



Best collection of the country

15+ Brands under one roof





TECNO

the experience







TOSHIBA

Leading Innovation



HITACHI

Inspire the Next

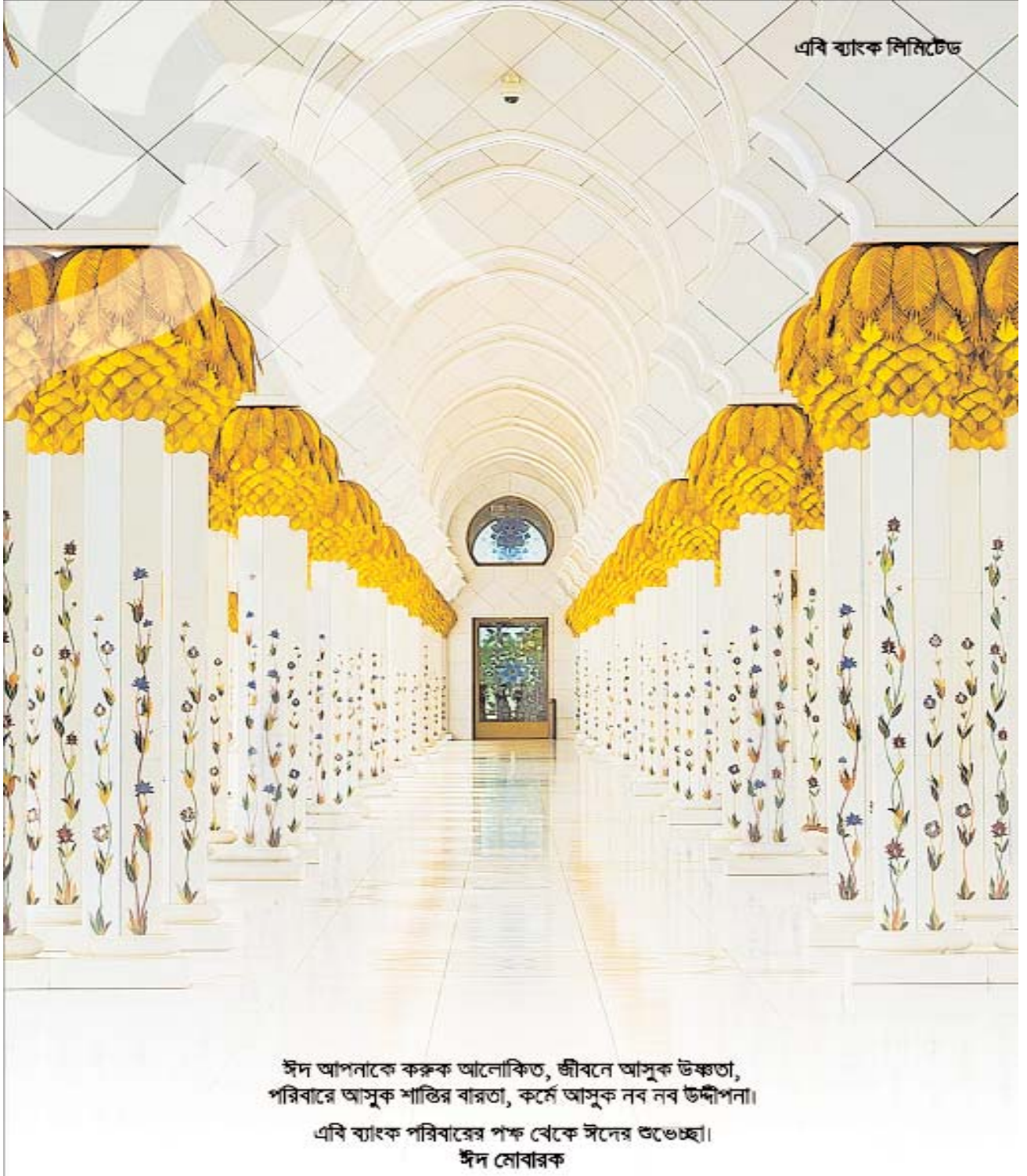


M.K. Electronics

Global electronics solution for your home

Gulshan Branch 24 Hamid Tower Gulshan C/A, Circle-2 Dhaka-1212. Tel : 9894129, 8831009	Dhanmondi Branch Nevana Newbury Place, 4/1/A Sobahanbagh, Mirpur Road Dhaka-1205. Phone: 9121946, 9122692 E-mail: dhanmondimk@mkelectronics.org	Kalabagan Yakub South Center, 156, Lake circus Kalabagan 67/D, Dhanmondi Dhaka-1205. Phone: 02-9136205 E-mail: kbsmke@yahoo.com	Stadium Branch 95, Bangabandhu National Stadium Market, Dhaka-1000. Tel : 9554232, 9558487
Jamuna Future Park Upper Basement, Shop no. UA 006, Jamuna Future Park, Dhaka-1229. Phone: 02-9832036, 02-9823037 E-mail: jfpmk@mkelectronics.org Web: www.mkelectronics.org	Uttara Branch Atlanta Trade Center House # 1/A, Road # 1 Sector # 4, Uttara Dhaka-1230. Tel: 58957114 E-mail: mk4uttara@yahoo.com	Chittagong Yunusco city center Ground Floor, GEC Mor, Chittagong-4000 E-mail: ctgyemk@mkelectronics.org Phone: 02-0312853119, 02-0312853120	

এবি ব্যাংক লিমিটেড



www.abbl.com

 AB Bank



দেশ কেউ দায়ের অঙ্গসিদ্ধি

যায়যায়দিন

১৯৮৪ থেকে

ঈদ সংখ্যা ২০১৬

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি
সাইদ হোসেন চৌধুরী

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক
কাজী রুকুনউদ্দীন আহমেদ

সাহিত্য সম্পাদক
সালাম সালেহ উদদীন

প্রচ্ছদ
শতাব্দী জাহিদ

গ্রাফিক্স
শিবশংকর দেবনাথ

বিজ্ঞাপন ব্যবস্থাপনা
মো. ইব্রাহীম খলিল স্বপন
মো. ইদ্রিছ আলী মিয়া
নূরে আলম

মুদ্রণ ব্যবস্থাপনা
বাহুল কবীর লিটন

বিপণন ব্যবস্থাপনা
মো. বিল্লাল হোসাইন
মো. আজিজুল হক

মূল্য : ১৫০ টাকা

ঈদ উৎসব

বর্ষার আমেজমাখা পরিবেশে বাঙালি এবার ঈদুল ফিতর উদযাপন করতে যাচ্ছে। ঈদ সারা বিশ্বের মুসলমানের জীবনে এক তাৎপর্যময় আনন্দঘন দিন। উৎসবের আনন্দ মানেই বাঙালির আনন্দ। কারণ উৎসবপ্রিয় জাতি হিসেবে বাঙালির খ্যাতি ও ঐতিহ্য আছে বিশ্বসমাজে। এবারের পবিত্র ঈদুল ফিতরেও সর্বত্র এ উৎসব-আমেজ পরিলক্ষিত হবে, এটাই সবার প্রত্যাশা। বাংলাদেশে উৎসব নতুন ধরন ও নবতাপর্য লাভ করেছে। ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আধুনিক জীবনবোধ ও জীবন জিজ্ঞাসার নানা প্রতীকী অর্থ ও উদ্ভাবনাময় ব্যঙ্গনা।

পবিত্র ঈদের আগে মুসলমানদের মাঝে রমজান আসে রহমত, বরকত, মাগফিরাত ও নাজাতের বার্তা নিয়ে। ঈদ কেবল বাঙালি মুসলমানের ধর্মীয় উৎসবই নয়, আনন্দ-বিনোদন এবং মিলনমেলাও। ঈদের আনন্দ ভাগাভাগি করে নেয়ার জন্য কারোর মধ্যেই যেন চেষ্টা ও আন্তরিকতার অভাব থাকে না। চারদিকে ঈদের আগমনী সুর বাজতে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ছোট-বড় সবার মনে আনন্দের ফানুশ উড়তে থাকে। চারদিকে কেবল উৎসবের আমেজ। মানুষের সাধ-সাধ্য-সীমাবদ্ধতার ব্যবধান অনেকটাই ঘুচে গেছে ঈদ সামনে রেখে। ঈদের আনন্দকে বরণের জন্যই বাংলার মুসলমান মাসব্যাপী অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেছে। ঈদকে কেন্দ্র করে ইদানীং গ্রামীণ জীবনেও লেগেছে নগর সংস্কৃতির ছোঁয়া। ঈদের আপ্যায়নেও ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। ফলে উৎসবের ধরন ও আমেজ বদলে গেছে। বদলে গেছে মানুষের জীবনধারাও।

ঈদুল ফিতরের আনন্দকে আরো জাঁকজমকপূর্ণ করে তুলতে এবারো যায়যায়দিন প্রতি বছরের মতো বর্ধিত কলেবরে ঈদ ম্যাগাজিন পাঠকের হাতে তুলে দিচ্ছে। নানা দিক থেকে বর্ণাঢ্য ও বৈচিত্র্যময় সেরা এই ম্যাগাজিন। দেশের স্নানামধ্য লেখক, কবি-সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবীদের লেখায় ভরপুর এবারের ঈদ ম্যাগাজিন। এতে রয়েছে বিশেষ রচনা, গল্প, উপন্যাস, কবিতা, নাটক, ভ্রমণ কাহিনী, উপাখ্যান, স্মৃতিকথা, ফ্যাশন, রূপচর্চা, রান্নাবান্না, বিনোদন, খেলাধুলাসহ নানা আকর্ষণীয় বিষয়।

এ বিশেষ সংখ্যাটি যদি পাঠককে আকৃষ্ট করে, তাদের মন ছুঁয়ে যায়, তাহলেই আমাদের পরিশ্রম সার্থক হবে। এবারের ঈদে বিগত দিনের হতাশা, গ্লানি ও দুঃখ মুছে যাক। সবার জন্য সহজ ও সুন্দর হোক আগামী দিনের পথচলা। যায়যায়দিনের সব লেখক, পাঠক, বিজ্ঞাপনদাতা, এজেন্ট, হকার, শুভানুধ্যায়ী সবাইকে জানাই ঈদ শুভেচ্ছা। ঈদ মোবারক।



সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি ও প্রকাশক : সাইদ হোসেন চৌধুরী, ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : কাজী রুকুনউদ্দীন আহমেদ
প্রকাশক কর্তৃক এইচআরসি মিডিয়া ভবন, লাভ রোড, ৪৪৬/ই-এফ+জি তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮ থেকে প্রকাশিত

ও যায়যায়দিন প্রিন্টার্স লিমিটেড থেকে মুদ্রিত

পিএবিএক্স : ৮৮৭ ০২০৮-১২ ফ্যাক্স : ৮৮৭ ০২০২ রিপোর্টিং : ৮৮৭ ০২১৪ বিজ্ঞাপন : ৮৮৭-০২২৩ ফ্যাক্স : ৮৮৭-০২০১
সার্কুলেশন : ৮৮৭-০২২৪ E-mail : country_jjd@yahoo.com, jajadi@jjdbd.com Website : www.jjdin.com

electra



বিদেশ ভ্রমণ

ইলেক্ট্রা পণ্য কিনুন

বিদেশ ভ্রমণ করে আসুন



উপহার সমূহ	
বিদেশ ভ্রমণ প্যাকেজ	ইলেক্ট্রা ব্রেডার
ইলেক্ট্রা আয়রণ	ইলেক্ট্রা দই মেকার

নগদ ও ১২ মাসের মজুদ নির্মিত
পাওয়া যায়।



* সর্ব প্রযোজ্য

ইলেক্ট্রা ফ্রিজ, ডীপ ফ্রিজার, এল ই ডি টিভি, মাইক্রোওয়েভ ওভেন, এয়ার কন্ডিশনার ও ওয়াশিং মেশিন প্রতিটি পণ্য ক্রয় করার সাথে সাথে পাবেন

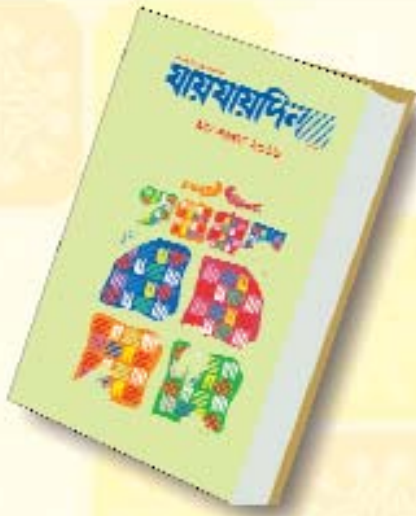
১টি ক্যাচ কার্ড

electra
INTERNATIONAL

* এই সুযোগ ১৪ জুলাই ২০১৬ ইং পর্যন্ত।

শোভন সমূহ : ঢাকা- ২৭, ৬০, ৭৮ বঙ্গবন্ধু জাতীয় টেলিগ্রাম মার্কেট, ফোন : ৯৫৫০২০৭, ৯৫৬০৪৮৯, ৯৫৭১৭৬৭, উত্তরা : ৮৯৫৮৬৯২, ৫৮৯৫২০৪৪, মহাশালী : ৯৮৫৭৫৬৯, বিজয় সরনী : ৫৮১৫১৬১৫, শেওড়াপাড়া : ৯১০১৭২৭, মোহাম্মদপুর : ৯১৮৫০৮০, শ্যামলী : ৯১২৭৫৪৬, মিরপুর-১ : ৯০০৮৬৯০, মিরপুর-১০ : ৯০২০০০০, পাছপাছ : ৯১০৯২৫৮, এ্যালিসফার্ট রোড : ৯৬৭৭০০৮, লালবাগ : ৯৬৭৭২৫৯, ধোলাইপাড় : ৭৪৪৯০২২, ধোলাইপাড় : (ডিসকাউন্ট সপ) : ৭৪৫১৯১০, সাতার : ৭৭৪২১৪৬, টাংগাইল : ০৯২১-৬২২৪০, ময়মনসিংহ : ০৯১-৬১১৯১, তৈলন : ৯৪৭১০২২, কুমিল্লা : ০৮১-৬৪৬০৪, সিলেট : ০৮২১-৭১৯২৬০, মৌলভী বাজার : ০৮৬১-৬০৫৭০, চট্টগ্রাম-১ : ০৩১-৬২৬৯২৪, চট্টগ্রাম-২ : ০৩১-৭৪১২০১, কক্সবাজার : ০৩৪১-৫২০১৬, বুলনা-১ : ০৪১-৭২১৫৫১, বুলনা-২ : ০৪১-৭২২৮৫৮, রাজশাহী-১ : ০৭২১-৭৭৬১৮৬, রাজশাহী-২ : ০৭২১-৭৭১৬০১, সাতার : ০৭৭১-৬৬৫৫২, পাবনা : ০৭৩১-৬৪৮৭৫, শিরাজগঞ্জ : ০১৮৪৪-১৪৬১০৫, বগুড়া ১ : ০৫১-৬২৫০০, বগুড়া-২ : ০৫১-৬৪৫৮৬, নওগাঁ : ০৭৪১-৬১১৭৫, জয়পুরহাট : ০৫৭১-৫১০৪২, গোবিন্দগঞ্জ : ০৫৪২৬-৭৫০৬৫, বিরামপুর : ০৫০২২-৫৬৪৯০, দিনাজপুর : ০৫০১-৬৬০৫০, রংপুর : ০৫২১-৬২৬১০, সৈয়দপুর : ০৫৫২৬-৭২৭৪৮, চুয়াডাঙ্গা : ০৭৬১-৬২৯০২, মাদারীপুর : ০৬৬১-৬২৬৪৭, নারায়ণগঞ্জ : ৭৬০০৬৭৫, নরসিংদী : ০১৭২০-১৬২৬০৬, বি-বাড়িয়া : ০৮৫১-৫২৫৮৮, চাঁদপুর : ০৮৪১-৬০২১৯, বরিশাল : ০৪০১-৬১২৭৯, পটুয়াখালী : ০৪৪১-৬২০০০, ভোলা : ০৪৯১-৬২৫৫৮, রাজবাড়ী : ০৬৪১-৬৬৬৬৮, মাগুরা : ০৪৮৮-৬২৬২২, সাতক্ষীরা : ০৪৭১-৬৪৬২৪। এছাড়া অনুমোদিত ডিলারগণের নিকট পাওয়া যাবে।

সেলস এন্ড মার্কেটিং অফিস : ১৫/১-৪ ট্রিপলিক্স মোটর টাওয়ার (৭ম তলা), শ্রুতি সরনী, মধ্যযাত্রা, ঢাকা, কোড : ৮৮০০১০১, ৮৮০০৮০২ ই-মেইল : electra@sazawa.com



সূচি

বিশেষ রচনা

- আহমদ মমতাজ * শেখ মুজিবের 'বঙ্গবন্ধু' হয়ে ওঠার নেপথ্যে - ৩৫
জোবায়ের আলী জুয়েল * নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার বিখ্যাত সিংহাসন - ৪৬

প্রবন্ধ-নিবন্ধ

- এমাজউদ্দীন আহমদ * এবারের ঈদ - ১১
কামাল লোহানী * একাত্তরে মুক্তিযোদ্ধাদের ঈদ কেমন ছিল - ১৫
বদরুদ্দীন উমর * বাংলাদেশের সমাজ জীবনে লেখক, সাহিত্যিক, শিল্পী, বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা - ১৯
সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী * বাঙালি সংস্কৃতিতে নারী - ২১
আবদুল মতিন খান * স্বাভাবিকতায় ফেরা - ৩১
বেলাল চৌধুরী * রবীন্দ্রনাথ ও কালিদাস - ৩৩
তারাপদ আচার্য্য * বাঙালির উৎসব আনন্দ - ৪৪
ড. রাশিদ আসকারী * সাহিত্যে সওদাগরবৃত্তি - ৭৬
এ কে আজাদ * কাজী নজরুল ইসলামের কবিতায় ঈদুল ফিতর - ৩০৭
মাহমুদুল বাসার * বাঙালির জয়পরাজয় - ৪৮
প্রশান্ত হালদার * যত মত তত পথ, বৈচিত্র্য যত সৌন্দর্য তত - ১৪২
সৌম্য সালেহ * শুকনো মাটি কিংবা স্নিগ্ধ কাফুরের ঘ্রাণ - ২৮৬

উপন্যাস

- জুবাইদা গুলশান আরা * যা হারিয়ে যায় - ৬২
নুরুল করিম নাসিম * স্বপ্নময় কিংবা প্রত্যাখ্যানের পটভূমি - ২০৬
আলমগীর রেজা চৌধুরী * বারুদ বৃষ্টির ঘ্রাণ - ১১০
সালাম সালেহ উদদীন * আলো-আধারির জীবন - ১৫৮
আবু সাইদ কামাল * বাঁ-হাতি তানিয়া - ২৫৪

গল্প

- বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর * বাড়ি আসবই - ৯৮
আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ * হৃদয়ের নিভূতে - ১৪৬
হাজেরা নজরুল * কনে দেখা আলো - ১৯৯
আলী ইমাম * গণ্ডার উপাখ্যান - ৭২
হারুন হাবীব * প্রেমিক - ২৪৬
সারোয়ার কবীর * ফাঁদ - ১২৭
ইকবাল আজিজ * বীরেন স্যারের চেহারার শেষ পরিণতি - ১২৪
রঞ্জিত বিশ্বাস * আমি তব পত্রের হব বাহিকা - ৭৪
আফরোজা পারভীন * ওস্তাদ - ৯২
মঈনুদ্দিন কাজল * সৈকতে দুজনে - ১৩৩

Eid MUBARAK

05:26
FRI, JANUARY 3

Tiger X6

www.winmaxmobile.com
/winmaxmobilebd

Winmax

TITAN

Ramadan Offer

GET A
ZOOP KIDS WATCH
FREE WITH EVERY
TITAN WATCH!



*Terms & Conditions Apply

Authorized Sales
& service centre

TIME ZONE

Dealers

DHAKA • Shimanto Square, Rapa Plaza, Concor Arcadia, Dhanmondi • Iqbal Centre, Banani • North Tower, RAK Tower, Polwel Camellion, Uttara • Concord Twin Tower, Fortune Shopping Mall, Malibagh • Mukta Bangla Shopping Complex, Mirpur-1 • New Market • Bashundhara City, Panthegepath • Jamuna Future Park, Baridhara • Suvastu Nezar Valley, Shahzadpur • Rankin Street, Wari • Police Plaza, Gulshan-1 • Westin, Gulshan-2 • 199, Tejgaon I.A. • **NARAYANGANJ** • Club Market • **MYMENSINGH** • Alaka Nodi Bangla Complex • **CHITTAGONG** • Radisson Blu Bay View Hotel, New Market, Ameen Centre, Afri Plaza • **SYLHET** • Al-Hamra Shopping Complex • **COMILLA** • Khandaker Haque Tower • **KHULNA** • Boro Bazar, Clay Road • **JESSORE** • M. K. Road • **RAJSHAHI** • Index Plaza • **BARISAL** • Hemayet Uddin Road • **RANGPUR** • Jahaz Company Shopping Complex • **SAVAR** • New Market • **BOGRA** • Jamil Shopping Centre • **FENI** • Nur Plaza • **COX'S BAZAR** • Coral Reef Plaza

DHAKA • Day Night Watch & Optics, Bright Watch & Optics, The International Watch Co., Unity Watch, Unique Watch, Novel Watch Co., Time House, M.H. Watch Co., Watch World, Reliable Watch, Watch Zone, Almas Super Shop, Khejani • **GAZIPUR** • Shourav Watch & Vision • **SAVAR** • Mavi Watch • **MYMENSINGH** • The Popular Watch Co., A.B. Watch • **CHITTAGONG** • Kanungo Watch Co., Kanungo & Son's Co., Kanun Watch Co., Nishat Watch Co., Electronics Garden, Newton Watch • **RAJSHAHI** • Pen Service, Crown Watch Co., Royal Watch & Electronics, Kejal Watch Service • **NATORE** • New Popular Watch • **PABNA** • Bappa Electronics, Citizen Electronics • **MOULVIBAZAR** • M.B. Cloth Store • **SYLHET** • Modern Watch • **B.BARIA** • Taranga Electronics • **CHANDPUR** • Mitall Electronics, Nitun Electronics • **NOAKHALI** • Time King • **RANGPUR** • Rafiq Watch Co., Super Store • **DINAJPUR** • Pubali Watch & Optics • **BOGRA** • Amir & Son's, Touch & Take, B.C.L. Super Store • **SIRAJGONJ** • Babul Watch • **NAOGAON** • Ghan Ghar, Khoka Store • **GAIBANDHA** • Time House • **FARIDPUR** • National Watch • **KHULNA** • Time Vision, Optiman, Time View • **SATKHIRA** • Time Watch • **CHUADANGA** • A.R. Watch • **NETROKONA** • Temenna Electronics • **SRIMANGLE** • M.B. Legacy • **CHAPAI NABABGONJ** • Golam Watch • **MANIKGANJ** • Mukta Watch & Optics • **SAYEDPUR** • Modern Watch • **JOYPURHAT** • Janani Electronics • **KISHORGONJ** • Batar Bhaban

Imported & Marketed by: Kallol Enterprise Ltd. 199 Tejgaon I. A., Dhaka-1208, Tel: 58816004-9



মাহবুব আলম * রমণীদের গল্প	- ২৩৪
শহীদ খান * কৃষ্ণপক্ষের জোছনা	- ২২২
অনূপ সাহা * মহাপ্রাণের আহ্বান	- ২২৫
জহিরুল হক * দিনলিপি	- ৩১৫
রোকেয়া ইসলাম * স্বপ্নের সিঁড়ি শূন্যতায়	- ৯৫
মনির জামান * হাওয়ায় ভেসে যাওয়া	- ৩১১
কাজী লাবণ্য * মানবী	- ১৩৫
স্বপ্না রেজা * জহরী	- ১৩৮
রুমা মোদক * একটি সুইসাইডাল নোট ও কয়েকটি ঘটনা	- ২৩২
সমীর আহমেদ * বস্তুর লোকটির সাথে তার কোনো শত্রুতা ছিল না	- ২৭৮
হোসেনে আরা মণি * আগামীর প্রতিভা	- ২৩৮
দিলরুবা আহমেদ * অভিবাসীর অভিযাত্রা	- ২৮৩
রেজাউল করিম খোকন * ফিরে যাওয়া হলো না	- ১৮৯
তমসুর হোসেন * ফকিরের ধনের নেশা	- ৩২৪
এলিজা খাতুন * এক দিনের ব্যবধান	- ২৮১
আবুল বাসার * মহাযাত্রা	- ৩৩১
সাজ্জাক হোসেন শিহাব * ক্যাসিনো-খোয়াব	- ৩২৭

কবিতাগুচ্ছ - ৫০-৫২

আল মাহমুদ, মহাদেব সাহা, নির্মলেন্দু গুণ, মাকিদ হায়দার,
ফারুক মাহমুদ, সরকার মাসুদ, গোলাম কিবরিয়া পিনু

কবিতাগুচ্ছ - ৫৪-৫৬

মাসুদুজ্জামান, হাসান হাফিজ, শফিক আলম মেহেদী, নির্মল
চক্রবর্তী, মিজান রহমান, ফারহানা রহমান, মিজানুর রহমান
বেলাল, অনু ইসলাম

কবিতাগুচ্ছ - ৫৮-৬০

সুজাউদ্দিন কায়সার, দিলারা হাফিজ, জাফরুল আহসান, প্রবীর
চন্দ, সুজন হাজারী, আনোয়ার কামাল, জাফর ওবায়দ, নীহার
মোশারফ

কবিতাগুচ্ছ - ১০৪, ১০৬, ১০৮

রেজাউদ্দিন স্টালিন, বদরুল হায়দার, তমিজ উদ্দীন লোদী, চঞ্চল
শাহরিয়ার, আমিনুল ইসলাম, শিউল মনজুর, নাহার ফরিদ খান,
শেলী নাজ, রনি অধিকারী, শাহরিয়ার সোহেল, নাহিদা আশরাফী

কবিতাগুচ্ছ - ১৫৪-১৫৬

তপন বাগচী, কামরুজ্জামান, জাকির আবু জাফর, মানস বিশ্বাস,
নাভেদ আফ্রিনী, ফারুক আফিন্দী, রওশন মতিন, শাহীন মাহমুদ





সৎ ও কল্যাণময় কাজে তোমরা একে অপরকে সহযোগিতা কর
-আল কোরআন



পবিত্র ঈদে
সম্মানিত
বীমা গ্রাহক
ও
দেশবাসীকে
প্রাণঢালা শুভেচ্ছা



ন্যাশনাল লাইফ ইনস্যুরেন্স কোম্পানী লিঃ

নিশ্চিত ভবিষ্যতের সুখের সার্থী

প্রধান কার্যালয় : এনএলআই টাওয়ার, ৫৪ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, কারওয়ান বাজার,
ঢাকা- ১২১৫ ফোন : ৫৮১৫১২৭১, ৫৮১৫১০৮৯, ৫৮১৫১৪৯০, ফ্যাক্স : ৮১৪৪২৩৭



কবিতাগুচ্ছ - ২৪২-২৪৪

মোস্তফা মীর, জাহিদুল হক, দুলাল সরকার, ফাহিম ফিরোজ, সমর চক্রবর্তী, মনসুর হেলাল, শাহজাদা বসুনিয়া, খালেদ রাহী

কবিতাগুচ্ছ - ৩৩৬

ইদ্রিস সরকার, জান্নাতুল ফেরদৌসী, মনিরুজ্জামান, রুমকি আনোয়ার

সঙ্গীত

মোবারক হোসেন খান * রাগ সঙ্গীতের
শ্রেষ্ঠ দশজন সঙ্গীতজ্ঞ

- ১৯৪

নাটক

ড. মুকিদ চৌধুরী * একটি আষাঢ়ে স্বপ্ন
নূনা আফরোজ * আমি ও রবীন্দ্রনাথ

- ৮৩

- ১৭৭

যাত্রা

মিলনকান্তি দে * বাংলার যাত্রা : বাঁকে বাঁকে
একুশ শতকে

- ৮৮

মঞ্চ

অপূর্ব কুমার কুণ্ডু * মঞ্চের অভিনেত্রী সোনিয়া হাসান

- ২৯৮

আখ্যান

নুসরাত শারমিন তানিয়া * পদ্মাবতী আখ্যান

- ১২০

স্মৃতিকথা

রংশে মৈত্র * পাবনা প্রেসক্লাব ও আমি

- ২৭

ভ্রমণ

তপন কুমার দাশ * সাগরবালা মালদ্বীপ

- ১৮৩

ড. মো. হুমায়ুন কবীর * ভ্রমণের অভিজ্ঞতায় শিক্ষালাভ

- ৩২০

প্রকৃতি

ড. মুহাম্মদ সিদ্দিক : নদী প্রসঙ্গ

- ৮০

ঈদ রেসিপি

পারভীন শম্মা * ঈদের রান্না

- ৩০২

রূপচর্চা

কানিজ আলমাস খান : ঈদের সাজসজ্জা

- ২৯২

ঈদ ফ্যাশন

অনামিকা লিপি * ঈদের ঐতিহ্য শাড়ি-পাঞ্জাবি

- ২৮৯

খেলা

জাহিদ রহমান * শামীমা সান্তার মিমু

ক্রীড়াঙ্গনের আলোকিত একজন

- ৩৩৩

ঈদ মুবারক

পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর উপলক্ষ্যে
অয়ন এ্যাডভার্টাইজিং ফার্ম এর
সকল গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ীদের
প্রতি রইলো ঈদের

শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন



AYAN Advertising Firm

দার-উল-ইসলাম আর্কেড, (৭ম তলা), মুন্সি নং-০৫, ১৪ পুরানা গণ্ডিন, ঢাকা-১০০০।
মোবাইল : ০১৭২৫-৫৫৫২৪২, ০১৭১২-৫৫৮৫৯০, ০১৭১৫-৪০৬২০৬, ০১৭১৪-২৯৫৭৫৬
ই-মেইল : ayan.adfirm@gmail.com

ইসলামী ইন্স্যুরেন্স বাংলাদেশ লিমিটেড

শরীয়াহু ভিত্তিক বীমার জগতে এক অনন্য নাম

অগ্নি, নৌ, মোটর, ইঞ্জিনিয়ারিং এবং বিবিধ বীমার
সর্বোত্তম সেবা প্রদানে সারা বাংলাদেশে রয়েছে

আমাদের ৩৮টি শাখা



ইসলামী ইন্স্যুরেন্স বাংলাদেশ লিমিটেড

(সহযোগিতা ও কল্যাণের প্রতীক)

প্রধান কার্যালয়

রূপায়ন তাজ (৩য় তলা)

১, ১/১, নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০

ফোন : ৮৩১৭৩৫৩ পিএবিএক্স : ৮৩১৭৩২০, ৮৩১৭৬৭১, ৮৩১৭৭৩৭ ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৮৩০১০৩২

ওয়েব : www.islamiinsurance.com ই-মেইল : islamiinsurance@gmail.com



প্রবন্ধ

এবারের ঈদ

এমাজউদ্দীন আহমদ

বাংলাদেশে এবারের ঈদ অনেকটা কুয়াশায় ঢাকা চাঁদের ম্লান আলোর মতো। নেই তার মনোলোভা সেই প্রভা। নেই সেই গুজ্জল্য। নেই মন কেড়ে নেয়ার সেই দ্যুতি। ব্যক্তির ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম রয়েছে বটে, সমস্তির দৃষ্টিতে এবারের ঈদ খানিকটা বিষাদের ছটায় মলিন। ঈদের দিন কোনো অভিযোগ রাখতে নেই। তাই আমাদেরও নেই কোনো অভিযোগ। কিন্তু চারদিকে তাকিয়ে দেখুন তো। বাজারে দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি। কোনো কিছুতেই হাত দেয়ার জো নেই। রমজান মাসে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখার কতো কথা, কতো প্রতিশ্রুতি উচ্চারিত হলো। কাজের কাজ কিন্তু কিছুই হয়নি। হাতে টাকা থাকলে উচ্চ দ্রব্যমূল্যকে উপেক্ষা করা যায়,

কিন্তু টাকা কোথায়? ব্যবসাবাণিজ্যে মন্দার ঢেউ। শিল্প-প্রতিষ্ঠানে উৎপাদন হ্রাস। কর্মসংস্থান হ্রাস পাচ্ছে। টাকা আসবে কোথা থেকে? একশ্রেণির লোকের হাতে অবশ্য টাকার অভাব নেই। সন্ত্রাস যাদের পেশা, 'দিনবদলের' এ সময়ে তারা তাদের দিনবদল করে ফেলেছে। চাঁদাবাজি-টেন্ডারবাজিতে যারা হাত পাকিয়েছে, ক্ষমতার করিডোরে ঘোরাফেরা করে তারা কামিয়েছে অটেল টাকা। এ ঈদ তাদের জন্য। কিন্তু সমস্তির? দেশের বৃহত্তর জনসমস্তির কাছে যতোটা আনন্দের, ঠিক ততোটাই বিষাদের। ছেলেমেয়েদের আবদার মেটানোর সামর্থ্য কোথায় তাদের? নিজেদের প্রয়োজন না হয় ভুলে থাকা যায়, কিন্তু ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের শখ-



**SCHOOL
BANKING**
TEACH THEM YOUNG

*It is time to change
the glass jar!*



Your kids have a natural propensity to collect their little gifts in glass jars or plastic containers. Standard Bank brings banking that is only for them.

From today, let Standard Bank be their savings partner.



Standard Bank Limited

www.standardbankbd.com

আছাদ? একটু ভালো খাবার? ঈদের দিনে সস্তা হলেও নতুন জামা-কাপড়? মুসলিম বিশ্বের এ সার্বজনীন উৎসব ঈদুল ফিতরের দিন একটু ভিন্ন। ঈদে ব্যক্তিগত আনন্দ বা ফুর্তির যে আমেজ তারচেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ সমাজে সামগ্রিক সন্তুষ্টি। সমষ্টিগত ফুর্তিই ঈদকে বিশৃঙ্খলীকরণ করে তোলে। মুসলিম বিশ্বে ঈদ আসে এক মাস সিয়াম সাধনার পরে। ঈদ আসে আত্মশুদ্ধির মোহনা ঘেঁষে। তাই ঈদের আনন্দে নেই কোনো বাঁধনছাড়া গতি। নেই অসংলগ্ন কোনো ছন্দ। ব্যক্তির উর্ধ্বে যে সমাজ, এমনকি সমাজের সন্ধীর্ণ গণ্ডি পেরিয়ে যে বিশৃঙ্খল উম্মাহ তার সুখ-দুঃখের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে ঈদ আসে। সুতরাং ঈদে একদিকে যেমন রয়েছে আনন্দের আবহ, অন্যদিকে রয়েছে এক ধরনের কর্তব্যবোধ ও সবার সঙ্গে ঈদ পালনের এক ধরনের নিষ্ঠা এবং সৃষ্টিকর্তার প্রতি কৃতজ্ঞতাবোধ। তাই ঈদের আনন্দ যতোটুকু ব্যক্তিগত, ঠিক ততোটুকু সমষ্টিগত এবং সমষ্টিগত পর্যায়ে বাংলাদেশের মানুষের জীবন এখন ভয়ঙ্কর পর্যুদস্ত। রাস্তায় নামলে নিশ্চল গতি। তাছাড়া রয়েছে সেই পরিচিত অভিজ্ঞতা— ছিনতাই, রাজহানি আর সন্ত্রাসের দাপট। আইনশৃঙ্খলার অবনতি। জনজীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে সন্ত্রাসীদের মহড়া, বাচালতা আর নিষ্ফল আক্ষালন, হিংসা আর প্রতিহিংসার কালো থাবা। এর মধ্যে এবারে ঈদ এলো। ঈদের দিনে সহাস্য সম্ভাষণ এবং উষ্ণ কোলাকুলির ডালা সাজিয়ে ঈদ এলো। পিতার হাতে কোমল আঙুলগুলো গলিয়ে ছোট ছেলেটিরও ঈদের জামায়াতে যাওয়ার দাওয়াত নিয়ে এলো ঈদ। দুঃখ-দৈন্যের উষর মরুভূমিতে শ্যামলিমা সমৃদ্ধ মরুদ্যান যেন। সবার মুখে অন্তত এই দিনটিতে হাসি ফুটুক। অন্তত এই দিনটিতে সবাই ব্যথা-বেদনার যন্ত্রণা ভুলে সবাই সবার বুকে বুক মিলাক। আজকের দিনে এর চেয়ে বেশি আর কী চাইতে পারি?

বাংলাদেশের বৃহত্তর জনসমষ্টির কাছে ঈদুল ফিতর এক আনন্দঘন অনুষ্ঠান। আবালবৃদ্ধবনিতার অনুষ্ঠান এটি। ধনী-দরিদ্র সবার জন্য আনন্দমুখর দিনটি। পল্লী-শহরাঞ্চলে উভয় এলাকায় সবাই উদ্বেল হয়ে ওঠে এই দিনে। এই দিনে সবাই আপনজনের সান্নিধ্য পেতে চায়। দূদগু কাটাতে চায় প্রিয়জনদের পাশে। মা পেতে চায় সন্তানকে কাছাকাছি। কার্য উপলক্ষে দূরে অবস্থানকারী সন্তান-সন্ততি তাই ছুটে চলে মায়ের পাশে। ভাই ছুটে আসে বোনের কাছে। বোন ভাইয়ের কাছে আসে হাজারো প্রতিবন্ধকতা জয় করে ঈদের দিনে। এই দিনের আনন্দে ছোট-বড় হাত ধরাধরি করে শরিক হয়। ঈদের নামাজ শেষে উষ্ণ কোলাকুলিতে প্রাণের আবেগ বিলিয়ে দেয় সবাই। মুরব্বিরদের সালাম জানিয়ে আনত দৃষ্টিতে তাদের স্নেহে ভাগ বসায়। মুরব্বিররাও সবাইকে বুক জড়িয়ে বেহেশতি সুখ অনুভব করে। সমগ্র সমাজব্যাপী ঈদের আনন্দ গড়িয়ে পড়ে স্নেহ-প্রেম-প্রীতির অঝোর ধারায়। প্লাবিত করে সমাজ জীবনের দশ দিক। এসব কারণেই ঈদ এতো প্রত্যাশিত অনুষ্ঠান। এতো কাঙ্ক্ষিত উৎসব। বাংলাদেশে এবারের ঈদ, আগেই বলছি

অনেকটা মেঘে ঢাকা আকাশে স্নান চাঁদের আলোর মতো। এ দেশে কিছু ব্যক্তি রয়েছেন, যাদের ঘরে ঈদ আসে প্রতিদিন। কিন্তু ভাবুন তো ওইসব ব্যক্তির কথা, যারা জীবনযুদ্ধে পরাস্ত, হতাশাগ্রস্ত-বঞ্চিত, তাদের জীবনে ঈদ আসে বছরে এই একদিন। তারাও ঈদের দিনটিতে আশায় বুক বাঁধে। আবহমান বাংলার ঐতিহ্য ধারণ করে তারাও ছোট ভাঙা ঘরটিতে নামিয়ে আনতে চায় স্বপ্নীয় এক পরিবেশ। নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী সবাই দেখতে চায় প্রিয়জনদের মুখে হাসি। ভুলতে চায় সেদিন জীবনযন্ত্রণা। সাধ্যমতো সাজাতে চায় নিজেদের সংসারটাকে। বাবা-মায়ের জন্য ছোট একটা উপহার, সন্তান-সন্ততিদের জন্য নতুন জামা-কাপড়, প্রিয়জনদের জন্য সামান্য কিছু সবাই এদিন সংগ্রহ করতে চায়। প্রত্যেকে এদিন ভালো কিছু খেতে চায়। পরিবার-পরিজনদের ভালো কিছু খাওয়াতে চায়, তত্ত্ব বাজারের উত্তাপে তাদের সব আশা হাওয়ায় মিলিয়ে গেলেও।

তারপরও ঈদ এলো। ঈদ এলো এ নির্মম সমাজে অবিন্যস্ত ব্যবস্থাপনার ভাঙা ঘরে। সমাজব্যাপী জবরদখল, হত্যাকাণ্ড, ধর্ষণের নারকীয়তার প্রচণ্ড দাপটের মাঝে ঈদ এলো। রাজনীতিকদের দুর্নীতি, আত্মজরিতা, বাচালতা আর হাজার হাজার প্রতিশ্রুতির নিষ্ফলতার মধ্যে এবারে ঈদ এলো। এ অবস্থা যেন বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ। প্রাচীন বাংলা লোকসাহিত্য ‘মলুয়া’য় তৎকালীন শাসনব্যবস্থার যে ছবি অঙ্কিত হয়েছে, তার দিকে দৃষ্টি দিলেও একই ছবি চোখে পড়ে। লিখিত হয়েছে :

বড়ই দুরন্ত কাজী ক্ষমতা অপার
চোরে আশ্রয় দিয়া মিয়া সাউদের দেয় কার।
ভালো মন্দ নাহি জানে বিচার আচার,
কুলের বধু বাহির করে অতি দুরাচার।
অন্যকথায়, দুরন্ত কাজীর অপার ক্ষমতা রয়েছে। সে চোরকে আশ্রয় দেয়, সাধুকে দেয় কারাবাস। ভালোমন্দ বা আচার-বিচার সে জানে না। সে এতোই খারাপ যে, কুলের বধুদেরও ঘর থেকে বের করে নিয়ে আসে। মলুয়ার বাংলা আর আজকের বাংলাদেশে তফাৎ কোথায়? কোথাও নেই জীবনের এতোটুকু নিরাপত্তা। নেই ইনসাফ আর ন্যায়নীতির এক কণাও। চারদিকে চোখে পড়ে শুধু ক্ষমতাপ্রীতির অশুভ ছায়া, হিংসা-প্রতিহিংসার জল্পাদি রূপ আর নির্যাতন ও নিপীড়নের বিভীষিকা। সবকিছুকে ছাপিয়ে তারপরও বাংলাদেশের ঘরে ঘরে ঈদ এলো। ঈদে এসেছে সম্ভাষণ এবং উষ্ণ কোলাকুলির ডালা সাজিয়ে। পিতার হাতে কোমল ছোট আঙুলগুলো গলিয়ে ছোট শিশুটিরও ঈদের জামায়াতে যোগদানের দাওয়াত নিয়ে এলো ঈদ। মায়ের পায়ে হাত দিয়ে প্রবাসী সন্তানের সালাম করার উদগ্র আকাঙ্ক্ষা পূরণ করার প্রতিশ্রুতি নিয়ে ঈদে এলো। প্রিয়জনের কলকোলাহলে ছোট ঘরটি মুখরিত করার অঙ্গীকার নিয়ে ঈদে এলো।

আশা আমার, সবার মুখে অন্তত এ দিনটিতে হাসি ফুটুক। এ দিনটিতে সবাই ব্যথা-বেদনার যন্ত্রণা ভুলে বুক বুক মিলাক। আনন্দের বন্যায় ভেসে যাক সব দুঃখ-দৈন্যের আবর্জনা। আমাদের কামনা— ঈদ সবার ঘরে আসুক। আসুক বিনয় পদভারে। আসুক অনাবিল খুশির ডালা সাজিয়ে, সবার ঘরে ঘরে।



বিএইচবিএফসি'র বিশেষ বিজ্ঞপ্তি সম্মানিত ঋণপ্রার্থী/গ্রহীতাদের দৃষ্টিআকর্ষণ

- * বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন ৬ দশকেরও বেশি সময় ধরে দেশে গৃহনির্মাণ ঋণ প্রদানে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে ;
- * কর্পোরেশন সরল সুদে ঋণ দিয়ে থাকে। ঢাকা ও চট্টগ্রাম মহানগরে সুদের হার বার্ষিক ১২% এবং দেশের অন্যসব এলাকায় বার্ষিক ১০% ;
- * সাধারণত সমমাসিক কিস্তিতে মোট ১৫/২০ বছরে ঋণ পরিশোধেয় ;
- * সকল বিভাগীয় ও জেলা সদর, উপজেলা সদর এবং গ্রোথ-সেন্টারসমূহে গৃহনির্মাণ ঋণ প্রদান করা হয় ;
- * ঢাকা ও চট্টগ্রাম মহানগরীসহ দেশের সকল জেলা সদর এবং টংগী ও সাভার পৌর এলাকায় ফ্ল্যাট/এপার্টমেন্ট ক্রয়ে ঋণ দেয়া হয় ;
- * সম্মানিত গ্রাহকবৃন্দ Online-এ ঋণের প্রাথমিক আবেদন দাখিল করতে পারেন ;
- * ঋণ মঞ্জুরী প্রক্রিয়া সহজ করা হয়েছে ;
- * সদর দফতর থেকে হিসাব বিবরণীসহ যেকোন সেবা দিতে Help Desk চালু আছে ;
- * সেবার মান উন্নয়ন ও হয়রানি বন্ধে প্রতিটি মাঠ কার্যালয়ে One-Stop সার্ভিস চালু আছে ;
- * সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রতিটি অফিসের উন্মুক্ত স্থান এবং ওয়েবসাইট-এ কর্পোরেশনের সিটিজেন-চার্টার প্রদর্শিত রয়েছে ;
- * কর্পোরেশনের গুরুত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ডের সচিত্র সংবাদসহ ত্রৈমাসিক বুলেটিন গৃহঋণ বার্তা নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে।



বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন

সদর দফতর, ২২, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০

Help Desk Phone: 9561380

E-mail : bhabfc@bangla.net, Web : www.bhabfc.gov.bd



বিশেষ রচনা

একাত্তরে মুক্তিযোদ্ধাদের ঈদ কেমন ছিল

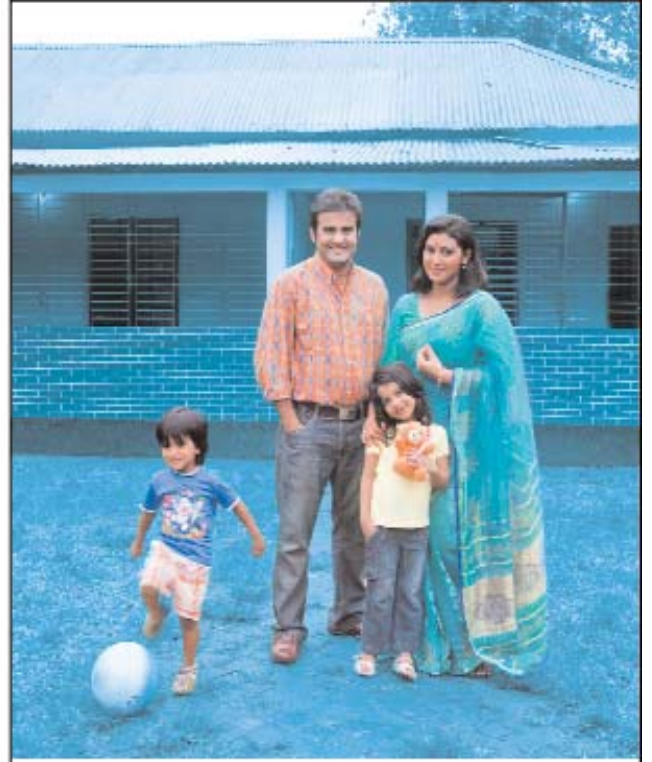
কামাল লোহানী

মুক্তিযুদ্ধ যখন চলছিল, তখন অনেক অবশ্যপালনীয় ধর্মীয়, সামাজিক ও জাতীয় দিবস এসেছিল রণাঙ্গনে, কিংবা মুক্তির লড়াইয়ে নিবেদিতপ্রাণ অন্যান্য মানুষের জীবনে, তা কি পালন কিংবা উদ্‌যাপন করা সম্ভব হয়েছিল? কিংবা পালন করার মতো কোনো পরিবেশ সেদিন কারো জীবনে ছিল? অপরূপ বাংলাদেশে ভীতসন্ত্রস্ত মানুষ সারাক্ষণ ভাবছে কখন যমদূতসহ আলবদর-আলশামস আর জামায়াত কিংবা ইসলামী ছাত্র সংঘের সশস্ত্র ধর্মান্ধ ক্যাডার এসে

হাজির হয়ে যায়! ঈদ কিংবা পরব কি আর তাদের কাছে। আর যারা আমরা মুক্তিযুদ্ধে ছিলাম, তাদের কাছে তখন যে কোনো পরবের চেয়ে প্রিয় ছিল স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ। যে যুদ্ধ আমাদের দেবে আপন মাতৃভূমির মুক্তি। তাই মুক্তিযুদ্ধটাই আমাদের কাছে ছিল পরাধীনতার গ্লানি মুছে ফেলার এক উৎসব, সে উৎসব আমাদের যারা এতটা বছর ধরে হতমান করেই রাখেনি, দিয়েছে অবমাননা, সম্পদ লুটে নিয়ে গেছে নির্বিচারে, অবহেলা-উপেক্ষা এবং বৈষম্যের জটাজালে



- ❑ Fastest Inter Bank Fund Transfer
- ❑ Mobile Top-up/Recharge
- ❑ Credit Card Bill Payment
- ❑ Bill payment of Qubee & Banglalion



আবাস লোন

ছেট হোক তবুও নিজের বাড়ি

সিটি কর্পোরেশন এলাকার বাইরে কমপক্ষে ৩ শতাংশ জমি থাকলেই আপনার নিজের একটি বাড়ি নির্মাণে প্রথম ব্যাংক দিচ্ছে আবাস লোন।

- ❑ সর্বোচ্চ ৩০ লক্ষ টাকা
- ❑ লোনের মেয়াদ সর্বোচ্চ ১০ বছর, বিশেষ ক্ষেত্রে ৬ মাস বর্ধিত হতে পারে
- ❑ গ্রেস পিরিয়ড ৬ মাস*

*সর্বোচ্চ



জড়িয়ে আমাদের পশু করে ফেলার এক ভয়াবহ চক্রান্ত চালিয়েছিল। আর সে কারণেই সেই অবাঙালি সংখ্যালঘিষ্ঠ জনগোষ্ঠী আমাদের থেকে হাজার মাইলের ব্যবধানে রেখে পূর্ব বাংলাকে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকশ্রেণির উপনিবেশ বানিয়ে রাখতে চেয়ে নানা অত্যাচার-নিপীড়নে স্টিম রোলার নিরবধি চালিয়ে যাচ্ছিল। তাদের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার লক্ষ্যেই পূর্ব বাংলার আপামর জনসাধারণ বিশেষ করে কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, জনতা, নারী-পুরুষ মায় কিশোর পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল।

আমার মনে আছে, মুক্তিযুদ্ধ যখন প্রায় শেষের দিকে, নভেম্বর মাস শত্রুসেনা পাকিস্তানি বীর পুঙ্গবেরা সর্বত্র মার খাচ্ছে এমন সময় এসেছিল ঈদুল ফিতর। রোজার ঈদ। বুঝতেই পারছেন পাঠক, এক মাস রোজা পালন শেষে যে ঈদ আসে, সে ঈদ কিংবা রোজা রাখার মতোন পরিবেশ-পরিস্থিতি ছিল না। কোথায় থাকি, কখন খাই কি না খাই তার মধ্যে জীবনকে বাজি রেখেই তো আমরা লড়ে যাচ্ছিলাম পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে। রণাঙ্গনের সহযোদ্ধা বন্ধু মুক্তিযোদ্ধাদের তো রাত্রি বিনিদ্র লড়তে হচ্ছে কোথায় পাবে খাবার? কোথায় পড়বে নামাজ? রোজা থাকবার মতোন অবস্থা নেই কারো। তবু কেউ কেউ রোজা থাকার চেষ্টা করেছেন খেয়ে না খেয়ে।

যতদূর মনে পড়ে, অক্টোবরের শেষ দিকে রমজান শুরু হয়েছিল। দিন তিরিখ মনে নেই, হয়তো অক্টোবরের ২৮ কি ২৯ তারিখে রোজা শুরু হয়েছিল এবং ঈদুল ফিতর ছিল ২৬ নভেম্বর, ১৯৭১। এদিন তো উৎসবের দিন। ঈদ মানেই উৎসব। আর আমরা প্রত্যুত হচ্ছিলাম চূড়ান্ত বিজয়ের জন্য, সেদিন হবে বাংলার সব ধর্মবর্ণ-দলমতের সব মানুষের একেবারে বিজয় উৎসব। নভেম্বর মাসে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী মনস্তাত্ত্বিকভাবে পরাজয়বরণ করতে শুরু করেছে। হেরে যাচ্ছে বিভিন্ন ফ্রন্টে। ওদের মধ্যেও হতাশা দেখা দিয়েছে। ওদের পূর্বাঞ্চলীয় সেনাপ্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল একে নিয়াজি যুদ্ধে জিততে পারবেন না এমন ভাবতে আরম্ভ করেছেন।

এমনি সময় ‘রমজানের ঐ রোজার শেষে এলো খুশীর ঈদ’ বলার কথা সবার কিন্তু মুক্তিযুদ্ধে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়তে যারা জান লড়িয়ে দিয়েছেন, তারা কী করবেন? তাই সাংবাদিক-গীতিকার শহীদুল ইসলাম লিখলেন মুক্তিযুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে আমাদের করণীয় নির্দেশ করে ‘চাঁদ তুমি ফিরে যাও’, কবি বললেন, ‘রক্তিম এ বাংলায় তোমায় বসতে দেব কোথায়?’ ওর গানের কলিটা শুনে সেদিন বহু বছর পর ছোটবেলাকার ছেলে ভোলানা ছড়া অথবা মা আদর করে তার কোলে ছোট্ট চাদের কণার কপালে টিপ দিয়ে যাওয়ার জন্য কতই না আবদার ধরতেন—

‘আয় আয় চাঁদ মামা
চাঁদের কপালে চাঁদ
টিপ দিয়ে যা।’

আজ শত্রুসেনা পাকিস্তানি হানাদারদের হামলা

রক্ত স্বাক্ষরের এই বাংলার মানুষ তোমাকে দেখেও

আকাশের পানে তাকিয়ে আনন্দ-উচ্ছ্বাসে আপুত

হতে পারছে না। তাই এই রক্তাক্ত প্রান্তরে চাঁদকে রাখবে কোথায় সেই প্রশ্ন খোদ কবির মনে জেগেছে।

আর রণসৈনিক কিংবা শব্দসৈনিক অথবা মুক্তিযুদ্ধে নিয়োজিত ধর্মপ্রাণ মুসলমান পর্যন্ত আজকের এই দিনে এতটুকু আনন্দ প্রকাশ করতে পারছে না। তারা জানে না, তারা কিংবা তাদের পরিবার-আত্মীয়স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী, গ্রাম-নগরের বাসিন্দা কে কোথায় আছেন, আদৌ বেঁচে আছেন কিনা— তাও জানে না। তাহলে ঈদ কেন যে কোনো উৎসবই তো তাদের কাছে ফিকে হয়ে গেছে। তাই রোজা কিংবা ঈদ কোনো আবেগে দুর্বল করতে পারেনি আমাদের। তাই তো গীতিকার শহীদুল ইসলাম লিখেছেন—

চাঁদ তুমি ফিরে যাও

দেখো মানুষের খুনে খুনে রক্তিম বাংলা

রূপালী আঁচল কোথায় রাখব বল।

দুঃখিনী মায়ের কোলে নেই সন্তান

শোকের পতাকা চোখে

ফেটে যায় প্রাণ

মোদের শান্তি কেড়ে নিল যারা

তাদের তরে আজ আমাদের

বারুদ হোয়ে জ্বলতে দাও।

লুটেরা লুটেছে হাসি এই বাংলার

নেমেছি তাই রণাঙ্গনে চাই অধিকার

মুক্তিতে হাসি ফুটেবে যেদিন

সেদিন এসো খুশির চাঁদ

আজকে মোদের লড়তে দাও ॥

এমনি মনের ভাবটা প্রকাশ করেছেন শহীদুল

ইসলাম। কিন্তু এ কথাগুলো তো কেবল শহীদের

ছিল না। এমন ছিল সব মানুষের। যুদ্ধরত সব রাত

ছিল পাহাড়-সমতলের আদিবাসী জনগোষ্ঠী সব

মানুষই কেবল কামনা করছিলেন কবে মুক্তি

পাবেন হায়নাদের হাত থেকে। সেদিনই

উদ্‌যাপিত হবে সত্যিকার ঈদ— সাধারণ মানুষের

উৎসব।

লড়াকু বাংলার অকুতোভয় মানুষের বিজয় উৎসব।

আমরা রণক্ষেত্রে, স্বাধীন বাংলা বেতারের

শব্দসৈনিক কিংবা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

সরকারের সব কর্মকর্তা, কর্মী, মন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী

সবাই দিন গুনছিলেন সেই সে শুভদিনের বিজয়

উৎসবের।

ঈদের শুভেচ্ছা জানিয়ে ঈদের এই দিনে অবরুদ্ধ

বাংলাদেশের প্রতিক্ষণ লড়াইয়ের শক্তায় দিন

কাটানো মানুষগুলোকে এক হায়নার খাঁচায় বন্দি

আতঙ্কিত জীবনে যেন তারা কেউ ভীতসন্ত্রস্ত না

হোন, তাদের মনে উৎসবের আমেজ বজায় রাখা

ছিল মুক্তিসেনা হিসেবে আমাদের পবিত্র কর্তব্য।

যেন পাকিস্তানি দখলদার সেনাবাহিনীর জুলুম,

হত্যার মধ্যে ঈদ যেন বিষাদে পূর্ণ না হয়, সেটাই

আমাদের লক্ষ্য। রণাঙ্গনে লড়াকু বন্ধুরা তো

শানিত দৃষ্টি নিয়ে শত্রুর কারিলায় হামলার সুযোগ

খুঁজছিল এই ঈদেরও দিনে। কারণ মুসলিম

জনগণের সবচেয়ে বড় এই উৎসব ইবাদতের

দিনে পাকিস্তানি বেরহম দিলের বুঝদিল কাপুরুষ

সৈন্যবাহিনী ধর্মীয় দুর্বলতার সুযোগে সাধারণ

মানুষকে হত্যা করতেও ছাড়েনি। তাই দুশমন

বেহরমদের সমুচিত জবাব দেয়ার জন্য

মুক্তিসেনারাও প্রত্যুত ছিলেন ঈদের দিনেও।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র সচিবালয় এমনকি মন্ত্রী-সচিব পর্যায়ের ব্যক্তিগত হয়তো খানিকটা সময় বের করে ধর্মকর্ম পালন করেছেন বাংলাদেশ মিশনে। আর কর্মী মুক্তিসেনারা জাতিগত লড়াইয়ে নিবেদিতপ্রাণ সৈনিকের মতোন নিজেদের উৎসর্গ করেছিলেন মাতৃ মুক্তিপণ পূরণের জন্য।

তবে এ অবস্থার মধ্যেও আমরা স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সদস্যরা একটা কৌশলগত ভুল করে ফেললাম, যা আমাদের নাকে খত দিতে বাধ্য করেছিল। আমরা যখন বুঝতে পেরেছিলাম অন্যায় করে ফেলছি আবেগের বশে, তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। তবে ভারতীয় নিরাপত্তা বাহিনীর উপ-পরিচালক মিঃ দাস যিনি আমাদের দায়িত্বে ছিলেন, তার দক্ষ ও পারঙ্গমতার মাধ্যমে এমন একটি কঠিন এবং ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত লাগা একটি বিষয়কে খুব সহজে না পারলেও অবশেষে ক্ষুদ্র প্রহরী, নিরাপত্তারক্ষীদের বুঝিয়ে আবার কাজে লাগাতে পেরেছিলেন।

সুপ্রিয় পাঠক! আমরা থাকতাম বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে। সেখানে একটি পাড়ার ভেতর এক পাশে ছিল একটি দোতলা ভবন, সেখানে প্রথম দিকে থাকতেন মন্ত্রিপরিষদ সদস্যরা কিন্তু যখন প্রবাসী সরকার ভারতের কাছ থেকে ৫০ কিলোওয়াট মিডিয়াম ওয়েব একটি ট্রান্সমিটার পেয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধকালীন প্রবাসী সরকারের পরিচালনাধীন এই স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র চালু করার জন্য বালিগঞ্জের এই ভবনটি সর্বাত্মক নিরাপদ ছিল বলে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ বেতার কেন্দ্রের জন্য নির্বাচিত করে ছেড়ে দিয়েছিলেন।

এ ভবনেই ২৫ মে, ১৯৭১ বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মদিনে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রটিও নতুন করে শক্তিশালী প্রচারযন্ত্রের মাধ্যমে চালু করা হয়। প্রথম থেকেই বেতারকর্মীদের অনেকেই আমরা এখানে থাকতাম এবং বেতারের জন্য প্রোগ্রাম তৈরি, নিউজ মনিটরিং এসবই করতাম। প্রথমে দুই পর্বে তিনটি অধিবেশন সকাল, দুপুর ও সন্ধ্যায়। বাংলা, ইংরেজি ও উর্দুতে অধিবেশনটি চালানোর ব্যবস্থা হয়েছিল এখানে থেকেই। এখানে কোনো স্টুডিও ছাড়াই শুরুর করা হয়েছিল। দু-এক দিনের মধ্যেই প্রথম স্টুডিওটি প্রস্তুত হয়ে গেল। তখন ওখানেই সব রেকর্ডিং করা হলো। পরে অবশ্য ২ নাম্বার স্টুডিও দোতলাতেই তৈরি হয়েছিল। এখানে আমরা সার্বক্ষণিক কাজ করার মতোন কিছু মানুষ বসবাস করতাম। কাজ সেরে বাইরে যেতে যেতাম। কিন্তু এতে কাজের অসুবিধা হয়। নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করা যায় না, কাজে বিঘ্ন ঘটে। তাই খাবারের ব্যবস্থাও ওই বাড়িতেই হলো।... আমাদের নিরাপত্তার বিষয় তখন অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিল। সেজন্য গুর্খা সম্প্রদায়ের বিএসএফ সদস্যদের বেশ কিছু জোয়ানকে ওই ভবনে আমাদের দেখাশোনা, রক্ষণাবেক্ষণ নিরাপত্তাসহ দৈনন্দিন কিছু কাজও ওরা করত। ওরা খুবই বন্ধুসুলভ ব্যবহারের মানুষ ছিল। রান্না, খাওয়ানো, তৈজসপত্র পরিষ্কার করা যাবতীয় কাজ তারাই করত। ওরা আমাদের প্রতি দারুণ শ্রদ্ধাশীল ছিল। অবসর পেলেই আমাদের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে জানতে চাইত এবং সেসব নিয়ে গল্পসল্প করত। কিন্তু একদিন আমরা একটা কৌশলগত ভুল

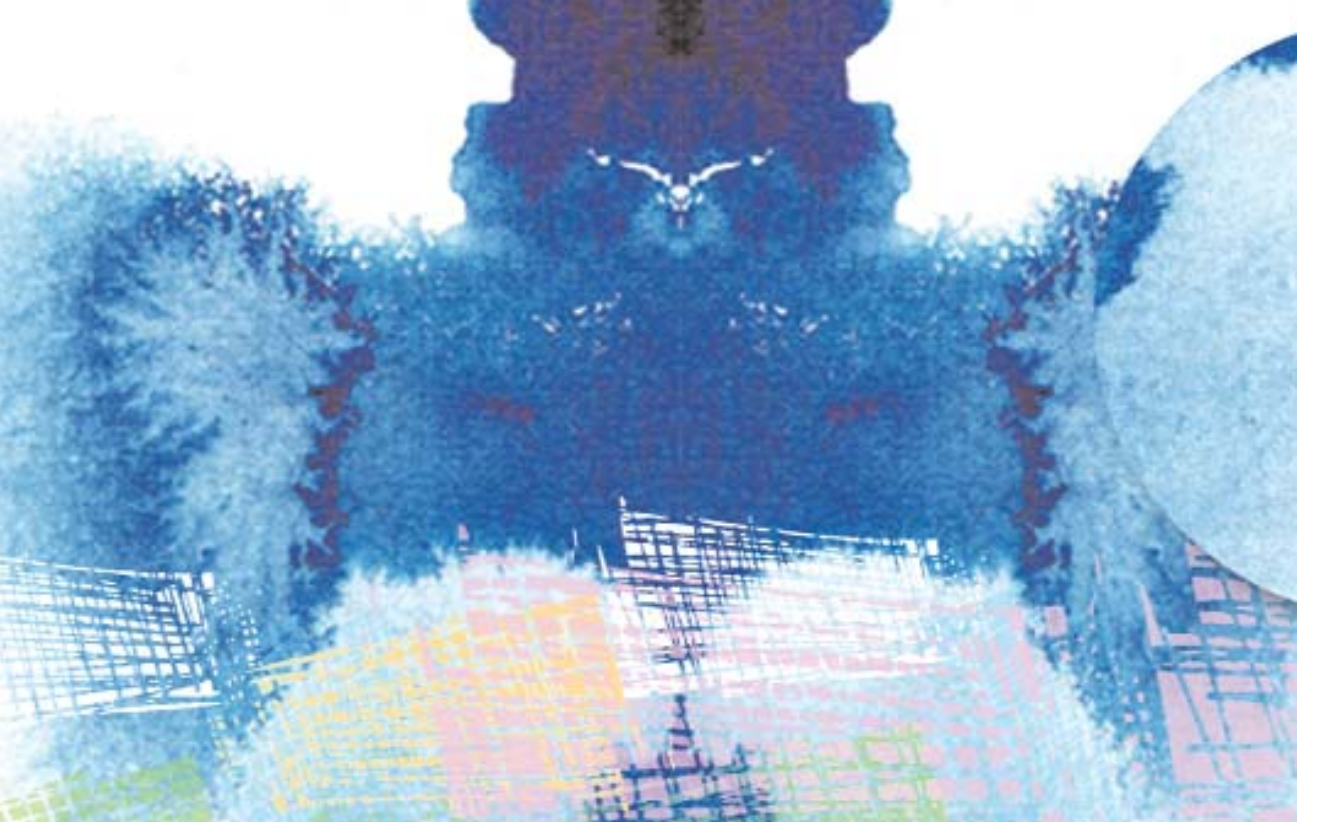
করে ফেললাম। ইচ্ছাকৃত কিছুটা যে নয়, তাও বলা যায় না। জেনেশুনেই এই অন্যায়টা সেদিন সবাই করেছিলাম। সে হলো, ঈদের আগের দিন আশরাফ আলী চৌধুরী, এমএনএ এলেন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে এবং ‘কী খাবেন’ ঈদের দিনে জিজ্ঞেস করলেন। আশরাফ ভাই ঢাকা থেকে নির্বাচিত সর্বোচ্চ ভোটের অধিকারী প্রচণ্ড রুচিশীল মানুষ। শুরুরবাড়ি তার কলকাতায়। আমরা সবাই মিলেই বললাম খিচুড়ি-গরুর গোশত। তখন মাথায় ঢোকেনি, কোথায় কী বললাম। একটি জিপ ডেকচিভর্তি খিচুড়ি এবং গোশত এলো। পরম পরিতোষে খেলাম সবাই। তারপর মাথায় এলো খালাবাসন তো ওদের ধুতে দেয়া যাবে না। বুঝে ফেলবে। সুতরাং ঠিক হলো, ওগুলো আমরাই ধুয়ে ফেলব। ফেললামও। তৃপ্তিতে টেকুর তুলছিলাম। কিন্তু সব আশই মাটি হয়ে গেল, যখন দেখলাম, ওরা বুঝতে পেরেছে, আমরা গরুর মাংস খেয়েছি বলে খালাবাসনগুলো নিজেরাই ধুয়ে ফেলেছি। তখন তো ওরা প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ। কিছুতেই থাকবে না আমাদের এখানে। বিছানা পেটরা গুটিয়ে ফেলেছে। ওরা চলে যাবে। উপরওয়ালার নির্দেশের অপেক্ষায় রয়েছে। প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত। যে প্রহরীরা ছিল বন্ধুর মতোন তারা একেবারে বিগড়ে গেছে। ওদের আমরা কিছুতেই ‘পোষ’ মানাতে পারছি না, আমাদের কোনো কথাই ওরা শুনতে রাজি নয়। আমরা ভুল স্বীকার করলাম, ক্ষমা পর্যন্ত চাইলাম তবু ওরা যেভাবে চটেছে, তা থামানো যাচ্ছে না। নেহায়েত ফৌজের লোক, তাই উপরওয়ালার অর্ডার না পেলে নড়তে পারছে না।

অগত্যা আমরা মি. দাসকে বললাম একটু আসতে। আমাদের কারণ জিজ্ঞেস করলেন। কিন্তু সে কথা ফোনে বলতে পারছিলাম না। মি. দাস এলেন। ভদ্রলোক আমাদের প্রতি সহানুভূতিশীল প্রচণ্ড। তাই আশ্রয় করলেন, চিন্তা করো না। সব ঠিক হয়ে যাবে। তবে তোমরা কিছু ভুল করেছ। আমরা মেনে নিলাম, অপরাধ হয়েছে। এটা তো ধর্মীয় আচারের রীতি পদ্ধতি। এসব তারা মানবে কেন? মি. দাস তাদের সঙ্গে কথা বললেন এবং তারপর তিনি বিষয়টি মীমাংসা করে তবেই ছাড়লেন। তিনি ভারত সরকারের পক্ষ থেকে আমাদের দেখাশোনা, চাহিদা-প্রয়োজন দেখা, নিরাপত্তা-সুরক্ষার ব্যবস্থা করা এসব দায়িত্ব ছিল তার ওপর। তিনি যা বলতেন, তাই আমাদের শুনতে হতো। আবার প্রহরীদের তার কথায় উঠবোস করতে হতো। কিন্তু আমরা যে ঘটনাটা ঘটিয়েছিলাম, তা ছিল নিতান্তই ছেলেমানুষী। সেটা বোঝাতেই পেরেছিলাম বলে মি. দাস একটা বিপর্যয় থেকে আমাদের বাঁচিয়ে দিলেন। বিষয়টা তার পর্যায়েই রেখেছিলেন। এর বাইরে গেলে সম্পর্কটাকে কালিমা লেপন হতে পারত। সাম্প্রদায়িক মনোভাবটা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী কারো মানসিকতার ছিল না। প্রকাশ্যে ছিল না এ কথা হলফ করে বলতে পারি কিন্তু কেউ কেউ যে ধর্মীয় গোঁড়ামিতে ভুগতেন সেটা হয়তো ছিল কিন্তু অন্তরে অন্তরে, বাইরে তার কোনো প্রকাশ ছিল না। একইভাবে ভারত সরকার এবং জনগণ আমাদের গ্রহণ করেছিলেন মুক্তিযুদ্ধে শত্রুর আক্রমণে বিপন্ন মানুষ হিসেবে। তাই তাদের আচরণে

সাম্প্রদায়িকতার লেশমাত্র ছিল না। সেখানে আমরা অধিকাংশই মুসলিম জেনেও আমাদের কার্যক্রম করতে কোনো আপত্তি করেনি কেউই। তাই বলে আমরা ভুল করে যে অপরাধটি করে ফেললাম তাকে ‘ইচ্ছাকৃত’ যদি ভেবে থাকে ওই গুরখা প্রহরীরা, তাহলে তাদের দোষ দিই কী করে? নয় মাসে মুক্তিযুদ্ধকালে ওদের প্রশ্নাতীত সহযোগিতাই তো প্রমাণ করে, ওরা আমাদের কতটা বন্ধু! দু-একটি অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ছাড়া তেমন কোনো বিভ্রমনার কাহিনী তো শুনিনি। আজো মনে পড়লে কষ্ট পাই। কী দরকার ছিল ওই অযাচিত ঘটনার সুযোগ দেয়ার। যেখানে ঈদে আমাদের আগুত করতে পারছে না, সেখানে আমরা একি করলাম! অন্য ধর্মের মানুষকে কেন কষ্ট দিলাম? মনে পড়লে আজ পীড়িত হয় মনটা। ধর্মনিরপেক্ষতা আমাদের স্লোগান ছিল এবং অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ ছিল আমাদের স্বপ্ন। তাহলে আমরা কেন এই অসাবধানী কাজটা করেছিলাম। আজো ভাবী বার বার। ওই ভারতীয় জোয়ানদের যুদ্ধক্ষেত্র ছাড়াও এমনি অবদান তো আমাদের কাজ করতে সে সুযোগ করে দিয়েছিল, তাতেই আমরা সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য এবং প্রয়োজনীয় শক্তি পেয়েছিলাম। যাতে জয় ত্বরান্বিত হয়েছিল।

১৯৭১ সালের ২৬ নভেম্বর যে ঈদুল ফিতর এসেছিল তা এমনিভাবেই পালন করেছিলাম আমরা।





প্রবন্ধ

বাংলাদেশের সমাজ জীবনে লেখক, সাহিত্যিক, শিল্পী বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা

বদরুদ্দীন উমর

যে কোনো দেশের প্রগতিশীল, গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে লেখক, সাহিত্যিক, শিল্পীসহ সব ধরনের বুদ্ধিজীবীর একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। আমাদের দেশে ব্রিটিশ এমনকি পাকিস্তান আমলেও, তাদের এ ভূমিকা থেকেই কিছু বাংলাদেশে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর প্রগতিশীল আন্দোলনে তাদের এ ভূমিকা আর দেখা যায় না। এটা আমার দৃষ্টিতে এক বিস্ময়কর ব্যাপার। কারণ স্বাধীন বাংলাদেশে

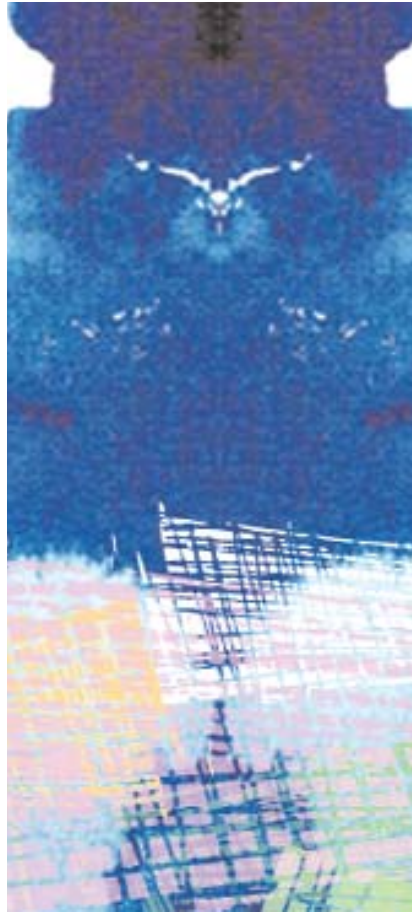
তাদের এ ভূমিকা আরো ব্যাপক ও শক্তিশালীভাবে থাকারই কথা ছিল। কিন্তু তা না হয়ে এখানে তার উল্টোটাটি হয়েছে। স্বাধীন বাংলাদেশে নব্য বাঙালিদের যে শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সে শাসনব্যবস্থার সামাজিক খুঁটি (ংড়পরিধ্ব চুড়ুচুড়) হিসেবেই তারা রাষ্ট্রযন্ত্রের খেদমতগার হিসেবেই নিজেদের নিয়োজিত রেখেছেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর এখানে নব্য বাঙালি শাসক শ্রেণির রাজত্বে সাধারণভাবে বাঙালিদের

জন্য যে সুযোগ-সুবিধা সর্বক্ষেত্রে সৃষ্টি হয়েছে তাতে ভাগ বসানোর তাগিদ থেকেই এ ধরনের বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা প্রগতিশীলতার জন্য না থেকে প্রতিক্রিয়ার শক্তিকেই সুসংহত করার ‘পবিত্র’ কাজে নিয়োজিত হয়েছে। কাজেই তাদের ভূমিকা ও কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জনগণের কোনো সম্পর্ক নেই। তারা অনেক ধরনের নেসলেট করেন, অনেক কথাবার্তা বলেন, সভা-সমিতির মঞ্চ আলোকিত করেন; কিন্তু এভাবে তারা যেসব বক্তব্য প্রদান ও প্রচার করেন তাতে গরিব, কৃষক, শ্রমিক, নিপীড়িত সংখ্যালঘু জাতিসমূহের সমস্যা বিষয়ে কিছুই থাকে না। তার অর্থ এই নয় যে, সাহিত্য, নাটক, সঙ্গীত, কাব্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে তাদের কোনো অবদান নেই। সেটা আছে। এসব ক্ষেত্রে বাংলাদেশে কিছু উন্নতি ও উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে। কিন্তু তা হলেও জনগণের সমস্যা কদাচিৎ তাদের কাজকর্মের মধ্যে স্থান পায়। এভাবে ক্ষেত্রবিশেষে জনগণের কথা তাদের কারো কারো কর্ম ও রচনায় উঁকিঝুঁকি মারলেও তার বেশি কিছুই দেখা যায় না। এটা স্বাধীন বাংলাদেশের জনগণের জীবনের এক মস্ত ট্রাজেডি ছাড়া আর কী?

সবার ক্ষেত্রে এ কথা প্রযোজ্য না হলেও সাধারণভাবে এটা বলা যায় যে, বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী (লেখক, সাহিত্যিক, শিল্পী, সাংবাদিক) হিসেবে যারা সুপরিচিত এবং যাদের কর্মকাণ্ডের প্রচার মুদ্রিত ও বৈদ্যুতিক প্রচারমাধ্যমে বড় অক্ষরে দেখা যায় তাদের মধ্যে আত্মসম্মানবোধ, লজ্জা বা জনগণের প্রতি দায়িত্ববোধের অভাব বেশ প্রকটভাবেই দেখা যায়। ঠিক এ কারণে বাংলাদেশে অনেক কৃতী ব্যক্তি থাকা সত্ত্বেও এখানে বিধ্বংসমাজ বলে কোনো কিছুর উপস্থিতি নেই। ছড়িয়ে ছিটিয়ে দু-চার জন ব্যতিক্রমী ব্যক্তি থাকলেও সাধারণভাবে এটাই হলো এ দেশের বুদ্ধিজীবীদের অবস্থা। এর ফলে নানা গুণে গুণান্বিত সাহিত্যিক, শিল্পী, নানাভাবে সংস্কৃতি চর্চাকারী ব্যক্তির অভাব না থাকলেও তাদের মধ্যে সততা ও সং চরিত্রের অভাব নিদারুণভাবে প্রকট। এমনকি বলা যেতে পারে যে, বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক যুগে শিল্প-সাহিত্য ক্ষেত্রে যাদের কিছুটা প্রগতিশীল ভূমিকা ছিল তারাও পরবর্তীকালে পরিবর্তিত হয়ে সুবিধাবাদের গডলিকা প্রভাবে গা ভাসিয়েছেন। বাংলাদেশের নাট্য আন্দোলনের মধ্যে প্রগতিশীলতার যে চর্চা প্রথম দিকে ছিল তার বর্তমান পরিণতির দিকে তাকালে এই অবস্থার একটা পরিচয় পাওয়া যায়। এমন নাট্য প্রদর্শনার জোট সরকার অনেক সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করেছে। মহিলা সমিতি নাট্যমঞ্চ থেকে শিল্পকলা একাডেমির মঞ্চ ব্যবস্থাসহ নানা সুবিধার দিকে তাকালে এ পরিবর্তন সহজেই চোখে পড়ে। যারা আগে জনগণের কিছু সমস্যা বা আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্কিতভাবে নাট্যচর্চা করতেন তারা আজ শাসক শ্রেণি ও তাদের সরকারের খেদমতগার। এভাবে তারা জীবনকে অনেক মসৃণ করেছেন। দুই হাতে সুযোগ-সুবিধা পকেটস্থ করেছেন, কিন্তু জনগণের সঙ্গে তাদের আর কোনো সম্পর্ক নেই। তারা এখন পুরোপুরিভাবেই শাসক শ্রেণির অংশে পরিণত হয়ে তাদের ফ্যাসিস্ট শাসনকেই শক্তিশালী করেছেন। সত্যিকার অর্থে তারা কাজ করছেন শাসক শ্রেণির সামাজিক ঘুঁটি হিসেবে।

কাব্যসাহিত্য ক্ষেত্রে অবস্থা আরো শোচনীয়। যারা কিছু ভালো গল্প লেখেন, উপন্যাস লেখেন, সঙ্গীতচর্চা করেন, অন্য নানাভাবে সংস্কৃতচর্চায় নিয়োজিত তাদের মধ্যে অনেকেরই আত্মসম্মানবোধের অভাব যে মাত্রায় দেখা যায় তা এ দেশের শিল্প সংস্কৃতির, এমনকি জাতীয় জীবনে এক বড় সংকট। এর দৃষ্টান্তের অভাব নেই। তবে এখানে একটি উদাহরণ দিলেই এ বিষয়ে ধারণা অনেকখানি পরিষ্কার হবে। এটা উল্লেখ করা প্রয়োজন কারো বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত কোনো বিরূপতার কারণে নয়, এটা প্রয়োজন এজন্য যে, এটা কোনো উপেক্ষার বিষয় নয়। এর মধ্যে স্বাধীন বুদ্ধিজীবী পরিব্রের একটা বিশস্ত প্রতিফলনই দেখা যায়।

দৈনিক সমকালে ১০ জুন, ২০১৬ তারিখের শূক্রবারের সাময়িকীতে কবি নির্মলেন্দু গুণের একটি বক্তৃতা ছাপা হয়েছে। এই বক্তৃতা তিনি দিয়েছেন ব্র্যাক-সমকাল সাহিত্য পুরস্কার প্রদান উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু সম্মেলন কেন্দ্রে আয়োজিত অনুষ্ঠানে। বক্তৃতার শিরোনাম ‘আমি সম্মানিত বোধ করছি’। এই বক্তৃতা থেকে স্পষ্ট বোঝা যাবে যে, এই ধরনের লেখক, কবি, সাহিত্যিকদের সম্মানবোধের সঙ্গে তাদের ‘লজ্জাবোধের’ কোনো সম্পর্ক নেই। তিনি এতে প্রথমেই বলেছেন, ‘মাত্র কিছুদিন আগে আমি স্বাধীনতা পুরস্কার পেয়েছিলাম। অবশ্য এ ক্ষেত্রে চেয়েছিলাম শপট ও ব্যবহার করা যায়। যা হোক শেষ পর্যন্ত আমি পুরস্কারটি পেয়েছিলাম।



মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ তিনি আমার ফেসবুক স্ট্যাটাসটির পরিপ্রেক্ষিতে আমাকে পুরস্কৃত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে আমাকে সম্মানিত করেছেন।’ এ ক্ষেত্রে ব্যাপার হলো এই যে, স্বাধীনতা পুরস্কারের জন্য নির্ধারিতসংখ্যক ১০ জনের নাম ঘোষণার পর নির্মলেন্দু গুণ তাকে স্বাধীনতা পুরস্কার না দেয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করে ফেসবুকে লেখেন। আওয়ামী ঘরানার একজন প্রথম সারির কবির এই ক্ষোভ প্রধানমন্ত্রী উপেক্ষা করতে না পেরে নিয়ম ভঙ্গ করে তাকে ১১তম পুরস্কার প্রদানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। এভাবে পুরস্কার পাওয়ার মধ্যে সম্মানজনক কিছু না থাকলেও নির্মলেন্দু গুণ পুরস্কার লাভ করে নিজেকে ‘সম্মানিত’ বোধ করেছেন।

কিন্তু তার বক্তৃতার উদ্ধৃত অংশের মধ্যে এর থেকে আরো ভয়াবহভাবে তিনি নিজের এ দিকটির যে পরিচয় তার বক্তৃতা-পরবর্তী অংশে রেখেছেন তা এখানে উদ্ধৃত করা দরকার। তাকে এ বছর ব্র্যাক-সমকাল সাহিত্য পুরস্কার দেয়ার পর তার জন্য এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সেই সংবর্ধনা সভায় মঞ্চে আরোহণ করে তিনি বলেন, ‘মাঝখানে অনেক দিন কোনো পুরস্কার পাচ্ছিলাম না— সেজন্য আমার ভেতরে ভেতরে ক্ষোভও ছিল। এক পুরস্কার অনুষ্ঠানে আমি বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলাম। সেদিন বলেছিলাম, আমি শুধু পুরস্কারের দর্শক, অন্যরা পাবে আমি কেবল বসে বসে দেখব— এটা হয় না। ঠিক পরদিনই জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ঘোষিত হয়েছিল। সেখানে আমার কবিতা অবলম্বনে মাসুদ পথিক যে চলচ্চিত্রটি তৈরি করেছিল সেটি শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র হিসেবে পুরস্কৃত হয়েছে। ওই ছবির কাহিনী আমার, ছবিতে আমি অভিনয়ও করেছি ও একটি গানও রচনা করেছি। তার পরও আমার ভাগ্যে কোনো পুরস্কার জোটেনি। এ নিয়েও আমার ক্ষোভ ছিল। এই বঙ্গবন্ধু সম্মেলন কেন্দ্রে থেকেই সেদিন অনুষ্ঠান শেষে চলে গেছি। আজকে আমি পুরস্কার পেয়েছি। আপনারা আমার পুরস্কার গ্রহণের দৃশ্য দেখছেন। যেটি আমার জন্য আনন্দ ও গর্বের বিষয়। সেই সঙ্গে লজ্জারও বোধ হয়। কারণ আমি মঞ্চে উঠে পুরস্কার গ্রহণের পর কিছুটা স্তম্ভিত বোধ করছি। তার আগ পর্যন্ত সময়টা আমি খুব অস্বস্তির মধ্যে ছিলাম যে, সময়টা আমি কীভাবে পার করব।’ উল্লেখ্য যে, পুরস্কার সম্পর্কে সন্দেহান থাকার পর পুরস্কার পাওয়ার পর এ ধরনের বক্তব্য পুরস্কৃত ব্যক্তিদের পক্ষ থেকে দেয়া হলেও উপস্থিত সুধীবৃন্দের মধ্যে কেউই তাকে তিরস্কার করেননি। পরেও কিছু বলেননি। তার পরও তার গুণকীর্তনই করেছেন। কারণ তারা এ ব্যাপারে প্রায় সবাই একই পালকের পক্ষী।

এই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় আমি বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের সম্পর্কে যা বলেছি তার যথার্থতা প্রমাণের জন্যই আমি নির্মলেন্দু গুণের বক্তৃতার অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত করলাম। এ দেশে অনেক ধরনের গুণী ব্যক্তি আছেন— সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতি ইত্যাদি রচনার ক্ষেত্রে। কিন্তু গুণ থাকলেও তাদের মধ্যে যে জিনিসটির অভাব খুব প্রকট তা হলো আত্মসম্মানবোধ ও সং চরিত্রের। এটা এ দেশের বুদ্ধিজীবীদের বিরুদ্ধে কোনো নিদাবাদ নয়। আসলে এটা হলো, এ দেশের জনগণ ও দেশের জন্য এক মস্ত ট্রাজেডি।



প্রবন্ধ

বাঙালি সংস্কৃতিতে নারী

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

এই লেখার নাম ‘প্রফুল্ল কেন বাসন মাজে’ দিলেও অন্যায় হতো না। বাঙালির সংস্কৃতিতে প্রফুল্লরা দীর্ঘকাল ধরে বাসন মাজছে— কেউ স্বেচ্ছায়, কেউবা বাধ্য হয়ে। স্বেচ্ছায় যে করে তার কাজটা আরও মর্যাদাপূর্ণ। কেননা সে জানে না সে কি করেছে, মনে করেছে মহৎ কাজে নিয়োজিত আছে, জীবন চরিতার্থ হচ্ছে। আসলে যা ঘটছে সে তো দাসত্ব, তাও আবার মজুরিবিহীন। এই সমস্তটাই অবশ্য সম্ভব হচ্ছে একটা আদর্শবাদের অনুশাসনে। প্রফুল্লের ক্ষেত্রে এটাই ঘটেছে।

প্রফুল্ল বঙ্কিমচন্দ্রের নায়িকা, ‘দেবী চৌধুরাণী’ উপন্যাসে। বঙ্কিমচন্দ্র অসাধারণ শিল্পী, বাঙলা সাহিত্যে তিনিই প্রথম যথার্থ উপন্যাস রচয়িতা, তার উপন্যাসে মেয়েরা অসামান্য। নানাবিধ অনুশীলনের

মধ্য দিয়ে যোগ্যতা অর্জন করে প্রফুল্ল সব নায়িকাদের ছাড়িয়ে যায়। দশ বছরের সাধনায় প্রফুল্ল দেবী চৌধুরাণী হয়েছে ভবানী পাঠকের নির্গিমেষ তত্ত্বাবধানে। সে ব্যাকরণ, কাব্য, দর্শন, গীতা সব পড়েছে, মল্লযুদ্ধও শিখেছে। বাঙলার রবিনহুড যেন, দুষ্টির দমন ও শিষ্টের পালন করে সে অরণ্যের অভ্যন্তরে।

কিন্তু পরিণতিটা কি? দেখা গেল অপদার্থ যে স্বামী প্রফুল্লের পা টিপবারও উপযুক্ত নয়, শেষ পর্যন্ত তারই ঘরে বধূবেশে ফেরত যাচ্ছে। তিন পত্নীর এক পত্নী হয়ে। রান্নাবান্না, ঘরসংসার সব তো করছেই, পুরুষঘাটে বসে বাসনও মাজছে ওই প্রফুল্ল, অতন্ত প্রফুল্লচিত্তে। বোঝা যায় বঙ্কিম নিজের সৃষ্টিকে নিয়ে বড়ই বিপদে পড়েছিলেন। কি করেন, কোথায় নিয়ে

যান। দেবী চৌধুরাণী যখন লিখছেন তখন তিনি রক্ষণশীল হয়ে উঠেছেন, ঝুঁকে পড়েছেন ধর্মের দিকে। বিদ্রোহীরা নিয়ে অস্বস্তি অবশ্য আগেও ছিল। নইলে বিশ্বব্লেদে কুন্দনন্দিনীকে আত্মহত্যা উদ্বুদ্ধ করবেন কেন? কুন্দনন্দিনীর বিদ্রোহটা ছিল শান্ত, সে আত্মহত্যা সম্মত হয়েছে। ‘কৃষ্ণকান্তের উইল’ের রোহিণী উগ্র, সে অত সহজে বিদায় নেয়নি, তার জন্য গোবিন্দলালের হাতে পিস্তল তুলে দিতে হয়েছে, যাতে সে গুলি করে রোহিণীকে হত্যা করতে পারে।

প্রফুল্লকে নিয়ে সমস্যাটা এই যে, সে বিষ খাবে এমন পাত্রী নয়, তাকে গুলি করে মারবে এমন পাত্রও কোথাও নেই, কোম্পানির সাহেবদের মধ্যেও নেই। প্রফুল্লকে তাই ফেরত আনতে হলো ব্রজেশ্বরের গৃহে, সেখান থেকে পুকুরঘাট আর কতদূর। বলা অসঙ্গত নয় যে, এটাও এক ধরনের হত্যাকাণ্ডই। গুলি করে নয় বটে, তবে বিষ খাইয়ে ঠিকই। প্রফুল্ল জানে না যে সে বিষ খেয়েছে। আদর্শবাদের বিষ। সংসারে নারীর ভূমিকা সম্পর্কে এই আদর্শবাদ বলে যে, নারীজন্মের চরম চরিতার্থতা রয়েছে সন্তান উৎপাদনে, পুরুষের লালসা চরিতার্থকরণে এবং ঘরসংসারের নিত্যকার কর্তব্য সম্পাদনে। প্রফুল্ল সংসারী হয়েও সন্ন্যাসিনী। ঔপন্যাসিক বলেছেন এ কথা, তার ক্ষেত্রে তাই ঘরকন্নার কাজটিই সবচেয়ে জরুরি। বাসন তো মাজতেই হবে। প্রফুল্ল সন্ন্যাসিনী না হলে তার ওপর আরও একটি দায়িত্ব বর্তাত, সেটি হচ্ছে সন্তান উৎপাদন এবং ওইখানে বার্থ হলে যতই সে দেবী হোক কিংবা রানী, বক্তা বলে অসম্মানিত হতো, অনুর্বর শস্যক্ষেতের মতো।

২.

নারীর পরাজয় অবশ্য বিশ্বে ঐতিহাসিকভাবেই ঘটেছে। এটা সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তে ঘটেছে যখন নারী আপন সন্তানকে মাতার পরিচয়ে পরিচিত করার অধিকার হারাল। ব্যাপারটাকে এস্লেস খুব পরিষ্কারভাবে তুলে ধরেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে সন্তানের পরিচয় মাতার নামে নয়— পিতার নামে হবে, এই ব্যবস্থা প্রবর্তনের সময় থেকেই পুরুষ গৃহের লাগাম পেয়ে গেল তার হাতে, আর নারী অবনমিত, সম্মোহিত হলো, পরিণত হলো পুরুষের লালসা মোটানোর ও সন্তান প্রজননের যন্ত্রে।^১ এর সঙ্গে নারী-পুরুষের প্রাকৃতিক বিভাজনও জড়িত। সন্তান প্রজননের ব্যাপারে পুরুষ ও নারীর কাজের যে পার্থক্য, সেটাই হচ্ছে আদি শ্রম-বিভাজন। আর এক পত্নী-এক স্বামী বিবাহব্যবস্থায় পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে দ্বন্দ্ব, সেইখান থেকেই শ্রেণিদ্বন্দের শুরু।^২

বিভাজন বৈষম্য সৃষ্টি করেছে এবং বৈষম্যমূলক ব্যবস্থায় নিয়ম এটাই যে, একপক্ষ যদি এগোয় তবে অন্যপক্ষ পিছাবে। যে জন্য পুরুষ এগিয়েছে, নারী গেছে পিছিয়ে।

শ্রেণি অবশ্যই সত্য। ধনী নারী গরিব পুরুষের তুলনায় যে অধিক ক্ষমতাবান তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু একই শ্রেণির ভেতর অবস্থানকারী একটি মেয়ে পুরুষের তুলনায় নানা কারণে পিছিয়ে পড়ে; একটি বিশেষ কারণ হচ্ছে প্রফুল্ল যার শিকার হয়েছে, সেই আদর্শবাদ। তাছাড়া এটাও তো সত্য যে, ব্যক্তির শ্রেণি ও বর্ণ পরিচয় তবু মিটিয়ে ফেলা যায়, কিন্তু নারী-পুরুষের জৈবিক ব্যবধানটা থেকেই যায়, যে-

বিভাজনের সুযোগ নিয়ে বৈষম্য আরও বাড়ে। পুরুষ অধিপতি, নারী তাই নির্যাতিত। যখন আদর পায় তখনও অধীনেই থাকে এবং অর্জনের মাপকাঠি পুরুষই ঠিক করে দেয়। নারীর বিশ্ব-ঐতিহাসিক পরাজয়ের পর তার পক্ষে এগিয়ে যাওয়া কঠিন হয়েছে; সভ্যতা অগ্রসর হয়েছে কিন্তু নারী-পুরুষের বৈষম্য ঘোচেনি, অনেক সমাজে বৃদ্ধি পেয়েছে। অগ্রসর ইউরোপে ফরাসি বিপ্লব মানবমুক্তির ইতিহাসে এক মাইলফলক, কিন্তু বিপ্লবের পরে ১৭৯৩তে যে শাসনতান্ত্রিক সম্মেলনে মানুষের সর্বজনীন অধিকার স্বীকৃতি পেল তাতে মেয়েদের ব্যাপারে কিছুই বলা হলো না। ১৮৬৭তে ইউরোপের কোথাও কোথাও (এবং আমেরিকায়) সর্বজনীন ভোটাধিকারের ব্যবস্থা করা হয়, কিন্তু সেটা শুধু পুরুষদের জন্যই, মেয়েরা তখনও ওই অধিকার পায়নি। ১৮৭১-এর প্যারিস কমিউনেই প্রথম দেখি নারী ও পুরুষ সমান গুরুত্ব পাচ্ছে। ইংল্যান্ডে মেয়েরা ভোটাধিকার পায় ১৯১৮তে, তাও সীমিত সংখ্যায়। ১৯২৮ সালে পোঁছে তবেই সেখানে ২১ বছর ও তার ওপরের মেয়েরা ভোটাধিকার পেল। ভারতে এই অধিকার মেয়েরা পেয়েছে ১৯৫০-এ, বাংলাদেশে আরও বিশ বছর পরে, ১৯৭০-এ।

প্রাচীনকালে বাংলাদেশের সুনাম ছিল, প্রাচুর্যের দেশ বলে অতিসুখাত মিসরের তুলনাতোও উর্বর ছিল এর ভূমি— এমন মন্তব্য শোনা গেছে। কিন্তু দেশের অধিকাংশ মানুষই ছিল দরিদ্র এবং ওই দরিদ্রদের মধ্যে মেয়েরা ছিল দরিদ্রতর। উল্লেখ আছে যে, ভারতবর্ষে খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে যেসব পিতামাতা দারিদ্র্যের দরুন যোগ্য বর খুঁজে পেত না কন্যাসন্তানদের তারা বাজারে এনে বিক্রি করে দিত, নিষ্কৃতির আশায়। ভারত সম্পর্কে যা সত্য বাঙলা সম্পর্কে তা মিথ্যা হওয়ার কথা নয়। দশম শতাব্দীতে রচিত আদি বাঙলা কাব্য ‘চর্যাপদে’ মেয়েদের দেখি নানা রকমের কাজ করছে। তারা নৌকা বায়, মদ চোলানোতে হাত লাগায়, হাতি পোষে, শিকারও করে; ডোম ও চণ্ডালের কাজ তো রয়েছেই। তারা আক্ষেপ করে যে হাড়িতে ভাত নেই। কিন্তু এই মেয়েরা নিরাপত্তা পায় না। ব্রাহ্মণ তার শত্রু, চণ্ডালও তাই। ভুসুকু বলছে সে বাঙালি হয়েছে, অর্থাৎ তার অধঃপতন ঘটেছে, কেননা তার ‘ঘরিণী’কে চণ্ডালে নিয়ে গেছে। এটা দেখা যাচ্ছে যে, বাঙালি হওয়া আর মানুষ হওয়া যে এক নয় এ বক্তব্য বাঙালি আদি কবিরাও রেখে গেছেন। সংস্কৃত কাব্যশ্রোকের সঙ্কলন গ্রন্থ ‘সদুক্তিকর্ণামৃত’ে সেন আমলের সমাজচিত্র পাওয়া যাবে। পুরুষ আক্ষেপ করছে, বলছে শিশুরা ক্ষুধায় কাতর, তাদের দেহ শবের মতো শীর্ণ, প্রীতি নেই, বান্ধব নেই, জলপাত্রে জল নেই। এসব তবু সহ্য হয়, কিন্তু সেই কষ্টের কোনো তুলনা নেই যখন দেখি গৃহিণী তার ছেড়া কাপড় সেলাই করার জন্য করুণ হাসি হেসে কুপিত প্রতিবেশীর কাছে যায় সুঁই ধার করতে। এ হচ্ছে পুরুষের অক্ষমতা, কিন্তু নারীর দুর্দশাটা কেমন ছিল সেটা ভাববার বিষয়, যদি ভাবতে চান। চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগে বাঙলায় এসেছিলেন পর্যটক ইবনে বতুতা, এসে প্রাচুর্য দেখেছেন। কিন্তু দাস-ব্যবসা না দেখে পারেননি। দেখলেন খুব সস্তায়, মাত্র ১ দিনারে, মেয়েরা বিক্রি হচ্ছে। অনিন্দ্যসুন্দর একটি মেয়েকে তিনি কিনে নিয়েছিলেন, ওই দামে। তিনি পর্যটক তাই কিনলেন,

হানাদার কিংবা ব্যবসায়ী হলে ছিনতাই করতেন। পর্তুগীজ হার্মাদ বর্মি মগ, মহারাষ্ট্রীয় বর্গিরা যে হানা দিত সে তো ঐতিহাসিক সত্য এবং তাদের লোলুপতার প্রথম শিকার হতো মেয়েরাই। যেমন হয়েছে তারা একান্তরে। বাঙলায় বারবার দুর্ভিক্ষ হয়েছে, এর প্রতিটি দুর্ভিক্ষই সবচেয়ে কঠিন দুর্ভোগ মেয়েদেরকেই পোহাতে হয়েছে। ছিয়াত্তরের মন্ত্রস্তরের বর্ণনা দিতে গিয়ে ‘আনন্দমঠে’ বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন— ‘লোকে গরু বেচিল, লাঙল জোয়াল বেচিল, বাজধান খাইয়া ফেলিল, ঘরবাড়ি বেচিল। জোতজমা বেচিল। তারপর মেয়ে বেচিতে আরম্ভ করিল। তারপর ছেলে বেচিতে আরম্ভ করিল। তারপর স্ত্রী বেচিতে আরম্ভ করিল। ১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষও মেয়ে বিক্রি হয়েছে এবং বহুক্ষেত্রে স্বামী পালিয়ে গেছে স্ত্রীকে ফেলে রেখে। ১৯৭৪-এর দুর্ভিক্ষও ওই রকম ঘটনার খবর পাওয়া গেছে। স্ত্রীকে বিক্রি করে দেয়ার ইতিহাস অবশ্য অতিপুরাতন। ‘মহাভারত’ের যুধিষ্ঠিরও তো ওই কাজই করেছিলেন, পাশা খেলায় বাজি রেখেছিলেন দ্রৌপদীকে, যে-দ্রৌপদী তার একার নন, অন্য চার ভাইয়েরও স্ত্রী বটে। কোম্পানি আমলে উইলিয়াম জোনস কলকাতায় এসেছিলেন সুপ্রিমাকোর্টের বিচারপতি হিসেবে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষপর্বের ঘটনা। তার আদালতে বিচারের জন্য একটি হত্যা মামলা এসেছিল, যাতে অভিযোগ এই যে, একজন ইউরোপীয় তার এক দাসীকে পিটিয়ে মেরে ফেলেছে। ওই মামলার রায় দেবার সময় জোনস দাসব্যবস্থার বিস্তার নিন্দা করেছিলেন। সেই সময়ের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ব্যবস্থার অধীনে মেয়েদের অবস্থাটা কেমন তা ধারণা করা যায় আরেকটি দৃষ্টান্ত থেকে। উদারপন্থী আরেক ইংরেজ এই ঘটনাটির উল্লেখ করেছেন। এক ইংরেজ অফিসার একটি হিন্দু মেয়ের ওপর অত্যাচার করেছিল; জানতে পেরে মেয়েটির স্বামীর দিককার লোকজন ভেবেছে এই মেয়েকে দিয়ে আর কি হবে, একে হত্যা করাই মঙ্গল। তারা সে-কাজই করেছে। হত্যা করে তাকে ফেলে রেখে এসেছে সাহেবের তাঁবুর দরজায়। ব্যাপারটা আদালতে উঠেছিল। ঘটনা যে সত্য তা সবাই জানত। আদালতে বিচার করে শাস্তিও দিয়েছে। শাস্তি পেয়েছে তারাই যারা মামলা দায়ের করেছিল; ষড়যন্ত্রমূলকভাবে তারা যে সাহেবকে অপদস্থ করবার জন্য নিতান্ত বিদ্রোহপ্রসূত হয়েই এই মামলা নিয়ে আদালতে এসে হাজির হয়েছে— এ ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে আদালত প্রত্যেককে এক হাজার টাকা জরিমানা ও সেই সঙ্গে তিন মাসের জেলের শাস্তি দিয়েছে। শোনা যায়, কোম্পানি আমলে চার সদস্যের কোনো কোনো পরিবারে দাসদাসীর সংখ্যা ছিল ১১০ জন। আজকের বাংলাদেশে অবশ্য ওই অবস্থা নেই, উন্নতি হয়েছে; কিন্তু সম্পন্ন গৃহে ভিন্ন নামে দাসী নেই— এটা সত্য নয় এবং তাদের ওপর দৈহিক নিপীড়ন যে ঘটে না এটাও বলা যাবে না। ফরাসি দেশের মানুষ ফ্রান্সোয়া বার্নিয়ারের ভারত ভ্রমণে ১৮৫৬ থেকে ১৮৬৮ এই বারো বছর কাটিয়েছেন, বাঙলাতেও এসেছিলেন। অনেক কথা বলার সঙ্গে এ কথাও বলেছেন বার্নিয়ারের যে, বাঙলায় তখন পর্তুগীজ ও ডাচ বণিকেরা ছিল, তারা বলত যে বাঙলায় ঢুকবার পথ রয়েছে একশটা। কিন্তু বেরবার পথ নেই একটিও। এর

কারণ হলো প্রকৃতিতে প্রাচুর্য এবং মেয়েদের সৌন্দর্য ও উদারতা। মেয়েরা নিশ্চয়ই ইচ্ছা করে উদার হয়নি, তাদেরকে উদার হতে বাধ্য করা হয়েছে। তাদের প্রতি আচরণে দস্যুতে ও বণিকে তফাৎ ছিল না।

বাঙালির আদি ইতিহাস অনুসন্ধান করতে গিয়ে নীহার রঞ্জন রায় লক্ষ্য করেছেন, পাল ও সেন আমলের লিপিপুণ্ডা এই রকমের ধারণা দেয় যে, ‘লক্ষ্মীর মতো কল্যাণী, বসুধারার মতো সর্বসংসহা, স্বামী ব্রতনিয়তা নারীই ছিল নারীর চিত্তাদর্শ।’ কিন্তু কেন এই চিত্তাদর্শ? তার ব্যাখ্যা ওই বর্ণনাত্রেই রয়েছে, ‘স্বামীর ইচ্ছারপিলী হওয়াই তাহাদের বাসনা ছিল।’ অনুমান করা খুবই সম্ভব যে, স্বামীর ইচ্ছার এই প্রবল চাপ, কেবল ব্যক্তি স্বামীর একার যে তা নয়, এ ছিল গোটা ব্যবস্থার। রূপেগুণে লক্ষ্মী হতে হবে— এই আদর্শবাদের শক্ত অনুশাসন তারপরেও যুগ যুগ ধরে কার্যকর ছিল, এখনও আছে। প্রফুল্লর সাধ্য কি পালিয়ে বাঁচে; পরিবার ও সমাজ থেকে সরে যেতে পারে, প্রফুল্ল গিয়েছিল বটে, কিন্তু আদর্শবাদ থেকে পালাবে কি করে, সে তো রয়ে গেছে সমগ্র চিন্তা ও চেতনাজুড়ে, শাসন করেছে তাকে ফ্যাসিবাদী কায়দায়।

নৃতাত্ত্বিকভাবে বাঙালি মিশ্র নরগোষ্ঠী। স্থানীয় আদিবাসীরা আগেই ছিল; অন্যরা বাইরে থেকে এসেছে। প্রথম গুরুত্বপূর্ণ আগন্তুক হচ্ছে আর্যরা। তাদের ধর্মমতের প্রধান দুটি বৈশিষ্ট্য—হলো জন্মান্তরবাদ ও কর্মফল। এই ধর্মমত প্রচারের জন্য দায়ী হচ্ছে ব্রাহ্মণরা। যারা ছিল নেতা। আদি ব্রাহ্মণরা পূজারী ছিল না, দেব-দেবীদের তুষ্ট করবার জন্য তারা হোম ও যজ্ঞের ব্যবস্থা করত। পরে মূর্তিপূজা এসেছে এবং সেই পূজার অধিকার ব্রাহ্মণেরই রইল, তবে পুরুষ ব্রাহ্মণেরই শুধু, মেয়েদের নয়, ব্রাহ্মণ হলেও নয়। উপবীত পুরুষই ধারণ করে, মেয়েরা করে না। মেয়েরা মেয়ে হয়েছে কর্মফলে, অর্থাৎ কর্মদোষে এবং জনসূত্রেই শূদ্রের জন্য জন্মান্তরের কোনো আশা নেই, ব্রাহ্মণ রমণীর জন্য আছে।

স্থানীয় মানুষদের আদিবাসী সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের একটি ছিল মাতৃতান্ত্রিকতা। ৮ তাদের সমাজে দেবতার তুলনায় দেবীই ছিল প্রধান। এমনকি তাদের হাতে পড়ে দেবতাও মেয়েলি হয়ে যেত, যেমনটি ঘটেছে কঠোর শিবের ক্ষেত্রে। ভারতের অন্যত্র শিব উগ্র, বর্তমানকালের শিবসেনাদের তিনি আদর্শ ও পৃষ্ঠপোষক, কিন্তু বাঙালয় এসে তিনি পরিণত হয়েছেন আপনতোলা কৃষকে, ভাঙ-গাঁজা খান, অন্যমনস্ক থাকেন। বাঙালির পক্ষে মাতাকে আদর্শায়িত করার কারণ মনে হয় একটি নয়, দুটি। প্রথমটি অবশ্যই কৃষিনির্ভরতা। কৃষকের কাছে জমি হচ্ছে মায়ের মতো। বাঙালি কৃষি থেকে যত দূরেই সরে যাক, তার ভেতরে সর্বদাই একজন কৃষক বসবাস করে, যার জন্য প্রকৃতিরপিলী মাতা, আশ্রয়দাত্রী মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার প্রতি তার একটি অন্তর্গত নির্ভরশীলতা রয়েই যায়। মাতার প্রতি আকর্ষণের দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে পিতার শত্রুতা। পিতা বহিরাগত, সে এসেছে বিজয়ী বেশে, রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছে, নিয়ন্ত্রণ করেছে সমাজকে এবং যখন শাসন করেনি তখনও দেখা গেছে বার্থ হয়েছে আশ্রয় দিতে। দুস্থ বাঙালিকে তাই মানসিকভাবে মাতার কাছেই যেতে হয়েছে। বিপদের দিন

সমষ্টিগতভাবেও গেছে সে মায়ের কাছেই, যেমন হিন্দু মধ্যবিত্ত গেছে ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গের সময়, মুসলমান মধ্যবিত্ত গেছে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের কালে। বাঙালি তার অভিমানেই জন্য প্রসিদ্ধ। এমনকি এমন যে প্রবল বিদ্রোহী কাজী নজরুল ইসলাম তার লেখাতেও অভিমানী কিশোরের অনেক প্রকার চিত্ত-চাঞ্চল্য দেখতে পাই। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, অভিমান প্রকাশের জন্য মাতাই হচ্ছে আদর্শ স্থান ও কাজ আমরা এখনও করি, কিংবা করতে চাই। পলাশীর যুদ্ধের সময়কার কবি রামপ্রসাদ মায়ের বিরুদ্ধে অনেক বিষয়ে অভিযোগ করেছেন। অন্যের দুখে বাতাসা পড়ে, রামপ্রসাদের শাকে অন্ন মেলে না, অন্যরা ধনজন, হস্তী-অশ্ব-রথ সব পায় অথচ রামপ্রসাদ নিঃশ্ব এর কারণ কি এই যে তারা ‘তোমার বাপের ঠাকুর’, ‘আমি কি তোমার কেউ নয়?’ এসব প্রশ্নে উঠে এসেছে। এও বলেছেন কবি, ‘আমি কি তোমার পাকা ধানে দিয়েছি মই?’ এ রকম অন্তরঙ্গ জিজ্ঞাসাবাদ মাতার সঙ্গেই সম্ভবপর, পিতার সঙ্গে নয়। পিতা ধমক দেবেন, রক্তচক্ষু দেখাবেন।

কিন্তু সামাজিক শাসনটা ছিল পিতৃতান্ত্রিক। রাষ্ট্রশাসন তো বটেই। আর্য, তুর্কি, পাঠান, মুঘল, ইংরেজ, পাকিস্তানি সকল শাসকই মনে করেছে তারা পিতার কাজ করছে, প্রজাদের উপকারে নিয়োজিত রয়েছে। আর ওইসব কর্তৃত্বকারী, আধুনিক পরিভাষায় ফ্যাসিবাদী, শাসকদের চাপে বিপদগ্রস্ত হয়েছে সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক জীবন। এডমন্ড বার্ক তার উদারনৈতিকতার জন্য প্রশংসিত হয়েছেন; ভারতে কোম্পানির শাসকদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে তিনি পার্লামেন্টে দক্ষ ও গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য উপস্থাপিত করেছেন, কিন্তু তিনিও মনে করতেন ইংরেজ হচ্ছে ভারতীয়দের পিতার মতো; তিনি ব্যাখ্যা পেয়েছেন এটা দেখে যে, ভারতে গিয়ে ইংরেজরা ওই ভূমিকা পালন করতে বার্থ হচ্ছে। আর পেনাল কোড ও ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তক মেকওলে তো বলেছেনই যে, ভারতের জন্য ইংরেজের শাসন হচ্ছে একটা আলোকিত ও পিতৃতান্ত্রিক স্বৈরাচার। স্বাধীন বাংলাদেশেও যারাই শাসনক্ষমতা পান, তারাই মনে করেন যে পিতার কর্তৃত্ব পেয়েছেন, ব্যক্তিগতভাবে যদি তিনি মহিলা হন তবুও। যে আমলাতন্ত্র রাষ্ট্র চালায় তারি মোটেই সেবক নয়, পিতা। ব্যবসায়ীদের আচরণও এখানে বিক্রেতার নয়, বরঞ্চ মালিকের।

পিতাতে মানুষের আস্থা নেই, মাতাতে যে আছে, তাও নয়। এই ব্যাপারটা খুব স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যখন পুত্রসন্তান লাভের জন্য ব্যাকুলতাটা প্রকাশ পায়। এমনকি মাতৃভাষার প্রতিও যতই ভালোবাসা থাক শিক্ষিত লোকে রাষ্ট্রের ভাষা অর্থাৎ সংস্কৃত, ফার্সি ইংরেজির ব্যাপারেই অধিক আগ্রহ প্রকাশ করেছে। বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা বাঙলা হয়েছে অনেক আগে ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে, কিন্তু বাংলাদেশের আজ ইংরেজির দাম অবশ্যই বাঙলার চেয়ে বেশি। প্রাচীন সংস্কৃত নাটকে যেমন দেখা যায় উচ্চবর্গের লোকেরা কথা বলে বিশুদ্ধ সংস্কৃতে, নারী ও সাধারণ মানুষ বলে প্রাকৃত, যে প্রাকৃত হচ্ছে সাধারণের ভাষা; তেমনিভাবে আমাদের পূর্বের ইতিহাসে তো বটেই, বর্তমান ইতিহাসেও দেখা যাবে মাতৃভাষা থেকে ক্রমাগত দূরে সরে আসছে।

ওদিকে সমষ্টিগতভাবে যেমন ব্যক্তিগতভাবে আরও অধিক পরিমাণে ছেলেরা বিপদে পড়লে মায়ের কাছে ছোট্টে, আঁচল খোঁজে, ঠিক যেমনিভাবে বাইরে অসম্মানিত গৃহকর্তা ঘরে এসে সম্মান আদায় করতে চায়, প্রয়োজনে স্ত্রী ও কন্যাদেরকে নিগৃহীত করে। মাতা যে লড়াই করবে তা নয়— লড়াই করবে পিতাই, মাতা দেবে স্নেহ, দেবে সাহায্য। খ্যাতিবানদের কথাই ধরা যাক। কেশবচন্দ্র সেন যখন প্রায় খ্রিস্টান তখন ব্রহ্মাকে পিতা বলতেন, যখন তিনি রামকৃষ্ণের ভক্ত হয়েছেন তখন থেকেই দেখা গেছে তার জন্য ব্রহ্মা মাতায় পরিণত হয়েছে। নাট্যকার ও অভিনেতা গিরিশচন্দ্র ঘোষ আগে নাস্তিক ছিলেন, মদ্যপান ছাড়া সৃষ্টির হতে পারতেন না; পরে অসুস্থ হওয়ায় সব বদলে গেল, তিনি কালীভক্ত হলেন, মঞ্চে নামার আগে মাকে ডেকে তবে নামতেন।

আর মেয়েদের জন্য মা ছাড়া ভরসার কী! কে বুঝবে দুঃখ? রবীন্দ্রনাথের ‘শান্তি’ গল্পে চন্দরার ফাঁসির হুকুম হয়েছে। মিথ্যা অভিযোগে। প্রচণ্ড অভিমান চন্দরার, বিশেষ করে স্বামীর ওপর। চন্দরা বাঁচতে চায় না। ফাঁসির আগে শেষ ইচ্ছা কী জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। চন্দরা বলেছে সে তার মাকে দেখতে চায় শেষবারের মতো। মা অনুপস্থিত, স্বামী এসেছে জেলখানার দরজায়। স্বামীকে দেখতে চায় কিনা জিজ্ঞাসা করা হলে চন্দরা বলে ‘মরণ’। এবং মুখ ঢাকে।

৩.

নারী-পুরুষে বিভাজন ও বৈষম্য এবং বিভাজন-বৈষম্যকে আদর্শে পরিণত করার ব্যাপারটি হঠাৎ করে আসেনি, প্রোথিত রয়েছে একটি দীর্ঘ ঐতিহ্যে। লোকগানে আছে, ‘মেয়েছেলে মাটির ঢেলা/টপ করে নিয়ে জলে ফেলা’ এ হচ্ছে পুরুষের কথা, ‘অপরের বিষয়ে।’ অপর যদি ভয়ঙ্কর হয় তবে তাকে পূজা করতে আপত্তি নেই, তবে যদি দুর্বল হয় তবে কথা নেই, খেলাচ্ছলে তাকে ফেলে দিতে হবে জলে। রামের কাছে সীতা যে খেলবার পুতুল ছাড়া অন্য কিছু ছিল না এই কথাটা বেগম রোকেয়া বলেছিলেন তার একটি লেখাতে। মিথ্যা বলেননি। সাহিত্য সমালোচকরা ওই রকমভাবে দেখেনি ব্যাপারটাকে। কালীদাসের ‘শকুন্তলা’ নাটকে শকুন্তলাই যে প্রধান চরিত্র, এ বিষয়ে কালীদাসের মনে কোনো প্রশ্ন ছিল না, কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীতে উচ্চ-প্রশংসিত ‘একটি বই’ ‘শকুন্তলাতন্ত্রে’ চন্দ্রনাথ বসু দেখাচ্ছেন যে, নাটকের নাম যাই বলুক না কেন, নায়িকা নয়, নায়ক দুগ্ধন্তই হচ্ছে নাটকের প্রাণকেন্দ্র। ব্যাপারটা দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই উদ্ভূত, এই দৃষ্টিভঙ্গি যতই সুশিক্ষিত হোক— নারীকে প্রধান বলে গ্রহণ করতে প্রস্তুত নয়।

সন্তানের অপরাধের দায়ভার মাতার ওপর গিয়েই পড়তে চায়। স্বাভাবিক গতিটা ওই দিকেই। বলা হয় চোরের মার বড় গলা। গালি দেবার সময় মাকে টেনে আনাই প্রথা; রসিকতা ভালো জমে না কেন্দ্রে যদি নারীকে স্থাপন না করা যায়। মাতার বিপরীতে বলা হয়, হ্যাঁ বাপের ব্যাটা। গুণটা বাপেরই, সেখান থেকেই পেয়েছে। আর আছে প্রতারণা। মা দেবী, তার পায়ের তলায় বেহেস্ত, তাকে রাখি মাথায় করে— এ ধরনের সমস্ত বক্তব্যই নারীকে তার যোগ্য মর্যাদা থেকে বঞ্চিত রাখার সত্যকে লুকাবার

অভিপ্রায়টা থাকে। আবরণ দিয়ে আড়াল করা হয় উপেক্ষা ও অবমাননার বাস্তবতাকে। নারীর ঐতিহাসিক পরাজয়ের পর তার কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল পুরুষের লালসাকে তৃপ্তিদান ও সন্তান উৎপাদন; বাঙালির সংস্কৃতিতে এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ঘরকন্নাকে অতিউচ্চ মূল্য দেবার আদর্শিক বোঁক। এই তৃতীয় কর্তব্যটিকেই বরঞ্চ সামনে নিয়ে আসার চেষ্টা হয়েছে প্রথম দুটিকে আড়াল করে। আরেকটি লোকগানে গুণধর পুত্রটি যাচ্ছে বিয়ে করতে, যাবার আগে অনুমতি চাইছে তার মায়ের, বলছে, মা, তুমি অনুমতি দাও, তোমার জন্য একটি দাসী নিয়ে আসি। মা খুশি হচ্ছেন। কেননা একদিন তিনি নিজেও ওই ভূমিকাতেই অবতীর্ণ হয়েছিলেন তার শাশুড়ির গৃহে। অন্তঃপুরচারিণী একটি নীরব প্রতিশোধ গ্রহণের রক্তপাতহীন ঘটনা বাঙালির গৃহে গৃহে ঘটেছে, ঘটছে। মাতা প্রতিশোধ নিয়েছেন বধূর ওপর তো বটেই, সন্তান ও স্বামীর ওপরেও, তাদেরকে যথার্থ পুরুষ হতে না দিয়ে। পুরুষ নারীর সেবা নিয়েছে এবং সেবা নিতে গিয়ে ছোট হয়ে গেছে, কাপুরুষে পরিণত হয়েছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যখন বিলেত রওনা হন তখন সেই খবর তার মায়ের কাছ থেকে যতক্ষণ পারা যায় গোপন রাখা হয়েছিল, মা যখন জানতে পারলেন, তখন তিনি সংজ্ঞা হারালেন। এটা অবশ্যই অত্যন্ত গভীর পুত্রশ্লোহের প্রকাশ, কিন্তু এ আবার মাতার প্রতিশোধও; তাকে অধিক ও বঞ্চিত রাখার স্বাভাবিক প্রতিশোধ। হিন্দুসমাজে নারীর অবস্থানের প্রসঙ্গটিই প্রথমে আসে। কেননা তারাই আগেকার, মুসলমান এসেছে পরে এবং মুসলমান সমাজ পূর্বপ্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি নিজের অজান্তেই গ্রহণ করেছে, অথবা বলা যায়, ওই দুটি সঙ্গেই ছিল। কেননা মুসলমানদের অধিকাংশ তো ধর্মান্তরিত। প্রাচীনকালে শূদ্রদের যেমন, ব্রাহ্মণ ঘরের মেয়েদেরও তেমনি পূজার অধিকার ছিল না। এমনকি মধ্যযুগেও বেদ ও স্মৃতি পাঠ মেয়েদের জন্য নিষিদ্ধ করে রাখা হয়েছিল।^৯ হিন্দু বিবাহকে বলা হয়েছে ‘আধ্যাত্মিক’, সে দাবি যে কতটা আসার রবীন্দ্রনাথ তা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন তার ‘হিন্দু বিবাহ’ নামের প্রবন্ধটিতে। তার আলোচনায় মনু সংহিতার বিধানবলির কথা উঠে এসেছে। রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, ‘মনু সংহিতায় স্ত্রী নিন্দাবাচক যে সকল শ্লোক আছে তাহা উদ্ধৃত করতে লজ্জা ও কষ্টবোধ হয়।’^{১০} এবং মহাভারতের অনুশাসনপর্বে অষ্টবিংশতক অধ্যায়ে স্ত্রী চরিত্র সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছে তা রীতিমতো অশ্লীল—‘বর্তমান সমাজে তাহার সমগ্র ব্যক্ত করিবার যোগ্য নহে।’^{১১} এবং এও উল্লেখ করেছেন তিনি, মহাভারতের যে কৃষ্ণ আদর্শ ব্যক্তিত্ব তার ছিল ষোড়শ সহস্র মহিষী।^{১২} ‘মনু সংহিতা’ বিবাহ-বিচ্ছেদ মানে না, মনে করে বিবাহ চিরস্থায়ী বন্ধন, যেজন্য সমরগণ ও অনুমরণ সমর্থনীয় হয়ে পড়ে। তবে, পুত্রসন্তান লাভ যেরূপ অত্যাবশ্যকীয়, তাই মধ্যযুগের বাঙালি যে স্ত্রী পুত্রসন্তান নেই কিংবা যে বিধবা, পুত্রের আশায় সে যোগ্য পরপুরুষ ‘নিয়োগ’ করতে পারত।^{১৩} সে যুগে যে স্ত্রীর পুত্রসন্তান নেই কিংবা স্বামী নেই, তাকে মনে করা হতো অপবিত্র। ব্রাহ্মণদের জন্য তাদের হাতে খাদ্য গ্রহণ নিষিদ্ধ ছিল। শূদ্রের হাতে

ব্রাহ্মণ জল খেত না। তার স্পর্শে জল অপবিত্র হতো, তবে শূদ্র স্ত্রী গ্রহণ করতে তাদের তেমন আপত্তি ছিল না।^{১৪} যার স্পর্শে জল-পবিত্রতা হারাত নিজের কিন্তু সে পবিত্রই থাকত ব্রাহ্মণদের প্রয়োজনের সময়। স্ত্রীর পক্ষে স্বামীসেবা ছিল মোক্ষলাভের প্রকৃষ্ট পন্থা। বয়ঃসন্ধিতে কন্যার বিবাহ দেওয়া ছিল বাধ্যতামূলক, যে পিতা তাতে ব্যর্থ হতো তাকে শূদ্র বলে গণ্য করা হতো। কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা কন্যাকে কেন যে বিক্রি করে দিত তা বুঝতে অসুবিধা হয় না, এই সমস্ত অনুশাসনের কথা জানলে। ‘রামায়ণ’ তো কেবল মহাকাব্য নয়, ধর্মগ্রন্থ হিসেবেও গ্রন্থ। সেই রামায়ণে দেখি আমরা সীতাকে বারবার এবং অতি প্রকাশ্যে সতীত্বের পরীক্ষা দিতে হচ্ছে। পরীক্ষা রাবণ নিয়েছে, রামও নিয়েছে, নিতেই থাকত যদি না সর্বসহা সীতাও আর সহ্য করতে না পারে পাতালে চলে যেত। সীতা বনবাসে গেছে, বনবাস তার কাছে বনবাস মনে হয়নি। কেননা স্বামী সঙ্গে আছে, রয়েছে সে স্বামীগৃহে; বনে গিয়েও তাই সে অলংকার পরে, নূপুর পায়ে চলাফেরা করে লীলাসহকারে। বনের মধ্যেই অনসূয়াকে বলেছে সীতা, ‘আর্য্য, পতি যে নারীর গতি তা আমার জানা আছে। আমার স্বামী যদি দৃঃশীল ও নির্বন হতেন তথাপি বিনাদ্বিধায় তার অনুগামী হতাম।’ এর বিপরীতে অরণ্যকান্তে রাম বলছে যে, সীতার পরপুরুষ স্পর্শে সে যত দৃঃখ পেয়েছে তত দৃঃখ রাজ্যনাশে পায়নি, পিতার মৃত্যুতেও নয়। যুদ্ধক্ষেত্রে লক্ষ্মণ আহত হয়েছে দেখে রামের শোক প্রকাশের ধরনটি খুবই পুরুষসুলভ। রাম বলছে, ‘দেশে দেশে পত্নী পাওয়া যায়, দেশে দেশে বন্ধুও মেলে, কিন্তু এমন দেশ কোথায় আছে যেখানে ভ্রাতা পাওয়া যায়?’ এবং অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তনের পর সুখের দৃশ্যে রামের যে নিষ্ঠুর উজ্জ্বল শুন শিউরে উঠতে হয় সেটি একজন পুরুষের পক্ষেই করা সম্ভব, কোনো নারীর পক্ষে নয়। রাম বলছে সীতাকে, ‘তোমার চরিত্রে আমার সন্দেহ জন্মেছে। নিজের চরিত্র রক্ষা, অপবাদ খণ্ডন এবং আমার বিখ্যাত বংশের গ্লানি দূর করা আমার কর্তব্য।’ মনু তার সংহিতায় মেয়েদের ব্যাপারে পুরুষদের নানাভাবে সতর্ক করে দিচ্ছেন। বলছেন, অন্য নারীর সঙ্গে তো নয়ই, নিজের মায়ের সঙ্গেও নির্জন স্থানে যাওয়া যাবে না। কেননা মেয়েদের স্বভাবেই রয়েছে পুরুষকে প্রলুব্ধ করবার প্রবণতা। বোকারা তো বটেই, জ্ঞানীরাও নিরাপদ নয়।^{১৫} পুরুষ কিছুই করে না, সব দোষ মেয়েদের—‘মহাভারতে’ও ওই একই অবিশ্বাস। অনুশাসনপর্বে বলা হচ্ছে সেই সুন্দরী রমণীই প্রকৃত প্রতিব্রতা যার মুখ স্বামী ভিন্ন অন্য কেউ দেখতে পায় না। সূর্য নয়, চন্দ্র নয়, পুরুষালি নামের বৃক্ষও নয়। অসূর্যস্পর্শ্যার আদর্শ ওখান থেকেই এসেছে। মনু সংহিতাতে নারীকে বলা হচ্ছে কর্ণক্ষেত্র, যেখান থেকে পুরুষ তার নিজের জন্য ফসল সংগ্রহ করে থাকে। বিশেষ ফসল হচ্ছে পুত্রসন্তান। ইসলাম ধর্ম নারীকে মর্যাদা দিয়েছে, বিশেষত যে কালে তার প্রবর্তন, সেকালের তুলনায়। তার অনেক নির্দেশ অবশ্যই ওই ঐতিহাসিক সময়ের তুলনায় অগ্রসর। কিন্তু অসুবিধা হয় তখন যখন সব বিধিকেই চিরকালের বিধান বলে মনে করা হয়।

আর দ্বিতীয় অসুবিধাটি ঘটে প্রয়োগের ক্ষেত্রে। অর্ধশিক্ষিত ও পুরুষতান্ত্রিক মোল্লারা ওইসব বিধির এমন সব ব্যাখ্যা দেয়, যাতে মেয়েরা অনেক কিছু থেকেই বঞ্চিত হয়ে পড়ে। মেয়ে-পুরুষের সম্পর্কের বিষয়ে কোরানের একটি উক্তি এই রকম, ‘তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের শস্যক্ষেত্র। তোমরা সেখানে ইচ্ছামতো যেতে পারা।’ (২ : ২২৩) এটাও জানা যে, ইসলামে পুরুষদের জন্য একসঙ্গে চারজন স্ত্রী রাখবার অধিকার দেওয়া হয়েছে। মেয়েদের বেলায় তেমন অধিকারের প্রশ্ন সেখানে অপ্রাসঙ্গিক। সম্পত্তি বন্টনের ব্যাপারে নির্দেশ হচ্ছে এই যে, কন্যাসন্তান পাবে পুত্রসন্তানের অর্ধেক। (৪ : ১১), ব্যবসাসংক্রান্ত কোনো চুক্তি তৈরির সময় দুজন পুরুষ সাক্ষীর দরকার হবে, দুজন পুরুষ না পাওয়া গেলে পছন্দমতো একজন পুরুষ ও দুইজন নারীর সাক্ষ্য নেয়া যেতে পারে। (২ : ৮২) হাদিসে উল্লেখ রয়েছে যে, আকিকার সময় ছেলের জন্য দুই ছাগল দিতে হবে, মেয়ের জন্য এক ছাগল। আর এ বিধানও আছে যে, পুরুষ মানুষ স্মৃতি উপাসক ও অগ্নিপূজক ভিন্ন অন্য যে কোনো ধর্মমতের মেয়েকে বিয়ে করতে পারবে, মেয়েরা তা পারবে না। ধর্মীয় বিধানে যা লেখা আছে প্রয়োগের ক্ষেত্রে সেসবের অনেক রকম অতিরেক ঘটেছে। উপমহাদেশের অন্যান্য এলাকার তুলনায় কাঠমোল্লার সংখ্যা বাংলাতে বেশি, যার প্রধান কারণ অর্থনৈতিক ও সামাজিক পশ্চাৎপদতা। বাংলা যেমন পিছিয়ে রয়েছে, তার মোল্লারাও তেমনি পিছিয়ে গেছে। এরা ওয়াজ, মিলাদ, ফতোয়া, মাদ্রাসায় পাঠদান ইত্যাদির মধ্য দিয়ে নারীর তথাকথিত অধস্তনতা প্রচার করেছে এবং এখনো সমান বেগে করে চলেছে। ফতোয়াবাজি এখন বরঞ্চ বেড়েছে। এটাও মর্যাদাসিক সত্য যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে মেয়েরা আদর্শিকভাবে এসব প্রচারকে মেনে দিতে বাধ্য হয়েছে। আরবি-ফার্সি শব্দমিশ্রিত ভাষায় লিখিত পুঁথিসাহিত্যে মেয়েদের ওপর আদর্শগত আক্রমণটা অত্যন্ত প্রবল। যেমন উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে লেখা মানে মোহাম্মদের ‘তানবীহ আল-নিমা’ নামক পুঁথিতে বলা হচ্ছে যে, আল্লাহই বলে দিয়েছেন যে, স্ত্রীলোকের কর্তব্য হচ্ছে খসম ও আল্লাহর সেবা করা। তবে এমন বাজে নারী আছে যারা স্বামী যদি ‘দোছরা নেকা করে’ তবে কলহ বাধায়। ‘জিদ বন্দি ঝগড়া করে মরদর সাত/কেতাবেতে লেখে সেই আওরত বজ্জাত।’ ওই সময়েই লেখা, ‘নূরুল ইমানের পুঁথিতে’ মোহাম্মদ দানেশ ধর্মপথযাত্রীদেরকে আশ্বাস দিচ্ছেন যে, মৃত্যুর পরে অবশ্যই তারা বেহেশতে যাবে এবং সেখানে তাদের জন্য খাদ্যের কোনো অভাব হবে না। ‘গরম পোলাও আর রুটি আর কাবাব/ছোরাই ভরিয়া সবে রাখিবে সরাব।’ সারাব মুসলমানদের জন্য হারাম, কিন্তু পরহেজগারদের জন্য তারও সুব্যবস্থা থাকবে। আওরাতও পাওয়া যাবে। ‘এয়চাই আওরত সবে দিবেন এলাহি/তাহার মেছেল কেহ দুনিয়াতেও নাই।’ আর কি চাইবার থাকতে পারে? তবে সবকিছুই পুরুষের জন্য, মেয়েরা কি পাবে তা বলা হচ্ছে না। বোধ করি পুরুষের সেবা করার সুযোগ পাবে, এটাকেও তারা যথেষ্ট পাওনা মনে করবে।

‘বেহেশতের মেওয়া’, ‘মোকসদুল মোমেন’, ‘মোকসদুল মোমেনিন’ ধরনের বই গ্রামে ও শহরে নিম্নমধ্যবিত্তের মধ্যে বেশ জনপ্রিয়, বিশেষ করে বিয়েতে উপহার দেয়ার বেলায় এদের খোঁজ করা হয়। এসব বই নানা রকমের স্কুলতা ও অন্ত্রীলতায় আকীর্ণ। দৃষ্টিভঙ্গিটি সর্বদাই পুরুষতান্ত্রিক। যেমন ওজুর ফজিলত বর্ণনা করতে গিয়ে এক জায়গায় বলা হচ্ছে যে, এতে অসামান্য আনন্দ পাওয়া সম্ভব। সে আনন্দের সঙ্গে তুলনীয় হচ্ছে মুখ ও জিহ্বা দিয়ে নারীকে চুম্বনের, অঙ্গুলি দ্বারা মসৃণ ও কোমল নারীদেহ স্পর্শ করার।

কোথাও কোথাও আবার বিজ্ঞানমনস্কতার ভান রয়েছে। যেমন- ‘নেয়ামুল কোরানে’। সেখানে বলা হচ্ছে এটা বৈজ্ঞানিকভাবেই প্রতিষ্ঠিত যে, মেয়েরা ছেলেদের চাইতে ছোটতর। এর কারণ হচ্ছে ছেলেদের মস্তিষ্ক মেয়েদের মস্তিষ্কের তুলনায় অধিক ওজনদার। নাকি আরো প্রমাণ পাওয়া গেছে মেয়েদের চাইতে ছেলেরা বেশি চঞ্চল গতিবান এবং সেজন্যই স্বাভাবিকভাবেই পুরুষ হচ্ছে বহু বিবাহপ্রবণ আর মেয়েরা এক স্বামী অভিসারী। হাদিস থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হচ্ছে, আল্লাহর পরে যদি কেউ এবাদতের দাবিদার হয় তবে সে হচ্ছে স্বামী। বলা হয়েছে, উপযুক্ত কারণ ছাড়া স্বামীর সঙ্গে সহবাসে অসম্মতি, স্বামী ডাকলে সাড়া না দেয়া, নামাজের আগে গোসল না করা, স্বামীর বিনা অনুমতিতে অপরের গৃহে গমন—এ ধরনের অন্যায় করলে স্বামীর অধিকার থাকবে স্ত্রীকে প্রহার করার।

৪. বাংলা সাহিত্যে নারীর অধিকারের কথা বহু জায়গায় আছে। নারীর প্রতি অন্যায় আচরণ লক্ষ্য করে দ্বিধারের ধ্বনিও উচ্চারিত হয়েছে। যেমন ‘সহমরণ বিষয়ে প্রবর্তক-নিবর্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ’-এ (১৮১৯) রামমোহন স্ত্রীলোকের বুদ্ধি কম এই তত্ত্বের, কেবল অর্ধশিক্ষিতরা নয়, শিক্ষিত লোকেও যে তত্ত্বে বিশ্বাসী তার অসারতা প্রতিপন্ন করতে গিয়ে প্রশ্ন করেছেন, ‘স্ত্রীলোকের বুদ্ধির পরীক্ষা কোনো কালে লইয়াছেন যে অনায়াসে তাহাদিগকে অল্পবুদ্ধি কহেন?’ মেয়েরা বিশ্বাসঘাতকতা করে—এই অভিযোগের জবাবে রামমোহন লিখছেন, ‘দোষ পুরুষের অধিক কি স্ত্রীতে অধিক, চরিত্র দৃষ্ট করিলে বিদিত হইবেক।... আমরা অনুভব করি যে, প্রতারিত স্ত্রীর সংখ্যা দশগুণ অধিক হইবেক।’ কার অনুরাগ বেশি, স্বামীর নাকি স্ত্রীর, সে প্রশ্নে তিনি বলছেন দূরে যেতে হবে না ‘তাহা উভয়ের বিবাহ গণনাতেই ব্যক্ত আছে, অর্থাৎ এক ২ পুরুষের দুই-তিন শত বরঞ্চ অধিক পত্নী দেখিতেছি, আর স্ত্রীলোকের এক পতি।’ কৃষ্ণের ছিল লক্ষ লক্ষ, তিনি দেবতা, কিন্তু নরলোকের দেবতাদেরও কম নেই, আছে শত শত। স্ত্রীলোকের ধর্মভয় অল্প—এই দাবির বিপরীতে রামমোহন লিখছেন, ‘এত অতি অধর্মের কথা, দেখি কি পর্যন্ত দুঃখ, অপমান, তিরস্কার, যাতনা তাহারা কেবল ধর্মভয়ে সহিষ্ণুতা করে।... বিবাহের সময় স্ত্রীকে অর্ধঅঙ্গ করিয়া স্বীকার করেন, কিন্তু ব্যবহারের সময় পশু হইতে নিচ জানিয়া ব্যবহার করেন; যেহেতু স্বামীর গৃহে প্রায় সকলের পত্নী দাস্যবৃত্তি করে রন্ধনে ও পরিবেশনে যদি কোনো অংশ ত্রুটি হয়, তবে তাহাদের স্বামী শাসড়ি দেবর প্রভৃতি কি তিরস্কার

না করেন।’ খুবই স্পষ্ট বক্তব্য। রামমোহন প্রফুল্লুর বাসন মাজা সমর্থন করেন না, তার সংসারধর্ম পালনকে তিনি দাস্যবৃত্তি ভিন্ন অন্যকিছু মনে করেন না, যে আদর্শবাদের বোঝা প্রফুল্লুরা বহন করতে বাধ্য হয়, তাকে তিনি ছিন্নভিন্ন করতে চান। এই রচনাতেই তিনি বলছেন যে, সংসারে একজন নারী ‘একাধারে রাঁধুনি শয়্যাসঙ্গিনী ও বিশৃঙ্খল গৃহরক্ষী বটে।’ একজনে তিনজনের কাজ করে। বেতন পায় না।

‘বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব’—(১৮৫৫) বিদ্যাসাগর আবেগপূর্ণ ভাষায় লিখেছেন, ‘তোমরা মনে কর, পতিবিয়োগ হইলেই স্ত্রী জাতির শরীর পাষাণিসম হইয়া যায়, দুঃখ আর দুঃখ বলিয়া বোধ হয় না, যন্ত্রণা বলিয়া বোধ হয় না, দুর্জয় রিপূর্ণ এককালে নির্মূল হইয়া যায়।... যে দেশে পুরুষ জাতির দয়া নাই, ধর্ম নাই, ন্যায়-অন্যায় বিচার নাই, হিতাহিত বোধ নাই, কেবল লৌকিক রক্ষণই প্রধান ধর্ম, আর যেন সে দেশে হতভাগ্য অবলা জাতি জন্মগ্রহণ না করে।’ ওই সময়ে বিধবা মেয়েদেরকে রাত্ বলা হতো; শব্দটির অন্য অর্থ হচ্ছে বেশা। প্রভাবতী নামের শিশুটির মৃত্যুতে বিদ্যাসাগর যে কতটা কাতর হয়েছিলেন তা লেখা আছে তার ‘প্রভাবতীসম্ভাষণ’ নামের ছোট রচনাটিতে। বিদ্যাসাগর বলছেন একদিক দিয়ে ভালোই হয়েছে যে প্রভাবতী চলে গেছে, কেননা কে জানে, বেঁচে থাকলে ভাগ্যদোষে তাকে হয়ত ‘অসৎ পাত্রের হস্তগত ও অসৎ পরিবারের করাল কবলে পতিত হইয়া অবিশিষ্ট দুঃখসম্মেগে কালান্তিপাত করিতে হইত।’ সেটা হতো হৃদয়বিদারক। ‘বোধ হয় তোমার অতর্কিত অন্তর্ধান নিবন্ধন যাতনা অপেক্ষা সে যাতনা বহুসহস্রগুণে গরীয়সী হইত।’ প্রভাবতীর পক্ষেও প্রফুল্ল হবার আশঙ্কা ছিল বৈকি, সে আশঙ্কা যদি সত্য হতো তাহলে বঙ্কিমচন্দ্রের মতো উৎফুল্ল হবেন কি, বিদ্যাসাগরের হৃদয় বিদীর্ণ হতো।

বঙ্কিমচন্দ্র যে মেয়েদের দুর্দশার বিষয়ে জানতেন না তা তো নয়। তার নিজের তিন কন্যার একজন আত্মহত্যা করেছিল। তার লেখায় আছে, ‘তোমার স্ত্রী, তোমার কন্যাকে যে পশুর মতো পচালায়ে বন্দি রাখা তাহাতে কি অপমান নাই, কিছু লজ্জা নাই?’ দ্বিধার দিচ্ছেন অবশ্যই, কিন্তু স্রটি জাতীয়তাবাদীর, মেয়েদের প্রতি পাশবিক আচরণ লজ্জার ব্যাপার, সে কারণে দুঃখে; হৃদয়-বিদীর্ণ হওয়ার ধ্বনিটি শোনা যাচ্ছে না, যেমন শোনা গেল বিদ্যাসাগরের রচনায়। ক্ষেত্রে এই দুইজন প্রধান লেখকের মধ্যকার তফাৎটা সামান্য নয়।

বিদ্যাসাগরের ‘বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক, বিচার, দ্বিতীয় পুস্তকের’ (১৮৭৩) সমালোচনা করে বঙ্কিমচন্দ্র ‘বঙ্গদর্শনে’ যে মন্তব্য করেছিলেন, তার মধ্যে একটি জাতীয়তাবাদী উদ্বেগও বর্তমান ছিল। তিনি লিখেছেন, ‘আর একটি কথা এই যে, এ দেশে অর্ধেক হিন্দু অর্ধেক মুসলমান। যদি বহুবিবাহ নিবারণের জন্য আইন হওয়া উচিত হয়, তবে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই সে আইন হওয়া উচিত। হিন্দুর পক্ষে বহুবিবাহ মন্দ, মুসলমানের পক্ষে ভালো এমন নহে।’ জাতীয়তাবাদী উদ্বেগটা স্পষ্টই এইখানি যে, হিন্দুর জন্য বহুবিবাহ নিষিদ্ধ হবে, কিন্তু

মুসলমানের জন্য হবে না, ফলে বাংলায় মুসলমানের সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পাবে। বলা বাহুল্য, এই জাতীয়তাবাদেরই অপর নাম হচ্ছে সাম্প্রদায়িকতা। নারীর দুঃখ শরৎচন্দ্র যতটা বুঝেছেন, কম বাঙালি লেখকই ততটা অনুভব করেছেন। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় সেই সাধারণ মেয়ে মালতী যে শরৎচন্দ্রের কাছে সানুয় অনুরোধ জানিয়েছিল তাকে তার সাত বছরের প্রবাস-গরী স্বামী নরেশ ও নরেশের বিলেতি মেয়েদের সামনে জিতিয়ে দিতে, সেটা ছিল খুবই স্বাভাবিক। শরৎচন্দ্র ছাড়া কে বুঝবে মালতীর মর্মবেদনা? ‘নারীর মূল্য’ প্রবন্ধে শরৎচন্দ্র লিখেছেন যে, নারীর মূল্য আসলে নির্ভর করে কি পরিমাণে তিনি সেবাপরায়ণ, স্নেহশীলা সতী এবং দুঃখকষ্টে মৌনা। অর্থাৎ তাহাকে লইয়া কি পরিমাণে মানুষের সুখ ও সুবিধা ঘটিবে। এবং কি পরিমাণে তিনি রূপসী। অর্থাৎ পুরুষের লালসা ও প্রবৃত্তিকে কতটা পরিমাণে নিবন্ধ ও তৃপ্ত রাখিতে পারিবে।’ তার এ বক্তব্য এসেলসের পূর্বোক্তিত বিশ্লেষণকেই স্মরণ করিয়ে দেয়।

কিন্তু তার সাহিত্যে দেখি আমরা যে প্রফুল্ল হতে অসম্মত মেয়েরা বারবার হেরে যাচ্ছে, ব্যক্তিগত উৎকর্ষের অসন্তোষের দরুন নয়, সামন্তবাদী আদর্শবাদের কারণে। ‘গৃহদাহের’ অচলা শহরের মেয়ে, আধুনিক এবং ব্রাহ্মসমাজের সদস্যা। কিন্তু নৈতিকভাবে শোচনীয় পরাজয় ঘটেছে তার গ্রামের মেয়ে মৃণালের কাছে। মৃণাল ‘সনাতন’ নারীর আদর্শ যেন: সে রুগ্ন, বয়স্ক স্বামীর সেবা করে।’ তার মধ্যে কোনো অস্থিরতা নেই, অচলার মধ্যে যা আছে। পুরুষও অত্যাচারিত, কিন্তু নারী অত্যাচারিত দ্বিতীয়বার। স্বাধীনতার পরে ১৯৭৩-এ, একজন ভারতীয় বাঙালি সাংবাদিক এসেছিলেন বাংলাদেশে। যা দেখেছেন তাতে মোটেই উৎফুল্ল হতে পারেননি। অন্যান্য দৃশ্যের সঙ্গে ছিল একটি দৃশ্যের অনুপস্থিতি, সেইটে হলো মেয়েদের চলমানতা। রাস্তাঘাটে মহিলাদের চোখে পড়েনি। না, রাস্তাঘাটে, মেয়েরা ছিল না, এখনো যে তেমন আছে তা নয়। তারা গেল কোথায়? থাকে কোথায়? আছে ছোট ছোট গৃহে। অনেকের তাও নেই, গৃহ নেই, কেবল ভূমিহীন নয়, গৃহহীনের সংখ্যাও বছরে বছরে বেড়েছে; মাথার ওপর চাল না থাকলে মেয়েরাই ভেজে সর্বাগ্রে, প্রাকৃতিক বৃত্তিতে, সামাজিক বৃত্তিতেও। তারা চূপসে যায়, চোখে যাতে না পড়ে সেটাই চায়। পুরুষ তো চায়ই, মেয়েরা নিজেরাও চায়।

একশ বছর আগে ১৮৯৪তে, রবীন্দ্রনাথ নদীপথে যাচ্ছিলেন, তখন বর্ষাকাল, যেসব দৃশ্য দেখেছেন তা লিখে রেখেছেন চিঠির আকারে। একটি চিঠিতে লিখেছেন তিনি, নদীর ধারে দেখতে পাচ্ছেন, ‘গৃহস্থের মেয়েরা ভিজে শাড়ি গায়ে জড়িয়ে ঠাণ্ডা হাওয়ায় বৃষ্টি জলে ভিজতে ভিজতে হাঁটুর ওপর কাপড় তুলে জল ঠেলে সহিষ্ণু জন্তুর মতো ঘরকন্নার নিত্যকর্ম করে যায়— সে দৃশ্য কোনোমতেই ভালো লাগে না।’

হাজার বছর আগের চর্যাপদে নারীর অবস্থা ও অবস্থানের যে চিত্র পাই তা এ থেকে কতটা খারাপ কিংবা ভালো? চর্যাপদের কালে তবু মেয়েরা কর্মক্ষেত্রে এক ধরনের স্বাধীনতা ভোগ করত, কৃষকের ঘরে বন্ধ মেয়েরা যেটুকুও পায়নি, তারা সহিষ্ণু জন্তুর মতো ঘরকন্নার নিত্যকর্ম করে যায়।

রবীন্দ্রনাথের ওই লেখার পর একশ বছর পার হয়ে গেল, এই সময়ে অবস্থার নিশ্চয়ই উন্নতি হয়েছে। হ্যাঁ, কারো কারো হয়েছে, অল্পকিছু, অধিকাংশের দুর্দশা আগের মতোই, কারো কারো ক্ষেত্রে আবার অবনতি ঘটেছে। কিন্তু ব্যাপারটা খেয়াল করা হয় না। উপরতলার লোকেরা বর্ষায় শোভা দেখে, ভরা নদী দেখে উৎফুল্ল হয়, কিন্তু তাতে অন্য মানুষের যে কী দুর্গতি তার খোঁজ করে না, অন্য মানুষ যেন ভিন্ন গ্রহের প্রাণী। ওই চিঠিতেই রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, ‘প্রকৃতি উপদ্রব করে তাও সয়ে থাকি, রাজা উপদ্রব করে তাও সই, শাস্ত্র চিরদিন ধরে যে সকল উপদ্রব করে আসছে তার বিরুদ্ধেও কথাটা বলতে সাহস হয় না।’ সহ্য করে মেয়েরাই বেশি, সাহস তাদেরই কম বাস্তব কারণে। প্রকৃতি অত্যাচার করে, রাজা তো করেই; শাস্ত্রও করে থাকে। শাস্ত্রীয় নিপীড়নটা ব্যাপ্তি এবং গভীর। এটি হচ্ছে আদর্শের নিগ্রহ। এর বন্ধন ছিন্ন করা খুবই কঠিন।

বেগম রোকেয়ার ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি আদর্শবাদের বহিরাবরণটিকে কেননভাবে ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন। সেটি একজন অসাধারণ নারীর কাজ, সাধারণেরা তা পারে না। তাছাড়া এমনকি তাকেও তো সামাজিক অনুশাসন মেনে চলতে হয়েছে। স্কুল করেছেন, লিখেছেন, ভ্রমণ করেছেন, বক্তৃতা দিয়েছেন মেয়েদের সম্মেলনে, কিন্তু অবরোধ থেকে বের হয়ে আসতে পারেননি। পর্দা করতে হয়েছে। ‘সওগাত’ সম্পাদক মোহাম্মদ নাসির উদ্দিনের সঙ্গে তার সাক্ষাতের ঘটনাটি যেমন কৌতুককর তেমনি তাৎপর্যপূর্ণ। ১৯২৯-এর ঘটনা। বেগম রোকেয়া ‘সওগাতে’ লিখেছেন, কিন্তু ‘সওগাত’ সম্পাদকের সঙ্গে তার কখনও দেখা হয়নি। সম্পাদকে অনুরোধ করেছিলেন তার বাসায় যেতে, বলেছিলেন, খুবই আনন্দের ব্যাপার হতো যদি তিনি নিজে যেতে পারতেন পত্রিকা অফিসে, কিন্তু সেটা সম্ভব নয়। কেননা তিনি অবরোধবাসিনী। নাসিরউদ্দিন গিয়েছিলেন; কিন্তু দেখা হয়নি।

রোকেয়া কথা বলেছেন পর্দার ওপার থেকে। টেবিলে নাস্তা সাজানো ছিল। পরিচারিকা এসে বলেছে, মেম সাহেব বলেছেন আপনাকে খেতে, আমি পরে চা নিয়ে আসছি। ‘সওগাত’ সম্পাদক লিখছেন, ‘একটু পরে পর্দার ওপার থেকে হাসির শব্দ শুনতে পেলাম। হাসতে হাসতে পর্দার ওপার থেকেই বললেন, ‘আদাব!... আপনাকে একটা চিঠি দেখাবার জন্য আমি আজ ক’দিন যাবৎ ব্যস্ত রয়েছি।’ বলে তিনি চিঠিটা পাঠিয়ে দিয়েছেন। ‘আমি চিঠিখানা পড়ছি আর হাসছি। তিনিও পর্দার ভিতর থেকেই হাসছিলেন, শব্দ পাওয়া গেল। চিঠিতে সিলেটের একজন মুসলমান ও চা-বাগানের মালিক তার নিজের পরিচয় ও ধনসম্পদের ফিরিস্তি দিয়ে লিখেছেন যে, ‘মহিলা সংখ্যা’ সওগাত দেখে তিনি মুগ্ধ হয়েছেন। তার একটি আরজ বেগম রোকেয়ার মুখে, তিনি যেন মধ্যস্ততা করে ওই সংখ্যায় যেসব মহিলার ছবি ছাপা হয়েছে তার মধ্যে ফাতেমা বেগম অথবা ফজিলাতুন নেছার সাথে তার বিবাহের প্রস্তাব দেন। পাত্রীর নামে অনেক সম্পত্তি তিনি লিখে দেবেন; সে বেশ সুখে থাকবে।’ ফাতেমা বেগম হচ্ছেন ‘সওগাত’ সম্পাদকের স্ত্রী; ফজিলাতুন নেছা সেকালের খ্যাতিমান মহিলা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি অঙ্কশাস্ত্রে প্রথম শ্রেণী পেয়েছিলেন। পত্র পাঠ শেষ হলে বেগম রোকেয়া

গভীর স্বরে বলেছিলেন, ‘যে দেশের একজন প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি অজানা-অচেনা ভদ্রমহিলাকে উদ্দেশ্য করে এ ধরনের চিঠি লিখতে পারেন সে দেশের পুরুষসমাজ কোন স্তরের এবং মেয়েদের প্রতি তাদের ব্যবহার কত অশিষ্ট তা সহজেই ধারণা করা যেতে পারে।’

আসলেই তাই। কিন্তু পুরুষের এই দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাবে কোনো গুণগত পরিবর্তন এসেছে কি? না, আসেনি। বৈষম্যমূলক এবং সমাজের যে কোনো পুরুষ তার সম-অবস্থানের যে কোনো মেয়ের চেয়ে নিজেকে বড় মনে করে। অধিকাংশের মনোভূমিতে ফ্যাসিবাদের লালন চলে।

বেগম রোকেয়া মানসিকভাবে মুক্ত হয়েও সামাজিকভাবে যে মুক্ত হতে পারেননি তার কারণটা লক্ষ্য করা দরকার। মূল কারণ মেয়েদের কর্মে পরাধীনতা এবং কর্মক্ষেত্রের সঙ্কীর্ণতা। রোকেয়ার কাজের কোনো বিরাম ছিল না, কিন্তু কর্মে তার স্বাধীনতা ছিল না এবং কর্মক্ষেত্রটিও ছিল সঙ্কীর্ণ। পোশাকশিল্পে যে মেয়েরা আজ কাজ করে, তাদের কর্মক্ষেত্রটি বড় নয়। তারা মজুরি-দাসত্বই করে, তবু একটু যে স্বাধীনতা আছে অর্থোপার্জনের ও চলাফেরার, সেটুকু তারা পছন্দ করে এবং মনের দিক থেকেও তারা বদলে গেছে, প্রফুল্ল যেমন মহা উৎসাহে ঘরে ফিরে গিয়েছিল স্বেচ্ছাবন্দি হবার আকাঙ্ক্ষায় তেমনটি করতে তাদের অনেকেই রাজি হবে না, নিতান্ত বাধ্য না হলে পুনরায় আবার তারা কাজের বুয়া হতে সম্মত হবে— এমনটা আশা করা যায় না।

রাষ্ট্রনৈতিকভাবে অনেক কিছু বদলেছে। ব্রিটিশ গেছে, পাকিস্তানিরা গেছে চলে। কিন্তু এসবই উপর-কাঠামোর ব্যাপার, সমাজে কোনো মৌলিক পরিবর্তন ঘটেনি, তার কাঠামো আগের মতোই রয়ে গেছে। ছিলাম আমরা পাকিস্তানে, পাকিস্তান নিজেকে একটি ইসলাম রাষ্ট্র বলে ঘোষণা করেছিল; তখনই বোঝা গিয়েছিল যে, এই রাষ্ট্রে মেয়েরা সমান অধিকার পাবে না। একান্তরে ইসলাম রক্ষার নাম করে পাকিস্তানি রাষ্ট্রের বর্বর সেনাবাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়েছিল বাঙালির ওপর; তখন সবচেয়ে কঠিন দুঃসময় গেছে মেয়েদের। অবরুদ্ধ ও আক্রান্ত হয়েছে। সবচেয়ে মর্মান্তিক হচ্ছে এই যে, আক্রমণের চিহ্নগুলো তাদেরকে বহন করতে হয়েছে দেহে ও মনে। লাঞ্ছিতা মেয়েদেরকে সম্মান জানানোর জন্য তাদেরকে যারা ‘বীরঙ্গনা’ উপাধি দিয়েছিলেন তাদের আন্তরিকতার প্রশংসা করা সম্ভব; কিন্তু দূরদৃষ্টি নয়। কেননা তারা দেখতে পাননি কি ঘটতে যাচ্ছে, বুঝতে পারেননি যে ওই উপাধি একটা দুঃসহ বোঝায় পরিণত হবে, আমেরিকান ঔপন্যাসিক হর্নের উপন্যাস ‘দি স্কার্লেট লেটার’ের নায়িকাটির মতো নিজের অপমানে কারহিনী নিজেকেই বিভজ্ঞাপিত করতে পারবে। তাই বলে যারা উপাধি পায়নি তারা যে বেঁচে গেছে তা নয়, দৈহিকভাবে বাঁচলেও সামাজিকভাবে অসম্মানিত হয়েছে, মর্মে মর্মে দগ্ধ হয়েছে নিঃশব্দে। যুদ্ধ পুরুষতন্ত্রকে পরাজিত করতে পারেনি, হানাদার পাকিস্তানিদের পরাজিত করলেও। এসব ক্ষেত্রে আদর্শ হচ্ছে চলমান ট্রেনের ধোঁয়ার মতো, আগে আগে না, পেছনে পেছনে চলে।

বাংলাদেশ একটি জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্র, কথা ছিল

এই জাতীয়তাবাদ হবে সকল নাগরিকের, এখানে ধর্ম ও শ্রেণী বিভাজন থাকবে না, ক্ষুদ্র জাতিসত্তাগুলোও সমান অধিকার পাবে, অর্থাৎ রাষ্ট্র হবে গণতান্ত্রিক, যার মূলকথা হচ্ছে অধিকার ও সুযোগের সাম্য। সে ঘটনা ঘটেনি। উল্টো রাষ্ট্রীয় আদর্শগুচ্ছ থেকে ধর্মনিরপেক্ষতা উচ্ছেদ হয়ে গেছে, সেখানে এসেছে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম। সমাজতন্ত্র নেই, গণতন্ত্র নামে আছে মাত্র, কাজে অনুপস্থিত। এ রকম একটা বৈষম্যমূলক ব্যবস্থায় সাধারণভাবে মেয়েদের অবস্থা ছেলেরদের চেয়ে খারাপ হবার কথা এবং ঠিক তাই হয়েছে নির্ভুলভাবে।

আইন-শৃঙ্খলা ব্যবস্থার চরম অবনতি ঘটেছে এবং এর প্রথম ভুক্তভোগী হচ্ছে মেয়েরা। রাষ্ট্র তাদের নিরাপত্তা দিচ্ছে না, বরঞ্চ আগে যেমনটি কখনও ঘটেনি, তেমন ঘটনা ঘটছে, পুলিশও অংশ নিচ্ছে ধর্ষণে। গণধর্ষণের কথা আগে শোনা যায়নি, এখন শোনা যাচ্ছে। কাঠমোড়ার উৎপাত আগের চেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষভাবে বিপ্লববোধ করছে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মেয়েরা। পাকিস্তান আমলেও তারা নিজেদের ততটা অরক্ষিত মনে করেনি, আজ যতটা করছে। বাইরে থেকে বোঝা যায় না, কিন্তু নীরবে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের দেশত্যাগ ঘটছে, যার একটা বড় কারণ মেয়েদের নিরাপত্তার অভাব। এখন মেয়েরা পাচার হচ্ছে, বিক্রি হচ্ছে। গ্রামাঞ্চলে ছেলেরা যৌতুকের জন্য বিয়ে করে, সাইকেল, রেডিও, ঘড়ি সব নেয়, তারপর স্ত্রীকে ছেড়ে দিয়ে নতুন স্ত্রী গ্রহণ করে। সেই কুলীন ব্রাহ্মণদের মতো। শিক্ষাক্ষেত্রে মেয়েরা এগিয়েছে, তবে বড় ধীরে ধীরে। উইলিয়াম এ্যাডাম বাঙালার শিক্ষাব্যবস্থার ওপর যে রিপোর্ট লেখেন ১৮৩৫-এ, তাতে দেখা যায় প্রদেশের কোথাও মেয়েদের জন্য বিদ্যালয় নেই। শিক্ষাকে তখন কেবল অপ্রয়োজনীয় নয়, অন্যায়ও মনে করা হতো। ১৯০৬-এর একটি প্রতিবেদনে প্রকাশ— বিদ্যালয়ে যাবার উপযুক্ত মেয়েদের শতকরা মাত্র ২.৭ জন সেখানে যেতে পারছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কাজ শুরু করে ১৯২১ সালে, ছাত্র সংখ্যা ছিল ৮৮৭ জন, ছাত্রী সংখ্যা ১। ১৯৪৬-৪৭-এ এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ১০০; ১৯৪৭-৪৮-এ নেমে যায় ৭২-এ। ১৯৩৩-এর আগে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো সার্বক্ষণিক শিক্ষিকা ছিলেন না। বার্ষিক সমাবর্তনে ১৯২৬ পর্যন্ত কোনো মহিলা উপস্থিত হননি। এখন সব স্তরেই ছাত্রী সংখ্যা বেড়েছে, মেয়েরা ভালো করছে, কিন্তু তাদের কর্মক্ষেত্র এখনও সঙ্কীর্ণ, চলাফেরা বিপদসঙ্কুল। সব মিলিয়ে সত্য এই যে, সমাজ মনুষ্য বসবাসের অনুপযুক্ত হয়ে পড়েছে। একে মানবিক করতে হলে বৈষম্য দূর করা চাই, যেমন ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য তেমনি পুরুষ-নারীর বৈষম্য। সে কাজ করবার সময় নারীত্বের আদর্শ সম্পর্কে অনুশাসনের উৎপীড়নকে যেন না ভুলি। এই আদর্শবাদের তৎপরতা অত্যন্ত ক্ষতিকর। এরই উৎপীড়নে এককালে সতীদাহে দগ্ধ বিধবাদের কেউ কেউ মনে করতে বাধ্য হতো যে, তারা আগুনে পুড়েছে না, বরঞ্চ স্বর্গে আরোহণ করছে। ইতিহাস, ঐতিহ্য, ধর্ম, রাষ্ট্র, সমাজ সবাই মেয়েদের বিপক্ষে কাজ করেছে, এই বিরূপতায় পরিবর্তন আনতে ব্যাপক ও মৌলিক পরিবর্তনের প্রয়োজন হবে। সমাজ কাঠামোতে যেমন, তেমনি আদর্শিক ধ্যান-ধারণায়। আগে পরে নয়, এক সঙ্গেই।



পাবনা প্রেসক্লাব ও আমি

রণেশ মৈত্র

আজ থেকে ঠিক ৬৫ বছর আগে পাবনা প্রেসক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয়। সে এক ঐতিহাসিক লগ্নো। তখন পাকিস্তানের প্রথম সামরিক শাসক জেনারেল আইয়ুব খানের কঠিন রাজত্ব চলছে। তখন ১৯৬০ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বরে পাকিস্তান সরকার কর্মরত সাংবাদিকদের বেতন বোর্ডের প্রথম রোয়েদাদ প্রকাশ করেছিল। তা সব পত্রিকায়ই যথেষ্ট গুরুত্বসহকারে প্রকাশ করেছিল। ওই রোয়েদাদে দেখি জেলা সংবাদদাতাদের জন্য রিটেইনার অ্যালাউন্স ও লাইনেজ বাবদ যৎকিঞ্চিৎ অর্থ মালিকরা দেবেন এমন ব্যবস্থা লিখিত আছে। এ রোয়েদাদে ঢাকায় বা সংবাদগুলোর প্রকাশনা কেন্দ্রে কর্মরত সাংবাদিকদের জন্য বেতন-ভাতাদির ব্যবস্থা হয়েছিল। এটি অবশ্য আইয়ুব সরকারের দয়ার দান ছিল না। পিএফইউজে অর্থাৎ পাকিস্তান ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের

দীর্ঘদিনের আন্দোলনের ফসল, যাকে সাংবাদিকরা তাদের আন্দোলনের উল্লেখযোগ্য বিজয় হিসেবেই দেখতেন।

পাবনায় তখন আমরা মাত্র দুজন সাংবাদিকতা করি। একজন প্রয়াত একেএম আজিজুল হক আর দ্বিতীয় জন আমি। এ দুজন বসে স্থির করলাম আমরা রাজশাহী ও খুলনা বিভাগীয়, মফস্বল সাংবাদিকদের একটি সম্মেলন করে সরকারের ও পত্রিকা মালিকদের ওপর চাপ প্রয়োগ করব, যাতে সাংবাদিকরা যারা জেলাগুলোতে কর্মরত তারাও রোয়েদাদে বর্ণিত বেতন-ভাতাদি পান। এ ব্যাপারে সম্মিলিত চাপ প্রয়োগ করে যাতে সরকার ও মালিকদের সম্মত করানো যায় তার উদ্যোগ হিসেবে ওই সম্মেলন আহ্বানের সিদ্ধান্ত দুজন মিলে নিয়েই তৎকালীন সংবাদপত্রগুলোতে তা পাঠানো হয়। পাবনাকেই সম্মেলনের স্থান

হিসেবে মনে মনে স্থির করে থাকলেও স্থান ও দিন-তারিখ নির্ধারণের জন্য দুটি বিভাগের নেতৃস্থানীয় সাংবাদিকদের বৈঠক আহ্বান করা হয়। যথারীতি খবরটি সব পত্রিকায়ই গুরুত্বসহকারে প্রকাশিত হয়।

আহ্বান অনুযায়ী দিনাজপুর ছাড়া রাজশাহী ও খুলনা বিভাগের সব জেলার প্রায় জনত্রিশেক সাংবাদিক সমবেত হন। দিনব্যাপী আলোচনার পর প্রস্তাবিত রাজশাহী-খুলনা বিভাগীয় সম্মেলনের স্থান হিসেবে পাবনা শহর এবং দিন-তারিখও নির্ধারণ করে তা ঢাকাস্থ ও পাবনাস্থ সব পত্রিকায় বড় বড় শিরোনামে প্রকাশিত হয়।

ইতোমধ্যে রংপুরের পাকিস্তান অবজারভার প্রতিনিধি প্রয়াত আবু সাদেক ছিলেন ঢাকায়। ওই বছরে ইংল্যান্ডের রানী ঢাকা সফরে আসেন। আবু সাদেক সে উপলক্ষে রানীর দর্শনের লক্ষ্যে ঢাকায় অবস্থান করছিলেন। যেদিন রাজশাহী-খুলনা বিভাগীয় মফস্বল সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠানের দিন-তারিখ সংবলিত খবরটি প্রকাশিত হয় সেদিন সকালে তিনি ঢাকা প্রেসক্লাবে চা-নাশতা খাওয়ার সুবাদে সংবাদগুলো পড়ছিলেন। খবরটি নিয়ে তিনি... ইউনিয়ন ও পাকিস্তান ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করে তিনি উভয় ইউনিয়নের নেতাদের কাছে ওই সম্মেলনে প্রতিনিধি পাঠানোর আমন্ত্রণ জানান। এসব বৈঠক বা আলাপ-আলোচনার জন্য তো একটি নির্দিষ্ট স্থান বা প্রেসক্লাবের প্রয়োজন হয়। অন্য কোথাও অর্থাৎ সুবিধাজনক কোনো স্থানে অফিসঘর ভাড়া না পাওয়ায় আজিজুল হক সাহেবের শহরের প্রধান সড়ক আবদুল হামিদ রোডে অবস্থিত তার বাসভবনের বৈঠকখানায় অস্থায়ী প্রেসক্লাব প্রতিষ্ঠা করা হয়। পরবর্তী কয়েক বছর ওখানেই চলে ক্লাবের কাজকর্ম।

কিন্তু সবই তো রয়ে গেছে সিদ্ধান্তের পর্যায়ে অথচ সাংবাদিক আমরা মাত্র দুজন। তার মধ্যে আজিজুল হক সাহেব তখন এডরক ল্যাবরেটরিতে অফিসপ্রধান হিসেবে চাকরি করায় সারা দিন তিনি আদৌ সময় পেতেন না। ফলে আমি একাকী দিনরাত কাজ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়তাম। আমার স্থির করেছিলাম ৭-৮ মেরে সম্মেলন অনুষ্ঠানের।

হঠাৎ একদিন সরাসরি ঢাকা থেকে রংপুরের আবু সাদেক পাবনা এসে হাজির। আমি তখন পাবনা বস্ত্র ব্যবসায়ী সমিতির কার্যালয়ে অফিস সুপারিনটেনডেন্ট হিসেবে কর্মরত। আবু সাদেক তার ব্রিফকেস নিয়ে এলেন, সেখানে কোনো পরিচয় ছিল না। নিজ উদ্যোগেই তিনি পরিচয়পর্ব সমাপ্ত করে সরাসরি বলে বসলেন, ‘ঢাকা থেকে ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের ও পূর্ব পাকিস্তান সাংবাদিক ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। আপনারা যে পাবনায় বিভাগীয় সাংবাদিক সম্মেলন আহ্বান করেছেন তার প্রতি সমর্থন জানিয়ে আগ্রহের সঙ্গে ওই নেতাদের প্রতিনিধি ওই সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসেবে যোগদানের আমন্ত্রণ জানাতেই তারা বললেন বিভাগীয় সম্মেলনটা হবে সম্পূর্ণ নিরর্থক। আপনি সরাসরি পাবনা চলে যান। ওটাকে প্রাদেশিক মফস্বল সাংবাদিক সম্মেলন করতে হবে, সেখানে একটি সংগঠনও গড়তে হবে। নতুবা যে উদ্দেশ্যে

সম্মেলনটি আহ্বান করা হয়েছে তা সম্পূর্ণ নিরর্থক হবে। তাই বিষয়টিতে আপনাকে রাজি হতেই হবে।’

আমার তো মাথায় বাজ পড়ল বলে মনে হলো। বললাম, আমরা মাত্র দুজন লোক এখানে সাংবাদিকতা করি। তদুপরি প্রাদেশিক সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠানের মতো বড় হলঘর, প্রতিনিধিদের থাকার ব্যবস্থা, অর্থের কোনো উৎস বা ভালো কোনো আবাসিক বা খাবারের হোটেলও নেই। এ অবস্থায় কী করে অত বড় একটা দায়িত্ব কাঁধে নেয়া যায়। বললাম এটা অসম্ভব। বরং আপনি হয় ঢাকায় নয় তো রংপুরে অনুষ্ঠানের দায়িত্ব নিন। যা হোক, আবু সাদেকও নাছোড়বান্দা। বলে বসলেন, ‘এখানে তো করতেই হবে-তদুপরি প্রধান... সরকারের শ্রমমন্ত্রী জেনারেল বুরকিকে প্রত্নতি কমিটির প্রধান অতিথি হিসেবে আনতে হবে কারণ কর্মরত সাংবাদিকদের জন্য যে প্রথম বেতন বোর্ড রোয়েদাদ প্রকাশিত হয়েছে তা ওই শ্রম মন্ত্রণালয় থেকেই।’

বললাম, সাদেক ভাই, আমি রাজি হতে পারি যদি আজিজুল হক এতে সম্মতি দেন। আর সে প্রতিনিধি বিভাগীয় সম্মেলন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্তটি নেয়া হয়েছিল সেখানে জেলা প্রতিনিধিদের সম্মতি ছাড়া তো তা পরিবর্তন একতরফাভাবে করা যায় না। আজিজুল হক সাহেব সম্মতি দিলেও তাদের অভিমত অনুরূপ বৈঠক করে তা বদলানো সম্ভব। সাদেক তা সঠিক মনে করলেন। অতঃপর বললেন, আমি একটি হোটেলে উঠে দুপুরের খাবার খেয়ে বিশ্রাম নিয়ে উভয়ে মিলে সন্ধ্যায় আজিজুল হক সাহেবকে রাজি করাতে তার বাসায় যাব।

সন্ধ্যায় উভয়ে মিলিত হয়ে গেলাম হক সাহেবের বাসায়। তিনি সদ্য অফিসফেরত। তার ঘোর অসম্মতি। তিনিও আমার মতো অনুরূপ সমস্যার কথা বলে ব্যভিতি যা বললেন, তা হলো তিনি তো কাজ করতে পারবেন না সময়ভাবে। একা রণেশ বাবু কী করে একটি প্রাদেশিক সম্মেলনের দায়িত্ব নেবেন? কোনো রাজনৈতিক দলও তো পাবনায় প্রাদেশিক সম্মেলন অনুষ্ঠানের দায়িত্ব নেয়নি এযাবৎ। এভাবে আবু সাহেবের সঙ্গে পরপর বহু যুক্তিতর্ক এলো। তার বক্তব্য ছিল, বিভাগীয় সম্মেলনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাতে তো ফলোদয় হবে না। তাই তো দুটি ফেডারেশনের নেতারা এত করে সবটা বুঝিয়ে বলে আমাদের সম্মত করতে সক্ষম হন এবং বলেন আপনারা দুজন সাংবাদিক থাকায় এ কাজ কোনো না কোনোভাবে প্রাদেশিক সম্মেলন করতে পারবেন—সবাই আমরা ও ইউনিয়ন নেতারাও সহযোগিতা করব। কিন্তু হক সাহেব তারপরও ভরসা পান না, রাজিও হন না। এ পরিস্থিতিতে ওই দিনের মতো ক্ষান্ত দিতে হলো। অতঃপর আবু সাহেব পুনরায় হোটেলে ফিরে গেলেন আর বলে গেলেন দাদা, আমি প্রয়োজনে দু-চার দিন আরো থেকে যাব তবু কাজটা সমাধান করে ইতিবাচক সিদ্ধান্ত নিয়েই হয় রংপুর নয় তো ঢাকা ফিরব।

রাত হয়ে আসায় বাসায় ফিরে রাতভর চিন্তা করেও ঠিক করে উঠতে পারছিলাম না কী করা যায়। পরদিন সকালে আবার আবু সাদেক এসে হাজির। বললেন, দাদা রাতে তো নিশ্চয়

ভেবেছেন কী স্থির করলেন? বললাম হক সাহেব তো বৈঠক কথা বলেননি। সমস্যা বিস্তারিত তাই সাহস করে হ্যাঁ বলতে পারছি না। আবার শেষ পর্যন্ত হক সাহেবও সম্মত হবেন এমন ভরসাও পাচ্ছি না। যা হোক, তিন-চার দিন ধরে বিস্তারিত আলোচনা করে তিনজন মিলে চালানোর পর ঝুঁকিটা নিতেই হলো উদ্দেশ্যের এবং লক্ষ্যের জরুরি গুরুত্ব উপলব্ধি করে। হক সাহেবের শেষ কথা, ‘আমি তো কিছু করতে পারব না। রণেশ বাবু রাজি হলে আমার সম্মতিটুকু থাকবে শুধু।’ ভরসা পেয়ে বৃহত্তর আকারে... দিন-তারিখ স্থির করে আবু সাদেক চলে গেলেন। শুধু বলে গেলেন, ‘দাদা, আপনাকে দেখেই ফেডারেশন নেতৃবৃন্দ পাবনায় ভেন্যু করার কথা বলেছেন। নইলে আদৌ কিছু এমন সম্মেলনের কথা কেউ ভাবত না। তাই বিশাল এক ভরসা রইল আপনার ওপর।’ এই বলে বিদায় হলেন আবু সাদেক।

এবারে কী করা যায়? তারিখ অনুযায়ী প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদানের আমন্ত্রণ জানিয়ে হক সাহেবের নামে (সংবর্ধনা কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে) করাচিতে টেলিগ্রাম পাঠানো হলো। তার আগে প্রাদেশিক সম্মেলন আহ্বানের সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য প্রত্নতি কমিটি গঠন ও সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি আলোচনার জন্য প্রাদেশিক পর্যায়ের বৈঠক ডাকা হলো মফস্বল সাংবাদিকদের। অনেক জেলা থেকেই এলেন। তারা একযোগে প্রাদেশিক সম্মেলন পাবনায় অনুষ্ঠানের প্রস্তাব ও দিন-তারিখ অনুমোদন দিয়ে একে আজিজুল হককে সভাপতি এবং আমাকে সাধারণ সম্পাদক ও দপ্তর সম্পাদক করে স্থানীয় বিশিষ্টজনদের ও দেশব্যাপী কিছুসংখ্যক সাংবাদিককে সদস্য করে ১০১ সদস্যবিশিষ্ট একটি প্রত্নতি কমিটি গঠন করে গেলেন। কয়েকজনকে পরে প্রয়োজনমতো কো-অপ্ট করার সুযোগ রাখতে ২১টি জায়গা খালি রাখা হলো। এদের ১৫ জন হবেন পাবনার, বাকিরা নানা জেলার প্রধান সাংবাদিক ও অন্যান্যরা।

একটি পর্যায় শেষ হলো। বৈঠকস্থল পাবনা প্রেসক্লাব অর্থাৎ আজিজুল হক সাহেবের বৈঠকখানা। অতঃপর সবেধন নীলমণি এ দুই সাংবাদিক বসলাম স্ত্রাবিক ও বিস্তারিতভাবে সম্ভাব্য পরিকল্পনা অন্তত খসড়াভাবে স্থির করার জন্য। সিদ্ধান্ত নিলাম ১. দ্রুত ‘পূর্ব পাকিস্তান মফস্বল সাংবাদিক সম্মেলন প্রত্নতি কমিটি’ নামে বাংলায় ও ইংরেজিতে সম্ভাব্য সুন্দর টাইপে অত্যন্ত ভালো কাগজে কিছু প্যাড টাইপ করা। ২. অবিলম্বে কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রী ডব্লিউ বুরকির কাছে প্রস্তাবিত তারিখে পাবনা এসে ওই সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদানের আমন্ত্রণ জানানো। জরুরি তারবার্তা পাঠানো। ৩. প্যাড ছাপা-বাঁধাই হয়ে আসামাত্র ওই মন্ত্রী মহোদয়কে একই অনুরোধ জানিয়ে তারবার্তার অনুলিপি সহ রেজিস্ট্রার ডাকযোগে চিঠি পাঠানো। ৪. খসড়া প্রস্তাবগুলো অনুমোদনের জন্য জরুরি ভিত্তিতে পাবনাস্থ প্রত্নতি কমিটির সভা আহ্বান করা। ৫. সংবাদপত্র অফিসগুলোর সম্পাদক এবং বার্তা সম্পাদকদের ওই সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসেবে যোগদানের আমন্ত্রণ জানিয়ে ডাকযোগে পত্র প্রেরণ। ৬. সব পত্রিকার বার্তা সম্পাদককে পূর্ব পাকিস্তানের সব

জেলার সংবাদদাতাদের নাম ও ডাক ঠিকানা প্রত্নতি কমিটির চেয়ারম্যান বরাবর পাঠানো এবং সম্মেলনের স্থান নির্ধারণ। ৭. ডেলিগেটদের থাকার স্থান নির্ধারণ ও ৮. অর্থের সম্ভাব্য উৎস অনুসন্ধান করে তাদের কাছে চিঠি পাঠানো।

ওই সিদ্ধান্ত গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই প্রথমে প্রধান অতিথি শ্রমমন্ত্রীকে টেলিগ্রাম পাঠানোর মধ্য দিয়ে প্রত্নতি কমিটির পাবনাস্থ সদস্যদের জরুরি বৈঠক আহ্বান করা হয়। ওই বৈঠকে খসড়া প্রস্তাবগুলো পেশ করলে তার সবকটি সর্বসম্মত অনুমোদনক্রমে গৃহীত হয়। অতঃপর প্যাড ছাপতে দিয়ে তা তিন দিন পর পাওয়া গেল। শ্রমমন্ত্রী, সব পত্রিকার সম্পাদক ও বার্তা সম্পাদককে বিশেষ অতিথি হিসেবে এবং বার্তা সম্পাদকদের প্রদেশব্যাপী নিজ নিজ পত্রিকার সব জেলার সংবাদদাতাদের নাম ও পূর্ণাঙ্গ ডাক ঠিকানা পাঠানোর অনুরোধ জানিয়ে চিঠি পাঠানো হয়। সব কাজ অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে করা হয়। ইতোমধ্যে শ্রমমন্ত্রী মহোদয়কে পাঠানো টেলিগ্রামের জবাব তারবার্তা পাওয়া গেল। তিনি সানন্দে প্রস্তাবটি গ্রহণ করে এই মহতী উদ্যোগ গ্রহণের জন্য প্রত্নতি কমিটিকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। সম্মতি দিয়েছেন নির্ধারিত তারিখকেও, যা তাকে জরুরি টেলিগ্রামে জানানো হয়েছিল।

এবারে প্রত্নতি কমিটির আবারো একটি জরুরি সভায় সিদ্ধান্ত নেয়া হলো অতিশয় দ্রুততার সঙ্গে পাবনার বনমালী ইন্সটিটিউট অডিটোরিয়ামটি দুই দিনের জন্য ভাড়া নেয়া, সব সাংবাদিকের কাছে গোটা প্রদেশে প্রাশ্ত নামের তালিকা অনুযায়ী সম্মেলনে যোগদানের আমন্ত্রণলিপি জানানো, ডেলিগেটদের থাকার স্থান হিসেবে শহরের স্কুলগুলোর অনুমতি চেয়ে হলের নিকটবর্তী এবং বাথরুম সুবিধাদিসংবলিত গোটাদেশক রুম বরাদ্দ ও অর্থের কোনো উৎসের নির্দিষ্ট কারো স্থির করা ও প্রত্নতি কমিটির সদস্যদের প্রত্যেকের সবার জন্য বাধ্যতামূলক ন্যূনতম এককালীন চাঁদা হিসেবে ১০ টাকা নির্ধারণ প্রভৃতি।

প্রধান অতিথি থাকার জন্য তো সার্কিট হাউস নির্ধারণ করার জন্য তদানীন্তন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কাজী জালাল উদ্দিন আহমেদকে চিঠি দেয়া হলো। হলের জন্য এবং ডেলিগেটদের থাকার সম্ভাব্য স্থান হিসেবে পাবনা জিলা স্কুল এবং বর্তমান সেন্ট্রাল গার্লস স্কুলের প্রধানদের আনুষ্ঠানিক চিঠি পাঠানো হয়। দরখাস্ত নিয়ে যেতেই পাবনার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আমাদের স্বাগত জানিয়ে বসতে অনুরোধ জানালেন এবং বললেন, আপনাদের মাননীয় শ্রমমন্ত্রীর কাছে পাঠানো তারবার্তা এবং আপনাদের কাছে তার পাঠানো টেলিগ্রাম অনুলিপি তিনি তাকে এবং পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর শ্রমমন্ত্রীকে ও রাজশাহী বিভাগীয় কমিশনারকে কয়েক দিন আগেই পাঠিয়েছেন। সুতরাং আপনাদের প্রার্থিত মতো সার্কিট হাউসের ভিআইপি কক্ষ মাননীয় শ্রমমন্ত্রীর জন্য বরাদ্দ করা হলো।

আমরা সন্তোষজনক জানাতেই তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এত বড় একটা সম্মেলন করবেন পাবনায় তো কোনো ধনী ব্যক্তি নেই টাকা-পয়সা জোগাড় করলেন কোথেকে? উত্তরে তাত্ক্ষণিকভাবে বললাম, কোনো উৎসের সন্ধান পাইনি তাই প্রত্নতি

কমিটির সব সদস্যের ন্যূনতম এককালীন চাঁদা ১০ টাকা হারে ধরেছি। আপনি কি আপনার ঐচ্ছিক তহবিল থেকে কিছু বরাদ্দ করতে পারবেন? বললেন, নিশ্চয়ই আমার সর্বোচ্চ ক্যাপাসিটি হিসেবে এক হাজার টাকার চেক এফুনি নিয়ে যান। কিন্তু তাতে কি হবে? কমিটির সদস্যরা যা দেবেন তাতে তো সর্বোচ্চ ২০০ বা ৩০০ টাকা উঠতে পারে ওটা তো আপনাদের আনুষ্ঠানিক ব্যয়ে ফুরিয়ে গিয়ে আরো দরকার হবে। তদুপরি, আর কোথায় পাবেন? বললাম, ভাবছি জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও পৌরসভার চেয়ারম্যানদ্বয়কে তাদের সর্বোচ্চ সাধ্যমতো আর্থিক ও সর্বাঙ্গিক সহযোগিতা চাইব। তিনি বলেন, তাতে সর্বোচ্চ শ পাঁচেক টাকা হয়তো পেতে পারেন। আরো তো কমপক্ষে ১০ হাজার টাকা চাই। তা কীভাবে সংগ্রহ করবেন? আমরা মাথা চুলকাতে থাকলে তিনি বললেন, বিশেষ আতিথ্য গ্রহণে সম্মতি জানিয়ে আপনাদের যে চিঠি দিয়েছেন তার অনুলিপিও পেলাম। তাদের এবং প্রধান অতিথির থাকা-খাওয়া প্রত্যেকের পৃথক ট্রান্সপোর্টের দায়িত্বও আমি নিলাম। বাকিটা ফিরে গিয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিন। অন্যদিকে সাংবাদিক তো আপনারা দুজন মাত্র। কর্মী কোথায় পাবেন তাও নির্ধারণ করুন। ডেলিগেটদের থাকার স্থানই বা কোথায় করবেন তাও নির্ধারণ করেন। তিন দিন পর আবার আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করুন।

তখন ফিরে এসে বন্ধুবর আনোয়ারুল হককে বললাম, তুমি কি দৈনিক ইত্তেফাকের পাবনাস্থ রিপোর্টার হতে চাও? আনোয়ার রাজি হলেন। তখন হক সাহেবকে বললাম, আপনি তো অনেক পত্রিকার রিপোর্টার। ইত্তেফাকটা ছেড়ে দিন আমার এক বাল্যবন্ধুকে। দিলে সাংবাদিকের সংখ্যা একজন তো বাড়ানো যায়। তিনি রাজি হলেন—তবে শেষ পর্যন্ত তা নির্ভর করবে ওই পত্রিকার বার্তা সম্পাদক সিরাজ উদ্দিন হোসেনের ওপর। তাকে ফোন করে জিজ্ঞেস করলাম আপনি কি রাজি আছেন আমার এক বন্ধুকে পাবনার রিপোর্টার হিসেবে নিয়োগপত্র দিতে? তিনি বললেন, নিশ্চয়ই পারি তবে যিনি কাজ করছেন তিনি যদি নিজ মুখে আমাকে জানান যে তিনি পত্রিকাটি ছাড়তে রাজি আছেন, তবে দিতে পারব। হক সাহেবকে রিসিভারটা দিয়ে বললাম, সিরাজ ভাই তো রাজি তবে আপনিও তাকে ছেড়ে দিতে রাজি আছেন—সেই কথাটি সিরাজ ভাইকে জানান, ফোনটা ধরুন উনি ধরে আছেন। হক সাহেব ফোন নিয়ে তার সম্মতি জানালে, তখন সিরাজ ভাই জিজ্ঞেস করলেন, আনোয়ার সাহেব হাতের কাছে থাকলে তাকে দিন। আনোয়ার ফোন ধরলে উনি তার মতামত জানতে চাইলে আনোয়ার তার সম্মতি জানালে সিরাজ ভাই বললেন, আপনি খবর পাঠাতে থাকুন, ভালো হলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নিয়োগপত্র পাঠাব। এভাবে একজন বেড়ে আমরা তিনজনে দাঁড়ালাম। আজো আনোয়ারুল হক ওই একই পত্রিকায় আছেন দীর্ঘ দিন যাবৎ। তখনকার মতো আর সাংবাদিকের সংখ্যা বাড়ানো সম্ভব হলো না।

ইতোমধ্যে অন্য কাউকে না জানিয়ে আমি সম্মেলনের জন্য ডোনেশন চেয়ে কুষ্টিয়ার মোহিনী মিল থেকে শুরু করে যতগুলো কলকারখানা সারা প্রদেশে আছে সেগুলোর ম্যানেজিং

ডিরেক্টর/জেনারেল ম্যানেজারদের কাছে ডাকযোগে চিঠি পাঠালাম সম্মেলনের জন্য সর্বোচ্চ পরিমাণে সম্ভব ডোনেশন পাঠাতে। দুই সপ্তাহের মধ্যেই কেউ ২৫০ কেউ বা ৫০০ টাকার চেক পাঠালেন। এ ছাড়া পৌরসভার চেয়ারম্যান বললেন, তিনি এক বেলা খাওয়ার দায়িত্ব নিলেন ডেলিগেটদের জন্য নগদ টাকা দেবেন না। আর জেলা পরিষদ চেয়ারম্যানও ৫০০ টাকার চেক দিলেন। এই ভাঙিয়ে সাবুল্যে হাজার পাঁচেক টাকা দাঁড়াল সম্মেলনের তহবিল। চারজন প্রতিকা সম্পাদক সার্কিট হাউসে নয় কোনো প্রাইভেট হোটেল বা রেস্ট হাউসে থাকতে চাইলে জেলা পরিষদ তাদের রেস্ট হাউসের চারটি রুম তাদের জন্য অর্থাৎ পাকিস্তান অবজারভার সম্পাদক আবদুস সালাম, ইত্তেফাক সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া ও সংবাদ সম্পাদক জহুর হোসেন চৌধুরী ও মর্নিং নিউজ সম্পাদক এসজিএম বদরুদ্দিন। ইতোমধ্যে সাংবাদিক ইউনিয়ন নেতাদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল যেমন ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের এবিএম মুসা, সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি সালাউদ্দিন আহমেদ। তারা সবাই সম্মতও হয়েছিলেন। বিভিন্ন সাব-কমিটিও গঠিত হয়েছিল, তারাও উৎসাহেব সঙ্গে কাজ করছিলেন। হঠাৎ একটা টেলিগ্রাম এসে হাজির। প্রধান অতিথি পাকিস্তানের শ্রমমন্ত্রী ডব্লিউ বুরকিকে বিদেশে যেতে হওয়ায় তিনি আসতে অক্ষমতা জানিয়ে লিখেছেন। দ্রুত বসতে হলো প্রত্নতি কমিটিকে, নতুন কোনো প্রধান অতিথিকে আমন্ত্রণ জানাতে। কারণ তারিখ এগিয়ে আসছে। সিদ্ধান্ত নিয়ে টেলিগ্রাম পাঠানো হলো পাকিস্তানের শিক্ষামন্ত্রী হাবিবুর রহমানকে। তিনি সম্মতি জানালেন সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু তারিখ জানালেন ৩০ এপ্রিল ও ১ মে এবং এক দিন করতে হবে, তার বেশি নয়। তিনি থাকতে পারবেন না। আমরা তাতেই রাজি হলাম। কিছুটা সময়ও পাওয়া গেল।

ইতোমধ্যে প্রস্তাবিত সংগঠনের নাম, তার গঠনতন্ত্র, প্রস্তাবাদির খসড়া প্রণয়নের কাজও হাতে নেয়া হলো; যা অনুমোদনের জন্য সম্মেলনে পেশ করতে হবে। স্থির হলো, সম্মেলন দুই দিনই হবে তবে প্রধান অতিথি শুধু উদ্বোধনী অধিবেশনে থাকবেন এবং অতঃপর তার বাড়ি বগুড়ায় চলে যাবেন। মধ্যাহ্নভোজের বিরতির পর প্রতিনিধি সম্মেলন হবে বিকাল থেকে একটি এবং পরদিন ১ মে অন্যটি। এতে গঠনতন্ত্র, প্রস্তাবাদি অনুমোদন করে সংগঠনের নতুন কমিটি নির্বাচন করে সম্মেলনের সমাপ্তি ঘোষণার কর্মসূচিও গৃহীত হলো।

ঠিক সম্মেলনের চার দিন কি তিন দিন আগে পূর্ব পাকিস্তান সাংবাদিক ইউনিয়নের তদানীন্তন সভাপতি সালাউদ্দিন মোহাম্মদ হঠাৎ এসে হাজির। তিনি জানালেন, ফেডারেশন ইউনিয়ন নেতা কেজি মুস্তফা ও আনোয়ার জাহিদকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে, তাই এবিএম মুসা এবং ইত্তেফাক ও সংবাদ সম্পাদক আসবেন না। কারণ তারা আকট নেতাদের মুক্তি এবং তাদের পরিবারগুলোর দেখাশোনার কাজে ব্যস্ত। তবে দুজন সম্পাদকই সম্মেলনের সাফল্য কান্না করে তারবার্তা পাঠাবেন বলে তিনি জোরেশোরে প্রত্নতি চালাতে বলে সৈয়দপুরে এক জরুরি কাজে চলে গেলেন,

আসবেন সম্মেলনের আগের দিন। এভাবে নানা উঠতি-পড়তি, আশা-নিরাশা, অনুকূল-প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবেলা করে সম্মেলনের তারিখ এসে গেল। আগের দিন রাতেই প্রধান অতিথি এবং সম্পাদক দুজন অবজারভারের আবদুস সালাম ও মর্নিং নিউজের এসজিএম বদরুদ্দিন এসে উপস্থিত হওয়ায় স্বস্তি পাওয়া গেল। জনা চল্লিশেক ডেলিগেটও নানা জেলা থেকে এসে পৌঁছে গেলেন। বাকি আরো দু-চার জন করে আসতে আসতে সম্মেলন শুরুর পরপরই এসে পৌঁছালেন সাবুল্যে ৭০-৮০ জন সাংবাদিক।

যথাসময়ে প্রধান অতিথিসহ অন্য অতিথিরা এলেন। এলেন বিশেষ অতিথি দুজন সম্পাদক ও পূর্ব পাকিস্তান সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি একেএম আজিজুল হক যিনি গোটা সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। তারা মঞ্চে উঠে গিয়ে বসলেন। আমাদেরও প্রত্নতি কমিটির সাধারণ সম্পাদক হিসেবে ওখানেই আসন নিতে হলো। এটা ছিল উদ্বোধনী অধিবেশন।

সেখানে প্রথমে আমি সমাগত প্রতিনিধি, ডেলিগেট ও সুধীজনদের সম্বোধন করে সব অতিথিকে পরিচয় করিয়ে দিলাম। অতঃপর স্বাগত ভাষণ দিলেন ইপিইউজে সভাপতি সালাউদ্দিন মোহাম্মদ। তিনি তার আগুনঝরা দীর্ঘ ভাষণে প্রথমেই দাবি তুললেন কেজি মুস্তফাসহ আর সব সাংবাদিক ও রাজনৈতিক বন্দিকে আশু বিনা শর্তে মুক্তি, সামরিক আইন প্রত্যাহার, দেশে সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান, কর্মরত সাংবাদিকদের সদ্য ঘোষিত প্রথম বেতন বোর্ড রোয়েদাদ সব প্রতিকায় অবিলম্বে কার্যকর করুন এবং মফস্বলে কর্মরত সব সাংবাদিককে কর্মরত সাংবাদিক হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান। এ ভাষণে উপস্থিত সাংবাদিক ও সুধীজনেরা বিপুল করতালি দিয়ে তাকে অভিনন্দন জানান। বিশেষ অতিথি যথা উভয় সম্পাদক তাদের ভাষণে যত শিগগির সম্ভব বেতন বোর্ড রোয়েদাদ তার নিজ নিজ পত্রিকায় কার্যকরের প্রতিশ্রুতি দেন।

অবশেষে প্রধান অতিথি কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী হাবিবুর রহমান বলেন, সাংবাদিকদের গ্রেপ্তারের বিষয় তাদের...। তবে ঢাকায় ফিরে গিয়ে তিনি গভর্নর মোনোয়েম খানের সঙ্গে আলাপ করে সম্ভব হলে তাদের মুক্তির ব্যবস্থা করতে চেষ্টা করবেন। আর মফস্বল সাংবাদিকদের বা ওয়েজবোর্ড সম্পর্কে বিস্তারিত জানার পর করাচি ফিরে গিয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর সঙ্গেও কথা বলবেন। সামরিক আইন প্রত্যাহার ও সাধারণ নির্বাচনের বিষয় রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভরশীল। তবে যথাসময়ে তা করা হবে বলে তিনি বিশ্বাস করেন। অতঃপর সভাপতি একেএম আজিজুল হকের সংক্ষিপ্ত ভাষণের পর উদ্বোধনী অধিবেশন সমাপ্ত হয়।

সন্ধ্যায় শুধু আগত সাংবাদিক প্রতিনিধিদের সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে প্রথম প্রস্তাব উত্থাপন করা হয় কোনো মফস্বল সাংবাদিকদের প্রতিষ্ঠান গঠন করা হবে কিনা। এর পক্ষেই সবাই ভাষণ দিলে সবাইকে জানানো হয় যে একটি খসড়া গঠনতন্ত্র তৈরি করা আছে যার কপি সবাইকে সরবরাহ করে পড়ে শোনালাম। শুনিয়ে এ খসড়া বিবেচনা

করতে সবাইকে আহ্বান জানিয়ে একটি সাবজেক্টস কমিটিও গঠন করা হয়, যারা রাতে বসে আলোচনা করে প্রয়োজনীয় সংশোধনীর প্রস্তাব রচনা করে পরদিন অনুষ্ঠেয় দ্বিতীয় প্রতিনিধি সম্মেলন করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ওই অধিবেশনেরও সভাপতি ঘোষণা করা হয়। পরদিন অর্থাৎ ১ মে দ্বিতীয় অধিবেশন বসে সকাল ১০টায় একেএম আজিজুল হকের সভাপতিত্বে। আমি সাবজেক্টস কমিটিতে পূর্ববর্তী রাতে আলোচনার ভিত্তিতে প্রস্তাব গঠনতন্ত্রের সংশোধনীগুলো পেশ করলে তা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। পাস হয় পূর্ব পাকিস্তান সাংবাদিক সমিতির গঠনতন্ত্র।

অতঃপর নির্বাচন। তারও খসড়া ওই সাবজেক্টস কমিটিতে গৃহীত হয়েছিল এবং তা প্রস্তাব আকারে পেশ করেন আবু সাদেক, সমর্থন করেন রাজশাহীর একজন প্রতিনিধি। অতঃপর তাও বিপুল করতালিতে গৃহীত হয়। সভাপতি নির্বাচিত হন একেএম আজিজুল হক, সাধারণ সম্পাদক কুমিল্লার এম. উল্লাহ আর যুগ্ম সম্পাদক আমি স্বয়ং রণেশ মৈত্র ও শফি উদ্দিন আহমেদ। অন্য সদস্য ও কর্মকর্তাদের নাম স্মরণে আনা গেল না।

অতঃপর ধীরে ধীরে অবজারভার, মর্নিং নিউজ এবং ইত্তেফাকে বেতন বোর্ড রোয়েদাদের জেলা সংবাদদাতাসংক্রান্ত বিধানাবলি কার্যকর করা হয়। অতঃপর ১৯৭১ সালের মার্চে অসহযোগ আন্দোলনের সময় জরুরি বৈঠক করে সমিতির নাম পরিবর্তন করে 'বাংলাদেশ সাংবাদিক সমিতি' করা হয়। এ বৈঠকটিও হয় পাবনা প্রেসক্লাবে। উল্লেখ্য, সম্মেলনে সিদ্ধান্ত হয়েছিল ঢাকায় অফিসঘর না পাওয়া পর্যন্ত পাবনা প্রেসক্লাবই হবে অস্থায়ী কার্যালয়। পাবনা প্রেসক্লাবেই সব সভা অনুষ্ঠিত হতো।

মুক্তিযুদ্ধের পর দেশে এসে '৭২-এর প্রথম দিকেই জানা গেল কুমিল্লার বাশারতুল্লাহ রাজাকার হয়েছিলেন বলে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালেই মুক্তিযোদ্ধারা তাকে গুলি করে হত্যা করেন। আজিজুল হক হাটের গুরুতর আক্রমণে অকস্মাৎ পাবনা জেনারেল হাসপাতালে পাকিস্তান আমলেই মৃত্যুবরণ করেন।

যা হোক, মুক্তিযুদ্ধের পরে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় স্বাধীনতারিরোধী কাউকে কোনো কমিটিতে কর্মকর্তা নির্বাচন করা যাবে না, সমিতিতে বা প্রেসক্লাবগুলোতে।

যা হোক, পাবনা প্রেসক্লাব পাকিস্তান আমল থেকেই সাংবাদিক ও রাজবন্দিদের মুক্তি বা সাংবাদিক নির্যাতন বা সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণকারী যে কোনো আইনের বিরোধিতা করেছে। সামরিক আইন বাতিল ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ও বন্দি মুক্তিযোদ্ধা দিবস, ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবস ও ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবস পালন এবং সম্প্রতি পহেলা বৈশাখ নববর্ষ উদযাপন করা হয়। কিন্তু ধীরে ধীরে অতীতের ঐতিহ্যের অনেক কিছুই পাবনা প্রেসক্লাব হারিয়েছে। এখন এমনকি জামায়াত-বিএনপির সদস্য কর্মকর্তারাও পাবনা প্রেসক্লাবের কর্মকর্তা পদে আসছেন আমাদেরই (মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সদস্যদের অবহেলায়), নির্বাচিত হতে পারছেন; যা অনাকাঙ্ক্ষিত। তবুও স্বীকৃত যে পাবনার প্রেসক্লাব...।



প্রবন্ধ

স্বাভাবিকতায় ফেরা

আবদুল মতিন খান

পৃথিবীতে বাস করলেও পার্থিবত্ব এক সময় মানবজাতি পরিত্যাগ করে। করার কারণ হলো— হঠাৎ মৃত্যু, অকাল মৃত্যু। মৃত্যুর এ মিছিলের শুরু গর্ভাবস্থা থেকে। তারপর ভূমিষ্ঠ হওয়ামাত্র। তারপর সপ্তাহ পর। তারপর মাস পর। তারপর বছর পর। তারপর কয়েক বছর পর। ভাগ্য ভালো থাকলে দু-চারজনের পঞ্চাশ বছর পর। শতাব্দী কোটিকে গুটিক, তাও শতাব্দী পার করে নয়। মধ্য যুগ যাকে বলা হয় তার সূচনাতে সারা ভারতবর্ষে মানুষ ছিল মাত্র দশ কোটি। গত শতকের অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে বঙ্গদেশের (বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ মিলে) লোকসংখ্যা ছিল দুই কোটি। লোকসংখ্যা তখন নিয়ন্ত্রণ করতে পরিবার পরিকল্পনা নয়, মহামারী— প্রাধান্য কলো বসন্ত। গত শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত সচ্ছল, শিক্ষিত, ভদ্র পরিবারের সদস্য সংখ্যা, নির্দিষ্ট করে বললে সত্তান সংখ্যা ছিল বারো থেকে পনেরটি। এর সবকিছু শেষতক

কমই বাঁচত। জীবনের নশ্বরতা মানুষকে স্বেচ্ছায় ফেলত পরকালমুখী। মানুষের মধ্যে যারা ভাবুক এ দুর্বিষহ অবস্থা কাটাতে তারা উপসনা ও নির্মল জীবনযাপনের পরামর্শ দিতেন। তারা বলতেন, ক্ষণিকের এ পৃথিবী থেকে মানুষ অনন্ত আনন্দময় জীবনের নাগাল পেতে পারে যদি সেই জীবনের জন্য, যা মৃত্যুর পরে আসবে, তার সাধনা করে। ইহকাল নয়, মানুষের জন্য পরকাল একমাত্র বিবেচ্য। ইহকালের জীবন পদ্যপাতার ওপর জলবিন্দুর মতো। পরকালের জীবন অ-নিঃশেষ। ইহকালের জীবনের ক্ষণস্থায়িত্বের মধ্যেও মানুষ পরকাল ভাবনা সচেতনভাবে পাশ কাটিয়ে জীবন ভোগ-উপভোগ করতে চেয়েছে। পরকাল-বিচ্ছিন্ন নানা উৎসব ও হৈহুয়ো সৃষ্টির পাশাপাশি তারা মওকা বুঝে উপসনাকেন্দ্রিক পরকাল সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোর মধ্যেও উৎসব ও আনন্দভোগের উপাদান ঢুকিয়ে দিয়েছে।

ফলে ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলো পরিণত হয়েছে ধর্মীয় উৎসবে। ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলোর উৎসবে পরিণত হওয়া রাতারাতি হয়নি। উৎসব-আনন্দ করতে এবং উপভোগ করতে লাগে অবসর এবং অর্থ। এজন্য উৎসব-আনন্দ একসময় অর্থবান-অভিজাতদের মধ্যে আবদ্ধ ছিল। তারা তাদের গণ্ডি বা পরিমণ্ডলের বাইরে এসব করতেন না। পূণ্যার্জনের জন্য তারা উৎসবের সময় গরিবদের নগদ অর্থ ও নিম্নমানের পরিধেয় বিলাতেন। গরিবদের অবসর ও অর্থ কিছু থাকত না। তারা ধনবানের দানের অপেক্ষায় থাকত। তারা ভালো কিছু খাওয়া এবং কাপড়চোপড় দিলে খুশি হতো। কাড়াকাড়ি করে নিতে গিয়ে তাদের মৃত্যুও হতো।

মানুষের অবসর এবং আয় বাড়তে শুরু করে সামন্তবাদ শেষ হয়ে পুঁজিবাদ চালু হলে। পুঁজিবাদের সূচনায় কাজ করার লোকদের কাজের সময় ছিল চৌদ্দ থেকে আঠারো ঘণ্টা এবং মজুরিও ছিল যৎসামান্য। পুঁজিবাদ চালু হয়ে গেলে শ্রমিকের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলল। তারা তখন দিন শ্রমঘণ্টা কমাতে ও মজুরি বাড়াতে আন্দোলন শুরু করল। তাদের দমিয়ে রাখতে পুঁজিপতিরা রাষ্ট্রযন্ত্রের সহায়তায় তাদের মিছিল সমাবেশে গুলি চালিয়ে হত্যা করল। এতে পুঁজিপতিদের হিতে বিপরীত হলো। প্রাণ বিসর্জন দিয়ে শ্রমজীবীই বিজয়ী হলো। কাজের ঘণ্টা দিনে আট ঘণ্টা ও সপ্তাহে চল্লিশ ঘণ্টা ঠিক হলো। শ্রমিকরা সপ্তাহে দুদিন ছুটি কাটাতে পারল।

এই যে শ্রমঘণ্টা হ্রাস ও মজুরি বৃদ্ধি এর পেছনে রয়েছে টেকনোলজি বা কৃৎকৌশলের অভাবনীয় উন্নয়ন। হস্তাচলিতের জায়গায় জ্বালানিচালিত স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের সর্বত্র ব্যবহার। স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র জটিল হওয়ায় তার ব্যবহার প্রশিক্ষণের ওপর নির্ভরশীল। এসব যন্ত্র চালানো শিখলে ভালো মজুরি মেলে দেখে তরুণদের মধ্যে উদ্যমীরা লেখাপড়া শিখতে লাগল। সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে বেড়ে চলল টেকনিক্যাল শিক্ষাদানের বিদ্যালয়। যন্ত্রশিল্পের প্রসার ও কারিগরি শিক্ষাদানের বিদ্যালয়ের সংখ্যাবৃদ্ধি একই সঙ্গে ঘটে চলল।

স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের আবিষ্কার প্রথম ঘটে ব্রিটেনে এবং সেখান থেকে ইউরোপে। স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের সঙ্গে স্বয়ংক্রিয় অগ্ন্যেয়াস্ত্রেরও প্রসার ঘটে ওই মহাদেশে। এশিয়া ও অবশিষ্ট বিশ্বে এর কিছু ঘটে না। ফলে স্বয়ংক্রিয় অগ্ন্যেয়াস্ত্র ব্যবহার করে ব্রিটিশ ও ইউরোপীয়রা এশিয়া আফ্রিকা ও নব আবিষ্কৃত মহাদেশ উভয় আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়া দখল করে নিল। দখল করার পর তারা এটাও নিশ্চিত করল যে তাদের বিদ্যা যেন কোনোক্রমেই তাদের দখলকৃত ভূমি উপনিবেশগুলোর মানুষের আয়ত্ত না হয়। এশিয়া জাপান (নিপ্পন) তারা দখল করতে না পারায় জাপানিরা ইউরোপীয়ানদের সর্বাধুনিক যন্ত্রগুলো খুব দ্রুত তৈরি করা শিখল। জাপানিরাও এরপর আগ্রাসী হয়ে উঠল এবং তারা কোরিয়া, চীন, ইন্দোচীন প্রভৃতি দেশে তাদের বাজার ও উপনিবেশ স্থাপন করল।

কিন্তু এ অবস্থা তো চিরকাল চলতে পারে না। উপনিবেশ বিস্তার নিয়ে শেষ যুদ্ধটি হলো গত শতকে (১৯৩৯-৪৫)। এ যুদ্ধের পর উপনিবেশের মানুষ তাদের নিজ নিজ দেশ থেকে ঔপনিবেশিক শক্তিকে অভ্যুত্থানের মাধ্যমে তাড়িয়ে দিয়ে হলো স্বাধীন। তাদের এ স্বাধীনতা অচিরে কাগুজে হয়ে গেল নয়া উপনিবেশবাদ তার জয়গা করে নিলো। নয়া উপনিবেশবাদ হলো দৃশ্যত স্বাধীন রেখে ঔপনিবেশিক পরাশক্তিগুলোর সদ্য স্বাধীন দেশগুলো পদানত রাখা। বর্তমানের প্রধান

ঔপনিবেশিক পরাশক্তি হলো যুক্তরাষ্ট্র। নয়া উপনিবেশগুলোয় তাদের রাষ্ট্রদূত ঔপনিবেশিক যুগের গভর্নর জেনারেলের ভূমিকা পালন করে। প্রথমে উপনিবেশ ও তারপর নয়া উপনিবেশ পর্যন্ত ধাপগুলোয় একটি এলিট শ্রেণির আবির্ভাব ঘটে। এরা বিভবান হওয়ায় খাওয়া-পরা ভ্রমণ ও বাসগৃহের পেছনে ঢালাও খরচ করতে পারে। খরচ করতে পারে বছরের উৎসবগুলোতে। এ সময় তাদের কেনাকাটা বেড়ে যায়। নিজেদের জন্য ছাড়াও তারা আত্মীয়-পরিজন ও বন্ধু-বান্ধবের জন্য উপহার সামগ্রী কেনে ও বিলায়। পুঁজিবাদ বিকাশের প্রথম দিকে ধর্মীয় উৎসব ছাড়া সর্বজনীন উৎসব ছিল না। ইউরোপীয়রা খ্রিস্টান হওয়ায় তারা তাদের প্রধান উৎসব ক্রিসমাস বা বড়দিনের (২৫ ডিসেম্বর) সময় প্রচুর কেনাকাটা করত। ক্রিসমাসের সময় তাদের প্রধান খাওয়া-দাওয়া হলো টার্কি রোস্ট দিয়ে ডিনার যা ক্রিসমাস উপলক্ষে দামি কেক কেটে বিকেল থেকে শুরু হয়। সকালে এবং কখনো মধ্যাহ্নে গির্জায় উপাসনা সেরে তারা সারাদিন ফুর্তি করে। তরুণ-তরুণী পার্কের ঝোপের আড়ালে ঠোটে ঠোট লাগিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটায়। ভারতবর্ষে উৎসব বলতে বারোয়ারি, বহু মানুষ মিলে তা পালন করে। বিশেষাঙ্গিণীরা নানা উৎসব দিয়ে ভরা, তেলাই বা কনে ও বরের গায়ে হলুদ দিয়ে যার শুরু। উপমহাদেশের সব অংশের মতো বাংলাদেশের মানুষও ধর্ম ও ব্যক্তিগত উৎসব পালন করে। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্য জনতার সংগ্রাম শুরু হয় ধর্মীয় উগ্রবাদের মূল্যাংগাটন করে ইহজাগতিক রাষ্ট্র ও সমাজ প্রতিষ্ঠাকল্পে। ধর্ম নাগরিকের ব্যক্তিগত প্রতিপালনের বিষয় হিসেবে রেখে রাষ্ট্র ও সমাজের সব বিষয় হবে সেকুলার বা ইহজাগতিক, পরলোক বা পরকালের সঙ্গে যার সম্পর্ক থাকবে না। বাঙালি পৃথিবীর সব থেকে বেশি ধর্মপরায়ণ না হলেও ধর্ম পালনকারী জাতি। প্রত্যেক ধর্মের বাঙালি নিষ্ঠার সঙ্গে তার ধর্ম পালন করে। কিন্তু ধর্মীক না হওয়ায় সে মুক্তমনে নির্দিষ্টাঙ্গি ভিন্ন ধর্মের অনুষ্ঠানগুলোয় যোগ দিয়ে আনন্দ লাভ করে।

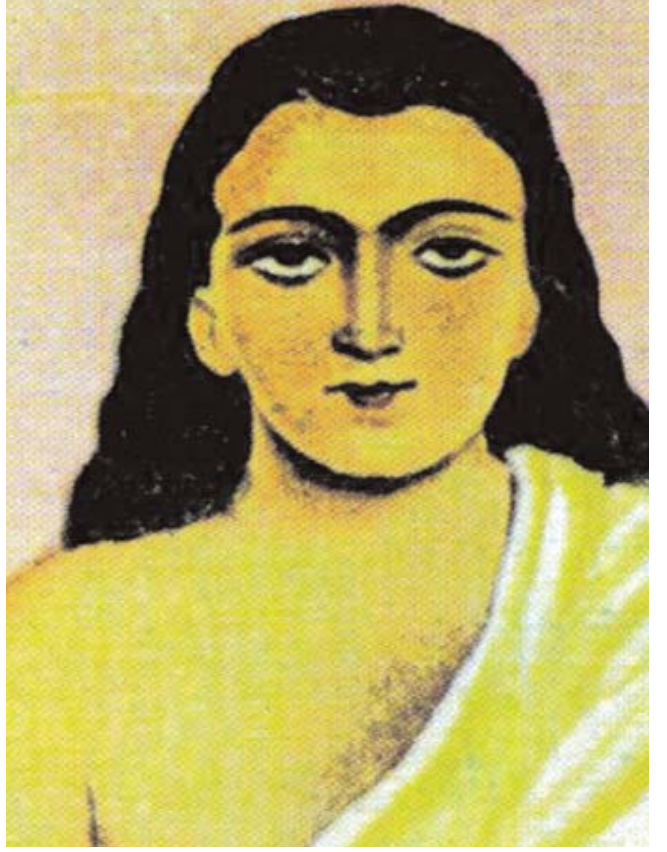
বাংলাদেশের প্রধান ধর্মীয় উৎসব হলো দুর্গাপূজা ও সরস্বতী পূজা। এ সময় আনন্দোৎসবে সারাদেশ মুখর হয়ে ওঠে। বাঙালির বড় অংশ যখন উচ্চবর্ণের ঘৃণা ও তাচ্ছিল্য থেকে মুক্তি বা রেহাই পেতে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে তখন তারা ইসলাম ধর্মের প্রধান পার্বনগুলো তাদের পূর্বপুরুষ ও প্রতিবেশীর অনুকরণে উৎসবের মেজাজে পালন করতে থাকে। মুসলমান শাসকরা এতে অংশগ্রহণ ও পৃষ্ঠপোষকতা দেয়ায় মুসলমান পার্বনগুলোও উৎসবের মেজাজে প্রতিপালিত হতে থাকে। হিন্দুরাও তাতে অংশগ্রহণের সুযোগ পায়। হিন্দুরা আগে মাংসভোজী ছিল না। মুসলমান উৎসবে তাদের অংশগ্রহণের প্রেরণা ছিল মুসলমান বন্ধুদের বাড়িতে মাংসের নানা পদের খাবার ভক্ষণ। এখন অবশ্য তারা উৎসবে যোগ দিতে ও শুভেচ্ছা জানাতেই মুসলমান বন্ধুদের বাড়ি যায়। এখন তারা নিজেদের বাড়িতেও মাংস রান্না করে খায়। মাংসের নানা পদ রান্না করা তারা শিখেছে।

আরবভূমিতে ধর্মীয় উৎসব বলতে কিছু ছিল না। বাঙালি শ্রমিক আরবদেশে কাজ করতে গিয়ে দেখে ঈদের দিনও তাদের ছুটি দেয়া হয় না। ঈদের দিন আরবরা ফজরের নামাজ পড়তে মসজিদে যায়। নামাজ শেষে তারা সূর্যের এক কোমর তক ওঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করে। তারপর দুই রাকাত ঈদের নামাজ পড়ে ঘরে

ফেরে। অন্যান্য দিনের মতো ঈদের দিনও তারা অতিবাহিত করে। বাঙালি শ্রমিকরা ঈদের দিন ভালো রান্না করা ও কিছুটা আমোদ করার চেষ্টা করলে সৌদি পুলিশ তাদের বাধা দিত অথবা কয়েদ করত। কিন্তু তাদের সংখ্যা লাখ লাখ যখন হয়ে গেল বাঙালিদের বাধা ও কয়েদ করা আর তাদের পক্ষে সম্ভব হলো না। বহু বছর হলো এখন পুরো আরববিশ্বে বাঙালির দেখাদেখি আরবরাও ঈদে আনন্দোৎসব করছে। ঈদের সময় প্রিয়জনকে কার্ডে শুভেচ্ছা জানানো ও তাদের উপহার দেয়ার চল শুরু হয় ইউরোপীয়দের দেখে। এ দেশে থেকে যারা ইউরোপ, আমেরিকায় যায় তারা ক্রিসমাসের সময় উপহার কেনাকাটা ও তা প্রিয়জনকে উপহার দেয়া দেখে দেশে ফিরে তারাও এ প্রথা ঈদের সময় চালু করে। ইউরোপীয়রা কেনাকাটা ও উপহার বিলায় বছরে একবার। ঈদ দুটা হওয়ায় বাঙালি তাদের দেখাদেখি উপহার কেনে ও বিলায় বছরে দুই বার।

ঈদের একটি হলো ফিতর। এ ঈদটি প্রতিপালিত হয় হিজরি সালের একমাস রমজানের সিয়াম অর্থাৎ দিনের বেলা উপবাস ও সংযম পালনের পর পরের মাস শাওয়ালের প্রথম দিন। রোজার শেষ দিন সন্ধ্যায় চাঁদ দেখার জন্য আগে হুড়োহুড়ি লেগে যেত। দেখা গেলে বোম ফুটিয়ে তার জানান দেয়া হতো। এখন এটা কমে গেছে সরকার থেকে চাঁদ দেখার ব্যবস্থা হওয়ায়। মানুষ এখন পশ্চিম আকাশে নিরীক্ষণের চেয়ে টিভির পর্দায় রাখে চোখ যেখানে ব্রেকিং নিউজ প্রদর্শন করা হয়। চাঁদ দেখা কমিটির ঘোষণা দেখে ও কোথায় কোথায় জমাত হবে জেনে সকালে পুষ্টিত গ্রহণ করে। আরবি ফিতর শব্দের অর্থ হলো বিদীর্ণ করা। এ ক্ষেত্রে রমজানের পর উপবাস বিদীর্ণ করা বা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যাওয়া।

আর একটি ঈদ হলো আজহা। আজহা অর্থ হলো উৎসর্গ করা। হজরত ইবরাহিম খোদার আদেশে তার তুষ্টির জন্য নিজ হাতে তার পুত্র ইসমাইলকে তার সম্মতিতে জবাই করতে উদাত হলে আল্লাহ তাদের ঐকান্তিকতায় সন্তুষ্ট হয়ে সন্তানের বদলে পশু উৎসর্গ বা কোরবানি করতে আদেশ দেন। তখন থেকে হজরত পালনকালে হাজিরা মিনায় পশু কোরবানি দেন। এ সময় সমর্থ মুসলমানরাও সব দেশে কোরবানি দেন। বাংলাদেশের মুসলমান উভয় ঈদ জাঁকজমকের সঙ্গে পালন করে। তাদের এ সময় কেনাকাটার ধুম পড়ে যায়। আজকের মধ্যআয়ের পথে ধাবমান বাংলাদেশে ঈদের সময় কয়েক হাজার কোটি টাকার বেচাকেনা হয়। এতে দেশের প্রবৃদ্ধির হার বাড়ে। ইউরোপ, আমেরিকায় ক্রিসমাসের সময় দোকানদাররা প্রতিটি পণ্যের দাম কমিয়ে দেয় যাতে সবাই বেশি বেশি কিনতে পারে। গরিবরা কিনতে পারে। বাংলাদেশে দেখা যায় এর উল্টো। পার্বণ ও উৎসব এলে তারা সব পণ্যের দাম দেয় বাড়িয়ে। প্রতি ঈদে এভাবে সারাদেশের বিক্রেতারা লাখোপতি কোটিপতি বনে যায়। এ জন্য রমজানের আগে থেকে দোকানিরা পণ্য পসরা সাজিয়ে টিভি ও কাগজে বিজ্ঞাপন দিতে থাকে। বিজ্ঞাপনে হীরের গয়নার বিজ্ঞাপনও থাকে। তরুণী ও মহিলাদের এতে সুবিধা হয়। তাদের মান ও মূল্য যাচাই সহজ হয়। মহিলারাই এ সময় পুরো পরিবারের জন্য কেনাকাটা করেন। তাদের স্বামীদের ভূমিকা হলো সঙ্গে থেকে মূল্য পরিশোধ ও শপিং ব্যাগ বহন। এই হলো ইদানীংয়ের ঈদ উৎসব। বাঙালির রোজার পর ফিতর বা স্বাভাবিকতায় ফেরা।



প্রবন্ধ

রবীন্দ্রনাথ ও কালিদাস

বেলাল চৌধুরী

রবীন্দ্রনাথ তার বিচিত্র প্রবন্ধের বসন্ত যাপনে লিখেছেন— ‘বসন্তে... প্রাণের অজস্রতা, বিকাশের উৎসব। তখন আত্মদানের উচ্ছ্বাসে তরুণতা পাগল হইয়া উঠে। তখন তাহাদের হিসাবের বোধমাত্র থাকে না, যেখানে দুটো ফল ধরিয়ে সেখানে পঁচিশটা মুকুল ধরাইয়া বসে। মানুষই কি কেবল... আপনাকে ফুটাইবে না, ফলাইবে না, দান করিতে চাহিবে না; কেবলই কি ঘর নিকাইবে, বাসন মাজিবে ও যাহাদের সে বালাই নাই তাহারা বেলা চারটে পর্যন্ত পশমের গলাবন্ধ বুনিবে। আমরা কি ততোই একান্ত মানুষ। আমরা কি বসন্তের নিগূঢ় রস সঞ্চার বিকশিত তরুণতা পুষ্প পল্লবের সহিত নই।’ এরই ভেতর গীতবিতান থেকে

অনেক দিনের বনের মানুষও উঠে এসে যেন চমকে দেয় ‘অনেক দিনের বনের মানুষ যেন এল কে/ কোন ভুলে যাওয়া বসন্ত থেকে।/... দেখতে এলে সেই— যে বীণা বাজে কিনা হৃদয়ে,/ তারগুলো তার ধুলায় ধুলায় গেছে কি ঢেকে। এমন করে যোগাযোগের পাতা উল্টে দেখি যেদিন হাওয়ার মধ্যে বসন্তের ছোঁয়া লাগে। মনে হয় পৃথিবী যেন উৎসুক হয়ে চেয়ে আছে নীল আকাশের দূর পথের দিকে। যা কিছু চারদিকে বেড়ে আছে সেইটেকেই মনে হয় মিথ্যে। আর যার ঠিকানা পাওয়া যায়নি, যার ছবি আঁকতে গেলে রং যায় আকাশে ছড়িয়ে। মূর্তি উঁকি দিয়ে পালিয়ে যায় জলস্থলের নানা ইশারার মধ্যে। মন তাকেই

বলে সবচেয়ে সত্য।’
ব্যক্তিগতভাবে বসন্তকাল এলেই সবার আগে আমার মনে গুনগুনিয়ে ওঠে রবীন্দ্রনাথের সেই বিখ্যাত হোলিখেলা/রাজস্থান কবিতাটি। কবিতাটি আছে কথা ও কাহিনীতে। পত্র দিল পাঠান কেসর খাঁরে/কেতুন হতে ভুনাগ রাজার রানী, / ‘লড়াই করে আশ মিটেছে মিঞা?/ বসন্ত যায় চোখের উপর দিয়া, / এসো তোমার পাঠান সৈন্য নিয়া-/হোলি খেলব আমরা রাজপুতানি।’ পত্র পড়ি কেসর উঠে হাসি, / মনের সুখে গাঁফে দিল চাড়া।
বেসুর বুঝি/তেমন কারো কাঁকন বাজছে না।/চোখে কেন লাগছে নাকো নেশা।/মনে মনে ভাবছে কেসর খাঁ।/তান ধরিয়া ইমন ভূপালিতে/বাঁশি বেজে উঠল দ্রুত তালে।/কুন্তলেতে দোলে মুক্তমালা।/কঠিন হাতে মোটা সোনার বালা, দাসীর হাতে দিয়ে কাঁসার থালা/রানী বনে এলেন হেনকালে।/তান ধরিয়া ইমন ভূপালিতে/বাঁশি তখন বাজছে দ্রুত তালে।/কেসর কহে, ‘তোমারি পথ চেয়ে/দু’টি চোখ করেছি প্রায় কানা।’ রানী কহে, ‘আমারো সেই দশা।’/এ কথা সখী হাসিয়া বিবশা— পাঠানপতির ললাটে সহসা/মারেন রানী কাঁসার থালাখানা।/রক্তধারা গড়িয়ে পড়ে বেগে/পাঠানপতির চোখ হয় কানা।’
এর পরের অংশ অতিশয় বিয়োগাত্মক বলে আর বিশদে না গিয়ে শুধু শেষ স্তবকটি তুলে দিচ্ছি ‘যে পথ দিয়ে পাঠান এসেছিল/সে পথ দিয়ে ফিরল নাকো তারা।/ফাগুন-রাতে কুঞ্জ বিতানে/মত্ত কোকিল বিরাম না জানে।/কেতুনপুরের বকুলবালাকে/কেসর খাঁয়ের খেলা হলো সারা।/যে পথ দিয়ে পাঠান এসেছিল/সে পথ দিয়ে ফিরল নাকো তারা।’
বসন্ত বলতে কেবলই দখিন হাওয়া আর বসন্ত ঘোষের নির্ঘোষই নয়। কেবল বাংলা সালের ঋতুরাজই নয় যদি এর শেষ মাসও ধরা হয় ফাল্গুন চৈত্রের সম্মোহনে যখন সমগ্র দেহমন হয়ে আসে বিবশ আর বিহ্বল তখন কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে নানা রকমের আধিব্যাধির দিকে। যেমন শীতলা মায়ের দয়া। যার জন্য হুশিয়ার যারা তারা এই সময়টায় নিম্ন বেগুন জিভে দিয়ে বেতন মুখে তোলে।
তবে এটাও ঠিক যে বসন্ত শুধু ঋতুনাথ বা রোগব্যাধিই নয় রাগরাগিণীতেও যার সমুজ্জ্বল বর্ণময় উপস্থিতি। যার অবদান কোনো অংশেই বেশি বৈ কম নয়। আম্রমুকুল ভূষিত মণিরক্ত পদ্মালোচন, পরিহিত পীতাম্বর, কাঞ্চনবর্ণ দেহ বসন্ত রাগ যুবক-যুবতীদের প্রিয়বাস।
রবীন্দ্রনাথের হাত ধরেই ঢাকা যাক বসন্ত বন্দনায়। যেমন ‘এক ফাগুনের মনের কথা আর ফাগুনের কানে কানে/গুঞ্জরিয়া কেঁদে শুধায়, ‘মোর ভাল আজ কেইবা জানে’। এভাবেই গীতবিতানে কিনা ছড়িয়ে আছে।
লিপিকায় পরীর পরিচয়ে রয়েছে। ‘ফাগুন মাসে তখন ডালে ডালে শালফুলে ঠেলাঠেলি, আর শিরিশ ফুলে বনের প্রান্ত শিউরে ওঠেন।’ একই বইতে সুয়োরানীর সাথ এও ‘কোন ঘরের বউ গো। যেন নির্মাল্যের ফুল। হাতে সাদা শাখা, পরনে লালপেড়ে শাড়ি। স্নানের পর ঘড়ায়

করে জল তুলে আনছে, সকালের আলো তার ভিজে চুলে আর ভিজে ঘড়ার উপর ঝিকিয়ে উঠছে।’ তারপরই তো শুরু হলো ভরা বসন্তে বন্যা, অবশ্য এই বন্যা ‘বকুল গন্ধে বন্যা এল/দখিন হাওয়ার স্রোতে।’ যদিও তিন ঋতুর দূরত্ব তারপরও রবীন্দ্রনাথ কিন্তু তার শ্রাবণগাথায় বর্ষা-বসন্তকে একসঙ্গে মিলিয়ে লিখেছেন ‘বসন্তে কোকিল ডালপালার মধ্যে প্রচ্ছন্ন থেকে বনছায়াকে সক্রিয় করে তোলে— আর বর্ষায় বলাকাই বল, হংসশ্রেণিই বল, উধাও হয়ে মুক্ত পথে চলে...।’ ভাবনার ওই দুই জাত আছে। গীতাজলিতে যেমন আবাহন ‘আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে।/তব অবগুপ্তিত কুণ্ঠিত জীবনে/করো না বিভ্রান্ত তারে।’ গল্পগুচ্ছের ‘স্ত্রীর পত্রে’ রয়েছে ‘হৃদয়ের জগতেও একটা বসন্তের হাওয়া আছে— সে কোন স্বর্গ থেকে আসে, গলির মোড় থেকে আসে না।’
এবার যুগান্তরে কবি সার্বভৌম রবীন্দ্রনাথ ‘চৈতালি’তে কবিকুলপতি কালিদাস পাঠ শেষে যে রসভাষ্য রচনা করেছেন সেটাকে স্মরণ করে ‘হে রবীন্দ্র, কালিদাস, কল্পকুঞ্জ বনে/নিভূতে বসিয়া আছ প্রেয়সীর সনে/যৌবনের যৌবরাজ্য- সিংহাসন পরে। মরকত পাদপীঠ বহনের তরে/রয়েছে সমস্ত ধরা সমস্ত গগন/স্বর্ণরাজচ্ছত্র উর্ধ্বে করেছে ধারণ/শুধু তোমাদের পরে। ছয় সেবাদাসী ছয় ঋতু ফিরে কিবা নৃত্য করে আসি।/নব নব পাত্র ভরি ঢালি দেয় তারা/নব নব বর্ণময়ী মদিরার ধারা/তোমাদের ভূষিত যৌবনে। ত্রিভুবন/একখানি অন্তঃপুর বাসর ভবন/নাই দুঃখ, নাই দৈন্য, নাই জনপ্রাণী/তুমি শুধু আছ রাজা, আছে তব রানী।’
সরসচিত্তি বাঙালি কাব্য পাঠক চিরকালই রম্য কাব্যপাঠে অভিলাষী। তাই কালিদাসের উপমা প্রধান বসন্ত বর্ণনা থেকে কয়েক ছত্র বাছল্য হবে না মনে করি। এই বসন্ত যাপনের জন্য কালিদাসের কালে জন্ম না নিলেও হা-হুতাশের কিছু নেই। কালিদাস বসন্ত সমাগমে বসন্ত যাপনের চিত্র এভাবে শুরু করেছেন— ‘ওগো প্রেয়সী, রতিসুখকারীদের চিত্তবিন্দু করিবার জন্য ঋতুরাজ বসন্ত যোদ্ধার ন্যায় সমাগত। বিকশিত আম্রমুকুল তার তীক্ষ্ণদ্রাঘ এবার ভ্রমর পঙ্ক্তিতে তার প্রকাশ্য উজ্জ্বল ধনুর্গুণ। কবির মতে, বসন্তকাল ইন্দ্রিয়ভোগের অতি অনুকূল সময়। প্রকৃতি তখন মানুষের মনে শৃঙ্গারের উদ্দীপনা সঞ্চার করে। তরুণ কবি ভোগের দৃষ্টিতে বিশ্ব ভুবনকে বসন্ত ঋতুতে প্রত্যক্ষ করছেন বসন্তে সবকিছুই রূপে রূপে অধিকতর রমণীয় হয়ে উঠেছে। স্বর্গে নিসর্গে বেজে উঠছে মিলনের বাঁশি। এই বসন্ত সরোবর সলিলের, রত্নময় রসনামণ্ডিত চন্দ্রকান্তি যৌবনবতী কামিনীদের সঙ্গে পুঞ্জিত বিলাসিনীরা তাদের নিতম্ববিম্ব কুসুম ফুলের পরাগের মতো অরুণ বর্ণের বসনে। স্তনমণ্ডল কুঙ্কম রাগের মতো উজ্জ্বল রক্তবর্ণ ক্ষৌমবস্ত্রে ভূষিত করেছে। দুই কালের দুই বড় কবির বসন্ত ভাবনা নিয়ে সংক্ষিপ্ত এই আলোচনায় সময়কার্যে হয়তো যথার্থই বিস্তারিত করা গেল না। পরবর্তীকালে আরো বিশদ আলোচনার ইচ্ছে রইল।



বিশেষ রচনা

শেখ মুজিবের ‘বঙ্গবন্ধু’ হয়ে ওঠার নেপথ্যে

আহমদ মমতাজ

বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও ‘বাংলার যৌবন শক্তির প্রতীক’ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। জন্মস্থান ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার (বর্তমানে জেলা) টুঙ্গিপাড়া গ্রামে। মধুমতি নদী তীরবর্তী অঞ্চলে শেখ বংশে তার জন্ম। এই বংশের আদিপুরুষ শেখ বোরহাউদ্দিন ছিলেন একজন ধার্মিক পুরুষ তার একজন অধস্তন পুরুষ হলেন শেখ আবদুল হামিদ, তারা ছিলেন তিন ভাই। অন্য দুই ভাই হলেন— শেখ আবদুল মজিদ ও শেখ আবদুর রশিদ। শেষোক্তজনকে ইংরেজরা ‘খান সাহেব’ উপাধি দেন, তিনি একটি এমই (মিডল ইংলিশ) স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। শেখ আবদুল হামিদের এক ছেলে শেখ লুৎফর

রহমান ছিলেন সরকারি চাকুরে। তিনি বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন চাচাত বোন সায়েরা খাতুনের সঙ্গে। এই দম্পতির সন্তান হলেন শেখ মুজিবুর রহমান। ছয় ভাই-বোনের মধ্যে তিনি ছিলেন জ্যেষ্ঠ। মুজিবের অন্য ভাই শেখ আবু নাসের। টুঙ্গিপাড়ার সম্ভ্রান্ত ও ঐতিহ্যবাহী খানদান শেখ পরিবারের এই ছয় ভাই-বোন ও তাদের সন্তান-সন্ততিরা বাংলাদেশের ইতিহাসে গৌরবময় এক অধ্যায় রচনাকারক।

বিশেষ করে শেখ লুৎফর রহমানের সুযোগ্য পুত্র শেখ মুজিবুর রহমান হলেন স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের মহান স্থপতি, যিনি হাই স্কুলের ছাত্রাবস্থায় স্বদেশি আন্দোলনের নেতাকর্মীদের

সংস্পর্শে আসেন, স্বদেশি ভাবধারায় উদ্ভূত হন ও নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর অনুসারী হয়ে যান। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সঙ্গে মেলামেশা ও সভা-সমাবেশে যোগদানের কারণে এবং ইংরেজদের প্রতি বিরূপ ধারণা সৃষ্টির প্রেক্ষিতে এক স্বাধীন দেশের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেন। তিনি পনের-ষোল বছর বয়সে গোপালগঞ্জ-মাদারীপুরের বিভিন্ন জনসভায় যোগদান করতেন ও মনযোগসহকারে শুনতেন নেতাদের বক্তৃতা। ধারণ করতে চাইতেন সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে। শেখ মুজিব ছোটবেলা থেকেই সমাজসেবামূলক কাজে জড়িত হন। তিনি মিশন স্কুলের ছাত্রাবস্থায় ‘মুসলিম সেবা সমিতি’র সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হন আর এই কাজে উৎসাহদাতা ছিলেন তার গৃহশিক্ষক কাজী আবদুল হামিদ, সংগঠনটির তিনিই প্রতিষ্ঠাতা। সংগঠনের পক্ষ থেকে বাড়ি বাড়ি গিয়ে মুষ্টিভিক্ষার চাল সংগ্রহ এবং দরিদ্র ছাত্রদের সহায়তা দেয়া হত। বই কিনে দেয়া, পরীক্ষার ফিসহ নানাভাবে এই সাহায্য দেয়ার ব্যবস্থা ছিল। স্কুলছাত্র শেখ মুজিব ছিলেন এই কর্মকাণ্ডের সক্রিয় সহযোগী-কর্মী। ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দ। গোপালগঞ্জ মথুরানাথ মিশন স্কুল পরিদর্শনে আসেন অবিভক্ত বাংলার দুই অবিসংবাদিত নেতা, প্রধানমন্ত্রী শেরেবাংলা একে ফজলুল হক ও অনাজন শ্রমমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। এ উপলক্ষে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করার ভার পড়ল মুজিবের ওপর। এক্সিভিশন উদ্বোধন করা হয়। হক সাহেব পাবলিক হল দেখতে যান আর সোহরাওয়ার্দী সাহেব আসেন মিশন স্কুল দেখতে। মিশন স্কুলের ছাত্র মুজিব। সোহরাওয়ার্দীকে সংবর্ধনা দেয়া হয়। সোহরাওয়ার্দী মুজিবের সাংগঠনিক দক্ষতা ও যুবকদলের প্রতি তার প্রভাব দেখে মুগ্ধ হন, তিনি ভাঙা ভাঙা বাংলায় বালক মুজিবের নাম ও পরিচিতি জানতে চান। জানতে চান এই অঞ্চলে মুসলিম লীগ ও মুসলিম ছাত্রলীগের সাংগঠনিক তৎপরতা আছে কিনা? মুজিব জানান যে, নাই। কিছুদিন পর মুজিবের নামে একটি চিঠি আসে কলকাতা থেকে, প্রেরক-হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। চিঠিতে মুজিবকে ধন্যবাদ জানানো হয়েছে ও কলকাতায় গেলে সাক্ষাৎ করে আসার জন্য বলা হয়েছে। স্কুলছাত্র মুজিব ফেরত চিঠি পাঠান সোহরাওয়ার্দী সাহেবকে। মূলত এভাবে ১৯৩৮ সাল থেকে স্কুলছাত্র মুজিব বাংলার রাজনীতির এক কিংবদন্তিতুল্য পুরুষ হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর স্নেহ-আশীর্বাদপুষ্ট প্রিয়পাত্ররূপে আবির্ভূত হন। মুজিবের বেড়ে ওঠা:

হাই স্কুলের ছাত্রাবস্থায় শেখ মুজিব তার বিচক্ষণতা, সাহস ও সাংগঠনিক দক্ষতা দেখিয়ে সোহরাওয়ার্দীর মনোযোগ আকর্ষণে সমর্থ হন, ১৯৩৯ সালে মুজিব কলকাতায় যান বেড়াতে, তিনি সাক্ষাৎ করেন সোহরাওয়ার্দী সাহেবের সঙ্গে। এরপর গোপালগঞ্জের মুসলিম লীগ ও মুসলিম ছাত্রলীগের শাখা গঠন করা হয়, তরুণ মুজিব হন মুসলিম ছাত্রলীগের সম্পাদক। মুসলিম লীগের শাখাও গঠন করা হয়, তবে মুজিবই মূলত কাজ চালাতেন। এভাবেই রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে জড়িয়ে পড়েন। মুজিব ছিলেন মিশন স্কুলের ক্যাপ্টেন। ছোটবেলা থেকেই খেলাধুলায় উৎসাহী ছিলেন, তার ছিল

একটা ফুটবল টিম। ১৯৪১ সালে প্রবল জ্বর নিয়ে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেন ও উত্তীর্ণ হন। এ সময় তিনি পুরোদমে রাজনীতি শুরু করেন। মুসলিম লীগ আর মুসলিম ছাত্রলীগের রাজনীতির স্থানীয় কাণ্ডারি তিনি। এলাকায় তিনি সভা-সমাবেশ করতেন ও আশপাশের এলাকায় চলে যেতেন, বক্তৃতা দিতেন, পাকিস্তান আন্দোলনের একনিষ্ঠ কর্মী তিনি। ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিতে কলকাতায় যান, নেতা সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ভর্তি হন কলকাতা ইসলামিয়া কলেজে। সোহরাওয়ার্দীর ঘনিষ্ঠ অনুসারী মুজিব, থাকতেন বেকার হোস্টেলে। তিনি ইসলামিয়া কলেজের জনপ্রিয় ও প্রভাবশালী নেতা। একই সঙ্গে গোপালগঞ্জে যেতেন রাজনৈতিক প্রয়োজনে।

কলকাতা জীবন :

ইসলামিয়া কলেজ ছিল বাংলার মুসলিম ছাত্রদের শিক্ষা ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র। মুজিবকে কেন্দ্র করে এই কলেজে ছাত্রলীগের একটি স্বতন্ত্র শক্তিশালী সমর্থকগোষ্ঠী গড়ে ওঠে, তার নেতৃত্বাধীন মুসলিম ছাত্রলীগের গ্রুপই নির্বাচনে জয়যুক্ত হতে লাগল। পরপর কয়েকবার এমন হয়, এমনকি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয় মুজিব সমর্থিত গ্রুপ। এক সময় তিনিও কলেজ ছাত্র সংসদ নির্বাচনে সাধারণ সম্পাদক পদে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন। অবশ্য তিন মাস পর স্বেচ্ছায় পদ ছেড়ে অন্য একজনকে দায়িত্ব দেন। নিজে পাকিস্তান আন্দোলনের জন্য কাজ করেন। ইসলামিয়া কলেজের ছাত্রাবস্থায় মুজিব বাংলার মুসলিম লীগের কাউন্সিল সদস্য হন ও শহীদ সোহরাওয়ার্দীর গ্রুপের একজন নেতৃত্বাধীন নেতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। এরই মধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। আর যুদ্ধের অবশ্যম্ভাবী পরিণতিতে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। সোহরাওয়ার্দী তখন সিভিল সাপ্লাই মন্ত্রী। তিনি বাংলার মানুষকে বাঁচাতে তৎপর হন, মুজিবসহ নেতাকর্মীরা বাঁপিংয়ে পড়েন দুর্ভিক্ষপীড়িতদের বাঁচাতে। লেখাপড়া ছেড়ে মানবতার সেবায় আত্মনিয়োগ করেন তিনি। বাংলার শহরে, বন্দরে ও গ্রামে লঙ্গরখানা খোলা হয়। মুজিব গোপালগঞ্জে এসেও কাজ করেন। যিশার, খুলনা ও বরিশালে কাজ করেন, আহ্বান করেন কনফারেন্স। তিনি হন অভ্যর্থনা কমিটির চেয়ারম্যান। মুসলিম লীগের একজন প্রভাবশালী নেতা ছিলেন আবুল হাসিম। তিনি চাইতেন দলকে প্রতিক্রিয়াশীলদের হাত থেকে উদ্ধার করতে, গ্রামপর্যায়ে মুসলিম লীগকে দাঁড় করাতে। জমিদারদের কবল থেকে মুসলিম লীগকে বের করে আনতে আবুল হাসিমের চেষ্টা ছিল। আবুল হাসিম ও সোহরাওয়ার্দী বাংলার বিভিন্ন স্থান ঘুরে বেড়ান, সভা-সমাবেশে বক্তৃতা দেন। মুসলিম লীগ দলকে শক্তিশালী করতে কাজ করেন।

এ সময় দিল্লিতে অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগের সম্মেলনে যোগ দেন মুজিব। সেখানে ভারতবর্ষের মুসলিম লীগ নেতারা আসেন ও বক্তৃতা দেন। সর্বোপরি ভারতের সর্বশেষ রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত হন, নিজে বিচিত্র অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হন। দিল্লিগরী ঘুরে দেখেন, সুলতানি-মোগল যুগের স্থাপত্য নিদর্শন ও সুফি-দরবেশের মাজার পরিদর্শন করেন। কলকাতায় ফিরে

লেখাপড়া মনোনিবেশ করেন। ১৯৪৩ সালের দিকে কলকাতায় চট্টগ্রামের মুসলিম লীগের কিছু নিষ্ঠাবান কর্মীর সঙ্গে মুজিবের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি হয়, তারা হলেন— ফজলুল কাদের চৌধুরী, এমএ আজিজ, জহুর আহমদ চৌধুরী, আজিজুর রহমান, ডা. সুলতান আহমদ ও আবুল খায়ের চৌধুরী। নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর নেতৃত্বে ১৯৪০ সালে প্রথমোক্ত ব্যক্তির সঙ্গে কলকাতার অন্ধকূপ হত্যার স্মৃতিস্তম্ভ সরিয়ে নেয়ার আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন মুজিব। ১৯৪৫ সালের শেষদিকে নির্বাচনের তোড়জোড় শুরু হয়। ১৯৪৬ সালের মার্চে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সোহরাওয়ার্দীর অভুলনীয় সাংগঠনিক দক্ষতায় মুসলিম লীগ অধিকাংশ আসনে জয় হয়ে সরকার গঠন করে। শহীদ সোহরাওয়ার্দী হন বাংলার প্রধানমন্ত্রী। এদিকে মুসলিম লীগ নেতা জিন্নাহ ১৬ আগস্ট ‘ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে’ ঘোষণা দেন। তিনি বিবৃতি দিয়ে বলেন শান্তিপূর্ণভাবে দিবসটি পালন করতে। কিন্তু কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভার নেতারা ওই প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস তাদের বিরুদ্ধে ঘোষণা করা হয়েছে বলে বিবৃতি দিয়ে পরিস্থিতি ঘোলাটে করে তোলেন। এদিকে প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী ঘোষণা দেন দিবসটি যেন শান্তিপূর্ণভাবে পালন করা হয়, কারণ কোনো অঘটন হলে তাতে মুসলিম লীগ সরকারেরই বদনাম হবে। তিনি এদিন সরকারি ছুটি ঘোষণা করেন। ১৬ আগস্ট কলকাতার গড়ের মাঠে জনসভা হয়। সেদিন জনসভা শুরুর আগেই কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে হিন্দু গুণ্ডারা মুসলমানদের ওপর আক্রমণ শুরু করে। সংঘটিত হয় এযাবতকালের ভয়াবহতম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। লাখো মানুষের সমাবেশে বক্তৃতা দেন প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী। দাঙ্গার খবর পেয়ে তিনি সবাইকে ঘরে ফিরে যেতে বলেন। তিনি দাঙ্গা প্রতিরোধেও শান্তি স্থাপনের জন্য দিনরাত কাজ করেন। দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে ভারতের বিভিন্ন স্থানে।

কলকাতার মুসলিম লীগ অফিস, ইসলামিয়া কলেজ, আলিয়া মাদ্রাসা, বেকার হোস্টেল, ইলিয়ট হোস্টেল ছিল অন্যতম আশ্রয়কেন্দ্র। এখানে হতাহতদের সেবা ও চিকিৎসা করা হয়। শেখ মুজিবের নেতৃত্বে মুসলমান ছাত্র-তরুণরা এ সময় দাঙ্গা প্রতিরোধে ও দুর্গতদের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী দিনরাত অবিশ্রান্ত তৎপরতায় দাঙ্গা থামাতে প্রচেষ্টা চালান। এরপর দাঙ্গা শুরু হয় নোয়াখালী ও বিহারে। কোথাও মুসলমান আবার কোথাও হিন্দুরা আক্রান্ত হন। ছাত্রনেতা মুজিব সঙ্গীদের নিয়ে ছুটে যান একস্থান থেকে অন্যস্থানে। দেড় মাস কলকাতার বাইরে কাটিয়ে ফিরে আসেন। তিনি এবার বিএ পরীক্ষা দেয়ার প্রস্তুতি নেন। এরই মধ্যে তিনি অসুস্থ হয়ে যান, পনের দিন হাসপাতালে থাকেন। প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী কলেজের প্রিন্সিপালকে ফোন করে মুজিবের অসুস্থতার খোঁজখবর নেন। সে সময় ইসলামিয়া কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন ড. জুবেরী। সুস্থ হয়ে মুজিব কলেজে ফিরে আসেন ও পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে থাকেন। অধ্যক্ষ ড. জুবেরী, প্রফেসর তাহের জামিল, প্রফেসর সাইদুর রহমান ও প্রফেসর নাজির আহমদের সহযোগিতা লাভ করেন। বিএ পরীক্ষা দিয়ে মুজিব উত্তীর্ণ হন।

শেষোক্তজন ছিলেন ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক এবং চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডের গুপ্তখালী নিবাসী। এদিকে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক ৪৭ সালের জুন মাসে ঘোষণা দেয়া হয়, ভারতবর্ষ ভাগ করা হবে। কংগ্রেস এই ভাগ প্রস্তাবে রাজি হলো এই জন্য যে, বাংলাদেশ ও পাঞ্জাব ভাগ হবে। আসামের সিলেট ছাড়া আর কিছুই পাকিস্তানে আসবে না। বাংলাদেশের কলকাতা ও আশপাশের জেলাগুলো ভারতবর্ষ থেকে যাবে। মওলানা আকরম খাঁ ও অন্য মুসলিম লীগ নেতারা এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করেন। ধারণা করা হয়েছিল সমগ্র বাংলা ও আসাম পাকিস্তানে আসবে। শেষ পর্যন্ত আসাম থেকে সিলেট এলো তবে গণভোটে জেতার পর। কলকাতাকে আর বাংলাদেশের রাজধানী করা হলো না। দিল্লিতে বসে বাংলা ভাগ হলো, কলকাতা হাতছাড়া হলো— বাঙালি নেতারা জানতেও পারলেন না এসব। সোহরাওয়ার্দী আবুল হাশিম, শরৎ বসু ও কিরণশংকর রায়ের সঙ্গে আলোচনা করেন। সর্দার প্যাটেল শরৎ বসুকে সাফ জানিয়ে দেন কলকাতা ছাড়া যাবে না। সিলেটের গণভোটে সোহরাওয়ার্দীর নির্দেশে মুজিব ও হাজার হাজার কর্মী দিনরাত কাজ করেন। সিলেট পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। কিন্তু বাংলা ভেঙে টুকরো এবং যশোর, নন্দীয়া, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি ও আসামকে খণ্ড-বিখণ্ড করা হয়। মুসলিম লীগের বাঙালি নেতাদের মতো মুজিবও এতে হতাশ হন। তিনি মন্তব্য করেন, ‘নেতারা যদি ভুল করে, জনগণকে তার খেসারত দিতে হয়। যে কলকাতা শুধু বাংলার ঢাকায় গড়ে উঠেছিল সেই কলকাতা আমরা স্বেচ্ছায় ছেড়ে দিলাম। কেন্দ্রীয় লীগের কিছু কিছু লোক কলকাতা ভারতে চলে যাক এটা চেয়েছিল বলে আমার মনে হয়। অথবা আগেই গোপনে রাজি হয়ে গিয়েছিলেন। সোহরাওয়ার্দী নেতা হলে তাদের অসুবিধা হবে তাই তারা পিছনের দরজা দিয়ে কাজ হাসিল করতে চাইল। কলকাতা পাকিস্তানে থাকলে পাকিস্তানের রাজধানী কলকাতায় করতে বাধ্য হতো। কারণ পূর্ববাংলার লোকরা দাবি করত পাকিস্তানের জনসংখ্যাও তারা বেশি। আর শহর হিসেবে তদানিন্তন ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ শহর কলকাতা। ইংরেজদের শাসনের প্রথমদিকে কলকাতা একবার ভারতবর্ষের রাজধানীও ছিল।’ (সূত্র-অসমাপ্ত আত্মজীবনী, শেখ মুজিবুর রহমান, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০১২ পৃষ্ঠা-৭৯) শেষ পর্যন্ত দেশ ভাগ হয়ে যায়। কলকাতায় শেখ মুজিবের থাকাটা ভীষণ হুমকি হয়ে পড়ে। সিদ্ধান্ত নেন পূর্ববাংলায় চলে আসবেন। নেতা শহীদ সোহরাওয়ার্দী তখনো কলকাতায়, তার জীবন হুমকির মুখে। কয়েকবার তাকে আক্রমণ করা হয়, মহাত্মা গান্ধী তাকে রক্ষা করেন। কলকাতায় একবার তার গাড়ি আক্রান্ত হয়, বোমা হামলা হয়। কোনোমতে প্রাণে রক্ষা পান। মুজিব বললেন, ‘চলুন স্যার পাকিস্তানে, এখানে থেকে কী করবেন?’ সোহরাওয়ার্দী বললেন, ‘যেতে তো হবেই। তবে এখন এই হতভাগা মুসলমানদের জন্য কিছু একটা না করে যাই কী করে? দেখ না, সমস্ত ভারতবর্ষে কী অবস্থা হয়েছে। চারদিকে শুধু দাঙ্গা আর দাঙ্গা। সমস্ত নেতা চলে গেছে আমি চলে গেলে এদের আর উপায় নাই। তোমরা একটা কাজ কর দেশে গিয়ে

সাম্প্রদায়িক গোলমাল যাতে না হয় তার চেষ্টা কর। পূর্ববাংলায় গোলমাল হলে আর উপায় থাকবে না। চেষ্টা কর যাতে হিন্দুরা চলে না আসে। ওরা এদিকে এলেই গোলমাল করবে। তাতে মুসলমানরা বাধ্য হয়ে পূর্ববাংলায় ছুটবে। যদি পশ্চিমবাংলা, বিহার ও আসামের মুসলমানরা পূর্ববাংলার দিকে রওয়ানা হয় তবে পাকিস্তান বিশেষ করে পূর্ববাংলা রক্ষা করা কষ্টকর হবে। এত লোকের জায়গাটা তোমরা কোথায় দিবা, আমার তো জানা আছে। পাকিস্তানের মঙ্গলের জন্যই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হতে দিও না।’ (পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা-৮২) সোহরাওয়ার্দীর এই বক্তব্যে একজন বিচক্ষণ ও ভবিষ্যৎদৃষ্টা রাজনীতিক নেতাকে প্রত্যক্ষ করা যায়। মুজিব ঢাকা চলে আসেন, ওঠেন ১৫০ মোগলটুলিতে মুসলিম লীগের অফিসে। শওকত মিঞা মুসলিম লীগের পুরনো কর্মী। তিনি অফিস দেখাশোনা করেন। শামসুল হক সেখানেই থাকেন। ঢাকায় এসে গঠন করেন গণতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ‘গণতান্ত্রিক যুবলীগ।’ মুজিব যুক্ত হয়ে যান সংগঠনের সঙ্গে। সহপাঠীর স্মৃতিচারণে মুজিব কলকাতা থেকে ঢাকায় আসা ছাত্রনেতা শেখ মুজিবের কলকাতায় ইসলামিয়া কলেজের একজন সহপাঠীর স্মৃতিচারণমূলক লেখায় কিছু নতুন তথ্যের সন্ধান মেলে। সে সময় মুজিবের সাহস, সাংগঠনিক দক্ষতা, বিচক্ষণতা ও ছাত্রদের দাবি নিয়ে তার উদ্যোগী ভূমিকার প্রশংসা করেন চট্টগ্রামের হাটহাজারী নিবাসী ও ইসলামিয়া কলেজে মুজিবের সহপাঠী মোহাম্মদ মজহারুল কুদ্দুস (১৯২৬-২০০৯)। এই স্মৃতিকথায় ইসলামিয়া কলেজের ছাত্রনেতা মুজিবের অনন্য চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, প্রখর স্মৃতিশক্তি ও সাংগঠনিক দক্ষতার প্রমাণ পাওয়া যায়। একজন ভবিষ্যৎ জাতীয় নেতা ও একটি স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্রের স্বপ্নদ্রষ্টার পরিচয় সেই অবিভক্ত বাংলার প্রাণকেন্দ্র কলকাতা জীবনে ফুটে উঠেছিল। মুজিবকে প্রথম দেখতেই তার (কুদ্দুস) ভালো লেগে যায়। তিনি লিখেছেন: ‘১৯৪৪ সালের ৮ জুলাই ইসলামিয়া কলেজে ভর্তি হয়ে প্রথম ক্লাসে যোগ দেই। অধ্যাপক ক্লাসে ঢাকার কিছুক্ষণ পরেই ক্লাসের দ্বিতীয় দরজা দিয়ে শ্যামল রঙের সুদর্শন লম্বা ছিপছিপে গড়নের এক তরুণ ঢুকে আমার পাশে বসে পড়ল। তার চোখেমুখে একটা আকর্ষণীয় উজ্জ্বলতা দীপ্তিমান ছিল। ক্লাস শেষে ঐ তরুণ আমার দিকে হাত বাড়িয়ে প্রশ্ন করল কী নাম? কোথেকে? আমি বললাম, মজহারুল কুদ্দুস, চিটাগাং থেকে। সে বলল, আমি শেখ মুজিব, ফরিদপুর থেকে।’ প্রথম পরিচয়ে ‘তুমি’ সম্মোধন এবং চট্টগ্রামের ফজলুল কাদের চৌধুরী ও কলকাতার ইতিহাসখ্যাত হেলওয়েল মনুমেন্ট ভাঙার আন্দোলনে তাদের উভয়ের অংশগ্রহণ প্রসঙ্গে মুজিবের অন্তরঙ্গ আলাপে মজহারুল কুদ্দুস আপ্ত হন। তিনি মুজিবের একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও অনুসারী হয়ে যান। মুজিবের নেতৃত্বে বিভিন্ন আন্দোলন ও আত্মমানবতার সেবাকার্যে অংশগ্রহণ করেন। ছেচল্লিশের দাঙ্গায় কুদ্দুস পিঠে ছুরিকাহত হন। খবর পেয়ে শেখ মুজিব, সৈয়দ নূর, হাফিজ,

ওয়াজিউল্লাহ ও আসলাম প্রমুখ সহপাঠী বন্ধুরা সুরেন ব্যানার্জি রোড থেকে আহতাবস্থায় কুদ্দুসকে উদ্ধার করে বেকার হোস্টেলে নিয়ে আসেন। তালতলার ডাক্তার মজিবুর রহমান ও কলকাতা প্রেসিডেন্সির সার্জন ডাক্তার গিয়াস উদ্দীনের তত্ত্বাবধানে দুই মাস চিকিৎসাধীন ছিলেন। মুজিবের নেতৃত্বে ছাত্ররা বিভিন্ন গ্রুপে ভাগ হয়ে রিপন স্ট্রিট ও পার্ক সার্কাসে স্থাপিত উদ্ধৃত্ত শিবিরে আহতদের চিকিৎসাসেবা ও আশ্রিতদের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করতে কলকাতা শহরময় ছুটে বেড়ান। মুজিবের নেতৃত্বে কয়েকশ তরুণ-যুবক সিলেট গণভোটে কাজ করেছিলেন, তাদের মধ্যে একজন ছিলেন মজহারুল কুদ্দুস। মজহারুল কুদ্দুসের স্মৃতিকথায় মুজিবের অসাধারণ স্মৃতিশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন— ‘অসাধারণ মেধা ছিল তার, ... পরবর্তীতে দেখেছি তার রাজনৈতিক জীবনে এই অসাধারণ গুণটি তাকে সাফল্য এনে দিয়েছিল। আমার মনে হয় বাংলাদেশের লক্ষাধিক লোকের নাম ও ঠিকানা তার কণ্ঠস্থ ছিল। হয়তো কাউকে কোথাও মাত্র একবার দেখেছিল, বছর দশেক পরে অন্য কোথাও তাকে দেখেছে। সঙ্গে সঙ্গে তাকে নাম ধরে ডাক দিয়েছে পরমচেনা আত্মীয়ের মতো। ফলে ঐ লোকটি সারাজীবন শেখ মুজিবের সমর্থক না হয়ে থাকতে পারে না। এই ভাবেই শেখ মুজিব কোটি মানুষের হৃদয় জয় করেছিল। এই জয়ের পেছনে তার রাজনৈতিক দাবিগুলির শক্ত ভিত্তি, স্বাভাবিক যুক্তি এবং বিশ্বস্তের ও শোষিতের উদ্দেশ্য আশা জাগাবার প্রচণ্ড সংকল্পের বোঁক ছিল। এই সংকল্প বাস্তবায়ন করতে গিয়ে সে যৌবনের অধিকাংশ সময় জেল খেটেছে, বৈরী প্রশাসকের হাতে নিগৃহীত হয়েছে। জীবনভর তিল তিল করে এই ত্যাগের মহিমায় সে বিশ্বনেতার আসনে উন্নীত হয়েছে। আমরা যখন ছকবাঁধা ভোগের জীবনযাপনের প্রকৃতি নিছিলাম সে তখন শোষিত ও বঞ্চিতদের কোন দাবি নিয়ে হয় রাস্তায় মিছিল করে বেড়াচ্ছিল অথবা পল্টন ময়দানে বা লালদীঘি ময়দানে, খুলনার সার্কিট হাউস ময়দানে বা সিঙ্গিরগঞ্জের জনসমাবেশে বক্তৃতা করছিল। কখনো বা সরকারের রোষানলে পড়ে জেল খাটছিল। আমরা তার সহপাঠী ও অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলাম বটে কিন্তু রাজনৈতিক আন্দোলনের তাগিদে তার মতো ঘরছাড়া বেদুঈনের মতো দেশের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে ঘুরে বেড়াইনি। আমি দেখেছি আন্দোলন সংগঠনের কাজে তার থাকা-খাওয়ার ও কাপড়-চোপড়ের কোনো ঠিক-ঠিকানা ছিল না। কলকাতা ও ঢাকায় এমনভাবেই সে চলেছিল। ঝাঁ করে কোনো কোনো দিন এসে আমাদের কাছ থেকে যাই সংগ্রহ করতে পারত টাকা নিয়ে যেত এবং পরনের কাপড় পাতে যে কাপড়টা তার গায়ে লাগত সেটা পরেই চলে যেত। আমরা হাসিমুখেই এই বেদুঈন কর্মীর চলার পথে তাকিয়ে শুভ কামনা জানাতাম।’ সংগঠনের কাজে মুজিব সারা বাংলায় ভ্রমণ করেন। যেখানেই গেছেন পরম আন্তরিকতা ও ব্যবহারে ভক্ত অনুরাগী দল জুটে যেত। যারা একবার মাত্র দেখেছেন ও কথা বলেছেন তার জন্য মুজিবের ভক্ত অনুরাগীতে পরিণত হয়ে যান। সারাজীবনের

বন্ধু মজহারুল কুদ্দুসের স্মৃতিচারণে জানা যায় এমন কয়েকজন একনিষ্ঠ ভক্ত অনুসারীর নাম। যাদের সঙ্গে ও বাড়িতে মুজিব রাত কাটিয়েছেন এবং একসঙ্গে খেয়েছেন। মহেশখালীতে ফজল করিম মাস্টারের বাড়িতে, রামুর আবু নছরের বাড়িতে, পঞ্চগড়ে মেরাজ উদ্দীনের বাড়িতে, সাতক্ষীরার আলতাফ মণ্ডলের বাড়িতে রাত কাটিয়েছেন মুজিব। বগুড়ার ক্ষেত্রলাল প্রাইমারি স্কুলের ছাত্রদের বেষ্ট একত্র করে রাতে ঘুমিয়েছেন মুজিব। এভাবেই শেখ মুজিব বিভিন্ন সময়ের আন্দোলন-সংগ্রামে ও সকল পেশার মানুষকে শোশন বঞ্চনার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ করতে গ্রামেগঞ্জে কাজ করেন। কুদ্দুসের মতে, মুজিবের মতো এভাবে গ্রামেগঞ্জে সাধারণ মানুষের সঙ্গে আন্তরিক সম্পর্ক, ব্যক্তিগত পরিচয় ও বিভিন্ন পেশার মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন দেশে-বিদেশে অন্য কোনো রাজনৈতিক নেতার আছে কিনা সন্দেহ। মুজিবই একমাত্র নেতা যিনি গভীর আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে গণমানুষের দাবির কথা সুস্পষ্টভাবে এবং দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে পারতেন। কুদ্দুস আরো লিখেছেন;

‘মানুষ যখন পরার্থে নিজেকে বিলীন করে দেয়, তখন জনগণের আস্থা ও ভালোবাসায় সে অনেক উঁচু স্তরে অভিযুক্ত হয়ে যায়। জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অভিষেক তখন যে সে বঙ্গবন্ধু হয়ে গিয়েছিল তার কোনো হদিস নেই। এটা তার কোনো সরকারি আনুষ্ঠানিক খেতাব নয়। এটা জনগণের দেওয়া আন্তরিক অভিনন্দনের খেতাব।’

মজহারুল কুদ্দুসের লেখায় মুজিবের কলকাতা জীবনের অনালোচিত ও অজানা কিছু বিষয়ের কথা জানা যায়। বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের স্থপতি এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রধান নেতা হিসেবে শেখ মুজিবুর রহমানের পরিপক্ব হয়ে ওঠার পেছনে কলকাতা জীবনের ঘটনাবলি বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক ও গুরুত্বপূর্ণ। শেখ মুজিব একদিনে মুজিব ভাই হয়ে ওঠেননি বা বঙ্গবন্ধু ও বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাননি সেই গোপালগঞ্জের মিশনারি স্কুল থেকে ধাপে ধাপে এবং ধীরে ধীরে বেড়ে উঠেছেন ও তারগের মহিমায় নিজেকে গড়ে তুলেছেন। সেই হিসেবে এই আলোচনাটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

ছাত্রদের জন্য দাবি আদায় :

মোহাম্মদ মজহারুল কুদ্দুস আরো লিখেছেন, ইসলামিয়া কলেজের মুসলিম ছাত্ররা কলকাতা ও বাইরের জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে ট্রেন, ট্রাম ও বাসযোগে আসা-যাওয়া করতেন। সমাজের অনগ্রসর মুসলিম ছাত্রদের যাতায়াতসহ থাকা-খাওয়ার সমস্যা ছিল প্রকট। শেখ মুজিব ছিলেন উদ্যমী ছাত্রনেতা। তিনি ছাত্রদের জন্য নতুন হোস্টেল নির্মাণের দাবিতে ইসলামিয়া এবং বেকার ও কারমাইকেল হোস্টেলের ছাত্রদের সংঘটিত করে বাংলার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিনের বাসভবন অভিমুখে ছাত্রদের মিছিল নিয়ে যান ও মুসলমান ছাত্রদের জন্য হোস্টেল নির্মাণের দাবি জানান। তার নেতৃত্বে লাগাতার আন্দোলনের প্রেক্ষিতে ১৯৪৪ থেকে ১৯৪৬ সালের মধ্যে কলকাতায় মুসলিম ছাত্রদের জন্য মির্জাপুর স্ট্রিটে জিন্মাহ হল ও পার্ক স্ট্রিটে সিরাজউদৌলা হল

স্থাপিত হয়। এই দুটো হলে প্রায় ৫০০ মুসলিম ছাত্রের আবাসনের সুব্যবস্থা হয়। শেখ মুজিবকে নিয়ে ছাত্ররা আন্দোলনের মাধ্যমে বেনে পুকুরে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ও আইন বিষয়ের মুসলিম ছাত্রদের জন্য ইকবাল ছাত্রাবাস প্রতিষ্ঠায় সমর্থ হয়। মজহারুল কুদ্দুস থাকতেন বেনে পুকুরের ইকবাল হলে।

কুদ্দুসের মতে, কলকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা মোকাবেলা ও দুর্গতদের চিকিৎসা, আশ্রয় ও সাহায্য প্রদানের পর সোহরাওয়ার্দীর ঘনিষ্ঠ অনুসারী হিসেবে মুজিবের পরিচিতি ও জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়।

এদিকে সাতচল্লিশের মধ্য আগস্টে খণ্ডিত বাংলাদেশের বৃহদাংশ নিয়ে পূর্ব পাকিস্তান এবং বর্ধমান বিভাগ ও মালদহ, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং নিয়ে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ গঠিত হয়। প্রফুল্লচন্দ্র বোষের নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসি মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসবিরোধী রাজনৈতিক কর্মীদের দ্বারা শান্তিভঙ্গের আশঙ্কায় কলকাতায় অবস্থানকারী মুসলিম ছাত্র নেতৃবৃন্দের সক্রিয় কিছুসংখ্যককে চিহ্নিত করে একটি গোপন তালিকা তৈরি করা হয়। এ তালিকায় সোহরাওয়ার্দী অনুসারী হিসেবে শেখ মুজিবুর রহমান ও মজহারুল কুদ্দুসের (কুদ্দুসের মতে) নাম ছিল। তালতলা পুলিশের এক কর্মকর্তা (আবদুল রফিক) ১৯৪৮ সালের জানুয়ারির কোনো এক সময় বেনে পুকুরের ইকবাল হলে এসে মজহারুল কুদ্দুসকে গোপনে এসে জানান সেই রাতেই তিনি (কুদ্দুস) ও মুজিব যদি কলকাতা ছেড়ে না যান, তবে পরদিন সকালে গ্রেপ্তারের সম্ভাবনা আছে। কলকাতায় সে সময় পাকিস্তান সরকারের কিছু উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা রাইটার্স বিল্ডিং থেকে পাকিস্তানসংক্রান্ত নথিপত্র সংগ্রহের জন্য স্টিয়ারিং কমিটির সদস্য হিসেবে সেখানে কাজ করছিলেন। আবদুল গফুর ছিলেন সে কমিটির অন্যতম সদস্য। সাবেক সহকর্মী হিসেবে গোপন তালিকার খবরটি জেনে যান আবদুল রফিক এবং তিনি মজহারুল কুদ্দুসকে জানিয়ে দেন। শেখ মুজিব তখন বেনে পুকুর লেনের কাছে লিটন স্ট্রিটে থাকতেন। কুদ্দুস তাকে এ খবরটি জানিয়ে দেন। সে রাতেই বিছানাপত্র নিয়ে শিয়ালদহ স্টেশনে পৌঁছে যান উভয়ে। (সূত্র : মজহারুল কুদ্দুসের হাতে লেখা পাণ্ডুলিপি)।

শেখ মুজিব খুলনা মেইলে ও মজহারুল কুদ্দুস চিটাগাং মেইলে কলকাতা ত্যাগ করেন। কুদ্দুসের সাক্ষ্যমতে, কিছুদিন পর উভয়ে ঢাকায় মিলিত হন। এ ঘটনার মাধ্যমে জানা যায় ‘৪৭-এর ১৪ আগস্ট পাকিস্তান রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ের পাঁচ মাস পর ‘৪৮-এর জানুয়ারিতে শেখ মুজিবুর রহমান কলকাতা ছেড়ে ঢাকায় চলে আসেন।

ভাষা আন্দোলন থেকে স্বাধিকার আন্দোলনের পথে :

শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকায় এসে দেখেন বাঙালি ভাষা-সংস্কৃতি নিয়ে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ও তাদের দোসররা এক নতুন খেলায় মেতেছে। সেই সঙ্গে শুরু হলো সরকারিভাবে বাঙালিদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক ও প্রশাসনিকভাবে পেছনে ঠেলে দেয়ার চক্রান্ত। বাঙালি রাজনীতিবিদরা বিষয়টি বুঝতে দেরি

করলেও বুদ্ধিজীবী ও সাংস্কৃতিক কর্মীরা মোটেও বিলম্ব করেননি। তার প্রমাণ অধ্যাপক আবুল কাশেমের ‘তমদ্দুন মজলিস’ নামে সাংস্কৃতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ভাষাবিরোধী চক্রান্তের প্রতিবাদে সংগঠিত হওয়া। ‘৪৭ সালের ১ সেপ্টেম্বর তার (অধ্যাপক আবুল কাশেম) ঢাকার ১৯ নম্বর আজিমপুরের বাসভবনে সংগঠনটি প্রতিষ্ঠার পর থেকে সে বছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত এককভাবে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয়। এর মধ্যে ‘পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু’ পুস্তিকা প্রকাশ, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে সাহিত্যসভা ও সেমিনার আয়োজন, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীসহ বিভিন্ন পেশার মানুষের সঙ্গে মতবিনিময়, গণস্বাক্ষর সংগ্রহ ও সরকারের কাছে পেশ, মন্তব্য-নেতৃবৃন্দ পর্যায়ে সংলাপ, বাংলা ভাষার পক্ষে জনমত গঠনের জন্য পোস্টার-প্রচারপত্র প্রকাশ ও প্রচার, দেশব্যাপী কর্মসভা ও কর্মী সংগ্রহ এবং ডিসেম্বরে প্রথম রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন উল্লেখযোগ্য।

‘৪৮ সালের জানুয়ারিতে ভাষা আন্দোলন নতুন মাত্রা লাভ করে। এতদিন শুধু তমদ্দুন মজলিসের নেতাকর্মীদের মাঝে ভাষা আন্দোলন সীমাবদ্ধ ছিল, এবার অন্যান্য দল ও মতের লোকও একাত্মতা প্রকাশ করে।

‘৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি ঢাকার ফজলুল হক মুসলিম হলের এক সভায় পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ গঠিত হয়। নঈমউদ্দিন হন আহ্বায়ক। কলকাতা প্রত্যায়িত ছাত্রনেতা শেখ মুজিবুর রহমান অনেক পরিশ্রম করে সংগঠনকে শক্তিশালী করতে সচেষ্ট হন। তিনি রাষ্ট্রভাষা বাংলার পক্ষে কাজ শুরু করেন। এদিকে পাকিস্তানের পার্লামেন্টে সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের বাংলায় বক্তৃতা ও বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি প্রত্যাখ্যাত হয়। ২ মার্চ রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ সম্প্রসারণ করা হয়। এবার অন্যান্য দল ও মতের লোকেরা অন্তর্ভুক্ত হন পরিষদে। তমদ্দুন মজলিস ও পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ যৌথ সভায় বসে সংগ্রাম পরিষদ পুনর্গঠন করে। ১১ মার্চ পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের প্রতিবাদে ও বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে ঢাকাসহ সমগ্র পূর্ব বাংলায় ধর্মঘটসহ হরতাল পালন করে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর এটাই ছিল প্রথম ও সফল হরতাল। ঢাকায় সচিবালয়ের গেটে শামসুল হক, শেখ মুজিবুর রহমান, অলি আহাদ, খালেক নওয়াজ, শওকত আলী ও কাজী গোলাম মাহবুব পিকেটিং করেন। বিভিন্ন স্থানে মুসলিম লীগ কর্মী ও পুলিশের সঙ্গে আন্দোলনরত কর্মীদের সংঘর্ষ হয়। শেখ মুজিব, অলি আহাদসহ ৭০-৭৫ জন কর্মীকে গ্রেপ্তার করে কারাগারে নিষ্ক্ষেপ করা হয়। মুজিব ছাড়া পান ১৫ মার্চ সন্ধ্যায় সরকারের সঙ্গে সংগ্রাম পরিষদের সম্পাদিত চুক্তির পদ। এটাই মুজিবের প্রথম জেলে যাওয়া নয়, ছোটবেলায়ও তিনি জেলে গেছেন। কিন্তু ভাষার জন্য আন্দোলন করে জেলে যাওয়া এই প্রথম। মওলানা ভাসানী পাকিস্তান সৃষ্টির পর প্রথম প্রতিষ্ঠা করেন আওয়ামী মুসলিম লীগ। শেখ মুজিব মওলানার পাশে থেকে এ সংগঠন প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি ১৯৫৩ সালে দলের সাধারণ সম্পাদক ও ‘৬৬ সালে

সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার আগে-পরে মাঠ পর্যায়ের সংগঠনকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য কাজ করেন। এরপর তিনি ৬ দফা পেশ, ৬ দফার পক্ষে দেশব্যাপী সফর করে জনমত গঠন, গ্রেপ্তার ও আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় আসামি হিসেবে কারাগারে কাটান এবং মুক্তিলাভের পর থেকে একাত্তরের ২৫ মার্চ রাতে গ্রেপ্তার ও পাকিস্তানের কারাগারে যাওয়া পর্যন্ত বাঙালির জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। তার অনুপস্থিতিতে এবং তার নামে ও নেতৃত্বে বাঙালি জাতি এক রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ছিনিয়ে আনে স্বাধীনতার লাল সূর্যটাকে। শেখ মুজিবের রাজনৈতিক গুরু হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মতো তিনিও দলের সাংগঠনিক ভিত্তি শক্তিশালী করার ওপর গুরুত্ব দেন ও সে অনুসারে কাজ করেন। দীর্ঘদিন ধরে নেতৃত্ব দিয়ে দলে যেমনি, তেমনি দেশের রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে নিজের গ্রহণযোগ্যতা প্রমাণ করেন। অনেক বাধাবিপত্তি পার করে, জেল-জুলুম ও নির্যাতন মাখায় নিয়ে শ্রম ও সাংগঠনিক দক্ষতা দিয়ে মুজিব পূর্ব বাংলার রাজনীতিতে নতুন দিগন্তের সূচনা করেন। সেই সঙ্গে আওয়ামী লীগকে পুনরুজ্জীবিত করেন ও দেশের গ্রাম পর্যায়ে তৃণমূলে পর্যন্ত একদল নিষ্ঠাবান ও ত্যাগী রাজনীতিবিদ তৈরি করেন; যারা হলেন যুগে যুগে আওয়ামী লীগের প্রাণভোমরারূপ।

৬ দফা প্রণয়ন ও উপস্থাপন :

'৫২-এর ভাষা আন্দোলনের সময় মুজিব জেলে ছিলেন। তিনি '৫৪ সালের নির্বাচনে জিতে পূর্ব বাংলার আইনসভার সদস্য ও যুক্তফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রিত্ব লাভ করেন। কিন্তু পাকিস্তানের স্বৈরাচারী শাসককুল অবশ্য যুক্তফ্রন্ট সরকারকে বেশিদিন ক্ষমতায় থাকতে দেয়নি। এরপর দেশে বেশকিছু ঘটনা ঘটে। '৫৪ থেকে '৫৮ পর্যন্ত মাত্র চার বছরে পূর্ব পাকিস্তানে সাতবার মন্ত্রিসভার পতন ঘটে ও তিনবার গভর্নরের শাসন জারি হয়। অন্যদিকে '৫১ সালে লিয়াকত আলী খানের মৃত্যুর পর থেকে সাত বছরের মধ্যে ছয়বার মন্ত্রিসভা বা সরকারের পতন ঘটে। '৫৮ সালের অক্টোবরে সেনাপ্রধান আইয়ুব খান সামরিক আইন জারি করেন। '৬২ সালের জুন পর্যন্ত ৪৪ মাস রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ ছিল। দেশের বিশিষ্ট রাজনীতিবিদদের রাজনৈতিক জীবন ধ্বংস করতে '৫৯ সালের ৭ অক্টোবর দুটি আদেশ জারি করা হয়। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, খান আবদুল গাফফার খান, মিয়া মমতাজ দৌলতানাসহ ৮৭ জন রাজনীতিবিদ অভিযুক্ত হন। এ সময় (১৯৫৮-৬২) পাকিস্তানে বিশেষ কোনো আন্দোলন সংঘটিত হতে পারেনি। দেশরক্ষা আইনে '৬২ সালের ৩০ জানুয়ারি সোহরাওয়ার্দী গ্রেপ্তার হওয়ার পর সামরিক শাসকবিরোধী আন্দোলনের সূচনা হয়। এ সময় আইয়ুব খান মৌলিক গণতন্ত্র প্রবর্তন, নতুন সংবিধান প্রণয়ন ও জাতীয় পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠান করেন, প্রত্যাহার করেন সামরিক আইন। '৬২ সালে শরিফ কমিশনের শিক্ষা রিপোর্ট প্রকাশিত হলে দেশব্যাপী ব্যাপক ছাত্র আন্দোলন গড়ে ওঠে, গঠিত হয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ। সোহরাওয়ার্দী মুক্তি পান। তিনি স্বতন্ত্রভাবে আওয়ামী লীগের পুনরুজ্জীবন না ঘটায় গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের জন্য আওয়ামী লীগ, ন্যাশনাল

আওয়ামী পার্টি, জামায়াতে ইসলামী, নেজামে ইসলাম পার্টি ও কাউন্সিল মুসলিম লীগের সমন্বয়ে এনডিএফ (ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট) গঠন করেন। ১৯৬৩ সালের ৫ ডিসেম্বর হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী বৈরতে মারা যান। ১৯৬৫ সালে অনুষ্ঠিত হয় পাকিস্তানে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। উপরোক্ত দলগুলো 'কপ' নামে (ঈডসনরহবফ ওচুডুংঃঃঃঃ চখৎঃঃ) নির্বাচনী জোট গঠন করে ফাতেমা জিন্নাকে প্রার্থী মনোনয়ন দেয়। অন্যদিকে কনভেনশন মুসলিম লীগ আইয়ুব খানকে প্রার্থী ঘোষণা করে। মৌলিক গণতন্ত্রীদের ভোটে আইয়ুব খান প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। এরপর দেশে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলো— পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধ। পূর্ব পাকিস্তান আক্রান্ত না হলেও ছিল অরক্ষিত। এ বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায় যে, ভারত চাইলে খুব সহজেই পূর্ব পাকিস্তান দখল করে নিতে পারত। এতে সামরিক ও অর্থনৈতিক পরিনির্ভরশীলতাসহ পূর্ব বাংলার সার্বিক অসহায়ত্ব প্রকটভাবে ধরা পড়ে। পূর্ব পাকিস্তানিদের নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে— এ বিষয়টি পূর্ব বাংলার নেতাদের মাথায় ভালো মতো ঢুকে যায়। বাঙালিদের ওপর এতদিনকার সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের সঙ্গে যুক্ত হয় সার্বিক নিরাপত্তাহীনতার বিষয়টি। এই অবহেলা ও ঔদাসীন্য বাঙালিদের ভাবিয়ে তোলে। ফলে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের দাবি আরো জোরদার হয়ে বাঙালির প্রাণের দাবিতে পরিণত হয়। আওয়ামী লীগ স্বায়ত্তশাসনের দাবি জোরালোভাবে উপস্থাপন করে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও শেরেবাংলা একে ফজলুল হক তখন আর বেঁচে নেই। মওলানা ভাসানীও সেসময়ে আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত নেই, তিনি ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি গঠনপূর্বক আলাদাভাবে অবস্থান নিয়েছেন। এমন অবস্থায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে এককভাবে এসে পড়ে শেখ মুজিবের হাতে। এবার তিনি দীর্ঘকালের আন্দোলন-সংগ্রামের অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে উদ্যোগী হন। প্রণয়ন করেন ঐতিহাসিক ছয় দফা। শুরু করলেন ছয় দফাকে কেন্দ্র করে বাংলার স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন। সুযোগ খুঁজলেন ছয় দফা উপস্থাপনের। ১৯৬৬ সালের ৫-৬ ফেব্রুয়ারি লাহোরে অনুষ্ঠিত হয় বিরোধী দলগুলোর জাতীয় সম্মেলন। আওয়ামী লীগের সভাপতি হিসেবে শেখ মুজিবুর রহমান ৬ ফেব্রুয়ারি ঐতিহাসিক ছয় দফা কর্মসূচি উত্থাপন করেন। এর আগে ৪ ফেব্রুয়ারি শূক্রবার আওয়ামী লীগ নেতা লাহোরের উদ্দেশে ঢাকা ত্যাগ করেন এবং ঢাকা ত্যাগের প্রাক্কালে তেজগাঁও বিমান বন্দরে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে বলেন, 'সাম্প্রতিককালে উপর্যুপরি পটপরিবর্তনে ইহাই প্রতিভাত হইয়াছে যে ব্যক্তির খোয়াল-খুশি অনুযায়ী নাহে সমষ্টির বিচারবুদ্ধি অনুযায়ী দেশের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে। দেশবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত করার জন্য নির্ভেজাল গণতন্ত্র পুনরায় কায়মে করিতে হইবে। বিগত যুদ্ধের অভিজ্ঞতা হইতে আজ সকলেই পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশি ভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন যে, ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে শাসনতান্ত্রিক শর্তানুযায়ী পূর্ব পাকিস্তানকে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও দেশরক্ষামূলক বিষয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও আত্মনির্ভরশীল

করার দ্বারাই দেশের অখণ্ডতা ও সংহতি বজায় রাখা সম্ভব।' দৈনিক ইত্তেফাক শেখ মুজিবের বক্তব্যের বিষয় নিয়ে ৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬ সংখ্যায় প্রথম পাতায় দ্বিতীয় প্রধান শিরোনামপূর্বক বিস্তারিত সংবাদ প্রকাশ করে। লাহোর সম্মেলনে শেখ মুজিবের সঙ্গে প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক তাজউদ্দীন আহমদ, কোষাধ্যক্ষ নূরুল ইসলাম চৌধুরী, জাতীয় পরিষদে আওয়ামী লীগ দলীয় সদস্য অধ্যাপক ইউসুফ আলী এবং প্রাদেশিক পরিষদে বিরোধী দলের নেতা আবদুল মালেক গমন করেন। ৫ ফেব্রুয়ারি লাহোরে নেজামে ইসলামী দলের নেতা চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর বাসভবনে দুদিনব্যাপী নিখিল পাকিস্তান জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন কাউন্সিল মুসলিম লীগ প্রেসিডেন্ট সৈয়দ মোহাম্মদ আফজাল। পূর্ব পাকিস্তানের সাবেক গভর্নর লে. জেনারেল মোহাম্মদ আজম খান ও চৌধুরী মোহাম্মদ আলী সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশনে ভাষণ দেন। উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে আমন্ত্রিত ৮০০ ব্যক্তির মধ্যে দেশের বিভিন্ন অংশ থেকে সর্বমোট ৭৪০ জন সম্মেলনে যোগদান করেন। তাদের মধ্যে ১২৪ জন লাহোর, ৫৯৫ জন পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য স্থান এবং ২১ জন পূর্ব পাকিস্তান থেকে যোগদান করেন। উল্লেখযোগ্যরা হলেন, মওলানা আবুল আলা মওদুদী, নবাবজাদা নসরুল্লাহ খান, সর্দার শওকত হায়াত খান, শেখ মুজিবুর রহমান, মৌলভী ফরিদ আহমদ প্রমুখ। এদিকে সরকার ৫ ফেব্রুয়ারি গভীর রাতে 'পাকিস্তান রক্ষা বিধি' (ডিফেন্স অব পাকিস্তান রুলস) ৫২ ধারা অনুযায়ী বিরোধী দলের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে প্রদত্ত বিভিন্ন বক্তার বক্তৃতা প্রকাশনা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। দৈনিক ইত্তেফাক ৬ ফেব্রুয়ারি প্রথম পৃষ্ঠায় বন্ধ হেডিং করে সে সংবাদ প্রকাশ করে। ফলে ৬ দফা সম্পর্কিত কোনো সংবাদ প্রকাশিত হয়নি। শেখ মুজিবুর রহমান ৬ ফেব্রুয়ারি তার ৬ দফা কর্মসূচি উত্থাপন করলে উপস্থিত ৭৪০ সদস্যের মধ্যে ৭৩৫ জন তাৎক্ষণিকভাবে তা প্রত্যাখ্যান করেন। সৃষ্ট বিরূপ পরিস্থিতিতে মুজিবসহ অন্য ৬ জন সফরসঙ্গী দুদিন করাচিতে আটকা পড়ে থাকেন। ১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬ দৈনিক ইত্তেফাক প্রথম পৃষ্ঠায় সংবাদ প্রকাশ করে 'শেখ মুজিবের ঢাকা উপস্থিতি বিলম্বিত' শিরোনামে। বলা হয় বিমানে স্থানভাবহেতু করাচিতে আটকা পড়িয়া আছেন শেখ মুজিবুর রহমান ও তার অপর ৬ জন সহকর্মী। পূর্ব ঘোষণানুযায়ী ৯ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় প্রত্যাবর্তনের কথা ছিল, শেষ পর্যন্ত তারা ১১ ফেব্রুয়ারি ঢাকা ফেরেন। ৬ দফা কর্মসূচি নিয়ে দেশে চরম অস্বস্তিকর পরিস্থিতি তৈরি হয়। খোদা আওয়ামী লীগের ভেতরেও ৬ দফার পক্ষে-বিপক্ষে নানা কথা ওঠে। শেষ পর্যন্ত মানুষ বুঝতে পারে এই ৬ দফাই বাঙালির মুক্তির সনদ হতে পারে। দীর্ঘদিনের বঞ্চনা-উপেক্ষার অবসান হতে পারে। বাঙালি মাত্রই আশাবাদী হয়ে ওঠেন। এদিকে দৈনিক ইত্তেফাক সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া ৬ দফা সমর্থন করেন। তিনি নিয়মিত সংবাদ প্রকাশ ও নিজের লেখা উপসম্পাদকীয় কলাম লিখে ৬ দফার পক্ষে জনমত গঠনে অগ্রণী ভূমিকা

পালন করেন।

তবে চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ নেতারা সর্বপ্রথম ১৩ ফেব্রুয়ারি সংবাদপত্রে বিবৃতি প্রচার করে ছয় দফার প্রতি সমর্থন ঘোষণা করেন। পরদিন ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কমিটি ৬ দফা সমর্থনপূর্বক বিবৃতি দেয়। ধীরে ধীরে আওয়ামী লীগের অন্যান্য সহযোগী সংগঠন ৬ দফার প্রতি সমর্থন দিতে শুরু করে। দৈনিক ইত্তেফাকের তৎকালীন বার্তা সম্পাদক সিরাজুদ্দীন হোসেনের ভূমিকা ছিল এক্ষেত্রে অগ্রণী। তিনি ‘ছয় দফা কি ও কেন’ শিরোনামে ছয় দফা ব্যাখ্যা করে যে নিবন্ধ লেখেন তা ইত্তেফাক পত্রিকায় পর পর ছয় দিন প্রকাশিত হয়। এটা পুস্তক আকারে চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগ প্রকাশ ও প্রচার করে। এ পুস্তিকাই ছয় দফার ওপর লেখা প্রথম পুস্তিকা।

৬ দফার পক্ষে প্রথম জনসভা হয় চট্টগ্রামের লালদীঘি ময়দানে। ২৫ ফেব্রুয়ারি মুজিব চট্টগ্রাম যান। সেদিন বিকালে অনুষ্ঠিত জনসভায় ভাষণ দেন। সে সময় প্রথম লাল মলাটে ছাপানো ৬ দফার পুস্তিকা বিলি করা হয়। প্রবীণ নেতাদের বিরোধিতা সত্ত্বেও ৬ দফা তরুণ নেতাকর্মীদের মধ্যে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে ও ক্রমে সাধারণ মানুষ এটা গ্রহণ করতে শুরু করে। অবশেষে ১৯৬৬ সালের ১৩ মার্চ আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির সভায় ও ১৮-১৯ মার্চ কাউন্সিল অধিবেশনে অনুমোদিত হয়। এই অধিবেশনে শেখ মুজিবুর রহমান ও তাজউদ্দীন আহমদ যথাক্রমে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। এরপরই আওয়ামী লীগ নেতারা ও শেখ মুজিব-তাজউদ্দীন আহমদ দেশব্যাপী ৬ দফার পক্ষে প্রচার-প্রচারণা শুরু করেন। শেখ মুজিব ২০ মার্চ থেকে ৮ মে পর্যন্ত ৫০ দিনে একটানা ৩২টি জনসভায় ভাষণ দেন। ঝটিকা সফরের মাধ্যমে ৬ দফার পক্ষে ব্যাপক জনমত সৃষ্টি হয়।

৬ দফা আন্দোলনে চট্টগ্রামের অবিসংবাদিত নেতা জহুর আহমদ চৌধুরী ও এমএ আজিজের নেতৃত্বে সর্বস্তরের নেতাকর্মী এবং সাধারণ মানুষের অবদান অবিস্মরণীয়। ১৯৬৬ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি লাহোরে ৬ দফা আনুষ্ঠানিকভাবে উপস্থাপিত হয়, মুজিব ঢাকায় ফিরে আসেন ১১ ফেব্রুয়ারি, আর দুই দিন পরই চট্টগ্রাম থেকে নেতৃত্ব ৬ দফার প্রতি সমর্থন ঘোষণা করেন ও সংবাদপত্রে বিবৃতি প্রচার করেন। দ্বিতীয়ত, ৬ দফার পক্ষে প্রথম জনসভাটি হয় চট্টগ্রামের লালদীঘি ময়দানে, সেখানে স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন মুজিব। তারিখটি ছিল ২৫ ফেব্রুয়ারি। আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সভায় ও কাউন্সিল অধিবেশনে অনুমোদিত হয় মার্চ মাসে। শুধু তাই নয়, ৬ দফা আন্দোলনকে গ্রাম-মহল্লা পর্যায়ে ছড়িয়ে দিতে নেতৃত্বের নির্দেশে চট্টগ্রামের রাজনৈতিক কর্মীদের সঙ্গে সাংস্কৃতিক কর্মীরা সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। ৬ দফা কী ও কেন? পুস্তিকা প্রকাশ ও বিতরণ করে এবং তুখোড় বক্তা ও লেখক ইদরিস আলম কর্তৃক ৬ দফার বাখ্যামূলক পুস্তিকা ‘বাঙালির মুক্তিসনদ’ প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়। ইদরিস আলম, আশরাফ খানের মতো তরুণ বক্তারা ৬ দফার প্রচার-প্রসারে দিন-রাত বিভিন্ন সভা-সমাবেশে বক্তৃতা দিতে থাকেন। ৬ দফা নিয়ে গান বাঁধলেন আবদুর রহমান (বদন দিদারী নামে খ্যাত)। তিনি বিভিন্ন সভা-সমিতিতে

সে গান গাইতে শুরু করেন। পাশাপাশি আওয়ামী লীগের কর্মীদের অনবদ্য তৎপরতায় চট্টগ্রামে মুসলিম লীগের তৎপরতা স্তিমিত হয়ে পড়ে এবং দিকে দিকে ৬ দফার প্রতি ব্যাপক জনমত ও দুর্বীর আন্দোলন গড়ে ওঠে।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামি পাকিস্তান সরকার ৬ দফাকে ‘বিচ্ছিন্নতার দাবি’, ‘বৃহত্তর বাংলার দাবি’ ও ‘রাষ্ট্রবিরোধী দাবি’ অভিহিত করে ব্যাপক দমন-পীড়ন চালায়। ৮ মে শেখ মুজিবুর রহমানকে দেশরক্ষা আইনে গ্রেপ্তার করা হয়। পরবর্তী দুই দিনের মধ্যে আওয়ামী লীগের সাড়ে ৩ হাজার নেতাকর্মী গ্রেপ্তার হন। গণহারে গ্রেপ্তার ও ব্যাপক নির্বাতনের প্রতিবাদে ও নেতৃত্বের মুক্তির দাবিতে আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগ ৭ জুন (১৯৬৬) সমগ্র পূর্ব-পাকিস্তানে হরতালের ডাক দেয়। হরতালকে কেন্দ্র করে সরকার বিরোধী দলের ওপর আক্রমণাত্মক ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। এক তথ্যমতে, সরকার পরবর্তী ৩ মাসে ৯ হাজারের বেশি নেতাকর্মীকে গ্রেপ্তার করে।

১৯৬৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে চট্টগ্রামে এমএ আজিজ ও জহুর আহমদ চৌধুরী কারামুক্ত হন। তাদের নেতৃত্বে ১৩ ফেব্রুয়ারি ৬ দফা দিবস পালিত হয়। এদিকে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন আন্দোলনকে চিরতরে দমন করার উদ্দেশ্যে সরকার ১৯৬৮ সালের জানুয়ারি মাসে শেখ মুজিবসহ ৩৫ জনের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রোচিতামূলক ‘আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা’ দায়ের করে। ফৌজদারি আইন ‘সংশোধনী বিশেষ ট্রাইব্যুনাল অর্ডিন্যান্স ১৯৬৮’ নামক অর্ডিন্যান্স জারি করে ৯ জুন ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে বিশেষ ট্রাইব্যুনালে এ মামলার বিচার শুরু হয়। ৭ মাস ধরে চলে মামলার শুনানি ও জেরার কাজ।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা শুরু হলে চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগ এ মামলার খরচ চালানোর জন্য ‘মুজিব ফান্ড’ গঠন করে এবং এমএ আজিজকে সভাপতি করে ১৫ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি গঠন করে। এ ফান্ডে অর্থ সংগ্রহের জন্য ১ (এক) টাকা মূল্যমানের রসিদ ছাপানো হয়। রসিদে চিত্র অঙ্কন করে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনৈতিক বৈষম্যের চিত্র তুলে ধরা হয়। পশ্চিম পাকিস্তানকে ধনী বোঝানোর জন্য কলকারখানার ছবি এবং পূর্ব পাকিস্তানকে অনুন্নত ও দরিদ্র দেখানোর জন্য গ্রামীণ জনপদ ও ডাউনবিনের ছবি আঁকা হয়। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের চিত্রের মাঝখানে শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি এঁকে দেয়া হয়। এ রসিদের চিত্র অঙ্কন করেন চিত্রশিল্পী সবিহ উল আলম। চট্টগ্রামে এ ফান্ডের মাধ্যমে ২০ হাজার টাকা চাঁদা তুলে ঢাকায় পাঠানো হয়।

গার্জেন্ট জহুরুল হকের হত্যাকাণ্ড ১৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯, শনিবার সকালে বিশেষ ট্রাইব্যুনালে বিচারার্থীন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম অভিযুক্ত সার্জেন্ট জহুরুল হক ঢাকা সেনানিবাসে বন্দি থাকাবস্থায় পাকিস্তানি সৈন্যের গুলিতে গুরুতররূপে আহত হন ও রাত ৯টায় কন্সাইন্ড মিলিটারি হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন। একই ঘটনায় আহত হন অন্য অভিযুক্ত সার্জেন্ট ফজলুল হক। সার্জেন্ট জহুরুল হক ১৯৬৮ সালের ১৮ জানুয়ারি থেকে সামরিক তত্ত্বাবধানে ঢাকা

সেনানিবাসে বন্দি ছিলেন।

এ ঘটনার প্রতিবাদে ১৭ ফেব্রুয়ারি সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ঢাকা শহরের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্র ধর্মঘট আহ্বান করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় ছাত্রসমাবেশ ও সভা শেষে শোভাযাত্রা বের করে। ঢাকাসহ সারা দেশের ছাত্র-জনতা প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ মিছিল করে। মওলানা ভাসানী এ ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবি করেন। হরতাল, ধর্মঘট ও বিক্ষোভ-মিছিলে ঢাকাসহ সমগ্র পূর্ব পাকিস্তান অচল হয়ে পড়ে।

জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার

১৬ ফেব্রুয়ারি প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান এক ঘোষণায় ১৯৬৫ সালের ৬ সেপ্টেম্বর জারিকৃত জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার করেন। ১৭ ফেব্রুয়ারি থেকে এ ঘোষণা কার্যকর হয়। দৈনিক ইত্তেফাক ১৭ ফেব্রুয়ারি ৮ কলামব্যাপী শিরোনাম করে ‘পাকিস্তানে জরুরি অবস্থার অবসান ঘোষণা’।

মামলা প্রত্যাহার ও মুজিবের মুক্তি

১৯৬৮ সালের শুরুর দিকে ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়নের মেনন ও মতিয়া উভয় গ্রুপ যৌথভাবে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করে। ছাত্র ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে সর্বদলীয় কমিটি গঠিত হয়। ১৯৬৯ সালের জানুয়ারির প্রথম দিকে ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়ন ও এনএসএফের অংশ ও ডাকসু মিলে গঠন করে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ (তোফায়েল আহমেদের মতে ৫ জানুয়ারি)। সংগ্রামী ছাত্র সমাজ ৬ দফার সঙ্গে যুক্ত করে ১১ দফা। ছাত্র-জনতার এ আন্দোলন সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোয় পালিত হয় ধর্মঘট, ছাত্র সমাবেশ। আইয়ুববিরোধী আন্দোলন প্রচণ্ড গণআন্দোলনে রূপ লাভ করে। বিরোধী দলগুলো জেটিবদ্ধ হয়ে ‘ডাক’ (ডেমোক্র্যাটিক অ্যাকশন কমিটি) গঠন করে ও সম্মিলিতভাবে আন্দোলন শুরু করে। একপর্যায়ে আওয়ামী লীগও সে আন্দোলনে যোগ দেয়। শ্রমিক-জনতা ও ছাত্রদের সম্মিলিত আন্দোলনে দিশাহারা হয়ে ওঠে সরকার।

এ সময় ১৯৬৯ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি সামরিক হেফাজতে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামি সার্জেন্ট জহুরুল হক এবং ১৮ ফেব্রুয়ারি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. শামসুজ্জোহা নিহত হলে সারা দেশ প্রতিবাদে গর্জে ওঠে। শিক্ষক-ছাত্র-শ্রমিক-জনতা রাজপথে নামে। আগে মতো পশ্চিম পাকিস্তানেও আইয়ুববিরোধিতা তীব্র হয়ে ওঠে। অবশেষে ১৯৬৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি সরকার আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহারপূর্বক শেখ মুজিবকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। মুজিব ততদিনে বাঙালি জনমানসে সবার প্রিয় ‘মুজিব ভাই’ হিসেবে অভিষিক্ত হন। সরকারি মালিকানাধীন দৈনিক পাকিস্তান পরদিন (২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯) পূর্ণ পৃষ্ঠাব্যাপী ব্যানার হেডলাইনে নিউজ ছাপে ‘মুজিবের মুক্তি : তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার’।

দৈনিক ইত্তেফাক (সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া) এদিন ৮ কলামব্যাপী ব্যানার হেড লাইনে নিউজ ছাপে ‘ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার’। ইত্তেফাক প্রথম পাতায় ‘জয় নিপীড়িত জনগণ জয়, জয় নব উত্থান’ শিরোনাম দিয়ে দীর্ঘ সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। পূর্ব পাকিস্তানের অন্য প্রভাবশালী

সংবাদপত্র ও আবুল কালাম শামসুদ্দীন সম্পাদিত 'দৈনিক পাকিস্তান' পত্রিকা প্রথম পৃষ্ঠা শেখ মুজিবের মালাভূষিত ছবি দিয়ে ৭ কলামব্যাপী হেডলাইন ছাপে 'মুজিবসহ সকলের মুক্তি লাভ'।

কারামুক্ত মুজিব

প্রবল গণআন্দোলনের ফলে ২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯ শনিবার অপরাহ্নে শেখ মুজিবুর রহমান কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করেন। এ খবরে চট্টগ্রাম শহরে রাজনৈতিক কর্মী ও সাধারণ মানুষ আনন্দে ফেটে পড়ে। সমগ্র শহরে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিজয় মিছিল হের হয় এবং পাড়া-মহল্লায় মিষ্টি বিতরণ করা হয়। দৈনিক ইত্তেফাকের চট্টগ্রাম অফিস থেকে পাঠানো সংবাদ— 'দৈনিক ইত্তেফাকে রিপোর্ট প্রকাশিত হয় যে, 'শহরের বিভিন্ন ফটোগ্রাফিতে শেখ মুজিবের ফটো হটকেকের মত বিক্রয় হয় এবং কোন কোন দোকানে তাহার একটি বড় সাইজের ছবি ৪০ টাকা পর্যন্ত বিক্রয় হয়। সারা বিকাল সারা শহরে পটকাবাজি চলিয়াছে এবং সন্ধ্যার পর লালদীঘি ময়দানে একটি কবিগানের আসরের ব্যবস্থা করা হয়। এই কবিগানের বিষয়বস্তু ছিল মুজিব বনাম আইয়ুব।'।

একই সঙ্গে মুজিবের মুক্তির সংবাদ পেয়ে ঢাকা, কুমিল্লা, নরসিংদী, রংপুরসহ সারা দেশের মানুষ উল্লাসে ফেটে পড়ে। হাজার হাজার মানুষ মুজিবকে নিয়ে শোভাযাত্রাসহকারে শহীদ মিনারে যায়। শহরের ভবন ও দোকানপাটে এত দিনকার উজ্জীন কালো পতাকার পরিবর্তে উড়তে দেখা যায় বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা।

রেসকোর্সে স্মরণকালের বৃহত্তম জনসভায় সংবর্ধনা সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে আয়োজিত ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে সর্বকালের বৃহত্তম গণসংবর্ধনা অনুষ্ঠানে শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা করেন যে, 'প্রয়োজন হইলে সংগ্রাম করিয়া আবার কারাগারে যাইব, কিন্তু দেশবাসীর সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিব না।' মুজিব আরো বলেন, তিনি সরকারপক্ষের প্রস্তাবিত রাজনৈতিক আলোচনায় অংশগ্রহণ করে দেশের উভয় অংশের পক্ষ হইতে দেশবাসীর অধিকারের দাবি উত্থাপন করবেন এবং যদি উত্থাপিত দাবি গ্রাহ্য করা না হয় তবে সে বৈঠক হতে ফিরে এসে দাবি আদায়ের জন্য তিনি দুর্বীর গণআন্দোলন গড়ে তুলবেন।

দৈনিক ইত্তেফাকে প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত প্রতিবেদন 'মহাসমুদ্রের মহাকল্লোলে' শিরোনামে সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ কর্তৃক দেশগৌরব নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে নজিরবিহীন ঐতিহাসিক গণসংবর্ধনা প্রদানের কথা বলা হয় এবং তাতে শুধু রাজধানী ঢাকার সকল শ্রেণির নাগরিক নন, সুদূর ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা প্রভৃতি স্থান থেকে অসংখ্য লোক যোগদান করেন বলে উল্লেখ করা হয়। ইত্তেফাকের রিপোর্ট অনুযায়ী সেদিনের ঐতিহাসিক গণসংবর্ধনায় দশ লক্ষাধিক লোক সমবেত হয়। দৈনিক ইত্তেফাক, ২৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯। সভায় সভাপতিত্ব করেন সর্বদলীয় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক তোফায়েল আহমেদ।

'বঙ্গবন্ধু' উপাধি লাভ

২৩ ফেব্রুয়ারি ঐতিহাসিক গণসংবর্ধনা অনুষ্ঠানের

সভাপতি তোফায়েল আহমেদ 'পূর্ববাংলার নির্যাতিত জননায়ক' শেখ মুজিবুর রহমানকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করেন। দৈনিক ইত্তেফাক ২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯ প্রথম পাতার নিচের অংশে এক কলামে শিরোনাম করে 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব'। রিপোর্টের ভাষা— 'কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক ও গতকল্যকার গণসংবর্ধনা সভার সভাপতি জনাব তোফায়েল আহমেদ শেখ মুজিবুর রহমানের বাংলা ও বাঙ্গালীর স্বার্থে অবিচল ও অবিরাম সংগ্রামের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া ঢাকার ইতিহাসে সর্বকালের সর্ববৃহৎ জনসমাবেশের উদ্দেশ্যে বলেন যে, আমরা বক্তৃতা বিবৃতিতে শেখ মুজিবুর রহমানকে নানা বিশেষণে বিশেষিত করার প্রয়াস পাই। কিন্তু তার রাজনৈতিক জীবন বিশ্লেষণ করিলে যে সত্যটি সবচাইতে ভাস্বর হইয়া উঠে তা হইতেছে তিনি মানবদরদি বিশেষ করিয়া বাংলা ও বাঙ্গালি দরদি প্রকৃত বন্ধু তাই আজকের এই ঐতিহাসিক জনসমুদ্রের পক্ষ হইতে আমরা তাকে বঙ্গবন্ধু উপাধিতে ভূষিত করিতে চাই। রেসকোর্সের জনতার মহাসমুদ্র তখন একবাক্যে বিপুল করতালির মধ্য দিয়া এই প্রস্তাব সমর্থন করেন।' মুজিব ভাই হলেন বঙ্গবন্ধু

গণআন্দোলনের চাপে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান ক্ষমতায় থাকতে পারলেন না। তিনি ক্ষমতা হস্তান্তর করেন সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল ইয়াহিয়া খানের কাছে। জেনারেল ইয়াহিয়া ক্ষমতা হাতে নিয়ে দেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান ও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু পাকিস্তানের রাজনৈতিক পরিস্থিতি দিনের পর দিন খারাপের দিকে যেতে লাগল। ষড়যন্ত্র দানা বেঁধে উঠতে লাগল। আর পাশাপাশি ৬ দফা আন্দোলন বাঙালির প্রাণের দাবিতে পরিণত হয়। এ ৬ দফার দাবি স্বায়ত্তশাসনের দাবি শুধু পূর্ব বাংলায় সীমাবদ্ধ থাকল না, পশ্চিম পাকিস্তানেও প্রভাব ফেলতে শুরু করে। ৬ দফা পশ্চিম পাকিস্তানিদের সচেতন করতে সহায়তা করে।

এ প্রেক্ষাপটে জরুরি অবস্থা ও আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার এবং শেখ মুজিবের মুক্তিরও রেসকোর্স ময়দানে বিপুল গণসংবর্ধনা লাভ বিশেষ তাৎপর্যবহু। কলকাতা ইসলামিয়া কলেজের ছাত্রতৃকাল থেকে শুরু করে সাধারণ ছাত্র-জনতা সবার কাছে 'মুজিব ভাই' হিসেবে এতকাল জনপ্রিয় ছিলেন। দেশ ও জাতির ক্রান্তিলগ্নে বিশেষ করে ৬ দফা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে এবং আরো সুনির্দিষ্ট করে বলতে গেলে, ৬ দফা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে এবং পাকিস্তানি সামরিক জন্তার বন্দিশালায় থাকাকালে মুজিবের জনপ্রিয়তা আকাশ ছুঁয়ে যায়। বহুত্ব বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ ঘটে তাকে কেন্দ্র করে, সেটা আরো আগে ঘাটের দশকের সূচনালগ্নে। তিনি ছিলেন এ চেতনার মূল প্রেরণাশক্তি এবং তাকে কেন্দ্র করে বঙ্কিত-নিপীড়িত বাঙালি জাতি ঐক্যবদ্ধ হয়ে ওঠে। এভাবেই একটা স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিল দেশের মেধাবী তরুণ সমাজ। এ আকাঙ্ক্ষা বাংলার সংগ্রামী ছাত্রসমাজের মাঝে বিস্তার লাভ করেছিল খুব দ্রুত। ফলে আরো দ্রুত দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি পাল্টে যায়।

পেছনের কথা

শেখ মুজিব ধীরে ধীরে হয়ে উঠেছিলেন বাঙালি জাতিসত্তার প্রতীক ও অধিকার আদায়ের সংগ্রামের মহানায়ক। সবার পরিচিত ও প্রিয় মুজিব ভাই হয়ে গেলেন 'বঙ্গবন্ধু'। এ উপাধি পাওয়ার পেছনের ইতিহাসটি অল্প কয়েকজন জানলেও অনেকেই জানেন না। কারাগারে থাকাকালে সংগ্রামী ছাত্রসমাজ ও বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ তাদের বক্তব্য বিবৃতিতে শেখ মুজিবের নামের আগে বঙ্গশাদুল, সিংহশাদুল ইত্যাদি খেতাব জুড়ে দেয়ার কাজটি শুরু করে। যেমনটি দেয়া হয়েছিল মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীকে মহাত্মা গান্ধী, মোহাম্মদ আলী জিন্নাহকে কয়েদে আজম, চিত্তরঞ্জন দাশকে দেশবন্ধু, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তকে দেশপ্রিয়, ফজলুল হককে শেরেবাংলা, খান আবদুল গাফফার খানকে সীমান্তগান্ধী এবং আশুতোষ মুখোপাধ্যায়কে বাংলার বাঘ ইত্যাদি উপাধি এবং এসব তাদের নামের সমর্থক হয়ে উঠেছিল তেমনি শেখ মুজিবুর রহমানকে মুজিব ভাই, বঙ্গশাদুল, সিংহশাদুল বলে যথার্থ তাৎপর্য ও গুরুত্ববহ বলে মনে করতে পারছিলেন না তার অনুগামীরা। অথচ একটা জুতসই উপাধি জুড়ে দেয়া খুবই প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল।

এ সময় (১৯৬৭) ঢাকা কলেজে পড়তেন মুজিবতনয় শেখ কামাল। তারই সহপাঠী ও বন্ধুদের একজন রেজাউল হক চৌধুরী মুশতাক, চট্টগ্রামের ছেলে। চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী সরকারি মুসলিম হাইস্কুলে পড়াকালে ছাত্রলীগের রাজনীতি ও ছাত্র সংসদের নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। জননেতা এমএ আজিজের চিঠি নিয়ে এসে শেখ কামাল ও মুজিব পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হন। কামালের পরামর্শে ও ইচ্ছায় ঢাকা কলেজ ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব নিয়ে ছাত্রলীগের সাংগঠনিক তৎপরতা বাড়ানোর কাজ শুরু করেন।

ঢাকা কলেজ (স্থাপিত : ১৮৪১) শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত এবং লেখাপড়ার ক্ষেত্রে ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। এখানকার ছাত্র আন্দোলনের গুরুত্ব ছিল অপরিমিত। সে সময় ছাত্র ইউনিয়নের প্রবল দাপটের মাঝে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ জায়গা করে নিতে চেষ্টা চালাচ্ছিল। এ সময় রেজাউল হক চৌধুরী মুশতাক এসে ভর্তি হন ঢাকা কলেজে। এর আগে দেখা করে আসেন চট্টগ্রামের এমএ আজিজের সঙ্গে। তিনি খুব উৎসাহ দেন ও শেখ কামালের সঙ্গে দেখা করতে বলে একটি চিঠি লিখে দেন। শেখ মুজিবের আস্থাভাজন নেতা এমএ আজিজের লেখায় মুশতাকের সাংগঠনিক যোগ্যতার পরিচিতি পেয়ে শেখ কামাল খুব খুশি হন। সহজেই দুজনের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি হয়। মুশতাককে ৩২ নাম্বার ধানমন্ডির বাসায় নিয়ে যান কামাল এবং নিয়মিত ক্লাস শেষে রেস্টুরেন্টে খাওয়া, সিনেমা দেখাসহ নান-ভাবে তাদের ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পায়। কলেজে ছাত্রলীগের সাংগঠনিক তৎপরতা বৃদ্ধির ব্যাপারে দুই বন্ধু আলোচনা করেন ও এক পর্যায়ে আসন্ন ছাত্র সংসদ নির্বাচনে রেজাউল হক মুশতাককে ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক পদে প্রার্থী হতে বলা হয়। মুশতাক এতে দ্বিমত পোষণ করে এ পদে অন্য কাউকে প্রার্থী করতে বলেন

এবং তিনি নিজে সাংগঠনিক দায়িত্ব পালনে আগ্রহ দেখান। ঠিক তখনই করিৎকর্মা শেখ কামাল পাল্টা প্রস্তাব দেন ঢাকা কলেজ ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব নিতে। শেখ কামালের আগ্রহ ও অনুরোধে রেজাউল হক মুশতাক দায়িত্ব গ্রহণ করেন ও ছাত্রলীগকে সাংগঠনিকভাবে শক্তিশালী করার কাজ শুরু করেন। এটা ১৯৬৭ সালের জুন-জুলাইয়ের ঘটনা।

ঢাকা কলেজ ছাত্র সংসদের নির্বাচনের তারিখ ঘোষিত হয়। ৬ দফা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে দেশের রাজনৈতিক উত্তাল পরিস্থিতিতে ঢাকা কলেজ ছাত্র সংসদ নির্বাচনে ছাত্রলীগের বিজয় লাভের দিকটা মাথায় রেখে তৎকালীন ছাত্র আন্দোলন ও বিকাশমান বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে ছাত্রলীগের সাংগঠনিক কার্যক্রমের সঙ্গে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে রেজাউল হক মুশতাক বন্ধু ও সতীর্থ শেখ কামালকে একটি বুলেটিন প্রকাশের প্রস্তাব দেন।

দৃষ্টান্ত হিসেবে চট্টগ্রাম কলেজের ছাত্র সংগঠনগুলোর নিজস্ব প্রকাশনা যেমন— ইউএসপিপি (ইউনাইটেড স্টুডেন্ট প্রগ্রেসিভ পার্টি) দুই পাতা, যাত্রিক সংগঠনের পত্রিকা ও ইউএসএফের (ইউনাইটেড স্টুডেন্ট ফোর্স) প্রকাশনার কথা বলেন। শেখ কামাল সঙ্গে সঙ্গে সম্মতি প্রকাশ করে বলেন, ‘ভূমি যা যা ভালো মনে কর— করবে। আমি তোমার পাশে আছি’ মুশতাক প্রকাশনার নাম দেন ‘প্রতিধ্বনি’। সম্পাদনার দায়িত্ব দেয়া হয় আমিনুর রহমানকে। প্রতিধ্বনি বুলেটিন প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় নভেম্বর, ১৯৬৮ সালে (কর্তিক, ১৩৭৫)।

বুলেটিনের প্রথম সংখ্যায় প্রকাশের জন্য রেজাউল হক চৌধুরী মুশতাক ‘আজব দেশ’ শিরোনামে ও সারথি ছদ্মনামে ছোট একটি নিবন্ধ রচনা করেন। পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের ঢাকা কলেজ শাখার প্যাডে ৪ পৃষ্ঠার হাতে লেখা নিবন্ধ। নিবন্ধের শেষাংশে লেখা হয়— ‘দুই অংশের পার্থক্য ও অমিলকে স্বীকার করে, দুই অংশের ভাষা, সংস্কৃতি ও ইতিহাসকে পাশাপাশি স্থান দিয়ে ও সর্বোপরি পূর্ব বাংলার নয়নমণি-মুক্তি দিশারি-বঙ্গবন্ধু-সিংহ শাদুল জনাব শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক প্রস্তাবিত ৬ দফা কর্মসূচির বাস্তবায়নের মাধ্যমে, আজব ও অভিনব পাকিস্তানের ঐক্য ও সংহতি টিকে থাকতে পারে— নতুবা নয়।’

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় সামরিক আদালতে বিচারার্থীন শেখ মুজিবুর রহমান তখনো ‘মুজিব ভাই’ হিসেবে বাঙালির হৃদয়জুড়ে আসন নিয়েছেন। কিন্তু চিত্তরঞ্জন দাশ, সুভাষচন্দ্র বসু আবুল কাশেম ফজলুল হক, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের নামের মতো অর্থপূর্ণ কোনো একটি বিশেষণ শেখ মুজিবের নামের আগে যুক্ত করা দরকার— প্রধানত এ বিষয়টি মাথায় রেখেই ছাত্রনেতা রেজাউল হক চৌধুরী মুশতাক এ নিবন্ধটি রচনা করেন ও শেষ অংশে পূর্ব বাংলার আপামর জনগণের নয়নমণি মুক্তির দিশারি মুজিব ভাইকে ‘বঙ্গবন্ধু’ আখ্যা দেয়া হয়।

কিন্তু দেশের সার্বিক পরিস্থিতি তখন এ রকম লেখা প্রকাশের পক্ষে মোটেও অনুকূল ছিল না। তাই ‘প্রতিধ্বনি’তে লেখাটি প্রকাশ করা হয়নি। এ বিষয়ে রেজাউল হক মুশতাক বলেন, ‘শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক উত্থাপিত ঐতিহাসিক ৬ দফার আলোকে লিখিত এ নিবন্ধে মূলত পাকিস্তান রাষ্ট্রের অসারতাই

ফুটে উঠেছিল। সেই সময়ের প্রেক্ষাপটে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর দৃষ্টিতে এ ধরনের নিবন্ধ ছিল রীতিমতো রাষ্ট্রদ্রোহিতামূলক অপরাধ। প্রতিধ্বনিতে এ নিবন্ধটি প্রকাশের উদ্যোগ নিলে শেখ ফজলুল হক মণি সিরাজুল আলম খানসহ ছাত্রলীগের তৎকালীন কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ আমাকে সেই মুহূর্তে নিবন্ধটি না ছাপানোর পরামর্শ দেন। তাদের যুক্তি ছিল, এ নিবন্ধটি প্রকাশিত হলে ঢাকা কলেজ ছাত্রলীগের ধারাবাহিক কার্যক্রম পুলিশি রোযানলে পড়বে এবং ঢাকা কলেজ ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে আমার কার্যক্রম পরিচালনা ব্যাহত হবে।

তবে ‘প্রতিধ্বনি’ বুলেটিনের প্রথম সংখ্যায় ‘বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রস্তাবিত পূর্ববাংলার মুক্তি সনদ ৬ দফা’ মুদ্রিত হয়। এ শিরোনামে বঙ্গবন্ধু শব্দটি সর্বপ্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হয়। পরে ছাত্রলীগের বিভিন্ন সময়ের প্রচারপত্রে ‘বঙ্গবন্ধু’ শব্দটি প্রকাশিত হতে থাকে। ঐতিহাসিক এই সত্যের প্রাসঙ্গিক বর্ণনা ও স্বীকৃতি পাওয়া যায় লেখক-গবেষকদের রচনায়।

বঙ্গবন্ধু উপাধি প্রসঙ্গ

এক জনাব ওবায়দুল কাদের (বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি ও বর্তমানে সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী) দৈনিক বাংলার বাণী পত্রিকায় লিখেন : ‘মুজিবুর রহমান আনুষ্ঠানিকভাবে বঙ্গবন্ধু খেতাবে ভূষিত হন লক্ষ লক্ষ জনতার সমাবেশে, ১৯৬৯ সালে। অবিস্মরণীয় গণবিক্ষোভের চূড়ান্ত পর্যায়ে সে আন্দোলনের অগ্রণী বাহিনী ছাত্র সমাজের পক্ষ থেকে সদ্য কারামুক্ত শেখ মুজিবকে রেসকোর্সের স্বতঃস্ফূর্ত বিশাল জনসমুদ্রে ডাকসুর সহ-সভাপতি ও ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতা তোফায়েল আহমেদ বঙ্গবন্ধু খেতাবে ভূষিত করেন। সেটা অবশ্য আরো পরের ঘটনা।

এখন প্রশ্ন জাগতে পারে, কার মাথায় প্রথম বঙ্গবন্ধু শব্দটি এসেছিল। এ প্রশ্নের জবাব পেতে হলে খানিকটা পেছনে যেতে হয়। তখন সম্ভবত ১৯৬৭ সাল। ঢাকা কলেজ ছাত্রলীগ প্রতিধ্বনি নামক একটি মাসিক পত্রিকা বের করত। সে পত্রিকার একটি ইস্যুতে ছাত্রলীগের রেজাউল হক মোশতাক (মুশতাক) সারথি ছদ্মনামে ‘আজব দেশ’ নামে একটি লেখা লেখেন। লেখাটির শেষ দিকে ‘সিংহশাদুল’ শেখ মুজিবের পাশে প্রথম ‘বঙ্গবন্ধু’ শব্দটি ব্যবহার করা হয়।... তখন অবশ্য ছোট ছোট অখ্যাত এক পত্রিকায় ব্যবহৃত বঙ্গবন্ধু শব্দটি ঢাকার ছাত্রমহলের একাংশ ছাড়া অন্য কারো নজর কাড়েনি। হয়তো স্থান-কাল-পাত্রের বিবেচনায় সে সময় শেখ মুজিবের নামের সঙ্গে এমন একটা বিশেষণ প্রয়োগের ভাবনাটা তেমন গুরুত্ব পায়নি। ওটা গুরুত্ব পায় ঠিক তখন যখন জাগ্রত বাঙালি জাতির জাগরণের সব প্রোতধারা এক মোহনায় একাকার, যখন গণমোহন মুজিব বিদ্রোহী বাংলার মুকুটহীন সম্রাট। বলা দরকার, মুজিবের জন্য জুতসই খেতাব হিসেবে বঙ্গবন্ধু শব্দটি শেখ ফজলুল হক মণি সিরাজুল আলম খান ও ‘৬৯-এর তরুণ নেতৃত্বের সবার খুবই পছন্দ হয়েছিল।’ (দৈনিক বাংলার বাণী : ৩১ জুলাই, ১৯৮৭ প্রকাশিত সংখ্যা)।

দুই) গবেষক-লেখক মোরশেদ শফিউল হাসান তার ‘স্বাধীনতার পটভূমি : ১৯৬০ দশক’ গ্রন্থে

লেখেন—

‘যেভাবেই হোক সিরাজুল আলম খান ও তার অনুসারীদের কাছে মনে হয়েছিল যে স্বাধীনতার জন্য তাদের আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবে রূপ দিতে এবং ব্যাপক জনগণকে সে প্রক্রিয়ায় शामिल করতে হলে, শেখ মুজিবের নেতৃত্বের কোনো বিকল্প নেই। এ উদ্দেশ্যে তারা বিভিন্ন প্রচেষ্টা বা কৌশল গ্রহণ করেন। ১৯৬৯ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের সংবর্ধনায় শেখ মুজিবকে ‘বঙ্গবন্ধু’ হিসেবে ঘোষণা তেমন একটি ঘটনা।’ (পৃষ্ঠা : ২৪৫)

লেখার নিচের অংশে ফুটনোট এ বাক্যখ্যা দিয়ে লেখেন—

“শেখ মুজিবুর রহমানের নামের সঙ্গে ‘বঙ্গবন্ধু’ কথাটি প্রথম ব্যবহৃত হয় ১৯৬৮ সালে ঢাকা কলেজ ছাত্র সংসদের নির্বাচন উপলক্ষে কলেজ শাখা ছাত্রলীগের নির্বাচনী প্রচারপত্র ‘প্রতিধ্বনি’তে। শেখ মুজিবের জন্য এ উপাধিটির উদ্ভাবক ছিলেন ছাত্রলীগ ঢাকা নগর শাখার সাধারণ সম্পাদক ও ঢাকা কলেজের ছাত্রনেতা রেজাউল হক মুশতাক।” (পৃষ্ঠা : ২৪৫)

তিন) প্রাক্তন ছাত্রনেতা শেখ মোহাম্মদ জাহিদ

হোসেন তার ‘মুক্তিযুদ্ধ ছাত্রলীগ ও বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্স (বিএলএফ)’ গ্রন্থে লিখেন—

‘বিশাল সেই জনসভায় তোফায়েল আহমেদ শেখ মুজিবকে বঙ্গবন্ধু উপাধিতে ভূষিত করেন, যে উপাধি বিতর্কের উর্ধ্বে বাঙালির হৃদয়ে এখনো অম্লান হয়ে আছে।’ (অঙ্কুর প্রকাশনী, ঢাকা পৃষ্ঠা : ১৬)

সেই একই পৃষ্ঠার নিচের অংশে ফুটনোট দিয়ে বিস্তারিত বিশ্লেষণপূর্বক লেখা হয় ঢাকা কলেজ ছাত্রলীগের বুলেটিনে কলেজ ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক রেজাউল হক মুশতাকের সারথি ছদ্মনামে ‘আজব দেশ’ শিরোনামের লেখায় বাঙালির প্রাণপ্রিয় এই নেতার পাশে ‘বঙ্গবন্ধু’ শব্দটি প্রথম ব্যবহার করা হয়। গ্রন্থ লেখক ছিলেন স্বয়ং ১৯৬৯ সালে ঢাকা কলেজ ছাত্রলীগের সভাপতি, শীর্ষস্থানীয় ছাত্রনেতা ও মুক্তিযোদ্ধা।

রেজাউল হক চৌধুরী মুশতাক প্রদত্ত এ নতুন উপাধিটি সে সময় ছাত্রনেতাদের মধ্যে যথেষ্ট আলোচিত হয় এবং সবার নিকটই উপাধিটি শেখ মুজিবুর রহমানের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত ও যথার্থ বলে মনে হয়। অন্যান্য যেসব উপাধি ব্যবহার করা হতো যেমন ‘বঙ্গ-শাদুল’ ‘শেরবাংলা’র খেতাবের সমার্থক হওয়ায় ছাত্রনেতৃবৃন্দ এটা ব্যবহার করা নিয়ে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। শেখ মোহাম্মদ জাহিদ হোসেন লিখেছেন “জনাব তোফায়েল আহমেদ তার দেওয়া ‘বঙ্গবন্ধু’ উপাধিটি রেজাউল হক চৌধুরী মুশতাকের এই লেখা থেকেই গ্রহণ করা হয় বলে পরবর্তীতে বিভিন্ন আলোচনা সভায় স্বীকার করেন।” (পৃষ্ঠা : ১৬)

চার) ‘জাতিসংঘের উত্থান-পতন : অস্তির সময়ের রাজনীতি’ গ্রন্থে লেখক মহিউদ্দিন আহমেদ লেখেন— ‘জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রয়োজনে আইকন বা বীর খোঁজার একটা সচেতন প্রয়াস থাকে। শেখ মুজিব এ রকম একজন প্রতীকে পরিণত হলেন। সিরাজ গ্রন্থের সঙ্গে সংশ্লিষ্টা যার যার মতো স্লোগান তৈরি করতেন। সভায় কিংবা মিছিলে কোনোটা জনপ্রিয় হতো, কোনোটা হতো না। এক

ধরনের স্বতঃস্ফূর্ততা ছিল। তবে সবকিছুই একজন বা কয়েকজন নেতা মিলে সৃষ্টি করেছেন, এমনটা দাবি করা যায় না। উদাহরণস্বরূপ বঙ্গবন্ধু শব্দটির কথা উল্লেখ করা যায়।’ (পৃষ্ঠা : ২১)

লেখক গ্রন্থে ১৯৬৮ সালে ঢাকা কলেজ ছাত্র সংসদ নির্বাচনী প্রচার উপলক্ষে কলেজ ছাত্রলীগের প্রকাশিত বুলেটিন ‘প্রতিধ্বনি’ প্রচারপত্রের কথা উল্লেখ করেন। যাতে ‘বঙ্গবন্ধু’ শব্দটি প্রথম ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত ছিল। তিনি লেখেন— “শেখ মুজিবের জন্য এই উপাধির আবিষ্কার ছিলেন ঢাকা কলেজ ছাত্রলীগের নেতা এবং ওই সময়ে ঢাকা নগর ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক রেজাউল হক মুশতাক। তার চিন্তা ছিল দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের মতো একটা জুতসই কিছু শেখ মুজিবের জন্য খুঁজে বের করা। এই ভাবনা থেকেই ‘বঙ্গবন্ধু’ শব্দের উৎপত্তি।” (পৃষ্ঠা : ২৪)

পাঁচ) ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় সংসদের সাধারণ সম্পাদকের কার্যবিবরণীতে উল্লেখ করা হয়—

“আমাদের সংগঠনের দপ্তর সম্পাদক জনাব রেজাউল হক মুশতাকই শেখ মুজিবুর রহমানকে সর্বপ্রথম ‘বঙ্গবন্ধু’ উপাধিতে ভূষিত করেছে, আমরাই প্রথম জয় বাংলা ধ্বনি তুলি, স্বাধীনতার প্রস্তাব উত্থাপন করি, জাতীয় পতাকা তৈরি করি, স্বাধীনতা ঘোষণা করি, বঙ্গবন্ধুকে জাতির পিতা হিসেবে আখ্যায়িত করি, জাতীয় সংগীত নির্ধারণ করি এবং আমরাই প্রথম জাতীয় পতাকা উত্তোলন করি।” (সাধারণ সম্পাদক শাজাহান সিরাজের রিপোর্ট পৃষ্ঠা : ৩৯, ১৯৭২, বাংলাদেশ ছাত্রলীগ, কেন্দ্রীয় সংসদ)

উপরোক্ত বিশ্লেষণের আলোকে এ বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায় যে, পুরো বিষয়টি তৎকালীন ছাত্র রাজনীতি পূর্ববাংলার স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধীনতার তাত্ত্বিক নেতা সিরাজুল আলম খানের কানে যায়।

তিনি এটা অনুমোদন করেন ও সদ্য কারামুক্ত শেখ মুজিবকে রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানকালের সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে) কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে যে সংবর্ধনা দেয়া হয়েছিল, সেই সভায় সভাপতি তোফায়েল আহমেদ প্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে ‘বঙ্গবন্ধু’ হিসেবে ঘোষণা দেন। তবে এ বিষয়ে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের শরিক দল ছাত্র ইউনিয়নের উভয় গ্রুপের (মেনন ও মতিয়া) প্রবল আপত্তি ছিল। সে আপত্তি ছাত্রদের প্রবল আগ্রহের মাঝে বাতাসে মিলিয়ে যায়।

যাই হোক, বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে তৎকালীন অগ্নিসময়ে শেখ মুজিবুর রহমান ওরফে সবার প্রিয় মুজিব ভাইয়ের উজ্জ্বল ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠায় বঙ্গবন্ধু উপাধি বিরাট ভূমিকা রেখেছিল। এদিন (২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯) থেকে তিনি হয়ে যান ‘বঙ্গবন্ধু’। বক্তৃতা-বিবৃতি, লেখালেখি, গান-কবিতা, রাজপথের মিছিল-স্লোগান, সম্মোদনে ‘বঙ্গবন্ধু’ শেখ মুজিবের নামের সঙ্গে একাত্ম হয়। সারা দেশে এখন থেকে বঙ্গবন্ধু মানে শেখ মুজিব, আর মুজিব মানেই বঙ্গবন্ধু।

বঙ্গবন্ধুর জীবনী রচনা :

১৯৭০ সালে ছাত্রনেতা ও বন্ধু রায়হান ফেরদৌস মধুর উৎসাহ ও সহায়তায় রেজাউল হক মুশতাক আরেকটি ঐতিহাসিক কাজ করেন তা হলো— বঙ্গবন্ধুর জীবনী রচনা।

জাসদের উত্থান-পতন : অস্তির সময়ের রাজনীতি পৃষ্ঠা : ২৪

দেড় ফরমার ওই পুস্তিকার নাম ছিল ‘এই দেশেতে জন্ম আমার’। প্রচ্ছদশিল্পী ছিলেন কালাম মাহমুদ। বর্তমানে দৃষ্টান্ত্য এ পুস্তিকাই বঙ্গবন্ধুর জীবনীবিষয়ক সর্বপ্রথম ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত পুস্তিকা। তিনি পুস্তিকাটি নিয়ে ঢাকার ধানমন্ডির ৩২ নম্বারে বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে যান ও তার হাতে প্রদান করেন। বঙ্গবন্ধু পুস্তিকাটি হাতে নিয়ে

উল্টেপাল্টে দেখেন ও এর লেখক তরুণ রেজাউল হক চৌধুরীকে বুকে জড়িয়ে ধরেন। তিনি বলেন, ‘ছাত্রলীগের ছেলেরা এত সুন্দর প্রকাশনা বের করতে পারে— আমার ধারণা ছিল না।’ তিনি আরো বলেন, ‘পুস্তিকাটি প্রকাশ করতে তার তো অনেক টাকা ব্যয় হয়েছে’— এ কথা বলেই পকেট থেকে পাঁচশ টাকার একটা নোট বের করে তরুণ মুশতাকের হাতে দিয়ে বলেন, এটি তোর কাছে রাখ।

এখানে একটি কথা বলে রাখা ভালো যে, ঢাকা কলেজ থেকে প্রকাশিত ‘প্রতিধ্বনি’ বুলেটিনে ‘আজব দেশ’ শিরোনামে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ, ঢাকা কলেজ শাখার প্যাডে হাতে লেখা সেই চার পাতার নিবন্ধনসহ আরো বেশকিছু ঐতিহাসিক দলিল রেজাউল হক চৌধুরী মুশতাক সংরক্ষণ করতে পারলেও বঙ্গবন্ধুর জীবনীবিষয়ক পুস্তিকার কপিসহ আরো বহু নথিপত্র ও পত্রপত্রিকা তিনি হারিয়ে ফেলেন মুক্তিযুদ্ধের সময়। একাত্তরের পঁচিশে মার্চ তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে যান। দুই দিন পর চট্টগ্রামের উদ্দেশে ঢাকা ভ্যাগের প্রাক্কালে বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলে থেকে যায় সবকিছু। উল্লেখ্য যে, রেজাউল হক চৌধুরী পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সহ-দপ্তর সম্পাদক ছাড়া একবার ঢাকা নগর ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। তার হস্তাক্ষর ছিল সুন্দর ও ঝরঝরে। ছাত্রলীগের প্রেস বিজ্ঞপ্তি, নেতৃত্বদ্বন্দের বিবৃতি, প্রচারপত্র লেখা ও বিভিন্ন পর্যায়ে চিঠিপত্র লিখার দায়িত্ব ছিল তার। এসবের অনেক কিছু তিনি সংগ্রহ করে রেখেছিলেন নিজ কক্ষে। স্বাধীনতা লাভের পর হলে ফিরে এসে সেসব কাগজপত্রের কিছুই আর পাননি। হারিয়ে ফেলেন অমূল্য দলিল, ইতিহাসের অনেক উপাদান।





নিবন্ধ

বাঙালির উৎসব আনন্দ

তারাপদ আচার্য

উৎসবের আনন্দই আলাদা। যারা উৎসবে যোগদান করেনি তারা এর মাহাত্ম্য বুঝতে পারবে না। উৎসবের আনন্দ মানেই বাঙালির আনন্দ। কারণ উৎসবপ্রিয় জাতি হিসেবে বাঙালির খ্যাতি ও ঐতিহ্য আছে বিশ্বেসমাজে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের উৎসবগুলো বাঙালি ঘটা করেই পালন করে। উৎসব পালনের ক্ষেত্রে বাঙালি খুবই আন্তরিক এবং অকুপণ। এ উৎসবপ্রিয়তা বাঙালির ব্যক্তিজীবন থেকে শুরু করে জাতীয় জীবনকে সমৃদ্ধ করেছে। উৎসব পালনের উৎসাহে এতটুকু ভাটার টান পরিলক্ষিত হয় না কখনো। উৎসব পালন রীতিমতো আজ এক লৌকিক অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। যে কোনো উৎসব-পার্বণে রাস্তাঘাটে মানুষের ঢল নামে। মানুষ আনন্দে আত্মহারা হয়ে ওঠে। কী আনন্দ আকাশে বাতাসে। বাঙালির জাতীয় জীবনে যে উৎসবগুলো

গুরুত্বসহকারে পালিত হয় এর মধ্যে ইংরেজি ও বাংলা সালের প্রথম দিবস, অমর একুশে, স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস, ঈদে মিলাদুন্নবী, শবে বরাত, ঈদ ও পূজা উল্লেখযোগ্য। প্রতিটি উৎসবেরই আছে কিছু আদর্শিক বোধ এবং সেই সঙ্গে কিছু সুস্থ বিনোদন। তবু সত্য এই যে, সব উৎসব বিনোদনের জোয়ারে ভেসে যায় প্রতি বছর। মানুষের এ পর্যন্ত যতগুলো সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে তার মধ্যে সংস্কৃতিকে টিকিয়ে রাখার সংগ্রামও অত্যন্ত ব্যাপক। যার সঙ্গে বিভিন্ন উৎসব-পার্বণ নিবিড়ভাবে জড়িত। বাংলাদেশের জন্ম হয়েছে এক রক্তক্ষয়ী পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে। যার কারণ ছিল ভাষাকে টিকিয়ে রাখা, ধরে রাখা নিজস্ব সংস্কৃতিকে। কেননা ১৯৭১ সালে যে ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল তা ছিল সংস্কৃতিকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলারও একটি যড়যন্ত্র। কিন্তু তা

মেনে নিতে পারেনি এ দেশের জনসাধারণ। যার ফলে দেখা যায় নিজস্ব সংস্কৃতি, রীতিনীতির প্রতি এ দেশের মানুষের মমত্ববোধ কত বেশি এবং বাঙালির যে প্রাণের সঙ্গে মিশে আছে উৎসব এ কথা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। একে অন্যের সঙ্গে মিশতে চাওয়ার যে আকাঙ্ক্ষা তা বাঙালির বৈশিষ্ট্যপ্রণোদিত। আর উৎসব মানেই হলো একটি ক্রিয়াশীল ঐতিহ্য যা পৃথিবীর প্রতিটি জাতিরই ছিল এবং আছে। একে অন্যের সঙ্গে বন্ধনকে দৃঢ় করার আনন্দে মেতে ওঠা, পুরনোকে আবার নতুন করে পাওয়ার যে তৃষ্ণা তা এখানেই সবচেয়ে বেশি মেটে। তাই বোধহয় আমরা বার বার ফিরে আসি বিভিন্ন উৎসব-পার্বণের কাছে নতুন করে পাওয়ার অস্বীকৃত তৃষ্ণায়। বাঙালি জীবনের সবচেয়ে গৌরবময় পরিচয় বহন করেছে অমর একুশ। একুশ আন্তর্জাতিক মর্যাদা লাভ করেছে ‘মাতৃভাষা দিবস’ হিসেবে। তবে একুশ বাঙালি জাতিসত্তার এক বলিষ্ঠ পরিচিতি, এতে কোনো সন্দেহ নেই। জাতীয় জীবনের সব কটি আন্দোলন এবং স্বাধীনতার উৎস হিসেবে ‘একুশ’ এক মহাশক্তির ভূমিকা পালন করেছে। এ দিনটি সর্বস্তরের মানুষ শ্রদ্ধা ও আন্তরিকতার সঙ্গে পালন করে থাকে। স্বাধীনতা ও বিজয় দিবস উদযাপন আমাদের জাতীয় জীবনের এক নির্মল নির্ভেজাল ও আনন্দঘন দিন। মুক্তিযুদ্ধের সূচনা ও সমাপ্তি ঘিরেই এসেছে স্বাধীনতা। এজন্য যারা এর পেছনে অবদান রেখেছে তাদের মূল্যায়ন করতে হবে গভীর কৃতজ্ঞতায়। তাদের কোনোভাবেই অবহেলা করা

যাবে না। অন্যদিকে বসন্তবরণ উৎসব ও ভ্যালেন্টাইন ডে এ দেশের তরুণ-তরুণীর জীবনে বিশ্বয়কর প্রভাব রেখে চলেছে। বাসন্তী রঙের শাড়িতে-পাঞ্জাবিতে বসন্তবরণ শহরকেন্দ্রিক এক মহা উৎসবে পরিণত হয়েছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, অফিস-আদালত সবখানেই সেদিন বসন্তের আমেজ লক্ষ্য করা যায়। এটা কেবলই ভালোবাসার এক উৎসব, জীবনের অন্য কোনো খানে এর আবেদন থাকে না। বাংলা নববর্ষ এখন আমাদের সংস্কৃতির প্রধান দিক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের অনুষ্ঠানের মঙ্গল শোভাযাত্রা আমাদের সংস্কৃতির ঐতিহ্যিক উপাদানকে উদ্ভাবনাময় এবং সমাজ ও রাজনীতি ক্ষেত্রের অপশক্তিকে চিহ্নিত করা এবং তাদের বিরুদ্ধে সক্রিয় সদাসতর্ক লড়াই চালিয়ে যাওয়ার বার্তা দিচ্ছে। এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য অসাধারণ। নববর্ষকে কেন্দ্র করে সারা দেশে যে মেলা বসে তা বাংলাদেশের আবহমান সংস্কৃতিরই একটি ঐতিহ্যবাহী অনুষ্ঠান। যার মধ্যে জড়িয়ে আছে মানবজীবন প্রবাহ। নবান্ন ও বাঙালির প্রাচীন ধর্মীয় উৎসব ছিল। কেউ কেউ বলেন, আগে অগ্রহায়ণ মাসে নববর্ষ হতো। অগ্রহায়ণ ফসলের মাস। তাই তখন নবান্ন উৎসব করে নববর্ষ পালন করা হতো। এ ছিল কৃষকের ফসলপ্রাপ্তির জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের হৈমন্তিক অনুষ্ঠান। পূর্বপুরুষের পারলৌকিক শান্তি কামনায় নতুন ফসলের পায়ের-ভাত এবং নানা ব্যঞ্জন নদীতীরে এবং পাখপাখালির জন্য নিবেদন করা হতো। এ ছিল এক প্রাচীন আচার। এ আচার এখন

বদলে গেছে। বাংলাদেশে উৎসব নতুন ধরন ও নব তাৎপর্য লাভ করেছে। ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আধুনিক জীবনবোধ ও জীবন জিজ্ঞাসার নানা প্রতীকী অর্থ ও উদ্ভাবনাময় ব্যঙ্গনা। বাংলা নববর্ষ, একুশে ফেব্রুয়ারি হয়েছে ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয় উৎসব। জাতীয় সংহতি ও ঐতিহ্যের বিস্তার এবং নবায়নে উৎসবের গুরুত্ব তাই অসামান্য। আর ঈদ উৎসব ও দুর্গোৎসব বিশাল আর্থ-সামাজিক বিষয়কে আত্মস্থ করে নতুন এবং বহুমাত্রিক তাৎপর্য লাভ করেছে। ধর্মবর্ণগোত্রনির্বিশেষে ঈদ ও পূজা এখন সর্বজনীন রূপ লাভ করেছে, পরিণত হয়েছে জাতীয় উৎসবে। এবার বর্ষার পূর্ণ আমেজ নিয়ে বাঙালি মুসলমানের ঘরে আসছে পবিত্র ঈদুল ফিতর। সবকিছু মিলিয়ে দেখা যায়, বহুকালের আনুষ্ঠানিকতা পালন করে উৎসবপ্রিয় বাঙালি জাতি তার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে নানা উৎসব-পার্বণের মাধ্যমে উজ্জ্বল করে রেখেছে। যতই দিন যাচ্ছে উৎসবপ্রিয়তা বাঙালির মধ্যে ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। এ উৎসবের মধ্য দিয়ে মানুষে মানুষে জাতিধর্মবর্ণনির্বিশেষে সৌভ্রাতৃত্ব ও গভীর মেলবন্ধন গড়ে উঠেছে। ব্যক্তিক ও সামাজিক যোগাযোগ বেড়েছে। মানুষ নিজেকে চেনা-জানার সুযোগ পেয়েছে। নিজস্ব কৃষ্টি, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে নিজের মধ্যে ধারণ করতে পারছে। এবারের পবিত্র ঈদুল ফিতরেও সর্বত্র এ উৎসব-আমেজ পরিলক্ষিত হবে, এটাই সবার প্রত্যাশা।





বিশেষ রচনা

নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার বিখ্যাত সিংহাসন

জোবায়ের আলী জুয়েল

১৭৫৭ সালের ২৩ জুন পলাশীর প্রান্তরে যুদ্ধের প্রহসন এবং বিশ্বাসঘাতকদের দ্বারা নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার মৃত্যু বাংলার ইতিহাসে এক কলঙ্কজনক ও শোকাবহ অধ্যায়। ১৭৫৬ সালে তার নানা আলীবর্দী খানের মৃত্যুর পর মাত্র ২৩ বছর বয়সে তরুণ নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা বাংলার মসনদে বসেন। তার শাসনকাল ছিল মাত্র ১৪ মাস ১৪ দিন। ক্রাফটন লিখেছেন, দুর্ভাগ্য সিরাজ তার প্রাণভিক্ষা করে ব্যর্থ হলে শেষবারের মতো অজু করে নামাজ পড়ার সুযোগ প্রার্থনা করেন। তার নিষ্ঠুর হৃদয়ঘাতকরা তার দিকে এক ঘটি পানি ছুড়ে

মারে এবং তরবারি ও খঞ্জরের আঘাতে তাকে হত্যা করে। তার খণ্ডিত দেহ মীরজাফরের পুত্র মীরনের নির্দেশে হাতির পিঠে নিয়ে মুর্শিদাবাদে শহরময় প্রদর্শন করা হয়। (স্যার পেন্ডারেলমুনের গ্রন্থে উদ্ধৃত পৃষ্ঠা নম্বার ৫৫)। সিরাজের মৃত্যু হলে তার স্থলাভিষিক্ত হলেন বিশ্বাসঘাতক মীরজাফর। তার সিংহাসনে অভিষেকের দিন (২৯ জুন, ১৭৫৭) ক্লাইভ সদলবলে মুর্শিদাবাদে প্রবেশ করেন। বাংলার রাজধানীর বিপুল ঐশ্বর্য দেখে ইংরেজ সেনাপতি দারুণ বিস্মিত হয়ে মত্তব্য করেছিলেন, ‘মুর্শিদাবাদ লন্ডনের মতোই ধনসম্পদে ভরা, তবে তফাত

হচ্ছে সেখানে ধনাঢ্য ব্যক্তিদের যে পরিমাণ ধনসম্পদ রয়েছে, লন্ডনে তার কানাকড়িও নেই।’ মীরজাফরের কাছ থেকে তার ব্যক্তিগত ইনাম তখনকার হিসেবে ১ লাখ ৬০ হাজার পাউন্ড নিয়ে মুর্শিদাবাদ ত্যাগ করেন রবার্ট ক্লাইভ। সঙ্গে ছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির জন্য পাঠানো নগদ পাওনা ও উপটোকন। ক্লাফটন স্মরণ করেছেন ২০০ নৌকায় বোঝাই করে সে উপটোকন নিয়ে যাওয়া হয় কলকাতায় আর এভাবে বাংলার মানুষের রক্তে ও মাংসে বানানো সড়ক বয়ে ভারতে ইংরেজ উপনিবেশের পত্তন ঘটে।

নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা যে মসনদে বা সিংহাসনে বসে রাজকার্য চালাতেন তার নাম হলো তখত মোবারক। দিল্লির মোগল সম্রাট শাহজাহানের দ্বিতীয় পুত্র শাহজাদা সুজা যখন বাংলার সুবাদার (১৬৩৪ সাল) হয়ে আসেন তখন তিনি তার ব্যবহারের জন্য এ সিংহাসনটি তৈরি করেন। শাহজাহানের পুত্র সুজার পর একে একে মীর জুমলা, শায়েস্তা খান, আজিম উশ শান, ইবরাহিম খান প্রমুখ সুবাদার পর্যায়ক্রমে এতে বসেই দোর্দণ্ড প্রতাপে বাংলা শাসন করেছেন।

চেহেল সেতু নামে পরিচিত পরবর্তীতে মুর্শিদকুলী খাঁ, চল্লিশ স্তম্ভের জমকালো প্রাসাদে দরবার তৈরি করেন। মুর্শিদকুলী খাঁ এ দরবারেই গৃহ নির্মাণ করেন এবং এর প্রশস্ত হলঘরে তিনি বাংলার সুবাদারির ঐতিহাসিক ‘মসনদ’ স্থাপন করেন। মসনদের অন্য নাম সিংহাসন এবং এটি কালো মারলে পাথরে নির্মিত ছিল। আকৃতিতে এটি ছিল গোলাকার এবং এর ব্যাস ছিল প্রায় সাড়ে তিন হাত। এক হাত অপেক্ষা উঁচু চারটি স্তম্ভের ওপর এটি স্থাপিত ছিল। মাত্র এক খণ্ড পাথরে সমগ্র মসনদটি খোদিত হয়েছিল। সোনালী ও রূপালি বালরবিশিষ্ট একটি গাঢ় লাল রঙের জমকালো চাঁদোয়া দ্বারা এর উপরিভাগ সুন্দরভাবে সুসজ্জিত ছিল। বাংলার শাসনকর্তা থাকাকালে শাহজাদা সুজা কর্তৃক এই রাজকীয় সিংহাসনটি নির্মিত হয়েছিল। মসনদের এক পাশে একটি উৎকীর্ণ লিপি থেকে জানা যায়, খাজা নজর নামক জনৈক শিল্পী এটি তৈরি করেছিলেন। খাজা নজর লাহোরের অধিবাসী ছিলেন এবং তিনি পরে ১০৫৪ হিজরিতে (১৬৪৪ সাল) মুঙ্গেরে বসতি স্থাপন করেন। মসনদটি আগ্রার সম্রাটের সিংহাসনের আদলে পরিকল্পিত হয়েছিল। রাজমহলে শাহজাদা সুজা কর্তৃক ব্যবহৃত এ মসনদ পরবর্তীকালে ঢাকার জাহাঙ্গীরনগরে স্থানান্তরিত হয়। অতঃপর মুর্শিদকুলী খাঁ এ রাজকীয় সিংহাসনটি মুর্শিদাবাদে স্থানান্তর করেন। বাংলার সুবাদার ও পরে নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর পরে নবাব সুজাউদ্দিন, নবাব সরফরাজ খাঁ, নবাব আলীবর্দী খান প্রমুখ নবাব এতে বসেই দোর্দণ্ড প্রতাপে বাংলার রাজকার্য পরিচালনা করেছেন। এর নির্মাণকাল ও নির্মাণকারী সম্পর্কে তখত মোবারকে ফারসি ভাষায় খোদিত ছিল— ‘তৈয়ার শোদ তখত মোবারক বতারিখ বিস্ত ওহফতম সহর-সাবানুলমন আজাম ১০৫২ ব এতমাম কম তারিনে বান্দহো খাজা নজরে বোখারি কি মোকামে মুঙ্গের মিন সুবাবেহার।’ বাংলা তরজমায় অর্থাৎ এই পরম কল্যাণময় রাজসিংহাসন সুবা বিহারের অন্তর্গত মুঙ্গের শহরে ১০৫২ সালের ২৭ শাবান (বাংলা) তারিখে

দাসানুদাস খাজা নজর বোখারি কর্তৃক নির্মিত। এ তখত মোবারক নামক রাজসিংহাসনটি প্রথমে রাজমহলে তারপর ঢাকা এবং সর্বশেষ মুর্শিদাবাদে নেয়া হয়। কারণ সুবা বাংলার রাজধানী শাহজাদা সুজার সময় থেকে শুরু করে প্রথমে রাজমহল, পরে ঢাকা এবং আরো পরে মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত হয়। নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা এ সিংহাসনকে হীরাবিল প্রাসাদে স্থাপন করেছিলেন। এ সিংহাসনে তিনি বসেছেন মাত্র ১৪ মাস ১৪ দিন। নবাব সিরাজের পর আর কেউ এ সিংহাসনের গৌরব রক্ষার জন্য সচেষ্ট হয়নি। এ সিংহাসন সম্পর্কে প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ অক্ষয়কুমার মৈত্র তার ‘মীর কাসিম’ নামক গ্রন্থে লিখেছেন, ‘এই বহু মানাস্পদ মোগল রাজসিংহাসনের সঙ্গে মীর জাফরের কলঙ্ক কাহিনী চিরসংযুক্ত হইয়া রহিয়াছে। কী হিন্দু কী মুসলমান কেহই মীরজাফরের কথায় বিস্মিত হইতে পারে নাই। পাঁচশত বছর মুসলমানের সম্মুখে কুর্নিশ করিতে করিতে হিন্দু সভ্যতার পক্ষে মুসলমান শাসন অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়া ছিল। তাহারা কেহ



রাজা, কেহ মন্ত্রী, কেহ সেনাপতি হইয়া মুসলমানের দোহাই দিয়া শাসন ও শোষণকার্য হস্তগত করিয়া ছিলেন। সিরাজ-উদ-দৌলা তাহার মূলোচ্ছেদের চেষ্টা করায়, সকলে মিলিয়া মীরজাফরের সহায়তায় সিরাজ-উদ-দৌলাকে উচ্ছেদ করেন। মুসলমানেরা অনেককালের নবাব। কী ইংরেজ, কী বাঙালি সকলেই সে নবাব দরবারে জানু পাতিয়া উপবেশন করিতেন, সিরাজ-উদ-দৌলার পদভারে মেদিনী কম্পিত হইয়া উঠিত। ইংরেজদের কথা বিশেষভাবে আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। বিদেশে বাণিজ্য করিতে আসিয়া যাহার প্রাসাদে এমন স্বর্ণ সিংহাসন কুড়াইয়া পাইয়াছেন। তাহার কথায় ইংরেজগণ কোন লজ্জায় এত অল্পদিনই বিস্মিত হইবেন? মীরজাফর কর্নেল ক্লাইভের হাত ধরিয়া একবার মাত্র এই সিংহাসনে পদার্পণ করিলেন। কিন্তু তাহাতে আর অধিক দিন উপবেশন করিতে পারিলেন না। সেই সময় হইতে এই পুরাতন রাজসিংহাসন অযত্নে অনাদরে পড়িয়া রহিয়াছে।’ নবাব সিরাজের পর এ সিংহাসন অনাবৃত অবস্থায় বাইরে পড়ে থেকে রোদে শুকাত আর বৃষ্টিতে ভিজত। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, নবাব সিরাজের পর মীরজাফর মাত্র কয়েক দিনের জন্য এ সিংহাসনে বসেছিলেন, তারপর আর কেউ বসেননি। তারা মনে করতেন, এ সিংহাসনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে তাদের শত্রু নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার স্মৃতি। তাই এ সিংহাসনটির যত্নের ব্যাপারে পরবর্তী শাসনকর্তাদের ছিল তীব্র অনীহা। দীর্ঘদিন ধরে রোদ-বৃষ্টি এ সিংহাসনের গায়ে কতকগুলো রেখাচিত্রের সৃষ্টি করেছিল এবং এ রেখাচিত্র দিয়ে নাকি ফোঁটায় ফোঁটায় পানি বরত। এ ব্যাপারে মুর্শিদাবাদের স্থানীয় বাসিন্দারা বিশ্বাস করতেন সিরাজ-উদ-দৌলাকে স্মরণ করে সিংহাসনটি এখনো কাঁদে। তবে সিংহাসনের এ কাঁদার বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা দিয়েছেন ইংরেজ ইতিহাসবিদ এইচ বেভারিজ। তার ভাষায় : The stone has reddish stains, due to the presence of iron; And it sometimes swells so much that water trickles over the edge. Then the stone is weeping, according to the natives, for the passing away of the glory of the subahdari. অর্থাৎ বেভারিজ সাহেবের কথা হচ্ছে : এ সিংহাসনের পাথরে লোহা মিশ্রিত আছে বলেই এখনো তা এত ক্ষীত হয় যে, রেখাচিত্রের প্রান্ত বেয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় পানি পড়ে। এটা নিশ্চয়ই বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা। ইতিহাসবিদ বেভারিজ সাহেবও ওপরের মন্তব্যে এ কথাই বলেছেন। কিন্তু মুর্শিদাবাদের বাসিন্দারা, যাদের কাছে অতীতের গৌরব স্মৃতি এ সিংহাসনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে, তাদের কাছে এ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার বাইরেও কিছু আছে, আর তা হচ্ছে তাদের মনের আবেগ-অনুভূতি। তাই জনশ্রুতি আছে যে, নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার সিংহাসন আজো তার জন্য নীরবে অশ্রু বিসর্জন করে। এ সিংহাসনটি পরে লর্ড কার্জনের শাসনামলে মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল ভবনে এনে সংরক্ষণ করা হয়। বর্তমানে সিংহাসনটি সেখানেই বিদ্যমান রয়েছে।



নিবন্ধ

বাঙালির জয়পরাজয়

মাহমুদুল বাসার

ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর একটি মূল্যবান বইয়ের নাম ‘বাঙালির জয়পরাজয়’। বাঙালির জয়ও আছে পরাজয়ও আছে। তবে ১১ এপ্রিল দৈনিক সংবাদে স্বনামধন্য কলাম লেখক মুনীরুজ্জামানের কলামটি পড়ে ব্যথিতচিত্তে অনুভব করলাম, বাঙালির পরাজয় ঘটতে শুরু করেছে। পাকিস্তানের কাছে নয়, পরাজয় ঘটছে এ-দেশীয় পাকিস্তানপন্থী মৌলবাদীদের কাছে। চল্লিশের দশকে সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহ ‘লাল সালু’ উপন্যাসে নোয়াখালীর একটি গ্রাম ‘মহব্বতনগর’-এর যে চিত্র এঁকেছিলেন, এখন দেখা যাচ্ছে গোটা বাংলাদেশ মহব্বতনগরে পরিণত হচ্ছে। মৌলবাদকে ভয় পেতে পেতে বাংলাদেশ রাষ্ট্র ১৯৪৭ সালের দিকে যাত্রা করেছে। একবার পাকিস্তানি এক ক্রিকেট তারকা ১৯৭৫ সালের পরপর দম্ভভরে বলেছিলেন, ‘বাংলাদেশ খাতায় আছে গোয়ালে নেই’। তাহলে গোয়ালে কী আছে? গোয়ালে আছে জিন্নাহ আর দ্বিজিততত্ত্ব। হেফাজতের মাওলানা শফি যেদিন বাঙালি মা-বোনকে তেঁতুল আখ্যা দিলেন, সেদিন আড়াই লাখ মা-বোন পুনরায় শফির কথায় ধর্ষিতা হয়েছে। সেই শফি নাস্তিকদের বিরুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়ার হুমকি দিয়েছেন। বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব হারানোর করে দেবেন বলে হুমকি দিয়েছেন। মৌলবাদ শফিদের স্পর্ধা এভাবে যদি চড়া হতে থাকে তাহলে পাক ক্রিকেট তারকার কথাই সত্য প্রমাণিত হবে। সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ব্যাপার যে, মৌলবাদীরা লাল সালুর মজিদের মতো বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অস্তিত্বের শিরায় শিরায় ভয় ঢুকিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে। গণজাগরণ মঞ্চের মতো একটি জ্বলন্ত পাবকতুল্য সংগঠনকে নাস্তিক বলে বল্লম ছুড়ে মেরে নাস্তান-বুদ করে দিয়েছে। তাদের হাত-পায়ের গিরা ভেঙে দিয়েছে। তারা তবুও খোঁড়া পায়ে আন্দোলন করে যাচ্ছে। মৌলবাদীরা সাধনা করছে বাংলাদেশের দুই নেত্রীকে হিজাব পরাতে। বিসমিল্লাহ, রাষ্ট্রধর্ম তো আছেই। এখন দরকার দুই নেত্রীর পায়ে ফতোয়ার শৃঙ্খল পরানো। মধ্যযুগের ভণ্ড আলেমরা সুলতানা রাজিয়া, সম্রাজ্ঞী নুরজাহানের বিরুদ্ধে ফতোয়া দিয়েছিলেন ‘নারী নেতৃত্ব’ হারাম বলে। এ যুগের ভণ্ড আলেম আর মৌলবাদীরা পাকিস্তানের বেনজির ভুট্টোর প্রাণই কেড়ে নিল। মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীও বলেছিলেন, ‘নারী নেতৃত্ব হারাম’। তথাকথিত আওয়ামী ওলামা লীগের ফতোয়া শুনে

স্তম্ভিত হয়ে গেছি। আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক মাহবুব উল আলম হানিফ এই সংগঠনকে আওয়ামী লীগের অঙ্গসংগঠন হিসেবে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। মৌলবাদীরা ছদ্মবেশ ধরে আওয়ামী লীগে অনুপ্রবেশ করছে। আওয়ামী লীগের সেকুলার স্পিরিট ধ্বংস করার পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। সরকার পহেলা বৈশাখের প্রাণ মাতানো উৎসবের ওপর যে নীতিমালা আরোপ করেছে, তা এসেছে এক ধরনের ভীতি থেকে। মৌলবাদীদের ভয় পাওয়ার দৃষ্টান্ত এটি। রাষ্ট্র ও সরকারের সীমাবদ্ধতা আছে, তাকে পা গুনে চলতে হয়। এই যে পা গুনে চলার কৌশল, এও ভীতি থেকে আসছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, ‘দুর্বলেরই ছল বেশি’। তথাকথিত ওলামা লীগ বর্ষবরণ উৎসব নিষিদ্ধের যে ফতোয়া দিয়েছে, তার মধ্যে পাকিস্তানি শাসকদের কণ্ঠস্বর শোনা গেছে। এটা সবারই জানা কথা যে, সরকার ‘বিসমিল্লাহ’ ও ‘রাষ্ট্রধর্ম’ আইনের ওপর হস্তক্ষেপ করবে না। এর পরও একটি রিট পিটিশনকে কেন্দ্র করে হেফাজত ও জামায়াত যে হুমকির ভাষা প্রয়োগ করেছে তা সংবিধান, সরকার ও আদালত অবমাননার শামিল বলে মনে হওয়া স্বাভাবিক। ধর্মীয় সেন্টিমেন্ট পুঁজি করে এ স্পর্ধা দেখাতে পেরেছে তারা। তাদের এ স্পর্ধা ১৯৭২ সালের সংবিধান লঙ্ঘনের পর্যায়ে পড়েছে। ধর্মনিরপেক্ষতা যদি সংবিধানে না থাকে, সংবিধানে যদি রাষ্ট্রধর্ম থাকে, তাহলে মুখে মুখে অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশের কথা বললে মৌলবাদী প্রভাব দমন হয় না। ভারতের নরেন্দ্র মোদি যতই মুখে মুখে মুসলমানপ্রীতি দেখান, বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর উগ্রপন্থী হিন্দু সংগঠনের পক্ষ থেকে ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার প্রকাশ ঘটতে থাকে। বিজেপি ভারতের মুসলমানদের দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিকে পরিণত করেছে। গরুর মাংস খাওয়ার ওপর বিজেপি যে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে, একে মধ্যযুগীয় বর্বরতা ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। খাদ্য ব্যক্তিগত অভিরুচির প্রশ্ন। একে বলে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জবরদস্তি। একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এ জবরদস্তি চলতে পারে না। বাংলাদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠতার হুমকি, জবরদস্তি, আঞ্চালন-এসব চলছে পঁচাত্তর-পরবর্তীকাল থেকে। পাকিস্তানি শাসকরা যে স্টাইলে বাঙালির উৎসবগুলোর মধ্যে হিন্দুয়ানি খুঁজেছে তেমনি এ দেশের মৌলবাদীরা এখন উৎসবগুলোর ওপর

ফতোয়া দিতে শুরু করেছে। আমাদের সংবিধানের মূল স্তম্ভই হচ্ছে ধর্মনিরপেক্ষতা। তা বাতিল করার পর ধর্মাত্মক মৌলবাদীরা বুক ফুলিয়ে মাঠে নেমেছে। ‘৭২ সালের মূল সংবিধান আর ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়নি। এটা মৌলবাদীদের একটা বড় বিজয়। দীর্ঘ ২১ বছর পর্যন্ত স্বাধীনতার নেতৃত্বদানকারী দল আওয়ামী লীগকে ইসলামের শত্রু হিসেবে প্রচার করেছে বিএনপির গুটিফরম থেকে। এমনকি ১৯৯১ সালের নির্বাচনে বিএনপি নির্বাচনী প্রচারণায় সাম্প্রদায়িকতা, ভারতবিরোধ, হিন্দুবিদ্বেষ ছড়িয়েছে। এতে আওয়ামী লীগের ওপর মনস্তাত্ত্বিক চাপ সৃষ্টি হয়েছে। বাধ্য হয়ে আওয়ামী লীগকে ফতোয়াবাজদের ভয় পেয়ে, পা গুনে চলতে হচ্ছে। চারদিক থেকে ফতোয়াবাজরা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ওপর চাপ সৃষ্টি করে রেখেছে তিনি যেন ধর্মনিরপেক্ষতার পক্ষে, বাঙালি কালচারের পক্ষে পা না বাঁড়ান। বর্তমান সরকার মুখে হলেও ‘অসাম্প্রদায়িক’ কথাটা বলে যাচ্ছে। সেদিন স্বাস্থ্যমন্ত্রী মো. নাসিম বলেছেন এক বক্তৃতায় যে, ‘অসাম্প্রদায়িক চেতনার সঙ্গে কোনো আপস হবে না।’ মৌলবাদীরা চাপ সৃষ্টি করে যাচ্ছে এ উচ্চারণটুকু স্তব্ধ করে দিতে। যে কোনো তুচ্ছ ঘটনা অজুহাত করে তারা মার মার কাট কাট করে মাঠে নামছে ‘শতকরা ৯২ ভাগ মুসলমানের দেশ’ বলে রণহুংকার দিয়ে। অমনি সরকার ভয়ে সঁধিয়ে যাচ্ছে। এভাবে বাঙালি মৌলবাদী, পাকিস্তানপন্থীদের কাছে পরাজিত হচ্ছে। বাঙালির সেকুলার স্পিরিট এভাবে ভোঁতা হতে চলেছে। মৌলবাদীরাই সম্রাসের পথ ধরেছে। ড. হুমায়ুন আজাদ, ড. ইউনুছ, ড. তাহেরসহ ১২ জন লেখক-রুগারকে হত্যা করেছে মৌলবাদীরা। ইসলামে এ হত্যাকাণ্ড, এ নিষ্ঠুরতার কোনো স্বীকৃতি নেই। ইসলামে মহানবীর জীবনে মানবতার যে দিকটি বলবৎ, সে দিকটি উপেক্ষা করে দলীয় প্রতিহিংসা থেকে রুগার-লেখকদের কাপুরুষের মতো পেছন থেকে অস্ফাঘাত করে হত্যা করেছে। এর মূল কারণ আতঙ্ক ছড়ানো, সরকারের প্রতি চাপ সৃষ্টি করা যেন বাঙালি জাতীয়তাবাদী কালচার, মুক্তচিন্তার চর্চা, সেকুলার চর্চা প্রাধান্য বিস্তার করতে না পারে। রুগাররা প্রত্যেকে তরুণ। তাদের চিন্তা কুসংস্কারমুক্ত, বিজ্ঞানমনস্ক। তারা এখন দেশ ছেড়ে পালানোর জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। পত্রিকায় দেখছি বিভিন্ন দূতাবাসে গোপনে গোপনে রুগাররা পাসপোর্ট সংগ্রহের জন্য ভিড় জমিয়েছে। এর চেয়ে পরিতাপ আর কী হতে পারে। এটা তো বাঙালির পরাজয়েরই লক্ষণ। অচিরেই কি রোম সাম্রাজ্যের মতো বাঙালি জাতির পতন ঘটবে মৌলবাদীদের কাছে? জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের যে ছাত্রটি রুগে লিখত, পুলিশ ও গোয়েন্দা বাহিনী তার রুগ অনুসন্ধান করে দেখেছে, সে ইসলামের বিরুদ্ধে কিছুই লেখেনি। তাহলে এত নিষ্ঠুরভাবে তাকে হত্যা করা হলো কেন? কারণ ওই একটাই, মনস্তাত্ত্বিকভাবে ‘লাল সালু’ উপন্যাসের মজিদের মতো ভীতি ছড়ানো। ‘৭১ সালে বাঙালিকে যুদ্ধে পরাজিত করা যায়নি, এবার ঘায়েল করতে হবে ধর্মের অস্ত্র দিয়ে।



পুতালী ব্যাংক লিমিটেড
PUBALI BANK LIMITED

Deposit Products

- ▶ Savings Bank Account
- ▶ Current Deposit Account
- ▶ Dwigun Sanchaya Prakaipo
- ▶ Pubali Sanchaya Prakaipo
- ▶ Shiksha Sanchaya Prakaipo
- ▶ Pubali Pension Scheme
- ▶ Fixed Deposit Receipt
- ▶ Monthly Profit Based Fixed Deposit
- ▶ Special Notice Deposit (SND)
- ▶ Monthly Profit Based Small Deposit
- ▶ Target Based Small Deposit
- ▶ Pubali School Banking

**For your financial
management and plans,
please contact the nearest Branch.
Our 444 Branches are ready to
assist you.**



আরোহণ

আল মাহমুদ

বৃষ্টিতে না হোক, তবু অন্য কিছু ঘটুক এখন
এমন রাত্রিতে এসে খেমে যাবে বক্ষা বিশ্বয়?
হতাহত, অনাদর, অপমানে-আরক্ত ভ্রমণ—
সানুদেশে একত্রিত, আরোহণও নিরাপদ নয়।

জ্যেষ্ঠদের উৎসাহে নারীদের গোপন রোদনে
যদিও দাঁড়ালো উঠে যুবকেরা, শিশুর জনক
এমনকি কিশোরেরা কেঁটে ওঠে মোহিত বোধনে
বৃদ্ধেরা চিন্তিত, তবু পিছু ফেরা আরো ভয়ানক।

আরো ভয়ঙ্কর ওই পর্বতের তির্যক চূড়াটা
কঠিন কৃষ কান্তি, চিরকুট পিচ্ছিল পাথর,
সহসা পেশল শব্দে যাত্রীদের প্রথম ঘোড়াটা
অতর্কিত লাফ দেয় বাতাসের বুকের ওপর

অতল নৈঃশব্দে যেন উপচালো ঐক্যের আঁধার
কে যেন ফুঁপিয়ে কাঁদে, পুরণের প্রেয়সী না রোল
একদিন চূর্ণ হবে এই তিক্ত গোলক-ধাঁধার
এখন মশালে দাও এক বিন্দু স্নেহের আগুন।

চৈত্রে শ্রাবণ

মহাদেব সাহা

দুদিনেই সাঙ্গ হয়ে গেল সহস্র বছর, এতো স্বাদ এতো কথা
কাঁদছে মুহূর্তগুলি কাকে বলি একটু দাঁড়াও;
বৃথা এ প্রার্থনা, জীবন নিষ্ঠুর বড়ো অপেক্ষা জানে না
তবু তারই কাছে হাত পেতে আছি, তারই কাছে নত।
সব মোম ক্ষীণ হয়ে যেতে যেতে কাঁপে
শুধু শিখা
গুনে গুনে দেখি এই পুরনো পালক বারাপাতা
সমস্ত কথার ভার তুলে নিচ্ছি, আর দুঃখ নয়
পাথরের দীর্ঘ শ্বাসে ভারী হয়ে ছিলো, সারা বন
এবার তা হলে হোক ঝুম বর্ষা, চৈত্রে শ্রাবণ।

স্বপ্ন

নির্মলেন্দু গুণ

জয়ী হতে কী কী চাই? এক ডিভিশন সৈন্য?
আধুনিক রণতরী? এক স্কোয়াড্রন বোমারু বিমান?
ইঙ্গ-মার্কিন ক্যাপিটাল? না, এসবের কিছু নয়,
আমি অন্যভাবে জয়ী হই প্রতিদিন। দৃষ্টি কেড়ে নেয়া
একটি হঠাৎ জবা হেমন্তের হিম কুয়াশায়
আমাকে ফুলের সাথে বেঁধে দিয়ে যায়।

আমার বাহিনী এক ডিভিশন জবাফুল। নানা বর্ণে,
নানা গন্ধে, আধুনিক স্বপ্ন-কল্পনায় রণতরী হয়ে
ধেয়ে চলে বঙ্গোপসাগর থেকে ভারতসাগরে।
অপ্রতিদ্বন্দ্বী এবং অপ্রতিরোধ্য গতি তার,
মৃত্যুহীন স্টেনলেস স্টিল।
এক অলৌকিক ঐশী এরোপ্লেন আমি, উড়ে যাই...।
টুপটাপ করে বারে পড়ে পারমাণবিক রক্ত
আমার এ দেহ থেকে; লোকে বলে ধ্বংসাত্মক বোমা।
অশ্রুর আইসোটোপে ভিজে ওঠে পরিপার্শ্ব,
উষর পৃথিবী। বাংলার মাটি তাকে চেনে।
স্বপ্নে প্রেমে কল্পিত সাহসে আমি ছুটে চলি
অব্যর্থ লক্ষ্যের দিকে, দ্রুত, দ্রুততর, ধীরে কখনো-বা
শর্তহীন মুক্তিবিশ্ব মাথা তোলে একবিংশ শতাব্দীর কোলে।
পূবের আকাশে জবাকুসুমের মতো সূর্যসত্য জাগে।

অনাগত নববিশ্ব জানি মিথ্যে নয়,
আমার চৈতন্যে তার মুখ দোলা লাগে।
আমি তা ছড়িয়ে দিই বীজকম্প হাতে, বুঝি,
স্বপ্নভ্রষ্টকৃতবিশ্বে বিশ্বাস আমার প্রেম;
আশা তার একমাত্র পুঁজি।

এই ঈদে
ঘরে আনুন
প্রয়োজনের সবকিছু

এসআইবিএল ইসলামিক কনজুমার ফাইন্যান্স
আপনার
সংসারের
সঙ্গী

ঈদে আপনার সংসার গোছানোর প্রয়োজনীয়
সব আসবাবপত্র, ইলেক্ট্রনিক ও অন্যান্য
ভোগ্যপণ্য কেনার অনন্য সমাধান নিয়ে
আপনার পাশে এসআইবিএল ইসলামিক
কনজুমার ফাইন্যান্স। বিনিয়োগের টাকা
১২-৬০টি মাসিক কিস্তিতে পরিশোধের সহজ
ব্যবস্থাতে থাকছেই।



যে কোন প্রয়োজনে যোগাযোগ করুন
দেশব্যাপী সকল শাখায় অথবা ০৯৬১২০০১১২২

www.sibl-bd.com



মর্ম বেদনার কথা

মাকিদ হায়দার

শনিবারে যেতে বলেছিলে
কি কারণে যাবো, বলোনি আমাকে
রবিবারে অফিস থাকায় হলো না যাওয়া।
সোমবারে মিটিং ছিলো সকাল থেকে
যাচ্ছে তাই এক মন্ত্রীর সাথে।
মঙ্গলবারে প্রচণ্ড দাঁতের ব্যথায়
সাথে ছিলো মাথা ধরা।
যাইনি অফিসে।
বুধবারে যথেষ্ট চিন্তায় ছিলাম প্রমোশন নিয়ে।
বৃহস্পতিবারে আমার ব্যক্তিগত সহকারী সুশী মেয়েটি,
ট্রেনে উঠতে গিয়ে শেষ অব্দি
চলে গিয়েছিলো না ফেরার দেশে।
তোমাকে বলাই হয়নি, শুক্রবারে অভিজিৎকে
দেখতে গিয়েছিলেম লাশ কাটা ঘরে,
গিয়ে দেখি তুমি।
অবিকল, সেই মেয়েটির আদল তোমার চোখে
কাজলটানা চোখ, তুমি কি এক বারের জন্যে
জীবনানন্দের লাশ কাটা ঘরে শুয়ে শুয়ে
আমাকে দেখতে পাও।
পেয়েছিলে?

তার পরও ফুটিও

গোলাম কিবরিয়া পিনু

আমিও ফুটেছি
তুমিও ফুটেতে পারো এ-বয়সে
পাঁচটি পাপড়ি না হলেও
তিনটি পাপড়ি খুলে—
কানায় কানায় পূর্ণ হয়েছ
না হলেও ভুলে!
মাচার ওপর ঘরে
পায়রার খোপে—
কিংবা কোনো ঝোপে
হৃদস্পন্দন কাঁপে কাঁপুক জ্বরে।
ধনুকের ছিলা, লোহারও হাতিয়ার
কিবা রক্ষাকবচ—
রক্ষা করে না মৃদুগন্ধেও
পরিচয় গৌণ—বড় জাতি কার!
চঞ্চল হলে মনঃপূত
কখনো কখনো হতে হয় স্থানচ্যুত।
তার পরও ফুটিও—
আপন গন্ধে লুটিও!

শত পৃষ্ঠা ঝড়ে

ফারুক মাহমুদ

আগুনের কোনো সঙ্গী নেই
একাই সে অনেক আগুন
চন্দ্র সূর্য একা একা চন্দ্র-সূর্য হয়
একা একা মানুষ হয় না
মানুষ সান্নিধ্য খোঁজে। যদি পায়, পেয়ে যায় সুবোধ সময়
মধু কিংবা বিষে
দ্বৈত কণ্ঠে গীত হবে সময়ের গান
ফুরানো যাবে না কথা, কথাগুলো কথা বলে অপলক স্বরে
শিল্পের সংকেত এলে শরীরে শরীর যাবে রতিদীর্ঘ মিশে
তখনই কবিতাজন্ম : দিত্তা দিত্তা শত পৃষ্ঠা ঝড়ে

মরুভূমির চিত্রকল্প

সরকার মাসুদ

মরুভূমির ভেতর দিয়ে একটা গাড়ি ছুটেছে
মরুভূমির ভেতর দিয়ে পাকা রাস্তা চলে গেছে
অনিশ্চয়তার দিকে...
গাড়ির ভেতর বসে আছে দুজন নর-নারী
এগার বছর পর দেখা!
এতদিনে তাদের প্রেম পেকে ফেটে
বীজ ছড়িয়ে পড়েছে কনকচাঁপার মাঠে!
তারা ধরে রাখতে পারেনি হৃদয়ের মুগ্ধ ভাব।
এখন তাদের মনে কীসের অভাব
মৃদুস্বরে বেজে চলেছে!

প্রেম মানুষের জীবনে আসে না বেশি রাত
এগার বছর পর দেখা!
মরুভূমির ভেতর পাকা রাস্তায় পাশাপাশি দুজন
খুব স্পিডে গাড়ি ছুটেছে
গাড়ির ভেতর কথা বলছে না তারা
গতির আবেগে তাদের নিঃসঙ্গতা এখন চূড়াস্পর্শী
খেজুরগাছ জ্বলছে বালু ও পাথরের রূপালি আগুনে
একজন দোষ দিচ্ছে অন্যজনকে—
তুমি আমার জীবন মরুভূমি করে দিয়েছ সিঁড়ি ভালোবেসে!

আপনার ব্যাংকিং হোক বৈচিত্র্যময়!

বহুমুখী সেবায় আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক



www.al-arafahbank.com

অন্তহীন মানবকল্প

মাসুদুজ্জামান

অজ্ঞাত আদম আমি, কুলশীল, তাই যত্রতত্র লিখি নাম। অনামা পাজরের হাড়ে খোদিত কাদামাটি দিয়া বহু যত্নে দেশগ্রামে লিখে যাই হাইরিড হুতশন। এই হলো শূন্য ধানক্ষেত, প্রিয় মৃত মানুষ, ঘুমন্ত প্রান্তর, রক্তলিপিসংকেত।

এ মানবপুঁথি হে, ধীরবাহন। আরিচার উজানে অলিক ইলিশের জালে রাত্রির আন্ধার। আরো দূরে কত কত নদী মরুময়, হার্ডিঞ্জ ব্রিজের তলায় থিরবিজুরি পানি ও বালির পুরাণ। আমি লিখি লোকালয়ের এইসব ভাটিয়ালি, মরমীক্ষরণ।

লিখি, লিখি কত যে ডাকিনীকথা। বিলের মধ্যখানে শালুকফোটা নরম জ্যোৎস্না। বাপজান হাট থেকে ভাইজানের জন্য প্রথম শার্ট কিনে ফিরতাম, শেওড়াগাছের কাছে ওই হিমসঙ্কায় কোনো এক প্রেতিনী কেশ আওলাইয়া মিহিসুরে কাঁইন্দা ওঠে। আলপথ দিয়া হেঁটে যেতে যেতে বাপজান চিক্কর দেন। পরদিন লতার কামড়ে ভাইজান কব্বরে।

বিগত আশ্বিনে বুঝান নাইওরে আসিছেন, টুটাফাটা শাড়ির আঁচলে বান্ধা পান, গুয়া, একটুকরা বিড়ি। সেলাইকলের সুঁই ও সুতায় জোড়া দেয়া যাপনের দিনগুলো হঠাৎ বাপ করে ভেঙে-পড়া ভঙ্গুর প্লাজার নিচে ছিন্নভিন্ন, রক্তস্রোতস্বিনী।

এরই মাঝে বেজে ওঠে জীবনবিস্তৃত বাঁশি, শস্যসূত্র। ঝড়জল, মাঠে মাঠে লাঙলের মুঠিতে শিথিল হাত, মাটিমুখে চৈত্রের মাঠফাটা বলিরেখা, ধ্বংস, জমিনে অঙ্কুরিত ফসলের আদিকল্প আমি ও রক্তাক্ত আমার পিতার মুখ।

দীর্ঘশ্বাসে সূর্যোদয়ে

ফারহানা রহমান

কতটা স্বপ্ন আঁকা ছিল বিরান প্রদর্শনীর দেয়ালে, মনে নেই আর।

ভুলে গেছি তোমার নামের শেষ অক্ষরটিও।

ছাই হয়ে উড়ে গেছে শেষ সৌরলিপি

সময়ের সমান্তরাল পথের ধারে

যে-পথ শুরু আর শেষ হয়েছিল কোনো এক কুহক টানেলে।

চোখ বুজে গেছে, কত যে রাত হলো তবু নির্ঝরিলি

অশ্রুবার্ণা উপচে উপচে পড়ছে পাথরচোখে

আলোর স্বচ্ছ কাঁচের ঘাগরা পরে নাচছে আমার ছায়াপ্রতিবিম্ব

বারান্দায় গা ঘেঁসে নিশ্চিন্তে শুয়েছিল মৃত আর জীবিত স্মৃতির মমি

কাকে বেছে নেব?

গভীর কুপে ডুবে থাকে তোমার দুচোখের ভাষা

মৃত চাঁদ স্থির হয়ে আছে আমার চোখে

পতঙ্গ যেমন ঘন হয়ে থাকে আগুনের খুব কাছে

উর্মির উচ্ছ্বাসে ভেসে আসে অতীতের সেইসব কথোপকথন

ছায়ার উপরে ছায়া সবুজ আগুনে মর্মে ধরায় মেঘের বুক

যখনই তোমার কথা ভাবি

দীর্ঘশ্বাসগুলো প্রতিদিন আমার হৃদয়ে সূর্যোদয় হয়ে ফুটে ওঠে।

তুমি ভুলে যাবে ভাবতেই পারি না

শফিক আলম মেহেদী

একদিন তুমি আমাকে ভুলে যাবে

আমি ভাবতেই পারি না

যেমন ভাবতে পারি না

সাহারা অথবা গোবির বুক চিড়ে

কোনদিন জলপদ্ম ফুটেবে

একদিন তোমার স্মৃতিতে মরে যাবো

আমি বিশ্বাস করি না

যেমন বিশ্বাস করি না

কঠিন পাথরের বুক

মানুষের মতো সুনীল হৃদয় থাকে

আমি বুঝি না, কী করে ভুলে যেতে পারো

চোখের কম্পিত তারায় উচ্চারিত

ভালোবাসার প্রথম অঙ্গীকার

আমি বুঝি না, কী করেই-বা ভুলে যেতে পারো

প্রথম চুম্বনের সোনালি স্মৃতি

প্রাত্যহিক প্রথায় দেখা হওয়া কথা কওয়া

ফুল পাখি নদী দেখা

তুমি কি ভুলে যেতে পারো

ওসব স্মৃতিময়ী দিনের কথা

যখন ভালোবাসার প্রত্যয়ে

আমার সাহসী হাত

তোমার মায়াবী শরীর

ছুঁয়ে যেত প্রত্যহ

যখন কবিতা দুপুরে

গাছের ছায়ায় বসে

রবীন্দ্রসংগীতে খুঁজেছি দুজন

জীবনের সুন্দরতম মানে?

তুমি কি ভুলে যাবে তোমার প্রথম প্রেম

যৌবনের প্রিয় নাম প্রিয়তম অনুভূতি?

তুমি কি পারো

সেসব সুবর্ণ স্মৃতির মালা ছিঁড়ে

কৃষ্ণপক্ষের রাত্রির ভীষণতা নিয়ে

চাঁদের মতো আমাকে গ্রাস করতে?

অরণ্যের অসম্পন্ন পাতা ও ফুল

মিজান রহমান

এবং পারমানবিক বজ্রের ভাগাড় চাঁদ থেকে ছড়িয়ে পড়া

তেজস্ক্রিয় জ্যোৎস্না দুহাতে সরিয়ে

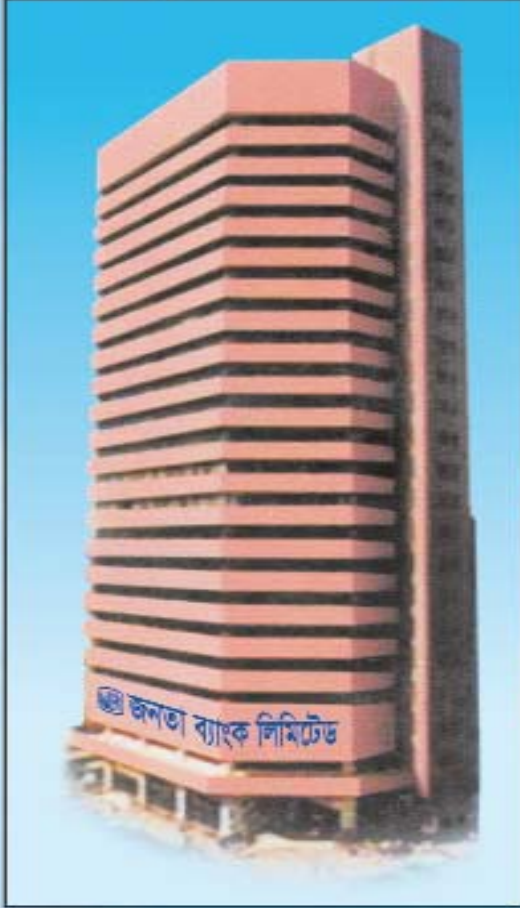
মহাশূন্য থেকে তুলে আনি নক্ষত্র ভঙ্গ

আর ক্লেদাক্ত মেঘে ছড়িয়ে দেই অনল স্কুলিঙ্গ

এবং যে যার স্বভাবে বিকশিত হতে থাকে

অরণ্যের অসম্পন্ন পাতা ও ফুল

২০১৫ সাল জনতা ব্যাংকের অনলাইন ব্যাংকিং কার্যক্রম বাস্তবায়নের এক অনন্য সফলতার বছর



আপনি কি জানেন ?

- এখন হতে জনতা ব্যাংক লিমিটেড এর ৫০৩ টি শাখা থেকে অনলাইন ব্যাংকিং সুবিধা পাওয়া যাচ্ছে।
- আজই জনতা ব্যাংক লিমিটেড এর অনলাইন সেবা গ্রহণ করুন।
- অনলাইন শাখার তালিকা http://jb.com.bd/jb/about_us/online_branches লিংকে পাওয়া যাবে।



জনতা ব্যাংক লিমিটেড

E-mail: dgmit@janatabank-bd.com

উন্নয়নে আপনার বিশ্বস্ত অংশীদার

website: www.janatabank-bd.com

ভালোবেসে প্রিয় বিষে

হাসান হাফিজ

বিষও প্রিয় হয়। কখনো সখনো।
বিষ কিছু প্রতারণা করতে জানে না।
খাঁটি বিষ কোথা খুঁজে পাই?
যা প্রয়োগে বিচ্ছেদের বিষজ্বালা
নিভতে জুড়াই!
এ দহন চলবে কিছু আমরণ
এই ক্ষত হয়তো আর শুকাবে না
ভিতরে ভিতরে হবে গোপনীয়
নীরবে ক্ষরণ
ভালোবেসে, প্রিয় বিষে
আয় দুঃখ সন্তাপ হরণ
ভালোবেসে নিমজ্জিত প্রিয় বিষে
শুভলগ্নে নিরজনে করি তোকে
সানন্দ বরণ
ভালোবেসে অনিচ্ছায় মরে যাই
না চেয়েও পুনর্জন্ম পাই
এমন ফিনিক্স পাখি তোমরা দেখেছ নাকি
চোখভরে দেখতে যদি চাও
এসো চুপে, মনোচোরা পাখি দেখতে সম্মুখে দাঁড়াও...

কর্কট রাশির কবিতা- ২

মিজানুর রহমান বেলাল

বৃষ্টিবিনম্র সবুজপাঠে বালিকা হারায় উড়ালমিন।
ডানাভেজা পাখির গান শুনবে বলে জেগে আছে আদিবাসীগ্ৰাম
চোখের তারায় ব্রজ্যপরি রুক্মিণী দৃষ্টআশ্রম
আর জুমপাহাড়ের চূড়ায় প্রজাপতি রঙিন বৃষ্টিবিলাস
আহা! কত মধুর—
সাঁওতাল বালিকার খোঁপাভেজা সুবাস...
কী করে ভুলে যাব—
দমির দরদ, কালো চোয়ালের মায়া;
মহিষের পিঠে বসা—
কর্কট রাশি মিহি মিহি মৌনতা।
মুনের মুনিয়া চিনতে পারেনি—
বুনোফুলের গোত্রহীন সরলতা
বৃক্ষ বোঝে বৃষ্টির ভাষা—
বর্ষায় হাসে বোঙ্গা
জুমপাহাড়ে জমে আছে জ্যোতির্ময় মধুচন্দ্রিমা
তাই তো, বর্ষা এলেই খুলে যায়—
সাঁওতাল সাঁতারবিদ্যার দরজা...

গহ্বর

নির্মল চক্রবর্তী

প্রতিনিয়ত মিথ্যে বলেছ আমায়
হয়তো ভেবেছ যৌবন দিয়ে
এমনকি আমার অর্থ দিয়ে
যাদের লালন করছ তুমি
তারা তোমার হিটলিস্ট দেখে
যারা তোমার দুর্বলতা জানে
তাদের হত্যা করবে।
জেনে রেখ, এই আততায়ীরাই
বিনিময়ে তোমাকে ছিঁড়ে খুঁড়ে খাবে,
টেনে নিয়ে যাবে নোংরা অন্ধকারে গহ্বরে
তখন তোমার আর্তিচিংকারে কর্ণপাত
করবে না কেউ। অথচ তোমার সমস্ত
দেহমন চেষ্টা করে উঠবে— ‘বাঁচাও, বাঁচাও’, বলে।

স্বপ্নবাজ

অনু ইসলাম

নিঃসঙ্গতার মুখোমুখি বসে—
যাকে নির্মাণ করি; সে তো তোমারি প্রতিচ্ছবি।
অনুভূতির মানচিত্র জুড়ে যে সরল রেখাগুলো হেঁটে গেছে
সেখানে গোপন কোনো চিহ্ন নেই; শুধুই নিভৃত এক মায়াবৃক্ষ!
পিপাসায় নিমগ্ন হয়ে আছি জলরঙে কোনো নির্জন দুপুরের
অযাচিত মুখোচ্ছবি তুলে আনবো বলে সময়ের আয়নায়....

যদিও ইতিবৃত্ত ভেঙে পড়ছে আর চোখ রাঙাচ্ছে সময়ের অনুশাসন
তবুও জলফড়িংয়ের ডানায় স্বপ্ন ওড়াই;- স্বপ্নবাজ!

মার্কেন্টাইল ব্যাংক কর্পোরেট ব্যাংকিং



সময়ের সাথে দেশের অর্থনীতিকে
আরো সুদৃঢ় করতে
আমাদের প্রচেষ্টা সবসময়
ছিল, আছে এবং থাকবে...

বাংলা ব্যাংক



মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেড
Mercantile Bank Limited

সম্ভ্রমিত আদায়ের শক্তি

প্রধান কার্যালয়: ৬১ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০ | ফোন : ৯৫৫৯০০০, ফ্যাক্স : ৯৬০-২-৯৫৬১২১০

www.mblbd.com

হঠাৎ তুমি

দিলারা হাফিজ

চারপাশে কত শত তোমার স্মৃতির পোষাপাখি
 আয় আয় ডেকে যায় বিধুর সন্ধ্যায়;
 মনন মুহূর্তে তুমি যেভাবে ডাকতে 'মুমু' বলে
 পলায়নপর ঝাঁঝি পোকারা আমাকে
 ডাকে, ডেকে যায় সেইভাবে নিরলস,
 শয্যায় একাকী তুমি অচেনা নিঃশ্বাসে ভারাতুর
 কী জন্য অপেক্ষা তার আমি যে বুঝিনি
 শত্রুমিত্র কেবা পর, কেই বা আপন?
 যেন বুকশেলফের সমুখে দাঁড়িয়ে আজো তুমি
 বিস্ময়ে সমগ্র কাব্যে বিভোর রেখেছ দুই চোখ
 পড়ছ পুরনো পদ্য যেন কালোত্তীর্ণ রসে নত
 পিছনে এসেছ ফেলে পরিণামহীন রাত্রি-দিন;
 নতুন বোষ্টমীদের ওগো-হ্যাগো হাসি,
 এখনো শুনতে পাও কি আগের মতো
 একটান জলবতী মেঘের বর্ষণ কবরের ঘাসে ঘাসে
 এভাবে যখন জেগে ওঠে আজ সত্যের কখন
 আমাকে পেছনে ফেলে, কীভাবে এগিয়ে যাবে একা?
 যে কোনো সময় তুমি দাঁড়াবে আমার পাশে এসে
 অবশ্য দাঁড়াবে তুমি সমুখে আমার
 তাই তো তোমার চেয়ারের পাশে আমি
 বসে আছি একা একা অনন্তকালের যেন ছায়া
 ফিরে এসে দেখ তুমি-এখনো প্রতীক্ষারত আমি
 কখন অভিন্ন?
 পরিশেষে হঠাৎ তুমিও ...।

বিবস্ত্র রাত

জাফর ওবায়দ

দুয়ার খোলাই ছিল শুরু থেকে শেষঅবধি
 গতরাতে কোনো চাঁদ ছিল না
 বিবস্ত্র নদীর মতো রাতের শরীরে লেগেছিল পুরনো চাঁদের জৌলুশ
 আমার গিয়েছে কেটে সমস্ত প্রহর তার সঙ্গে ঘুম ঘুম খেলে -
 নিঃশ্বাস খাটে শুয়ে।
 গেল রাতে কোনো তারা ছিল না
 বিড়ালের মতো জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তার লেগেছিল জোনাকি শরীর
 আমার হয়েছে ভোর তার সঙ্গে ডলাডলি করে গলাগলি করে,
 ন্যাংটো কালের বুকুর ওপর।
 দুয়ার খোলাই ছিল শুরু থেকে শেষঅবধি
 তুমি আসোনি, আমার হয়েছে স্বজন সাধারণ কবিতা রমণি
 ছিল না সঙ্গে যার উপমা-রূপক প্রতীক-জমক।
 দুয়ার খোলাই ছিল শুরু থেকে শেষঅবধি
 তুমি আসোনি ঘুমের গালিচা বিছিয়ে নিঃশ্বাস রমণীয় খাটে;
 ধারালো পিনের সূঁচালো খোঁচায় বিক্ষত আজ ভোরের দেহ।

কোমল গান্ধার

প্রবীর চন্দ

তখনো যাইনি কলেজের ক্লাসে
 তখনো হয়তো ছাত্র-ছাত্রীরা গল্প করছে প্রিয়তম মুখ
 বন্ধু-বান্ধবের সাথে সকালের কামরাঙা রোদে
 হয়তো আকাশমুখী গাছে তখনো পাতা ঝরে পড়ছে
 দুঃখের বারান্দায় টুপটাপ শব্দে
 তখনো ঘর থেকে বের করিনি মোটরসাইকেল
 হিরো হোন্ডা-ডিলাক্স
 প্রতিদিনের মতো তখনো ঈশ্বরের পূজা
 শেষ হয়নি ঠাকুরঘরে। শঙ্খ বাজেনি
 মন্ত্র উচ্চারণ হয়নি একবারও
 শুধু শুধু ধূপ জ্বলে যায় আপন মনে;
 যদিও বানপ্রস্থের মতো বয়স হয়েছে ঢের দিন
 তবু তীর্থক্ষেত্রে শালগ্রাম শিলা
 স্পর্শ করিনি একবারও। এটা কি পাপ...?
 নাকি অভিশাপ...?
 শুধু দৌড়ের ওপর আছি; নিঃস্বার্থ প্রেম
 অহিংস জীবন মানুষের জন্য
 এ জীবন কি মিথ্যাময় ... হে ভগবান?
 আমি কি নাস্তিক ছিলাম কোনো দিন তোমার কাছে
 তবে কেন মৃত্যু হয় এইসব কোমল গান্ধারের
 তবে কেন পড়ে থাকে এইসব সেতারের করুণ মূর্ছনা!

একজোড়া লোভী চোখ

নীহার মোশারফ

মধ্যযুগীয় সময়ে নয়
 সমকালীন দৃষ্টিতে তৃণাচ্ছাদিত
 শিলার অন্ধকার গুহা ভেদ করে
 তোমার একজোড়া লোভী চোখ
 দেখতে কী যে ইচ্ছে তার
 একটি নিঃসঙ্গ পাখি যখন তোমাকে
 বিস্ময়ে দেখছে
 প্রজাপতি উড়ছে হাওয়ায় হাওয়ায়
 তখন উপেক্ষিতা নারী নও তুমি
 রৌদ্রদগ্ধ চৈত্রনিদাঘ, বলসানো রোদ
 স্নিগ্ধ ফুল মনে হয়
 নিসর্গে যেমন তিজতার পর্দা থাকে না
 তোমার ছায়ায়ও তেমনি নৈপুণ্যের লীলায়িত মুক্তহৃন্দ
 কখন যে আত্মনিমগ্ন দেবদূত প্রেমের অধিকারী হয়েছে
 জানি না। শুধু জানি পাহাড়ের চড়াই উতরাই
 শ্রাবণের রাত, কালের মন্দিরা- সব পদদ্বারে পুজোয় রত
 কত গৃহতত্ত্ব, শিল্পীর চিত্রকলা, নির্জনে চাঁদের জ্যোৎস্না

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড-এ ভিসা কার্ড চালু রয়েছে



ATM ও CARD-এর সুবিধাসমূহ:-

- দেশ জুড়ে সোনালী ব্যাংকের বিস্তীর্ণ ATM নেটওয়ার্ক।
- প্রতিদিন ২৪ ঘন্টা ATM সুবিধা।
- সোনালী ব্যাংক এর কার্ড Q-Cash Consortium, National Payment Switch Bangladesh (NPSB) ও VISA নেটওয়ার্কভুক্ত সকল ATM এর মাধ্যমে টাকা উত্তোলন সুবিধা।
- ডুয়েল কারেন্সি কার্ডে বৈদেশিক মুদ্রা লোড করে বিদেশেও নগদ উত্তোলন এবং কেনাকাটা।
- ATM বুথ থেকে দৈনিক সর্বোচ্চ ডেবিট কার্ডে ৩০,০০০/- ও ক্রেডিট কার্ডে ৫০,০০০/- পর্যন্ত নগদ উত্তোলন।
- একক ও যৌথ নামের স্থায়ী ও চলতি হিসাবধারীদের ডেবিট কার্ড ইস্যু।
- Pre-paid Card ব্যবহার করে ইন্টারনেটের ATM থেকে টাকা উত্তোলন, POS-এ কেনাকাটা এবং ঘরে বসে আয়কর, ভ্যাট ইত্যাদি পরিশোধ।

VISA DEBIT CARD

VISA CREDIT CARD

VISA PRE-PAID CARD



সোনালী VISA কার্ড জীবনকে করে তোলে সহজ

বিস্তারিত তথ্যের জন্য কার্ড ডিভিশন-এর সাথে যোগাযোগ করুন।



সোনালী ব্যাংক লিমিটেড
Sonalibank Limited
উদ্ভাবনী ব্যাংকিং-এ আপনার বিশ্বস্ত সঙ্গী
www.sonalibank.com.bd

ফোন: ০২-৯৫৬০৩৬৬, ৯৫৭১১৬৫
মোবাইল: ০১৭৫৫-৫৮৩৬৮৭, ০১৭৫৫-৫৮৩৬৮৬
dgmcard@sonalibank.com.bd

ঔদার্যে ফোটে

সুজাউদ্দিন কায়সার

শব্দের নানাশ্রদ গুলতানি বিন্যাস দুঃসহ করে
ব্যাপ্ত বক্ষঃস্থলে— অনুলিপ্ত হয় উদ্ভাসে
জানিনা, এ-কেমন রহস্যগতি
প্রসারিত অনুক্ষণ

সবকিছুই তো সম্পূরক, তবু অস্পষ্ট জন্মপূর্ব
অন্তরালে মন্দির
বয়ে চলেছে অনুলিপ্ত থেকে অনন্তকাল

সমাচ্ছন্ন বিপুল শূন্যতা
জন্মউত্থান আর অপার রহস্যগতির আঁচড়
জীবনপ্রহর জুড়ে প্রশ্ন রাখে

অনুসন্ধানের গর্ভে জীবনবাহিত চিরপৃথিবী
আজন্ম আন্দোলিত অনন্তকাল
জন্মগন্ধ চুষে প্রতিদিন রাত
ঔদার্যে ফোটে জ্যোতি— অন্ধকার

বিমূর্ত মগ্নতা

আনোয়ার কামাল

ছেড়েছি মাটির ঘর-বাড়ি—
আবাদি জমিন ফসলের মাঠ, লেবু, কতবেল, পেয়ারা
আম, কাঁঠাল, জাম আর জামরুলের ছায়ায় ঘেরা জমিন
এত কাছে থেকেও বড় বেশি শূন্যতা দেখি—
হাহাকার জেগে থাকে পূর্ণিমার আলোকিত মধ্যরাতে
গুটি গুটি পায়ে বন্য ইঁদুর ধেয়ে আসে
পথের বেওয়ারিশ কুকুরগুলো তারস্বরে ডুকরে কাঁদে
আমারই হাতের কাছে পড়ে থাকে আবাদি মায়াবী শরীর
ছুঁয়ে যায় গহিন অরণ্যঘেরা বৃকের জমিন
অথচ এখানে কোনো ফসলের আবাদ হতে দেখি না
জেগে উঠতে দেখি না কোনো নতুন সবুজ জমিন
কেবলই বসত গেড়ে ধ্যান করি বন্দি দেয়ালে।

জনৈকা কিরণবালার কথা

জাফরুল আহসান

হাঁকডাক ছাড়ি গ্রামের মোড়ল জানিতে চাহেন
জটলা কিসের, থামুন সাবাই; আপনি বলেন—
কহিলাম ভয়ে ‘কিরণবালা তো পোয়াতি হইয়াছে’
নাউজুবিল্লাহ! মস্ত পাপের কাজ করিয়াছে।

বিহিত একটা করিতে হইবে শালিস ডাকিয়া
আরো কী কী সব কহিল মোড়ল মাথা নাড়াইয়া।

এ বাড়ি ও বাড়ি করিয়া ভিক্ষা ভিখিরির বেসে
কিরণবালা যে ঢাকিতে পারে না দেহ কায়-কেলাসে
বৃকের চূড়া সে কেমনে ঢাকিবে ছিঁড়া শাড়ি দিয়া
কামনার চোখ, লালসার জিভ খায় যে গিলিয়া।

যদি কেউ ডাকে কিরণবালারে সোহাগে আদরে
মানা শিখে নাই— ডাকিলে যাইবে বাঁশ-ঝোপ-ঝাড়ে
শরীরী ক্ষুধার জাত কুল নাই জীবন জোয়ারে
ইতর চাঁড়াল ভেদাভেদ নাই কিরণের ঘরে।

বার বার হায়! তাহারে পোয়াতি করিয়াছে যারা
তাহারাই কহে ‘ছিলাল কিরণ, করো গ্রাম ছাড়া।’

বিচারের শেষে রাক্তি পোহাইলে দেখিল সকলে
কিরণবালা যে ফাঁস লইয়াছে বৃক্ষের ডালে
মরিবার আগে সব কথা ফাঁস করিয়া গিয়াছে
মোড়লের বীজে উদরে বাছাটি ধীরে বাড়িয়াছে

কিরণবালার শোকে পশুপাখি কাঁদে, কাঁদে তরুলতা
গাঁও গেরামের সকলে কহিল কহিল যে কথা
রক্ষক যদি ভক্ষক হয় বিচারের শেষে
কিরণবালারা যেন না জন্মে আর এই দেশে।

তুমিময় বন্দনা

সুজন হাজারী

গোলাপ গোলাপি রঙে মানায় ভালো
অতীত যুগের অভিজাত
অন্তরের স্নিগ্ধতা প্রকাশ
গোলাপি গোলাপ শীর্ষ উপহার

গোলাপি রঙের গোলাপি সুখ
রোমান্স আনন্দের মিলন প্রতীক
পরস্পর প্রেমের বন্দনা
ভালোবাসার অমোঘ স্বীকৃতি
হৃদয়ে তুমিময় প্রাগুক্ত অনুভূতি

Agrani Bank Limited

(100 Percent owned by the Government
of the People's Republic of Bangladesh)

Financial Position of the Bank as on 31.12.2009 & 31.12.2015

(Taka in Crore)

	31.12.2009	31.12.2015 (Un-Audited)
Total Deposit	: 16628	: 43998
Total Loan and Advance	: 12224	: 24480
Total Remittance	: 5587	: 13204
Investment	: 4090	: 20522
Total asset	: 21406	: 56404
Number of Employees	: 11443	: 13396
Number of Branches	: 867	: 930
Subsidiary Companies	: 2	: 6

Online Banking Branches :

All (930) branches are Real time Online

Instant Payment service for NRBs

The Bank Pay off the remittance instantly from it's all 930 branches (cash over the counter) and credit the remittance to the beneficiary's account on the same day. The Bank has remittance arrangement with major remittanc companies and Money Transfer Companies (MTOs) around the world.

Agrani Exchange House
Private Limited, Singapore

Agrani Remittance House
Sdn Bhd Malaysia

Agrani Exchange Company
(Australia) Pty. Ltd.

Agrani Remittance House
Canada Inc.

MoneyGram

Trans-Fast
WORLDWIDE MONEY TRANSFER

prabhu
Money Transfer

MERCHANTRADE

IME
International Money Express
A Complete Money Transfer Solution

NBL QUICK PAY
REMITTANCE SYSTEM

WESTERN UNION
moving money for better

Ria
Money Transfer

AI Ansari Cash Express, National Exchange Italy, EzRemit, City Pay,
NEC Money Transfer, Instant Cash Money Transfer etc.



অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড

দেশ ও জাতির সেবায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ

9/D Dilkusha Commercial Area Dhaka 1000 -Bangladesh

PHONE : +88-02-9563942, +88-02-9560822 Mobile : 01708122199, 01713185162, 01713480109

PABX : +88-02-9566160-69, Ext-555 SWIFT at ID, HO : AG8KBDDH

e-mail : dgmfrmd@agranibank.org, info@agranibank.org

website : www.agranibank.org



উপন্যাস

যা হারিয়ে যায়

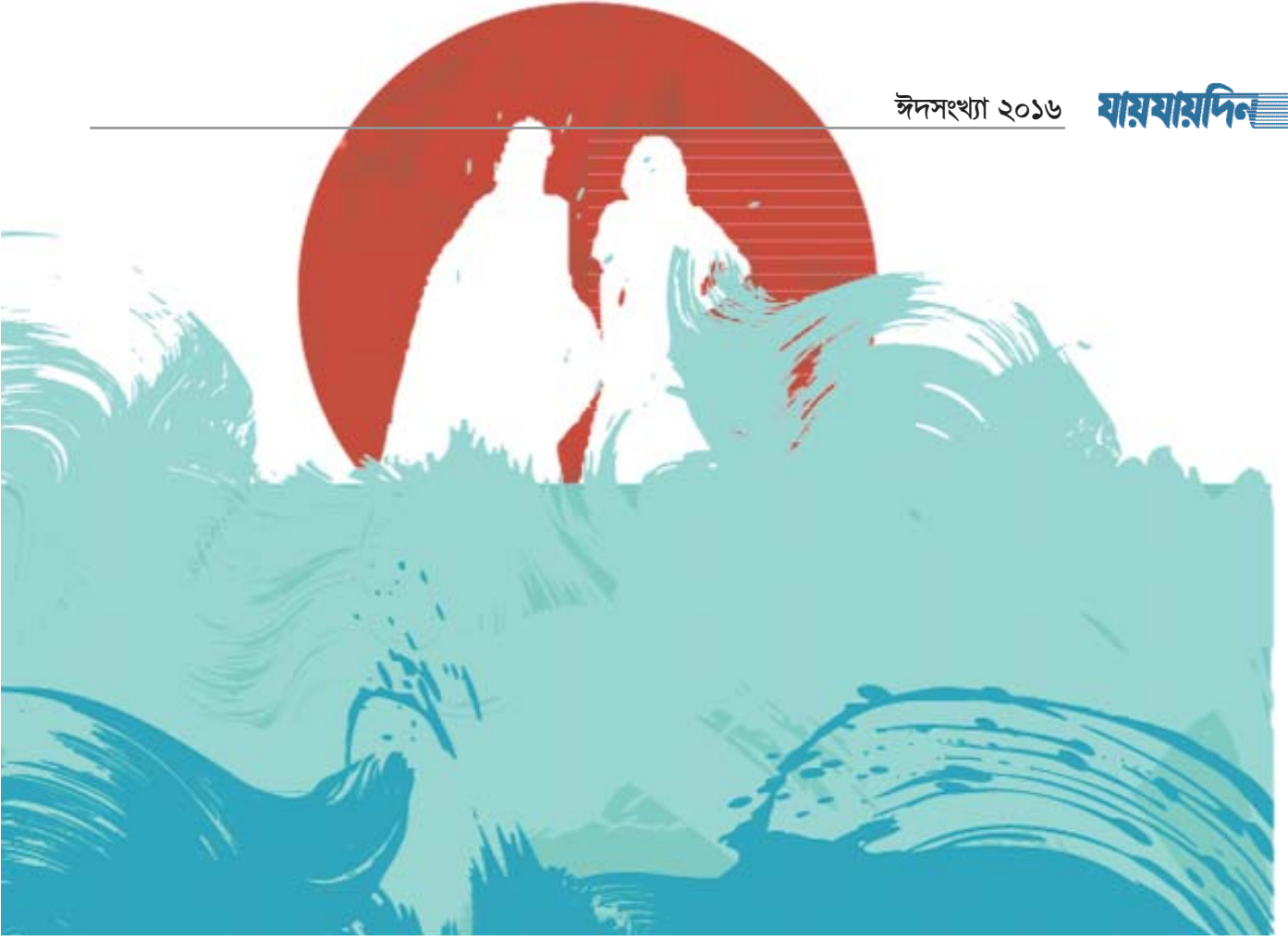
জুবাইদা গুলশান আরা

আকাশ চিরে বজ্রপাত হলো। হাতের কম্পমান আঙুলগুলো হাত থেকে খসেপড়া কাগজটা তুলে নিল। 'নূরজাহান বেগম ইজ নো মোর। শি ওয়াজ নাইনটি ওয়ান অ্যান্ড স্পারিং ফ্রম একিউট নিউমোনিয়া অ্যান্ড চেষ্ট কনজেশন। মে আল্লাহ নিভ হার পিস অ্যান্ড রেস্ট হার সোল ইন পিস।' চায়ের পেয়ালো হাতে সাবেরা ঘরে ঢুকে অমৃতাকে দেখে চিত্তিত হলো।

- কী হয়েছে ম্যাডাম! কোনো খারাপ খবর? অমৃতা নীরবে কাগজটা সাবেরার হাতে তুলে দিল। সাবেরা ওটা খুলে আঁতকে উঠল। মুখে ফুটল দুঃখের রেখা। ধীরে ধীরে কাগজটা মুড়ে ভাঁজ করে রাখল ত্রিপদীতে। ওদিকে টেলিফোন বাজতে শুরু করেছে। রিসিভার উঠিয়ে সংক্ষেপে

কথা বলল সাবেরা। তুলে দিল অমৃতার হাতে। ওপাশে কথা বললেন প্রগতিশীল নারী সংস্থার নেত্রী সুরাইয়া খানম।

- হ্যাঁ পেয়েছি খবর। মর্মান্তিক। অবশ্যই। আমরা সবাই জানি। নূরজাহান বেগম আমাদের জন্য কী ছিলেন কতখানি দিলেন। রিসিভার নামাতেই আবার বেজে উঠল টেলিফোন। ... সারাদিন ফোন আমছে। সারাদেশের সজাগ সচেতন মানুষ সবাই সমবেদনা জানাচ্ছেন, মতবিনিময় হচ্ছে সবার সঙ্গে। এক শতাব্দী সন্ধিধানে চলে যাওয়া মানুষটিকে সবাই নতুন করে চিনতে চাইছেন। অমৃতাও যেন নতুন করে আবিষ্কার করছেন একজন কর্মী। একজন নেতৃস্থানীয় মানুষকে যিনি জীবনে কখনো রাজনীতি করেননি। অথচ যার



কাছে সাহস উদ্দীপনা, উপদেশ না পেলে কর্মের ক্ষেত্রে এগিয়ে যাওয়ার আনন্দ হতো খণ্ডিত, অসম্পূর্ণ।
অমৃতার চোখের কোন ভিজিয়ে আসছে অর্থহীন কান্নার ধারা, যে কান্না, যে দুঃখের অশ্রু কখনো আপাকে ফেলতে দেখেনি অমৃতা। মনে পড়ল তার বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর— মেয়েদের আমি বলি, যোদ্ধার জাতি। জন্মযোদ্ধা। সমাজে, সংসারে, কর্মক্ষেত্রে, সর্বক্ষেত্রে তোমাদের যুদ্ধ করতে হবে। অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য। মেয়েদের জীবন শুরুই হয় যুদ্ধের জন্য।
অমৃতা তার চুলে চিরুনি ছোঁয়ায়। এখনো তার চুল কোমর দাপিয়ে নামে। ঈশ্বর তাকে সৌন্দর্য দিতে কার্পণ্য করেননি। তা নিয়ে অবশ্য ভাবার

অবকাশও ছিল না অমৃতার। তবুও অমৃতা আজকে অর্ধ শতাব্দী পরে নিজের পেছনের দিনগুলোয় ফিরে তাকায়। সামনে তাকিয়ে দেখে টেলিভিশনের পর্দায় শ্রদ্ধেয় নূরজাহান বেগমের স্মৃতিচারণমূলক কথামালা। না নিজেকে নিয়ে সহানুভূতির কথা বলার মতো স্মৃতি খুঁজে পায় না অমৃতা। কারণ বাবা-মায়ের আদরের মেয়ে হওয়ায় সব ব্যাপারে তার ছাড়পত্র ছিল অবাধ আর সব বিধি-নিষেধের বাইরে। কলকাতা থেকে ছেলেদের পাঁহাড় ঘোরা আনন্দ পেছনে ফেলে এসে পড়েছিল টাঙ্গাইল, মধুপুর গড়ের বিচিত্র জীবনে। বাবা বেপরোয়া সাহসী জীবনকে অনুসরণ করার সাধ যে অমৃতাকেও প্রলুব্ধ করত। তাতে সন্দেহ নেই। তবে মায়ের কড়া শাসনে

ছোট ছোট বালু কণা
বিন্দু বিন্দু জল
গড়ে তোলে মহাদেশ
সাগর অতল

পরিকল্পিত সঞ্চয়ই আপনাকে সম্পদশালী করবে। নিশ্চিত করবে ভবিষ্যতের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা। ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেডের বিভিন্ন রকম সঞ্চয় প্রকল্প থেকে আপনার জন্য সুবিধাজনক প্রকল্পটি বেছে নিন।

আর সঞ্চয় করতে শুরু করুন ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেডের সাথে।

ডাবল বেনিফিট অ্যাকাউন্ট । মাসিক সঞ্চয় প্রকল্প । মাসিক আর্নিং স্কিম
সিরিয়াস সেভার'স অ্যাকাউন্ট । মিলিয়নিয়ার ডিপোজিট স্কিম
সুপার সেভার'স টার্ম ডিপোজিট অ্যাকাউন্ট । স্কুল ব্যাংকিং

বিস্তারিত জানতে যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন।



ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড
প্রতিশ্রুতিশীল কর্মতৎপর একটি ব্যাংক

www.nblbd.com

সব সাধ, ইচ্ছেকে শান্ত হয়ে থাকতে হতো। এও সমান সত্য।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে অমৃতা জানতে চায়—বলত অমৃতা, জীবনকে তুমি কেমনভাবে সাজাতে চেয়েছিলে? রূপকথার রাজ্যের মতো তোমার পরিবেশও তো ছিল বিচিত্র। তাই না? আসলেই অর্ধ শতাব্দী ধরেই তার জীবন পথের যাত্রা। শান্তিনগর আর কাকরাইলের মাঝামাঝি বিশাল এক সবুজ-শ্যামল মাঠ। তার মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে আছে মস্তবড় একটা দেড়তলা ভবন। যার নাম রাজভবন। কোনো এক জমিদারের বাগানবাড়ি ছিল ওটা। ওহাব সাহেব যখন তার ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া শেষে নতুন চাকরিতে যোগ দিয়েছিলেন তখন তরুণ ওহাব পুরনো ঢাকার একটা দোতলা বাড়িতে দুটো ঘর ভাড়া দিয়ে থাকতেন। পাড়া-প্রতিবেশী প্রায়ই তার জন্য খাবার পাঠাতেন। তাদেরই একজন আফসারউদ্দীন ছিলেন ওহাবের অফিসের কর্মচারী। তার আগ্রহে ওহাব তাকে ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে কিছু প্রশিক্ষণ দিতেন। এক সময় ওহাব চাকরিসূত্রে কলকাতায় চলে গেলেন। ছিন্ন হয়ে গেল যোগসূত্র। সময়ের দাবি মেটাতে জীবন থেকে কেটে গেছে দীর্ঘকাল। চাকরির সূত্রে প্রায় পাঁচ-ছয় জেলার দায়িত্ব পালন শেষে ওহাব সাহেব একসময় এলেন ঢাকায়। অনেক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে এলেও থাকার মতো কোয়ার্টার পাচ্ছেন না। নিদারুণ হতাশা। সারাজীবন বড় বড় বাড়িতে থেকেছেন। কী করবেন ভেবে পাচ্ছেন না। এমন সময় আকস্মিকভাবে আফসারের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। আফসারের নির্বন্ধাতিশয্যে তার একটি খালি বাড়িতে সে নিয়ে গেল দেখাতে। বলল স্যার, এই বাড়িতে থাকবেন আপনি। বাড়ির নাম রাজভবন। দেখে ওহাব সাহেব অভিভূত। এ যে চিন্তাও করিনি আফসার! সেদিনই বিকেলে সবাইকে নিয়ে এলেন তিনি। তিরিশের দশকের প্রাচীন মোগল আমলের ঢাকা তখন স্বাধীন দেশের প্রাদেশিক রাজধানীর গৌরব নিয়ে নতুন চেহারায় দাঁড়িয়ে আছে। মস্ত বড় হাইকোর্ট ভবন সেক্রেটারিয়েট ভবন, গভর্নরের ভবন, নতুন নতুন স্কুল-কলেজ আর সবচেয়ে গৌরবের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। চোখ ধাঁধানো জলুস নেই, আছে অভিজাত্য। মাথা তুলে দাঁড়ানো আর আছে কলাভবন। বিজ্ঞান ভবন যার নাম কার্জন হল। কলাভবনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে জ্ঞানতাপস ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, বিজ্ঞান ভবনের সঙ্গে প্রফেসর সত্যেন বোসের নাম। নতুন দেশে কথিত স্বাধীনতার মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে ভাষা আন্দোলনের রক্তক্ষরা গৌরবের স্মৃতি নিয়ে গড়ে উঠেছে। শহীদ স্মৃতির মিনার। ওহাব সাহেব এই নতুন শহরে সানন্দে অতিথি হলেন। নতুন সেশনে একদিন ইডেন কলেজে ভর্তি করিয়ে মেয়েকে রেখে গেলেন বাবা। বিকাল ৩টার সময় আবার এলেন। অফিসে ঢুকে নিজের মেয়েকে প্রধান অফিসারের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। বললেন ঢাকায় আমরা নতুন এসেছি। আমরা ঢাকার বাইরে ছিলাম। মেয়ের সুবিধা-অসুবিধার দিকে আপনারা একটু খেয়াল রাখেন তবে বড় ভালো হয়। অমৃতার বাবাকে দেখে মনে হয় বাড়ির ছোট মেয়েটিকে ইচ্ছা করে ভর্তি করিয়ে দিতে এসেছেন। তবে প্রথম দিন হিসেবে বাংলার অধ্যাপিকা

নূরজাহান বেগম, ফিলোসফির নাইয়ার মনসুর এদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো শ্রদ্ধা আর কৌতূহল নিয়ে। বন্ধুত্ব হলো সহপাঠীদের সঙ্গে। ভূমিকা হিসেবে ভালোই লাগল। এখান থেকে তাকে উচ্চস্তরের বিদ্যা শিক্ষার জন্য যাত্রা করতে হবে। যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে পড়ানো শুরু করলেন প্রফেসর নূরজাহান। এক ধরনের মুগ্ধতা নিয়ে বাবার সঙ্গে বাসায় ফিরল অমৃতা। বাড়ি ফিরে মনে হলো—ছোটো ভাইবোনদের যেন কত বছর দেখিনি। সারা বিকালটাই ছোটদের সঙ্গে খেলাধুলা করে কাটাল অমৃতা।

দিন কয়েকের মধ্যে কলেজ জীবনে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে অমৃতা। আমরা এর মধ্যে একটি কিন্ডারগার্টেন স্কুলে পড়ানোর চাকরি নিয়েছেন। সকাল হলে বেশ হইচই করে ব্রেকফাস্ট সেরে রেডি ফর ডেজ ওয়ার্ক হয়ে সবাই বেরিয়ে পড়ে। শাওন, রঞ্জু আর তাতুম একটু দেরি করে যায়। ওদের তিনজনের স্কুল বসে ১১টা। একই স্কুলে বয়েজ অ্যান্ড গার্লস, সিনিয়র অ্যান্ড জুনিয়র সেকশন আছে বলে এই স্কুলটাই তারা বেছে নিয়েছে। বাড়ির কাজের ছেলের সঙ্গে যাওয়া-আসা করতে অসুবিধে নেই।

দীর্ঘ দিন বড় তিন ভাই ঢাকায় বাসা ভাড়া করে ইউনিভার্সিটির পড়া ও পার্টটাইম জব করেছে। এখন আর সেটা চলবে না। ওহাব সাহেব চান দীর্ঘদিন আলাদা থাকার পর সবাই একসঙ্গে থাকাই ভালো হবে।

বড় ছেলেকে দেয়া হয়েছে সবচেয়ে একপাশের সুন্দর ঘরটি। মেজ ভাইও থাকবে বড়দার ঘরেই। বাকি চারটা ঘর ভাইরা ভাগাভাগি করে নিয়েছে। অমৃতার ঘরটা বারান্দার অর্ধবৃত্ত রেলিংয়ের সঙ্গে মুখোমুখি করে বানানো। চাঁদের সন্ধ্যায় রাজভবনের পাশে লম্বাটে পুকুরে মুখ দেখে চাঁদের উপচেপড়া কিরণমালায় নেয়ে ওঠে অমৃতার ঘর আর বারান্দা। কিছুদিন হলো ওহাব সাহেব বাড়িটাতে বিদ্যুৎ এনেছেন। পাড়া-পড়শিরা খুশি, সেই সঙ্গে রাজভবনের চেহারাও যেন ঝলসে উঠেছে। জলাধারে আয়নায় মুখ দেখছে রাজভবন। শোনা যায়, বাড়িটি যে জমিদার শখ করে বানিয়েছিলেন তিনি বাড়িটিকে সাজিয়েছিলেন শৌখিন পদ্মলতার নকশায়। বাড়বান্টি ঝুলিয়ে দিয়ে ঘরগুলোর যেন বাড়িয়ে দিলেন গানের জলসার জন্য। হঠাৎ একদিন আর দু'দুটো জাহাজ ডুবে গেল দূর সাগরের বাণিজ্যযাত্রায়। কঠিন অসুখে ভুগে ভুগে মা মারা গেলেন। কলকাতার রেসকোর্সে তার চমৎকার তিনটি রেসের ঘোড়া দুর্ঘটনায় প্রাণ হারায়। এসবের কার্যকারণ কেউ ভেদ করতে পারেনি। মায়ের শ্রাদ্ধ-শান্তি সম্পন্ন করে জমিদারি যা অবশিষ্ট ছিল বিলিয়ে দিলেন। স্ত্রীকে নিয়ে তীর্থ করতে চলে গেলেন প্রয়াগে। আর বিশ-তিরিশ বছরে ফেরেননি। এই অপূর্ব সুন্দর বাগানবাড়ি পড়ে ছিল তালো দেয়া, পরিত্যক্ত অবস্থায়। আফসার সাহেবও বাড়িটি কিনে ফেলেই রেখেছিলেন। কারণ শান্তিরঞ্জন চৌধুরীর আত্মীয়স্বজনরাও বাড়িটা বাতিল করতেই চেয়েছিলেন। ওহাব সাহেবেরা এসে বাড়িটাতে বসত করায় যেন এলাকায় প্রাণ ফিরে এলো। সারাদিন খোলা মাঠ থেকে ছুটে আসে হাওয়ার গ্যাপানী। সূর্যের আলোয় পরিশুদ্ধ চটপটে

রাজভবন যেন ঘুম ভেঙে জেগে ওঠে। এ বাড়ির ছাদটা বড় একলা। অমৃতা তার বই হাতে করে বিকেল বেলা ছাদে চলে যায়। কখনো কখনো ছোট ভাইবোনরাও আসে। তারা কেউ ছবি আঁকে, কেউ ঘুড়ি ওড়ায়। পড়তে পড়তে যখন সন্ধ্যা হয়ে আসে। তখন নিচে থেকে আমরা ডাক দেন— অমৃতা, তাতুম, শাওন নিচে এসো। সন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছে ...

‘আসছি! এই আপু চল না! আমরা বকবো।’ বলে লাটাই গুটায় তাতুম। চিলেকোঠার ঘরে ঘুড়ি লাটাই রেখে নিচে নামে তাতুম। রঙের বাল্লশুদ্ধ ঝুড়ি হাতে করে নামে শাওন। সন্ধ্যার বাতাসে অমৃতার খোলা চুল মুখের চারপাশে ছড়িয়ে যায়। চুলগুলো হাতে জড়িয়ে আটকে নেয় সে। তারপর বলে চল তোরা। আমি দরজায় তালো দিয়ে আসছি।

মেজদার খাটটা এখন খালি। কয়েক মাস হলো মেজদার রংপুরের কারমাইকেল কলেজে অধ্যাপনায় যোগ দিয়েছেন। খাটটা এখন সেজদার শোয়ার জন্য পাতা আছে। মেজদার রংপুর থেকে এলেই ভাইদের গান, আবৃত্তি আর হই হুল্লোড় শুরু হয়। মেজদার দারুণ শখ শিকারের। তারও কমতি নেই ভাইদের মধ্যে। তোড়জোড় করে শিকারের জন্য ঢাকার সাভার কোনাবাড়ির জংলা এলাকায় যাবে। আপাতত শিকারের পাট বন্ধ। সেজদা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি বিভাগ থেকে পরীক্ষা দিয়ে অধ্যাপনার জন্য তৈরি হচ্ছে। বিকালে সাংবাদিকতা বিভাগে বৈকালিক ক্লাস করতে যায়। নন্দা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়ছে। এখনো পরীক্ষা হয়নি। অমৃতার পিঠেপিঠি ভাই সারওয়ার বিএসসি পড়ছে জগন্নাথ কলেজে। বাড়িভেঁড়ে কেবল লেখাপড়ার আয়োজন। রঞ্জুর ক্লাস টেন, শাওন পড়ছে সেভেনে। আর তাতুম এবার নতুন ক্লাস ফোরে। ওহাব সাহেব রিটার্নারমেন্টের সঙ্গে সঙ্গে একটি কনস্ট্রাকশন ফার্মে চুক্তিভিত্তিক কাজে যোগ দিয়েছেন। সন্ধ্যার নামাজ শেষে তামাকের নকশা করা হুক্কার নল হাতে আয়েশ করে তামাক খান আর সংবাদপত্রটি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়েন।

একটু পরে ছেলেমেয়েরা একে একে এসে বাবার কাছে বসে। কথাবার্তা সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয়। আমরা কাছে বসে আলোপচারিতায় অংশ নেন। এক সময় আমরা বলেন, এবার বড় খোকার বিয়ের কথা ভাবতে হয়।

- হু। সংক্ষেপে বলেন ওহাব সাহেব।

বড় ছেলে, লজ্জা পায়। বলে ওসব কথা থাক আব্বা। আমরা...

- আচ্ছা বাবা আচ্ছা, বিয়ে বললেই তো হুট করে হবে না। মেয়ে দেখতে হবে, সময় লাগবে। অমৃতা মায়ের পেছনে দাঁড়িয়ে বলে, খুব আনন্দ হবে বড়দা। রাজি হয়ে যাওনা।

দূর বোকা! এখনই কী হয়েছে? বললেন আমরা অমৃতার দিকে তাকিয়ে আব্বা মেয়েকে বললেন—তোমার ক্লাস কেমন চলছে মা? একাডেমিক আলোচনায় ফিরতে পেরে হাফ ছেড়ে বাঁচল সবাই।

- হ্যাঁ, ভালো কথা, বাস ঠিকমতো পাচ্ছি তো? কোনো অসুবিধে নেই? সম্ভ্রতি কলেজ বাসে যাতায়াত করার সুযোগ পেয়েছে অমৃতা। প্রশ্ন

সেই সূত্রে।

একসময় আমরা বলেন— চলো খাবার দিয়েছে। রাত ৯টা বাজে। শাওনকে বলেন, যাও বড় ভাইকে ডেকে আনো। ওর অফিস তো সাড়ে ৮টায়। বড় ভাই একটা বিখ্যাত ওষুধ কোম্পানিতে প্রোডাকশন ম্যানেজার। সকালবেলায় গাড়ি এসে তাকে তুলে নিয়ে যায়। বড়দার সঙ্গে সঙ্গে ছোটরাও খেতে বসে যায়। খাওয়া হয়ে গেলে ঘণ্টা দুয়েক পড়াশোনা করে অমৃত। রেজাল্ট ভালো করতে হলে প্রচুর পরিশ্রম করতে হবে। অন্যেরা ঢাকা থেকেই ভর্তি হয়েছে, কেবল অমৃতাই ঢাকার বাইরে থেকে এসে ভর্তি হয়েছে। কয়েকটা ক্লাসে, অধ্যাপকদের প্রশ্ন দৃষ্টি অর্জন করতে পেরেছে বলে তার ভালো ফলের আশাও বেড়ে গেছে। অনেকদিন পরে একটা কবিতা তার মনের মধ্যে গুনগুনিয়ে উঠছে। প্রায় মাস তিনেক সে কবিতা লেখনি। নতুন বাসা, মাকে সাহায্য করা, বাড়িঘরের ডিসিপ্লিন রক্ষায় অমৃত খুব আন্তরিক। নিজে শোয়ার আগে ছোটদের হোমওয়ার্ক, ঘুমোনো, বড়দের পানির গ্লাস হাতের কাছে জোগান দিয়ে তারপর নিজের ঘরে ফেরে অমৃত। বছর দুই ধরে কবিতা লিখতে শুরু করেছে অমৃত। ছাপা হয়েছে সাপ্তাহিক মেয়েদের বিখ্যাত পত্রিকা ‘বেগম’-এ। আঠারো বছরের থরো থরো যৌবনের ব্যাকুলতা নিয়ে লিখলেও তার লেখায় পরিপক্বতা আছে, বলেছেন সম্পাদিকা। সুতরাং লেখা তৈরি করার জন্য

যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হবে, তা ভালোই বোঝে অমৃত। এরই মধ্যে সায়েমা চৌধুরী জাহানারা আরজুর যে সব কবিতা পড়েছে, তা দেখে অমৃত মুগ্ধ। সেই সঙ্গে প্রবল একটা আকাঙ্ক্ষা তার বুকের ভেতর ফেনিয়ে উঠছে। তার লেখায় কবে ফুটেবে ওই রকম পূর্ণতা? নিজেকে তৈরি করতে হলে কত রক্তক্ষরণ আর দুঃখের সঙ্গে পরিচয় হতে হবে? পর্দাগুলো জানালায় টেনে দিল অমৃত। আবছা অন্ধকারের ছায়ায় রাজভবনের মানুষ শান্তিপূর্ণ ঘুমের আশ্রয়ে শুষে পড়ে। বেড সাইড ল্যাম্পটা নিভিয়ে দেয় অমৃত। ঘরে শুধু নীলাভ আলোর স্নিগ্ধতা ছড়িয়ে পড়ে। ঢাকার বাইরের জীবনের শান্ত ছন্দের সঙ্গে ঢাকার দ্রুতগামী জীবনের কোনো মিল নেই। প্রাদেশিক রাজধানী হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ শহরের জনজীবন সর্বদা টগবগ করে ফুটেছে। এ শহরের বাতাসটাও যেন সর্বদা অস্থির, প্রতিবাদমুখর। অমৃত যেন নিজের অজান্তেই সেই অস্থিরতাকে গ্রহণ করে আত্মস্থ করে নিতে শুরু করেছে। একুশে ফেব্রুয়ারিকে উপলক্ষ করে ইডেন কলেজ ভালো রকম বিদ্রোহ দেখা দিল। বিষয়টা কিছুই না। মেয়েরা তাদের কলেজে একটা শহীদ মিনার তৈরি করতে চায়। ঢাকা কলেজ আর অন্য অন্য কলেজে দিনটা পালা করার আবেদন জানিয়েছে সম্মিলিত ছাত্রসমাজ। ‘নো মিটিং, নো অবজারভেন্স অভ দি ডে উইল ভি টলারেটেড।’

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নোটিশ প্রত্যেক ক্লাসে পড়ে শোনানো হলো। ফলাফল দেখা গেল ১১টার পরেই ছাত্রীরা সবাই জুতো খুলে খালি পায়ে ক্লাসে বসল। কলেজের অ্যাসেম্বলি রুমের সামনে ইট-বালু এনে রেখেছিল বেয়ারারা। কিছুটা গাঁথা হতে না হতেই ভাইস প্রিন্সিপাল আপা আরো কয়েকজন সিনিয়র প্রফেসরকে নিয়ে এসে দাঁড়ালেন। বললেন, তোমাদের গতকালকের আবেদন গ্রহণযোগ্য নয় বলে শহীদ মিনার বানানো যাবে না। প্রশাসনের প্রতি শ্রদ্ধা দেখিয়ে ওটা বন্ধ করে দাও। আমরা মনে করি ইডেন গার্লস কলেজ একটি ঐতিহ্যবাহী কলেজ। তার সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখা আমাদের সবার কর্তব্য। তোমরা ক্লাসে ফিরে যাও। নইলে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনার জন্য কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবে না। মেয়েদের বেশ বড়সড় ভিড় তৈরি হয়েছিল। তার মধ্য থেকে আওয়াজ উঠল— তোমার আমার মায়ের ভাষা, বাংলা ভাষা, বাংলা ভাষা। শহীদ দিবস অমর হোক, অমর হোক, অমর হোক এরই মধ্যে আচমকা গান গেয়ে উঠল অমৃত— আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি ... আমি কি ভুলিতে পারি পুরো আবহটাই যেন বদলে গেল— সবাই একসঙ্গে গেয়ে উঠছে গানটা। প্রফেসররা নীরবে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর দ্রুত ফিরে গেলেন প্রিন্সিপালের রুমের দিকে। কয়েকজন সিনিয়র ছাত্রী এসে অমৃতাকে জড়িয়ে ধরল-শাবাশ অমৃত, শাবাশ!



কলেজ বাস থেকে নেমে উড়তে উড়তে বাড়িতে ঢুকল অমৃতা। মাকে জড়িয়ে একপাক ঘুরল। তারপর বিছানায় বসে আদ্যোপান্ত কলেজের ঘটনা শোনালো আম্মাকে। শাওন চোখ বড় করে জানতে চাইল— তোমাদের বড় টিচাররা তোমাকে বকুনি দেননি আপু? শান্তি?

-না : কেন শান্তি দেবে? গান শুনে আরো বকুনি থামিয়ে চলে গেলেন। সারা কলেজ তোলপাড়। আপু তুমি কত সাহসী! কথা শুনে ছোট্ট বোনকে আদর করে দিল অমৃতা।

অনেক বছর পরে ভাষা আন্দোলনের স্মরণসভায় স্মৃতিচারণে এই ঘটনা বলে আলোড়িত হয়েছেন অমৃতা রহমান। স্পর্শ করেছেন শ্রোতাদের হৃদয়ও।

এই ঘটনায় আর কিছু না হোক নিজের সাহসী চিত্তকে তুলে ধরতে পেরেছিল সেদিনের খার্ড ইয়ারের নবীন ছাত্রী অমৃতা। নিজের স্বাধীন চিন্তাকেও দিয়েছিল অসংকোচ প্রকাশের দূরন্ত সাহস। এমনিতে সে ছিল লাজুক আর হাসি-খুশি স্বভাবের মেয়ে। কঠিন সমস্যায় পড়ে যখন কেউ সাহায্যের আবেদন জানায় তখন তার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসত এক ভিন্ন মানুষ যার শান্ত কঠিন চিন্তার কারণে বিপন্ন মানুষ পথ খুঁজে পেত, ভরসা পেত না। জননেত্রী হওয়ার কথা সে কখনো ভাবেনি। আসলে তো আমি মানুষের জন্যই কলম তুলে নিয়েছিলাম। কী যে খাপ্যামিতে পেয়ে বসেছিল আমাকে!

সামনে তখন বিএ পরীক্ষা, ভালো ক্লাস করার জিদটাও ভেতরে প্রবল। খোদেজা আপা বলেছেন, আমি বাংলা বিভাগের প্রধান হাই সাহেবকে বলেছি একটা ব্রিলিয়ান্ট মেয়েকে আমি পাঠাব আপনার বিভাগে। আশা করি তুমি কথাটা মাথায় রেখে তৈরি হবে! আসলে তখনকার পরিবেশ ছিল স্কলারদের জন্য আদর্শ। প্রতিটি বিভাগেই ছিল সুস্থ প্রতিযোগিতা। টিউটরিয়াল নিয়ে ঘুম হতো না। অথচ বইয়ের আকাল ছিল দারুণ। সকালবেলা সাড়ে ৮টার সময় ফ্যাকাল্টির লাইব্রেরির দরজা খোলামাত্র বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা অমৃতা আর তার বন্ধুরা ঢুকে পড়ত। বই ইস্যু করে নোট করতে একটুও ভুল হতো না তাদের।

না, অমৃতা এখন সে যুদ্ধের স্মৃতিচারণ করতে চায় না। সে চায় রাজবনের ঝড়-বাদল, জোৎস্না রাতের নেশা ধরানো বিন্দ্র রাত্রির কথা ভাবতে। সন্ধ্যা বেলা তুমুল ঝড়-বৃষ্টি এসে গোটা রাজভবনকে কাঁপিয়ে দিয়ে গেল। চারদিকের হুল্লোড় মার মার ধর ধর করে এসে পড়ল ঝড়। তারপর তুমুল বৃষ্টি। জানালা-দরজা বন্ধ করে তবে রক্ষা। লাল রঙের বারান্দা ঝকঝক হয়ে উঠল আর সবচেয়ে ভালো হলো অমৃতার ভুল বানানের চেহারা। বাড়ির সবাই কম-বেশি ভিজে ফিরেছে। ছোটদের মাথা মুছিয়ে কাপড় বদলে এলে গরম গরম হরলিকস দিল অমৃতা। বড়রা চায়ের পেয়ালা আর পঁয়াজ কুচি দিয়ে ঘিয়ে ভাজা মুড়ি আর ডালের বড়া খেয়ে খুশি। এক ফাঁকে দোতলার সিঁড়ি বেয়ে ছাদের দরজা খুলল অমৃতা। ঠাণ্ডা, শীতল হাওয়া এসে যেন আদর বুলিয়ে গেল তার গালে। দ্রুত দরজা লাগিয়ে নিচে নামল অমৃতা।

আসলে অমৃতা তখন বদলে যাচ্ছিল। অনাগত

ভবিষ্যৎ হয়তো তাকে প্রভুত করছিল এভাবেই।

ওহাব সাহেব অবসর সময়ে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার চর্চা করেন। কিছুদিন হলো এ চিকিৎসায় তার প্রচুর সুনাম হয়েছে। বিনে পয়সায় চিকিৎসা করেন তিনি। ফলে সপ্তাহে তিনদিন তার পর্দা ঘেরা বারান্দা অংশে প্রচুর ভিড় লেগেই থাকে। দেশি, বিদেশি এক মৃত প্রায় শিশুকে বাঁচিয়ে তুলে দেন তিনি। ফলে শিশুটির বাবা আর মা তাকে ভক্তির সঙ্গে মাস্মি, ড্যাডি বলে ডাকছে। জনপ্রিয়তা এবং চিকিৎসার নেশায় একসময় ওহাব সাহেব স্থির করেন কনসালট্যান্সির পরিশ্রমসাধ্য কাজটা ছেড়ে দেবেন। চিকিৎসা সেবাতেই বেশি সময় দেবেন। এর মধ্যে মেজ ছেলে, ও তার ছোট ভাই চাকরি পেয়ে গেছে। লেখাপড়ার খরচা নিয়ে মাথা ঘামাতে হচ্ছে না।

অমৃতা বিএ-তে হায়ার সেকেন্ড ক্লাস পেয়েছে বাড়িশুদ্ধ সবাই খুশি। এর মধ্যেই বড়দাকে তার অফিস থেকে দুই বছরের জন্য করাচিতে পাঠাচ্ছে। প্রথমটা সবাই মন খারাপ করলেও বড়দার জন্য আনন্দের। অতঃপর হাসি-কান্নায় মিশে সবাই মিলে এয়ারপ্লেনে তুলে দেয়া হলো। চিঠি লিখতে যেন ভুল না হয় থোকা, আমি চিন্তায় থাকব। বললেন ওহাব সাহেব। বড়দা ভেজা চোখে বিদায় নিল ভাইবোনদের কাছ থেকে। কলেজে পড়তে পড়তেই প্রেমে পড়েছিল অমৃতা। এমন অদ্ভুত এক ভালোবাসা, যার কোনো ব্যাখ্যা নেই তার নিজের কাছেই। রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, দ্বিজেন্দ্রলাল, তারাক্ষর, বনফুল, মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য, আশাপূর্ণা দেবী, বিমল মিত্র, বিভূতিভূষণ সঙ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, সব মিলে তার দারুণ আয়োজন। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে কথায় কথায় উদ্ধৃত করে কথা বলেন তার বাবা। বাড়িতে রয়েছে ইংরেজি-বাংলা বইয়ের বড়সড় সংগ্রহ। সবাইকে ফেলে অমৃতাই যে কি এক হৃদয় বিহ্বল করা ভালোবাসায় পড়ে গেল। গুড আর্থ, স্লোজ অন দি কিলিমানজারো, ম্যান ইন দি আয়রন মাস্ক, টেল অভ টু সিটিজ, টু কিল এ মকিং বার্ড, ডক্টর জিভাগো, আরো যা কিছু নাগালের মধ্যে পায়, পড়ে ফেলে অমৃতা। বন্ধুদের সঙ্গে গল্পে সেই উপছে পড়া আনন্দ আলোচনার মধ্যে চলে আসে। তার বন্ধুরা বলে, তোমার এ পাগলামি থামাও অমৃতা। নইলে বই চাপা পড়ে মরবে একদিন। মাঝখান থেকে তোমার আসল প্রেমিক পালিয়ে প্রাণ বাঁচাতে বাধ্য হবে।

আসলে সত্য কথা বললে বলা যায় যে, বিন্দ্র রাত্রিজুড়ে লিখে যায় অমৃতা। সকালে ঘণ্টা দুয়েক ঘুমিয়ে দ্রুত উঠে পড়ে ক্লাসে যাওয়ার জন্য। আঝা ঠিক টের পান। বলেন তোমার টিউটোরিয়ালের কাজগুলো দিনের বেলা কর না কেন? ও তো রাতের বেলা টিউটোরিয়ালের কাজ করে না আঝা! ও করে লেখালেখি। বলে ওঠে সেজ ভাই।

লেখালেখি? এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে অমৃতার আঝা বলেন, আমাদের তো দেখাস না কখনো! অমৃতা ঘরে যায়। ‘মাহে নও’ আর ‘সমকাল’ হাতে করে নিয়ে আসে। আঝা পত্রিকা দুটো

হাতে নিয়ে খুশি হয়ে ওঠেন।

-ভালো লিখছিস তো! তবে এ জন্য তোকে খাটেতে হবে প্রচুর। পৃথিবীতে যারা মানুষের কথা লেখে, তাদের নিজেদের ক্ষয় করে তবেই লেখা সম্ভব হয়। গুটুড, ভেরি গুড!’ নূরজাহান আপার সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে বড় ভালো লাগে অমৃতার। সৌন্দর্যে যেন খাপখোলা তলোয়ার তিনি। স্নেহে ঔদার্যে সুন্দর পত্রিকা আর ছাপাখানার যান্ত্রিক পরিবেশের মধ্যে তার চঞ্চল কর্মব্যস্ততার মধ্যে মাতৃত্বের সৌন্দর্যে অনিন্দ্যসুন্দর। সামনের কামরাটা মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন সাহেবের। অবিভক্ত বাংলায় বিখ্যাত সাহিত্য প্রতিষ্ঠান সওগাত আর কবি নজরুলের প্রিয় পত্রিকা মোসলেম ভারত, বিজলী, ধুমকেতু সব যেন একগুচ্ছ দুরন্ত জাগরণী আহ্বানের প্রতীক। ইতিহাসের গর্ব ও বেদনাবহ ঘটনা বলে যেতেন তিনি। অনর্গল বলে যান স্তব্ধ মন্ত্রমুগ্ধ শ্রোতাদের সামনে। এক সময় বলেন, এখন তোমাদের যুগ। তোমরা যত কাজ করবে তত এ দেশ সৃষ্টিশীল হবে। অনেক দিনের জন্য শক্তি আর লেখার স্বপ্ন নিয়ে ফিরত অমৃতা। অপূর্ব এক শক্তির আনন্দে ভরে যেত মনটা। দুই বছর কেটে গেল ঝড়ের বেগে। বাংলা বিভাগের সবচেয়ে বেশিসংখ্যক ছাত্রছাত্রী এমএ ডিগ্রি নিয়ে বেরিয়ে গেল। পাবলিক সার্ভিস কমিশনে পরীক্ষা দিয়ে ইডেন কলেজে জয়েন করল অমৃতা। দেশে যেন যৌবনের আবাহন তীব্র তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে। কবি হেলাল হাফিজ লিখলেন, ‘এখন যৌবন যার, যুদ্ধে যাবার তার শ্রেষ্ঠ সময়।’ আরো আছে আলাউদ্দিন আল আজাদের লেখা— ‘মাটির মিনার ভেঙেছে ভাঙুক আমরা তো আছি সাত কোটি পরিবার।’ এসব কবিতায় দেশের বুকের ভেতরে ধুমায়িত অসন্তোষ ফুলে ওঠে। অর্থনৈতিক অসাম্য দেশের দুই শাখার মধ্যে অশান্তির বীজ বুনে রেখেছে সেই কবে থেকেই। ১৯৬৪ সালে বাদ যাওয়া কনভোকেশন আয়োজন করল মোনায়েম খানের সরকার। কিন্তু প্রচণ্ড বিরোধিতার মুখে পণ্ড হয়ে গেল অনুষ্ঠান। চারপাশে ঠেলাঠেলি পড়ে গেল। কার্জন হলের লোহার তীক্ষ্ণ মুখ রেলিং পেরিয়ে কী করে যে নিরাপদে বাইরে বেরিয়ে এলো অমৃতা, তা মনে রাখার মতো। যে শিক্ষক তাকে সাহায্য করে বের করে আনলেন, রাস্তায় নেমে মুচকি হেসে বললেন, ‘রেলিং তো ভালোই উপকাতে পারেন দেখলাম। আচ্ছা, এবার বাড়ি যান।’ একটা রিকশাকে হাত দিয়ে ডাকলেন ভদ্রলোক। -‘ধন্যবাদ আপনাকে, অশেষ ধন্যবাদ’ তখনও বুকটা কাঁপছে তার।

-আমার নাম ইশতিয়াক আহমেদ। কার্জন হলে রসায়ন বিভাগে পড়াই। আপনি তো একজন রাইটার। আপনার লেখা আমি পড়েছি।

-ও ধন্যবাদ। আচ্ছা, আসি। বলল অমৃতা।

মির্জা গালিব সম্পর্কে অমৃতার দারুণ আগ্রহ। কলেজের উর্দু সাহিত্যের প্রবীণ প্রফেসর মাহফুজা আপাকে অনুরোধ করল সে। মির্জা গালিব তার মধ্যে জাগিয়ে দিয়েছেন যন্ত্রণা আর দুঃখ পাওয়ার তৃষ্ণা। কোনো অদৃশ্য লোকের এক শক্তি রয়েছে, যা তার আত্মাকে সাহসী করে তুলবে, বেদনায় পুড়িয়ে দেবে, অশ্রুতে ভাসিয়ে নেবে, আর ভেতর থেকে বেরিয়ে আসবে সৃষ্টির ফসল! মাহফুজা

আপা তাকে বড় ভালোবাসেন।

তাকে জড়িয়ে ধরে বলেছেন— আমি যত দ্রুত পারি তোমার মির্জা গালিব, কালামে ইকবাল খুঁজে দেব।

অমৃতা বুঝতে পারে লেখা এখন তার ভেতর থেকে দাবি করছে, বিশ্রাম নেই, শান্তি নেই। বুকের গভীর থেকে উঠে আসছে সর্বগ্রাসী এক ক্ষুধা।

রাজভবনের সামনের অনেকখানি জায়গা নিয়ে ফুলের বাগান করেছে অমৃতা। হাসনাহেনা আর দোলনচাঁপার সুগন্ধ তো আছেই। আরো আছে গোলাপ, কেলি। নানা জাতের দেশি ও মরশুমি ফুল। বাগান করতে শাওনেরও খুব উৎসাহ। রঞ্জু বিজ্ঞান নিয়ে কলেজে পড়ছে। ওর পড়ার চাপ বেশি। শাওনও এ বছর কলেজে যেতে শুরু করেছে। ছোট তাতুম এখন ক্রিকেট নিয়ে ব্যস্ত। মায়ের ইচ্ছা ও ক্যাডেট কলেজপড়ুয়া ভাইদেরও খুব উৎসাহ। এভাবেই দিনগুলো চলে যাচ্ছে ঝড়ের বেগে। বর্ষার ঝরঝর কম্পমান দিন, বৈশাখের খরতাপ দক্ষ দিন, শীতের উষ্ণ মায়াময় অলস দিন-রাত্রি যেন কোন মায়াজাল বিস্তৃত করে দেয়। সংসারের মানুষ জীবন গোছায়, জীবন সাজায়। কখনো দূরের মানুষ কাছে আসে, কাছেই মানুষ দূরে সরে যায়।

মাঝে মাঝে অমৃতাকে যেন ভূতে ধরে। মাঝরাতে ছাদের দরজা খুলে চলে যায় ছাদে। বাতাস এসে তাকে ঘিরে খেলা করে। ফিসফিস করে কথা বলে। তার মনে পড়ে, মুগ্ধ পাঠক হিসেবে কলেজে পড়ার সময় চিঠি লিখেছিল কলকাতার বিখ্যাত সাহিত্যিক তারাক্ষর বন্দ্যোপাধ্যায়কে। উত্তরে তিনি লিখেছিলেন— ‘বিচারক ভালো লাগে যে তরুণ মনে, সে মনের গড়ন। আমি অন্যরকম বলেই মনে করি। তুমি যদি লেখক হতে চাও, তা হবে সবচেয়ে ভালো কাজ। আমার লেখা সপ্তপদী ও পঞ্চপুস্তকী বই দুটি পেলে পড়ে দেখ, তোমার ভালো লাগবে।’ বাংলা একাডেমিতে বন্ধুদের সঙ্গে মিলে উল্লেখযোগ্য সাহিত্য সভাগুলোয় যেতে বড় ভালো লাগে তার। শুধু সাহিত্য নয়, মেয়েদের মধ্যে বিশিষ্ট ফটোগ্রাফার সাঈদা খানমকে আরো বেশি ভালো লাগে আজ তার। অপূর্বসুন্দর জীবনঘনিষ্ঠ ছবি তোলেন সাঈদা খানম।

নওয়াজেহ আহমেদ, নইবুদ্দিন আহমেদ, আমানুল হক একেকজনের হাতের মুঠো থেকে বেরিয়ে আসে সোনালি ধানের ছড়া, সমুদ্রের উথাল-পাখাল তেউ। নদীতে ঝাঁপাই বুড়তে গ্রামীণ কিশোরদের উল্লসিত খেলা। এরা যেন মুঠো খুলে মেলে ধরছে বাংলাদেশের ভালোবাসার ঘৃণা ও প্রেমের চিত্ররূপ। জীবনের কত বিচিত্র রূপই না আছে, মুগ্ধ ও বিকল করে অমৃতাকে। কিন্তু সময় যেন এক দক্ষ শিকারি সে তার ইচ্ছামতোই লাঠিই আর সুতায় খেলতে শুরু করে। পরাভূতের জীবনের জোয়াল ফেলে দিয়ে স্বাধিকারের যুদ্ধে নেমে পড়ে বাংলাদেশ। অন্ধকার ছাদে হাঁটতে জীবনের যত অজানা বেদনার কথা নিজেকেই বলে দেয় অমৃতা। তার অভিজ্ঞতার যুদ্ধটা যেন ক্রমেই বড় থেকে বড় হয়ে ওঠে। চেনা-অচেনায় শোণ রহস্যময় পৃথিবীটাকে ক্রমে ভালোবাসায় জড়িয়ে ধরতে ব্যাকুল হয়ে ওঠে অমৃতা। অন্ধকার যেন জানতে চায় আমাকে তোমার ভয় করে না?

স্বাধীনতার যুদ্ধের রক্তস্রোত কি তোমাকে বদলে দিয়েছে?

আমি জীবন দেখতে চেয়েছিলাম। এখনো সে বেদনায় জ্বলছে সারা দেশ।

—না, আমি আরো বেশি করে অন্ধকারকে বুঝতে চাই। হাত বাড়িয়ে দেয় অমৃতা। শূন্যতার মধ্য থেকে কুড়িয়ে নেয় অভিজ্ঞতা আর রহস্য। একাত্তরের স্বাধীনতাযুদ্ধের আগেই ওহাব সাহেব রাজভবন ছেড়ে দিলেন। মগবাজারে এক তলা বড়সড় একটা বাড়ি পছন্দ তার। আফসার সাহেবই তাকে বাড়িটা কিনতে সাহায্য করলেন। বোঝা যাচ্ছে দেশে বড় ধরনের বিপদ ঘটেতে পারে। নিঃসঙ্গ প্রকাণ্ড বাড়িটা নিরাপদ নাও হতে পারে। বুকের ভেতর কান্না পেলেও নিরাপত্তার কথাটা বড় বলে গণ্য হলো। ফুলের গাছগুলো টবে ভুলে যতগুলো সম্ভব নিয়ে গেল ছোটদা আর রঞ্জু মিলে। এ বাড়িটায়ও আলো-হাওয়া আছে প্রচুর। অমৃতার বড় দুই ভাই কোয়ার্টারে থাকতে শুরু করেছে। আলাদা সংসার করে। সেজ ভাই আমেরিকায় গেছে। সেখানেই তার স্থায়ী হওয়ার ইচ্ছা। বাকিরা সবাই মগবাজারেই রয়ে গেছে। ওহাব সাহেবের শরীর আগের চেয়ে দুর্বল হয়েছে। তবে এখনো তিনি হেমিও চিকিৎসা চালিয়ে যাচ্ছেন। মাঝে মাঝে জানতে চান, সবাই তো বিয়ে থা করল, অমৃতার বিয়ে কবে? মাঝেমধ্যেই বিশ্বরগের ঘোরে পড়ে যান তিনি। অমৃতার আত্মা কপাল চাপড়ে বলেন— ওকি কোনো দিন ঘর বাঁধার কথা ভেবেছে? সেই যে লেখালেখি করে জীবনটায় ডুব দিল! বিয়ের কথা বললে রেগে ওঠে। বলে, নিজের জীবন দিয়ে বোঝ না? তোমার মতোন ভাত রাঁধা, আর ছেলেমেয়ে মানুষ করলে কাজ করব কখন? বল মা?

—ও যা ভালো বুঝেছে, তাই করেছে। ও তো ঠিক আর পাঁচটা মেয়ের মতো নয় অমৃতার মা। বলেন ওহাব সাহেব।

এক হিসাবে কথাটা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন অমৃতার মা। ছেলেরা তাকে স্বস্তি দিয়েছে। নাতি-পুতি নিয়ে জমজমাট সংসার। ঈদে-পরবে পারিবারিক সম্মিলনে ছত্রোড়ও হয় আগের মতোই। নাতি-নাতিনদের রূপেগুণে মুগ্ধ হন মাও। কিন্তু অন্য সময় অমৃতা একেবারে অন্য মানুষ। একবার বড়দার পরিচিত এক ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এলেন তিনি। বললেন পাত্রপক্ষ অমৃতার গুণমুগ্ধ। তার ঘরে গেলে তারা খুশি হবেন। সম্মানিত হবেন। অমৃতা সঙ্গে সঙ্গে বলল, সে রাজি নয়। বড় ভাই রেগে বললেন কেন? তুমি কি এমন বাহাদুর যে, তুমি কোনো ঘরের ঘরনি হতে পারবে না? —তা নয় বড়দা। আমি একজন স্বাধীন ব্যক্তি।

অন্যকে সম্মানিত করা আমার একমাত্র কাজ নয়। ওভার অল মানুষমাত্রই আমার প্রিয়জন। মানুষের কাছেই আমি দায়বদ্ধ। সীমাবদ্ধ জীবনযাপনে আমার কোনো আকাঙ্ক্ষা নেই। বড়দা থেমে গেলেন। বড়দা শুধু থেমে যাননি, বোনের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার জন্য চিন্তিত হয়েছিলেন। শুধু বলেছিলেন জীবনটা তোর নিজের এ কথা মানছি অমৃতা, কিন্তু তুই তো আমাদের! এখনো সময় আছে...

সময় আছে! সময় আছে! ভাবে অমৃতা সজাগ হয়ে ওঠে। সময়কে ধরবে বলে সময়কে ধাওয়া করে করে ষোড়শ শতাব্দীতে ঢুকে পড়ে আবার কখনো প্রাচীন ঢাকা শহরের সমাজ আর সাংস্কৃতিক জীবনে রাজনীতি আর হত্যার নির্মমতায় কাঁপতে কাঁপতে লিখে চলে।

—আপনি কী পেতে চান জীবনের রহস্য থেকে? একবার এক সাক্ষাৎকারে প্রশ্ন করেছিলেন কেউ। —সম্ভবত আমি জানতে চাই, জীবন এত ছোট কেন? আর যদি তা না হয় তাহলে দেখতে চাই, জীবন কত বড় আর থামবে কোথায়? চার।

বাংলা একাডেমি থেকে অনেক বই কিনে বেরোচ্ছিল অমৃতা। বইয়ের ভারে বেশ কষ্টকর লাগছে। কাজটা ঠিক হয়নি ভেবে আফসোস হলো তার। বেবিট্যাক্সির ড্রাইভারকে বলল— একটু কষ্ট করে এগুলো নিয়ে চল। পারবে তো? ঠিক এই মুহূর্তে এক শ্রুতকেশ ভদ্রলোক জোর পায়ে হেঁটে এসে সামনে দাঁড়ালেন। হাসিমুখে বললেন— আমার সঙ্গে আমার বুড়ো গাড়ি আছে। সুযোগ দিলে পৌঁছে দিতে পারি। এভাবে রিস্ক নাই নিলেন। কী বলেন? বেবিট্যাক্সি থেকে বইগুলো নিজেই নামিয়ে গাড়ির মধ্যে রেখে বেবিট্যাক্সির ড্রাইভারকে কিছু টাকা দিয়ে অমৃতাকে বললেন— আসুন। আপনার বাড়ি আমি চিনি।

কথা না বাড়িয়ে অমৃতা উঠে বসল। ভদ্রলোকের সঙ্গে। অনেকবার দেখা হয়েছে অমৃতার। ঢাকা ভার্টিসিট অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের অনুষ্ঠানের আলোচনা সভায়, অথবা গানের আসরে। তবে শুভেচ্ছা বিনিময়ের চেয়ে বেশি কিছু নয়। পরিচয়ের শিকড় অনেক দূর অবধি, তা দুজনেই জানে। অমৃতা বাস্তববাদী মানুষ। জীবনে রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা অনেক থাকলেও তা নিয়ে নিজেদের জীবনকে ভারী করে তোলেনি। বাড়ির দরজায় পৌঁছে আজো শুভেচ্ছা বিনিময় ও ধন্যবাদ পর্যন্ত বাক্য বিনিময় করে গাড়ি থেকে নামল অমৃতা। হঠাৎ করে রঞ্জুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। সে ক্লাস নিয়ে ফিরছে। হাসিমুখে বলল— আরে ইশতিয়াক ভাই যে! কেমন আছেন? চলুন না, বসবেন একটু। রঞ্জুর অন্তরঙ্গতা দেখে কেমন খটকা লাগে অমৃতার। হাতের ভারী বইগুলোর দুটো হাতে করে নিয়ে ঘরের দিকে যেতে যেতে থামল একটু। বলল— উনি ঢাকা ইউনিভার্সিটির কেমিস্ট্রির প্রফেসর... —ইশতিয়াক আহমেদ। আমরা উনাকে ভালোভাবেই চিনি। হেসে বলে রঞ্জু। ঢাকা শহরটা তো বেশি বড় নয় আপা। তিনজনেই হাসল এবার শব্দ করে। ইশতিয়াক গাড়ির দরজা লাগায় এবং আঙু আঙু সিলভার কলার গাড়িটা বড় রাস্তার দিকে ঘুরল। খাবার টেবিলে বসে কথাবার্তা হাচ্ছিল। রঞ্জু বলল— আপা মিস আন্ডারস্ট্যান্ড যদি না কর, তাহলে বলি। ইশতিয়াক আহমেদ আরো দুই দিন এসেছিলেন। বেশ অনেকক্ষণ আমার সঙ্গে বসে আলাপ-সালাপ করেছিলেন। কিন্তু আমাদের কারো সঙ্গে ভদ্রলোকের আলাপ আছে বলে তো জানি না। ঞ্চ কুঁচকে বলল অমৃতা। —না, তা নেই, তবে অত্যন্ত ভদ্র, সজ্জন ব্যক্তি। সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন নির্দিধায়।

আব্বা উনাকে জিজ্ঞেস করলেন, ফ্যামিলি কোথায়? হেসে বললেন, ‘আমার ফ্যামিলি বলতে আমি একাই। সময় পাইনি। তা ছাড়া আমার বাবা-মা খুব ছেলেবেলায় মারা গেছেন। আমার কাছে মানুষ হয়েছি। পড়াশোনার জন্য ঢাকায় এসে আর ফিরে যাওয়া সম্ভব হয়নি।’

—বিয়ে থা করা উচিত।

আব্বার এ মন্তব্যে বললেন— বাংলাদেশে কোনো অভিভাবক আত্মীয়স্বজনবিহীন ব্যক্তির কাছে মেয়ের বিয়ে দেবে না। এ আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝে গেছি। তাই ও চেষ্টাও করি না।

—ভদ্রলোক আসলেই ভালো মানুষ। অমৃত কথটা বলামাত্রই রঞ্জু লাফ দিয়ে উঠে অনুনয়ের সঙ্গে বলল— আপা আমি ভদ্রলোক সম্পর্কে সব রকম খোঁজখবর নিয়েছি, কোথাও কোনো ধোঁয়াটে কিছু পাইনি। উনার ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ডও খুব ভালো। এমনকি অন্য এক বন্ধুকে দিয়ে কোনো এক

মহিলাকে বিয়ের প্রস্তাবও দিয়ে দেখেছি। উনি হেসে বলেছেন ওরে বাবা, লোভে পড়ে ভুল করতে পারব না ভাই! মহিলাকে আমি খুব শ্রদ্ধা করি। ভুলেও এ কথা মুখ ফুটে বলতে পারব না।

—তাহলে তো মিটেই গেল। তুই কেন মিথ্যা ভেবে মরছিস? যা ঘুমোতে যা। হাসতে হাসতে বলে অমৃত। ভাই-বোনেরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে গ্লাস-প্লেট গোছাতে লেগে গেল।

নূরজাহান আপার ফোন পেয়ে চকিত হয় আর খুশি হয়ে ওঠে অমৃত। ফোনের উল্টো দিকে তার স্পষ্ট জোরালো গলার আওয়াজ— সামনে ঈদসংখ্যা তাড়াতাড়ি লেখা পাঠাও। তার স্নেহ সম্ভাষণ যেন অমৃতাকে তিরস্কার করে। যেমন করে আসছে দীর্ঘদিন ধরে।

—আপনি কেমন আছেন আপা? জানতে চায় অমৃত।

—শরীর ও বয়সে আর কত ভালো থাকব বল? তবুও তোমাদের লেখা এসে গেলে গুছিয়ে দিতে চেষ্টা করব। সারা জীবন তো এ কাজই করে গেলাম।

—অবশ্যই পাঠাচ্ছি আপা। দৃঢ়তার সঙ্গে বলে অমৃত। কথা তো এটুকুই। কিন্তু তার মধ্য দিয়েই বেরিয়ে আসে কর্মিষ্ঠ মানুষটির আন্তরিকতা আর ব্যক্তিত্ব।

এই তো মাত্র চার-পাঁচ দিন আগে খবর শুনল, নূরজাহান বেগম নিউমোনিয়া আর শ্বাসকষ্ট নিয়ে বিখ্যাত লিবার্টি হাসপাতালে ভর্তি হয়ে আছেন।

নিবিড় পরিচর্যায় আছেন তিনি।

অনেক আশা নিয়ে কাগজে লেখা পাঠায় অমৃত। সব পাঠকের প্রতি আন্তরিক আহ্বান সবাই যেন তার রোগমুক্তির জন্য সম্মিলিতভাবে একান্ত মনে প্রার্থনা করেন। সম্মিলিত প্রার্থনার পরে নিশ্চয়ই তিনি ভালো হয়ে উঠবেন, সুস্থ হয়ে যাবেন।

কিন্তু একি হয়ে গেল? অমৃতার সব আশা গুঁড়িয়ে দিল একটি মাত্র নির্ভুর লাইন শি ইজ নো মোর! বড় অপরাধী মনে হয় নিজেকে। আসলে জীবনের দাবি মেটাতে গিয়ে, সময়ের যুদ্ধের মোকাবেলা করতে গিয়ে প্রাচীন বটবৃক্ষটির কাছে গিয়ে দাঁড়াতে পারেনি অমৃত। মাঝে মাঝে দেখা হলে বলতেন, তুমি নিজেকে অনেক বেশি ছড়িয়ে ফেলেছ অমৃত। অনেক বড় পরিসরে কাজ করছ।

ভালোই হয়েছে। সবাইকে দিয়ে তো সব কাজ হয় না। যে বড় কাজ করে তাকে ছাড়ও দিতে হয় অনেক বেশি।

অমৃতার ভেতরটা বেদনার্ত হয়ে ওঠে। আপার কাছে গিয়ে আরো সময় দেয়া উচিত ছিল, তা সে পারেনি।

কটা দিন চুপচাপ থেকে আবার লেখায় মন দেয় অমৃত। দুই বছর আগে ঢাকার রোমাঞ্চকর ইতিহাস নিয়ে একটা লেখা নিয়ে বছর পাঁচেক বঁদ হয়ে কাজ করেছে অমৃত। এখন সামনে আছে বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের মধ্যে ডুব দেয়া, জীবন ঘষে আগুন জ্বালানোর নেশা। আলাওল, জায়সি, আবদুল হাকিম, প্রাচীন লোকসাহিত্য,

অমৃত।

মনে পড়ে কয়েক বছর আগের কথা। আব্বা বললেন— তোর পাণ্ডুলিপির বিষয় নিয়ে যে কাজ করেছিলি ওই বইটা ভালো হয়েছে। মালিক মুহম্মদ জায়সির পদুমাভত নিয়ে কতটা কাজ হলো? মনে মনে অবাক হয়ে গেলেও আনন্দে মন ভরে গেল অমৃতার। বলল— ওটা নিয়ে স্যার সৈয়দ আলী আহসানের অনেক বড় কাজ আছে আব্বা। আমি লিখব ‘স্বর্ণ প্রসবিনী মধ্যযুগের কথা’। দোয়া করবেন আমাকে।

‘তাড়াতাড়ি কর... সময় শেষ হয়ে আসছে...’ সময় শেষ হয়ে আসছে? তাহলে তো নিজেকে একটুও ছাড় দেয়া যাবে না। তখনো বোঝেনি



মানুষের জীবনের অজানা রহস্যলোক। আজকাল মাঝে মাঝে অসুস্থ হয়ে পড়ে অমৃত। জীবনের দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে ক্লান্তি বোধ করে মাঝে মাঝে। নিজের প্রিয় ছাত্রী সাবেরাকে বলেছে নির্দিষ্ট দু-তিন দিন এসে বইপত্র গোছানো, নোটবইয়ের কাজে সাহায্য করার জন্য। অবাক এবং বিরক্ত বোধ করে অমৃত। তার নিজের ঘরটা বইয়ে ঠাসা। দীর্ঘ সময়ের স্রোতে অন্য একজন অমৃত এ ঘরে বসত গড়েছে। তাকে ঘিরেই নানা অনুষ্ঠানের মেমেন্টো, পুরস্কার, ক্রেস্ট উপচে পড়ছে আলমারিগুলো। প্রতিটির সঙ্গে জড়িয়ে আছে গৌরব, আনন্দ, বেদনা ও অশ্রুর স্মৃতি। মাঝে মাঝে যেন নিজেকেই চিনতে পারে না

অমৃত। লাইব্রেরিতে কাজ শেষ করে বিকালে বাড়ি ফিরতেই বাড়িভর্তি সব ভাইবোনকে দেখতে পেল অমৃত। বড়দা এগিয়ে এসে বলল— এসেছিস? আয় আব্বা তোকে খুঁজছিলেন।

—কেন আমি তো সকালেই কথা বললাম। আম্মা, কী হয়েছে? আম্মা কথা বললেন না। অমৃতাই মায়ের হাত ধরে বিছানার পাশে নিয়ে গেল। আব্বা কী হয়েছে, খারাপ লাগছে?

ওহাব সাহেব মেয়ের দিকে তাকালেন ঝাপসা চোখে। একটা স্নেহভরা হাত এসে তার মুখে ছুঁয়ে গেল। তারপর পাশে পড়ে গেল। কে যেন ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। তারপর ডাক্তার মাথা নিচু করে ঘরে ঢুকলেন।

আম্মা বললেন— তোর ভাইদের সবার মত হলো, তোর এবার থামা দরকার। শুধু তোর বদমেজাজের ভয়ে সরাসরি বলছে না। থামা দরকার? কেন? আমার কী হয়েছে আম্মা? কিছুটা বিরক্ত হলো অমৃতা। তারপর কী মনে হলো আস্তে আস্তে মায়ের কাঁধে মাথাটা হেলিয়ে দিল অমৃতা। একটি শিশুর মতোই যেন আশ্রয় খুঁজল। নীরব কান্নার দুটি ধারা নেমে এলো চোখের কোণ বেয়ে। বিশ্বের প্রসারিত যন্ত্রণাময় জীবন থেকে মায়ের স্নেহের কাছে, নীড়ের স্নেহের কাছে ফেরার ব্যাকুলতা টের পেলেন মা। ধীরে ধীরে বললেন— ভয় কি মা? ভয় করিসনে। তুই আমার সাহসী মেয়ে।

বর্ষা এলো প্রবল ধারাপাত নিয়ে। কিছুদিন আগে সার্ক লিটারারি কনফারেন্সে ঘুরে এসেছে অমৃতা। সাতটি দেশের শূভ সম্ভাষণে সিক্ত হয়ে ফিরেছে সে। স্মৃতিচারণে বার বার উঠে এসেছে রাজভবনের উতল বাতাস। হু হু করে কেঁদে বেড়ায় যে ঝড়ের কান্না, আধুনিক জীবনের প্রয়োজনে যেখানে বিশাল আবাসন সেখানে দর্প ভরে দাঁড়িয়ে আছে। মানুষের কত পায়ের চিহ্নই তো এভাবে চিহ্নহীন হয়ে গেছে। বর্ষার ডেজা বাতাস খোলা জানালা দিয়ে অমৃতাকে স্পর্শ করে যায়। রহস্যময় হাসি হেসে সময় যেন হারিয়ে যাওয়া ভালোবাসার হাত বাড়িয়ে দিয়ে তাকে বলতে চায়— এই তো আমি। তোমার জীবনের মাধ্যমি আছি।

ওহাব সাহেব যখন মারা যান, তখন কয়েকবার অমৃতাদের বাসায় এসেছে ইশতিয়াক আহমেদ। ভাইদের সঙ্গে বসে আন্তরিকতার সঙ্গে কাজকর্ম, শেষকৃত্যে অংশ নিয়েছেন। তারপর অনেক দিন কোনো যোগাযোগ নেই। মাঝে মাঝে অমৃতা ভাবে এই ভালো হয়েছে। নইলে শিকড়বিহীন আন্তরিকতাকে গায়ে পড়া মনে হতে পারে। নিজের কাজ ছাড়াও বেশ কিছু সমাজসেবা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কাজ করছে অমৃতা। আজ সে যেখানে এসে দাঁড়িয়েছে সেখানে সময়ই তাকে হাত ধরে নিয়ে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। এমনই ভরা বর্ষার দিনে দুলাল নামে একটি যুবক এসে অমৃতার সঙ্গে দেখা করতে চাইল। তার হাতে একটি চিঠি। খাম খুলে অমৃতা চিঠিটি পড়ল। প্রফেসর ইশতিয়াক আহমেদ গুরুতর অসুস্থ। হার্ট ব্লক ধরা পড়েছে। এই বিপদের দিনে অমৃতা আর তার ভাইয়েরা কি তাকে একটু দেখতে আসবে? দুলাল ইশতিয়াকের গাড়ি চালায় বছর কয়েক হলো। লোকটির চোখে পানি। শেষ বিকালে অমৃতা আম্মাকে নিয়ে ভাইদের সঙ্গে করে গেল হাসপাতালে। ইশতিয়াকের কেবিনে ছাত্রছাত্রী, বন্ধুবান্ধব সব মিলে বেশ ভিড়। অমৃতা আম্মার হাত ধরে ভেতরে গেল। ভাইয়েরা সবাই এক এক করে বিছানায় মাথার কাছে দাঁড়ালেন। বড়দা বললেন— অবস্থা বেশ খারাপ। ওপন হার্ট সার্জারি করতে হবে সম্ভবত। এর কোনো আত্মীয়স্বজন নেই। সাহায্য করতে হলে আমাদেরই দায়িত্ব নিতে হবে। সময় কিছু বেশি নেই।

অমৃতা, তোর কী মত? বেসিক্যালি হি ইজ ইওর ফ্রেন্ড। অমৃতা বলল—

—যা ভালো হয়, তাই করা দরকার বলে মনে

করি। অপারেশনে তো টাকা দরকার হবে অনেক, তার কী হবে? সবকিছুর ব্যবস্থা করেই উল্টার আহমেদ হাসপাতালের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। এনজিওগ্রাম করতে নিয়ে যাবে। তারপর অপারেশনের সময় ঠিক করবেন প্রফেসর রহমান।

বড়দা ভারী গলায় বললেন— চারটি ব্লক ধরা পড়েছে। অথচ তাই নিয়ে তিনি পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে ব্যাডমিন্টন খেলেছিলেন। মাটিতে লুটিয়ে পড়ে যাওয়ার পরে ছেলেরা ডাক্তার ডেকে আনে। তারপর তার সহকর্মীরা নিয়ে যান হাসপাতালে। কিছুটা সুস্থ বোধ করে তিনি আমাদের কাছে পাঠান তার ড্রাইভারকে।

অমৃতা চুপ করে বসে থাকে। এই লোকটিকে কতটুকু চেনে সে? নিজে থেকে যতটুকু বলেছে, তার চেয়ে বেশি কিছু জানতে চায়নি কখনো। অথচ ইশতিয়াক তো কোনো আত্মানের জন্য অপেক্ষা করেনি। আবারো তার শেষযাত্রায় পৌঁছে দেয়ার দিনগুলোয় প্রতিটি মুহূর্ত সবার পাশে পাশে ছায়ার মতো থেকেছে। শেষ দিকে খালি অমৃতার কাছে কয়েক মিনিটের জন্য দাঁড়িয়ে বলেছে—

—আমি আসি তাহলে? খালাম্মা আমি তবে আসি? কই আম্মা তো ভুল করেননি! বলেছিলেন— এসো বাবা। ভালো থেকো। কিন্তু অমৃতা তো কিছুই বলেনি ইশতিয়াককে! কত ভালো ভালো কথা, কৃতজ্ঞতা জানানোর ভাষা, কিছুই মনে আসেনি অমৃতার। শুধু নিঃশব্দে মাথা নাড়িয়ে বিদায় জানিয়েছে। তবে কি অমৃতা তাকে দূরের একজন মানুষ বলেই জেনে এসেছে? ইশতিয়াক যেমন সাদামাটা ভাষায় একজন শুভাকাঙ্ক্ষীর বেশি কিছু দাবি কোনো দিন জানায়নি। অমৃতাও তেমনই তার মনের দরজাটা খোলার প্রয়োজন বোধ করেনি। কিন্তু সহজভাবেই ইশতিয়াকের দেয়া সহায়তা গ্রহণ করেছে। ইশতিয়াক তার অনুমতি ছাড়াই তার পরিবারের সঙ্গে মিশে গেছে। কোনো সীমালঙ্ঘন করেনি। অথচ বড়দা বললেন বেসিক্যালি সে অমৃতার ফ্রেন্ড। তবে কি সবার কাছে এই সবুজ সত্যটা যত সহজে গ্রহণযোগ্য হয়েছে। অমৃতা সেভাবে বোঝার সময়ই পায়নি। তার দৃষ্টি ছিল অনেক দূরের সার্থকতার দিকে। জীবনের ক্ষুদ্র ভালোলাগা, ভালোবাসার কথা সে ভাবতে চায়নি।

আজকে তাহলে ইশতিয়াকের কেবিনের একপাশে রাখা সোফায় বসে কী ভাবছে অমৃতা? নিছের উদাসীনতা, নাকি নির্ভুরতার কথা? বুকের গভীরে কান্নার মতো, নাকি অব্যক্ত হাহাকারের মতো ডুকরে উঠছে যন্ত্রণা। অবিশ্বাস্য হলেও সত্য যে উদ্বিগ্ন আত্মীয়রা এখন নেই। ভিড়ের লোকজন চলে গেছে। মাত্র দু-চার জন রয়ে গেছে। ইশতিয়াক ডাক্তারকে বলেছে আমার আত্মীয়স্বজনদের পেয়ে গেছি। এখন যে কোনো রিস্ক নিতে পারব উল্টার।

‘বি রেস্টফুল প্রফেসর। কোনো টেনশন করবেন না। ওয়েট ফর দ্য রাইট টাইম।’ বলেছেন ডাক্তার।

দুলালের দিয়ে যাওয়া খামটা আম্মা অমৃতার হাতে দিয়ে বললেন এটা পড়ে দ্যাখ। নইলে হয়তো তোর জন্য অনেক দেরি হয়ে যাবে।

গোসল সেরে এসে খামটা খুলল অমৃতা। খুলেই একটা ঝাঁকুনি খেল। অচেনা অথচ অন্তরঙ্গ ভাষায় লেখা প্রেমপত্র? না, তা হবে কেন? স্বীকারোক্তি। ইশতিয়াকের লেখা। “অমৃতা আমি স্বীকার করছি যে তোমাকে ভালোবাসার অপরাধ আমি করেছি। তুমি শুনলে হয়তো বিশ্বাস করবে না, কিন্তু যা বলছি, সবটাই সত্য। তোমাদের রাজভবনের পাশে একটা ফুটবল খেলার মতো বড় মাঠ ছিল। ওই মাঠে ষাটের দশকে স্থানীয় ফুটবল ক্লাবের ছেলেরা খেলতে আসত। আমিও ছিলাম ওদের সদস্য। তৌ, খেলতে খেলতে জোশে ফুটবলটা ছুড়ে দিতাম। পাশের বিরাট বাড়িটার সামনের শৌখিন বাগানটায় বলটা গিয়ে পড়ত। অথচ বিনা কারণে বলটা অমন জায়গায় পড়ার কোনো কারণ ছিল না। পরপর কয়েকবার বলটা বাগানে পড়ার পর নিতান্ত সরলভাবে বলটা চেয়ে আনতে যেতাম আমি। কারণ ওই সময়ে ওই বাড়ির মেয়েরা দুই বোন গাছে পানি দিতে বাগানে আসত। রীতিমতো দুঃখ প্রকাশ করে, ‘সরি, এমন ভুল আর হবে না’ বলে আমি বলটা কুড়িয়ে আনতাম। শুধু ওই বাড়ির বড় মেয়েটিকে দেখার জন্যই যাওয়া। বেশি দিন অবশ্য এ চাতুরী চলল না। আমাদের লিডার তারেক ভাইয়ের ধমক খেয়ে ওই মাঠে খেলা বন্ধ হয়ে গেল। জীবনের প্রয়োজনে অনেক কিছুই বাদ দিতে হলো, কিন্তু রাজভবনের স্বপ্নটা রয়েই গেল। ভেবেছিলাম কোনো একদিন গিয়ে হাজির হব নিজের প্রিয় স্বপ্নটির সামনে। কিন্তু স্বপ্নের চেয়ে জীবনযুদ্ধ অনেক কঠোর। সবার আগে মানুষ হতে হবে। সমাজের যোগ্য একজন। তারপর দেখা যাবে।

ততদিনে লজ্জা এবং সংকোচ এসে জায়গা নিয়েছে জীবনে। একদিন এক বিপজ্জনক অনুষ্ঠানে তারে রক্ষা করলাম, পরিচয় করলাম, তবু মুখ ফুটে মনের কথা বলা হলো না। আমি যতবার ভেবেছি ততবারই আপনার বিস্ময়কর চিন্তা-চেতনা, কাজের নেশা আর সফলতা আমাকে মুগ্ধ করেছে। আপনার সর্বগ্রাসী জ্ঞানসম্পূর্ণতার সামনে নিজের নিঃসঙ্গতা আর ব্যাকুলতা নিয়ে ধরা দিতে লজ্জাবোধ করছি আমি। জানি না, আমার কথা কখনো আপনি ভেবেছেন কিনা। আপনার সাধনাকে আমি শ্রদ্ধা করছি। স্কলার হিসেবে আমিও একেবারে ফালনা নই। তবু নিজেকে জীবনের সবচেয়ে সুন্দর যে ভালোবাসা তা থেকে বঞ্চিত করেছি বলে একটু দুঃখ হচ্ছে। তাই কথাগুলো বলে ফেললাম। আশা করি আমাকে ভুল বুঝবেন না।

আপনার অজানিতে আপনার পরিবার আমাকে যে মূল্যবান স্নেহ দিয়েছেন, তার পরিপ্রেক্ষিতে আমি আমার সারা জীবনের নিঃসঙ্গতা ভুলে গেছি। তাই যাওয়ার আগে বলে যেতে চাই, আপনাকে সর্বস্ব দিয়ে ভালোবেসেছি অমৃতা।” ইতি গুণমুগ্ধ ইশতিয়াক আহমেদ।

অপারেশনের তিন দিন পরে দেখা করতে গেল অমৃতা। এ তিন দিন নিজের টেবিলে বসেছে অমৃতা। লিখতে পারেনি একটি হরফও। নিজের বেডে আধশোয়া হয়ে বসে আছে ইশতিয়াক। নার্স কুশনগুলো ঠিক করে দিল। বলল উনার রেস্ট প্রয়োজন। আমি একটু পরই চলে যাব। বলল অমৃতা।

—তোমার হাতটা একটু ধরতে দেবে আমাকে?
অমৃতা নিঃসংকোচে হাত বাড়িয়ে দিল
ইশতিয়াকের হাতে। অনেকক্ষণ। অমৃতা চুলগুলোয়
রাখল অন্য হাতটি। জানতে চাইল কবে বাড়ি
যাবেন?

ইশতিয়াক এ কথার জবাব দেয় না। একটু পরে
বলে, আমাকে ভুলে যেও না। জীবনের ধারালো
রেলিংগুলো সাহসের সঙ্গে পেরিয়ে যেও।

—কী বলছেন? আপনি সাহসী মানুষ। কষ্টে কথা
বলে অমৃতা।

—কিন্তু এত কিছু পাওয়ার পরে আমার ভয় করছে।
তোমার হাতটা ছেড়ে দিতে ভয় করছে অমৃতা।
শিশুর মতো বলল ইশতিয়াক। নিঃশব্দে চোখ ভরে
ওঠে অমৃতার। মোছার চেষ্টাও করে না। নার্স এসে
নিঃশব্দে দাঁড়ায়। অমৃতা বলে আজ আসি।
সাবেরা অবাক মানে। এ বাড়ির মানুষগুলো অদ্ভুত।
পালা করে ইশতিয়াকের অসুস্থতায় পাহারা দিচ্ছে।
অমৃতা বলে, তোমাকে যে নোটগুলো দিয়েছিলাম,
ওগুলো যাচাই করছে?

—করেছি আপা। তবে দু-এক জায়গায় একটু খটকা
আছে। এখন আনব? সাবেরা উসখুস করে।
কিছুদিন হলো বিয়ে হয়েছে। তা অমৃতা বুঝে
বলে— না, না, এখন থাক সাবেরা। পরে একসময়
ঠাণ্ডা মাথায় বসব। তুমি একটা কাজ কর,
আলমারিটা খুলে একটা ভালো চাদর আর
বালিশের ওয়াড় বের করে রাখ। তোমাদের স্যার
এলে এখানেই থাকবেন।

—আচ্ছা ম্যাডাম। আর কিছু কি রাখতে চান? যেমন
ফুল?

—হ্যাঁ, সেই বেশ ভালো হবে। তবে সুগন্ধ ছাড়া
নয়। গন্ধরাজ পেলে আনার চেষ্টা করো। আজ আর
কাজ নয়। তুমি বাড়ি চলে যাও। কথাটা শেষ হতে
না হতেই ঘরে ঢোকে শাওন। বলে চাদর আমি
বের করে দিচ্ছি।

—ঠিক আছে। হঠাৎ কী মনে হয়, অমৃতা বলে, কিছু
বলবি?

শাওন কাছে আসে। একদৃষ্টে অমৃতাকে দেখে
শাওন। তারপর বোনকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ওঠে—
আপু তুমি কেন এত নিষ্ঠুর হলে? জীবনে হাজারো
মানুষের সুখ-দুঃখ নিয়ে লিখলে, আর নিজের
মানুষের একাকিত্ব ভালোবাসা কিছুই জানলে না
আপু, বুঝলে না! আপু তুমি কেন, কেন এমন
হলে?

অমৃতা নিশ্চুপ হয়ে বোনের কান্না শোনে। অভিযোগ
শোনে। বুকের ভেতর অপরিচিত এক ভালোবাসা
গুমরে ওঠে তার, কিন্তু মুখ ফুটে একটি শব্দও
উচ্চারণ করতে পারে না অমৃতা। অমৃতার নিশ্চুপ
মুখের দিকে তাকিয়ে সাবেরা পা টিপে টিপে
বেরিয়ে যায়।

সন্ধ্যায় টেলিফোনের শব্দ চমকে ওঠে অমৃতা।

—হঠাৎ অবস্থা ডেটোরিয়রেট করেছে অধ্যাপক
ইশতিয়াকের। এক্ষুনি যেতে হবে।

কেবিনে পৌছাতে চোখে পড়ল ডাক্তারের গম্ভীর
মুখ। নার্সের হাতে সিরিঞ্জ, ওষুধ।

নিম্নলিখিত চোখ খুলে তাকান ইশতিয়াক।

ডাক্তার বলেন উনাকে কথা বলতে দেবেন না।

অমৃতা হাত বাড়িয়ে ইশতিয়াকের হাতখানি ধরল।

ইশতিয়াকের মুখটা যেন কেমন দেখাচ্ছে। ফিসফিস
করে বললেন।

—আমার হাতটা ছেড়ে না অমৃতা, আমার ভীষণ
ভয় করছে। তুমি সঙ্গে না থাকলে অন্ধকার, তুমি
সরে যেও না। পরম নির্ভরতায় আঙুলগুলো জড়িয়ে
ধরলেন ইশতিয়াক। বুকের গভীর থেকে বেরিয়ে
এলো সুগভীর তৃপ্তির নিঃশ্বাস— তখনো অমৃতার
আঙুলগুলো তার আঙুলে জড়ানো।

ঘোর জ্বরের আচ্ছন্নতা কাটিয়ে দশ দিনের মাথায়
সুস্থ হয়ে ওঠে অমৃতা। সুস্থতার সঙ্গে সঙ্গে ফিরে
আসে দায়িত্ববোধ, কাজের দায়বদ্ধতা। বড় ভাই-
মেজ ভাই সবাই উদ্বিগ্ন। খবরের শিরোনাম হওয়ার
কোনো কারণ নেই তবু অমৃতার অসুস্থতার কারণে
হতে হয়েছে। বড় ভাই ড্রু কুঁচকে বার বার একটি
বিষয় এড়িয়ে যেতে চেয়েছেন কিন্তু ইশতিয়াকের
আইনজ্ঞ বন্ধুর সনির্বন্ধ অনুরোধ এড়ানো সম্ভব
হয়নি। না। কোনো আত্মীয়তার ছদ্মবেশ তৈরি না
করেই ইশতিয়াক আহমেদ তার গাড়ি থেকে শুরু
করে সব স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ তার বেস্ট ফ্রেন্ড
অমৃতা রহমানকে গিফট করে সব দায়ভার ন্যস্ত
করে গেছেন। প্রয়োজনে অমৃতার বড় ভাইয়েরা
যেন তাকে সাহায্য করেন। এ অনুরোধও করা
হয়েছে।

বর্ষা আসে, বর্ষগুরুজীবন টেনে চলতে থাকে
মানুষের। শরৎ আসে, শেফালির গন্ধে বাতাস
উতলা হয়ে ওঠে। চৈত্রের বিবাগী বাতাস উন্মাতাল
খেপামিতে আছড়ে পড়ে। পথের ধূলায় ঘূর্ণি ওঠে।
ঠিক রাজভবনের দিনগুলোর মতো। ইশতিয়াক
শিশুভবনের দিনগুলো অনাথ, পথে কুড়িয়ে পাওয়া
শিশুদের আনন্দে কলরবে ঝলমল করে। অফিস
ঘরে বুলছে ইশতিয়াক আহমেদের হাস্যজঙ্ঘল ছবি।
দুলালের চুলগুলো সাদা হয়ে এসেছে। অমৃতার
কাজের নেশায় যখন বাড়ি ফেরার কথা মনে থাকে
না, তখন বসে বসে ঝিমোয় আর কপালের দোষ
দেয়। মাঝে মাঝে কল্পনা করে, ম্যাডামের পাশে
পাশে স্যারও হেঁটে হেঁটে আসছেন। তারপর জিব
কাটে, চোখ ভিজে ওঠে তবুও।

বড়দা বলেন, এবার একটু বিশ্রাম নিলে তো পারিস
অমৃতা। এক জীবনে আর কত?

সামনের দেয়ালে ঝোলানো মা আর আবার ছবিতে
চোখ রেখে মৃদু হাসে অমৃতা। অমৃতা ভাবে, জীবন
দেখার নেশায় মগ্ন যে জীবনতৃষ্ণা তা তো কেবলই
সামনে টেনে নিয়ে চলে। সময় না হলে কোথায়
থামতে হবে। কী করে জানব বড়দা?

সেদিন শাওন এলো বেড়াতে। বোনের চুলে চিরনি
দিয়ে বিনুনি গাঁথতে বসে বলল— আপা, তোমার
ক্লান্ত লাগে না?

—ভালোবাসলে কোনো কাজেই ক্লান্তি আসে না শানু।
আমি যা লিখি, তার পেছনে আমার গভীর
ভালোবাসাই আমাকে চালিয়ে নেয়। কত কিছুই তো
হারলাম শানু। ভেবে দ্যাখ, তাহলে কিসের
জোরে চর্যাপদে আছে কাহ্ন। কোথায় তোর
নিবাস?

প্রাচীন কবি কাহ্ন বলেন— ‘যা মনের গোচর, সেই
আবার উদাস, একলা বন্ধনহীন।’ দুজনে স্তব্ধ হয়ে
থাকে। অমৃতার কানে ভেসে আসে ইশতিয়াকের
কণ্ঠস্বর— তোমার হাতটা আমাকে দাও অমৃতা,
নইলে বড় অন্ধকার। বিশৃঙ্খলতার সঙ্গে হাত বাড়াতো
প্রস্তুত হয় অমৃতা। সন্ধ্যার বাতাস যেন তাদের দুই
বোনকে স্নেহের চাদরে ঘিরে রাখে। ঠিক যেন
কোনো প্রাচীন ইতিহাসের মর্মর প্রতিকৃতি।





গল্প

গণ্ডার উপাখ্যান

আলী ইমাম

বৃদ্ধ গণ্ডারটি জলাশয়ের কাছে একটি জঙ্গলে দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ একটি ছোট গণ্ডারের বাচ্চা মায়ের কাছ থেকে দৌড়ে বৃদ্ধ গণ্ডারটির কাছে এলো। বৃদ্ধ গণ্ডারটি তার দাদিমা।

দাদিমা গণ্ডার বাচ্চাটির দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমরা কেন যে এ সময় পৃথিবীতে এলে আফসোস হয়। আমার খুবই কষ্ট হচ্ছে তোমার জন্য। এখন তো মানুষ আমাদের শুধু মারছে। আমাদের চামড়ার ওপর বসে তারা পূর্বপুরুষের শ্রদ্ধ করে। আমাদের রক্ত দিয়ে তারা তর্পণ করে। তুমিও যে কোনো মুহূর্তে মারা যেতে পার। তোমার মায়ের কাছে কাছে থাকবে সব সময়। দূরে যেও না।'

বাচ্চাটির মাও এলো সেখানে। সে বলল, 'আমিও তাকে তা বলছিলাম।'

'হ্যাঁ, যে কোনো মুহূর্তে সে মারা যেতে পারে। আগের

দিনের মতো এখানে ঘাসের আবরণ নেই। ঘন গাছগাছালিও নেই। তাই আমাদের আড়াল করার জায়গা কমে গেছে', দাদিমা বলল আবার। মা গণ্ডারটি বাচ্চার দিকে তাকাল স্নেহমাখা চোখে। 'আমাদের যদি শিং না থাকত তাহলে মনে হয়, আমাদের জীবন এত হুমকির মুখে পড়ত না। মানুষ এসে আমাদের ফাঁদে আটকায়, হত্যা করে। তারপর শিংটা নিয়ে যায়', মা গণ্ডার বলল।

ঠাকুরমা সম্মতিসূচক মাথা নাড়ল। 'ঠিক এ কথাগুলোই কয়েক বছর যাবৎ আমি বলে আসছি। এই বনের গ্রহরী-রা একটা কাজ করতে পারে। সব গণ্ডার ধরে শিংগুলো কেটে নিতে পারে। তাহলে শিকারিরা আর আমাদের টাঙেটি করবে না। এত ভোগান্তিও হবে না।'

মা গণ্ডার বলল, 'তারা যে শুধু শিং কেটে নিয়েই ছেড়ে দেবে তার নিশ্চয়তা কী? আমি তো মনে করি এরই মধ্যে অনেক গণ্ডারের শিং তারা কেটে নিয়েছে। বিদেশে পাচার

করেছে।

এই কথোপকথনের কয়েক দিন পর খবর এলো গণ্ডারের বাচ্চাটি হারিয়ে গেছে। শুধু মা নয়, দাদিমাও তাকে খুঁজতে বের হয়ে গেল। কয়েক দিন তার কোনো খবরই পাওয়া গেল না। হঠাৎ এক সকালে খবর এলো একটি বাচ্চা গণ্ডারের গলিত মরদেহ পাওয়া গেছে। তবে তার শিং অক্ষত আছে। নদীতে ভাসছিল। তাকে হয়তো শিকারিরা ধরতে ধাওয়া করছিল। দৌড়াতে গিয়ে হয়তো বা ছোট গণ্ডারটি পিছলে নদীর পানিতে পড়ে গিয়েছিল। পালানোর অন্য কোনো পথ ছিল না। তাই সাঁতরে নদী পার হতে চেয়েছিল।

বনের সবাই মা গণ্ডারকে সন্তান দিতে এলো। তখন পৌঁচা বলল, 'এটা আমাদের জন্য খুবই কষ্টের। বেচারী ছানাটি মাত্র কয়েক দিন হলো পৃথিবীর মুখ দেখেছে। এত অল্প দিনের মধ্যেই পৃথিবী ছেড়ে চলে গেল। সৃষ্টিকর্তা তার আত্মাকে শান্তিতে রাখুন। তার মা কী করছে এখন? বাচ্চাটার বাবা গণ্ডারকেও কয়েক মাস আগে শিকারিরা ফাঁদে আটকিয়েছে। তারপর কুড়াল দিয়ে আঘাত করে মাথা চূর্ণ করে ফেলেছে।'

বেজি বলল, 'এখন আমাদের একটি ব্যবস্থা নিতে হবে, যাতে গণ্ডাররা এই পৃথিবী থেকে হারিয়ে না যায় সে ব্যবস্থা।' শিয়াল বলল, 'বাচ্চা গণ্ডারটি মরে গেল! এখন আর কোনো পুরুষ গণ্ডার নেই। এখন মা গণ্ডারকেই তাহলে বনের এ বছরের শাসক বানাতে হবে।' শিয়ালের এ প্রস্তাবটি সবাই মেনে নিল।

'আমি আশা করি, সে একজন ভালো শাসক হবে। গত সময়ের তুলনায় আমরা ভালোই থাকব। নতুন শাসকের মঙ্গল কামনা করি', নীলগাই বলল।

মা গণ্ডার বনের শাসক হলো। এখন বনের অবস্থা ভালো নয়। চারদিকে বিশৃঙ্খলা, বামেলা লেগেই আছে। প্রথম সমস্যাটা সৃষ্টি হয়েছে তুষারমানবকে নিয়ে। নিজের দেশে অব্যাহত। উত্তরে তার দেশে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা হাওয়ায় কারণে সে দক্ষিণে চলে এসেছে। তাই সে কিছুটা উষ্ণ আবহাওয়ার উদ্দেশ্যে দক্ষিণে নেমে এলো। সে আর কেউ নয় ইয়েতি। হিমালয়ের বিখ্যাত তুষারমানব ইয়েতি। যতই সে দক্ষিণে এসেছে ততই আন্তে আন্তে তার শরীরের লম্বা পশম হারিয়ে গেছে। একটি কথা সবাই বিশ্বাস করে এই ইয়েতি সম্পর্কে। তা হলো, উত্তর থেকে দক্ষিণে নেমে আসার এই দীর্ঘ পথ সে অতিক্রম করে রাতের বেলা। দিনে চলাফেরা করলে দেখে ফেলার ভয়। তাই দিনে কোনো একটি স্থানে আশ্রয় নিতে হয়। এই দিনের বেলায়ই তার পশম খসে পড়তে থাকে। এভাবে সে যখন দক্ষিণে এসে পৌঁছাল তখন তার কোনো পশমই নেই।

একজন ধর্মযাজক তখন তাকে শীত থেকে বাঁচতে একটি গাউন দিল। আপাতত সে ওই মন্দিরে আশ্রয় নিল। যে দেশ থেকে সে চলে এসেছে সেই দেশের শাসক তাকে ফেরত নিতে চায়। আবার দক্ষিণের শাসকও তাকে ফেরত পাঠাতে ইচ্ছুক। কিন্তু তা করতে পারছে না।

তাহলে পশু অধিকার সংস্থা হৈচৈ ফেলে দেবে।

শাসকদের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হতে পারে। তারা এমন একটি পশমহীন প্রাণীকে বরফের দেশে ফেরত পাঠাতে পারে না। তাহলে নির্ঘাত সে মারা পড়বে।

তাই এ দেশের মানুষ, প্রাণী সবাই অভিযুক্ত হলো। কেন ইয়েতিকে আশ্রয় দিল? তারা বলল, উত্তর ও দক্ষিণের সীমান্তটা খুবই ঘন জঙ্গলাকীর্ণ। এত ঘন যে ওখানে হাতি থাকলেও দেখা যাবে না।

এদিকে বিশ্বের প্রচারমাধ্যমগুলো ইয়েতিকে নিয়ে হৈচৈ শুরু করে দিয়েছে। এ অবস্থায় কী করবে ভেবে পচ্ছে না

এই বনের পশুরা।

মা গণ্ডারের শাসনের অধীনে যারা আছে সবাই চিন্তিত। সবার এক কথা, কী করবে? সবাই ভাবছে মা গণ্ডার শাসনকাজ ঠিকমতো চালাতে পারবে কিনা।

একদিনের এক সভায় আলোচনা হচ্ছে। নীলগাই বলল, 'দেখ শিয়াল, তুমি তো চিত্তার সাগর। যে কোনো সমস্যার একটা কিছু সমাধান বের করে ফেলতে পার। এখন আমাদের জন্য কিছু একটা করা।'

শিয়ালের মনটা ভালো হয়ে গেল। তার মাঝে সবাই বুদ্ধি খুঁজছে। সে তো এটাই চায়। এখন সে ভাবছে আসলে ভালো বুদ্ধিই দেবে। কারণ যে কোনো কিছুর বিনিময়েই তাকে এই প্রাণীদের সঙ্গেই বাকি জীবনটা কাটাতে হবে।

শিয়াল বলতে শুরু করল, 'আমাদের পশ্চিমে একটি জঙ্গল আছে। এখান থেকে বেশ দূর হবে। তবে যাওয়া অসম্ভব হবে না। ওখানেও একজন মহিলা শাসক রয়েছে। শুনছি সেও খুব ভালোভাবে দেশ পরিচালনা করছে। আমার প্রস্তাব হচ্ছে, সেই দেশে গিয়ে মা গণ্ডারকে প্রশিক্ষণ নিয়ে আসতে হবে। সে যতদিন প্রশিক্ষণে থাকবে ততদিন তার মা ভারপ্রাপ্ত শাসক থাকবে।'

শিয়ালের কথা সবাই মেনে নিল। যদি ঠিকমতো প্রশিক্ষণ নেয়া যায় তাহলে এই দেশটার খুবই উন্নতি হবে। ঠিক হলো মা গণ্ডারের সঙ্গে দশজন সফরসঙ্গী হবে।

দলবল নিয়ে গণ্ডারের যাত্রা শুরু হলো পশ্চিমের দেশে। যেতে যেতে ভাবতে লাগল, সে কোনো বিপদে পড়বে না তো? শিয়ালের তো বুদ্ধির শেষ নেই। সে কোন ফাঁদ থেকে নিয়ে কোথায় ফেলে দেয় তার ঠিক নেই। ভাবতে ভাবতে একসময় অস্তির হয়ে উঠল। তখন পাশে

নীলগাইকে পেয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'নীলগাই! আমার তো খুব ভাবনা হচ্ছে। শিয়াল কোনো কুটচাল চালেনি তো? কী হতে যে কী হয়ে যায় বুঝতে পারছি না।'

নীলগাই বলল, 'শিয়াল শয়তান এ কথা আমি জানি। খুবই সত্যি কথা। কিন্তু সে খুবই ভীতু প্রাণী। এত বড় একটা ব্যাপার নিয়ে সে মশকরা করার সাহস পাবে না। গণ্ডার বলল, 'তুমি জান না সে সব সময় শাসক প্রাণীর কাছ থেকে কিছু না কিছু ভাগ আদায় করে থাকে। মুহূর্তের মধ্যে সে নিজের রং বদলাতে পারে। আমার মনে হয় ফিরে যাওয়াই ভালো।'

নীলগাই বলল, 'দেখ, তোমার এ কাজটা কিন্তু মোটেই উচিত হবে না। সবাই তাহলে মনে করবে মেয়েদের দিয়ে শাসন কাজ হবে না। সব সময় সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগে। কোনো ক্ষমতাই নেই।'

'নীলগাই! আমি জঙ্গলের প্রাণীদের কথা ভাবছি। বনে প্রাণী কম দেখলে মানুষ ভাববে, প্রাণী নেই তাই গাছেরও প্রয়োজন নেই। তারা ইচ্ছামতো গাছ কাটবে। এতে তারা প্রচুর পয়সা উপার্জন করতে পারবে', গণ্ডার বলল।

নীলগাই বলল, 'তুমি যা ভাবছ তা মোটেই ঠিক নয়।

আমরা যাব আর প্রশিক্ষণ শেষ করেই চলে আসব। এতে আর অন্য কিছু ভেবে মন খারাপ করে দিও না।'

কয়েক দিনের মধ্যেই তাদের প্রশিক্ষণ শেষ হয়ে গেল। খুশিমনে দলবলসহ গণ্ডার নিজের দেশে ফিরে আসছে। একজন ভালো শাসক নিয়ে তারা দেশে ফিরে এলো।

এর কয়েক দিন পরই বুনা হাতিগুলো আবার উৎপাত শুরু করেছে। রাতের পর রাত তারা তাণ্ডব চালাতে লাগল। বনের পশুজীবন অতিষ্ঠ করে তুলল। ইতোপূর্বে গড়া সমস্যা সমাধান কমিটিকে আবার তলব করা হলো। প্রথমে সবাই নেকড়েই কাছ গেল। তাকে বলল,

'নেকড়ে ভাই! কমিটি করার পর ভেবেছিলাম আমাদের এই হাতি সমস্যার সমাধান হবে। কিন্তু এখন দেখছি

আমাদের শুধু ধোঁকা দেয়া হয়েছে। হাতির শাসনকালে সে তার জাতভাইদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। তাদের সঙ্গে মানুষের তেমন কোনো পার্থক্য নেই। মানুষও নিজদের আত্মীয়স্বজনকে সব সময় প্রশ্রয় দিয়ে থাকে। অত্যাচার আমাদের মতো জনসাধারণকে ফল ভোগ করতে হয়।'

নেকড়ে কিছুক্ষণ চিন্তা করল। সমস্যা সমাধানের জন্য তার কিছু করা উচিত। তাই প্রথমেই সে সমস্যা সমাধান কমিটির সভা আহ্বান করতে মনস্থ করল। সভায় কমিটির পাঁচ সদস্যই একত্রিত হলো। নেকড়ে বলল, 'আমাদের কমিটির সিদ্ধান্ত খুব তাড়াতাড়ি জানাতে হবে। আজীবন তো এ সিদ্ধান্ত বুলিয়ে রাখতে পারি না।'

কাঠবিড়ালি বলল, 'আমরা কি প্রস্তাব নিতে পারি? আমরা খুবই ছোট। কিন্তু দুই হাতিগুলো বেশ বড় এবং শক্তিশালী। আমরা তো তাদের জন্য একটি গর্তও খনন করতে পারি না।'

বানর বলল, 'আমার একটি কথা মনে এসেছে।

আগেরকার দিনে এ পদ্ধতিটা বেশ চালু ছিল। তা হলো, কোনো বোলতা বা মৌমাছি হাতিগুলোর কানে ঢুকিয়ে দেয়া। তারা যখন কানের ভেতর ঢুকে কামড়ানো শুরু করবে তখন হাতিগুলো পাগল হয়ে যাবে। দিকবিন্দিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পালিয়ে যাবে।'

শিয়াল বলল, 'চমৎকার বুদ্ধি! এ পদ্ধতিটা ব্যবহার করা হয় আমাদের উত্তরের দেশে। ওখানে বিরাট বিরাট ষাঁড়কে এভাবেই কাবু করা হয়। পাগল হয়ে তারা ছোটছোট করার একপর্যায়ে পাহাড় থেকে পড়ে গিয়ে নিহত হয়। কিন্তু আমাদের সমস্যা হচ্ছে এখানে তো কোনো খাড়া পাহাড় নেই। কোথেকে হাতিগুলো পড়বে? তাহলে মরারও ভয় নেই। তবে এ বুদ্ধিটা মাথায় থাক। পরে কাজে লাগতে পারে।'

নেকড়ে বলল, 'শিয়াল যা বলেছে তা ঠিকই আছে। তবে এতে একটা কাজ হবে। হাতি যখন পাগল হয়ে ছোটছোট করবে, আছাড় খেয়ে পড়বে তখন আমি সাদোপাঙ্গসহ কামড়াতে পড়ব। এভাবে তাদের শরীরে "র্যাবিস" জীবাণু ঢুকিয়ে দিতে পারব।'

এ সিদ্ধান্তে কমিটির সবার মন-মেজাজ ভালো হয়ে গেল। একটি বাস্তব কার্যকর সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। সেদিনের মতো সভা শেষ হয়ে গেল। এখন কাজ করার পালা।

সেইমতো কিছু বোলতা ও ভিমরুল হাতির কানে ঢুকিয়ে দেয়া হলো। তাদের হলের তীর যন্ত্রণায় হাতি গাালের মতো ছোটছোট করে দিল। গাছ উপড়ে ফেলছে, পা দিয়ে মাড়িয়ে সব কিছু হারখার করে দিচ্ছে। কিছুক্ষণ পর সবার নেতা বিশাল হাতিটি দৌড়াতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে মাটিতে পড়ে গেল।

সে পড়ে যাওয়ায় অন্য হাতিগুলো কী করবে ভেবে পেল না। তারা এখানে সেখানে ঘুরতে শুরু করল উদ্দেশ্যহীন। আহত হাতিকে কেন্দ্র করে যোরাফেরা করছে। একটু দূরে গেল তো আবার ফিরে আসছে তার কাছে। কয়েক দিনের মধ্যেই তাদের উৎপাত আপনাআপনিই বন্ধ হয়ে গেল। তবে বিশাল আহত হাতিটা দুর্বল হয়ে পড়ল।

তখন নেকড়ে ও তার দল এবং শিয়াল ও অন্যান্য মাংসাশী প্রাণী হাতিটাকে কামড়াতে লাগল। হাতির প্রচণ্ড আতনাদে পুরো জঙ্গল কেঁপে উঠল। দিন দিন বিশাল দৈত্যাকার হাতিটা দুর্বল থেকে দুর্বলতর হতে থাকে। তার শরীরের বিভিন্ন স্থানে কামড়ের ক্ষতে ঘা হয়ে গেল। এভাবে কয়েক দিনের মধ্যেই সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল। তবে সে র্যাবিস সংক্রমণে মরেনি, মরছে ক্ষতস্থানের সংক্রমণের কারণে।



গল্প

আমি তব পত্রের হব বাহিকা

রণজিৎ বিশ্বাস

আপনাকেও আমি চিনতে পাচ্ছি না। আপনার কণ্ঠ সুন্দর, কথায়ও দম আছে, আপনার সঙ্গে কথা বলতে আমার ভালোও লাগছে, অনেকক্ষণ আপনি আমার কানে লেগে থাকুন— এমন বলতে ইচ্ছেও করছে। কিন্তু আপনি কে? অপরচিত কোনো ভদ্রমহিলা তো আমার ওপর এমন জোর খাটিয়ে কখনো কথাও বলেনি।
: আপনি আমার খুবই পরিচিত। আমার পরিচয়ে আপনার প্রয়োজন নেই। আমি ছোটখাটো একজন শিল্পকর্মী। বিচরণ সঙ্গীতভুবনে। গান গাই। রবীন্দ্রসঙ্গীত। আপনার অপমান, আপনার ব্যর্থতা, আপনার কষ্ট আমাকে কষ্ট দেয়। তাই বলে আপনার যেমন আনন্দ, আমাকে নিয়ে আবার গল্প

ফেঁদে বসবেন না!

: খুবই ইন্টারেস্টিং তো!

: আগে সব শুনুন। একটু পরে আর কিছুই

ইন্টারেস্টিং মনে হবে না।

: আপনি কিন্তু খুব কৌতূহল জাগাতে পারেন।

: আমি আরো অনেক কিছুই জাগাতে পারি। আবার বিরতও থাকতে জানি। আপনার ছোটখাটো ভালোও আমাকে অনেক বড় ভালোলাগার আনন্দ দেয় বলেই অনেক কষ্টে আপনার ফোন নাম্বার জোগাড় করলাম; তারপর আপনি কী মনে করবেন না ভেবেই আপনাকে ফোন করে বসলাম।

: একটা ফোন নাম্বার জোগাড় করার জন্য আপনি ঢাকা থেকে ত্রিশাল চলে গিয়েছিলেন!

: গিয়েছিলাম! প্রয়োজনে মানুষ কত জায়গায় যায়। ঢাকা থেকে ময়মনসিংহের ত্রিশাল, এ আর এমন কী দূর!

: তেমন দূর নয়, তবে এ তো মশকনিধনের জন্য জোড়াকামান দাগানোর মতো ব্যাপার!

: তার চেয়েও বেশি হতে পারে। তবে, কামান আমি দাগিয়েছি ঢাকায় বসে। ফোনের জোরে। ওখানে আমার এক বান্ধবী আছে। ফাইন-আর্টস পড়ায়। লেকচারার। বছর হয়নি এখনো ঢুকেছে। খুব সুন্দরী। একসময় আপনার শিক্ষার্থী ছিল। রূপকথার পরীর মতো লম্বা চুল। এজন্য একবার আপনি তাকে বলেছিলেন— পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর খোলা চুলের জন্য রেকর্ড বইয়ে কবে তোমার নাম যাবে? আপনি তাকে নিয়ে গল্প লেখেন, কবিতা বলেন, তাকে নিয়ে গল্পবিত্তার বা কল্পসঙ্গ রচনার সময় নিজেই নিজেকে বলেন— বয়স একটি সংখ্যামাত্র। তাকে আপনার আগ্রহ যাচনা স্বপ্ন ও দুঃসাহসের ভেলায় সহযাত্রী করেন ও সজ্জায় সজ্জায় সাজিয়ে নেন। তার নাম ছিল নম্রতা, আপনি ডাকেন পূর্ণতা। আপনি তাকে নিয়ে কবিতা লিখেছেন— ‘কোথায় তুমি পূর্ণতা এখন/আবাসে না ক্যাম্পাসে?/বিভাগে তুমি আছো নাকি ছবি আঁকার কেলাসে?’ তারপর তার মুখেই জবাব তুলছেন— ‘থাকি আমি যেখানেই/সন্ধ্যাবেলা দেখা হবে/বোজা চোখে অনেক ছবি আঁকব আমি/তুমি যখন কাব্য নেবে।’ তারপর আপনি হতাশ হয়ে বলছেন— ‘এত দেরি করলে পাগল/কবিতা তো পড়েই ফেললাম!’ মাথার চুল ছিঁড়ে সে জবাব দিচ্ছে— ‘সাজেসজ্জায় সময় খেয়ে/আমিও বা কী কল্পাম।’ আপনি বলছেন— ‘সে থাকে প্রকৃতির মতো/তার আবার সজ্জা কী!’ আমার পঁচিশ বছরের বান্ধবীর মুখের ভেতর হাত ঢুকিয়ে আপনি জবাব বার করে আনছেন— ‘ভাবনায় যার স্বপ্নসমুদ্র/তার আবার দোষটি কী!’

বলুন, আপনি এসব লেখেননি? আপনার গল্পের নায়িকা শোভা কিংবা প্রভা অথবা পর্ণা কিংবা স্বর্ণার মুখে বার বার প্রায় একই স্বাদের সংলাপ আপনি তুলে দেননি— সংসারে তুমি কেন অত আগে এলে প্রভু, আমি নামলাম কেন এত পরে! তারপর আমি হেসে হেসে জিজ্ঞেস করলাম— এখন তাহলে কী করবে? আপনার বুকে গুটি গুটি মুঠি ফেলে পূর্ণতা কেঁদে কেঁদে বলল— বিধাতাকে শান্তি দেব। তার অঙ্ক সব ভুলিয়ে দেব। ঠিক কিনা বলুন।

: এতসব কথা আমাকে মানতে হবে! নিরাপত্তার চিন্তা না করেই!

: মানতে হবে না। জানা জিনিস মানাতে হয় না।

: আপনাদের মধ্যে শেষ দেখা হবে হয়েছে?

: হুগুথানেক আগে। এক কবিতা পাঠের অনুষ্ঠানে। আমরা দুজনই ছিলাম সেখানে। একেবারে শেষ সারিতে। আপনি দেখতে পাননি। আমাদের প্ল্যানও ছিল তাই। পূর্ণতার খুব কষ্ট হচ্ছিল, তবু আমরা পূর্ণ করছিলাম। আপনি স্টেজ থেকে নামার আগেই আমরা সরে পড়েছিলাম। রিকশায় আমার বান্ধবী একটি শব্দও বলেনি।

: আমি একটি কবিতা পড়েছিলাম খুব ছোট। কবিনামহীন, শিরোনামহীন। বাজারের ঠোঙ্গায় কুড়িয়ে পাওয়া।

: আমার পুরো মনে নেই, তবে কয়েকটি পঙ্ক্তি

কানে লেগে আছে। ‘তোমার যে বান্ধবীটি রোজ/তোমার চিঠি পৌছে দিত আমার কাছে/সে এখন আমার স্ত্রী।/... চিঠি পৌছে দেয়ার সময়/সে তোমার খুব প্রশংসা করত/আর বলত— আমার বান্ধবী/আপনাকে যতটুকু ভালোবাসে,/আপনি তাকে তার/কগাটুকুও বাসেন না/... অথচ এখন চুপিসারে/তোমার প্রসঙ্গ এলে/সে বড় চুপসে যায়/আর তীব্রস্বরে বলে—/তুমি এখনো আমার বান্ধবীকে/যতটা ভালোবাসো/আমাকে তার কগাটুকুও বাসো না।’

কী, মোটামুটি ঠিক বলতে পারলাম?

: মোটামুটি নয়, পুরোপুরি।

: রিকশা থেকে নামার সময় কবিতার প্রসঙ্গ তুলে পূর্ণতাকে যখন বললাম— আমি যদি হতে পারতাম সেই পত্রবাহিকা, আপনার শ্রেণিকক্ষের একদাশিক্ষার্থী আমাকে কী বলল, জানেন?

: কী বলল?

: বলল— যা হারামি, তোকে দিয়ে দিলাম, নিয়ে যা, ঠ্যালা বোঝ।





প্রবন্ধ

সাহিত্যে সওদাগরবৃত্তি

ড. রাশিদ আসকারী

বলা যায়, এ যুগে আধিপত্য পুঁজির। ক্যাপিটালই আধুনিক যুগ ও জগতের সব দণ্ডমুণ্ডের হর্তাকর্তা। বর্তমান 'সভ্যতার' মূর্তিমান বিধাতা। সমকালীন সমাজের জীবন্ত ঈশ্বর। মুমূর্ষুপ্রায় সমাজতান্ত্রিক বিশেষর কথা স্মরণ রেখেই বলছি, আজকের গ্রহে তেমন দেশটি কোথায় খুঁজে পাওয়া যাবে না, যা পুঁজিতন্ত্রের প্রভাব বলয়ের বাইরে। আর শুধু গ্রহেই বা কেন, গ্রহান্তরেও পুঁজির নজর পড়েছে। হাজারো অমঙ্গলের আশঙ্কা অগ্রাহ্য করে মঙ্গলের (মঙ্গল গ্রহ) খোঁজখবর নিচ্ছে পুঁজিওয়ালাদের ভাড়াটে বিজ্ঞানীরা। ত্রিভুবনেই পুঁজির জয়জয়কার। জল-স্থূল-অন্তরীক্ষ পুঁজির করায়ত্ত। মহাশূন্যে পুঁজির নভো-বিহার; ভূতলে প্রবল পরাক্রম; পাতালেও পদচারণা। এত দৃষ্টান্ত আশা করি এ

সামান্যিকরণকে হেতুভাসের আশঙ্কামুক্ত রাখবে যে, পুঁজিই হাল দুনিয়ার প্রধানতম নিয়ামক। সর্বশক্তিমান; সর্বব্যাপী। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর আধুনিক সভ্যতায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিও পুঁজির নিয়ন্ত্রণের বাইরে নয়। বরং তারা পুঁজিরই কৃতদাস। নিজের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তারা আলাদিনী জাদু চেরাগের মতো দৈত্যের পুঁজির অঙ্গুলি হেলনে পরিচালিত হচ্ছে। পুঁজিনির্ভর এই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জন্ম দিচ্ছে ফরমায়েশি যন্ত্র সভ্যতা, যা দায়বদ্ধ পুঁজিরই তল্লিবাহক হিসেবে। বর্ধিষ্ণু প্রযুক্তি মানেই বর্ধিষ্ণু যন্ত্র-যন্ত্রী কিংবা কৌশল। আবার বর্ধিষ্ণু যন্ত্র-যন্ত্রী-কৌশল মানেই বর্ধিষ্ণু পুঁজি। অতএব ঘুরে-ফিরে ওই পুঁজি পুঁজি আর পুঁজি। এভাবে সমাজের মূল কাঠামো (Basic struc-

ture) যদি পুঁজির কাঁধের ওপর ভর দিয়ে তাবেদারি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির হাত ধরে কোনোমতে দাঁড়িয়ে যন্ত্র সভ্যতার মতো নিষ্প্রাণ অন্তঃসারশূন্য উপরি কাঠামো (super structure) ধারণ করে থাকে তাহলে সে সমাজের আর্ট-কালচারের চেহারা কেমন হবে তা ঠাहर করতে মোটেই অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। কারণ সমাজব্যবস্থার মূল কাঠামোর ওপর ভিত্তি করে রচিত হয় এর উপরি কাঠামো। মূল কাঠামো আবার গড়ে ওঠে অর্থনীতির ওপর অর্থাৎ উৎপাদন ও বণ্টনব্যবস্থার ধরনের ওপর। সেদিক থেকে সমাজব্যবস্থার বুনয়াদ হলো অর্থনৈতিক প্রকৃতি আর শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি-ধর্ম প্রভৃতি উপরি কাঠামোর অন্তর্গত যা অনিবার্যভাবে মূল কাঠামো অর্থাৎ অর্থনৈতিকব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীল। অতএব কোনো সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো বা মূল কাঠামো যদি পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীল হয় তার উপরি কাঠামো হবে পুঁজিজাত। আর্ট-কালচার হবে পুঁজিতান্ত্রিক আর্ট-কালচার। আর হয়েছেও ঠিক তাই। অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান-চিকিৎসা ও শিক্ষাবিষয়ক প্রপঞ্চগুলো বলতে গেলে নির্বিবাদে পুঁজির গোলামি মেনে নিয়েছে। একইভাবে বিশুদ্ধ আনন্দ লাভেরও মাধ্যম আর্ট-কালচারের বিষয়গুলোর ওপরও চলছে পুঁজির খবরদারি। আর চলবেই না বা কেন? পুঁজির জাদুকরি স্পর্শ চুম্বকের মতো আকর্ষণ করছে আর্ট-কালচারের প্রবক্তাদের। তারাই হন্যে হয়ে ঘুরছে পুঁজির পেছনে পেছনে। ফলে শিল্প পূরণ করছে পুঁজির চাহিদা। সাহিত্য ব্যবহৃত হচ্ছে পুঁজিবুদ্ধির মাধ্যম হিসেবে। মনন হয়ে পড়েছে সওদাগরি। বাণিজ্যবুদ্ধি হয়ে পড়েছে সংস্কৃতির নিয়ামক। আর এসব কিছুই বর্ধিষ্ণু পুঁজির কারণে। সমাজের মূল কাঠামোর কারণে। পুঁজিবাদী সমাজের বুনয়াদ কাঠামোর ওপর গড়ে উঠছে মোসাহেবি শিল্প, সওদাগরি সাহিত্য আর অর্থকরী সংস্কৃতি। স্থূলকায় পুঁজিকঠামোর ওপর বেটপভাবে গড়ে উঠছে ভারসাম্যহীন কৃশকায় শিল্প, রত্ন সাহিত্যে আর অসুস্থ সংস্কৃতি। আর শুধু এ যুগেই নয়, সব যুগেই উৎপাদিকা শক্তি আর উৎপাদন সম্পর্কের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত মূল কাঠামোর ওপর ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে সে সমাজের উপরি কাঠামো, যেখানে এই শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির বাস। যুগে যুগে মূল কাঠামোর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয় উপরি কাঠামো, আর সেই পরিবর্তন ছাপ ফেলে শিল্প-সাহিত্যের মন-মেজাজে। এভাবে কালভেদে শিল্পচারিত্র পরিবর্তিত হয়। এমনকি একই লেখকের লেখাতেও যুগান্তরের চিহ্ন লক্ষণীয়। প্রাচীন-মধ্য ও আধুনিক যুগের শিল্প-সাহিত্যের ভেতরেও তাই বিস্তর ব্যবধান। রেনেসাঁ-পূর্ব ও রেনেসাঁ-উত্তর সাহিত্যে সে কারণেই উল্লেখযোগ্য রূপান্তরের ছাপ পাওয়া গেছে। আমাদের বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রেও কাল বিবর্তনের ফলে আঙ্গিক ও ভাব বিবর্তনের ধারাটি স্পষ্ট। তাই বলে, সাহিত্যক্ষেত্রে যুগান্তরের বা কালান্তরের সঙ্গে সঙ্গে ভাবান্তর বা অঙ্গান্তরের সূত্রটি কোনো অপরিবর্তনীয় সাধারণ সূত্র নয়। এর ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্তও নেহাত কম নেই। যুগের শেকলে বন্দি থেকেও অনেকে যুগোত্তীর্ণ শিল্পের জন্ম দিয়েছে। কালজয়ী সাহিত্যে সৃষ্টি করেছে। প্রথার বৃত্তে আবর্তন করেও অনেকে কক্ষপথ পরিবর্তন করেছে।

বৃত্ত ভেঙে বেরিয়ে পড়েছে যুগহীন-কালহীন-প্রথাহীন স্বাধীন ভুবনে। তাদের মহান সৃষ্টিকর্মকে স্রেফ দ্বন্দ্ববাদী সমাজ কাঠামো তত্ত্বের নিরিখে দেখা হলে ডাहा অবিচার করা হবে। খ্রিস্টের বহুকাল আগে জন্মেও প্রোটোগোয়াস মানবতন্ত্রের মূলসূত্র সৃষ্টির জন্য সদাধুনিক। নির্মোহ ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি পোষণের কারণে রোমক নাট্যকার সেনেকা আজ পর্যন্ত সমাদৃত। প্রথাবিরোধী স্বাধীন ব্যক্তিস্বাতন্ত্রিক মননচর্চার জন্য সক্রেটিস, প্লেটো, অ্যারিস্টটল কালজয়ী। আজীবন সামন্ত কাঠামোর ভেতরে বন্দি থেকেও রুশো-ভলতেয়ারেরা দিয়ে যেতে পেরেছেন মানবমুক্তির মহাসনদ। পুঁজির জল হওয়ায় বেড়ে ওঠা মার্কস-এঙ্গেলস রচনা করতে পেরেছেন পুঁজিবাদের সমাধি গ্রন্থ উপহার দিতে পেরেছেন সাম্যবাদের মহা-ইশতেহার। কোয়েমি যুগধর্ম এসব মহান সৃষ্টি আর অমর স্রষ্টাকে প্রভাবিত করতে পেরেছে কিনা জানিনা তবে দলে ভেড়াতে যে পারেনি, সে ব্যাপারে গ্যারান্টি দেয়া যায়। না হলে আধুনিক মন-মগজ-মনন এদের নিয়ে এত টানাটানি করত না। এরা সময় প্রফ। অতীতে জন্মেও এদের সৃষ্টি আধুনিক আছে এবং থাকবে সৃষ্টিশীলতার জন্য, প্রথাবিরোধিতার জন্য, মননধর্মিতার জন্য, আধুনিক কালেও এজাতীয় অমর শিল্প-সাহিত্যের হৃদয় দুলক্ষ্য নয়। যদিও আধুনিক যুগের শিল্প-সংস্কৃতিতে পুঁজির অযাচিত অভিভাবকত্ব স্পষ্ট; সওদাগরি মনোবৃত্তি ও বাণিজ্যবুদ্ধি যদিও এ যুগের অন্যান্য বিষয়ের মতো শিল্পাঞ্চলেও জায়গা করে নিয়েছে; যদিও বাণিজ্যিকীকরণ হয়েছে সাহিত্যের; তবুও পুঁজির দৌর্দণ্ডপ্রতাপকে অগ্রাহ্য করে পুঁজিরই ছত্রছায়ায় রচিত হয়েছে পুঁজিবিরোধী শিল্প-সাহিত্য। আরোপিত পুঁজিবাদী শিল্প-সাহিত্যের পাশে সর্গের মুখ উঁচু করে দাঁড়িয়েছে স্বতঃস্ফূর্ত অপুঁজিবাদী শিল্প-সাহিত্যে। আর সেজন্য সমাজের মূল কাঠামোর দুলক্ষ্য বৃত্ত ভেঙে বেরোতে হয়েছে কিছু অকুতোভয় প্রথাবিরোধী মানুষকে। প্রমিথিউস স্পৃহা নিয়ে এরা এদের শিল্পকর্মে একে একে ভেঙে ফেলেছেন পুঁজির সব বন্ধন। পুঁজির শোচনীয় পরাজয় ঘটেছে মূলত এসব মহান শিল্পী-সাহিত্যিকের হাতে। সমকালীন ভাড়াটে শিল্পী-সাহিত্যিকদের অনুসরণে পুঁজির ঘানটানা বলদ কিংবা চোখে ঠুলি পরা ঘোড়ার মতো যুগের অনুশাসনকে এরা গ্রাহ্য করেননি। চলমান পুঁজিবাদী সাহিত্য ধারাকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে এরা রচনা করেছেন মানুষের জন্য সাহিত্য। জীবনের জন্য সাহিত্য। এরা যুগকে অনুসরণ করেন না বরং অনুসৃত হন। আধুনিক বিশ্বসাহিত্যের বিভিন্ন এলাকায় চোখ বুলালেই কমবেশি এদের দেখা মিলবে। 'পুঁজিশ্রুতন্ত্র' এদের নিয়ন্ত্রণে সম্পূর্ণ ব্যর্থ। সওদাগরবৃত্তি কিংবা স্থূল বাণিজ্যবুদ্ধি এদের মনন থেকে নির্বাসিত। এরা সৃজনপিয়াসী। এরা নেশাদার-পেশাদার নন। নমস্য এরাই। এবারে বাংলাদেশের সাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টি একটু খতিয়ে দেখা দরকার। বাংলাদেশের সাহিত্য বলতে সঙ্গত কারণেই এখানে স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা সাহিত্যকে বোঝানো হবে। এর বয়সও খুব একটা বেশি নয়। মাত্র তিন যুগের মতো। এই তিন যুগের গোড়ায় বাংলাদেশে যে ঐতিহাসিক ঘটনাটি ঘটেছে তার জন্য বাঙালিদের

দুই শতকেরও বেশি সময় অপেক্ষা করতে হয়েছে। পলাশির যুদ্ধ বাংলার ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ দুর্ঘটনা বলেই মুক্তিযুদ্ধ এ ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ ঘটনা। স্বাধীনতা বাঙালির জন্য শ্রেষ্ঠতম সুখবর। আর তাই বাংলা-বাঙালি-স্বাধীনতা-মুক্তিযুদ্ধ প্রভৃতি আমাদের আজকের শিল্প-সাহিত্যের কাঁচামাল জোগাবে সবচেয়ে বেশি। কারণ এযুগের শিল্প-সাহিত্যে যদি যুগধর্মের প্রভাব পড়তেই হয় তাহলে মুক্তিযুদ্ধের প্রভাবকে বাদ দিয়ে তার চিন্তা করা যায় না। মুক্তিযুদ্ধ বাঙালির চেতনার নতুন মেরুকরণ এনেছে। শত বছরের মনোদৈহিক গোলামির নাগপাশ থেকে মুক্ত করে এনেছে একদেশ মানুষকে। অতএব মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত মুক্ত মনন এ দেশের ললিতকলায় গভীর প্রভাব ফেলবে তাতে সন্দেহ কী? দুটি মহাসমরের কথাই ধরা যাক। পর পর সংঘটিত এ দুটি বিশ্বযুদ্ধ মানব অস্ত্রিকে সমস্ত করে তুলেছে। মানুষ বোধ করছে অসহায়, নিঃসঙ্গ এবং বিচ্ছিন্ন। এই সংশয়ে বোধ থেকেই জন্ম নিয়েছে আধুনিক মনন, আধুনিক সংবেদনশীলতা যার স্পষ্ট ছাপ পড়েছে সারা দুনিয়ার সমকালীন শিল্প-সাহিত্যে। বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিতে রচিত হয়েছে শ্রেষ্ঠ সাহিত্য, অঙ্কিত হয়েছে শ্রেষ্ঠ চিত্র, নির্মিত হয়েছে শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র। তদ্রূপ বাংলাদেশের শিল্প-সাহিত্যের ক্যানভাস হিসেবে মুক্তিযুদ্ধের চেয়ে বড় ঘটনা আর কী হতে পারে? অথচ মুক্তিযুদ্ধ কি আমাদের আজো উপহার দিতে পেরেছে শ্রেষ্ঠ সাহিত্য? শ্রেষ্ঠ শিল্প? শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতি? মনে হয় না। অবশ্য সেটি মুক্তিযুদ্ধের ব্যর্থতা নয়। সেটি আমাদের শিল্পী-সাহিত্যিকদের ব্যর্থতা। অবশ্য এ দেশে একেবারেই যে সুসাহিত্য চর্চা হচ্ছে না— এমনটি ভাবারও বোধহয় তেমন কোনো কারণ নেই। শত প্রতিকূলতার ভেতরেও কালে-ভদ্রে যে দু-চারখানা ভালো উপন্যাস লেখা হচ্ছে না, দু-একটি ভালো কবিতার বই বেরুচ্ছে না, কিংবা দু'একটি ভালো নাটক দেখা যাচ্ছে না— তাও নয়। তবে অ-সাহিত্য-কু-সাহিত্যের ভিড়ে সেগুলো খুঁজে পাওয়াই দায়। এর পেছনেও কারণ আছে। কাগজে-কলমে কিংবা দেখতে-শুনতে বাংলাদেশকে স্বাধীন মনে হলেও এর অর্থনীতি এখনো স্বাধীনতার স্বাদ ঠিক বুঝে উঠতে পারেনি। নানা কারণেই আজো দেশি-বিদেশি পুঁজি এ দেশের স্বাধীনতার কণ্ঠনালি চেপে ধরে আছে। বিশ্বব্যাংক কিংবা বিদেশি দাতা সংস্থা ছাড়া আমরা এখনো চলতে পারি না। এসব কারণে আমাদের সমাজের মূল কাঠামো দাঁড়িয়ে আছে পুঁজির ওপর ভর করে। পুঁজিবাদী বুনয়াদের ওপর গড়ে ওঠা শিল্প-সাহিত্যের ইমারত কেমন হবে তা সহজেই অনুমেয়। অপরিহার্যভাবে তাতে পড়বে পুঁজির প্রভাব। এ ধরনের শিল্প-সাহিত্যে সৃজনধর্মিতা লোপ পেয়ে সওদাগরবৃত্তির প্রকোপ প্রকট হয়ে পড়বে। পুঁজির এক বাণিজ্যিক প্রকাশ হয়ে দাঁড়াবে সাহিত্য কিংবা সাহিত্যকে খাটানো হবে মূলধন বাড়ানোর বণিকী কৌশল হিসেবে। যে সাহিত্যে এই শর্ত মেনে চলবে তা হবে অর্থকরী সাহিত্য। স্বভাবতই সেই অর্থকরী সাহিত্যে সুকুমারবৃত্তির চর্চা না হয়ে হবে সওদাগরবৃত্তির চর্চা। অন্য কথায়, এ জাতের সওদাগরি সাহিত্য শিল্পনৈতিক অঙ্গীকার পালন না করে করবে



বাণিজ্যিক অঙ্গীকার পালন। তা রচিত হবে মানুষের স্থূল রুচিবোধকে সুডুসুড়ি দিয়ে সস্তা বিনোদনের আনন্দ দেয়ার জন্য। নির্মল আনন্দ লাভ কিংবা বিশুদ্ধ শিল্পরস আশ্বাদন না করে পাঠকরা ইতর আনন্দে প্রশ্রয় পাবে। চর্চা হবে স্থূল রুচিবোধের। অন্যদিকে স্থূল রুচিবানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ায় এ ধরনের সাহিত্যের কদর বাড়তেই থাকবে। বাড়বে প্রকাশনা। বাড়বে মুনাফা। গড়ে উঠবে পুঁজির পাহাড়। উৎসাহিত হবে 'সাহিত্যিক'। উৎপাদিত হবে আরো সাহিত্য— টন-টন সাহিত্য। আর হয়েছেও তাই। সওদাগরি সাহিত্যের এই বিশাল উৎপাদন পাঠক-রুচিকে জিম্মি করে ফেলছে। খাওয়াচ্ছে কুরগিরি আফিম। নেশায় বুঁদ হয়ে পড়ে থাকছে পাঠককুল। সংক্রামিত হচ্ছে নেশা। মাদকসামগ্রীর মতো অবশ্য করে ফেলেছে তাদের রুচিবোধ। আর এভাবে চলতে থাকলে এমন এক সময় আসবে যখন দেশে সত্যিকার শিল্প-সাহিত্য বলে কোনো কিছুই অস্তিত্ব থাকবে না।

বাংলাদেশের সাহিত্যের অবস্থা অনেকটা সেরকমই। বিশুদ্ধ চারশিল্পের এলাকায় বাণিজ্যবুদ্ধি ঢুকে পড়েছে। সাহিত্য নিয়ে চলছে ব্যবসা। যে সাহিত্যের বাজারদর যত বেশি তাই তত মূল্যবান। যার বই বাজারে চলে বেশি সেই তত বড় সাহিত্যিক। তার পেছনে তত বেশি পুঁজি বিনিয়োগ করা হচ্ছে। প্রকাশকরা তার দরজায় ধরনা দিয়ে বসে থাকবে। রয়্যালটিও হয়তো অ্যাডভান্স দেয়া হয়েছে। প্রকাশিতব্য বইয়ের নামে বিজ্ঞাপনও বেরিয়েছে। কিন্তু লেখক মহোদয় হয়তো তখনো পট্টই মাথায় আনেননি। তাতে কী? সময়-সুযোগমতো একদিন পাঁচতারা হোটেলের বিলাসবহুল কক্ষ ভাড়া নিয়ে রাত জেগে তড়িঘড়ি করে পাণ্ডুলিপি রেডি করবেন। এরকম একরাতে পাণ্ডুলিপি লিখে শেষ করার ঘটনাও বিরল নয়। তারপর সর্বাধুনিক অফসেট প্রেসে বকবাকে ছাপায় আকর্ষণীয় প্রচ্ছদে বের হয় নতুন বই। রঙিন জ্যাকেট পরা বই। উৎপাদিত হয় ফরমায়েশি সাহিত্য। শুরু হয়ে যায় সেই সাহিত্যের বিপণন। বিজ্ঞাপনে বিজ্ঞাপনে আকর্ষণীয় করে তোলা হয় সে সাহিত্য। প্রকাশনা উৎসব করা হয় সাড়ম্বরে। একেবারে পুরো পুঁজিবাদী কায়দা। বড়রকমের পুঁজি লগ্নি করা হয় প্রকাশনা শিল্পে। ব্যবসা মার খেলে সে লেখকের বাজার পড়ে যায়। আর ঠিকমতো ব্যবসা হলে হু হু করে বেড়ে যায় তার দাম। এসব কারণে লেখক-সাহিত্যিকরা সাহিত্য-বাণিজ্যের ব্যাপারে একটু বেশি সজাগ। পাঠক খাবে না— এরকম একটি শব্দও তারা কলম ফেলে বেরোতে দেয় না। পাঠকের মনোরঞ্জনই যেন তাদের একমাত্র ব্রত। কিন্তু আসলে কি তাই? পাঠক পছন্দের মূল্য দেয়াই কি সব? অবশ্যই নয়। পাঠকের পছন্দ-অপছন্দকে তারা জিম্মি করে রেখেছে। অসাহিত্যের আফিম খাইয়ে পাঠকদের নেশাগ্রস্ত করে রাখা হয়েছে। কুসাহিত্যের সুডুসুড়ি দিয়ে উসকে দেয়া হচ্ছে তাদের স্থূল রুচিবোধ। নেশাবন্দি করে তাদের কাছ থেকে আত্মসাৎ করা হচ্ছে অর্থ।

এই হলো বাংলাদেশের অর্থকরী সাহিত্য যা মূলত নির্ভর করছে জনপ্রিয় লেখক, সর্বাধুনিক প্রকাশনা প্রযুক্তি, সফল বিপণন এবং সর্বাধিক বিক্রয়ের ওপর। পণ্যমূল্যই হয়ে উঠেছে সাহিত্যের

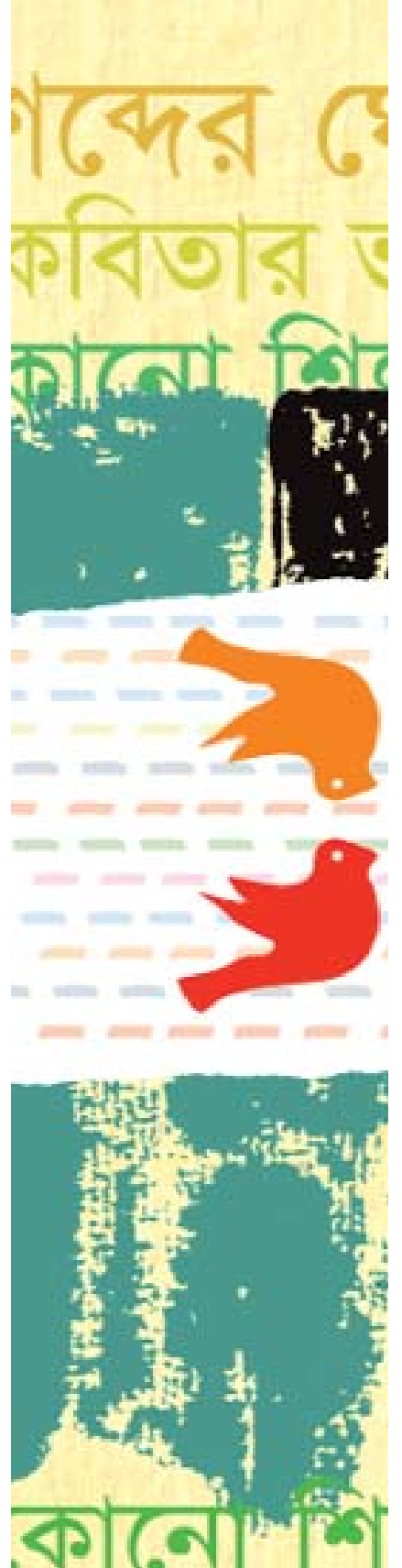
মানবিচারের নিয়ামক। যে সাহিত্যের পণ্যমূল্য নেই তা অনর্থকরী। সে সাহিত্যিকের কদর নেই, ব্যর্থ সাহিত্যিকের ভাত নেই। ধান-পাট-তামাক-চা প্রভৃতি অর্থকরী ফসলের বাজার ওঠা নামা করলেও এ দেশে অর্থকরী সাহিত্যের বাজার সর্বদাই রমরমা। বাজারমুখী হওয়ায় সঙ্গত কারণেই সাহিত্যিককে বাজারের চাহিদার ওপর লক্ষ্য রাখতে হয়, চাহিদা অনুযায়ী জোগান দিতে হয়, প্রমোদ উপকরণ। এই জোগানদাতা সাহিত্যিকদের সবাই যে নিম্নমানের তাও বলা যাবে না। উচ্চমানের অনেককেও অনেক সময়ে দেখা যায় পণ্য সাহিত্যে জোগান দিতে। নাম যশের পরিধি বাড়ানোর জন্য এরা অনেক সময় হালকা মানের উপাদেয় সাহিত্য সৃষ্টি করে গণমানুষের খাওয়ার জন্য। এরও চূড়ান্ত লক্ষ্য ব্যবসা। আসলে পুঁজিবাদী সমাজে সাহিত্যকে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ব্যবসা পণ্য হিসেবে উপযোগী হয়ে উঠতে হয়। বেশ সচেতনভাবেই পুঁজিনির্ভর সাহিত্য থেকে শিল্পমান কেটে-ছেঁটে বাণিজ্যমান বাড়ানো হয়। এটাই পুঁজিওয়ালাদের সাহিত্য ব্যবসা। ক্ষেত্রগুপ্তের ভাবনাতেও এর সমর্থন মেলে। তার ভাষায় : 'সাধারণভাবে এটা বুজোয়া যুগের একটা অর্থনীতি ঘটিত পরিস্থিতি। দেশভেদে, শিক্ষিতের সংখ্যা ও আর্থিক সংস্থান অনুযায়ী বাজার সাহিত্যের ওপরে, বিশেষ করে গল্প-উপন্যাসের ওপরে নিয়ন্ত্রণ ছড়িয়ে দেয়। [দ্র. ক্ষেত্রগুপ্ত : রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে সমাজতত্ত্ব]।

এভাবে সওদাগর সাহিত্যিকেরা ও তাদের পোষকমহল সাহিত্য বোচাকেনার মাধ্যমে পুঁজির পাহাড় গড়ে তুলছে। অন্যদিকে আবার সওদাগরি সাহিত্যের দাপটে সত্যিকার সাহিত্যের অবস্থা নিষ্পত্ত। অর্থের অভাবে সৃজনী ধারার কাজ করতে আগ্রহবোধ করেন না অনেক গুলী সাহিত্যিক। একান্ত নিজের গরজে কেউ কেউ করলেও পাণ্ডুলিপি তুলে পুস্তকত্ব লাভের সৌভাগ্য তাদের রচনার কপালে সহজে জোটে না। আর কোনোমতে জুটলেও প্রয়োজনীয় বিনিয়োগের অভাবে ওইসব পুস্তকের প্রকাশনা মান এবং বিপণন সুবিধা অপেক্ষাকৃত কম থাকায় প্রতিযোগিতার বাজারে টিকে থাকতে পারে না। সওদাগরি সাহিত্যে গ্রন্থের জলুসময় চেহারার পাশে অসহায়ভাবে ম্লান হয়ে থাকতে দেখা যায় সৃজনসাহিত্যের অনাকর্ষক গ্রন্থগুলোকে। তা ছাড়া স্থূল রস উৎপাদনের মাধ্যমে প্রমোদ উপকরণ সরবরাহে ব্যর্থ সাহিত্য বৃহত্তর পাঠক সমাজের মনতোষে ব্যর্থ হচ্ছে। ফলে তারা এ ধরনের ভাবগম্ভীর সাহিত্যকে বাতিল করছে। এতে সৃজনী সাহিত্যিকরা কিছুটা হলেও হারিয়ে ফেলছে লেখার আগ্রহ। আর একান্তই যারা প্রকাশব্যাকুল তাদের ঘরে জমে উঠছে পাণ্ডুলিপির বস্তা যা হয়তো কখনই ছাপাখানার মুখ দেখবে না। এভাবে কত বড় বড় সৃষ্টি যে অপ্রকাশ্য থেকে গেছে কিংবা যাচ্ছে তার হিসেবে করা সত্যিই দুরূহ।

সওদাগর সাহিত্যিকরা কেবল পুঁজির সেবাদাসই নয়, তারা কায়মি মহলের তাবেদারও বটে। সরকারি কিংবা অসরকারি কায়মি মহলের সঙ্গে গোপন শলাপরামর্শ করে সাহিত্যচর্চা করে বলে এরা তাদের নেকনজরে থাকে। ঘটা করে এদের লেখকত্বের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দেয়া হয় বিভিন্ন জাতীয় পুরস্কার প্রদানের মাধ্যমে। বিনিময়ে এই কর্তাজা

সাহিত্যিকের দল তাবেদারি সাহিত্য রচনা করে পোষকমহলের বন্দনা করে। এই বিশেষ মহল বন্দনা কিংবা ‘শ্রীসরকারকীর্তন’ আজকের বাংলা সাহিত্যের একটি লক্ষণীয় ধারা হয়ে উঠেছে। সরকার এবং পোষকমহল গোপনে সাহিত্যিকদের মাধ্যমে জনমনকে কায়েমি মূল্যবোধের দিকে ঠেলে দিতে চাইছে। এভাবে সাম্রাজ্যবাদী বা ফ্যাসিবাদী ধ্যান-ধারণার প্রচারে সওদাগরি সাহিত্য কাজ করছে একটি বিশৃঙ্খল অশৈল্পিক মাধ্যম হিসেবে। একটি অনুগত অললিতকলা হিসেবে। কারণ যথার্থ শিল্প কোনো নির্দেশ মানে না। খাঁটি ললিতকলা কোনো পরাভব মানে না। স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব শিল্প-সাহিত্যের বিকাশে একটি অনিবার্য প্রাথমিক শর্ত। এ দেশের সওদাগর লেখকদের অনেকে আবার একরাতে আস্ত একটা উপন্যাস লিখে গিনেস বুক নাম তোলার জোগাড় করেছেন। অনেকে জীবিকার পথ হিসেবে বেছে নিয়েছেন লেখালিখি। মানুষ যদি সেই লেখা না খায় তাহলে লেখকের চুলোয় হাঁড়ি চড়বে না। এদেরই রচনা মূলত সংখ্যাগুরু সরলমতি গণপাঠকের মনোখান্দ্য, আর সংখ্যাগুরুত্ব সুপাঠকত্বের কোনো আবশ্যিক শর্ত নয়। বরং এর উল্টোটা। অধিকাংশ পাঠক কখনই সুপাঠক নয়। তাই এদের খাদ্যও সুখাদ্য নয় তবে তা মুখরোচক। তাই ‘টক-ঝাল-মিষ্টি’ স্বাদের সাহিত্য এসব ‘অপাঠক’ দেনার গিলছে। আর চাহিদার অনুপাতে জোগান দেয়ার জন্য লেখকরাও শিল্প সাহিত্যের উৎপাদন বাড়িয়ে যাচ্ছে লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে অনেক বেশি। চাহিদা এবং জোগানের ওপর নির্ভর করে খোলা বাজারেই নির্ধারিত হচ্ছে এর দাম। সেদিক থেকে এই জাতের সাহিত্যকে ‘খোলাবাজার সাহিত্য’ বললেও বলা যায়। কারণ বাজারের শর্ত পালনে সমর্থ সাহিত্য উতরে যাচ্ছে, আর বাজারদর্শন পরিপন্থী সাহিত্য মার খাচ্ছে মনোপলি সওদাগরি সাহিত্যের হাতে। এটিই স্বাভাবিক। শিল্প-সাহিত্য সমাজের উপরি কাঠামোগত ব্যাপার হওয়ায় সঙ্গত কারণেই মূল কাঠামো হিসেবে খোলা বাজার অর্থনীতির একটি সাহিত্যিক বাইপ্রোডাক্ট হিসেবে বাজারে আসছে ‘খোলাবাজার সাহিত্য’। ‘অর্থকরী সাহিত্য’ কিংবা ‘সওদাগরি সাহিত্য’। আর এর প্রণেতারা হলো সওদাগর সাহিত্যিক। নীরদচন্দ্র চৌধুরী এ ধরনের সওদাগর সাহিত্যিককে কিংবা বণিক লেখককে অতি নিম্ন শ্রেণির একটি ভূগভোজী প্রাণীর সঙ্গে তুলনা করে তার লেখকবৃত্তি তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তার ভাষায় : ছাগলজাতীয় লেখক নিজের রুটির অপেক্ষা না রাখিয়া পাঠকরা যাহা পড়িতে চায় তাহাই লেখে ও ক্রমাগত সে ধরনের লেখাই লিখিয়া যায়। ... লেখাকে ছাগলজাতীয় লেখকের ‘প্রফেশন’ বা পেশা বলিতে হইবে। তাহাদিগকে পেশাদার লেখকও বলা হয়। [দ্র. আমার দেবোত্তর সম্পত্তি] এজাতীয় অর্থগুপ্ত লেখকের লেখার মূল উদ্দেশ্য যে অর্থোপার্জন নীরদ বাবুও তা স্বীকার করেছেন এবং বিলাত ও আমেরিকা মিলে বেশ কয়েকজন ছাগল লেখক ও বকরি লেখিকার (নীরদের ভাষায়) উপাত্ত দিয়েছেন। এ দেশের সাহিত্যঙ্গনও আজ ছাগল লেখক ও বকরি লেখিকা উপদ্রুত। মুক্ত বাজারের ‘হা-করা’

চাহিদা মেটাতে এরা বছর-বছর টন-টন সাহিত্য উৎপাদন করে যাচ্ছে। নতুন চাহিদা সৃষ্টির জন্য এর সঙ্গে মেশাচ্ছে আদিরসের মসলা। তা খাইয়ে পাঠকরুটিকে বিকৃত করে রাখা হচ্ছে। তাদের দিয়ে পড়িয়ে নেয়া হচ্ছে। পাঠকাগ্রহ বাড়ানো হচ্ছে। নতুন পাঠক সৃষ্টি করা হচ্ছে। এভাবে অত্যন্ত সুকৌশলে পাঠকদের এক্সপয়েট করা হচ্ছে। একে বলা যেতে পারে এক রকমের এক্সপয়েটেশন। ‘Literary exploitation’ সাহিত্যিক শোষণ। পুঁজিবাদী অসাহিত্য ব্যবহৃত হচ্ছে পাঠক শোষণের একটি হাতিয়ার হিসেবে। এ শোষণ আবার খুব সূক্ষ্ম শোষণ। কৌশলী প্রতারণামূলক শোষণ। এর শিকার হলো গণরুচিবোধ। এর থেকে নিস্তার পাওয়া দুরূহ। কারণ সংখ্যাগুরু সাধারণ পাঠকের নমনীয় রুচিবোধ এ ক্ষেত্রে পুঁজি-সাহিত্যের হাতে অসহায়ভাবে বন্দি। এই হলো সওদাগরি সাহিত্যের সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রভাব। প্রকৃতিতে তাবেদারি এবং লক্ষ্যে স্বার্থান্বেষী হওয়ায় এই সাহিত্যের পক্ষে মননশীলতা বা সৃজনশীলতার ধর্ম রক্ষা সম্ভবপর নয়। অথচ সাহিত্য পদবাচ্যকে অবশ্যই মনন কিংবা সৃজনধর্মী হতে হবে। মনন-সৃজনের অভাবে আমাদের সাহিত্যে আজ পচন ধরেছে। পচনশীল সাহিত্য আবার অতি সংক্রামক। তাই সাহিত্যের পচন ঠেকাতে না পারলে তা আজ না হোক কাল সাংস্কৃতিক মহামারী হিসেবে দেখা দেবে। কিন্তু কী করে এই ‘মহামারী’ রোধ করা যায়? এর জন্য তো কোনো প্রতিষেধক আবিস্কৃত হয়নি। তা ছাড়া এর বুনিয়াদ সমাজের মূল কাঠামোর সঙ্গে জড়িত। তবুও উপায় আছে। সমাজের মূল কাঠামো পরিবর্তনের আন্দোলনের মতো সাহিত্যের কাঠামো পরিবর্তনের আন্দোলন দরকার। এর প্রধান আবশ্যিক শর্ত হলো সাহিত্য-সচেতনতা। সাহিত্য হিসেবে চারুকলার এই মহান শাখাটির যে নান্দনিক-শৈল্পিক-জৈবনিক-সামাজিক প্রভুতি অঙ্গীকার আছে, তা বুঝতে হবে। এই বোধ থেকে উৎসারিত সচেতনতা শিল্পী-সাহিত্যিক ও লেখকদের মননশীল কিংবা সৃজনশীল করে তুলবে। তাদের ‘ছাগলত্ব’ ঘোচাবে। স্তূপীকৃত অপসাহিত্যের ভাগাড় থেকে সাহিত্যকে আলাদা করে আনবে। শ্রেণিচেতন্য যেমন সমাজ পরিবর্তনের জন্য অনিবার্য, শিল্পচেতন্য বা সাহিত্য চেতনা তেমনি সাহিত্য পরিবর্তনের জন্য অপরিহার্য। আজকের পুঁজির গোলামি থেকে সাহিত্যকে উদ্ধার করার জন্য দরকার একটি স্বতন্ত্র সংবেদনশীলতা গড়ে তোলা— যা অত্যন্ত সচেতনতাবেই দেশ ও কালের শৈল্পিক চাহিদা পূরণ করেও হবে দেশোত্তীর্ণ হবে কালজয়ী। সাহিত্য থেকে সওদাগরবৃত্তিকে নির্বাসন দিয়ে স্বাগত জানাবে মননধর্মিতা কিংবা সৃজনধর্মিতাকে। বাংলাদেশের সাহিত্য হবে বিশ্বসাহিত্যের এমনি এক অবিচ্ছেদ্য মাইক্রো রূপ, যা দৈশিক হয়েও বৈশ্বিক, ব্যাস্তিক হয়েও সামন্তিক, বাংলাদেশের হয়েও সব দেশের। এ ধরনের শিল্পের কাছে কিংবা জীবনের কাছে কমিটেড সাহিত্যের জন্য একটি বড় মাপের নতুন আন্দোলনের, একটি স্বতন্ত্র সাহিত্য সংবেদনশীলতার প্রত্নুতি নেয়া দরকার।





প্রকৃতি

নদী প্রসঙ্গ

ড. মুহাম্মদ সিদ্দিক

যদি নদীর প্রকৃতি সম্পর্কে বিশ্লেষণ করা যায়, বলতে হবে নদীর জীবন নির্ভর করে তিনটি বৈশিষ্ট্যের ওপর। এগুলো হলো— পৃথিবীর উপরিভাগের পানির প্রাপ্তি, জমিনে একটি প্রণালি পানি গড়াতে ও একটি এমন জমিন যা নিচের দিকে ঢালু। যখন থেকে পানি পৃথিবীর ভূমিতে গড়িয়ে চলছে, পানি-স্রোত ক্রমাগতভাবে জমিনকে ক্ষয় করে চলেছে। প্রাচীনতম কাল থেকে নদী জমিনের কিছু অংশে চষে বেড়ানোর মতো করে ছুটছে। নদীর ওপর প্রভাব এসেছে সাগর-মহাসাগরের, মহাদেশ ও মেরু অঞ্চলের অবস্থানের পরিবর্তনের, গরম-ঠাণ্ডা আবহাওয়ার, বর্ষা ও শুকনা মৌসুমের। পৃথিবীতে মানুষ আসার পরই নদী আকৃষ্ট করেছে

তাকে। কারণ নদী খাবার পানির অন্যতম উৎস, মানুষের অন্যতম খাদ্য মাছের বাসস্থান, আর যাযাবর মানুষের নৌকা বা ভেলার পথ। তবে সেই সঙ্গে প্রথম মানবগোষ্ঠী নদীর তীব্র স্রোত, বন্যা, গতিপথ পরিবর্তন, নদীর বিশালতা, গভীরতা ও পানির পরিমাণের কাছে কখনো কখনো ছিল অসহায়। নদী কখনো কখনো তার জন্য ছিল বাধা ও ভীতি। নদী যত বড় হতো, তত ছিল ভয়াবহতা, আর অনিশ্চয়তা।

মানুষ দুর্বল অবস্থা থেকে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও অভিজ্ঞতা দ্বারা শক্তি ও জ্ঞান সঞ্চয় করে নদীসহ প্রকৃতিকে ব্যবহার করা শিখল। তবে প্রকৃতির এসবই তো আল্লাহ মানুষের জন্যই সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ কোরআনে বলেন, ‘তারপর তিনি (আল্লাহ)

জমিনকে বিস্তৃত করেছেন, তার থেকে বরনা ও চারণভূমি বের করেছেন ও পর্বতকে দৃঢ়ভাবে প্রোথিত করেছেন (এসব) তোমাদের জন্য ও তোমাদের আনয়ামের (গৃহপালিত পশুর) ভোগের জন্য।’ (সূরা নাজিয়াত : ৩০-৩৩ আয়াত)। মানুষ প্রথমে পিপাসা নিবারণ ও মাছ ধরার জন্য নদীকে ব্যবহার করলেও, ধীরে ধীরে শিকল কীভাবে নদীকে আরো নানাভাবে ব্যবহার করা যায়। প্রাচ্যদেশে সভ্যতাগুলো তো নদীর ধারেই গড়ে উঠেছিল। তারা নদীর পানি ব্যবহার করেছিল বাঁধ দিয়ে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচকাজে। নীল নদের সভ্যতা, টাইগ্রিস-ইউফ্রেটিস-শাভিল আরব সভ্যতা, সিন্ধু সভ্যতা বিশ্ববিখ্যাত। এ ছাড়াও গঙ্গা, মেঘনা, টেমস, দানিউব, রাইন, ভলগাসহ নানা নদীর তীরে সভ্যতা গড়ে উঠেছে। নদী ব্যবহৃত হতে চলেছে জাহাজের পথ হিসেবে। নদীর ওপরে প্রথমে কাঠের ছোট পুল তৈরি হলেও এখন তো লোহা বা কংক্রিট নির্মিত বিশাল বিশাল পুল তৈরি হচ্ছে। নদীর পানিতে প্রথমে পানিচালিত কলকারখানা চালু ছিল। স্পেনের কর্ডোভা শহরের পাশে গোয়াদেলকুইভার নদীতীরে পানিচালিত কাগজের কল ছিল। স্থানটি আমার জ্ঞী ও আমি দেখেছিলাম। এখন তো নদীতে বিশাল বিশাল বাঁধ দিয়ে বিশাল ‘টারবাইন’ বসে অতিসস্তায় বিজলি তৈরি হচ্ছে বহু পাহাড়ি নদীতে। রাসায়নিক দ্রব্য তৈরিতে শিল্পে নদীর পানি ব্যবহৃত হচ্ছে। পারমাণবিক চুল্লির তাপ নিয়ন্ত্রণে রাখা হয় নদীর পানি ঢেলে। বহু উৎপাদনশীল কাজে নদীকে প্রচুর ব্যবহার করা হচ্ছে। মানুষের ইতিহাসে নদীর নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবহার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ফলে নদী নিয়ে প্রদেশে প্রদেশে (যেমন, ইন্ডিয়ায় নর্মদা নদী নিয়ে), দেশে দেশে (যেমন বাংলাদেশ বনাম ইন্ডিয়া, ইন্ডিয়া বনাম পাকিস্তান, ইসরাইল বনাম জর্ডান-সিরিয়া, ইরাক বনাম ইরান) ঝগড়া-বিবাদ চলেছে। কেউ কেউ বলেন, ভবিষ্যতে পানি নিয়ে ভীষণ বিবাদ, যুদ্ধ-বিগ্রহ শুরু হতে পারে বিশ্বে। আজকাল নদী নিয়ে অনেক উন্নত প্রযুক্তিগত কার্যক্রম হচ্ছে, এখন তো বাঁধ দিয়ে জলাশয় তৈরি করে পানিবিদ্যুৎ তৈরি করা হচ্ছে। অন্যদিকে বহুমুখী প্রকল্পও থাকে নদীকে নিয়ে। বাঁধ দিয়ে বিজলি উৎপাদন ছাড়া নদীতে পানি বৃদ্ধি করে নৌ চলাচলের সুবিধা এবং সেচকাজে নদীর পানির ব্যবহার—সবই চলতে পারে এ ব্যবস্থায়। ইন্ডিয়া তিস্তা নদী দিয়ে তাই করে চলেছে। বাঁধ দিয়ে পানি আটকে জনগণের পানের পানি সরবরাহ করা হয়; বাঁধ এলাকায় পর্যটনশিল্প পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। যা হোক, এ নদীগুলো মানুষের মঙ্গলের জন্য আল্লাহর দানবিশেষ। আমরা কোরআন মজিদ থেকে আর একটি আয়াতের উদ্ধৃতি দেব। আল্লাহ বলেন, ‘তিনিই আল্লাহ যিনি আকাশ ও পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন, যিনি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে তা দ্বারা তোমাদের জীবিকার জন্য ফলমূল উৎপাদন করেন, যিনি জলযানকে তোমাদের অধীন করেছেন যাতে তা তাঁর আদেশে সমুদ্রে বিচরণ করে, আর যিনি নদীকে করেছেন তোমাদের অধীন।’ (সূরা হুদ : ৩২ আয়াত)। উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা রয়েছে ‘সায়োন্সিফিক ইনভিকেশন্স ইন দ্য হলি কোরআন’ বইয়ে।

ইনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা, খণ্ড ১৫, পৃষ্ঠা ৮৬৭-৮৯১, ১৯৭৮ ইং থেকে তারা বৈজ্ঞানিক সূত্রও টেনেছে। উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ বলেছেন যে, তিনি নদী ও পানির যানবাহন অর্থাৎ জাহাজ-নৌকা প্রদান করেছেন মানুষকে তার ব্যবহারের জন্য। যদি কোনো বৃষ্টিপাত না হতো, কোনো বরফ না জমত পাহাড়ে, অথবা জমিনের ও সমুদ্রের উচ্চতা একই হতো অথবা পৃথিবীর তাপমাত্রা সব সময় জমানো অঙ্কের নিচে হতো, তাহলে কোনো নদীরই জন্ম হতো না। তাই তো আরব মরুভূমিতে, সাহ-রা মরুভূমিতে কোনো নদী নেই, গ্রহগুলোতেও নদী নেই। নদী দিয়ে কতটুকু পানি প্রবাহিত হবে তা নির্ভর করে কতটুকু পানি বৃষ্টিপাত হয়ে নদীর অববাহিকা এলাকায় পতিত হয়। গড়পড়তায় বৃষ্টিপাতের মাত্র এক পঞ্চমাংশ নদীতে বাহিত হয়। বাকি পানি বাষ্প হয়ে উড়ে যায় বা গাছ-গাছড়া টেনে নেয়। নদীর পানির পরিমাণ ও স্রোত নির্ভর করে জমিনের প্রকৃতির ওপর। খাড়া ঢাল আর শক্ত, দুর্ভেদ্য জমিন থাকলে পানির স্রোত বাড়ে। এসব এলাকায় বৃষ্টিপাত হলে স্রোত দ্রুত পরিবর্তিত হয়। যে জমিন নরম ও ভেদ্য সেখানে বৃষ্টিপাতের পানি জমিনের নিচে চলে যায়, ফলে পানি বাষ্পীভূত কম হয় সেখানে। শেষে এই জমিনের ভেতরের পানি নদীনালাতেই গিয়ে পড়ে বাষ্পীভূত না হয়ে। প্রবহমান নদীর পানি মাপতে নিয়ম হলো নদীর একটা বিশেষ পয়েন্টে পানি প্রবাহিত হলে একটা ইউনিট সময়ে যেমন প্রতি সেকেন্ডে কত কিউবিক ফুট পানি প্রবাহিত হলো, তাই হিসাবে ধরা হয়। সোজা কথায়, প্রতি সেকেন্ডে কত কিউবিক ফুট পানি। নদীর প্রবহমান পানির পরিমাণ কম-বেশি হয় সময় সময় কোনো বিশেষ পয়েন্টে বৃষ্টিপাতের কম-বেশির কারণে এবং সেই অববাহিকার বৈশিষ্ট্যের কারণে। নদীতে যে পলি পড়ে এর কারণ হলো, যখন স্রোতের গতির তীব্রতা এক সর্বনিম্ন পরিমাণের নিচে চলে যায়, তখন সেই ওজনের পলিকণা আর ভাসতে পারে না, চলতে পারে না, তখন নদীর বিছানায় পড়ে যায় ও এমনিভাবে জমতে থাকে। যখন নদী দুই কূলকে ভাসিয়ে নেয়, এভাবে হঠাৎ করে নদীর প্রস্থের বৃদ্ধির ফলে নদীর স্রোতের তীব্রতা হ্রাস হয়। এতে, নদী তার বোঝা নামিয়ে ফেলে। অন্যদিকে, বিরাট প্লাবন, উর্বর জমির উর্বরতা হ্রাস করে, কারণ প্লাবন এলাকায় বালি জমে। যে নদীতে ভাঙন ও পলি জমে পরিমিত তা হলো স্বাভাবিক ও সমতাসম্পন্ন। নদী ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য খুবই উপযোগী। এই সেদিন পর্যন্ত রেলপথ আবিষ্কার ও পাকা পথ নির্মাণ বৃদ্ধির আগ পর্যন্ত নদীপথই ছিল মূল পথ। বাংলা মূল্যের নদীপথ সেই প্রাচীন কাল থেকেই বিখ্যাত। এ নদীপথেই অবশ্য ইউরোপীয়রা বাংলার স্বাধীনতা হরণ করে। নদী উপত্যকা উর্বর হওয়ার ফলে প্রচুর লোক বসতিতে ধরা। জমিন এখানে উর্বর, আর নদীপথ নৌপরিবহনের উপযোগী। বাংলা ও মিসরের নদীগুলোর অবদান অপরিমিত। তাই এ দুই দেশ প্রাচীনকালে ছিল যথেষ্ট উন্নত। বিশ্বযুদ্ধের ইবনে বতুতা তার সফরনামায় লিখেছেন যে, তিনি দুটি দেশকে খুব সমৃদ্ধশালী পান; একটি হলো মিসর, অন্যটা বাংলা। দুটিই নদীবিশোধিত সমতলভূমি।

মানুষের গৃহস্থালি ও শিল্পসংক্রান্ত প্রয়োজনে পানির বড় উৎস হলো নদী। নদীর গুরুত্ব অর্থনীতিকে শক্তিশালী করে। নদীবিশোধিত এলাকা সবচেয়ে বেশি উর্বর। নদীতে রয়েছে কত ধরনের জলজ প্রাণী, যেমন মাছ, কাঁকড়া, ডলফিন, বিনুক, কুমির ইত্যাদি। এর অনেকই তো মানুষের প্রোটিনের জোগানদার। নদী তো নালা-নর্দমারও কাজ করে। নদীতে বর্জ্য ফেলে বর্জ্য সাফাই করা হয়। গঙ্গায় কত যে লাশভগ্ন মিশে নিষ্কাশিত হচ্ছে, তার ইয়ত্তা নেই। নদীতে শিল্পবর্জ্যই হোক বা অন্য প্রকারের, এতে অবশ্য প্রাকৃতিক ও পরিবেশগত বিপর্যয় আসে। এ পানি পান জীবনের জন্য হুমকি। নদীতে রয়েছে নানা জলজ উদ্ভিদ ও ক্ষুদ্র জীবাণু। এগুলো ভাসতে থাকে। এগুলোকে ছোট ছোট প্রাণী আহার হিসাবে খায়। সে ছোট প্রাণীগুলো আবার মাছের খাদ্য। নদীর জলজ উদ্ভিদ আবার মানুষের খাদ্য ও সার হিসেবেও ব্যবহার হয়। নদী মানব জীবনে প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করেছে। ইতিহাস, সাহিত্য, সঙ্গীত ও ধর্মে রয়েছে উল্লেখ ও গুরুত্ব। ভাগীরথী দিয়ে ইংরেজ বাংলা দখল করল। ফোরাতির কারবালা নিয়ে সাহিত্য গড়ে উঠেছে। পদ্মা-যমুনা-মেঘনা নিয়ে আমাদের সঙ্গীতজ্ঞতারা গীত রচনা করেছেন। গঙ্গামান হিন্দুধর্মে পবিত্র। সিন্ধু থেকে হিন্দু : সিন্ধু নদের নাম থেকে হিন্দু জাতি ও ধর্ম। তবে এ নামটি আরব ও পারস্যের লোকদের দেয়া, যা হিন্দুরা পরিত্যাগ করেনি। ড. আরএম দেবনাথ লিখেছেন, ‘হিন্দু’ শব্দটি কত প্রাচীন সে সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া কঠিন কিন্তু যে ‘সিন্ধু’ থেকে ‘হিন্দু’ নামের উৎপত্তি সেই সিন্ধু যে প্রাচীনতম তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তবে এটা ঠিক যে, হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ হিসেবে পরিচায়িত প্রাচীন বেদের কোথাও ‘হিন্দু’ শব্দের ব্যবহার নেই। (সিন্ধু থেকে হিন্দু : পৃষ্ঠা ৫৬-৫৭)। তিনি আরো লেখেন, ‘দীনেশচন্দ্র সেন তার গ্রন্থে (বৃহৎ বঙ্গ : দে’জ পাবলিশিং, ১৯৯৩) বলেছেন, সিন্ধু নদ থেকে ‘হিন্দু’ ও ‘হিন্দুস্থান’ প্রভৃতি শব্দ এসেছে। অন্য পণ্ডিতদের মতেও সিন্ধু নদ থেকে ‘হিন্দু’ নামের উৎপত্তি। ফারসিতে সিন্ধুর উচ্চারণ ‘হিন্দু’। ফারসি সাহিত্য ও ইতিহাসে তাই সিন্ধু নদের নাম ‘ইন্ডাজ’। এ কথা সুবিদিত যে, এই ‘ইন্ডাজ’ শব্দটিই পরবর্তীকালে ‘ইন্ডিয়া’ শব্দে রূপান্তরিত হয়। এ সূত্রেই হিন্দু অধ্যুষিত অঞ্চলের অধিবাসীদের ফারসি সাহিত্য ও ইতিহাসে ‘হিন্দুস্তানি’ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। বর্তমান ভারতের হিন্দিভাষী অঞ্চলের লোকেরা ধর্মবর্ণগোত্রনির্বিশেষে নিজেদের ‘হিন্দুস্থানি’ বলে পরিচয় দেয়। বলা বাহুল্য, মুসলমানরাও এর ব্যতিক্রম নয়। যদি ব্যতিক্রম হতো তাহলে পাকিস্তান রাষ্ট্রের স্বপ্নদ্রষ্টা ও বিখ্যাত দার্শনিক কবি ইকবাল ‘সারা জাহাঁসে আচ্ছা হিন্দুস্তা হামারা’ এই বিখ্যাত গান রচনা করতেন না।’ (পৃষ্ঠা ৫৭)।

নীরদ সি চৌধুরী তার ‘হিন্দুইজম : এ রিলিজিয়ন টু লিভ বাই’ (অক্সফোর্ড : ইন্ডিয়ান পেপার ব্যাকস, ১৯৯৬) গ্রন্থে বিভিন্ন শব্দের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেছেন, হিন্দুরাও নিজেদের পরিচয় দিতে গিয়ে ‘হিন্দু’ শব্দটি ব্যবহার করত না। শব্দটি তার মতে মুসলমান শাসক কর্তৃক ব্যবহৃত হতো। এ সূত্রে হিন্দুরাও ‘হিন্দু’ শব্দটি ব্যবহারের মাধ্যমে নিজেদের পরিচিত করতে থাকে।

অন্নদাশঙ্কর রায় তার ‘সংস্কৃতির বিবর্তন’ (বাণীশিল্প, কলকাতা, ১৯৮৯) গ্রন্থে লেখেন, ‘হিন্দি নামটি হিন্দুর মতই বাইরে থেকে আমদানি।’ অন্নদাশঙ্কর রায় আরো লেখেন, (পঞ্চাশ বছর পূর্তির পূর্বে নামক প্রবন্ধ : স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর: প্রবন্ধ সংগ্রহ) : হিন্দু ধর্ম বা ‘হিন্দুইজম’ শব্দটি ঊনবিংশ শতাব্দীর আগে কেউ ব্যবহার করেনি। জওহরলাল নেহরু (ভারত সন্ধানে : আনন্দ পাবলিশার্স : ১৯৯৫) হিন্দু শব্দ সম্পর্কে একই মন্তব্য করেছেন। তিনি লেখেন, প্রাচীন সাহিত্যে ‘হিন্দু’ শব্দটি একেবারেই নেই।

এ তো গেল এমন সব তথ্য যা প্রকাশ করে কীভাবে ‘সিন্ধু’ নামটি একটি ধর্ম, জাতি ও ভাষার পরিচায়ক হয়ে ওঠে। নদীর মাহাত্ম্যে কবি নজরুল ইসলাম : নদী যে সাহিত্যেরও উপাদান তা কাজী নজরুল ইসলামের সাহিত্যই প্রমাণস্বরূপ। ‘শাত্-ইল্-আরব’ কবিতায় কবি লেখেন, ‘শাতিল্-আরব। শাতিল্-আরব’ পূত যুগে যুগে তোমার তীর। শহীদেব লোহ, দিল্লীরেব খুন ঢেলেছে যেখানে আরব-বীর।

‘কৃত-আমারা’র রক্তে ভরিয়া দজলা এনেছে লোহর দরিয়া; উগারি’ সে খুন তোমাতে দজলা নাচে ভৈরব ‘মস্তানী’র ত্রস্তা-নীর গর্জে রক্ত-গঙ্গা ফোরাতে, – ‘শান্তি দিয়েছি গোস্তখীর।’ দজলা-ফোরাতে-বাহিনী শাতিল পূত যুগে যুগে তোমার তীর। জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম তার ‘মোহরুরম’ কবিতায় ফোরাতে নদীর প্রসঙ্গ এভাবে এনেছেন– ‘নীল সিয়া আসমান, লালে লাল দুনিয়া, – ‘আম্মা! লা’ল তেরি খুন কিয়া খুনিয়া।’ কাঁদে কোন ক্রন্দসী কারবালা ফোরাতে, সে কাঁদনে আসু আনে সীমারেরও ছোরাতে!” নদীসংক্রান্ত কবির আর একটি বিখ্যাত কবিতা হলো ‘খেয়া-পারের তরঙ্গী’ যাতে কবি লেখেন, ‘যাত্রীরা রান্তিরে হ’তে এল খেয়া পার, বজেরি তুর্যে এ গর্জেছে কে আবার?’ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নদী : বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নদী গুরুত্বপূর্ণ। এ দেশের দক্ষিণাঞ্চলের জনাই হয়েছে নদীগর্ভ থেকে। নদী ছাড়া বাংলাদেশকে কল্পনা করা যায় না। তবে বাংলাদেশ খুবই চাপের মুখে এ নদীগুলো নিয়ে। ৫৪টি অভিন্ন নদীতে ইন্ডিয়া নানা স্থানে ছোট-বড় বাঁধ দেয়ায় নিজে অবস্থিত বাংলাদেশ শুকনো মৌসুমে হাহাকারে উপনীত হচ্ছে। ফারাক্কা নিয়ে চুক্তি হলেও ফল নেই। পদ্মা শুকনো মৌসুমে হাড়িসার। অথচ একই সময়ে পশ্চিম বাংলায় ভাগীরথীর দুই কুল পানিতে টাইটমুর। আমার পরিবার ও আমি লক্ষ্য করেছি এটা মুর্শিদাবাদ, বহরমপুর, লালবাগে। কোনো কমতি নেই পানির সেখানে। উত্তর বাংলায় মরুক্রিয়া শুরু হয়েছে ফারাক্কার কারণে। ইউরোপের বহু নদীর সঙ্গে আমি প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত। কেউ পানি আটকায় না সেখানে। নদীগুলো সব দেশেই ভরপুর, যদিও একই নদী বিভিন্ন দেশে চুকেছে। তিস্তার প্রায় পুরো পানিই ইন্ডিয়া নিয়ে যাচ্ছে। সাবেক কূটনীতিক মোহাম্মদ জমির লিখলেন, গত সপ্তাহে তিস্তায় পানি এসেছে মাত্র ৩০০ কিউসেক, অথচ আসার কথা ৫০০১ কিউসেক। (দ্য ফাইন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেস, ২ মার্চ, ২০১৫)। এদিকে সুরমা-কুশিয়ারার দুর্দিন আসছে। ইন্ডিয়ার টিপাইমুখ বাঁধ বাংলাদেশে পূর্বাঞ্চলের মৃত্যুফাঁদ। ইন্ডিয়া যেভাবে নদীগুলো নিয়ে এগোচ্ছে তাতে সুজলা-সুফলা বাংলাদেশকে নিয়ে অন্য ধরনের কবিতা লিখতে হবে, হয়তো যেখানে মরুভূমির লু হাওয়ার মেজাজ মিলবে। পানির অভাবে দেশের ভেতরে অনেক নদীর অকালমৃত্যু হচ্ছে। ইন্ডিয়ায় নদীগুলোয় এভাবে বাঁধ দেয়া হলে শুধু পরিবেশ ও অর্থনীতিই বিপন্ন হবে না, নিচে অবস্থিত বাংলাদেশের, এ বাঁধগুলোকে সামরিক বোমা হিসেবেও ব্যবহার করা যাবে। প্রয়োজনে বাঁধ হঠাৎ খুলে দিলে বাংলাদেশ হাবুডুবু খাবে। এদিকে আমাদের দেশের কিছু নেতা (সবাই নন) ও উপদেষ্টা নদীসংক্রান্ত সমস্যা বোঝার চেষ্টাই করছেন না। এভাবে চললে বহু নদীর মৃত্যু আমাদের চোখের সামনেই হবে। উত্তর বাংলার করতোয়া এখন মৃত।





নাটক

একটি আষাড়ে স্বপ্ন

ড. মুকিদ চৌধুরী

প্রথম অধ্যায়

মণিপুরের রাজকুমারী চিত্রাঙ্গদা ও অর্জুনের প্রেম-প্রণয় চলছে। বিয়ের দিনক্ষণ এরই মধ্যে ধার্য করা হয়েছে। এখন তারা এরই প্রতীক্ষায়, যদিও বিকালটা বড় মনোরম। পরিপূর্ণ আলোয় চতুর্দিক উজ্জ্বল, তবে শুভ্র রোদের কোনো জ্বালা নেই, স্নিগ্ধ বাতাস বইছে মৃদুমনন্দ। পটভূমিকায় পাহাড়শ্রেণি স্পষ্ট দৃশ্যমান। আকাশ স্বেদহীন নীলাভ। অরণ্যের প্রতিটি বৃক্ষ ও লতাপাতা স্নানসিক্ত হয়েছে গত রাত, ফলে প্রকৃতির মধ্যে সকাল থেকে ধ্বনিত হচ্ছে আনন্দের কলম্বর। সব মিলে আজ সার্থক উৎসবের দিন। মণিপুর রাজপ্রাসাদের অলিন্দে আর্যবর্গ, সুপুরুষ, তীক্ষ্ণ নাশা মহাবীর অর্জুনসহ পারিষদ পরিবৃত হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন মণিপুরের

রাজকুমারী চিত্রাঙ্গদা। চিত্রাঙ্গদা তার রাজকর্মচারী কুলিমের উদ্দেশে বললেন, ‘যাও কুলিম প্রজাদের গিয়ে বলো, আমাদের শুভবিবাহ উদযাপনের জন্য তারা যেন প্রস্তুত থাকে। আমি চাই আনন্দে ভরে যাক আমার এই রাজ্য।’ রাজকর্মচারীসহ পারিষদ চলে গেলে অর্জুন তার প্রিয়তমাকে বললেন, ‘প্রিয়তমা, আমাদের শুভক্ষণ সমাগত। নতুন চাঁদ দেখা দেবে আগামী কাল। তবে কৃষ্ণক্ষের ক্ষয়ে যাওয়া চাঁদটির মতো আজকের দিনটিও যেন অতি আন্তেধীরে বিদায় নিচ্ছে। এই আন্তেধীরে ক্ষয়ে যাওয়া প্রতিটি মুহূর্ত যেন আমাকে শৃঙ্খলে আন্তেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে।’ ভোরের পাখিরা বাসার সন্ধানে সন্ধ্যায় ফিরলেই দিনটা বিদায় নেয়। চিত্রাঙ্গদা দূর আকাশে পাখির সন্ধান করতে করতে

বললেন, 'প্রিয়, আর তো মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যাপার। রাত তো স্বপ্ন দেখেই কেটে যাবে। বোঝাই যাবে না কী করে কী হলো!' চিত্রাঙ্গদার কথা অর্জুনের খুব পছন্দ হলো। তাই বললেন, 'প্রিয়তমা, বনবাসের তিক্ত অভিজ্ঞতা নিয়েই আমি তোমাকে বরণ করেছি। তাই বলতে পারি, তোমাকে পেয়ে আমি অপূর্ণতার পরিপূর্ণতা লাভ করেছি। তোমাকে বন্দি করে রেখেছি আপন হিয়ার মাঝে, কৃষ্ণবন্ধন মথিত প্রেমডোরে। এবার তোমার প্রেমে আপ্ত হয়ে ভরে উঠুক আমাদের জীবনও উৎসবে, আনন্দে।' তারপর দুজনে অনেকক্ষণ রাজপ্রাসাদের অলিন্দে ঘুরে বেড়ালেন। একসময় তারা মানুষের পায়ের শব্দ পেলেন। একজন নয়, কয়েকজনের। চিত্রাঙ্গদা ও অর্জুন ঘুরে দাঁড়ালেন। তখনই কুলিম কাছে এসে বলল, 'উজির মনু মনুর কন্যা মেঘবন, সেনাপতির পুত্র লিন্দুচন্দ্র ও রাজকবিরাজের পুত্র আদিত্য আপনার দর্শন প্রার্থী, রাজকুমারী চিত্রাঙ্গদা।' কুণ্ঠিত ক্রম সোজা করে চিত্রাঙ্গদা উত্তর দিলেন, 'তাদের নিয়ে এসো রাজসভা কক্ষে।'

রাজসভা নিস্তন্ধ, তবে সিংহাসন আলো করে বসলেন রাজকুমারী চিত্রাঙ্গদা। পাহাড়ের চূড়ায় বরফের ওপর সূর্যের সোনালি আভা পড়লে যেমনি দেখায়, ঠিক তেমনি দেখাচ্ছে তাকে। অর্জুন বেশ কয়েক পালক তাকিয়ে রইলেন চিত্রাঙ্গদার দিকে। একঝলক তার মনে পড়ল দ্রৌপদীকে, যদিও তার সঙ্গে চিত্রাঙ্গদার কোনো মিল নেই। চিত্রাঙ্গদা অনর্থক দ্রৌপদীর মতন হাসেন না, চোখের কোণে কোনো লুকানো ইঙ্গিতও নেই। ভিত্তি ভিত্তি কোনো ভাব নেই তার। তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীন। যখন ইচ্ছে যা করার তাই করেন। চিত্রাঙ্গদার বীরত্ব-সৌন্দর্যের তরঙ্গই তাকে স্পর্শ করল। উজির মনু রাজসভা কক্ষে প্রবেশ করে বললেন, 'আমাদের প্রিয় রাজকুমারী চিত্রাঙ্গদা দীর্ঘজীবী হোন।' চিত্রাঙ্গদা জিজ্ঞেস করলেন, 'ধন্যবাদ, আমার প্রিয় উজির। কী সংবাদ নিয়ে এসেছেন এখানে এই সময়?' মনু বললেন, 'বীরঙ্গনা, ক্ষোভ সহকারে আমি আমার কন্যা মেঘবনের বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে আপনার সম্মুখে উপস্থিত হয়েছি।' চিত্রাঙ্গদা বললেন, 'কীসের অভিযোগ আমার সুপ্রিয় উজির?' মনু উত্তর দিলেন, 'আদিত্যের সঙ্গে মেঘবনের বিয়ে দিতে সংকল্প করেছিলাম, কিন্তু লিন্দুচন্দ্র বাধা দিচ্ছে।'

স্মিতহাস্যে অর্জুন দেখতে লাগলেন উজির মনুকে। তাকে দেখতে দেখতে অর্জুনের মনে হলো, এ-এক কৌতুকজনক ব্যাপার। একটু পরে তিনি বললেন, 'এ তো জটিল ব্যাপার!' তারপর তাকালেন মেঘবনের দিকে। মেঘবনের শুধু চেহারা কিংবা পোশাকের জন্যই নয়, তার ব্যক্তিত্বও এমন এক আকর্ষণ আছে, যার জন্য যেকোনও পুরুষ চোখ ফেরাতে পারে না। তাই হয়তো অর্জুন বললেন, 'এগিয়ে এসো মেঘবন। আদিত্য ও লিন্দুচন্দ্রও এগিয়ে এসো।' ওরা এগিয়ে আসতেই উজির মনু বললেন, 'লিন্দুচন্দ্র জাদুর সাহায্যে প্রেমমোহ সৃষ্টি করে মেঘবনকে মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছে। সে আমার মেয়েকে কবিতা লিখে পাঠায়। প্রেমোপহার আদানপ্রদান করে। চাঁদনি রাতে মেঘবনকে নানা রকম গান শোনায়।' সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যে

হ্যাংলামি ও হীনবোধ প্রকট উপলব্ধি করেই হয়তো-বা অর্জুন বললেন, 'বুঝতে পারছি, এসব করেই মেঘবনকে স্বপ্নাবিষ্টে মোহাচ্ছন্ন করেছে লিন্দুচন্দ্র।' সঙ্গে সঙ্গে মনু উত্তর দিলেন, 'ঠিকই বলেছেন, সে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে মেঘবনের মনকে হরণ করেছে।' চিত্রাঙ্গদা উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'লিন্দুচন্দ্র, তোমার চাতুর্যপূর্ণ ক্রয়াকলাপেই মেঘবনের মতো কোমলমতি মেয়ের চোখে তুমি প্রেমময় হয়ে ধরা পড়েছ।' সঙ্গে সঙ্গে অর্জুন বললেন, 'ছলনার সাহায্যেই তুমি মেঘবনের হৃদয়কে গ্রাস করেছ। মোহাবিষ্ট করে রেখেছ।' মনুর মনও বিদ্রোহী হয়ে ওঠে, তাই বললেন, 'লিন্দুচন্দ্রের কারণেই মেঘবন আজ আমার অবাধ্য ও একগুঁয়েমি হয়ে উঠেছে। দিন দিন তা বৃদ্ধি পাচ্ছে। রাজকুমারী চিত্রাঙ্গদা, আজ আমি অসহায় পিতা হয়ে আপনার কাছে উপস্থিত হয়েছি।' চিত্রাঙ্গদা বললেন, 'আমার কাছে আসার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।' আর ভ্রমণবিলাসী অর্জুন বললেন, 'রাজকুমারী চিত্রাঙ্গদার কাছে আপনার আবেদনটি কী তা আমি বুঝতে পারিনি। অনুগ্রহ করে তা কী ব্যক্ত করবেন?'

মনু বললেন, 'আমার আবেদন এই যে, মেঘবন আদিত্যকে বিয়ে করবে কী না তা স্পষ্ট করে বলে দিক।' চিত্রাঙ্গদা একমত হয়ে বললেন, 'ঠিক আছে।' কিন্তু মনুকে প্রশ্ন করলেন অর্জুন, 'তবে সে যদি আপনার মনোনীত পাত্রের সঙ্গে বিয়ে করতে অস্বীকার করে, তাহলে?' সঙ্গে সঙ্গে মনু উত্তর দিলেন, 'তাহলে রাজ্যের নিয়ম অনুসারে ওর বিচার করা হবে।' চিত্রাঙ্গদা মণিপুর রাজকুমারীর কণ্ঠে বললেন, 'আমি সাধারণত তা-ই করে থাকি। রাজ্যের নিয়মানুযায়ীই শাসনকার্য পরিচালনা করে থাকি।' অর্জুন বললেন, 'তবে রাজ্যের প্রথা অনুযায়ী উজির মনু তার মেয়েকে যেখানে খুশি সেখানেই বিয়ে দিতে পারেন, কেউ কিছু বলতে পারবে না। এমনকি রাজকুমারীও না।'

মনু মিনতির সুরে বললেন, 'তবুও অনুরোধ, রাজকুমারী চিত্রাঙ্গদা ওর শাস্তি নির্ধারণ করুন।' চিত্রাঙ্গদা এগিয়ে এলেন মেঘবনের দিকে। মেঘবনকে দেখতে দেখতে তার মনে হল, দীঘি থেকে এক পদ্ম যেন সদ্য তুলে আনা হয়েছে। তাই লেহের কণ্ঠে বললেন, 'মেঘবন, ভালোভাবে চিন্তা করে দেখো, তোমার অন্তিমের জন্য তোমার পিতাই প্রসংশা যোগ্য, তাই তাকে তোমার অমান্য করা উচিত নয়।' 'ধন্যবাদও জানানো আবশ্যক।' যোগ করলেন অর্জুন। অর্জুনের কথায় কান না দিয়ে চিত্রাঙ্গদা বলে চললেন, 'তুমি তার হাতে গড়া এক রূপবতী প্রতিমা। তিনি ইচ্ছে করলে যেকোনও মুহূর্তে তা ভেঙে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারেন। তাই মেঘবন তোমাকে তোমার বাবার প্রস্তাবটি উত্তমরূপে বিবেচনা করে দেখা উচিত। দ্বিমত পোষণ করা বরং অন্যায়ই বটে।' আগের কথায় সারা না পেয়ে, মেঘবনের কাছে এগিয়ে এসে, সৌন্দর্যপিয়াসী অর্জুন বললেন, 'মেঘবন তোমার কী অভিমত? তবে আমার দৃষ্টিতে, আদিত্য একজন সুপুরুষ ও তোমার জন্য যোগ্য পাত্রই বটে।' অভিমানের সঙ্গে মেঘবন বলল, 'আদিত্যের চেয়ে লিন্দুচন্দ্রও কোনো অংশে কম নয়।' স্মিত হেসে চিত্রাঙ্গদা বললেন, 'স্বীকার করছি। কিন্তু বর্তমান

পরিস্থিতিতে উজির মনু যখন লিন্দুচন্দ্রের প্রতি বিরূপ ধারণা পোষণ করছেন, তখন আদিত্যই তোমার জন্য একমাত্র সুপুরুষ ও যোগ্য পাত্র।' মেঘবন বলল, 'আমার আফসোস এই যে, আমার পিতা যদি আমার মনের কথা বুঝতেন।' চিত্রাঙ্গদা বললেন, 'না, বরং তুমি তার ইচ্ছানুযায়ী কাজ করবে। তার কথা সঠিকভাবে বিবেচনা করবে।'

মেঘবন বলল, 'রাজকুমারী চিত্রাঙ্গদা, আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন।' অতঃপর মনে মনে বলল, আশ্চর্য, আমার নম্রতা ও লজ্জা বিসর্জন দিয়ে, কোন সাহসে জানি না, এই রাজসভায় আমার গোপন কামনার কথাগুলো বলে ফেলছি। তারপর প্রকাশ্যে বলল, 'তবে আশা করি আমার এই ব্যবহারের জন্য আপনি আমাকে মার্জনা করবেন। দয়া করে আমাকে বলে দিন, আদিত্যকে বিয়ে না করলে আমাকে কি রকম শাস্তি ভোগ করতে হবে?' চিত্রাঙ্গদা আদেশ জারি করলেন, 'তোমাকে কালরাত্রির মন্দিরে চিরকুমারীর ব্রত নিয়ে দেবদাসীর জীবন কাটাতে হবে। তাই বলছি, ভালোভাবে ভেবে দেখো।' অর্জুন যোগ করলেন, 'ভেবে দেখো মেঘবন, তুমি এখনও বালিকা। তোমার অনেক সাধাছাদ আছে যা এখনও পূরণ হয়নি। এছাড়া তুমি কি সহ্য করতে পারবে দেবদাসীর জীবন?' চিত্রাঙ্গদা নিজের আসনে ফিরে যেতে যেতে বললেন, 'মনের সব বাসনাকে বিসর্জন দিয়ে যারা চিরকুমারীর ব্রত উদ্‌যাপন করতে সক্ষম হয়, তারা হয়তোবা পুরস্কারস্বরূপ স্বর্গসুখ লাভ করতে পারে; কিন্তু বিবাহিত নারীর মতো সুখ-দুঃখের এই পৃথিবীতে তারা আনন্দ লাভ করতে পারে না।' অর্জুন শুধালেন, 'একজন বিবাহিত নারী হচ্ছে গোলাপের মতো, অন্যকে আনন্দ দেয়।' সঙ্গে সঙ্গে চিত্রাঙ্গদা বললেন, 'আর একজন দেবদাসী হচ্ছে বনোমল্লিকার মতো, একা ফুটে একাই ঝরে যায়, এই পৃথিবীতে তার কোনও সার্থকতা থাকে না।'

দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে, মিনতি কিন্তু দৃঢ়তার সঙ্গে মেঘবন বলল, 'রাজকুমারী, আমি একা ফুটে একাই ঝরে যাব, তবুও আমার পিতার অন্যায়ে আদেশ মেনে নিতে পারব না। স্পষ্টই জানিয়ে দিচ্ছি, নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে, যাকে ভালোবাসি না তাকে আমি আমার মন নিবেদন করতে পারব না।' গম্ভীরতা রক্ষা করে চিত্রাঙ্গদা বললেন, 'তুমি আরেকটু সময় নাও। আগামীকাল পর্যন্ত তোমাকে সময় দেয়া হলো, ভালো করে ভেবে দেখার জন্য।' আর অর্জুন যোগ করলেন, 'আগামীকাল চিত্রাঙ্গদা ও আমার শুববিবাহ অনুষ্ঠিত হবে।' অর্জুনের মন্তব্য এড়িয়েই চিত্রাঙ্গদা বললেন, 'তখনই তোমার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেব।' এবার অর্জুন দৃঢ়তার সঙ্গে প্রকাশ করলেন, 'মনে রেখো, উজির মনুর আদেশ অমান্য করলে তোমাকে সমাজচ্যুত করা হবে।' চিত্রাঙ্গদা যোগ করলেন, 'অথবা কালরাত্রির মন্দিরে চিরকুমারীর ব্রত নিয়ে দেবদাসীর জীবন কাটাতে হবে।' অর্জুন আবার শুধালেন, 'আর যদি সে উজির মনুর ইচ্ছানুযায়ী আদিত্যকে বিয়ে করে, তাহলে?' চিত্রাঙ্গদা বললেন, 'তাহলে অন্যকথা।' একথার গুরুত্ব না দিয়ে বরং ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যাওয়ায় আদিত্য বলল, 'মেঘবন, দয়া করে আর তর্ক করো না। আর শোন লিন্দুচন্দ্র, বন্ধ কর তোর এই

ন্যাকামু। তুই যদি তোর ভালো চাস তাহলে আমার কথা মেনে নে। তুই তোর পাগলামী বন্ধ করা।’

জরুটি কেটে লিন্দুচন্দ্র বলল, ‘তাই নাকি? বেশ তো, মেঘবনের বাবা যখন তোকে ভালোবাসেন, তখন তুই তাকেই বিয়ে কর। আমার ভালোবাসায় ভাগ বসাতে এসেছিস কেন?’ রেগে গিয়ে মনু বললেন, ‘লিন্দুচন্দ্র, মুখ সামলে কথা বলো। বলে দিচ্ছি তোমার ভালো হবে না কিন্তু। আদিত্যকে আমি ভালোবাসি, তাই আমি আমার পছন্দমতো পাত্রী তাকে উপহার দিচ্ছি। তোমার এতে সমস্যা কী?’ মনুর কথার উত্তর না দিয়েই চিত্রাঙ্গদার উদ্দেশ্যে লিন্দুচন্দ্র বলল, ‘শুনুন রাজকুমারী, আমি বংশগৌরবে বা অর্থসামর্থ্যে কোনো অংশেই আদিত্যের চেয়ে কম নই। তাছাড়া মেঘবন আমাকে ভালোবাসে, যা সবকিছুর উর্ধ্বে, কাজেই আমি কেন আমার অধিকার ক্ষুণ্ণ করব? আমি কেন মেঘবনকে বিয়ে করতে পারব না?’ তারপর আদিত্যের দিকে তাকিয়ে যোগ করল, ‘আদিত্য, তোকে বলছি, তুই এর আগে বিন্দুকে প্রেম নিবেদন করেছিলি। এর প্রমাণের অভাব নেই। তবে দুঃখ হয়, বিন্দু না জেনেশুনে তোর মতো এক চরিত্রহীন বিশ্বাসঘাতককে দেবতা জ্ঞানে পূজা করে।’ লিন্দুচন্দ্রের উদ্দেশ্যে চিত্রাঙ্গদা বললেন, ‘আমিও এ বিষয়ে কিছুটা হলেও অবগত আছি। কথাটা আদিত্যকে বলি বলি করেও বলা হয়নি।’ তারপর মনু ও আদিত্যের উদ্দেশ্যে বললেন, ‘সুপ্রিয় উজির আমার সঙ্গে চলুন। আর আদিত্যও সঙ্গে এসো। একান্ত কিছু আলোচনা করার আছে।’

মেঘবনের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী প্রকাশ করলেন অর্জুন, ‘তুমি তোমার এই খেয়াল খুশি ছেড়ে দিয়ে পিতার কথা মতো চলার চেষ্টা করো।’ আর মেঘবনের দিকে তাকিয়ে চিত্রাঙ্গদা আদেশ দিলেন, ‘তা না হলে আমি তোমাকে দণ্ড দেব। কালরাত্রির মন্দিরে চিরকুমারীর ব্রত নিয়ে দেবদাসীর জীবন কাটাতে হবে।’ তারপর অর্জুনের হাত-দুটো নিজের হাতে তুলে নিয়ে বললেন, ‘চলো প্রিয়, আমাদের সঙ্গে তুমিও চলো।’

লিন্দুচন্দ্র আর তর্ক করল না। সবাই চলে গেলে সে এগিয়ে এল মেঘবনের দিকে। তার দিকে হাত-দুটো প্রসারিত করে লিন্দুচন্দ্র বলল, ‘কী হচ্ছে প্রিয়তমা, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। তোমার গালের গোলাপি প্রলেপ কেন মিলিয়ে গেছে? তোমাকে এত স্নান দেখাচ্ছে কেন?’ অভিমানে ভেঙে পড়া মেঘবন সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, ‘হয়তোবা অনাবৃত্তিতে মনের গোলাপ নিরস হয়ে গেছে। চোখের জল দিয়ে এখন আমি আমার গালের গোলাপি আভা জীবন্ত করব।’ হতাশা সুরে লিন্দুচন্দ্র বলল, ‘ও প্রিয়তমা, শোন! ইতিহাস, কাব্য, কাহিনীতে যা-যা পড়েছি, সর্বত্রই সেই একই কথা...’ লিন্দুচন্দ্রের আক্ষেপ শেষ হওয়ার আগেই মেঘবন বলে উঠল, ‘কী কথা?’

প্রেমের গতি নাকি সর্পিণ। তাই বাধা থাকবেই। প্রেমের ক্ষেত্রে যদি বাধা থাকে, তাহলে দেখছি বিধির বিধান এড়ানো সম্ভব নয়। তবে আমি বলি কী, ধৈর্য্য আমাদের ধরতেই হবে।

উচ্ছ্বসিত ও আবেগভরা কণ্ঠে লিন্দুচন্দ্র বলল, ‘মেঘবন শোনো, পার্বত্য ত্রিপুরায় আমার এক বিধবা, নিঃসন্তান, মাসিমা থাকে। তার অনেক টাকাকড়ি আছে। আমাকে সে আপন সন্তানের মতো

ভালোবাসে। চলো, আমরা দুজনে সেখানে চলে যাই।’

‘সেখানে গিয়ে আমরা কী করব!’

সেখানে গিয়ে আমরা বিয়ে করব। সত্যিই তুমি যদি আমাকে ভালোবাসো তাহলে আজ রাতে, অরণ্যে পালিয়ে এসো। অরণ্যের মধ্যে যেখানটায় কালরাত্রির মন্দির আছে সেখানে আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করব।

আবেগময় প্রস্তাবে অভিভূত হয়ে মেঘবন বলল, ‘তোমার ডাকে সারা দিতে আমি কালরাত্রির মন্দিরে আসবই।’

এমন সময়, দূরে বিন্দুকে দেখতে পেয়ে লিন্দুচন্দ্র আত্মগোপন করার পরিকল্পনা করার আগে চুপিসারে বলল, ‘তুমি তোমার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করো না লক্ষ্মীটি।’

মেঘবন নিজেকে সামলে নিয়ে বিন্দু কাছে আসতেই জিজ্ঞেস করল, ‘আয়, বিন্দু। তা তুই চলেছিস কোথায়?’

তির্যক দৃষ্টিতে তাকিয়ে বিদ্রূপের সুরে বিন্দু বলল, ‘সে কথা আর বলিস না। আমি আদিত্যের কথা ভাবতে ভাবতে পাগল হয়ে যাচ্ছি। তুই ওকে চুম্বকের মতো আঁকড়ে রেখেছিস। এই পৃথিবীটা যদি আমার কথামতো চলত, তাহলে আদিত্যকে পাওয়ার জন্য তোকে আমি সবকিছু বিলিয়ে দিয়ে শুধু বিনিময়ে ওকে তোর আকর্ষণ থেকে মুক্ত করতাম। মেঘবন আমাকে শিখিয়ে দে না, কী কৌশলে তুই আদিত্যের মন জয় করেছিস!’

‘কী আর বলব বিন্দু, আসলে কিছুই করেনি। সত্য কথা হচ্ছে, আমি ওকে চাই না। তুই তো জানিস, আমি যদি চোখ রাঙাই তবুও সে আমাকে চায়।’

‘চোখ রাঙানো তো দূরের কথা, আমার হাসিও ওকে ভালোবাসায় উত্ত্বঙ্গ করে না, করলে আমি যে কত ভাগ্যবান হতাম তা তুই জানিস না।’

কিন্তু দ্যাখ, আমি যতই অপমান করি না কেন, সে ততই আমাকে চায়।

আর আমি যত ওকে ভালোবাসা নিবেদন করি সে ততই আমাকে অবজ্ঞা ভরে উপহাস করে। আদিত্য যদি আমায় দেখে মজে যায় তাহলে বল, আমার কী দোষ, বিন্দু!

দোষ তোর নয়, দোষ আমার কপালের।?তোকে একটা কথা বলি, একান্ত কথা। দেখিস, কাউকে আবার বলে দিস না। কী কথা!

‘এখন থেকে তোকে আর আমাকে নিয়ে চিন্তা করতে হবে না। আদিত্য আর কোনওদিন আমার মুখ দেখবে না।’

‘কেন?’

‘লিন্দুচন্দ্র ও আমি এখন থেকে চিরদিনের মতো চলে যাচ্ছি। তুই তো জানিস, যতদিন লিন্দুচন্দ্রের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটেনি, ততদিন এই মণিপুর রাজ্য ছিল আমার কাছে স্বর্গের মতো। এখন এই স্বর্গ আমার কাছে নরকে পরিণত হয়েছে, বিশেষ করে আমার পিতার কারণে। কিন্তু সে ছাড়া সবকিছু যে আমার কাছে মৃত আর গরল। তাহলে বোঝা ভালোবাসা কী জিনিস!

দূর থেকে লিন্দুচন্দ্র বলে উঠল, ‘আমি স্পষ্ট করে জানিয়ে দিচ্ছি, আজ রাতে যখন চাঁদ বনের জলে নিজেকে গোপন করবে, তখন অন্ধকারের মধ্যেই আমরা এই মণিপুর রাজ্য ত্যাগ করে চিরমুক্তির আশায় চলে যাব।’

প্রেমের আবেশে বিভোর হয়ে বিন্দুর দিকে তাকিয়ে মেঘবন বলল, ‘বিন্দু, আমরা দুজন চলে যাব এই রাজ্য ছেড়ে। আর ফিরব না। তুই ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিস আমি ও লিন্দুচন্দ্র যেন সুখী হই। আর শোন, আমিও প্রার্থনা করছি তোর ও আদিত্যের জীবন যেন আনন্দে ভরে ওঠে।’

মেঘবন চলে গেলে বিন্দু সেদিকে তাকিয়ে আফসোসের সুরে বলল, ‘কারও পৌষমাস আর কারও সর্বনাশ। মণিপুর রাজ্যে আমার সুখ্যাতি কী কম? কিন্তু এতে কার যায়-আসে! আদিত্য তো আমাকে এড়িয়েই চলে, কিন্তু ওর মুখ না দেখলে আমি উন্মাদ হয়ে যাই।’ তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে যোগ করল, ‘অথচ আদিত্যই একদিন আমাকে ভালোবাসত। কিন্তু মেঘবনের প্রেমে পড়ার পর থেকে সে আমাকে পাভাই দিচ্ছে না। আমি আদিত্যকে বলে দেব, মেঘবন পালিয়ে যাচ্ছে।’

অন্যদিকে, মণিপুর রাজ্যের প্রধান নগরের কারনশিল্পীদের এক জলসা বসল। রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদার বিয়ের অনুষ্ঠানে নাটক মঞ্চস্থ করার পরিকল্পনায় এই আসরের আয়োজন। তাদের দলনেতার নাম অচিন। সে দাঁড়িয়ে সবাইকে একবার দেখে বলল, ‘সবাই কী এখানে উপস্থিত?’

আত্মবিশ্বাসে পরিপূর্ণ ও পেশায় একজন বিশ্বাসযোগ্য পটকার সোনারজবা বলে উঠল, ‘আমরা তো সবাই উপস্থিত। তোমরা কী বলো?’

সঙ্গে সঙ্গে সবাই বলে উঠল, ‘হ্যাঁ, আমরা সবাই উপস্থিত।’

সোনারজবা বলল, ‘আমার মনে হচ্ছে, যাদেরকে তুমি ডেকেছিলে তারা সবাই এখানে উপস্থিত। তবে তোমার যদি কোনও সন্দেহ থেকে থাকে তাহলে তালিকায় লিপিবদ্ধ করা নাম অনুযায়ী সকলের নাম ডেকে যাও। আমরা একে একে হাজিরা দিয়ে আমাদের উপস্থিতি ঘোষণা করব।’

অচিন বলল, ‘এই তালিকায়, মণিপুর রাজ্যের সকল সুনামধন্য অভিনেতাদের নাম আমি লিপিবদ্ধ করেছি। তারা অর্জুন ও চিত্রাঙ্গদার বিয়ের অনুষ্ঠান উপলক্ষে এই নাটকে অভিনয় করার যোগ্য বলে মনে করি।’

সোনারজবা বলল, ‘তা তো বুঝলাম, তবে আমি বলি কী অচিন, প্রথমে তুমি নাটকের বিষয়বস্তুর একটু ব্যাখ্যা দাও, তারপর না হয় অভিনেতাদের নাম ঘোষণা করো। আর এসব যখন শেষ করবে তখন চূপচাপ বসে পড়ো। একটানা আর কত তোমার প্রলাপ শোনা যায়। তোমরা কী বলো?’

সকলে একসঙ্গে বলে উঠল, ‘সোনারজবা ঠিকই বলেছে।’

অচিন বলল, ‘ঠিক আছে। এই নাটকের নাম হচ্ছে ‘বিজয় ও মাল’। তা অবশ্য যাত্রা-ঢঙে অভিনয় করতে হবে। যাত্রা কী তা তো তোমরা বুঝো, তাই না?’

সোনারজবা বলল, ‘যাত্রা বোঝে না এমন লোক কি এই মণিপুর রাজ্যে আছে? তুমি যে কী বলো! এর ব্যাখ্যা নিশ্চয়ই যোগ্য। তার চেয়ে বরং তুমি অভিনেতাদের নাম ডেকে যাও। সময় আর নষ্ট করো না বাপু।’

অচিন বলল, ‘আমি যখন নাম ধরে ডাকব তখন তোমরা ‘উপস্থিত’ বলে তোমাদের হাজিরা দিও, ঠিক আছে।’

সকলে একসঙ্গে বলে উঠল, ‘ঠিক আছে, ঠিক

আছে।
 অচিন: সোনাজবা। তোমরা তো সবাই জান সে একজন পটকার। কী বলো!
 সকলে একসঙ্গে বলে উঠল, ‘আজ্ঞে, সে কথা কী আর বলতে হয়।’
 সোনাজবা বলল, ‘এই তো আমি। আমাকে চিনে না এমন লোক এই অঞ্চলে নেই। এখন বলো আমি কোন চরিত্রে অভিনয় করব।’
 অচিন বলল, ‘সোনাজবা, তুমি বিজয়ের চরিত্রে অভিনয় করবে।’
 সোনাজবা বলল, ‘সে কী একজন প্রেমিক, না, একজন জালিম?’
 অচিন বলল, ‘একজন প্রেমিক। অবশ্য সে তার প্রেমিকাকে পাওয়ার জন্য আত্মহত্যা করবে।’
 সোনাজবা বলল, ‘এ তো জটিল ব্যাপার, তবে আমার জন্য কিছুই অসম্ভব না। আমি বিশ্বাসযোগ্য অভিনয় করতে পটু। কিন্তু...।’
 সকলে একসঙ্গে বলে উঠল, ‘কিন্তু আবার কী!’
 সোনাজবা বলল, ‘আমি একজন জালিমের চরিত্রেও অভিনয় করতে সক্ষম। এখন বলো অন্যদের নাম।’
 অচিন বলল, ‘বাঁশি। তোমরা তো জানো, সে পেশায় একজন কুমার।’
 সকলে একসঙ্গে বলে উঠল, ‘তা জানব না কেন!’
 বাঁশি বলল, ‘এই তো আমি এখানে। আমাকে আবার কোন চরিত্রে অভিনয় করতে হবে, শুনি?’
 অচিন বলল, ‘তুমি মালার চরিত্রে অভিনয় করবে।’
 বাঁশি বলল, ‘মালা, সে আবার কে?’
 অচিন বলল, ‘বিজয়ের প্রেমিকা।’
 বাঁশি বলল, ‘না, না, আমি কোনও নারীর চরিত্রে অভিনয় করতে পারব না। তাছাড়া আমার দাড়ি

গজাচ্ছে।’
 অচিন বলল, ‘এতে কোনও সমস্যা নেই। তুমি মুখোশ পরে অভিনয় করবে।’
 সোনাজবা বলল, ‘এক্ষেত্রে আমি বরং মালার চরিত্রে অভিনয় করি। প্রথমে আমি বিজয় হবে, তারপর মুখোশ পরে মালার চরিত্রে অভিনয় করব। এই মণিপুর রাজ্যে আমার মতো এমন দক্ষ অভিনেতা আর কে আছে, তোমরাই বলো!’
 সকলে একসঙ্গে বলে উঠল, ‘তুমি সত্য কথাই বলেছ।’
 অচিন বলল, ‘না, না, সোনাজবা তুমি বিজয়ের চরিত্রেই অভিনয় করবে। আর বাঁশি করবে মালার চরিত্রে। তোমরা আর প্যাঁচাল বাঁশিও না বাপু।’
 সোনাজবা বলল, ‘আমি আবার প্যাঁচাল বাঁশিও না কোথায়। শুধু বললাম... ঠিক আছে, ঠিক আছে, তুমি যা বলবে তাই হবে। এখন বলো, আর কে কে আছে, না এখানেই শেষ।’
 অচিন বলল, ‘এখানেই শেষ হবে কেন? তারপর আছে কালাচান্দ। তোমরা সবাই তাকে চিন।’
 সকলে একসঙ্গে বলে উঠল, ‘আজ্ঞে, চিনি, সে পেশায় একজন দরজি।’
 কালাচান্দ বলল, ‘আমিও উপস্থিত। আমাকে কী করতে হবে বলো!’
 অচিন বলল, ‘তুমি হবে মালার মা।’
 কালাচান্দ বলল, ‘নারীর চরিত্র! আমার বয়স বেড়েছে, এখন কী আর আমাকে নারীর চরিত্র মানায়?’
 অচিন বলল, ‘তা আমি বুঝে নেব। যা বলছি তাই করতে হবে। পছন্দ যদি না হয় তাহলে কেটে পড়ো। আমি অন্যজনকে দেখে নেব।’

সোনাজবা বলল, ‘ঠিক আছে, ঠিক আছে, রাগ করো না বাপু। কালাচান্দ মালার মা’র চরিত্রেই অভিনয় করবে। এখন বলো অন্যদের কথা।’
 অচিন বলল, ‘ঝালাইমিস্ত্রী মহাশয় হবে বিজয়ের পিতা। আর আমি মালার পিতার চরিত্রে অভিনয় করব।’
 বৈছা বলল, ‘আমি কী করব? আমাকে কী এমনি এমনিই ডাকা হয়েছে?’
 অচিন বলল, ‘এমনি এমনি ডাকব কেন? আজ আছে বলেই তোমাকে ডেকেছি।’
 সোনাজবা বলল, ‘তাহলে বলেই ফেলো তক্ষক বৈছা কোন চরিত্রে অভিনয় করবে?’
 অচিন বলল, ‘সে হবে বাঘ।’
 সকলে একসঙ্গে বলে উঠল, ‘বা-বা-ঘ, বাঘ!’
 অচিন বলল, ‘আজ্ঞে, বৈছা হবে বাঘ। আমার তালিকা অনুযায়ী এই হচ্ছে সকল অভিনেতাদের নাম। এই যাত্রা-নাটকের জন্য আর কোনো অভিনেতার প্রয়োজন পড়বে না।’
 বৈছা বলল, ‘তোমার কাছে কী বাঘের সংলাপ লিখা আছে! থাকলে, আমাকে দাও, আমি মুখস্থ করে আসব।’
 অচিন বলল, ‘নিজের মতো করে তৈরি করে নিও। এতে তো বাঘের গর্জন ছাড়া আর কিছুই নেই।’
 সোনাজবা বলল, ‘আমি তাহলে বাঘের চরিত্রে অভিনয় করি। আমি চমৎকার বাঘের গর্জন দিতে পারি। আমার গর্জন শুনে চিত্রাঙ্গদা বলবেন, ওকে আরেকবার গর্জন করতে দাও, আরেকবার গর্জন করতে দাও।’
 অচিন বলল, ‘তুমি যদি ভয়ানকভাবে গর্জন দ্যাও তাহলে সবাই মিলে চৎকার শুরু করবে, আর



তখন আমাদের মাথা হারানো ছাড়া আর অন্যকোনও উপায় রইবে না।’
বৈছা বলল, ‘ঠিকই। আমাদের প্রাণ অচিরেই হারাতে হবে।’
সোনাজবা বলল, ‘ঠিক, তোমার কথাই ঠিক। যদি ভদ্রমহিলারা আমার গর্জন শুনে ভয় পান তাহলে আমাদের জন্মদের হাতে সঁপে দিতে চিত্রাঙ্গদা দ্বিধা করবেন না। কিন্তু আমার স্বর খুবই মোলায়েম। আমার গর্জন হবে একেবারে কোকিল কণ্ঠ।’
অচিন বলল, ‘তুমি বিজয়ের চরিত্র ছাড়া আর কোনও চরিত্রে অভিনয় করতে পারবে না। কারণ বিজয় হচ্ছে একজন সুদর্শন, সুপুরুষ। তোমাকে এই চরিত্রে চমৎকার মানাবে।’
সোনাজবা বলল, ‘ঠিক আছে অচিন, তুমি যখন আমাকে আর কোনও চরিত্রে অভিনয় করতে দিতে চাও না, তাহলে কী আর করতে পারি। আমি তাহলে বিজয়ের চরিত্রেই অভিনয় করব।’
অচিন বলল, ‘আমার কোনও আপত্তি নেই।’
সোনাজবা বলল, ‘ঠিক আছে, তাহলে আগামীকাল সন্ধ্যায় আবার দেখা হবে। আমরা তোমাকে একটি চমৎকার মোহড়া উপহার দেব। এখন তাহলে বিদায় বন্ধু, বিদায়।’
অচিন বলল, ‘সবাই যার যার সংলাপ মুখস্থ করে সন্ধ্যায় কালরাত্রির মন্দিরে সমবেত হবে। আবার মিলিত হওয়ার প্রত্যাশা নিয়ে এখনকার মতো বিদায় বন্ধুরা, বিদায়।’
সোনাজবা বলল, ‘তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছো তো, অচিন কী বলল? ঠিক সময়ে উপস্থিত থেকে, নতুবা তোমাদের মুখ আর আমি দেখতে চাই না।’

দ্বিতীয় অধ্যায়

অরণ্যের একপাশে পরীরা মহোৎসব মেতে উঠল। দূর থেকে কৃষ্ণপরী তাদের দেখতে থাকে। সে এক দুষ্ট পরী। মরার উপর সে তামাশা করে পরমানন্দ লুটে। সে পরীরাজের সহকারী। হঠাৎ সে বলে উঠল, ‘ও-রে বাবা! পরীরাজ দেখছি, এ দিকেই আসছেন। পরীরানীও সদলবলে একই স্থানে উপস্থিত। ভালোয় ভালোয় কেটে পড়াই উত্তম। যেখানে বাঘের ভয়, সেখানেই দেখছি সন্ধ্যা হয়।’
পরীরাজ: রানী, তোমার সঙ্গে এ কী অমঙ্গলের দেখা!
পরীরানী: অহ, তুমি! এখানে কী মনে করে আগমন ঘটালে, আমার ভিন্নদেশি ও হিংসুটে পরীরাজ? তোমার ছায়া মাড়ানোই পাপ, তাই আমাকে এ স্থান পরিত্যাগ করা উচিত।
পরীরাজ: দাঁড়াও দর্পিতা নারী, তুমি কি আমাকে পরীরাজ হিসেবে মনে নিতে দ্বিধাবোধ করছ?
পরীরানী: তুমিও কি আমাকে পরীরানী হিসেবে গণ্য করো?
পরীরাজ: গণ্য করতে আপত্তি কীসের!
পরীরানী: হাসালে, তুমি ভাবছ, আমি তোমার কোনও খবরই রাখি না।
পরীরাজ: ভালো, ভালো। কী খবর রাখো একটু সুধাও শুনি?
পরীরানী: তুমিই না পরীর দেশ থেকে পালিয়ে মেঘপালকের ছদ্মবেশে সারা দিন বৃন্দাবনে রাধিকাকে বাঁশি বাজিয়ে প্রেম নিবেদন করেছিলে?
পরীরাজ: তাই বুঝি! তো আর কী কী খবর রাখো, তাড়াতাড়ি করে বলো, তুমি তো জানো আমার

দেরি সহ্য হয় না।
পরীরানী: তুমি এই মণিপুর রাজ্যে কেন এসেছ তাও আমার অজানা নয়।
পরীরাজ: উত্তম, খুবই উত্তম। তবে কেন এখানে এসেছি সেই কথাটিই বলে ফেলো, শুন।
পরীরানী: তোমার মণিপুরী প্রেমিকা চিত্রাঙ্গদা, যে বর্ম এঁটে যোদ্ধার বেশে পুরুষ সৈনিকের সঙ্গে যুদ্ধ করে, তারই সঙ্গে বিয়ে হতে যাচ্ছে অর্জুনের তাই তুমি দিশেহারা হয়ে এই অরণ্যে ছুটে এসেছ।
পরীরাজ: পরীরানী, তোমার মুখে অন্তত আমার ও চিত্রাঙ্গদার নাম শোভা পায় না।
পরীরানী: সত্য বলতে আপত্তি কীসের!
পরীরাজ: সত্য কথা যদি বলতে তাহলে তোমার ও অর্জুনের গোপন প্রেমের কাহিনীটি সবাইকে জানিয়ে দিলেই ভালো হয়! নাকি সত্যকে মিথ্যা দিয়ে আড়াল করে রাখতে চাও? এই কাজে অবশ্য কেউ তোমাকে হারাতে পারে না। বলা যায় তুমি একজন মহা...।
পরীরানী: থামলে কেন, মন উজাড় করে মিথ্যা কথা বলে যাও! আমি মনোযোগ সহকারে তোমার সব মিথ্যা কথা শুনে যাচ্ছি।
পরীরাজ: মিথ্যা কথা বলব কেন! তুমি কী অস্বীকার করতে পারো, অর্জুন কাউকে বিয়ে করার চেষ্টা করলে তা তুমি ভেঙে দাওনি। এমনকি তুমি পাণ্ডব শিরমণি অর্জুনের নিকামরূপে দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামী আসনে বসালে, যেন তোমার ইচ্ছে চরিতার্থ করতে পারো নিরবচ্ছিন্নভাবে।
পরীরানী: এসব তোমার নিষ্ফল আক্রোশের কথা ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না।
পরীরাজ: এবার তুমি সত্যি সত্যিই হাসালে! বড্ড হাসি পাচ্ছে!
পরীরানী: হেসে যাও, প্রাণ খুলে হেসে যাও। আমার কিছু যায়-আসে না। কিন্তু বাস্তবে তুমি আমার পরীদের বাধা দিচ্ছ।
পরীরাজ: কিভাবে, কিভাবে?
পরীরানী: তোমার অপকর্মের কারণেই তো ফসলের ক্ষেতে আমরা নাচতে বার্থ হয়েছি। আর তাই নদীর জল বৃদ্ধি পেয়ে কৃষকের ক্ষেত প্রাণিত হয়েছে। এই অশান্তি, খাপছাড়া পরিবেশ তোমার অপকর্মের কারণেই সৃষ্টি হয়েছে।
পরীরাজ: সবই তোমার কারসাজি। আমি শুধু তোমার স্নেহের বালকটিকে চেয়েছিলাম, তা দিয়ে দিলেই সব ঝঞ্জাট মিটে যায়।
পরীরানী: আমিও সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করছি, আমার স্নেহের বালকটিকে তোমার হাতে তুলে দিতে পারব না।
পরীরাজ: পরীরানী, আর কত দিন তুমি এই অরণ্যে থাকার ফন্দি করছ?
পরীরানী: ফন্দি! ফন্দি হবে কেন! আমি স্বইচ্ছায় আগামীকাল, অর্থাৎ চিত্রাঙ্গদার বিয়ে উপলক্ষে অনুষ্ঠিতব্য আনন্দোৎসব পর্যন্ত। তবে হার মেনে, মাথা নত করে যদি আমাদের উৎসবে যোগ দাও তাহলে ভালো কথা। তবে যদি তুমি তা করতে অস্বীকার করো তাহলে দূরত্ব বজায় রেখে অন্যপথে চলো, এ তোমার জন্যই উত্তম হবে।
পরীরাজ: বালকটি আমাকে দিয়ে দিলেই তোমার উৎসবে যুক্ত হতে আমার কোনও আপত্তি থাকবে না।
পরীরানী: আমিও তোমাকে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে

দিচ্ছি, সমগ্র পরীরাজ্যের বিনিময়েও আমি আমার স্নেহের বালকটিকে তোমার হাতে অর্পণ করব না।
পরীরানীর চলে যাওয়া পথের পানে তাকিয়ে পরীরাজ বলল, ‘যাচ্ছ যাও এই অপমানের প্রতিশোধ তোলা রইল।’ তারপর কৃষ্ণপরীকে ডেকে বলল, ‘তুই তাড়াতাড়ি করে সেই ‘অলস-প্রেমের’ ফুলটি নিয়ে আয়। তারপর আমি পরীরানীকে মায়ায় ঘোরে আপ্ত করব।’
কৃষ্ণপরী: মহারাজ, আমি অর্ধ-প্রহরের মধ্যেই তা নিয়ে এসে ‘অলস-প্রেমের’ ফুলটি আপনার সম্মুখে হাজির করছি।
কৃষ্ণপরীর চলে যাওয়া পথের পানে তাকিয়ে পরীরাজ মনে মনে বলল, আগে ফুলটা হাতে আসুক। তারপর পরীরানীকে উন্মাদিনীর মতো মায়ায় ঘোরে আপ্ত করব। অবশ্য আমার কাছে আরও একটা ফুল আছে যা দিয়ে সেই মায়ায় ঘোর কাটানো সম্ভব। তবে পরীরানীর ঘোর কেটে যাওয়ার আগেই ছেলেটাকে ছিনিয়ে নিতে হবে।
তখনই পরীরাজ অস্পষ্ট পায়ের আওয়াজ শুনে পেল। সে বলল, ‘এদিকে কে আসছে। আমি আমাকে অদৃশ্য করে তাদের কর্মকাণ্ড দেখব।’
আদিত্য উন্মাদের মতো ছুটে ছুটে বলল, ‘বিন্দু কোথায় লিন্দুচন্দ্র ও মেঘবন? তোমার কথা শুনেই উদ্ভাতের মতো ছুটে এসেছি। এখন দেখছি সবই মিছে।’
বিন্দু বলল, ‘আমি মিথ্যা কথা বলেনি। স্বেচ্ছায় তোমার সঙ্গে আসতে চাইনি। তুমিই আমাকে এখানে নিয়ে এসেছ। ওগো নিষ্ঠুর বন্ধু, আমি আর তোমার নামও মুখে আনতে চাই না, কোনওদিনও না।
?আমি তোমাকে সুস্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিচ্ছি, তোমাকে আমি কোনওদিনও ভালোবাসিনি, আজও না।
?কিন্তু আমি যে তোমাকে ভালোবাসি!
?ভালোবাসা! তোমাকে দেখলেই আমার গা জ্বালা করে।
?আর আমার গা জ্বালা করে যদি আমি তোমাকে দৃষ্টির আড়ালে রাখি।
?তুমি ভুলে যেও না, এ হচ্ছে গভীর অরণ্য। একা পেয়ে এই অরণ্যের হিংস্র জানোয়ারগুলো তোমাকে কুড়ে কুড়ে খাবে।
?তুমি কেন বলছ আমি একা। তুমি তো আমার সঙ্গেই আছ। তুমি যেখানেই পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করো না কেন, আমি তোমার সঙ্গ ত্যাগ করব না।
?আমি আর তোমার প্রলাপ শুনতে চাই না।
আমাকে একা থাকতে দাও। আবারো বলছি, তুমি যদি আমাকে অনুসরণ করো তাহলে তোমার ভালো হবে না।
আমি তোমাকে অনুসরণ করবই। আমি এই নরককে স্বর্গে পরিবর্তন করে ছাড়বই।
পরীরাজ গোপনে সব কথা শুনে বিন্দুর প্রতি সমবেদনা জানাল, সুন্দরী! এই গভীর অরণ্য থেকে ফিরে যাওয়ার আগেই আমি তোমার ভাগ্য ঘুরিয়ে দেব। এই নরাধমটা প্রেমে উন্মাদ হয়ে তোমার পিছু পিছু ঘুরে বেড়াবে। তখনই কৃষ্ণপরী ‘অলস-প্রেমের ফুল’ হাতে নিয়ে ফিরে এল। ফুলটি পরীরাজের সামনে তুলে ধরে কৃষ্ণপরী বলল, ‘এই তো সেই অলস-প্রেমের কাহিনী। (অংশবিশেষ)



যাত্রা

বাংলার যাত্রা বাঁকে বাঁকে একুশ শতকে

মিলন কাণ্ডি দে

বাংলাদেশে দেশজ সংস্কৃতি ধারার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ও শক্তিশালী গণমাধ্যম হিসেবে যাত্রার স্বীকৃতি আছে। নাট্যাচার্য শিশির কুমার ভাদুড়ি বলেন, ‘আমাদের জাতীয় নাট্য বলিয়া যদি কিছু থাকে তাহাই যাত্রা।’ অধ্যাপক ও নাট্য গবেষক জিয়া হায়দার (১৯৩৬-২০০৮) এক নিবন্ধে লিখেছেন, ‘যাত্রাই আমাদের জাতীয় নাট্য।’ শুরুতেই যাত্রাপালার যে কনসার্ট অর্থাৎ একতানবাদন বেজে ওঠে, তার সুরে সুরে যেন আমরা অনুভব করি শস্য-শ্যামল এই বাংলার বহুমাত্রিক সঙ্গীতের তাল-লয়-ছন্দের এক অপূর্ব সম্মিলন। ‘যাত্রা’ শব্দটি আবেগপ্রবণ বাঙালি

মনকে আলোড়িত করে নিমেষেই এবং আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার বিভিন্ন পর্যায়ে এর বহুবিধ ব্যবহার এ রকম : শোভাযাত্রা, স্নানযাত্রা, রথযাত্রা, মঙ্গলযাত্রা, যুদ্ধযাত্রা, বরযাত্রা, বিদেশযাত্রা, শবযাত্রা, শুভযাত্রা- রকমারি যাত্রা। আবার হাটে বাজারে কিংবা নদীর পাড়ে কোনো যাত্রা প্যান্ডেল থেকে মাইকে ভেসে আসে কানফাটা আওয়াজ ‘যাত্রা-যাত্রা-যাত্রা’। সংস্কৃতির এ ধারাটি যুগের পর যুগ এসেছে ভিন্ন রূপে ভিন্ন সাজে।

উনিশ শতকের ষষ্ঠ ও সপ্তম দশকে শিক্ষিত ও শৌখিন সমাজে যাত্রার এক নতুন রূপান্তর ঘটে,

যার নাম গীতাভিনয়। এই নতুন ধারার যাত্রাকে সমাজের বিশিষ্টজনদের কাছে সমাদৃত করে তোলেন জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির সদস্যরা। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্যের গবেষণা থেকে জানা যায়, রবীন্দ্রনাথের শৈশব ও কৈশোরকালে কলকাতায় নতুন যাত্রার যুগ। বাংলায় একদা কৃষ্ণযাত্রা, রাসযাত্রা, রাইজন্দাদিনী যাত্রা ও বিদ্যাসুন্দর যাত্রার যে রূপ ছিল, তা পরিবর্তিত হয়ে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে পরিমার্জিত রূপে নতুন যাত্রার আত্মপ্রকাশ ঘটে। কবিগুরুর বাল্যকালে দেখা এমনি এক পালার নাম ‘নলদময়ন্তী’।

১৮৭২ সাল সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার বছর। এ বছরেই যাত্রাকে আধুনিক চিত্রা-চেতনায় উন্নীত করলেন ‘যাত্রাগুরু’ বলে খ্যাত বর্ধমানের তার্শলা গ্রামের মতিলাল রায় (১৮৩২-১৯০৮)। ১৮৭৪ সালে প্রতিষ্ঠিত বরিশালের মাচরঙ্গের নট কোম্পানি ইংরেজ শাসিত বাংলাদেশে প্রথম পেশাদারি যাত্রা সংগঠন। পশ্চিমবঙ্গে এ দলের সক্রিয় কার্যক্রম এখনো অব্যাহত রয়েছে। যাত্রাপালার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ‘বিবেক’। নাট্যতত্ত্বমীমাংসা গ্রন্থে ড. সাধন কুমার ভট্টাচার্যের উক্তি : ‘বিবেকই বাংলা যাত্রা নাটকের পতাকা চিহ্ন’। ১৮৯৪ সালে পালার অধীভূষণ ভট্টাচার্য তার ‘সুরত-উদ্ধার’ যাত্রাপালায় সর্বপ্রথম বিবেক সৃষ্টি করেন। ১২২ বছর আগে যাত্রাপালায় প্রথম বিবেকের গান—

‘ওরে আপন বুঝে চল এই

বেলা

ও যে বাস্তব শকুন উড়ছে

মাথার গো

বসে যুক্তি দিচ্ছেন

হাড়গেলা।’ (সংক্ষেপিত)

এভাবে বিভিন্ন পালাবদলের মধ্য দিয়ে রূপান্তর ঘটেছে বাংলার ঐতিহ্যবাহী যাত্রাপালায়।

স্বদেশি যাত্রা

বিশ শতকের সূচনায় পরাধীন জাতিকে মুক্তির গান শোনালেন নতুন যাত্রার নতুন যুবরাজ চারণকবি মুকুন্দ দাস (১৮৭৮-১৯৩৪)। তার স্বদেশি যাত্রার বিক্ষোভ ঘটল দেশজুড়ে। প্রেক্ষাপটটি ছিল এ রকম : ১৯০৫ সালের অক্টোবরে লর্ড কার্জনের ‘বঙ্গভঙ্গ’ পরিকল্পনা ছিল এ দেশের মিলিত হিন্দু-মুসলমানের সাম্য-সম্প্রীতি বিনষ্ট করার জন্য ইংরেজ বেনিয়াদের এক পরিকল্পিত রাজনৈতিক দুরভিসন্ধি। শুরু হলো দেশব্যাপী বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলন। এ সময় থেকে বাঙালির মানসভূমে স্বদেশচেতনা এক ভিন্নমাত্রায় রূপ নিল। রবীন্দ্রনাথ লিখলেন : ‘বাংলার মাটি বাংলার জল’, ‘আমার সোনার বাংলা’; রমেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী লিখলেন : ‘বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা’। পাশাপাশি মঞ্চায়ন হতে লাগল ‘পলাশীর পরে’, ‘প্রায়শ্চিত্ত’, ‘রানাপ্রতাপ’ প্রভৃতি দেশপ্রেমমূলক নাটক। বঙ্গভঙ্গ আইন জারির ওই বছরেই (১৯০৫) আধুনিক রঙ্গমঞ্চের জনক গিরিশ ঘোষ (১৮৪৪-১৯১২) নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে নিয়ে একটি উৎকৃষ্ট নাটক রচনা করেন। মঞ্চস্থ হয়েছিল কলকাতার মিনার্ভা থিয়েটারে ১৯০৫ সালের ৭ সেপ্টেম্বর। সেই

উত্তাল সময়ে জাতীয় জাগরণের এক সংগ্রামী নায়ক হিসেবে সিরাজকে মঞ্চে আনার গিরিশ ঘোষের এই কৃতিত্ব নিঃসন্দেহে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। অনেকের মনে প্রশ্নের উদ্বেক হতে পারে এ জন্য যে, বঙ্গভঙ্গ বিধানটি তো সরকারিভাবে ঘোষণা করা হয় ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর। তাহলে এর এক মাস আগে বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলন শুরু না হতেই জাতীয় চেতনা সৃষ্টিকারী নাটক লেখার প্রয়াস কেন? আসলে বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনার খসড়া তৈরি হয়েছিল ১৯০৩ সালে বাংলার ছোট লাট এন্ড ফ্রেজার আর ভারতের সরাষ্ট্র সচিব হারবার্ট রিজলের প্রস্তাবেই। তখন থেকেই ইংরেজ শাসকচক্রের অশুভ পায়তরার বিরুদ্ধে জনরোষ ধুমায়িত হচ্ছিল। আর বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলন থেকেই ঐতিহ্যবাহী যাত্রার একটি নতুন ধারা সৃষ্টি হলো ‘স্বদেশি যাত্রা’। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এ নতুন যাত্রার অধিকর্তা মুকুন্দ দাস গলা ছেড়ে গাইলেন—

‘আমি দশ হাজার প্রাণ

যদি পেতাম

তবে ফিরিঙ্গি বণিকের

গৌরব রবি

অতলে জলে ডুবিয়ে

দিতাম।’ (যাত্রাপালা মাতৃপূজা)

যাত্রাপালার প্রাণশক্তি যে কত প্রবল এবং এর ভাবরস মুহূর্তেই বিপরীত চিন্তার মানুষকে সুস্থ ভাবনায় ফিরিয়ে আনতে পারে, এমনই একটি ঘটনার অবতারণা হয়েছিল মুকুন্দ দাসের যাত্রাপানে। প্রিন্সিপাল ইবরাহীম খাঁর ‘বাতায়ন’ নামে স্মৃতিচারণগ্রন্থে আছে তারই উল্লেখ : “একবার ময়মনসিংহ শহরে মুকুন্দ দাসের দল আসে। তখন বাংলায় মুকুন্দ দাসের নাম।... তখন আমার বাসায় ছিলেন নোয়াখালীর মৌলভী আহছানউল্লাহ... বললাম, ‘মৌলভী সাহেব চলুন, গানটি শুন আসি।’ ‘যাত্রা শুনাকে যে আমি গুনাহ মনে করি।’ মৌলভী সাহেবের এ কথার উত্তরে আমি বললাম, ‘কিন্তু না দেখে শুনাই তো এতকাল রায় দিয়ে এসেছেন, আজ গিয়ে শুনুন, দরকার হয় কাল সকালে তওবা করে জোরেশোরে ফতোয়া দিবেন।’ মৌলভী সাহেব রাজি হলেন। গোলাম মুকুন্দ দাসের বিরাট বপু। সেই বপু নিয়ে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে তার বিশাল বাহু দুলিয়ে আর অপূর্ব সুন্দর কণ্ঠে সুললিত ভাষায় যে অভিনয় করলেন, যে গান গাইলেন, প্রায় ২০ হাজার লোক রাত নয়টা হতে দুটো পর্যন্ত তা মুগ্ধ চিত্তে শুনল। কোথাও সুই পড়ার শব্দ হলো না। ফিরার পথে মৌলভী সাহেবকে বললাম, ‘তাহলে মৌলভী সাহেব, সকালে তো তওবা করতেই হবে।’ ‘তওবা! কী জন্য তওবা?’ ‘এই যে গান শুনলাম।’ মৌলভী সাহেব বললেন, ‘গান! এই জিনিসকে গান বলে কে?... মানুষকে সেবার জন্য, মানুষকে হক পথে পরিচালনার জন্য উনি যেসব কথা বললেন, সে যে সত্যিকারের ওয়াজ নসিহত।” মুকুন্দ দাস সাতটি যাত্রাপালা রচনা করেছেন। তার যে পালাটি ইংরেজ সরকার প্রথম বাজেয়াপ্ত করে এবং তাকে কারাদণ্ড ভোগ করতে হয় তার নাম ‘মাতৃপূজা’।

১৯১০ সালে যাত্রার নতুন পালাবদল। প্রথম ঐতিহাসিক পালার রচনা ‘পদ্মিনী’। তবে উনিশ শতকের মাঝামাঝিতে পরীক্ষামূলকভাবে ঐতিহাসিক পালার রচনার সূচনা করেন চ’য়ে পাগলা নামে এক মুসলিম পালাকার। পালাটির নাম ছিল ‘কালাপাহাড়’। দিল্লির বাদশাহ আলাউদ্দিন খিলজির অতর্কিতে চিতোর আক্রমণ এবং রাজপুত রানা ভীমসিংহের অপরূপা স্ত্রীকে জোরপূর্বক ধরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা—এ আখ্যান অবলম্বনে রচিত হয়েছে পদ্মিনী পালা। এ কৃতিত্ব পালাকার হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৭১-১৯২৬)। যাত্রায় ব্যালে নৃত্যের প্রচলন এই পালা থেকে। পরবর্তীতে ব্যালের নতুন নাম হয় ‘ব্যালট’। ১২টি মেয়ের অংশগ্রহণে ব্যালট তৈরি হয় এবং তারা সম্রাট-বেগম, রাজা-রানী কিংবা যে কোনো উল্লেখযোগ্য চরিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করে। ‘সোহরাব-রস্তুম’ যাত্রাপালায় সূচনাদৃশ্যে সন্তানসম্ভবা তাহমিনা যখন পরম করুণাময়ের দোয়া কামনা করছেন, সেই সময় ব্যালটের মেয়েরা দ্রুতগতিতে মঞ্চে এসে হেসে খেলে আনন্দ-উচ্ছ্বাস প্রকাশ করছে এভাবে—

‘ভাবনা কি আর সহ

ঘরের কাছে এসে গেছে

স্বর্গে ওঠার মই।’

গত ১০০ বছরের যাত্রাশিল্পের ক্রমবিকাশ এবং এর উন্নয়ন উৎকর্ষের মূলে রয়েছে শিক্ষিত, সমকালীন সচেতনতাবোধ ও জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন যাত্রাপালাকারদের নিরবচ্ছিন্ন কর্মপ্রয়াস। বাঙালির অন্যতম আদি সংস্কৃতি যাত্রার প্রতি এক শ্রেণি শিক্ষিত বাঙালিরই মজাগত অনীহা রয়েছে। এ হীনমন্যতা সকালেও ছিল, একালেও আছে। উল্লাসিক ও শ্রেষ্ঠাত্মক মনোভাব নিয়ে তারা ‘যাত্রা’ শব্দটি উচ্চারণ করে থাকেন। এ শ্রেণির শিক্ষিতদের বিশ্বাস, যাত্রা যাত্রা করে কিংবা লেখে তারা সমাজের অপাঙ্কুজ, স্কুল-কলেজের চৌকাঠ মাড়ায়নি। যাত্রার ধারাবাহিক ইতিহাস জানা থাকলে এ রকম অমূলক ধারণার সৃষ্টি হতো না।

প্রথম সার্থক ঐতিহাসিক পালার রচয়িতা হাওড়া জেলার কল্যাণপুরের হরিপদ চট্টোপাধ্যায় (১৮৭১-১৯২০) হুগলি নর্মাল স্কুলের এবং কলকাতা সংস্কৃত কলেজের ছাত্র ছিলেন। তার পালার রচনার বিশেষত্ব এই যে, পৌরাণিক কিংবা ঐতিহাসিক যে কাহিনীই হোক রূপক ও প্রতীকের মাধ্যমে স্বদেশচেতনায় মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা। এ কারণে ইংরেজ সরকার হরি পদের তিনখানা পালার ‘পদ্মিনী’, ‘রঞ্জিত রাজার জীবনযজ্ঞ’ ও ‘দুর্গাসুর’ বাজেয়াপ্ত করেছিল। যাত্রাপালাকার অঘোর চন্দ্র ভট্টাচার্য (১৮৭২-১৯৪৩) ছিলেন একজন স্কুলশিক্ষক। ভাষা ও ব্যাকরণে অগাধ পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি ‘কাব্যতীর্থ’ উপাধি পান। বাংলাদেশে নড়াইল জেলার মল্লিকপুরে তার জন্ম। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পালার : ‘মগধ বিজয়’, ‘দাতা কর্ণ’, ‘সমুদ্রমহন’, ‘হরিশচন্দ্র’ ও ‘অনন্ত মাহাত্ম্য’। অনন্ত মাহাত্ম্য যাত্রাপালায় অভিনয় করেন নোয়াখালীর বেগমগঞ্জের নারী চরিত্রের বিখ্যাত অভিনয়শিল্পী নগেন নন্দী (১৯০৩-১৯৮৪)।

পরিবর্তন, পরিমার্জন ও সংস্কারের মধ্য দিয়ে যাত্রাকে সমৃদ্ধশালী করার ক্ষেত্রে এক বিশিষ্ট নাম ভোলানাথ রায় (১৮৯১-১৯৩৩)। বর্ধমান জেলার রায়ান গ্রামের অধিবাসী এই পালাকারের স্বতন্ত্র শিল্পচেতনা যাত্রার যাত্রাপথকে গতিশীল করেছে। যাত্রাপালায় দার্শনিক যুক্তিতর্কের চাতুর্যময় সংলাপ বুননের প্রথম কৃতিত্ব তার। যাত্রার প্রচলিত অসম্ভব দীর্ঘ সংলাপকে যথাসম্ভব ক্ষুদ্রাকৃতি করার পরীক্ষা-নিরীক্ষাও প্রথম তার হাতেই। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় হাটে-মাঠে খোলা প্রান্তরে যাত্রা প্রদর্শনী যখন অবরুদ্ধ হয়ে পড়ল, তখন ভোলানাথ রায়ের ‘পৃথিবী’ পালাটি মঞ্চায়িত হয় কলকাতার মনমোহন থিয়েটারে। প্রসেনিয়াম মঞ্চে বিশেষ ব্যবস্থায় এটাই প্রথম যাত্রানুষ্ঠান। ১৯১৬ সালের ১৬ অক্টোবর গণেশ অপেরা পার্টির পরিবেশনায় এ যাত্রা সম্পর্কে পরদিন অমৃতবাজার পত্রিকার রিপোর্ট : Last Tuesday (16 October, 1971) at 5. p.m the Ganesh opera party held a performance of the grand mythological five-act drama Babu Bholanath Roy called the ‘Prithivi’ on the Stage of Monomohon Theatre, which was filled up with the highest number of enthusiastic audience.

১৯২১ সালে কাজী নজরুল ইসলামের ‘বিনোদী’ কবিতা ভাব, ভাষা, ছন্দে সাহিত্যঙ্গনে যেমন নতুন জাগরণ নিয়ে আসে, তেমন একই বছরে প্রকাশিত ভোলানাথ রায়ের ‘আদিশূর’ পালাটিও যাত্রাশিল্পে আলোড়ন সৃষ্টি করে। এ পালায় সঙ্গীতের মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের একটি চিত্র তিনি তুলে ধরেছেন। প্রথম দুই পঙ্ক্তি—

‘আমার সোনার বাঙ্গালা

দেশ

সোনায়ে গড়া সযতনে নখ

হতে দূর মাথার কেশ’

শৃঙ্খলিত বাঙালি জাতির মুক্তির জন্য আশু প্রয়োজন এক ঐক্যবদ্ধ লড়াই। এ একটি মাত্র বক্তব্যই তিনি পৌরাণিক ধাঁচে প্রতীক ও উপমা দিয়ে প্রকাশ করেছেন ‘জরাসন্ধ’ পালায় (১৯৩০)। ইংরেজ শাসকরা পালাটি বাজেয়াপ্ত করে। বাংলা ভাষায় অগাধ পাণ্ডিত্যের জন্য ভোলানাথ রায় ‘কাব্যশাস্ত্রী’ উপাধি পান। কাব্যশাস্ত্রীর উত্তরসূরীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য তিনজন পালাকার হলেন হাওড়া জেলার সাতরাগাছির ফণীভূষণ মুখোপাধ্যায় (১৮৯৩-১৯৬৮), চব্বিশ পরগনার রামনগর গ্রামের সৌরিন্দ্র মোহন চট্টোপাধ্যায় (১৯০০-১৯৯৮) এবং হুগলী জেলার পাকড়ি গ্রামের বিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (১৯০২-১৯৬৬)। ফণীভূষণ যাত্রাজগতে ‘বড় ফণীবাবু’ নামে পরিচিত। শিক্ষাদীক্ষায়, জ্ঞানবুদ্ধিতে সকালে তার স্থান ছিল সর্বোচ্চে। তাকে বলা হয় ‘পণ্ডিত পালাকার’। যেজন্য ‘বিদ্যাবিনোদ’ শব্দালঙ্কারটি তার নামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। বিশ শতকের শুরু থেকেই দেখা যায় শিক্ষিত পালাকাররা যে বিষয়বস্তু এবং যে ঢংয়েই যাত্রার

বই লেখেন না কেন, তার অন্তর্নিহিত মূল সুরটি ছিল দেশপ্রেম। শব্দ ও সংলাপের ঝঞ্ঝারে ধ্বনিত হতো ঔপনিবেশিক শাসক চক্রের কবল থেকে বাংলা ও বাঙালির মুক্তির বারতা। এসব পালা কাহিনী জনগণের মধ্যে বিদ্রোহের আগুন জ্বালাতে পারে— এ আশঙ্কায় ব্রিটিশ সরকার তীব্রসম্মত হয়ে মুকুন্দ দাস থেকে পরবর্তীকালের অনেক লেখকের পালা বাজেয়াপ্ত করে। কোনো কোনো পালা লেখককে কারাবরণও করতে হয়েছে। বড় ফণীবাবুও শ্বেতাঙ্গ ‘প্রভু’দের চক্ষুশূল ছিলেন। ‘নির্বাচিত বাংলা যাত্রা’ সংকলনের তৃতীয় খণ্ডের ভূমিকায় দেবজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন : “ফণীভূষণের ‘বামন অবতার’ আর ‘রত্নেশ্বর’ পালায় অভিনয় বন্ধ হয় ব্রিটিশ পুলিশের রোষে। এ ছাড়া তার ‘মুক্তি’ যাত্রাপালা রাজরোষে পড়ে।” মঞ্চ ও যাত্রার অভিনয়ের রীতিনীতি নিয়ে ‘অভিনয় শিক্ষা’ নামে একটি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন ফণীভূষণ বিদ্যাবিনোদ। স্কুলশিক্ষক সৌরিন্দ্র মোহন চট্টোপাধ্যায় যাত্রাপালা রচনার পাশাপাশি সাময়িকীতে গল্প-কবিতা লিখতেন। ‘ধর্মবল’, ‘আত্মহুতি’, ‘ব্যথার পূজা’, ‘পলাশীর পরে’ প্রভৃতি তার সৃষ্টিশীল পালা রচনা। তার বিশেষ কৃতিত্ব বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘চন্দ্রশেখর’ উপন্যাসের পালারূপ দেয়া। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আদর্শ শিক্ষক হিসেবে সরকারি পদক লাভ করেন পালাকার বিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (১৯০২-১৯৬৬)। স্বদেশ চেতনা ও সাম্য-সম্প্রীতির জয়গানের পাশাপাশি তার পালায় উঠে এসেছে চোরাকারবারি, কালোবাজারীদের দৌরাড্যা, সরকারি আশ্রয়-প্রশ্রয়ে দুর্নীতি ইত্যাকার বিষয়ে মূল্যবোধের অবক্ষয়ের চিত্র। তার রচিত পালায় তালিকায় রয়েছে : ‘রক্তকমল’, ‘সংগ্রাম’, ‘মাটির প্রেম’, ‘বেইমান’ ও ‘ভুলের কাজল’।

১৯৩০ সাল। স্বদেশি যাত্রা থেকে আর এক নতুন যাত্রার জন্ম ‘ইমাম যাত্রা’। মীর মশাররফ হোসেনের (১৮৪৭-১৯১১) ‘বিষাদ-সিন্ধু’ অবলম্বনে রচিত এজিদ বধ, জয়নাল উদ্ধার, সখিনার বিলাপ— এ তিনখানা পালা নিয়েই ইমাম যাত্রার নামকরণ। একসময় যাত্রাপালা বলতেই হিন্দু দেবদেবীদের পুরাণনির্ভর কাহিনীই বোঝাত। তারপর রাজা-বাদশাহদের বীরত্বগাথা নিয়ে ঐতিহাসিক পালা রচনার একটি ধারা গড়ে ওঠে। মুসলিম ঐতিহ্য ও ধর্মীয় আখ্যানভিত্তিক পালা যাত্রার আসরে পরিবেশিত হবে সমকালীন সমাজে এটা ছিল কল্পনাভীত ব্যাপার। বরিশালের বাকেরগঞ্জ উপজেলার দুধল গ্রামের স্বশিক্ষিত পালাকার মোজাহের আলী শিকদার (১৯১০-১৯৮৫) সেই কল্পনাকে যখন বাস্তবে রূপ দিলেন, মীর মশাররফ হোসেনকে নিয়ে এলেন যাত্রার আসরে, তখনই এ শিল্পের ইতিহাসে উন্মোচিত হলো এক নতুন অধ্যায়। ইমাম যাত্রার রচয়িতা হিসেবে খ্যাত হলেন মোজাহের শিকদার। তার দলের নাম ছিল মুসলিম যাত্রা পার্টি। এখানেও আমরা দেখতে পাই এক ভিন্ন আদর্শিক চেতনা। ড. তপন বাগচী তার গবেষণাগ্রন্থে উল্লেখ করেছেন এটি মুসলিম পরিচালিত প্রথম যাত্রাদল।

স্বদেশি যাত্রার প্রভাবে দেশপ্রেমমূলক ঐতিহাসিক

যাত্রাপালা রচনার একটি ধারা গড়ে ওঠে অবিভক্ত বাংলাদেশে। স্বদেশি আন্দোলনের চেতনা সাধারণ মানুষের মধ্যে সঞ্চারিত করার দায়বোধ থেকে কোনো কোনো ঐতিহাসিক চরিত্রকে জাতীয় নায়ক হিসেবে মঞ্চে এনে দাঁড় করিয়েছেন পালা লেখক ও নাট্যকাররা। ১৯০৫ সালে মঞ্চায়িত গিরিশ ঘোষের সিরাজউদ্দৌলার কথা আগেই উল্লেখিত হয়েছে। এ ধারার পরবর্তী নাট্যরচনা : দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের (১৮৬৩-১৯১৩) ‘মেবার পতন’, ‘রানী দুর্গাবতী’; শচীন সেনগুপ্তের ‘গৈরিক পতাকা’, ‘নবাব সিরাজউদ্দৌল’ এবং যাত্রাপালা শাশাংক রায়ের ‘নবাব সিরাজ’। হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের আহ্বান জানিয়ে শচীন সেনগুপ্তের সিরাজ দাঁড়িয়েছেন মঞ্চে। মুখে তার সাম্য-সম্প্রীতির চিরায়ত সংলাপ : ‘বাংলা শুধু হিন্দুর নয়, বাংলা শুধু মুসলমানদের নয়। মিলিত হিন্দু-মুসলমানের মাতৃভূমি গুলবাগ এই বাংলা। এ ঐতিহাসিক ঘটনার ছয় বছর আগে ১৯৩২ সালে বাংলাদেশের এক বিখ্যাত যাত্রাপালাকার ব্রজেন্দ্র কুমার দে’র (১৯০৭-১৯৭৬) আত্মপ্রকাশ। পেশাদার যাত্রাদল গণেশ অপেরা পার্টির জন্য প্রথম পালা লিখলেন ‘বজ্রনাভ’। বিশিষ্ট যাত্রানট একুশে পদকপ্রাপ্ত অমলেন্দু বিশ্বাস (১৯২৫-১৯৮৭) রামেন্দু মজুমদার সম্পাদিত ত্রৈমাসিক ‘থিয়েটার’-এ (এপ্রিল-মে-জুন সংখ্যা ১৯৮৭) ‘যাত্রার অতীত ও বর্তমান’ নিবন্ধে ব্রজেন দে সম্পর্কে লিখেছেন : ‘১৯৩২ সালে যাত্রাঙ্গনে আরেক মাহেন্দ্রক্ষণ উপস্থিত হলো। আধুনিক যুগের আদ্যভাগে ক্ষুরধার লেখনী হস্তে যাত্রাপালাকার রূপে আবির্ভূত হলেন পালাসম্রাট ব্রজেন্দ্র কুমার দে। শিক্ষকতার পেশায় নিযুক্ত থেকেও তিনি পঞ্চাশ বছর যাবৎ যাত্রাপালা রচনায় নিবেদিত ছিলেন।’ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দামামা, ১৯৪০ সালে ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক অস্থিরতা, ১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষ— এ পটভূমিতে প্রগতিশীল ধারার লেখক ও নাট্যকর্মীদের সম্মিলিত উদ্যোগে গড়ে ওঠে সর্বভারতীয় গণনাট্য সংঘের নবনাট্য আন্দোলন। এ নতুন নাট্যধারার সূচনা বিজন ভট্টাচার্যের (১৯১৫-১৯৭৮) ‘নবান্ন’ নাটক দিয়ে। এর প্রভাব পড়ে যাত্রায়ও। দুর্ভিক্ষের জন্য মহাজন মজুমদার ও চোরাকারবারীদের দায়ী করে ব্রজেন্দ্র কুমার দে লিখলেন যাত্রাপালা ‘আকালের দেশ’। অনেকে এ পালাটিকে সামাজিক পালা হিসেবে উল্লেখ করেন। পালাকার নিজেই বলেছেন এটি আধাসামাজিক পালা। প্রথম পূর্ণাঙ্গ সামাজিক পালা ‘নিষিদ্ধ ফল’ বা ‘দোষী কে’ তিনি রচনা করেন ১৯৬০ সালে। ‘আকালের দেশ’ অভিনীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিপথগামী উচ্ছৃঙ্খল ব্যবসায়ী-রা পালাকারের ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। ফলে নিজের জন্মভূমি (শরীয়তপুর জেলার গঙ্গানগর গ্রাম) ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গে চলে যেতে বাধ্য হন তিনি।

১৯৪৭ থেকে ১৯৭১-এ ২৪ বছরে সংগঠিত যাত্রাদলের সংখ্যা ছিল ২৬। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি দল : ব্রাহ্মপাড়ার জয়দুর্গা অপেরা, ভাগ্যলক্ষী অপেরা, রয়েল ভোলানাথ অপেরা, চট্টগ্রামের গীতশ্রী মুক্তমঞ্চ নাট্য প্রতিষ্ঠান, ময়মন-

সিংহের গণেশ অপেরা, নবরঞ্জন অপেরা, ফরিদপুরের নিউ বাসন্তী অপেরা, সাতক্ষীরার আর্থ অপেরা, মানিকগঞ্জের অম্বিকা নাট্য প্রতিষ্ঠান, জগন্নাথ অপেরা এবং গোপালগঞ্জের রায় কোম্পানি যাত্রা পার্টি, দীপালি অপেরা, বালকাঠির নাথ কোম্পানি, সিরাজগঞ্জের বাসন্তী অপেরা। পূর্ব পাকিস্তানের বহুল আলোচিত ভিন্নধর্মী একটি যাত্রা দল গড়ে ওঠে চট্টগ্রামে, ১৯৫৮ সালে। নাম বাবুল অপেরা। প্রতিষ্ঠাতা-২০, ঘাটফরহাদবেগ লেনের একজন ব্যবসায়ী আমিন শরিফ চৌধুরী। এ দল থেকেই অমলেন্দু বিশ্বাস ও তুষার দাশগুপ্ত যাত্রার বড় মাপের অভিনেতা হিসেবে বিপুল খ্যাতির অধিকারী হন। এ দলটিই প্রথম যাত্রামঞ্চে নারী-পুরুষ সমন্বয়ে সহ-অভিনয়প্রথা চালু করে। আমাদের জাতীয় জাগরণের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় অধ্যায় '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান। সেই ক্রান্তিকালে চলচ্চিত্রকার জহির রায়হান বানালেন 'জীবন থেকে নেয়া'। কিন্তু এটা অনেকেরই অজানা যে, তারও আগে চট্টগ্রামের বাবুল অপেরার পরিবেশনায় গণআন্দোলনভিত্তিক পালা 'একটি পয়সা' মঞ্চে আসে ১৯৬৮ সালে। টাঙ্গাইলের মির্জাপুরে দানবীর রণদাপ্রসাদ সাহার পূজোবাড়িতে (আশানন্দ হল) ভৈরবনাথ গঙ্গোপাধ্যায় রচিত পালাটি প্রথম মঞ্চস্থ হয়। কেন্দ্রীয় চরিত্রের অভিনেতা ছিলেন নটসম্রাট অমলেন্দু বিশ্বাস। '৭১-এর ৭ মার্চ। বঙ্গবন্ধুর বজ্রকণ্ঠে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয় : 'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম/এবারের সংগ্রাম

স্বাধীনতার সংগ্রাম।' চেতনার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ জ্বলে উঠেছিল যাত্রাশিল্পেও। ব্যানারে, ফেস্টুনে, দেয়ালে যাত্রাশিল্পীরা লিখলেন : 'এ দেশ ছাড়বি কিনা বল/নইলে কিলের চোটে হাড় করিব জল'। দেশাত্মবোধক পালা ও গণসঙ্গীতের সুরমূর্ছনায় বিভিন্ন দলের শিল্পীরা মাতিয়ে রাখেন বাংলার জনপদ। মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্যে শুরু হলো গ্রুপ থিয়েটার নাট্যচর্চা। সমাজজীবনের নতুন একতান বেজে উঠল যাত্রামঞ্চেও। ১৯৭৩ সালে চট্টগ্রামে 'থিয়েটার-৭৩'-এর প্রতিষ্ঠা। ওই বছরের ২৫ জানুয়ারি চট্টগ্রামেরই যাত্রাদল বাবুল অপেরা যশোরের সাগরদাঁড়ির মধুমেলায় পরিবেশন করে বিধায়ক ভট্টাচার্য রচিত যাত্রাপালা 'বিদ্রোহী মাইকেল মধুসূদন'। এ মঞ্চায়নের নেপথ্যে যার বিশেষ ভূমিকা ছিল, তিনি যশোরের তদানীন্তন জেলা প্রশাসক আবদুস সামাদ। মধুসূদন চরিত্রে অভিনয় করে অমলেন্দু বিশ্বাস দেশীয় যাত্রাভিনয়ের একটি নতুন ধারার পথিকৃৎ হয়ে রইলেন। এরই ধারাবাহিকতায় পরবর্তীতে আমরা দেখি চট্টগ্রামের গীতশ্রী যাত্রা ইউনিটের লেনিন (১৯৭৪), মানিকগঞ্জের চারণিক নাট্যগোষ্ঠীর হিটলার (১৯৭৫), সিরাজগঞ্জের বাগীশী নাট্য প্রতিষ্ঠানের জানোয়ার (১৯৭৬), চট্টগ্রামের নবরঞ্জন নাট্য সংস্থার নটি বিনোদিনী (১৯৭৬), সিরাজগঞ্জের বাসন্তী অপেরার মা-মাটি-মানুষ (১৯৭৯), মানিকগঞ্জের নিউ গণেশ অপেরার বিদ্রোহী নজরুল (১৯৭৯), খুলনার শিরিন যাত্রা

ইউনিটের ক্রিওপেট্রা ও দস্যু রানী ফুলন দেবী (১৯৮০) এবং ময়মনসিংহের নবরঞ্জন অপেরার চিড়িয়াখানা (১৯৮১) প্রভৃতি উন্নতমানের পালা। স্বাধীনতার প্রথম ১০ বছরে ঐতিহ্যবাহী যাত্রাভিনয়ের যে গুণগতমান আমরা দেখলাম, এর ধারাবাহিকতা পরে আর রক্ষা করা যায়নি। ১৯৯০-এর পরের ইতিহাস, যাত্রাশিল্পের শুধু অবক্ষয়ের ইতিহাস। রাষ্ট্রীয় নিষেধাজ্ঞা, প্রশাসনিক জটিলতা আর অশীলতার আগ্রাসন ঐতিহ্যবাহী এ শিল্পকে ঠেলে দিয়েছে একেবারে ধ্বংসের অতলে। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির যাত্রাশিল্পের সার্বিক উন্নয়নে তেমন কোনো বড় ধরনের উদ্যোগ কখনো দেখা যায়নি। কেবল কয়েকটি যাত্রা উৎসবের মধ্যেই একাডেমির যাত্রাবিষয়ক কার্যক্রম সীমাবদ্ধ থেকেছে। যাত্রাশিল্পীদের দীর্ঘদিনের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে একটি যাত্রা-নীতিমালা গেজেটভুক্ত হলেও এর সুফল পাচ্ছেন না শিল্পীরা। সমগ্র জাতির জন্য দুর্ভাগ্যজনক যে, এ দেশে জাতীয় নাট্যশালা, চিত্রশালা, সঙ্গীত ও নৃত্যচর্চা কেন্দ্র সর্বই আছে। কিন্তু নেই একটি জাতীয় যাত্রামঞ্চ। কবি শামসুর রাহমান একদা বলেছিলেন, 'যাত্রা বাংলাদেশের হৃদয় থেকে উঠে এসেছে।' কিন্তু পরিতাপের বিষয়, এ দেশে এ মাটিতেই অবগুণীকৃত দুর্ভোগের কবলে ধুঁকে ধুঁকে মরছে এ শিল্পটি। সঠিকভাবে পরিচর্যা, লালন ও সংরক্ষণ অর্থাৎ জাতীয় পৃষ্ঠপোষকতা পাওয়া না গেলে আমাদের আশঙ্কা, বাংলার গৌরবদীপ্ত যাত্রাশিল্প স্থানান্তরিত হবে জাদুঘরে।





গল্প

ওস্তাদ

আফরোজা পারভীন

ছেলেবেলায় প্রতি শুক্রবার আরবি পড়তে হতো রোকেয়াকে। সিপারা হাতে সে যেত ওস্তাদজির কাছে। এটাতে গাফিলতি দেয়ার কোনো সুযোগ ছিল না। আবার কড়া নজর থাকত মেয়ে ঠিকমতো আরবি পড়তে যাচ্ছে কিনা সেদিকে। অন্যান্য ব্যাপারে সংসারের খেয়াল আবার কমই রাখতেন। রাখতেন না বললেই চলে। তা নিয়ে মায়ের অভিযোগের অন্ত ছিল না। কখনই নিজে হাতে বাজার করতেন না আবার। অথচ সেকালের দিনে চাকর-বাকর বা ড্রাইভার-পিয়ন দিয়ে বাজার করানোর কথা কেউ ভাবত না। বাজার করাটা তখন রীতিমতো বিলাসিতার ব্যাপারই ছিল। চট্টের থলির বাইরে মাছের লেজটা বেরিয়ে থাকবে আর যে দেখবে সেই বলবে, কত হলো ভাইজান? আর ভাইজান হেসে হেসে দামটা বলবেন— এর মজাই ছিল আলাদা। কিংবা জোড়া

মুরগির চার ঠ্যাং এক হাতে চেপে ধরে আরেক হাতে থলে ঝুলিয়ে বাজার থেকে ফেরা আর মোরগের ক্রমাগত ককরক ডাকও উপভোগ করত বাজারিরা। কিন্তু আবার সেসবের বালাই ছিল না। সারা বছর চাকর পাঠিয়ে বাজার করাতেন তিনি। আর জিনিসও আসত প্রচুর। সকালেই শুরু হতো মায়ের চোঁচামেচি, চিৎকার। পরিস্থিতি এমন হয়ে গিয়েছিল যে, যেদিন ভালো বাজার আসত সেদিনও মা চিৎকার করতেন। তা দেখে রোকেয়ার মনে হতো খারাপ বাজার আসার কারণে মা যতটা রাগেন আবার বাজারে না যাওয়ার কারণে তার চেয়ে অনেক বেশি। আর আবারও যেন ধনুক ভাঙা পণ করে বসেছিলেন বাজারে তিনি যাবেনই না। শুধু বাজার নয়, অন্য সব ব্যাপারেও ছিল একই অবস্থা। রোকেয়ার পড়াশোনার খেয়ালও তিনি

নিতেন না। মাঝে মাঝেই ভুলে যেতেন সে কোন ক্লাসে পড়ে। কেউ জিজ্ঞাসা করলে রোকেয়াকে ডেকে বলতেন, মা কেয়া! তুই যেন কোন ক্লাসে পড়িস। রাগ করিস না, আমি মনে রাখতে পারি না।

এ নিয়েও মায়ের সঙ্গে লেগে যেত। মা চরম খেদের সঙ্গে বলতেন, সাতটা না পাঁচটা না একটামাত্র মেয়ে আমাদের। একটাই তো মাত্র সন্তান। তা সে কোন ক্লাসে পড়ে তা তোমার মনে থাকে না! না, না, এটা আমি মনে নিতে পারি না। অবস্থা যা চলছে যে কোনো দিন তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করে বসবে তুমি যেন কে? চিনি চিনি মনে হচ্ছে!

আব্বা হাসতেন। আর সে হাসি দেখে আরো রেগে যেতেন মা।

না, হেসো না, হেসো না। হেসো না বলছি। তোমার হাসি দেখলে আমার পিঠি জ্বলে যায়। মেয়ে কোন ক্লাসে পড়ে জিজ্ঞাসা করতে তোমার লজ্জা করে না!

সংসারের সব ব্যাপারে যে আব্বার এত নির্লিপ্ততা সেই আব্বাই রোকেয়াকে আরবি পড়তে পাঠানোর ব্যাপারে ছিলেন বড়ই সজাগ। ওস্তাদজিকে তিনিই ঠিক করেছিলেন। নিজের বাড়ির বারান্দায় শূক্ৰবার সকালে আটটা মেয়েকে পড়াতেন তিনি। মাসে পঞ্চাশ টাকা করে দিতে হতো তাকে। শূক্ৰবার সকাল হলেই মাকে তাড়া লাগাতেন আব্বা, ‘তাড়াতাড়ি কেয়াকে ওস্তাদজির কাছে পাঠাও। দেরি হয়ে যাচ্ছে।’ পড়ে ফিরলে জিজ্ঞাসা করতেন, ‘আজ কী পড়লি মা? ওস্তাদজি কী পড়ালেন?’

এ ব্যাপারেও মার আপত্তি ছিল। না, আরবি পড়ার ব্যাপারে আপত্তি নয়, মায়ের আপত্তি হলো শুধুই কেন আরবি! গান নয়, নাচ নয়, ছবি আঁকা নয়, খালি আরবি কেন? আরবি পড়ুক, সঙ্গে গানটাও শিখুক। লড়াই করার ভঙ্গিতে কোমরে কাপড় জড়িয়ে মা আব্বার সামনে হাজির হয়েছিলেন। চড়া সুরে বলেছিলেন, কেয়া কেন শুধু আরবিই পড়বে শুনি? ওকে আমি গানের স্কুলে ভর্তি করে দেব। গান না, নাচ না, ছবি আঁকা না, খালি আরবি! কেন শুনি? আমি তোমার কোনো আপত্তিই শুনব না। ওকে আমি ভর্তি করবই... মাকে থামিয়ে দিয়েছিলেন আব্বা। মৃদুকণ্ঠে বলেছিলেন, আপত্তি করব কেন? ও গান শিখুক। আর যা যা ইচ্ছা তাও শিখুক। শেখা তো ভালো। আর তোমার কথায় আমি আপত্তি করব কেন? মোটেও না। আমি একটু অলস মানুষ আর একটু ভুলো স্বভাবের, তাই হয়তো তোমার সব কথা শোনা হয় না। তোমার যা ইচ্ছা ওকে শেখাও। শুধু আরবিটা বাদ দিও না। আমার মায়ের ইচ্ছা ছিল তো তাই।

এ কথায় মা চুপসে গিয়েছিলেন। খানিকটা লজ্জাও পেয়েছিলেন। আপন মনে নিজেকে ধিক্কার দিয়েছিলেন, ‘আমার এভাবে বলা মোটেও ঠিক হয়নি। ছি ছি, খুব অন্যায্য হয়েছে। মানুষটা না জানি মনে কতটা কষ্ট পেলে।’

রোকেয়ার সেদিন খুব ভালো লেগেছিল মা আব্বার এই গোপন শ্রদ্ধার ব্যাপারটা দেখে।

মা রোকেয়াকে গানের স্কুলে ভর্তি করে দিলেন। আর সে স্কুলও ওই শূক্ৰবারেই। সময় নিয়ে

অসুবিধা হলে ওস্তাদজি সময়টা একটু বদলে দিয়েছিলেন। সকালের জায়গায় বিকালে। বিকালে একাই পড়ত রোকেয়া। তবে পঞ্চাশের জায়গায় একশ দিতে হতো তাকে।

সেই ছেলেবেলায় অন্য দশটা ছেলেমেয়ের মতো রোকেয়ার মনেও ছিল অনেক কৌতূহল। ওস্তাদজিকে নিয়েও তার কৌতূহলের অন্ত ছিল না। প্রথম কৌতূহল তাকে কেন সবাই ওস্তাদজি ডাকে!

ওস্তাদজির বাড়ি নোয়াখালী। অথচ কথা বলেন শুদ্ধ ভাষায়। নোয়াখালীর লেশ তাতে নেই। তিনি এখানে এসে বসতি গেড়েছেন। বসতি গাড়াটা কী বিষয়, তা বুঝতেও সময় লেগেছিল রোকেয়ার। তবে একসময় বুঝেছিল বসতি গাড়া মানে বাড়ি বানিয়ে থাকা। একজন ভুল শূধরে দিয়ে বলেছিল, আরে শূধু থাকা নয়, একেবারে থাকা। বদলির চাকরিতে যেমন আসে থাকে চলে যায়, তেমন নয়। ওস্তাদজির বয়স পঞ্চান্নর ওপরে। টকটকে ফরসা রং। মাথায় পাগড়ি, পরনে লম্বা ঢোলা পাঞ্জাবি, কাঁধে হাজীদের মতো লাল সাদা চাদর, চোখে সুরমা, নাকে আতর, সারাশরৎ তসবি টেপেন। কে যেন বলেছিল তার পূর্বপুরুষ আরব থেকে এসেছিল। আচ্ছা কেন এসেছিল? আর এলোই যদি নোয়াখালী থেকে নড়াইলে এলো কেন? আর কী সুরেলা গলা! সুরাগুলো যখন পড়েন মনে হয় মধু বারে বারে পড়ছে। আচ্ছা তিনি গান না শিখিয়ে এই আরবি শেখাতে গেলেন কেন? তার বাড়ি নিয়েও রোকেয়ার অপার কৌতূহল। বাড়ির বারান্দা পর্যন্তই রোকেয়ার যাওয়া-আসা। ও সামনের দরজায় টোকা দেয়। ওস্তাদজি দরজা খুলে দেন। তারপর বারান্দার চৌকিতে বসে রোকেয়া। চৌকিটা নড়বড়ে। তার ওপরে লাল সবুজ সুতোয় ফুল পাতা তোলা একটা কাঁথা। সবুজ সুতোয় বোধহয় কম পড়ে গিয়েছিল। কিছু পাতার রং নীল। নীল রঙের পাতা হয় নাকি! ঘরের একপাশের বেড়ায় ঝোলানো সেলাই করে বাঁধানো একটা আয়াতুল কুরসি। আর একপাশে একখানা তালপাতার পাখা। পাখার চারপাশ লাল কাপড়ে মোড়া। মাঝে মাঝে সেখানা পেড়ে নিজেই বাতাস খান ওস্তাদজি। সেই কাঁথার ওপরেই বসে রোকেয়া। পড়া শুরু হয়। এভাবেই চলছে। কোনো দিন ও বাড়ি থেকে কাউকে সে বের হতে দেখেনি বা ঢুকতে দেখেনি। ওস্তাদজি কি একাই থাকেন? কে রান্না করে দেয়, অসুখ হলে কে দেখে! অনেক কৌতূহল তার। কিন্তু মা বলেছেন কারো ব্যক্তিগত ব্যাপারে অকারণ কৌতূহল ভালো নয়। এটা কি কারণ কৌতূহল না অকারণ কৌতূহল? তাই তো জানে না রোকেয়া।

আগে তা জানতে হবে তারপর ওস্তাদজি সম্পর্কে মাকে প্রশ্ন করবে রোকেয়া।

এত ভাবনার পরও কিন্তু কৌতূহল দাবিয়ে রাখতে পারে না রোকেয়া। সেদিন মাকে জিজ্ঞাসা করে, আচ্ছা মা! ওনাকে সবাই ওস্তাদজি বলে কেন? মা খানিকটা হকচকিয়ে যান। তারপর একটু ভেবে নিয়ে বলেন, উনি তোদের শেখান, মাস্টার তো তাই। তাহলে ওনাকে স্যার বা মাস্টার বলে না কেন? মা একটু ঘাবড়ে গিয়ে হেসে ফেলেন। বলেন, তা তো জানি না!

দুই.

এক শূক্ৰবার বিকালে গিয়ে ওস্তাদজির বাড়ির দরজায় টোকা দেয় রোকেয়া। টোকা দিতেই থাকে। কোনো সাড়া নেই। এরপর রোকেয়া ডাকে, ওস্তাদজি ওস্তাদজি। কেউ আসে না, দরজাও খোলে না। এখন রোকেয়া কী করবে? ফিরে যাবে? কিন্তু না পড়ে ফিরে গেলে আব্বাকে কী বলবে! আব্বা অন্য দিনের মতো আজো জানতে চাইবেন সে কী পড়ে এলো। রোকেয়া আব্বারো দরজায় টোকা দেয়। সাড়া নেই। রোকেয়া অসহায়ভাবে এদিক-ওদিক তাকায়। রাত্তার দিকে এগোয়। প্রচণ্ড পিপাসাও পেয়েছে তার। পানি খাওয়া দরকার। ও রাত্তার দিকে এগোয়। তখনই দরজাটা সামান্য ফাঁক হয় আর ভেতর থেকে মৃদু কণ্ঠস্বর ভেসে আসে, ‘উনি তো বাড়িতে নেই। আপনি একটু বসেন।’ কিন্তু আমি বসব কী করে, আপনি তো দরজা খোলেননি!

ও তাই তো, আসেন।

আস্তে করে দরজাটা খুলে যায়। ডোরে শাড়ি পরা কেউ একজন সন্তর্পণে দরজার কবাতের পেছনে দাঁড়ায় যেন তাকে দেখা না যায় এমনভাবে। রোকেয়া ভেতরে ঢোকে। বারান্দার চৌকিতে বসে। বলে, ওস্তাদজি কোথায়? কখন আসবেন? উনি একটু কাজে গেছেন। এসে পড়বেন। আপনি কে? ওভাবে লুকিয়ে আছেন কেন? সামনে আসেন।

আমি ওনার বিবি। কারো সামনে যাওয়া আমার বারণ। আমরা পর্দায় থাকি। আমরা মানে? আর কে?

আমার বড় সতীন। আর একজন বেপর্দা হয়েছিল বলে ওস্তাদজি তারে তালুক দিয়েছেন। পুরন্বের কুনজর লেগেছিল।

কিন্তু আমি তো একটা ছোট্ট মেয়ে।

তবুও, আমি যাই। উনি দেখলে মারবেন।

মেয়েটা দ্রুত এগোয়। ছোট্ট একটা মেয়ে, রোকেয়ারই বয়সী। গলা সমান লম্বা ঘোমটা। পায়ে পায়ে কাপড় জড়িয়ে যাচ্ছে। কী কাণ্ড! এই বাচ্চা মেয়েটা ওস্তাদজির বউ! আর একে ওস্তাদজি মারেনও!

শুনুন!

মেয়েটা ঘুরে তাকায়। তার মাথার ঘোমটা খসে পড়ে। কী অপূর্ব দৃষ্টি সরল চোখ! মেয়েটা তড়িঘড়ি আব্বার ঘোমটা ওঠাতে যায়। রোকেয়া বলে, অত তাড়াছড়ো করছেন কেন! কেউ তো নেই এখানে। তবুও।

মেয়েটা আঁচল তুলে দেয় মাথায়। অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে বলে, কী বলছেন, ডাকলেন কেন? আমাকে এক গ্লাস পানি দেবেন? খুব পিপাসা পেয়েছে।

অবশ্যই দেব। পানি খাওয়ানো ফরজ।

মেয়েটা দ্রুত চলে যায়। একটু পরই এক গ্লাস পানি নিয়ে আসে। পানিটা ঠক করে খাটের একপাশে নামিয়ে রেখে ও যেতে উদ্ভত হয়। যেতে যেতে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে, পানি খেয়ে নেন। আমি গ্লাস নিয়ে যাই। আপনাকে উনি বসাতে বলে যান নাই। আমার সতীনকে বলেছিলেন, আপনি যেন একটু বাইরে অপেক্ষা করেন। আমার মনে



ছিল না। আমার সতীন জায়নামাজে তাই আমি ভুল করে ফেলেছি।
তাতে কী হয়েছে! আপনি তো ভালো কাজই করেছেন। অতক্ষণ কেউ বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে! আপনি একটু বসুন না। আপনার সঙ্গে একটু গল্প করি।
মেয়েটা ভয়ে ভয়ে এদিক-ওদিক তাকায়, তারপর বলে, কিন্তু উনি যদি চলে আসেন?
আসলে আসবেন। তাকে অত ভয় পান কেন আপনি?
ভয় পাব না, উনি আমাকে ভাত দেন, কাপড় দেন।
সে তো দেবেনই। আপনি তার বিবি। আমার আকাও তো আমার মাকে ভাত দেন কাপড় দেন। কই মা তো আকাকে ভয় পান না। বরং মা আকাকে বকুনিও দেন।
এবার মেয়েটা কৌতূহলী চোখে রোকেয়ার দিকে তাকায়। তারপর আস্তে আস্তে বসে তার পাশে। বলে, আপনার মা আপনার আকাকে বকেন? হ্যাঁ বকেন। ভুল করলে, অন্যায় করলে বকবেন না! মা ভুল করলে আকাও বকেন।
পুরুষ ভুল করলে, অন্যায় করলে বকা যায়! ওরা কি ভুল করে?
করবে না কেন! তারা কি মানুষ না! মানুষমাত্রই ভুল করে, অন্যায় করে।
আচ্ছা আপনার মা যে আকাকে বকেন তিনি আপনার মাকে মারেন না?
কী আশ্চর্য, মারবেন কেন! ভদ্রলোক কাউকে মারে নাকি?
মেয়েটা অবাক চোখে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকে। তারপর আচমকা বলে, আপনার মা নিশ্চয়ই আমার মতো গরিব ঘরের না। খাওয়াতে পরাতে না পেরে আপনার মাকে নিশ্চয়ই আপনার আকার কাছে বিয়ে দেয়া হয়নি। আমার তাই হয়েছে। আমার আকা-মা বড় গরিব জানেন। গরিব বলে ভাত-কাপড়ের অভাবে এই বুড়া লোকটার সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়েছে।
মেয়েটা ঝরঝর করে কাঁদতে থাকে। আর তখনই বাইরে ওস্তাদজির গলা শোনা যায়।
তিন.
সেদিন ওস্তাদজির ছোট বিবিকে কতটা মারধর করা হয়েছিল জানে না রোকেয়া। ওর সামনে হয়নি। তবে ওস্তাদের গলা শোনামাত্র কাঁপতে কাঁপতে ঘরের ভেতরে ঢুকে গিয়েছিল ওস্তাদজির বউ আর ওস্তাদজি সেদিকে তাকিয়ে রক্তচক্ষু মেলে বলেছিল, তুমি এখানে বেপদা অবস্থায় কেন হ্যাঁ?
রোকেয়া দ্রুত বলেছিল, তার কোনো দোষ নেই, তাকে মারবেন না। আমি পানি খেতে চেয়েছি তাই। বলেই বুঝতে পেরেছিল কী মারাত্মক ভুল সে করে ফেলেছে! ঘরের দিকে যাচ্ছিলেন ওস্তাদজি।
‘মারবেন না’ কথাটা শোনামাত্র ঘুরে দাঁড়িয়েছিলেন। সাপের মতো হিসহিস করে বলেছিলেন, মারব কেন ওকে হ্যাঁ! মারব কেন! ও বলেছে বুঝি তোমাকে? যাও আজ আর পড়াব না। বাড়ি যাও।
চোখে পানি নিয়ে ওই বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল রোকেয়া। অনেকক্ষণ একা একা পুকুরঘাটে বসে ছিল। হু হু করে কেঁদেছিল ওস্তাদজির ছোট বিবির

জন্য, যে তার কেউ নয়। তারপর কিমুতে কিমুতে বাড়ি ফিরে এসেছিল। ওকে ওভাবে ফিরতে দেখে পড়ার কথা জিজ্ঞাসা করতে সব ভুলে গিয়েছিলেন আকা। ভয়মাখা কণ্ঠে বলেছিলেন, কী হয়েছে মা? অসুখ করেছে?
সেদিন রাতে সত্যিই জ্বর এসেছিল রোকেয়ার। সে জ্বর ছিল টানা সাত দিন।
এরপর ওস্তাদজির বাড়িতে পড়তে গেছে, এসেছে যন্ত্রের মতো। অনেক চেষ্টা করেও ওস্তাদজির ছোট বিবিকে আর দেখেনি।
তবে তাকে ভোলেওনি। মাঝে মাঝেই মনে পড়েছে একটা কচি পানপাতা মুখ, ডোরে শাড়ি, ভীরা কণ্ঠস্বর। কোথায় সে! বেপদার কারণে তাকেও কি তালাক দিয়েছেন ওস্তাদজি! বেঁচে আছে তো? কোথাও না কোথাও।
আর সেই টকটকে ফরসা রঙের ওস্তাদজি। তার খবর কী? যাকে নিয়ে তার ছিল অপার কৌতূহল। মার কাছে জানতে চেয়েছিল কেন তাকে সবাই ওস্তাদ বলে!
চার.
একটা সরকারি কাজে ইসলামাবাদ এসেছে রোকেয়া। সেদিন ব্রেকফাস্টের পর হোটেলের লবিতে বসে পত্রিকার পাতা ওল্টাচ্ছিল। হোটেলের ম্যানেজার ফয়সল সাহেব এসে পাশে বসলেন। লন্ডন থেকে হোটেল ম্যানেজমেন্ট পড়ে এসেছেন। চেকস ম্যানেজার, বছর পঁয়ত্রিশ বয়স, ইংরেজিতে তুখোড়া। হোটেলের ভিআইপি ক্লায়েন্টদের প্রতি বিশেষ নজর তার। এতে যোগসূত্র বাড়ে। নতুন নতুন ক্লায়েন্ট পাওয়া যায়।
পাশের সোফায় বসে গল্প জুড়ে দিলেন। হাঁক দিয়ে দুই পেয়ালা চা-ও আনিয়ে নিলেন। নানান কথা হয়। রোকেয়া জানতে চায় তক্ষিলা যেতে কতটা সময় লাগে, মারি কত দূর, মোনাল স্পটটা পাহাড়ের কত ওপরে? ম্যানেজার পর্যটন স্পট আর শপিং প্লেসগুলোর খুঁটিনাটি রোকেয়াকে জানায়। এক পর্যায়ে সে জানতে চায়, রোকেয়া ঢাকায় কোথায় থাকে, কটা সন্তান তার, এসব। তারপর অপ্রাসঙ্গিকভাবেই বলে, আই হ্যাভ থ্রি ওয়াইভস অ্যাট এ টাইম। ওয়ান ফ্রম পাকিস্তান, ওয়ান আমেরিকা অ্যান্ড ওয়ান থাইল্যান্ড।
ওর কণ্ঠে গর্বের সুর। আনন্দের তো বটেই। বিস্মিত রোকেয়ার হাত থেকে চায়ের খানিকটা ছলকে পড়ে। সামাল দিতে দিতে বলে, ইউ হ্যাভ থ্রি ওয়াইভস!
হোয়াই নট! হোয়াই আর ইউ সো সারপ্রাইজড! ওয়ান লিভ ইন আমেরিকা অ্যান্ড আদার টু বোথ ইন এ হাউস। আর হ্যাভ মানি, আই হ্যাভ অ্যাবিলিটি, বোথ। নাউ আই অ্যাম থিংকিং ফর ফোর। মাই ফাদার হ্যাভ ফোর অ্যান্ড মাই গ্র্যান্ডফাদারস হ্যাভ সিক্স। বাট সিক্স আর নট অ্যালাউড ইন ইসলাম। সো হি ডিভোর্সড টু।
ও কথা বলছে। এর মাঝেই কাউন্টার থেকে ডাক আসে। ‘এক্সকিউজ মি’ বলে উঠে যায় ফয়সল। আর অবাক বিহ্বল অবসন্ন রোকেয়া সোফায় মাথা হেলিয়ে দেয়। ওর চোখের সামনে থেকে সরে যায় একটা পদা। সে পদায়ে ভেসে ওঠে একটা মুখ, ‘ওস্তাদজি’। ও এবার কাউন্টারে ম্যানেজারের দিকে তাকায়। এতদিনে ওস্তাদ শব্দটার মানে ও বুঝেছে।



গল্প

স্বপ্নের সিঁড়ি শূন্যতায়

রোকেয়া ইসলাম

সাইদ আহমেদ সাবির বেশ লম্বা লম্বা পা ফেলে হাঁটছে। তার পেছনে শুভ্রানীলা দূর দূর বক্ষে হাঁটছে। হাঁটতে গিয়ে পায়ে শাড়ি লেগে মূনু একটা শব্দ হয়। শব্দটা খেয়াল করতে গিয়ে দুই পায়ের ফাঁক গলিয়ে পেটিকেটসহ শাড়ি ঢুকে যায়। শুভ্রানীলা কর গুনে আজ মাত্র তিন দিন শাড়ি পরল। কালেভদ্রে শাড়ি পরার এই এক জ্বালা। পায়ের সঙ্গে শাড়ি আর বাতাসের লুকোচুরি খেলা। শুভ্রানীলার হাইট খুব বেশি নয়। ৫ ফুটও পুরো হবে না। তাই তো শাড়ির সঙ্গে হাইহিল পরেছে। তাতে যা হওয়ার তাই হয়েছে। সমস্যা কমান বদলে বেড়ে হয়েছে বহুগুণ। হাইহিলে শব্দ তুলে হাঁটতে অভ্যস্ত শুভ্রানীলা। কিন্তু শাড়ির সঙ্গে হাইহিল সামলাতে হিম-শিম খেতে হচ্ছে। হঠাৎ ছোট্ট একটা ইন্টার ট্রেকারর সঙ্গে হাঁচট খেয়ে সাইদের পিঠের ওপর দিয়ে পড়ে।

আশপাশের খোলামেলা চোখ বাঁচিয়ে ওকে সোজা করে দাঁড় করিয়ে দেয়। দাঁড় করাতে গিয়েই শুভ্রানীলা স্তনের ছোঁয়া সাইদের বুকে লাগে। শুভ্রানীলার ভেতরটা কেঁপে ওঠে। সাইদের চোখে চোখ পড়তেই লজ্জায় লাল টুকটুক হলে যায় গাল দুটো। আচ্ছা সাইদ কি শুভ্রানীলার ভেতরটা দেখতে পাচ্ছে? সাইদ তো বলে, সৃষ্টিশীল মানুষের নাকি তৃতীয় নয়ন থাকে। সাইদ তো সৃষ্টিশীল মানুষ। ছবির মানুষ। গানের মানুষ। কথার মানুষ। শুভ্রানীলা আরেকটু যোগ করে প্রোগ্রামের মানুষ। কত কত অনুষ্ঠানের আয়োজক যে সাইদ তার হিসাব অন্তত শুভ্রানীলার কাছে নেই। সাইদের কাছেও হয়তো নেই। পাবলিক লাইব্রেরিতে থইথই করছে মানুষ। বেশ কয়েকটা অনুষ্ঠান সব সময়ই চলে। আজো তার ব্যত্যয় নেই। লাইব্রেরির নিয়মিত পাঠক রোজকার

মতোই আছে। দর্শক-শ্রোতা মিলে এলাহি কারবার। বিকালে মৃদুমন্দ বাতাসে সাইদের হাত ধরে হাঁটতে খুবই ইচ্ছা করছে। কিন্তু এই জনসম্মুখে সাইদের মতো পরিচিত মানুষ মরে গেলেও তা করবে না। আজই মঞ্চে অভিষেক হবে শুভ্রানীলার। সাইদ পরিচয়ের প্রথম দিন থেকেই ওকে বলে আসছে। ওর হাত ধরে যারা মঞ্চে মাইক্রোফোন ধরছে তাদের আর পিছু ফিরতে হয় না। আমন্ত্রণলিপিতে উপস্থাপিকা হিসেবে শুভ্রানীলার নাম ছাপা হয়েছে। শুভ্রানীলার নামটাও সাইদের দেয়া। শুভ্রার পুরো নাম হলো শুভ্রা রহমান। সাদা আর নীলের মিশেলে দেয়া নামটা খুবই পছন্দ হয়েছে। দুই দিন আগে দাওয়াতপত্রটা হাতে পেয়েছে। ছাপার আখরে নিজের নামটা কেমন যেন অন্যরকম লাগে দেখতে। কতবার কতরকম করে যে নামটা দেখেছে। কখনো ড্রিমলাইটের মৃদু আলোয় কখনো দিনের প্রখর আলোয়। আঃ যা ছিল এতদিন স্বপ্নের আজ তা একেবারে হাতের মুঠোয়।

পাবলিক লাইব্রেরির দোতলায় অনুষ্ঠান হবে। কোণাকৃতির অনেক সিঁড়ি পেরিয়েই পৌঁছতে হবে। শাড়ি, হাইহিল, সিঁড়ি— এ তিনে মিলে ত্রিশঙ্কু অবস্থার সম্মুখীন হয় শুভ্রা। সাইদ ওর অবস্থা বুঝতে পারছে তা শুভ্রাকে বুঝিয়ে দেয়, শুভ্রার কোনো কিছুই যে গোপন থাকে না, তা ভাবতেই বেশ ভালো লাগে। কী করে শুভ্রাকে এ অবস্থা থেকে উত্তরণ করা যায়। চারদিকে তাকিয়ে উপায় খুঁজতে থাকে। দেখে দুজন মহিলা ওদের দিকে হেঁটে আসছে। অকূলে কূল পায় দুজন তাদের দেখে। দুই পক্ষেই হাসি আর কথাবিনিময় হয়। সাইদ এই অঙ্গনে বেশ পরিচিতজন, এটুকু বুঝে গেছে এ কদিনে। দুজনের কাছে একজন শুভ্রানীলাকে অর্পণ করে নিজে গটগট করে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে যায়।

দুজনের হাত ধরে সাবধানে সিঁড়ি ভাঙে শুভ্রা। সামনের সারির চেয়ারগুলো ভরতে শুরু করেছে। ধীরেসুস্থে একটা চেয়ারে বসে ব্যাগ থেকে টিস্যু বের করে চেপে চেপে ঘাম মুছে নেয়। সাইদ আসার সময়ও বলেছে, সুন্দর চেহারা আর মোহনীয় সাজসজ্জা দিয়ে অনেক দুর্বলতা ঢাকা যায়। শাড়িতে ও ওর দেহের শৈল্পিক ভাঁজ ফুটিয়ে তুলেছে সাবলীলভাবে।

আজকাল বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সাইদের সঙ্গেই যায়। অনেক বিখ্যাত, অতিপরিচিত মানুষের সঙ্গে পরিচিত হচ্ছে। সাইদ ওর ভেতর একটা স্বপ্নের দ্রুণ রোপণ করেছে অতি যতনে। কোনো চ্যানেলে বিয়েলিটি শো উপস্থাপনা করা, দীর্ঘদিন ধরে এসব অনুষ্ঠান চলে। দর্শকও সংযুক্ত হয় বলে জনপ্রিয় হয় সহজেই। তাই উপস্থাপিকার রাতারাতি তারকা খ্যাতির সম্ভাবনাও বেশি।

শুভ্রানীলার বেশ কয়েকজন বান্ধবী মিডিয়ায় কাজ করতে আগ্রহী। তাই তারা বিভিন্ন কোর্সে ভর্তি হয়েছে। ওরা বলে, শিখে গেলে যোগ্যতার পরিচয় দেয়া যায় দ্রুত। ওরা তো সাইদের ওপরে ওঠার মই পায়নি, যে তরতরিয়ে এগিয়ে যাবে সাফল্যের চূড়ায়। সাইদের পাশে যেদিন শুভ্রানীলাকে দেখে সাইদের দুজন বন্ধু বেশ রসাল মন্তব্য ছুড়ে দেয়: স্বভাবসিদ্ধভাবে সাইদ উত্তর দিতে কম যায় না। রসের ফোঁটায় রস তো থাকবেই। তার মাঝেও শুভ্রানীলা ভালোবাসাই খুঁজে নেয়।

প্রথম যেদিন সাইদের চিত্রকর্ম প্রদর্শনীতে সাইদকে

দেখেছিল সেদিনই তো সাইদের প্রেমে হাবুডুবু খেতে শুরু করে।

ওরা এখন দুজন দুজনের চোখের ভাষা বুঝতে পারে। শরীর আর মনও যে মিলে যায় তাতে। সাইদ বলেছে, মাটি ছেনে যেমন ভাস্কর্য তৈরি করতে হয়, তেমন ছেনে ছেনে শুভ্রাকে তৈরি করেছে। সাইদ এ কথাটা সব সময়ই বলে। সুন্দর, দীর্ঘস্থায়ী, অর্থবহ ছবির জন্য যেমন চোখ-শরীর-মন প্রয়োজন, তেমন নিজের মানুষ গড়ার জন্যও তিনের সমন্বয় প্রয়োজন। গতকালই সাইদ ওকে জানিয়েছে চট্টগ্রাম যেতে হবে। সাইদের খুব বড় একটা প্রোগ্রাম আছে। না, শুভ্রার ওখানে উপস্থাপনার দায়িত্ব নেই। অত বড় অনুষ্ঠানে উপস্থাপনা করবে দেশসেরা মডেল। মডেল আর তার কাজ দুটোই খুব কাছ থেকে দেখার একটা সূর্যণ সুযোগ হাতে এসে গেছে। এটা ভেবেও আনন্দের সীমা নেই শুভ্রার।

সাইদ যে কারণে শুভ্রাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছে তা হলো ওখানে নাকি ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের বড় এক কর্মকর্তা যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। তার সঙ্গে যদি কোনোভাবে শুভ্রার পরিচয় করিয়ে দিতে পারে তাহলে কেল্লা ফতে।

রাতেই সব গোছগাছ সম্পন্ন করে রাখে। সকালের ট্রেনের টিকিট সাইদের পকেটে ওজন বাড়ছে। যথাসময়ে চট্টগ্রাম পৌঁছে একেবারে অনুষ্ঠানস্থলে চলে যায়। অনুষ্ঠান শেষ হতে হতে বেশ রাত হয়ে যায়। ক্লান্তিতে, ক্ষুধায় ঘুমে বেশ ভারাক্রান্ত হয় শুভ্রা। তার পরও ওর মনটা বেশ ফুরফুরে এই ভেবে যে, ওর পাশে সাইদ আছে।

শুভ্রাকে হোটেলের রুমে বসিয়ে রেখে সেই কখন বেরিয়ে গেছে সাইদ। অনেক কিছুর অপেক্ষা নিয়ে বসে আছে শুভ্রানীলা। তাড়াহুড়া করে রুমে প্রবেশ করে সাইদ। ওকে দ্রুত তৈরি হয়ে নিতে বলে। খুব কষ্ট করে ভদ্রলোকের অনেক ব্যস্ততার মাঝখান থেকে একটু সময় বের করেছে। যার জন্য এত দূর ছুটে আসা তিনি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একজন।

ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে একটু বেশি সেজে নেয় শুভ্রানীলা। কিভাবে নিজের প্রতিভা উপস্থাপনা করবে তাও মনে মনে গুছিয়ে নেয়। যেটুকু ঘাটতি থাকবে সেটুকু সাইদ পূর্ণ করবে। সাইদ পাশে



থাকলে শুভ্রানীলার বুকের ভেতর অনেক সাহস একসঙ্গে গান গায়। সাইদের হাত ধরেই ওর পথচলা শুরু।

শীতল রুমে পাতলা চাদর গাছে জড়িয়ে শুয়ে আছে এক রোগা কালো মতোন ভদ্রলোক। যিনি শুভ্রানীলাকে এগিয়ে দেবেন ওপরে ওঠার স্বর্ণময় সিঁড়ি। বিনীতভাবে সালাম দেয়। সাইদ ওকে কত করে শিখিয়ে এনেছে যে করেরি হোক ভদ্রলোককে ইমপ্রেশ করতে হবে। ভদ্রলোক ইমপ্রেশ হলে শুধু শুভ্রারই কাজ হবে না, সাইদেরও ওপরে ওঠার অনেক বড় আর শক্ত একটা সিঁড়ি চলে আসবে। তার জন্যই এতদিন অনেক করে সুযোগ খুঁজছিল। সাইদের এ কথাতেই শুভ্রার মনের জমিন অন্যরকম এক অনুভূতিতে ছেয়ে যায়। শুভ্রানীলা আর সাইদ তাহলে একই সূত্রে গাঁথা। এটাই তো চায় ও।

শুভ্রানীলার সালামের জবাবে ভদ্রলোক লুঙ্গির গিঁঠ ধরে উঠে দাঁড়ায়। স্মিত হেসে শুভ্রার কুশল জানতে চায়। তিনি নিজে শুকনা পটকা হলেও কণ্ঠস্বর বেশ জোরালো আর স্পষ্ট। আমি কি তোমার সঙ্গে একা কথা বলতে পারি? শুভ্রা জবাব দেয়ার আগেই সাইদ ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

লুঙ্গির কোমরের গিঁঠ না বেঁধে হাতে ধরে এগিয়ে আসেন শুভ্রার কাছে। খুব কাছে। লোকটার তত্ত্ব নিঃশ্বাস শুভ্রানীলার কপাল ছুয়ে যায়।

অস্বস্তি নিয়ে তাকাতেই সোফায় বসার ইশারা করে। এতক্ষণে লুঙ্গির গিঁঠ বেঁধে তিনিও পাশের সোফায় বসেন।

—শোনো মেয়ে! যারা আমার কাছে আসে তাদের আমি প্রথমই যে কথাটি বলি তোমাকেও বলছি। আমি জোর করে কিছুই ছিনিয়ে নিই না। সাইদ বা তাদের মতো যারা তোমার মতো কাউকে নিয়ে আসে আমাকে খুঁজই আসে।

—সাইদও?

শুভ্রানীলার কণ্ঠ চিরে যায়।

—সাইদের হাত ধরে যারা আমার কাছে এসেছে পরে তাদের আর সাইদের প্রয়োজন হয়নি।

‘প্রয়োজন’ শব্দটা শুনে চমকে যায়। না, সাইদকে কখনো এমন প্রয়োজন মনে হয়নি। সবটুকু দিয়েই ভালোবেসে ছিল তো। দুজন দুজনের হাত ধরে বহুদূর যাবে— এমনই তো কথা ছিল।

—আমি কি আপনার ফ্রেশরুমটা ব্যবহার করতে পারি? ভদ্রলোকের সম্মতি নিয়েই ফ্রেশরুমে ঢোকে শুভ্রা। বড় আয়নায় নিজের চোখে চোখ রাখে। একটু আগে যে সাইদ বেরিয়ে গেছে কোনো দিনও আর সেই সাইদকে খুঁজে পাবে না কোথাও। ওর সামনে দাঁড়ালেও না। শুভ্রানীলা যদি কাল সকালে দরজা খোলার অপেক্ষায় থাকে তাহলে এই লোক ওকে সাইদেরই মতো অন্য কারো কাছে হস্তান্তর করবে। ওর রূপান্তর হবে অন্য পরিচয়ে।

গভীরভাবে দেখছে নিজেকে। ওর চোখে জ্বলে ওঠে হাজার ভোল্টের আলো। সেই আলোয় দেখতে পায় ওর ব্যাগে রয়েছে ঢাকাগামী বাসের টিকিটের টাকা। এই ভদ্রলোক আর বাইরে দাঁড়ানো সাইদকে পেরিয়ে ও কী করতে পারবে! নানামুখী ভাবনা পেয়ে বসে শুভ্রাকে। ওপরে ওঠার সিঁড়িটা এত কাছে। ধোঁয়া ধোঁয়া আলোয় সব কিছু এলোমেলো করে দেয়।

শুভ্রা রহমান বেশ শক্ত হাতেই ফ্রেশরুমের দরজা খোলে।

অসহায় দস্থ শীতাত্মমানুষের জন্য পপুলার লাইফের কমল প্রদান



পপুলার লাইফ ইনস্যুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের (আইডিআরএ) কাছে সম্প্রতি শীতার্থীদের কমল প্রদান করেছে। বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের (আইডিআরএ) সদস্য সুলতান-উল-আবেদীন মোল্লার হাতে কমল তুলে দেন পপুলার লাইফের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও এবং বাংলাদেশ ইনস্যুরেন্স ফোরামের প্রেসিডেন্ট বি এম ইউসুফ আলী। এসময় উপস্থিত ছিলেন কোম্পানীর উর্ধ্বতন নির্বাহী পরিচালক আলমগীর ফিরোজ রানা। ছবিতে ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও এবং বাংলাদেশ ইনস্যুরেন্স ফোরামের প্রেসিডেন্ট বি এম ইউসুফ আলীকে কমল প্রদান করতে দেখা যাচ্ছে।

জীবন বীমার বিশ্বস্ত নাম



পপুলার লাইফ ইনস্যুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড



গল্প

বাড়ি আসবই

বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর

অন্ধকারের ভেতর আমাদের গাড়ি বাড়ির দিকে ছুটে চলেছে। আড়াই ঘণ্টা লাগে বাড়ি পৌঁছতে। স্পিডোমিটারের ফ্যাকাশে আলোয় তার মুখ দেখা যায়। বাইরে পল্লীগাম ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। ক্ষেত-খামারের মধ্যে আঁকাবাঁকা কোনো কোনো নদীতে জেলেদের নৌকার গতি। তারপর অন্ধকার। তারপর আবার অন্ধকার। আকাশে সাতটি তারার তিমির এবং একটি চাঁদ। আড়াই ঘণ্টা আমরা সাতটি তারার তিমির এবং একটি চাঁদের আলোর মধ্যে থাকব। যখন তিমির থাকবে না এবং আকাশের আলোক ফুরিয়ে যাবে, তখন আমাদের এলাকা দেখা দেবে। এলাকাটা বিপজ্জনক। আমার স্ত্রী, যিনি আমার ঘাড়ে মাথা রেখে ঘুমুচ্ছেন কিংবা ঘুমুচ্ছেন না, তিনি জেগে ওঠেন, জানি

তোমার কষ্ট হয়, তবু বলি না এলে হয় না। আমি কিছু বলি না। কিছু কিছু কথার জবাব হয় না। আমি বলতে পারি, মায়ের কবর দেখার সাধ হয়, তাই আসি। বলতে পারি, বাবার দেয়া স্কুলটা দেখতে আসি। বলতে পারি, গ্রামের লোকজন কেমন আছে দেখতে আসি। সব জবাবই সত্য, তবে পুরো সত্য নয়। বিপরীত দিক থেকে দৈত্যের মতো একটা ট্রাক ছুটে আসে। হেডলাইট শয়তানের চোখের মতো জ্বলছে। আমি রাস্তার পাশে গাড়ি যতটা সম্ভব নিয়ে আসি। এভাবে বিপদের হাত থেকে উদ্ধার পেতে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করি। স্ত্রী খানিকক্ষণ কথা বলতে পারেন না। ভয়ে, উদ্বেগ, শঙ্কায় তার কথা সব উধাও।

জীবন বীমা কর্পোরেশনের উল্লেখযোগ্য স্কিমসমূহ



জীবন বীমা কর্পোরেশন

একমাত্র রাষ্ট্রীয় জীবন বীমা প্রতিষ্ঠান

প্রধান কার্যালয় : ২৪ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

Email : info@jbc.gov.bd, Web : www.jbc.gov.bd



তিনি বলেন, আসল বিপদ তো আছেই।
অ্যাকসিডেন্টের বিপদ কম নয়। তবু তুমি আসবেই।
তুমি না এলে পারো।
তোমাকে একা আমি ছাড়তে পারি না।
তাহলে?
আমাকে আসতেই হয়।
ভয় আছে জেনেও। বিপদ আছে জেনেও। আমি
একবার তার মুখের দিকে তাকাই। দুই পাশের
ক্ষেত-খামার থেকে বাতাস বয়। ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগে।
রাত প্রায় দুটো। স্ত্রীর মুখ আধা আমার দিকে
ঘুরানো। স্যান্ডেল থেকে তার পা বেরিয়ে আছে।
ফর্সা পায়ের দিকে আমার চোখ যায়। তার মুখে
তারার তিমির আর একটা চার্জ স্ট্রিট লাইটের মতো
তার মুখে। স্ত্রীকে আমি চুমু খাই। আমার ইচ্ছা করে
তাকে নিয়ে শতে।
জানো।
বলো।
প্রথম দেখার কথা তোমার মনে হয়।
আমি কখনো ভুলি না।
ফ্রান্সফুটে দেখা।
হ্যাঁ।
তুমি ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরিতে কাজ করছিলে।
তাই। মনে হয় সেদিনের কথা।
আমি একটা রিসার্চ পেপারের জন্য বইপত্র
ঘাঁটিছিলাম।
আমি ছিলাম ইউনিভার্সিটিতে বৃত্তি নিয়ে।
তোমাকে দেখেই আমি চমকে উঠেছিলাম।
মনে আছে আমি হেসেছিলাম।
তারপর তোমাকে কফি খেতে নিয়ে গিয়েছিলাম।
এলোমেলো কথা হলো অনেক।
আমার ইচ্ছা ছিল তোমাকে সিডিউস করার।
আমি টের পেয়েছিলাম।
কিন্তু আমি করিনি।
তুমি খুব ক্লান্ত ছিলে।
শেষ পর্যন্ত তুমি আমাকে সিডিউস করলে।
আমার ইচ্ছে হচ্ছিল।
তুমি আমাকে হোটেল পৌছে দিলে।
কতক্ষণ আমরা কথা বলি না। গাড়ি দৌড়াচ্ছে।
এভাবে যদি যেতে পারি ঘণ্টাখানেকের মধ্যে বাড়ি
পৌছে যাব। আমার চোখে ঘুম। ঘুম তাড়ানোর জন্য
স্ত্রীকে বলি ফ্রান্সফুটে থেকে চা দিতে। চায়ে চুমুক দিতে
গাড়ি চালাই। এখানে গাড়ি চালাতে ইচ্ছে করে না।
তা ঠিক। কেউ কিছু মানে না।
সবটাই এই কারণে না।
তাহলে?
গাড়ি চালালে সবাই মুখের দিকে তাকায়। যেন
আমি একটা খান্দা। তারপর মোল্লারা তো আছেই।
হেদায়েত করে?
হ্যাঁ, তাই। পর্দা পুশিদার বক্তৃতা ঝাড়ে।
হারামজাদারা।
আমার মুখের দিকে তাকালে তার যদি কাম প্রবৃত্তি
লাগে, তুই মুখে নেকাব পর না। কে তোকে বারণ
করেছে।
নছাররা।
তোমার মনে আছে?
কী।
গাড়িতে অনেকক্ষণ বসেছিলাম। তুমি আমাকে
আচ্ছন্ন করে রেখেছিলে।
মনে পড়ছে।

তুমি বলেছিলে, কালকে আবার।
আমি বলেছিলাম, কালকে তোমার কাছে আসতে
চাই। কে কাকে সিডিউস করেছে তা এলোমেলো
হয়ে যায়। আমাদের শরীর দুজনকে জেনেছে।
একটা সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। সম্ভাবনাটাকে
দুজনই ধরে রাখতে চাই। তুমি আমাকে বিদায়ের
চুমু খেতে দিয়েছিলে। তুমি আমার দিকে
তাকিয়েছিলে একাগ্র।
গুডনাইট।
গুডনাইট, শফী।
এক সপ্তাহ আমি ফ্রান্সফুটে ছিলাম। প্রথম দিন
থেকেই আমি মলির বাড়িতে। আশ্চর্য মনে হয়। কিন্তু
পুরোটাই সত্যি। মলির চাওয়াটা এ ক্ষেত্রে জোর
দিয়েছে। লন্ডনে ফিরে আসার পর আমাদের বিয়ে
হয়। দুজনই আমরা বিদেশে ছিলাম বলে এমন
হতে পেরেছে। শরীর থেকে মন জানতে পেরেছি।
কোনো পাপবোধ আমাদের মধ্যে কাজ করেনি।
আমরা বিছানায় গেলেই ঘুমিয়ে যেতাম, পরস্পরের
হাত জড়িয়ে। যখন ঘুম ভাঙত, দেখতাম মলি
আমাকে দেখছে। তার লম্বা গাল আর গলার ওপর
বসানো মুখ আমার দিকে ঝুঁকে আছে।
মনিং
গুনগুন করে তুমি বলতে।
কী।
আমি তোমার কাছ থেকে একটা গান শুনতে চাই।
তুমি গান জানো?
মলি আমি গান জানি না।
মলি হেসে উঠত, আর আমি তার নরম কোমল,
হাড়হীন, মেদহীন, শরীরটার ভেতর লুকোতাম।
রাত শেষ হলে আমি তার মুখের দিকে তাকিয়ে
থাকতাম। তার মুখ এক অলৌকিক উপহার। আমি
তার দিকে তাকাতে তাকাতে ঘুমিয়ে যেতাম। যখন
ঘুম ভাঙত মলি নেই। টেলিফোন বাজত, মলির
গলা, তুমি রেস্ট নাও।
আমি বিছানায় ফিরে আসতাম, নিঃশ্বাসে শুষে
নিতাম অবশিষ্ট পারফিউম যতটুকু বালিশে আছে।
শফী?
বল মলি।
তোমার গলা মনে হচ্ছে না।
ঘুমিয়েছিলাম।
দুপুরে অন্য কোথাও খেতে যাব। তৈরি থেক।
সেদিন ফ্রান্সফুটের চার কিলোমিটার দূরের এক
গ্রামের রেস্টুরেন্টে খেতে গিয়েছিলাম। রেস্টুরেন্টের
বৈশিষ্ট্য আলুর ছোবলা ভাজা, এই খাওয়ার স্বাদ
বহুদিন ভুলিনি।
খাওয়ার পর আমরা আমার এক বন্ধুর ফার্মহাউসে
যাব।
আমি চিনি?
না, ওর নাম অ্যালিস। তোমার পছন্দ হবে।
আমি তোমার ভুবনের অনেককেই চিনি না।
তা ঠিক।
আমরা ছোট্ট একটা ফার্মহাউসে প্রবেশ করি।
ফ্রন্টরুমের একটা বিছানা, তিনদিক জানালা। ফ্লোরে
ম্যাট। আসবাবের বালাই নেই। ঘরটি মনে হয়
কোনো মঞ্চ, কোয়ার্টার। অ্যালিস, হাসিখুশি,
মোটাসোটা, একাই ঘরজুড়ে আছে, পুরনো বিশাল
ফার্নিচারের মতো। সে রাতে তিনদিক মেলা
জানালার পাশের বিছানায় ঘুমিয়েছি, কাপড়চোপড়
না খুলেই।

তুমি ঘুমোওনি।
কত রাত?
অনেক।
আঃ।
আমি তোমাকে ভালোবাসি। মলি তুমি কখনো
প্রেমে পড়েছ?
অনেকবার।
মলির ওই কনফেশন আমাকে তার খুব কাছে নিয়ে
যায়। আমি বুঝি মলিকে ভালোবাসতে শুরু করেছি।
অনেকটা সমুদ্রের তরঙ্গের মতো। আসছে তো
আসছেই। আমি সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে থাকি। মলি
ঘুমায়, মলির মুখে একটা হাসি। আমাদের পুরনো
দিনের কথা মনে পড়ে। পুরনো দিনের কথা বলতে
বলতে আমরা থেমে যাই। হাতড়েও আমরা আর
কথা খুঁজে পাই না। আমরা চুপ হয়ে যাই।
স্ট্রিয়ারিঙে আমার হাত, আর একটা হাত মলির
কোলের ওপর। ঘড়িতে রাত তিনটা। বড় বড় রাস্তা
ছেড়ে ছোট রাস্তায় মোড় নিই। এই হচ্ছে ভয়ের
এলাকা। মলি সতর্ক হয়, এই তোমার এলাকা।
হ্যাঁ। এখান থেকে বাড়ি কতদূর?
সাত মাইল।
এই সাত মাইল তুমি সাবধানে চালাও।
ভয়ের কিছু নেই।
আমি ভয় পাই। তোমার জন্য আমার ভয় হয়।
এত রাতে ক্যাডাররা থাকে না।
কী করে জানো?
দিনের বেলা ওরা ঘোরাফেরা করে।
পুলিশের সাপোর্টে ওরা এসব করে, না? তা ঠিক।
গাড়ি ভাঙুর করে, মারপিট করে।
কবার তোমার গাড়ি ভাঙল?
তিনবার।
তবু তোমার আসা চাই?
না এসে পারি না।
এটাকে রাস্তা বলে?
না।
সভ্যভব্য রাস্তা? নিরাপদ রাস্তা?
না।
শফী তোমার এই রাস্তাটা ভেঙে ফেল।
ভেঙে ফেলা দরকার।
এখানে থাকলে আমার স্যানিটি নষ্ট হয়ে যাবে।
তোমার কেন? সবার, সবার।
শফী।
বল।
আমার ভয় করছে।
দ্যাখো, আমরা ঠিক বাড়ি পৌছে যাব।
দুই বছর এমন চলছে।
তা ঠিক।
মধ্যরাতে বাড়ি যাওয়া।
অন্য কোথাও এমন হয় কিনা জানি না।
কিন্তু এখানে হয়, এই রাস্তা, এই দেশে। একটা
বাকি চায়ের দোকান, বাঁপ ফেলা। কয়েকজন
লোক দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের গাড়ি দেখে হাঁক
দেয়, কে যায়? এত রাতে কে যায়?
আমরা।
আমরা কারা? কই যাইবেন?
গুলবাহার।
ও মেভাই আপনারা।
তোমরা কি করছ এত রাতে?
পাহারা দিই। গত রাতে পুলিশ গ্রাম ঘিরা করছিল।

f /FizzupBangladesh

FizzUpTM
Clear Lemon



GSD GLOBE SOFT DRINKS LTD. **AST** AST BEVERAGE LTD.
Member of Globe Pharma Group of Companies Ltd.

আমরা বিএনপি কইরতে রাজি হই নাই। হারামজাদা মন্ত্রী পুলিশ খেপাইয়া দিছে। মামলা ঠুকছে বেশুমার। আমি বলি, সাবধানে থাইক। থাকুম মেভাই। পুলিশের গাড়ি দেখলেই আমার গুরুপ গো সাবধান কইরা দেই। মাইয়া পোলারা হাতে দা কুড়াল লাইয়া রেডি হয়। আমি ফের গাড়িতে স্টার্ট দিই। মলির মুখে কোনো রা নেই। দূরের গ্রামে, খুব সম্ভব, এনাতপুরে, গুটিকয় কুকুর ঘেউ ঘেউ করে ওঠে। চারপাশে শূন্যতা ও শুষ্কতা ভেঙে যায় খান খান করে। একটা রাত মোরগের বাক ওঠে। ধল পহরের সময় কাছে। সাতটি তারার তিমির এবং একটি চাঁদ আমাদের সঙ্গে ছুটছে এখনো। ভোরের আজানের আগেই বাড়ি পৌঁছে যাব। একটা স্বস্তিতে মন শান্ত হয়। যখন বাড়ি পৌঁছব তখন তিমির থাকবে না এবং চাঁদের আলো থাকবে না। তখন দেখা দেবে ভোরের আলো, ভোরের ঠাণ্ডা বাতাস এবং ভোরের গ্রামাঞ্চল। মলির চোখে ঘুম নেই। বুঝি মলির এখন কথা বলার ইচ্ছে নেই। মলি এখন কায়মনোবাক্যে একাগ্র। বাড়ি না পৌঁছনো পর্যন্ত মলির একাগ্রতা ভাঙবে না। দূরের দিকে তার চোখ নিবিস্ত, যে দূর থেকে শত্রুরা আসবে। পুলিশের গাড়িতে টহল পুলিশ আর হোন্ডায় বিএনপির ক্যাডার। টহল দিতে দিতে তারা আসছে। হোন্ডায় চড়ে চড়ে তারা আসছে। আসার পর তারা ঘিরে ফেলবে চরাচর। মলির দিকে আড়চোখে তাকাই। মলির চোখ নিষ্কম্প। আমি তখন গাড়ি চালাতে থাকি, আর নিজের সঙ্গে কথা বলতে থাকি। আমি আসব, বার বার আসব। নিজের বাড়িতে আসবই। কারো এখতিয়ার নেই এই আসা ঠেকানোর। পূর্বপুরুষের ভিটবাড়ি, পিতৃপুরুষের গ্রাম ছেড়ে আমি কোথাও আরাম পাই না। আমার শৈশব এখানে কেটেছে। যদি না আসি, আমাকে যদি আসতে না দেয়া হয়, আমার শৈশব থেকে আমি বিচ্ছিন্ন হয়ে যাব, যেমন বিচ্ছিন্ন হয় ডালপালা গাছ থেকে, যেমন বিচ্ছিন্ন হয় শিশু মায়ের কোল থেকে। আমি যে এখানে পৌঁছেছি আমার শৈশবই আমাকে এখানে পৌঁছে দিয়েছে। আমার শৈশবকে আমি খুঁজে পাই বাড়ি গেলে। রাস্তার ধারের সুপারি গাছের বাগানে বসে সূর্যাস্ত দেখতাম, শুরুরক্ষ চাঁদ দেখতাম, কৃষ্ণপক্ষে আন্ধার। দেখতাম হাটেররা সওদা নিয়ে কোথায় কোথায় চলে যায়। শুনতাম গীতগান। আমি তো শহরে বড় হইনি, বিদেশে ঘুরে বেড়াইনি প্রথম থেকে। আমার উৎপত্তি এখানেই। এলাকার মানুষ আমাকে ডাক নামে জানে, আমার চাচা-দাদার সার্বিক তাদের জানা। এই জানা থেকে আমি দূরে সরে যেতে চাই না। হে আল্লাহ তুমি আমাকে দূরে সরিয়ে দিও না এখান থেকে। কিন্তু দূরে সরিয়ে দেয়ার চক্রান্ত শুরু হয় ২০০১ সালের নির্বাচনের পরেই। আমি যে পক্ষকে সমর্থন দিই, নির্বাচনে তারা হারে বিএনপি-জামায়াত জোটের কাছে। এই ঐতিহাসিক তথ্য উল্লেখ করা দরকার আমার ঐতিহাসিক নিয়তি বোঝার জন্য। যিনি নির্বাচিত হন, তিনি নাকি প্রধানমন্ত্রী বেগম সাহেবার প্রিয়জন এবং তার পুত্র তার বন্ধু। এই জনশ্রুতি তাকে ভয়ঙ্কর করে তোলে। টাকার প্রতি তার লালসা দুর্নিবার। তার আটজন সশস্ত্র ক্যাডার,

প্রত্যেককে হোন্ডা দেয়া হয়েছে। হোন্ডার দাঁপটে সারা তল্লাট থর থর করে কাঁপে। তিনি জনপ্রতিনিধি এবং মন্ত্রী হয়ে যান। তিনি শুরু করেন তার ক্যাডারদের মাধ্যমে তোলা আদায়। এমন তোলা কেউ দেখিনি কখনো। বিয়ে হলে তোলা দিতে হয়, তালাক হলে তোলা দিতে হয়, দোকান করলে তোলা দিতে হয়, ব্যবসা করলে তোলা দিতে হয়। কখনো কখনো তার ক্যাডাররা স্লিপ নিয়ে আসে, মন্ত্রী সাহেবের মেহমান আসবে। তাদের খাওয়ার তোলা দিতে হবে। এই তোলা হয়ে ওঠে হাহাকার, বিলাপ, ক্রন্দন। আমি রাজনীতি করি না। শৈশবের টানে আমি গ্রামে আসি আর যাই। লোকজন আমাকে ঘিরে ধরে। মেভাই কী করতাম। আমি তাদের বলি, তোমরা দিবা না। মন্ত্রী পুলিশ লেলিয়ে দেয়। মিথ্যা মামলা ঠুকতে থাকে। আমি আগাম জামিন নিই হাইকোর্ট থেকে। আমার গাড়ি তিনবার ভাঙুর করে। আমাকে মন্ত্রী অবাস্তিত ব্যক্তি ঘোষণা করে এলাকায়। আমার বাড়িতে আগুন লাগানোর চক্রান্ত করে। এলাকার বিভিন্ন রাস্তায় আমার চলাফেরার ওপর বিধিনিষেধ জারি করা হয়। আমি সবকিছু সন্তোষে আসি, যাই, পরোয়া করি না। লোকজন উঠে দাঁড়ায় মার খায়, ভাঙে না। ক্যাডারদের কখনো কখনো ধাওয়া করে। এভাবেই আমি বেঁচে আছি। বাড়ি আসা আমার নেশা হয়। মলি জানে, বোঝে, কেন আমি পাগলের মতো নাকি দরবেশের মতো ঘুরে ঘুরে বাড়ি আসি। মলি অবুঝ, কিছুতেই মানতে পারে না এই অস্বাভাবিক অবস্থা। আমি মনে মনে এই কথাগুলো বলি মলির কাছে। মলি, মলি তুমি আমার পাশে থাক, সর্বক্ষণ সব সময়। আর দুটো গ্রাম পার হলেই বাড়ি। একটা তৃপ্তি আমার চোখে ভাসে। আমি টের পাই আমার শরীর একটা ভালোবাসার বাগান হয়। মলি বাগানে দাঁড়িয়ে বরণ করে আমার গ্রামকে, আমার বাড়িকে। আমি নির্মাতা, আমি চাষাবাস করি আমার নিয়তি, সীমাহীন মাঠ। আমার মনে হয় সব বাড়ি থেকে



আমাকে নাম ধরে ডাকছে। মলি, মলি। কিছু বলছ? তোমাকে আমার মায়ের জীবন থেকে একটা ঘটনা শোনাই। শোনাবে? শোনাও। আমার মায়ের মুখ থেকে শোনা। তখন তার বয়স চৌদ্দ-পনেরো। আসামের চা বাগানের কুলিদের ওপর নির্মম নির্যাতন করত চা বাগানের সাদা মালিকরা। বেতন কম দিত। তাদের মেয়েরা সাহেব এবং বাবুদের খোরাক। গুর্খা সৈন্যদের দিয়ে পেটাত। ১৯২১ সালের এপ্রিলের শেষ এবং মের প্রথম দিক। কুলিরা সহ্য করতে না পারে অব্যাহা হয়, বাগান চেড়ে হেঁটে রওনা হয় দেশের দিকে। দেশ মানে সাঁওতাল পরগনার দিকে। যেখানে তাদের বাপ-দাদাদের অবাস ছিল। আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের মালিক শ্বেতাঙ্গরা। তারা কুলিদের রেল চড়তে দিল না। হাজার দুই কুলি হেঁটে হেঁটে পৌঁছল চাঁদপুরে আসাম থেকে, সামনে মেঘনা ও পদ্মা নদী, ধু-ধু বিস্তার। এ নদী পার হয়ে তাদের গোয়ালন্দ পৌঁছতে হবে। তারপর হেঁটে হেঁটে দেশের বাড়ি। স্টিমার কোম্পানির মালিক সাদা চামড়ার লোকজন। স্টিমারে তাদের জায়গা জুটল না। দুই হাজার কুলি চাঁদপুর রেলওয়ে স্টেশনে বসে থাকল প্রায় পুরো মাসই। আশ্রম এবং তার বয়সী মেয়েরা কুলিদের জন্য রাধা ভাত, চিড়া, মুড়ি গুড় নিয়ে আসত রোজ। তাদের উৎসাহ দিত নান-রা। আশ্রম কতবার আমাদের শোনাতে, বেশ অহঙ্কার করেই, তাদের বাড়িতে ওই সময় গান্ধীজি এসেছেন, এসেছেন মওলানা মোহাম্মদ আলী, শওকত আলী, এসেছেন চিত্তরঞ্জন দাশ। ২০ মে গুর্খা সৈন্যরা ক্রান্ত অবসন্ন কুলিদের আক্রমণ করে, গুলি চালায়। বাগানে ফিরে যেতে বলে। গুর্খাদের আক্রমণে ক্ষিপ্ত হয় চাঁদপুর এবং লাকসামের রেলওয়ে কর্মীরা। তারা শুরু করে ধর্মঘট। ২৭ মে শুরু হয় স্টিমার স্ট্রাইক, সারেংরা জাহাজ চালাতে অস্বীকার করে। আশ্রম এসব তারিখ গড় গড় করে বলে যেতেন। তার চোখে ইতিহাস জ্বলজ্বল করে উঠত, তার গলায় রিনরিন করে উঠত ইতিহাস। তিনি কখনো আমাদের রূপকথা শোনাতে না। তিনি এসব কাহিনী শোনাতে, এসব সাহসের ইতিকথা। তিনি বলতেন, কুলিদের স্টেশন থেকে গুলি করেও সরানো যায়নি। শেষ পর্যন্ত কুলিদের সঙ্গে আপস করতে হয়েছিল চা বাগানের সাদা চামড়ার মালিকদের, রেলওয়ে কোম্পানি আর স্টিমার কোম্পানির মালিকদের। আশ্রম উচ্চল গলায় বলতেন, আমাদের ঠেকানো যায় না, আমরা জিতে যাই। শোন সাহস রাখবি। কিছুতেই সাহসকে পালাতে দিবি না। মলি এই সাহসটাই আমার উত্তরাধিকার, মায়ের কাছ থেকে পাওয়া। বাড়ি যেতে চাইলে কাউকে ঠেকানো যায় না। আমাদের আমলে গুর্খা বাহিনী, ইংরেজ কোম্পানি ঠেকাতে পারেনি। আমাদের আমলে এরা ঠেকাবে? এই বিএনপি-জামায়াতের বাচ্চারা? মলি আমার হাতে হাতে রাখে। ধলপহর দেখা দেয়। বাতাসে ভেসে আসে আজান। মানুষজন জেগে ওঠে, প্রাণিকুল নড়াচড়া করে। মলি, মলি তুমি একবার আমার শরীরে শরীর রেখে থরথর করে কেঁপে ওঠ। আমরা পৌঁছে গেছি বাড়ি।

সমৃদ্ধির পথে অগ্রযাত্রা

Eicher

**প্রোগ্রেস.
প্রডাক্টিভিটি.
প্রফিটাবিলিটি.
প্রস্পেরিটি.**

অগ্রিমার্গের নিম্নে এগো অধুনিক প্রযুক্তির
সিরিজের ১৫-৪০ টন ধারনক্ষমতা সম্পন্ন ট্রাক।
আজই আপনার ভাগ্যকে পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নিন



Pro 1015



Pro 1025



Pro 1075



Pro 1075



Pro 1055

Eicher

হট লাইন: ০২৭৬০-৪০৬৪৮৪
ই-মেইল: trucksales@eichertrucks.com | ওয়েব: www.eichertrucks.com

দুঃসহ দিনপঞ্জি রেজাউদ্দিন স্টালিন

প্রতিদিন জেগে উঠি দিনপঞ্জির পৃষ্ঠা থেকে
প্রিয়জন আসবে সোমে
আমি ঘুম থেকে জাগলাম বুধে

আমার কিছু অর্থ চাই শনিবার
আজ বৃহস্পতি
অপেক্ষার ভ্রুর মধ্যে আরো দুটো দিন
জানি পুরাকালে এক শনিবার
নিষেধ অমান্যকারীদের দোজখের দিন ছিল
বিপ্রতীপ বানর-জীবন

মঙ্গলে মায়ের কাছে যাব
আজ শুক্র
আরো পাঁচদিনের প্রতীক্ষা
আমার সব ইচ্ছার পায়ে দিনপঞ্জির বেড়ি
সব স্বপ্নে ক্যালেন্ডারের কারাগার

জন্মাবধি দেখতে চেয়েছি দিনক্ষণহীন
নামের বাকল ছেঁড়া উদয়-অস্ত
আলেকজান্ডার যেমন শেষবার হারিয়েছিলেন
হলুদ চোখের এক নামহীন সূর্যাস্তে

ভালোবাসা ঘুমায়েছে জেগে আছি আমি

আমিনুল ইসলাম

ভালোবাসা ঘুমায়েছে— জেগে আছি আমি
আমি কি জাগব তাকে
চুমু দিয়ে ঘুমন্ত অধরে?
যদি জেগে যায়— দেখতে পাব না তার
হাঁটুর ওপরে থাকা নৃত্যগর্ভ তিল
কে বলে সুন্দর শুধু গৌরবর্ণ গাল আর
সোনারং উরু?
আহা তিল— সোনালি আকাশে
একখানা কালোবর্ণ চাঁদ!
চাঁদমুখে চুমু দিয়ে প্রবেশিতে পারি—
ভালোবাসার সপ্তম জান্নাতে—
যেখানে উধাও হয়
জগতের যাবতীয় বিষয়ীচেনতা
আর শিরায় শিরায় শুধু ছলকে ওঠে
সুশোণায় শিহরণে নিবিড় পুলক!

দৃষ্টির আকাশে তুমি বদরুল হায়দার

দৃষ্টির আকাশে তুমি কালো সানগ্লাসে আলোরা আটকে থাকে
জালে। মনের ফুটেজে আতঙ্কের হাতছানি। বিন্দু বিসর্গের মালা
পরে অব্যাহত অরণ্যে ভালোবাসার হারায় অভিযোগের শুনানি।
স্বপ্নের শব্দের মাতালে তালি বাজিয়ে সতর্ক করে লোকচক্ষুর
আড়ালে। প্রেমের উদ্যোক্তা হাটে বিকল্প রুটের কাড়াকাড়ি। ফাঁস
হয়ে যাচ্ছে স্বতঃস্ফূর্ততার কিংবদন্তি। বেদনায় হেকারের
আনাগোনা নীরব আপত্তি। বৈসাবি আনন্দে ঝরে আবেগের কান্নার
পাহাড়। বাধার আঁধার কেটে গেলে পোড়ামন আত্মীয়তা মেখে
সোনালি মাঠের ধানে ফলায় বসন্ত। শুধু শান্ত মন অশান্তির
পরোয়ানা জারি করে হয়েছে অশান্ত। দৃষ্টির আকাশে তুমি
শিলাবৃষ্টির আদরে নামো অভিমানে। বার্থতার প্লাটফর্মের আমি
মেগাওয়াটের ঘাটতিতে জ্বলি অনাসৃষ্টির আগুনে।

উড়ো চিঠিবিষয়ক প্যারাগ্রাফ

শিউল মনজুর

আপাতত একটি উড়ো চিঠি জারি করে গেল আমার মৃত্যুপরোয়ানা।
প্রথমে আমি ভীত হলাম, অতঃপর আমি মৃত্যুপরোয়ানার জারিকৃত
চিঠির কালো হরফগুলোর দিকে তাকাতে তাকাতে আমার কেন যেন
খুব মনে হলো, এই চিঠির প্রতিটি অক্ষর বুলেটসদৃশ সাইল্যান্সার
লাগানো বন্দুকের নল দিয়ে লেখা যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে আহত হয়ে ফিরে
আসা একজন ব্যর্থ সৈনিক যেন তার প্রতিহিংসার চরিত্র রূপায়ণ করছে
আর আমাকে নৈকট্যের সুহৃদ বলে বলে ভিলেনি কায়দায় তার পোষা
প্রাণী দিয়ে একটার পর একটা গুলি করছে নিঃশব্দে হৃদয়ে, হৃদয়ের
গভীরে। আর আমি আহত রক্তাক্ত হৃদয়কে নিয়ে সেলাই করা সময়কে
বুকের খাঁচায় বন্দি করে দেখছি আয়নায় লুকানো মুখগুলি খুব কাছের
এবং কেন জানি মনে হলো এই মুখগুলিকে দীর্ঘ দেখেছি এবং আজও
দেখছি অতি যত্নে অতি মমতায়। তবে সেই উড়ো চিঠির ভাষা আমাকে
বেদনায় ভাসিয়ে নিয়ে গেল না কোনো মধ্যসমুদ্রে। সেই উড়ো চিঠির
ভাষা আমাকে পৌঁছে দিল না আনন্দের কোনো মোহন স্টেশনো। শুধু
সেই উড়ো চিঠির নিজস্ব একটি মর্মবেদনা আমাকে পৌঁছে দিয়ে গেল
জীবনের চরম সত্যের অবলোকন কেন্দ্রের ভাবনা যাপনে; মৃত্যুঘাতক
প্রত্যেকেরই চারপাশে বসবাস করে নীরবে অথবা সরবে। অনিবার্য
মৃত্যু নিয়ে যেতে হবে একে একে সকলকে। পূর্বে অথবা পরে। কবর
খোঁড়ার শব্দ থেকে যায় বুকের গভীরে, ভীষণ গভীরে, কর্ণকুহরে সেই
শব্দ পৌঁছে যায় আয়ু শেষে। সাদা কাফনের কাছে নয়, জীবনের আয়ুর
কাছে নিজেকে সমর্পণ করি মহান আল্লাহর কাছে, বিনয় প্রার্থনায়।
ততক্ষণে জীবন ও মৃত্যুর মাঝখানে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে
দেখি উড়ো চিঠি উড়ে উড়ে যায়, উড়ো চিঠির নিজস্ব ঠিকানায়। ভালো
থাকো উড়ো চিঠি, ভালো থাকো উড়ো চিঠির প্রিয় লেখক; জীবনের
অনিন্দ্যসুন্দর দরোজা তোমাকেই ডাকছে।

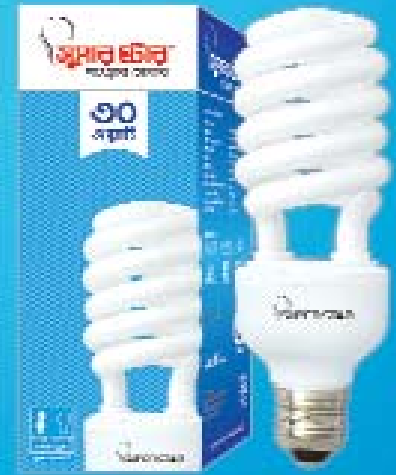
an **SSR** brand

সুসার্ব হটাব™
পাওয়ার সেভার

বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী

আরো উন্নতমানের

নতুন আকর্ষণীয় প্যাকে



www.ssgbd.com

Future is bright

নক্ষত্র মানুষ হতে চাই

নাহার ফরিদ খান

অষ্টাদশী বয়সের পানকোড়ি মন
ধূসর স্বপ্নে নিমজ্জিত ছিল
অনিন্দ্য সৌন্দর্য্যে পদ্মপাতায় বৃষ্টির জল
ঘাষের বুক জুড়ে শিশিরের লালিত্য
কৃষ্ণচূড়ার আগুনের দহন,
পলে পলে রাঙিয়েছি মন।
চন্দ্রিমা রাতে জোছনার সাথে বিদগ্ধ সময়
করেছি পার। হায় সময় তুমিও উড়াল দাও
ক্ষণে ক্ষণে। নীলপদ্যের সন্ধানে যখন
ক্লান্ত মন, বিভ্রান্তির পথে যেতে যেতে
জোছনার বন্দনায় জেগে ওঠে।
সময় বড় হস্তারক। পুরনো হারায় নতুনের
আগমনে, হারিয়ে যায় চিঠির সেই
নীল, গোলাপি আর গোলাপ পাপড়ির প্রেম
ডাকবাক্সগুলো এখন যেন প্রাচীন পুরাকীর্তি।
ভাঁজে ভাঁজে ছিড়েছে বেনারসি সম্ভার
তবু কেন ভার এ সংসার!
মায়াবন বিহারিণী মন সংসারের গ্রন্থিল
পথে হারায় একদিন একাকী নিশীথে
নক্ষত্র হতে চেয়েছিলাম।
এখন নক্ষত্র দেখি, নক্ষত্র মতে চাই না,
নক্ষত্র মানুষ হতে চাই।

ঈর্ষাকুচি

শেলী নাজ

হিমঈর্ষা ভোগ করি, তোমাদের ঈর্ষাতুর সোনালি চাকুতে
বিবিধ আমার বাহু, রক্তভেজা, কান্নাস্রোত বেঁধে নিতে
খুঁজছি জরির ফিতে, অতর্কিতে হানা দেয় মুগ্ধ বাজপাখি
পাখোয়াজ নেই, বিষন্নতার পাখসটি, রাত্রি কি একাকী!

তরল আঁধার ফুঁড়ে জাগছে ডুবন্ত দেহ, কাঁদছে ভীষণ
একান্ত মারীচ হয়ে বুক মুখ ঘষে শত শত আলপিন
ঝাপসা জানালা খুলে ফেনায়িত দেখি
মিথ্যে প্রেমরাশি, বন্ধুদের মুখ ও মুখোশ, ঈর্ষান্বিত, মেকি

অজস্র ঈর্ষার কুচি মেশানো রাত্রির হল জমিয়ে রাখছি
যত তোমাদের ঈর্ষা তত আমি জিতে যেতে থাকি
বুকের ঢাকনা খুলে বয়ে যেতে দিই ঈর্ষার সাম্পান
যতটা ধারালো তোমাদের চাকু তত ফুল আমার বাগান!

প্রেমের অভিসম্পাত

রনি অধিকারী

প্রেমের অভিসম্পাতে আজ ফালাফালা হয়ে আছি...
প্রিয়মুখে হাসিমুখ খুঁজে নেব শেষতম ছুতো
আঘাতের বদলে আঘাত চিহ্নের বদলে নেব ক্ষত।

প্রেমের অভিসম্পাতে টুকরো টুকরো হয়ে আছি...
অভিশাপের ওই সূত্র ধরে যত মন্ত্র-তন্ত্র-শাস্ত্র জানি
তোমরা জানো না বুঝি বদলে নিয়েছি দৈববাণী!

মায়াবী সময়ে ডেকে আনো আজি গুপ্ত খুনিদের
ক্রমশ প্রকাশ্যে খুলে যাবে নিবিড় চুম্বনরত
দগ্ধ-দুপুরে একান্ত ভাবী হে মানবী! তুমি কি সম্মত?

সুলতান সুলেমান

শাহরিয়ার সোহেল

ফেটে পড়ছে হৃদ-হৃদয় তোমার
তৃষ্ণার্ত মরুভূমি সাইমুম হাহাকার
অটোমান সাম্রাজ্যের দশম ধারা
সাহসিকতা, মহানুভবতা, ন্যায়পরায়ণতা
বদন্যতা ও শক্তিমানতায় ঐশ্বর্যের সম্ভার
পনেরো'শ বিশ থেকে পনেরো'শ ষেষটি
ছেঁচল্লিশ বছরের বীরত্বগাঁথা রাজত্বকাল
হাঙ্গেরি, আফ্রিকার অংশ
দানিউব থেকে বুদাপেস্ট
টাইগ্রিস থেকে বাগদাদ
ক্রিমিয়া থেকে নীলনদ
বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র
মহান কবি ও নৃপতি অধিক
শ্বেতসাগর, কৃষ্ণসাগর, রুমেনিয়া
আনাতোলিয়া, কারামানিয়া, রুম ভূ-খণ্ড
জুলকাদিয়া, দিয়ার বেকির, কুর্দিস্তান
আজারবাইজান, পারস্য, দামাস্কাস
আলেপ্পো, কায়রো, মক্কা, মদিনা
জেরুজালেম, সারা আরব, ইয়ামান
ও অন্যান্য বহু দেশের বিজয়ী নৃপতি
ধরা পড়ে গেলে তুমি সোনালি চুল
আর সবুজাভ-নীল চোখের অধিকারী
দাসী হররামের গভীর ভালোবাসায়

মোবাইলে প্রিমিয়াম জমা

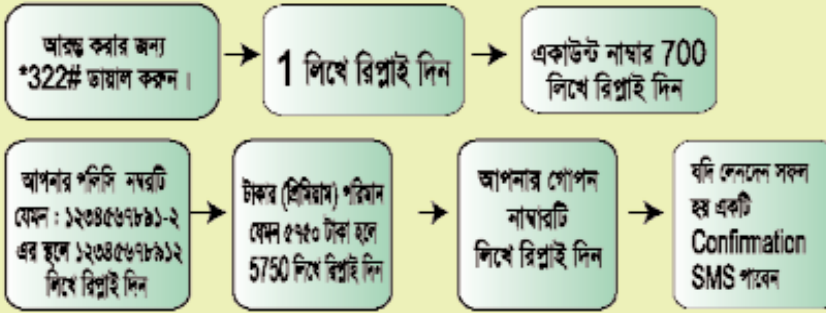
সানফ্লাওয়ার লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী লি: এর গ্রাহকগণ মোবাইল ফোনে নবায়ন (Renewal) প্রিমিয়াম নিম্নোক্ত সেবার মাধ্যমে জমা করতে পারবেন :

সেবা-১



Dutch-Bangla Bank Mobile Banking এর মাধ্যমে প্রিমিয়াম জমা :

• সানফ্লাওয়ার লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড এর **Dutch-Bangla Bank Mobile Banking** একাউন্ট নম্বর (Account Number) : **700** এর মাধ্যমে নবায়ন (Renewal) প্রিমিয়াম জমা দেয়ার পদ্ধতি :

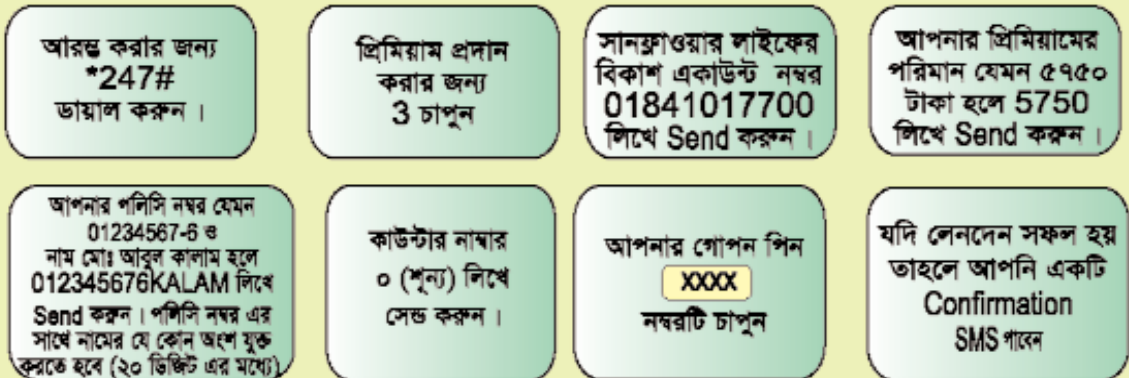


সেবা-২



bKash Mobile সেবার মাধ্যমে প্রিমিয়াম জমা:

• সানফ্লাওয়ার লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড এর **bKash** একাউন্ট নম্বর (Account Number) **01841017700** এর মাধ্যমে নবায়ন ((Renewal)) প্রিমিয়াম জমা দেয়ার পদ্ধতি :



* প্রিমিয়াম জমার পর মূল রশিদ (O.R.) ইস্যুর সাথে সাথে SMS এর মাধ্যমে মোবাইল ফোনে জানান হবে (যদি ফোন নম্বর কোম্পানীতে দেয়া থাকে) এবং মূল রশিদ (O.R) ডাক যোগে গ্রাহকের ঠিকানায় প্রেরণ করা হবে।

* এ ছাড়াও বর্তমানে প্রচলিত ব্যবস্থার মাধ্যমে নবায়ন (Renewal) প্রিমিয়াম জমা করা যাবে।

বিস্তারিত জানতে : ০১৭৫৭১০৭৯৬৮ ০১৮৪১৪১১১৫৫, ০১৮৪১৪১১১৬৬, ০১৮৪১৪১১১৭৭



সংস্করণ
সমৃদ্ধি ও
শিরাপত্তার
প্রতীক

সানফ্লাওয়ার লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী লিঃ

প্রধান কার্যালয় : দিলকুশা সেন্টার (৬ষ্ঠ তলা), ২৮ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০।
মোবাইল : ০১৭৫৭১০৭৯৬৮ ফোন : ৯৫৭১৬১৯-২০ ফ্যাক্স নং-৮৮-০২-৯৫৭৮৮৭০
ই-মেইল : sf_life@sparkbd.net web:www.sunflowerlife.com

pdfa creation 2014

কেন যে এমন হয়

তমিজ উদ্দীন লোদী

কনক্রিট-জঙ্গল থেকে বেরিয়ে
অবশেষে আমরা যখন ঘন সবুজ
তখন বৃষ্টি এলো ফসফরাসের গন্ধ নিয়ে।

তোমার খোলা চুলে যে বৃষ্টির ফোঁটাগুলি জড়িয়ে ছিল
তাতেও অচেনা গন্ধের ঝাঁজ
বুনোফুলের তাজা গন্ধকেও যা ম্লান করে দিচ্ছিল।

বহু প্রতীক্ষার পর তুমি যখন তোমার
খোলস থেকে বেরোতে চাইলে
তখন আকাশ ঘন, তখন ঝড়ো হাওয়া, তখন ফসফরাস
অসংখ্য ফাল থেকে চুইয়ে পড়া রক্তের মতো জল
আর তুমি আবারো শামুক
তোমার লেপ্টে যাওয়া চুলের ভেতর খুব ফ্যাকাসে মুখ।

এক টুকরো সবুজের জন্য একটি অনন্য অভয়ারণ্যের জন্য
আর কোথায় যাওয়া যাবে

নিদেন পক্ষে একটি কোলাহলহীন চুম্বনের জন্য
আমাদের আর কতটুকু যেতে হবে বলো?

আবেগ

চঞ্চল শাহরিয়ার

সারাটা জীবন শুধু আবেগে ভেসেছি
আবেগে ভেসে জেনেছি ওপাড়ার মেয়েগুলো
শেষ বিকালে দারুণ ফুর্তিতে থাকে।
বোকাসোকা কোনো যুবকের দেখা পেলে নাকে দড়ি
দিয়ে ইচ্ছামতো ঘুরাতে ভুলই করে না।

ওপাড়ায় আজ বিকালে হঠাৎ ঢুকে পড়লাম
এক কিশোরীর মায়াবী চাহনি উদাস করল
'বউ কথা কও পাখি' ডেকে ডেকে একাকার
মনে হচ্ছে আজ রাতে আইসক্রিম খেতে খেতে ফের
নতুন গল্পে প্রবেশ করব।

একটা মানুষ চাই

নাহিদা আশরাফী

নিজের জন্যে চাওয়া হয় না কখনই কিছু।
পাওয়া হয়নি সুখ নামের কোনো ভূখণ্ড,
অথবা চাষযোগ্য কোনো অনাবাদি হৃদয়।
নিজেকে তক্তপোশ ভেবে বিছিয়ে দেব—
সেগুন বা কড়ই কাঠের এমন শক্তপোক্ত খাট মেলেনি আজ অবধি।
কতবার নিজেকে পাখাওয়ালা পিপীলিকা ভেবে
উড়ে গেছি অগ্নিবলয়ের কাছে।
পুড়ে মরা হয়নি তবু যথোপযুক্ত আগুন মেলেনি বলে।
সেই থেকে ধরেই নিয়েছি – আমার কিছু চাইতে নেই।
কিছু পেতেও নেই।
কিন্তু চায়ের মগটা?
একা থেকে থেকে কেমন বিবর্ণ, বিষণ্ণ হয়ে উঠছে।
ঠোকাঠুকি না হোক নিদেনপক্ষে টুংটাং আওয়াজ তোলার জন্যে
সাতসকালে একটা সঙ্গী তো চাই ওর।
হতদরিদ্র পাঞ্জাবিটা ভরদুপুরে বারান্দায় একা দোল খায়।
একলা জীবনে বড্ড ক্লান্ত বোধ করে ও।
সুখ দুঃখের কথা বলার জন্যে একটা শাড়ি অথবা
একটা কমলা রঙা ওড়না থাকলে কী এমন ক্ষতি হতো?
যাই যাই বিকালের ঢলো ঢলো রোদ একটিবারের জন্যে হলেও
উঁকি দিত আমার বারান্দায়। আজকাল আর উঁকি দেয় না সে।
আচার কিংবা কুমড়োর বড়ি শুকাতে দেবার মতো
কেউ থাকে না এ ঘরে – এ কথা রোদ বেশ বুঝে গেছে।
যেমন করে দখিনা বাতাস বুঝেছে – পিঠময় এলোচুল বিছিয়ে
কুশন কভারে বা রুমালে ফুল তোলার মতো কোনো কারুশিল্পী এ ঘরে নেই।
এই সব রোদ আর দখিনা বাতাসের সাথে অলস দুপুরে
গল্প করার জন্যে একজন কারুকন্যার খুব প্রয়োজন।
আর রোজ রাতে পাশের শূন্য বালিশের
গুমরে ওঠা দীর্ঘশ্বাস আমায় বড্ড শোকাক্ত করে।
তাই আবারো বলছি, আমার জন্যে নয়—
ওর বুকে মাথা রাখার জন্যে হলেও একটা মানুষ চাই শুধু।

minister

আমার পণ্য, আমার দেশ
গড়ব বাংলাদেশ

বছর
গ্যারান্টি

ব্যাপক
দাম কমলো

ঈদ
মোবারক

বিদ্যুৎ
সামগ্রী



0% ইন্টারেস্টে
৬ মাসে মূল্য পরিশোধ

আরো আছে
সহজ কিস্তির সুবিধা

সেরা মডেল
সেরা কোয়ালিটি
সেরা গ্যারান্টি

f Minister Hi-Tech Park

01971-700700



উপন্যাস

বারুদ বৃষ্টির দ্রাণ

আলমগীর রেজা চৌধুরী

এক.

দ্যাশ গেরামের বাজার। কত কথা হাওয়ায় ওড়ে।
গঞ্জ থেকে মহাজনি নৌকা করে মাল আসে, মানুষ
আসে। কেউ কেউ বলে, সোনানগর। আবার বুড়ো
দবিরউদ্দিন রসিকতা করে বলে, ‘স্বর্গগ্রাম’।
মানু মুঙ্গীর চায়ের দোকানের আড্ডাবাজ ছেলে
ছোকরারা হেসে লুটিয়ে পড়ে।
চায়ে চুমুক দিতে দিতে নেতাই চরণ বলে, ‘দবির
চাচা না থাকলে, সোনানগর তামা হইত।’
পাশ ঘেঁষে বংশাই নদী। ভরা বর্ষায় নদীর জল
সাপের মতো শৌসায়। পালতোলা কত নৌকা
আসে, মাল বেচাকেনা আর লাভ-লোকসানের হিসাব
করে চলে যায়। সোমবার-বৃহস্পতিবার বাজার বসে।
মাঝে মাঝে বাজার কমিটি কবি, বাউল গানের আসর
বসায়। সিরাজ বয়াতির সঙ্গে কোরবান ফকিরের
কবিগানের যুদ্ধ হবে। গেরামের মানুষ ভেঙে পড়ে
গান শুনতে। ভোর হয়। চোখে ঘুম নিয়ে ঘরে ফিরে

যেতে যেতে মানুষ বলাবলি করে, ‘সিরাজ বয়াতি
গাইতে গাইতে কাইন্দা দিলে কী অইব, কোরবান
ফকিরের মারফতি প্যাঁচ বোঝে নাই। আহারে গলা
একখান।’

সকাল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সোনানগর বাজার নীরব
হয়ে যায়। তখনো দেখা যায় মানু মুঙ্গী ক্যাশ বাক্সের
ওপর মাথা রেখে বিমুগ্ধ আর চা খাচ্ছে কতিপয়
ছেলে-ছোকরা। বেলা বাড়তেই খালি হয় মানু মুঙ্গীর
চায়ের দোকান। আবার বিকালে বাজার সরগরম
করে তোলে। কেউ কেউ দ্যাশের পরিস্থিতি নিয়ে
কথা বলে,

‘আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় গেলে কী অইব, দ্যাশ
চালাইবার পারব না।’

‘অরা পাঞ্জাবির বাচ্চা, কমে ছাড়ব মনে করছ?’

‘আরো রাহ, কত দেখলাম। এইবার দেখবা সব ঠিক
অইয়া যাইব, শেখ মুজিব সব ঠিক কইরা ফালাইব।’
ফ্যাস ফ্যাস কণ্ঠে মজিদ বলে।



‘ও মানু চাচা, আপনার দোহান যে কথার ঠেলায়
ফাইটা যাইব গো’, বলতে বলতে স্বপন ঢোকে।
‘আরে কবার দেওছে মিয়া। দ্যাশটারে তো আকাশে
তোলবার চায়। তোলবার দেও। চা খাও মিয়া আর
কথা কও।’
পান খাওয়া লালচে ঠোট উলটে হাসে মানু মুগী।
ক্যাশ বাক্সের ওপর হাত বুলিয়ে মানু মুগী হাঁক
দেয়, ‘অয়, স্বপন মিয়ারে চা দে।’
স্বপন ততক্ষণে মজিদের বেঞ্চিতে বসে পড়েছে।
স্বপনকে বসতে দেখে নেতাই চরণ বলে, ‘গঞ্জ
থাইকা আইছ কোন সময়?’
‘আইতে আইতে রাইত অইছিল। মালেক মহাজনের
নায় মাল আনছিলাম। বেশি মাল আনি নাই। গঞ্জে কী
কী জানি কানাঘুসা করল মাইনষে। দ্যাশের অবস্থা
নাই ভালো না।’
‘আরে রাহ, তোমার দ্যাশ! ত্যালের দাম, ঘিয়ের
দাম এক অইলে হেডা আবার দ্যাশ অয়।’ ছমায়ুন

শিকদার একটু শ্লেষ মিশিয়ে বলে।
এই সময় বাইরে থেকে সাজাহান ভাইয়ের কণ্ঠস্বর
শোনা যায়। ‘তোমরা সবাই আছ দেখছি।’ মদু পায়ে
দোকানে ঢোকে সাজাহান ভাই। রোগাটে শরীর,
ঘোলাটে চোখ। মাথায় অবিন্যস্ত ঝাঁকড়া চুল। বাঁ হাত
দিয়ে চুলগুলো সব সময় বিন্যস্ত করতে ভালোবাসে।
ফুক ফুক সিগারেট টানতে টানতে একটা বেঞ্চিতে
বসে যায় সাজাহান ভাই।
‘সাজাহান ভাই!’ সমস্বরে সবাই বলে উঠল।
নেতাই চরণ হাঁক ছাড়ে, ‘অয় সাজাহান ভাইরে চা
দে।’
‘না, চা খাব না! তোমাদের সঙ্গে দু-একটা জরুরি
কথা বলব। ঢাকার খবর জান কিছ?’
‘গঞ্জ গেছিলাম। কাইল রাতে ফিরছি। মাইনষে কয়
ভুট্টো মিয়া চইলা গেছে। দ্যাশে যুদ্ধ লাগবার পারে।
এইসব আর কি?’
সাজাহান ভাই সোনানগরের সবারই প্রিয়। মানু



Primeasia University

a mission with a vision

(Approved by UGC & Govt.)



Admission for Fall Semester 2016

Undergraduate & Graduate Programs

School of Business

- Bachelor of Business Administration (BBA)
- Master of Business Administration (MBA)
- MBA in Textile and Apparel Marketing
- Executive MBA
- Bachelor of International Tourism and Hospitality Management (ITHM)

20% Tuition Waiver

School of Science

- B.Sc. (Hons.) in Microbiology
- M. Sc. in Microbiology
- B.Sc. (Hons.) in Biochemistry
- B. Pharm. (Hons.)
- M. Pharm. (General Group)
- M. Pharm. (Thesis Group)
- B.Sc. (Hons.) in Public Health Nutrition

School of Engineering & Technology

- B.Sc. in Textile Engineering
- B.Sc. in Electrical & Electronic Engg. (EEE)
- B.Sc. in Electronic & Telecom. Engineering
- B.Sc. in Comp. Science & Engg. (CSE)
- B.Sc. in Comp. Science & Information Tech.
- Bachelor of Architecture (B. Arch)

School of Law

- LL.B (Hons.)
4 - Year

Scholarship/
Waiver 10-100%

15% Tuition Fee Waiver for Female Student

Admission Office: Star Tower, 12 Kemal Ataturk Avenue, Barani CA, Dhaka-1213, Phone: +88-02-9822133, 9821499-501, 9821678 [Ext.-12, 311], Mobile: 01777 686 548, 01857 33 440, 01621 462 175

www.primeasia.edu.bd

মুন্সীর চা দোকানের আড্ডাবাজ বেকার ছেলেদের চোখের মণি। বিএ ফেল করে মাস্টারি করত মদনপুর হাইস্কুলে। সরকারবিরোধী আন্দোলনের জন্য মাস্টারি চলে যায়। কলেজে পড়াকালে ছাত্র সংসদের সম্পাদক ছিল। হরতাল করতে গিয়ে জেল খেটেছে তিন মাস। সোনানগরে আবালবৃদ্ধবনিতার কাছে সাজাহান ভাইয়ের আলাদা মান আছে। মানুষ মুন্সীর চায়ের দোকানের ছেলেরা জানে শেখ মুজিবের সঙ্গে সাজাহান ভাইয়ের যোগাযোগ আছে। অনেকক্ষণ কিম মেরে বসে থাকে সাজাহান ভাই।

ফুসফুস করে সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে মজিদ বলে, 'নতুন কোনো খবর আছে নাহি সাজাহান ভাই? আর আমাদের এমপি তো ভোদাই মাল একখান। দ্যাশের কী অইব ও জনব কী কইরা?' সাজাহান ভাই হাত নেড়ে মজিদকে থামতে বলে। 'রেডিও স্টেশন বন্ধ হয়ে গেছে সকাল থেকে। ঢাকার কিছু হয়েছে মনে হয়। টাঙ্গাইল যেতে হবে একজনকে। কে যেতে পারো? সাইকেল ম্যানেজ করে দিচ্ছি। এমপির সঙ্গে দেখা করে জেনে আসবে সব।'

এতক্ষণে নেতাই চরণ, স্বপন, মজিদ মিয়া, হুমায়ুন শিকদার পরস্পরের মুখের দিকে তাকায়। নেতাই চরণ অজুহাত দেখায় পেটের ব্যথার। মজিদ মিয়া বলে, 'হুমায়ুন নেহাপাড়া জানা লোক ও বুঝব বিষয়টা।' হুমায়ুন শিকদার শরীরের আড়মোড়া ভাঙে। স্বপন দ্রুত বলে, 'অইছে বুঝছি, পড়ছে তো কেলাস নাইন পর্যন্ত। চাকরি তো পাইবা না, দ্যাশের কাম কর কিছু। কাজে নাগবা।' হুমায়ুন শিকদার মৃদু হাসে। সাজাহান ভাই বলে, 'রাত হলেও চলে আসতে হবে। চল আমার সঙ্গে।' সাজাহান ভাইয়ের সঙ্গে হুমায়ুন শিকদার বেরিয়ে যায়। অনেকক্ষণ ওদের মাঝে কোনো শব্দ নেই। নিরুদ্দেশ বসে বিড়ি ফোঁকে, চা খায়। টেবিলের মধ্যে চটাস করে চড় কষে স্বপন বলে ওঠে, 'দ্যাশটার অইল কী? এতদিন খাইয়া স্বাদ মিটল না হারামজাদাগরে। এখানে তালবাহানা।' মানুষ মুন্সীর আবার এসব ভালো লাগে না। পুরনো আমলের মানুষ, ব্রিটিশ আমলে ইংরেজদের সঙ্গে চলাফেরা করেছে, কথাই রাখা ব্রিটিশ আমলের গল্প বলে। জিন্নাহ সাহেবের গড়ের মাঠের বক্তৃতার কথা বলে। চোখ দুটো ঘন ঘন নাচিয়ে নিয়ে বিজ্ঞের মতো হেসে বলে, 'জিন্নাহ সাব না অইলে পাকিস্তান অইত না, আর পাকিস্তান না অইলে...। কী অইত। তোমরা কী বোঝবা মিয়ারা। জন্মের পর দেখছ স্বাধীন পাকিস্তান। ঠেলা আছে মিয়ারা, ঠেলা আছে।' ওরা হে হে করে হেসে ওঠে। সবাই জানে মানুষ মুন্সী ভালো মানুষ। কারো আগেও নেই পাছেও নেই। বাজারের মধ্যে কত কী ঘটে, তা দুই নয়ন মেলে চেয়েও দেখে না। বিচার-শালিসে ডাকলে বলে, 'আমি ক্যাশের ওপর মাথা রাইখা ঘুমায়ে ছিলাম তখন।' কিমাম জরদা দিয়ে পান খেতে খেতে ছেলে-ছোকরাদের সঙ্গে রাজনৈতিক আলাপ করে। বিগত দিনের কথা বলে। ছেলে-ছোকরারা মানুষ মুন্সীর নাম দেয়, 'দালাল মুন্সী।' মানুষ মুন্সী হাসে। দাঁতের নিচে সুপারি ফেলে বলে, 'পাকিস্তানের দালাল না তোমাগোরে দালাল?' আবার হাসির রোল ওঠে। মজিদ মিয়া বলে, 'ও মানুষ চাচা, যুদ্ধ তো অইব

পাঞ্জাবির লগে, তখন কাগোরে কাছে যাইবাইন, আমাগোর না পাঞ্জাবিগো।' 'আরে রাহ, তোমার পাঞ্জাবি। কত দেখলাম।' গদগদ কণ্ঠে আর কী বলল মানুষ মুন্সী, কিছু বোঝা গেল না। একসময় হাসতে হাসতে মানুষ মুন্সীর দোকান থেকে বেরিয়ে গেল ওরা।

দুই.

সারা রাত্তা তনু কেবল আবু-আবু করেছিল। তিন বছর বয়স তনুর। এ-কোল থেকে ও-কোল বয়ে নিতে বিরক্ত ধরে। দু-এক বার ধমক দিয়েছিলেন করিম সাহেব। পা ফুলে গেছে সবাই। সোনানগর পৌছতে রাত নেমে এসেছিল। মিতুল বাড়ি পৌছে বলল, 'একবারে জানে মরে গেছি বড় ফুফু।' দীর্ঘদিন ঢাকায় আছেন করিম সাহেব। সম্প্রতি বাড়ায় জমি কিনে বাড়ি বানিয়েছেন। চাকরি করেন এজি অফিসে। রাতে ঢাকায় যখন পাক সেনাদের তাণ্ডবলীলা চলছে তখন উৎকণ্ঠায় হুপপিও চেপে ধরেছিল তার। মিতুল বলেছিল, 'অত ভেব না আবু, সকালে সব ঠিক হয়ে যাবে।' করিম সাহেবের ভাবনাটা ছিল অন্য জায়গায়। যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। ঘরে ঘরে তল্লাশি চালাবে ওরা, তখন কী উপায় হবে? শেখ মুজিবের আলোচনা ব্যর্থ হয়েছে। সন্ধ্যা থেকে সেই রকম আলোচনা মানুষের মধ্যে বিরাজমান। করিম সাহেবের স্ত্রীর এ ব্যাপারে কোনো বোধ নেই। গ্রামের মেয়ে। ভালোবেসে বিয়ে করেছিলেন আজ থেকে বাইশ বছর আগে। দীর্ঘদিনের সংসার রচনার ফল মিতুল, শোভন ও তনু। মিতুল ইন্টারমিডিয়েট পড়ে। শোভন ক্লাস টেনে। তনুর কেবল ভালো করে কথা ফুটেছে। করিম সাহেবের সংসারে শেষ প্রতিনিধি সম্পর্কে তাদের স্বামী-স্ত্রীর ধারণা, তনুর জন্য একটা অ্যাকসিডেন্ট। তবু তাদের শেষ সন্তানের জন্য হৃদয়ের সবটুকু ভালোবাসা যেন ঢেলে দিয়েছেন। করিম সাহেবের স্ত্রী রাহেলা বেগম তো তনু সোনা বলতে পাগল। মিতুলের উৎসাহের অন্ত নেই তার ছোট্ট ভাইটির প্রতি। কারণ-অকারণে বিরক্ত করা, ফিডারে দুধ ভরে জোর করে খাওয়ানো। করিম সাহেব অফিস থেকে ফিরে সারা বাসা তোলপাড় করে তোলেন। 'ও তনু সোনা, তনু সোনা। দেখ তো তোমার জন্য কী এনেছি?' পিট পিট করে বিড়ালের মতোন চোখ তুলে তাকায় তনু। ঠিক তখনই বাঁশি ফুঁ দেন করিম সাহেব। শোভন বলে, 'অ-তনু মিয়া, আমাদের জন্য চকলেট কিছু রেখে দিও। আবু তো সব তোমার জন্য নিয়ে আসে।' তনু ফোকলা মাড়ি দেখিয়ে হাসে। ভোর হতেই পটাপট গুলির শব্দ আসে। রামপুরা বস্তি জ্বলছে। এ বাসার ও বাসার লোকজন বলাবলি করে, 'আর ঢাকায় থাকা যাবে না। কখন যে ওরা এসে হানা দেয়?' পাশের বাসার কাদের সাহেব হাতে শুষু একটা ব্যাগ, তার স্কুলকায় বউকে নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন। করিম সাহেব ডাকলেন, 'ও কাদের সাহেব, যাচ্ছেন কোথায়?' কাদের সাহেব উৎকণ্ঠিত কণ্ঠে বলেন, 'ঢাকায় আর না। খবর কিছু রাখেন? পিলখানা শেষ। রাজারবাগ

পুলিশ স্টেশনের কেউ বেঁচে নেই। ঢাকায় থাকলে কারো রক্ষা নেই। গ্রামই এখন নিরাপদ।' কাদের সাহেব দেখতে দেখতে বাড়িগুলোর আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যান। আর ঠিক তখনই সমস্ত হতাশা এসে ভিড় করে করিম সাহেবের মধ্যে। কোথায় যাবেন এখন তিনি? এতদিনের পরিশ্রমের সংসার ছেড়ে স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়ে কোথায় দাঁড়াবেন? রংপুর কি আজকের রাত্তা? যানবাহন চলে না। এখন উপায়? ঠিক এই সময় ক্যান্টনমেন্ট এলাকা থেকে ভারী কামানের আওয়াজ ভেসে এলো। রোদ্দুর উঠে গেছে এক মানুষ সমান। চারদিক কাকের ডাক আর গুলির শব্দে একাকার। রাত্তার মোড় থেকে শোভন দৌড়ে এলো। 'আবু, আমাদের মহল্লা খালি হয়ে গেছে। সবাই গ্রামের দিকে যাচ্ছে। শেখ মুজিবকে বন্দি করে নিয়ে গেছে পশ্চিম পাকিস্তানে।' হতাশায় নুয়ে পড়েন করিম সাহেব। মার্চের মিঠে শীতেও তার কপালে ঘামের বিন্দু স্পষ্টতর হয়। রাহেলা বেগমের দিকে ঈষৎ আড়চোখে তাকান। রাহেলা বেগম মিতুল, শোভন, তনুর দিকে তাকিয়ে বলেন, 'এখানে থাকলে বিপদই বেশি। চল, আমরা গ্রামের দিকে যাই। কপালে যা হওয়ার তা তো হবেই। আল্লাহ ভরসা।' কিন্তু যাবেন কোথায়? বিষাদের চিহ্ন করিম সাহেবের কপালের বলিরেখা ফুলে ওঠে। শোভন বলে, 'বড় ফুফুর ওখানে গেলে এক ব্যবস্থা হবেই। ঢাকা থেকে টাঙ্গাইল, আজকের পথ? হতাশা মিতুলের কণ্ঠে। এভাবে কথা বলতে বলতে সূর্য অনেক উপরে চলে আসে। রেডিওতে বার বার কারফিউর কথা বলা হচ্ছে। একটা ব্যাগের ভেতর প্রয়োজনীয় কাপড় নিয়ে বাসার মৈন দরজায় তালা লাগিয়ে ওরা এসে রাত্তায় দাঁড়াল। তনু বলল, 'আবু, আমরা কোথায় যাচ্ছি?' রাহেলা বেগম দ্রুত বললেন, 'অনেক দূরে বাবা।' বাড়টা পেরোতেই পেছনের দিকে তাকাল সবাই। রোদের আলো পেরিয়ে দালানের ওপর দিয়ে আগুনের হলকা দেখা যায়। অনেক কথা মনে হয় করিম সাহেবের। এতদিনের সংসার ফেলেই চলে যেতে হবে। যাই হোক, আল্লাহ ভরসা। করিম সাহেব পুত্র তনুকে কোলে নিয়ে পথ হাঁটেন। মিতুল ভাবে, 'মোড়ের বাসার মিতু আপারা কি ঢাকা ছেড়েছে? আগামী পরশু দিন মিতু আপার বর আসবে বিলেত থেকে।' শোভন ভাবে, 'আগামী রোববার স্কুলের বার্ষিক পিকনিক ছিল চন্দ্রায়।' এভাবে দুটো দিন কেটে গেলে। কোথাও গরুগাড়ি, কোথাও হেঁটে করিম সাহেবের পরিবার সোনানগর এসে পৌছে। বড় ফুফুকে জড়িয়ে ধরে মিতুল কাঁদতে থাকে। 'আমি ভাত খাব', বলে তনু ঘ্যানর ঘ্যানর করে। বড় ফুফু 'ও আমার বাবারে' বলে তনুকে কোলে নিয়ে আদর করে। রাহেলা বেগম আর করিম সাহেবের মধ্যে যেন কোনো চেতনা নেই। একটা চোঁকিতে নিঃশব্দ হয়ে বসে থাকেন কতক্ষণ। যেন অনেককাল থেকে চেতনা হারিয়েছেন তারা। বড়

ফুফুর মাঝে ব্যস্ততা দেখা যায়। এ ঘর ও ঘর দিয়ে ঘুরতে থাকে। সন্ধ্যারাত। বাইরে ওলা পোকার একটানা ডাকার শব্দ। স্নান জোছনা কুয়াশার আন্তরণ ভেদ করে আসছে। আরো অনেক পরে করিম সাহেব ডাকলেন, ‘ও বড়বু’, দুলাভাই কই?’

বড় ফুফু কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে বলে, ‘আজ দুই দিন ধরে লোকটার শান্তি নেই, বাচ্চু আজো বাড়ি ফিরল না। মনে কি আর সুখ আছেরে ভাই।’

বড় ফুফু ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

বড় ফুফুর স্বামী দীর্ঘদিন চাকরি করেছেন জুট ডিপার্টমেন্টে। এখন অবসর জীবনযাপন করছেন। পিতৃপ্রদত্ত জমিজমা দেখাশোনা করে দিন চলে যাচ্ছে। বড় ফুফু তিনটি মেয়ে জন্ম দেয়ার পর ছেলের আশা ছেড়ে দিয়ে যখন মনের অনলে পুড়ছিলেন তখন তার কোলজুড়ে এলো বাচ্চু। যে এখন হলে থেকে ভার্টিসটিতে পড়ছে। পলিটেক্যাল সায়েন্সে শেষ বর্ষে। তালুকদার সাহেব চাকরিতে থাকাকালে সব মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। একমাত্র ছেলে বাচ্চুকে নিয়ে বড় ফুফুর সুন্দর সংসার। বাচ্চু ঢাকা থেকে ফিরে আসছে না। বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে ঢাকার শ্রাপদসংকুল সংবাদ। এই বাড়ির সুখ হঠাৎ করে কোথায় যেন উড়ে গেছে। বিষণ্ণ স্নান এক শোকাচ্ছন্ন হাওয়া বইছে চারদিকে।

করিম সাহেব ভাবলেন, ‘বাচ্চু এখনো ফিরল না কেন! ও তো অনেক আগেই চলে আসতে পারত। আজকাল ছেলেপেলেরা যে কী হচ্ছে!’ করিম সাহেবের বুক দুরু দুরু করতে থাকে। একসময় দূরে কোথাও শিয়াল ভেঁকে ওঠে।

শোভন ভয়ার্ত কণ্ঠে বলল, ‘আবু শিয়াল ডাকছে?’

করিম সাহেব কথা বললেন না। পাশে উবু হয়ে শুয়ে থেকে জীর দিকে তাকালেন। ঘুমের মধ্যে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়ছে রাহেলা বেগম। ঘুমাক। এতটা ধকল সহিব কেন ওর। বিগত দুই দিন ক্রমাগত হেঁটেছে। বড় ফুফু তনুকে খাইয়ে বিছানায় শুইয়ে দিল। কতক্ষণের মধ্যে ঘুমিয়ে যাবে ও। একবারো ওর মার কথা বলল না তনু। কলতলা থেকে হাত-মুখ ধুয়ে এসে রান্না ঘরে ঢুকল শোভন।

বড় ফুফু ডাকল, ‘ও করিম হাত-মুখ ধুয়ে খেতে আয়।’

এই সময় ফিরলেন জামিল সাহেব। তার চোখে-মুখে দৃষ্টিভার রেখা। খুব নিঃশব্দে বড় ঘরের বারান্দায় উঠতেই করিম সাহেবকে নিরুপ বসে থাকতে দেখলেন। এক মুহূর্তের জন্য আঁতকে উঠলেন তিনি। ‘আরে করিম যে? কখন এলে। বাচ্চু এসেছে কি?’

বুকের ভেতর আবার আঘাত খেলেন করিম সাহেব! কী বলবেন তিনি!

‘এই তো কতক্ষণ আগে। বাচ্চু ফেরেনি আমাদের সঙ্গে। চিন্তা করবেন না দুলাভাই। ঢাকায় তেমন কিছু হয়নি।’ সন্তানার ভাষায় কথা বললেন।

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে জামিল সাহেব বললেন, ‘বাজারে গিয়েছিলাম। দলে দলে লোক আসছে। সবাই বলছে ঢাকা একেবারে ম্যাসাকার।’

করিম সাহেব কোনো জবাব খুঁজে পেলেন না। জামিল সাহেব উৎকণ্ঠা টের পেলেন গভীরভাবে। রান্নাঘরের দিকে তাকিয়ে জামিল সাহেব বললেন, ‘ওগো শুনছ, করিমকে খাইয়েছ কিছু? এত পথ হেঁটে এসেছেন, কী যে কষ্ট হচ্ছে মানুষের। দলে দলে লোক এসে স্কুলঘরে আশ্রয় নিচ্ছে রাত কাটানোর জন্য। দেখলে চোখে পানি এসে যায়।’

জামিল সাহেবের কণ্ঠস্বর পেয়ে ছুটে এলেন বড় ফুফু। হুহু করে কেঁদে উঠলেন তিনি। জামিল সাহেব কোনো কথা না বলে কলতলার দিকে যাচ্ছেন।

খাওয়ার সময় রাহেলা বেগমকে ডাকলেন না করিম সাহেব।

‘বড়বু’, ওর জন্য খাওয়া রেখে দিও। ঘুমাক ও।’

খাওয়ার পিড়িতে বসে ঢাকার ও তাদের পথকষ্টের মোটামুটি বর্ণনা দিলেন করিম সাহেব। আর হুহু করে কাঁদলেন বড় ফুফু। রাত বাড়ার সঙ্গে মার্চের শীত ঢুকছে টিনের ভেন্টিলেটর দিয়ে। পাশের ঢৌকিতে মিতুল-তনু-শোভন ঘুমচ্ছে। বারান্দা থেকে ঘরে এসে ঘুমানোর সময়ে রাহেলা বেগম প্রায় পড়েই যাচ্ছিলেন। রাতে খাবে না বলে বিছানায় গিয়ে ঘুমিয়ে গেছে ও। এত ক্লান্তির মাঝেও করিম সাহেবের ঘুম এলো না। ঢাকা, বাসা, বাচ্চু ফিরে না আসাতে বড়বুর উৎকণ্ঠিত মুখ, কী ভয়াবহ অনিশ্চয়তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে এ দেশের ভবিষ্যৎ। এসব চিন্তা করে কষ্ট পেতে লাগলেন। সঙ্গে ও ঘরে বড়বুর ফুঁপিয়ে কান্নার আওয়াজ আসছে। একসময় আল্লাহ ভরসা করে বিছানায় মুখ গুঁজলেন তিনি।

তিন.

মানু মুন্সীর চার দোকানের আড্ডাবাজ ছেলে-ছোকরাদের আজ কদিন ব্যস্ততার অন্ত নেই। ঢাকা থেকে সহায়সম্মলহীন মানুষ আসছে। স্কুলে সাহায্য শিবির খোলা হয়েছে সাজাহান ভাইয়ের নেতৃত্বে। ছেলে-ছোকরারা গ্রামে গ্রামে ঘুরে সাহায্য চাইছে। কেউ কেউ জানতে চাইছে ঢাকার সর্বশেষ সংবাদ কী? শেখ মুজিব এখন কোথায়? কর্নেল ওসমানী এখন কী করছেন। প্রশ্নের অন্ত নেই মানুষের। ক্লান্ত কণ্ঠ হতাশায় মুহম্মান দৃষ্টি মেলে মানুষেরা বলছে, ‘ঢাকায় কেউ বেঁচে নেই হয়তো।’ আর তখনই ফেউ ফেউ করে কেঁদে উঠছে কোনো কোনো মানুষ।

সাজাহান ভাই ঘুরে ঘুরে তদারকি করছে সব। মজিদ, স্বপন, হুমায়ুন শিকদার, নেতাই চরণের দল ঘন ঘন মানু মুন্সীর দোকানে ঢুকছে। চা আনছে কারো জন্য। যেন কত আপন এই মানুষগুলো।

মানু মুন্সীর দোকানে ঢুকতেই মজিদ বলল, ‘বুঝলেন, মানু চাচা কিছু বুঝলেন, ঢাকার মানুষ আর বাইচা নাহিক। ঘরে ঘরে তল্লাশি কইরা মারতাকে সব। শালারা পশুর বাচ্চা। জানোয়ার।’

মানু মুন্সী গলা খাঁকারি দিয়ে বলে, ‘কী করন যাব অহন? এই মানুষগুলোর কী অইব তাই ভাবতছি! নেতারা কই? চেয়ারম্যান সাবরে খবর দিছ?’

‘দিছিলাম। কয় অহন আব না। শরীল খারাপ, বুঝলে না দালালের বাচ্চা।’

দাঁতে দাঁত ঘষে মানু মুন্সী বলে, ‘পাঞ্জাবিগের খাস পোষা কুস্তা।’

দুপুর নাগাদ একদল এলো। একজন ইপিআর গুলিবিদ্ধ। তাদের মুখ থেকে শোনা গেল পিলখানার জওয়ানদের করুণ অবস্থা। রাত ১২টার দিকে অতর্কিতে কামানের গুলিতে জগে ওঠে সবাই।

ইপিআরটি তখন ঘুমে ছিল। বাইরে তখন আহতদের আর্চটিকার শুনতে পায়। হাতের কাছে রাইফেলটি নিয়ে যখন দৌড়ে আসে তখন একটি ট্যাংক মেইন গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকছে। পালাতে চেষ্টা করল সে। খাড়া দেয়াল উপকে যেতে চাইনিজ রাইফেলের গুলি ওর হাতে বিদ্ধ হয়। রাইফেল বুকের কাছে জড়িয়ে ও পাশে যখন ধপাস করে মাটিতে পড়ে তখন একটি

সামরিক কনভয় তীব্রগতিতে ছুটে গেল পাশের রাস্তা দিয়ে। দেয়ালের সঙ্গে লেপটে থাকায় ওরা দেখতে পেল না তাকে। তারপর অন্ধকারের গা বেয়ে কোন রাস্তা দিয়ে গ্রামে এসে পড়ল কিছুই মনে নেই ওর। শুধু একবার পরনের লুঙ্গি ছিঁড়ে রক্ত বন্ধ হওয়ার জন্য শক্ত করে বেঁধেছিল। এটুকু মনে আছে। ভোর হতেই দেখল নিরাপদ গ্রামে এসে পড়েছে। তাকে এ অবস্থায় দেখে ছেলে-ছোকরারা ভালো করে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিয়েছে। তার মাঝে ক্রমাগত পথচলা। আজ সকাল থেকে যন্ত্রণা হচ্ছে ওর। ঘাসের ওপর চোখ বুজে শুয়ে আছে ইপিআরটি।

সাজাহান ভাই স্বপনকে ডেকে বলে, ‘বারী, ডাক্তারকে ডাকতে হবে। নইলে মানুষটির হাত সেপটিক হতে পারে।’

স্বপন ছুটল বারী ডাক্তারকে ডাকার জন্য। তা ছাড়া দলে সদ্যোজাত একটি শিশু আছে, যে শিশুটি আজ দুই দিন যাবৎ একটু দুধ পায়নি। বুড়ো দবির উদ্দিন চিৎকার করে বলে উঠল, ‘আল্লার গজব পড়ব শালাগো ওপরে।’

সাহায্য শিবিরে এলাহি কাণ্ড। কেউ ঘুমচ্ছে না। বাচ্চা ছেলেরা কাঁদছে ‘ও আম্মা ভাত খাব’ বলে। মা তার সন্তানকে নিয়ে প্রাণান্ত অবস্থায় পড়েছে।

বারী ডাক্তার এলো বাদ জোহর। ইপিআরটির হাত দেখে খানিক সময়ের জন্য চমকে উঠল। ফুলে টনটন করছে। ব্যান্ডেজ খুলে দেখল সাদা হয়েছে ফুটোর মুখ। প্রয়োজনীয় মেডিসিন লাগিয়ে ইনজেকশন করল একটা।

সাজাহান ভাই বার বার বলল, ‘এখন একটু ভালো লাগছে কি?’

ব্যান্ডেজ করার পর গোঁঙাতে গোঁঙাতে একসময় ঘুমিয়ে গেল ইপিআরটি। বুকের কাছে রাইফেল। এত কষ্টের মাঝেও শক্ত করে আগলে রেখেছে। মানু মুন্সী দোকান ফেলে বার বার ছুটে আসছে সাহায্য শিবিরে। সমবেদনা জানাচ্ছে দুখী মানুষগুলোর দিকে তাকিয়ে।

সোনানগরের আবালবৃদ্ধবনিতা ছুটে এসেছে ওদের সাহায্য করার জন্য। অকারণে কেঁদে ফেলছে কেউ। সময় ভালো না। হয়তো এই ভেবে বিকাল নাগাদ ঘোড়ায় চড়ে চেয়ারম্যান সাব এলো। সোনানগরের জনগণ চেয়ারম্যানকে ঘিরে ধরল।

সাহায্য শিবিরের বর্ণনা দিয়ে সাজাহান ভাই বলল, ‘আপনি একটা কিছু করেন চেয়ারম্যান সাব।’

চেয়ারম্যান কাঁচা-পাকা দাড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে বলে, ‘আরে রাহছে। এক সন্তার মধ্যে সব ঠিক হইয়া যাইব। যা অইছে তার চাইয়া বেশি ভয় পাইয়া মানুষজন ঢাকা ছাইড়া পালাইতাকে। সব গুজব মিয়া। চিন্তা করণের কী আছে?’

মানু মুন্সীর চার দোকানের আড্ডাবাজ ছেলে-ছোকরাদের মাঝে মনু গুজব শোনা গেল। সাজাহান ভাই বিমূঢ় দাঁড়িয়ে থাকল কতক্ষণ। চেয়ারম্যান সাব সামনে থেকে সরে সাহায্য শিবিরের দিকে এগিয়ে গেল।

নেতাই চরণ একটু রাগত কণ্ঠে বলে, ‘দ্যাশ তো ঠিক অইব। এখন এই মানুষগুলোর কী অইব ভাইবা দ্যাহেন।’

একবার আড়চোখে নেতাই চরণের দিকে চেয়ে গলার স্বর চড়ে গেল চেয়ারম্যান সাহেবের— ‘কী আর অইব, যার যার বাড়ি ফিরা যাইব।’

এই সময় হুমায়ুন শিকদার দবির উদ্দিনকে কী যেন

বলতে যাচ্ছিল।

তখন স্বপন চিৎকার করে উঠল, ‘ওই তো আরেক দল আসছে।’

চেয়ারম্যান সাব কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আবার ঘোড়ায় চড়ে বাড়ির দিকে ফিরে যেতে লাগল। মানু মুন্সী বলল, ‘শালা কুত্তার বাচ্চা।’ হাতের রগগুলো ফুলে উঠল মানুষ মুন্সীর। আরো দুটো দিন কেটে গেল। সোনানগর বাজার এখন নীরব। ঢাকা থেকে আর লোকজন আসছে না। শুধু এ গ্রাম ও গ্রাম থেকে লোক এসে বিকালবেলায় মানু মুন্সীর দোকান আড্ডায় মুখর করে তোলে। সবার মুখে এক কথা, ‘এখন কী অইব?’

সাজাহান ভাইয়ের দেখা নেই। মানু মুন্সীর চার দোকানের আড্ডাবাজ ছেলে-ছোকরারা সাজাহান ভাইয়ের দিকে চেয়ে আছে। টাঙ্গাইল থেকে কী সংবাদ নিয়ে আসে সাজাহান ভাই। উৎকণ্ঠায় ফুসফুস করে সিগারেট টানে ওরা। ঘনঘন চা খায়। মজিদ মিয়া বলে, ‘যুদ্ধ ছাড়া বাঁচন যাইব না।’ ঠিক এই সময় দবির উদ্দিন হস্তদন্ত হয়ে মানু মুন্সীর চার দোকানে ঢোকে।

‘ও ভাতিজারা! সংবাদ পাইছ কিছ? পাকবাহিনী টাঙ্গাইল আইয়া পড়ল বইল্যা। মির্জাপুরের কাছে ছাত্র আর পুলিশ রাইফেল দিয়া বাধা দিছিল বইল্যা বাড়ির সব জ্বালাইয়া দিছে।’

এতক্ষণ যারা কথার ভুবড়ি ছুটিয়ে মানু মুন্সীর চার দোকান গরম রেখেছিল তারা যেন হঠাৎ করে ঠাণ্ডায় জমে গেল। নীরবে যার যার নখ খুঁটে খুঁটে অস্তিত্ব নিয়ে ভাবছে। কৌস কৌস নিঃশ্বাস পতনের শব্দ আসছে।

‘আমরাও যুদ্ধ করমু, পাইছে কী ওরা।’ মানু মুন্সী ক্যাশ বাক্সের ওপর হাত চাপড়িয়ে বলে উঠল। অনেকক্ষণ পর এদের মাঝে যেন প্রাণ ফিরে আসে। হঠাৎ করে ফুঁসে উঠল হুমায়ুন শিকদার, ‘নেতা শাল-রা কেউ আমাগো হাতে অস্ত্র তুলিয়া দিক, আমরাও কমে ছাড়মু না।’

‘সাজাহান ভাই ফিরা আইলে সব ঠিক অইব। চিত্তা করস ক্যান? আমরা ইন্ডিয়ায় যামু। বডার খুইল্যা দিছে। ইন্ডিয়ায় খবর হুন্ছ?’ নেতাই চরণ দৃষ্ট কণ্ঠে বলে বাইরের দিকে তাকায়।

মাগরিবের আজান পড়ছে। মানু মুন্সী নামাজের জন্য মসজিদের দিকে ছুটে যাওয়ার আগে বলে, ‘অয় দোকানে বাতি দে নামাজটা পইড়া আই।’ বলতে বলতে বেরিয়ে যায় মানু মুন্সী। চার দোকানের আড্ডাবাজ ছেলে-ছোকরারা আস্তে আস্তে বাড়ির দিকে রওনা হয়।

বাঁশঝাড় ভেদ করে ম্লান চাঁদ ওঠে। কথা বলতে বলতে ওরা পথ হাঁটে।

চার.

আরো দুই দিন পর বাচ্চু ফিরে আসে। শীর্ণ দেহ, অবিন্যস্ত চুল, কোটরাগত চোখ, ক্লান্ত পা। বাচ্চুকে জড়িয়ে ধরে বড় ফুফু কাঁদতে লাগল। বড় ঘরের বারান্দায় ছোটখাটো ভিড় জমে গেল। খবর পেয়ে এ বাড়ি ও বাড়ি থেকে লোকজন ছুটে এলো। জামিল সাহেব বাচ্চুর মুখের দিকে তাকিয়ে কাঁদবেন কি হাসবেন, ভেবে পেলেন না। থ মেরে দাঁড়িয়ে থাকলেন কতক্ষণ। গায়ের তেলচিটচিটে শার্ট খুলতে খুলতে বাচ্চু বলল, ‘আমারে একটু ঠাণ্ডা পানি দাও তো, মা।’

বড় ফুফু এখনো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। বাচ্চুর কোনো কথাই তার কানে গেল না। জামিল সাহেব ব্যস্ত কণ্ঠে মিতুলকে ডাকল। মিতুল ততক্ষণ পানির গেলাস এগিয়ে ধরেছে বাচ্চুর দিকে। উঠোনের ছোটখাটো ভিড় ঠেলে করিম সাহেব বারান্দায় উঠে এলেন।

‘ভিড় ছেড়ে দিন আপনারা, ঠাণ্ডা বাতাস আসতে দিন।’ করিম সাহেবের কণ্ঠে সহানুভূতির সুর। বাচ্চু চৌকির ওপর বসে প্রতীক্ষিত অনেক মুখ দেখতে পেল। নিম্নালিত চোখ দুটো অবাক তাকিয়ে রইল কতক্ষণ। ক্লান্তিতে নেড়িয়ে আসছে শরীর। কথা বলার ক্ষমতা হারিয়েছে অনেক আগে।

‘আমি ঘুমবো মা!’, শিশুর মতোন শোনাল বাচ্চুর কণ্ঠ।

‘অবেলায় ঘুমাতে নেই বাবা। গোসল করে, খেয়ে-দেয়ে ঘুমাবি।’ বড় ফুফু বাচ্চুর মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বলল। উঠান থেকে এক এক করে মানুষ চলে যাচ্ছে। মিতুল, শোভন, তনু জামিল সাহেব, করিম সাহেব, রাহেলা বেগম অবাক দাঁড়িয়ে ছিল। সবার মনের মধ্যে অনেক প্রশ্ন। এতদিন কোথায় ছিল বাচ্চু?

এই সময় সোনানগর বাজারের মসজিদে আজান পড়ল। ঘুমের মধ্যে কাঁপুনি দিয়ে জ্বর এলো বাচ্চুর। রাহেলা বেগম, বড় ফুফু, মিতুল সারা রাত মাথায় পানি ঢালল। জ্বরের বিকারে আবোল-তাবোল বকছে বাচ্চু। ও ঘরে অঘোরে ঘুমাচ্ছেন জামিল সাহেব। কেউ তাকে ডাকল না। একদিন ঘুমায়নি বেচারা। সারা রাত পায়চারি করে কাটিয়ে দিয়েছে। বড় ফুফুর চোখ দুটো নেতিয়ে আসছে দেখে মিতুল বলল, ‘বড় ফুফু আপনি ঘুমাতে যান, আমরা তো আছি, বাচ্চু ভাইয়ের জ্বর অনেক কমে গেছে। আমি বরং জেগে থাকি।’ রাহেলা বেগম বলল, ‘তুই ঘুমাতে যা মিতুল।’ রাহেলা বেগম আর বড় ফুফু সারা রাত বাচ্চুর শিয়রে নির্ধুম কাটিয়ে দিল। শেষ রাতের দিকে রাহেলা বেগম, বড় ফুফু যখন বিছানা নিলেন তখন মিতুলকে জাগিয়ে দিলেন বাচ্চুর শিয়রে থাকার জন্য। মিতুল যখন ঘুম জড়ানো চোখে বাচ্চুর কাছে এসে বসল তখন বাইরে একবার মোরগ ডেকে ওঠে। বাচ্চু তখনো গভীর ঘুমে। মাথায় হাত বোলাতে থাকে মিতুল।

বাইরে আজান পড়ছে। এইমাত্র ঘুম ভাঙল বাচ্চুর।

‘বাচ্চু ভাই, এখন আপনার কেমন লাগছে?’

‘ভালো। তুমি জেগে আছ মিতুল? মা কোথায়?’

ক্লান্তিতে চোখ বুজে পাশ ফেরে বাচ্চু।

‘এইমাত্র বিছানায় গেল বড় ফুফু আর আম্মা।’

‘তোমরা কবে এসেছ মিতুল?’

‘দুই দিন আগে। আপনার জন্য দুশ্চিন্তায় ছিলাম।

রাত্তায় যা কষ্ট করেছি বাচ্চু ভাই। ও মাগো! মনে হলে এখনো দম আটকে আসে।’

বাচ্চু তখন তন্দ্রায় টলে যাচ্ছে। মিতুলের কথা ওর কানে পৌঁছল না। রুমজুড়ে আবার নিস্তর্রতা নেমে আসে। হ্যারিকেনের আলো নিভিয়ে দেয় মিতুল। বাইরে ফরসা হয়ে গেছে। আর কতক্ষণ পর সূর্য উঠবে।

অনেক বেলা করে ঘুম ভাঙল বাচ্চুর। তার একটু পর ঘুম থেকে উঠে বড় ফুফু মিতুলকে বাচ্চুর শিয়রে বসে থাকতে দেখল।

‘যাও মা, তুমি অনেক কষ্ট করলে।’

‘কী যে বলেন ফুফু’, অভিমানী কণ্ঠে মিতুল বলে।

অনেক দিন পর এই বাড়িতে যেন আনন্দ ফিরে এসেছে। জামিল সাহেবের উচ্চকণ্ঠ শোনা যাচ্ছে স্বভাবসিদ্ধভাবে। বড় ফুফুর ব্যস্ততার অন্ত নেই।

‘এই মিতুল, বাচ্চুকে এই দুধটুকু খাইয়ে দে।’ বড় ফুফু চিৎকার করে বলে ওঠে।

মিতুল দুধ নিয়ে বাচ্চুকে ডাক দেয়, ‘এই বাচ্চু ভাই, দুধটুকু খেয়ে নিন।’

বাচ্চুর চোখে তখনো দৃষ্ণপ্লের ঘোর। চোখ দুটোর দিকে তাকালেই মনে হয় গভীর কোনো চিন্তায় আচ্ছন্ন।

‘তুমি খুব কষ্ট করছ, মিতুল।’

‘আপনি আমাদের বাসায় যান না কেন? আপনি যে কী, বাচ্চু ভাই!’

‘সময় পাই না। রাজনীতি নিয়ে এত ব্যস্ত ছিলাম যে, অনেক দিন তোমাদের খোঁজখবর নিতে পারিনি।’

‘আপনার প্রতি আমার অনেক রাগ জমে আছে, বাচ্চু ভাই।’

‘তাই!’

এবার নিস্তর্রতায় ডুবে যায় বাচ্চু। আড়চোখে মিতুলের দিকে তাকিয়ে নখ খুঁটে খুঁটে ভাবতে থাকে।

‘এই বাচ্চু ভাই, আবার কী হলো?’

‘না কিছু না। তুমি যাও মিতুল। আমি একা থাকব।’

মিতুল রুম থেকে বেরিয়ে যায়।

বাচ্চু এখন অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠেছে। ঢাকার যে বর্ণনা করল তাতে যুদ্ধ শুরুর হয়ে যাওয়ার স্পষ্ট আভাস পাওয়া যাচ্ছে। ১২টার দিকে সামরিক কনভয়গুলো দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের হল সব ছেয়ে ফেলা হয়। রুম তল্লাশি করে যাকে পায় তাকেই নির্মমভাবে হত্যা করে। ইকবাল হলের দোতলার করিডর থেকে লাফিয়ে পড়ে একটা ড্রেনের ভেতর দুই দিন লুকিয়ে ছিল, তারপর রাতের অন্ধকারে ঢাকা ত্যাগ করেছে। করণ বর্ণনা দিতে দিতে বাচ্চুর চোখ সজল হয়ে ওঠে।

সন্ধ্যার দিকে ছাত্রনেতাদের সঙ্গে শেখ মুজিবের কথা হয়েছে।

শেখ সাহেব বলেছেন, ‘আলোচনা চলছে। কী হবে এখনো বলা যাচ্ছে না।’ তার মধ্যে এই কাণ্ড করে বসল ইয়াহিয়া।

বাইরে থেকে শোভন নৌড়ে এলো।

‘আবু ও আবু, শুনছ কিছ? টিক্কা খান পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হয়েছে।

সে পূর্ব পাকিস্তানের মাটি চেয়েছে, মানুষ চায়নি।’

হঠাৎ করে সবার মুখ আষাঢ়ের কালো মেঘের ছায়ায় ভরে যায়।

রাহেলা বেগম কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে বলল, ‘ওগো, কী যে হয়? আমরা এখন কোথায় যাব!’

ধমকে উঠলেন করিম সাহেব, ‘চুপ কর তো, সুস্থভাবে ভাবতে দাও। কী ঘ্যানর ঘ্যানর আরম্ভ করলে!’

বড় ফুফু, জামিল সাহেব ঘনঘন দীর্ঘশ্বাস ফেলতে লাগলেন।

বাচ্চু দৃষ্ট স্বরে বলে ওঠে, ‘যুদ্ধ ছাড়া বাঁচা যাবে না।’

বড় ফুফু আড়চোখে বাচ্চুর দিকে তাকাল।

বাচ্চু মিতুলকে বলল, ‘অয় মিতুল, রেডিও ধরে রেখো। কখন কী বলে, কে জানে।’ এই সময় পাশের বাড়ির রঞ্জু হস্তদন্ত হয়ে ছুটে এলো।

‘অ বাচ্চু ভাই, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র খুলেছে। আমরা শুনলাম। আমাদের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়ার আহ্বান জানানোছে। আবদুল জব্বারের গান বাজিয়ে শোনানো হলো, ‘একটি মজিবরের থেকে লক্ষ

মজিবরের...।’ রঞ্জুর কণ্ঠ বেয়ে এক ঝলক আবেগ বারে পড়ে। বাচ্চুর তখন মনে হলো শেখ মুজিবের ৭ মার্চের দৃষ্ট আত্মনাম।

পাঁচ

সোনানগর বাজার এখন নীরব। মানুষ মুন্সীর চায়ের দোকানে আড্ডা নেই। চুপচাপ ক্যাশ ব্যাক্সের ওপর মাথা রেখে সারা দিন ঘুমায় মানুষ মুন্সী। কদাচিৎ দু-এক জন কাস্টমার আসে। মানুষ মুন্সী শরীরের আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে এ কথা, সে কথা জিজ্ঞাসা করে। দ্যাশের পরিস্থিতি কী? ব্যবসাপাতি আজকাল নেই। পাঞ্জাবিরা টাঙ্গাইল এসে অসংখ্য লোককে যে ধরে ধরে হত্যা করেছে? বিরামহীন প্রশ্ন মানুষ মুন্সীর। হঠাৎ করে ঘোড়ায় চড়ে চেয়ারম্যান সাব সোনানগর বাজারে এলেন। মানুষ মুন্সীর দোকানের সামনে এসে ঘোড়া থেকে নামেন চেয়ারম্যান সাব। ‘অয় মুন্সী, তোমার দোকানের যে লালবাতি জ্বইল্লা গেছে। তোমার ছেলে-ছোঁকরা কই? কইছিলাম না সব ঠিক অইয়া যাইব? এখন পাকবাহিনী গেরামে গেরামে আইব, তখন কই যাইবা? কইলাম ভালো অইয়া যাও।’

আবার ঘোড়ায় চড়ে ফিরে গেলেন চেয়ারম্যান সাব। আতঙ্কে মানুষ মুন্সীর বুক কেঁপে ওঠে। অজানা আশঙ্কায় ভয় করতে থাকে তার। চেয়ারম্যান তাকে ভালো নজরে দেখে না। এটা মনে মনে স্থির হয়ে গেছে মানুষ মুন্সীর কাছে। ভালো লাগে না তার। খাঁখাঁ সোনানগর বাজারে তাকিয়ে মানুষ মুন্সীর চোখ সজল হয়ে ওঠে। অনেক কিছু ভাবে সে। সোনানগরে অধিকাংশ জওয়ান ছেলে-ছোঁকরা গেল কোথায় হঠাৎ করে? ‘যে জাহান্নামে যাবি যা, মানুষ মুন্সীরে তো খবর দেওন নাগে। আমি কি চেয়ারম্যান সাব যে, তাগোরে খারাবি চাই।’

আত্মগত উচ্চারণ করে মানুষ মুন্সী। বিরান সোনানগর বাজার আবার ভরাট হবে। সোনার বাংলা পতাকা হাতে নিয়ে মানুষ আসবে। আবার সিরাজ বয়াতি-কোরবান ফকিরের গান হবে। এই দোকানের আড্ডাবাজ ছেলে-ছোঁকরাদের গেরামে অনেক দোষ আছে। বেকার সবাই। বাড়িতে ফেরে আর এই দোকানে আড্ডা মারে। তবুও কোনো খারাপ কিছু আজ পর্যন্ত মানুষ মুন্সীর চোখে পড়েনি। বরং কারো

একটু অসুবিধা হলে তাকে উদ্ধার করার জন্য বাঁপিয়ে পড়ে। নানাবিধ কারণে কেউ কেউ বলে, ‘মানুষ মুন্সী যেমনে এখন ভালো মানুষ সাজছে, আর তার দোকানে জুটছে কয়টা!’

মানুষ মুন্সী হাসে। জবাব দিতে ইচ্ছা করে না। এই জীবনে তো আর কম দেখল না আজ যারা মাতব্বর সেজে গেরামে মাতাব্বরির করছে তাদের নির্মম, জঘন্য চেহারা মানুষ মুন্সীর মনে আছে।

চায়ের দোকানদারি করতে ইচ্ছা করল না তার। দোকান বন্ধ করে বাড়ির দিকে পা বাড়াল। একটু একটু করে ভেতরটা কাঁপছে। নিজেকে খুব দুর্বল মনে হতে থাকে তার। দুই ছেলে, এক মেয়ে আর স্ত্রী— এই নিয়ে মানুষ মুন্সীর সংসার। ছেলে দুটো হাল-গেরস্থি করে। মেয়েটির বিয়ে হয়ে গেছে বছর তিনেক আগে। গেল বছর নাতির মুখ দেখেছে মানুষ মুন্সী। বড় ছেলের বিয়ের কথাবার্তা চলছে।

এই সময় কী কাণ্ড ঘটে গেল দেশে। এখন কিছুই ভাবতে পারছে না মানুষ মুন্সী।

বাড়ি ফিরতে ফিরতে এক ঘড়ির থালার মতোন চাঁদ উঠে এলো বাঁশঝাড়ের ফাঁক দিয়ে। খাওয়া-দাওয়া শেষে মানুষ মুন্সী বারান্দায় বসে হুঁকায় তামাক খেল পরপর তিন ছিলুম। আকাশ-পাতাল ভাবল অনেক কিছু। কখনো নিজের মধ্যে আনন্দের বান বয়ে যায়, আবার কখনো বুক ভেঙে কান্না আসতে থাকে। যখন বিছানায় শুতে গেল তখন চাঁদ অনেক ওপরে উঠে গেছে। বিছানায় শুয়ে ঘুম এলো না অনেকক্ষণ। একসময় সব উৎকণ্ঠা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে তন্দ্রায় ডুবে যেতে লাগল। ঠিক সময় ডাকটা শুনতে পেল সে। প্রথমে শরীর টানটান করল, তারপর জবাব দেয়, ‘কেডারে?’

‘আমি মজিদ, চাচা। দরজা খোলেন, কতা আছে।’

বিস্ময়ের ঘোরে দরজা খুলে দিল মানুষ মুন্সী। ‘আরে একি!’ বুক কেঁপে উঠল মানুষ মুন্সীর। হাতে স্টেনগান নিয়ে মজিদ দাঁড়িয়ে আছে। মজিদকে চেনা যায় না। খোঁচা খোঁচা দাড়ি গজিয়েছে। চুল বড় হয়ে গেছে।

‘ও মজিদ, ও ঘরে যাও। বউ, পোলাপান জাইগা গেলে, হাউকাউ অইব।’ মজিদ উঠোন পেরিয়ে ও ঘরের বারান্দায় এসে দাঁড়াল। মানুষ মুন্সী পিদিম হাতে এগিয়ে এসে ও ঘরের চৌকির ওপর মজিদের

মুখোমুখি বসল। এখনো বিশ্বাস করতে পারছে না মানুষ মুন্সী— এ কোন মজিদ?

‘বুঝলাইন চাচা? যুদ্ধ করমু পাঞ্জাবিগো নাগে।

দ্যাশটারে শেষ কইরা ফেলাইতেছে শালারা। ইন্ডিয়া গেছিলাম, এক মাস ট্রেনিং দিয়া, অস্ত্র দিয়া ছাইড়া দিল আমাগো। আমরা সবাই আইয়া গেছি। ময়মনসিংহ বডারে যুদ্ধ অইছে, আর ভয় পাই না চাচা, দ্যাশের নিগা পরানডারে দিয়া দিমু।’ অবাক তাকিয়ে থাকে মানুষ মুন্সী। আনন্দে-দুঃখে চোখে জল এসে যায়। কথা বলতে পারে না।

‘কিছু যে কও না চাচা’, মজিদ স্টেনগান চৌকির ওপর রাখতে রাখতে বলে।

‘তোরা কই গেলি আমারে জানাইলি না ক্যান?’ মানুষ মুন্সীর কণ্ঠে অভিমান ভরে ওঠে।

‘দেবার সময় আছিলি না। সাজাহান ভাই, নেতাই চরণ স্বপন, হুমায়ুন শিকদার আপনার সঙ্গে দেহা করব। খবর পাইলাম বাজারে নাহি সৈন্য আইব।

আমরা তো এখনে থাকবার পারি না। খোঁজখবর রাইখেন। নইলে আমরা বিপদে পইড়া যামু।’

‘আরো মিয়া হেডা কওন লাগব নাহি। খাইছ কিছু?’

‘খাইছি। যাইগা চাচা। ছিলিমপুর অপারেশনে যামু।’

মজিদ স্টেনগান হাতে তুলে নেয়।

ঠিক তখন মানুষ মুন্সীর চেয়ারম্যান সাবের কথা মনে পড়ে। একবার মজিদকে বলতে ইচ্ছা করে। দ্রুত ভাবে মানুষ মুন্সী-না থাইকা দ্যাশ স্বাধীন অইলে তারে কতা ফেরত দেওন যাইব।’

বাঁশঝাড়ের আড়ালে মজিদ হারিয়ে যায়। মানুষ মুন্সী কতক্ষণ বিমূঢ় দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর অজান্তেই তার বুক আনন্দে ভরে ওঠে। বাতাবি লেবুর গন্ধ রাতের বাতাসে ভরপুর। মিষ্টি একটি আমেজে পেয়ে বসে মানুষ মুন্সীকে। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে চাঁদ দেখে। কিছু শীত পড়েছে। চাঁদ দেখতে দেখতে কত কী ভাবে মানুষ মুন্সী। হঠাৎ তীব্র স্বরে ভক্ষক ডেকে ওঠে গাব গাছের আড়াল থেকে। কেঁপে ওঠে মানুষ মুন্সী। দ্রুত বড় ঘরের ভেতরে ঢুকে পড়ে। মানুষ মুন্সীর স্ত্রী বলে, ‘কই গেছিলো?’

‘বাইরে দাঁড়াইয়া চান দেখলাম।’ মৃদু কণ্ঠ মানুষ মুন্সীর। ‘হঠাৎ আবার এই বয়সে চান দেখন কেন গো?’ মানুষ মুন্সী কথা বলে না। বাইরে নিরুপ পৃথিবীর বিরবির শব্দ আসছে। একটানা। এই শব্দ কোথায়— বাইরে?



না ওর বুকের ভেতর?

হয়।

‘এই মিতুল, রেডিওটা দে তো?’ বড় ঘর থেকে বাচ্চু চিংকার করে বলছে। ঘুটঘুটে অন্ধকার নিয়ে রাত নামছে। ছোট ঘরের বারান্দায় বসে বড় ফুফু, জামিল সাহেব, করিম সাহেব, শোভন, তনু জটলা করছে। মিতুল রেডিও নিয়ে এ ঘরে এলো। ওর চোখে-মুখে জিজ্ঞাসা।

‘স্বাধীন বাংলা বেতারের সময় হয়ে এলো তোদের কথাবার্তায় কখন যে সংবাদ চলে যাবে। তুই অমন হয়ে কী দেখছিস?’ বাচ্চু হাত ইশারা করে মিতুলের চোখের ভাষা বুঝতে চেষ্টা করে।

‘তুমি যে কী বাচ্চু ভাই! তোমার সব কিছুতেই হৈয়ালি।’ মিতুল রাগত কণ্ঠে বলে।

‘ক্যান, আমি একটি গৃহপালিত জন্তু?’ হাসতে থাকে বাচ্চু।

‘তুই কিছু বলবি, মিতুল?’

‘বলব।’

বাচ্চু দু-এক বার রেডিওর নব ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে টেবিলের ওপর রেখে দেয়। মিতুলের মুখের দিকে তাকায়।

‘তুমি খুব পাগলাটে, বাচ্চু ভাই!’

‘মা তাই বলে।’

‘আমিও বলি।’

অন্ধকার ঘরে পিদিমের আলোয় দুজনের চোখ চিকচিক করে। মিতুল একটা চেয়ার টেনে বসে। হাই তুলে হাসতে হাসতে বলে, ‘তোমাকে একটা বিয়ে করিয়ে দিলে তোমার পাগলামি ঠিক হয়ে যাবে।’

‘তুই গেলি মিতুল’, ঈষৎ হেসে বাচ্চু বলে।

‘আচ্ছা বাচ্চু ভাই, তোমার কি মনে হয় দেশ স্বাধীন হবে?’ মিতুল কথার মোড় ঘোরাতে চেষ্টা করে।

‘খুব শিগগির হয়তো নয় তবে হবে’, বাচ্চু বলে।

‘আমি আইএ পাস করে পলিটিক্যাল সায়েন্স নিয়ে ভার্টিসিটিতে ভর্তি হব। পলিটিক্স করব।’

‘আমার এক বান্ধবী আছে। ও ৭ মার্চে মিছিলের আগে আগে ব্যানার নিয়ে রেসকোর্সে গিয়েছিল। দুর্দান্ত মেয়ে। ও যে এখন কোথায়!’

হঠাৎ বাচ্চু আনমনা হয়ে যায়। নানান আশঙ্কায় ওর বুক কাঁপে। ২৫ মার্চে যদি ও হলে থেকে থাকে? তাহলে?

‘এই বাচ্চু ভাই, তুমি কি কাউকে ভালোবাসো?’, মিতুল হাসতে হাসতে প্রশ্ন করে।

বাচ্চু চমকে উঠে মিতুলের দিকে তাকায়। মিতুল আজ কাপড় পরেছে। মাতৃমুখ চেহারা ফুটে উঠেছে ওর অবয়বজুড়ে।

‘তোমার কী মনে হয়?’

‘তোমাকে কোনো মেয়ে পাত্তাই দেয় না।’ খিলখিল করে হেসে ওঠে মিতুল।

‘ও মা দেখ মিতুল কী বলছে।’

বাচ্চু চিংকার করে বড় ফুফুকে ডাকে।

‘ওই বাচ্চু ভাই, ভালো হবে না বলছি, আমি কাঁদব কিন্তু।’

‘মিতুল মণি তোর বর পেঁচামুখী হবে দেখিস।’

‘হলে হবে। তোমার বউ পেত্নী হবে।’

মিতুলের চেহারায়ে ছেলোমাসুখী ভঙ্গি ফুটে ওঠে। বাচ্চুর ভালো লাগতে থাকে। মিতুলের আন্তরিকতায় মুগ্ধ হয়। এ রকম আন্তরিকতার স্পর্শ যেন অনেককাল

পায়নি। বুকের ভেতর তোলপাড় করা শব্দ শোনে। নিঝুম রুমের ভেতর দুটো মানব-মানবী পুণ্ডলিকার মতো নিষ্পন্দ।

বাচ্চু রেডিওর নব ঘুরিয়ে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র ধরে। এতক্ষণে সংবাদ চলে গেছে। এম আর আখতার মুকুলের চরমপত্র হচ্ছে, ‘আমাগো বক্সিবাজারের ছক্কু মিয়া গুয়ামুড়ি হাসি দিয়া..।’ হেসে উঠল ওরা দুজন। মিতুল ডাকল, ‘ও শোভন, তনু মণি শুনো যাও। চরমপত্র হচ্ছে।’

আবার আধঘণ্টা পর খবর। এখন আর রেডিও রেখে লাভ নেই।

‘তুই রেডিও নিয়ে যা মিতুল। তোরা শোন। আমার ভালো লাগছে না।’

‘কী হলো, তোমার শরীর খারাপ লাগছে?’ মিতুল দ্রুত বলে।

‘তুই যা তো মিতুল।’

মিতুল রেডিও নিয়ে রুম থেকে বেরিয়ে যায়।

অনেকক্ষণ পিদিমের দিকে তাকিয়ে থাকে বাচ্চু। ওর ভাবনাগো না। অনন্ত শূন্যতা অনুভব করে রুমের ভেতরে।

গত দুই দিন থেকে মুক্তিবাহিনীর সংবাদ আসছে।

মজুমপুর থানা লুট করে নিয়ে গেছে মুক্তিবাহিনী।

ভারত থেকে ট্রেনিং নিয়ে দলে দলে মুক্তিবাহিনী আসছে। ক্রমাগত বাচ্চুর উৎকণ্ঠা বাড়ছে। এ দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা যুদ্ধ করেছে দস্যু সেনাদের বিরুদ্ধে। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে মুক্তিবাহিনীর যুদ্ধজয়ের সংবাদ প্রচার হচ্ছে।

শোভন দৌড়ে এলো এ ঘরে।

‘ও বাচ্চু ভাই, সোনানগর বাজারে মুক্তিবাহিনী এসেছে। আমরা দেখে এলাম।’

‘তুই মুক্তিবাহিনীতে যাবি শোভন?’ বাচ্চু ম্লান হেসে বলে।

‘তুমি যাবে না বাচ্চু ভাই?’

‘যাব।’

‘অনেক কষ্ট শোভন তা জানিস?’

‘জানি! দেশের জন্য কত লোক প্রাণ দিল তাই না বাচ্চু ভাই?’

শোভনের চোখ-মুখ মমতাময় মনে হয়। আবার শূন্যতা বুকে বাঁধতে শুরু করছে। ঈষৎ অন্ধকার নামছে। একটু পর বড় ফুফু পিদিম নিয়ে ঘরে আসবে।

নাজিম হিকমতের কবিতা বাচ্চুর প্রিয়। সময়-অসময়ে নাজিমের কবিতা পড়তে ভালো লাগে বাচ্চুর। স্বগত কণ্ঠে বলে, ‘যে ফুল আজও ফোটেনি...’।

‘এই মিতুল, এই ঘরে আয় তো?’ একটু পর মিতুলকে ডাকল বাচ্চু।

মিতুল পিদিম নিয়ে ঘরে ঢুকল। আহা, কী স্নিগ্ধ মিতুল। যেন সমস্ত নারী রহস্য ওর চোখে।

‘বাচ্চু ভাই ডাকলে?’

‘আয়, বস।’ খাটের এক কোণ দেখিয়ে বলল।

‘সন্ধ্যাবেলা বিছানায় শুয়ে থাকতে নেই।’

‘মন ভালো নেই আমার।’

‘কী হলো?’

‘তোকে একটা কথা বলব, মিতুল।’

মিতুল ইতিউতি তাকায়।

‘আমি যুদ্ধে যাব মিতুল।’ সরাসরি বলে বাচ্চু। মিতুল

একটু চমকে যায়।

তারপর ঈষৎ বাঁকা হেসে বলে, ‘যাবে। আমাকে জিজ্ঞাসা করতে হবে কেন?’

‘মা জানলে যেতে দেবে না।’

‘তাহলে আমাকে বললে কেন? আমি যদি সবাইকে বলে দিই?’

বাচ্চু হঠাৎ মিতুলের ডান হাত ধরে। খুঁটে খুঁটে হাতের রেখা দেখে।

‘তুই কাউকে বলবি না, এই বিশ্বাস।’

‘বলব।’

‘বলবি না। আমার বিশ্বাস।’

‘যুদ্ধ থেকে কবে ফিরে আসবে?’ কাতর শোনায় মিতুলের কণ্ঠ।

‘যেদিন যুদ্ধ শেষ হবে।’ খুব স্বাভাবিক কণ্ঠ বাচ্চুর।

‘আমি যদি তোমাকে যেতে না দিই!’

‘তুই খুব লক্ষ্মী মেয়ে মিতুল, হাতের রেখা বলে।’

‘তোমার কী মনে হয়?’

‘তোর স্বামী খুব ভালোবাসবে তোকে।’

‘এই বাচ্চু ভাই, ভালো হবে না কিন্তু!’

হা হা করে হাসে। মার গলা শোনা যায় বাইরে।

‘খেতে আয়, বাচ্চু।’

রুম থেকে বের হওয়ার আগে মিতুল বাচ্চুর চোখে তাকায়। যে চোখের ভাষা বাচ্চুর বোধগম্য নয়। তবু কোথায় যেন জলপতনের শব্দ শোনে।

অস্পষ্ট স্বরে মিতুল বলে, ‘আমি তোমার জন্য কাঁদব, বাচ্চু ভাই।’

‘আমিও।’

বাচ্চুর কণ্ঠস্বর শোনার আগেই মিতুল দরজা পেরিয়ে যায়।

সাত.

বাজার জ্বলছে। রাজাকার ক্যাম্প হয়েছিল তিন দিন আগে। তারপর এই ঘটনা। দূর থেকে আগুনের জিহ্বা গাছ-গাছালি ছাপিয়ে দেখা যায়। রাজাকার ক্যাম্প হওয়ার পর সোনানগর বাজারের ধারে-কাছেও যায়নি মানুষ মুসী। চেয়ারম্যান সাহেবের মতিগতি ভালো না। কখন আবার রাজাকারদের নিয়ে ধরে নিয়ে মেরে ফেলে কে জানে।

গতকাল শেষ রাতের দিকে মুক্তিবাহিনী রাজাকার ক্যাম্প আক্রমণ করেছিল। মিলিটারি আসে আজ ভোরে। তারপর থেকে গ্রাম-বাজার জ্বলছে। তবে ভাগ্য ভালো যে মিলিটারিরা এখনো গ্রামের মা-বোনদের ওপর কোনো অত্যাচার করেনি। আর করবেই কী করে। গ্রামে কি আর মেয়ে মানুষ আছে। মিলিটারি আসার সংবাদ পেয়ে সব গ্রাম ছেড়ে কোথায় চলে গেছে।

বাজারের দিকে তাকিয়ে মানুষ মুসীর চোখে জল এসে গেল। ওই তো আবার কুণ্ডলী পাকিয়ে ধোঁয়া উঠছে। ওটা ছফর ব্যাপারীর বড় ঘর। ‘আহা!’ স্বগতোক্তি বেরিয়ে আসে মানুষ মুসীর মুখ দিয়ে। ওর চার দোকান কি পুড়ে গেছে? চোখ দিয়ে টপটপ করে পানি পড়ল কয়েক ফোঁটা। শ্রিয়মাণ ঠায় দাঁড়িয়ে সোনানগর বাজারের দিকে তাকিয়ে থাকল অনেকক্ষণ। রাস্তা দিয়ে ওই তো মিলিটারি এখন কালিকাপুর ক্যাম্পে ফিরে যাচ্ছে। তাহলে সোনানগর বাজারে রাজাকার থাকবে।

‘পোলাপানগুলো গেল কোন হানে?’ মনে মনে ভাবে মানুষ মুসী। আশঙ্কায় বুক দুর্ন্দুর করছে থাকে মানুষ মুসীর। দেখতে দেখতে রাত নেমে এলো। বিষণ্ণ মনে

ঘরে ফিরে বউকে বলল, ‘বাজারে দোহান বুঝি জ্বালাইয়া গেছে। কোনো সংবাদ নিবার পাললাম না।’ বউ বলল, ‘খোদার গজব পড়ব গো ওগো ওপর।’ আরো পরে স্বপনকে কাছে নিয়ে সাজাহান ভাইসহ মুক্তিবাহিনীর ছেলেরা এলো। গোলাগুলির সময় স্বপনের বুকে গুলি লেগেছে। কতক্ষণ পড়েছিল বাজারের দক্ষিণে কালু শেখের বাঁশঝাড়ের আড়ালে। রাত নামলে মুক্তিবাহিনীর ছেলেরা ওকে নিয়ে আসে। সাজাহান ভাই বলল, ‘মানু চাচা, বারী ডাক্তারকে খবর দেন, রক্ত বন্ধ না হলে স্বপন বাঁচবে না।’ বড় ছেলে কাদেরকে পাঠানো হলো ডাক্তারের জন্য। আবার ভয়ও আছে। রাজাকার জনতে পারলে মেরে ফেলবে। ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেবে। সাজাহান ভাইয়ের নেতৃত্বে এ দলটি বেশ বড়। পৃথকভাবে বিভিন্ন ক্যাম্প আক্রমণ করে ব্যতিব্যস্ত রাখছে ওরা। এখন আছে জনা বিশেক। স্বপন আহত। স্বপনের গোঙানি শোনা যাচ্ছে। উঠানের মধ্যে ছোট জটলা। ডাক্তারের প্রতীক্ষায় সবাই কান উৎকীর্ণ করে আছে। মানু মুন্সী ঘুরে ঘুরে দেখছে। বুকে ঈষৎ বেদনা বার বার কষ্ট দিচ্ছে ওকে। স্বপন কি বাঁচবে না? আঃ এসব সোনার টুকরো ছেলে...। আর ভাবতে পারলে না মানু মুন্সী। সাজাহান ভাই ডাক দিল, ‘মানু চাচা দুদিন কিছু খাইনি।’ ‘আরে হ্যাঁ, চিন্তা তোমাগোরে করণ লাগব না। এহনে স্বপনের কী অহিব?’ ডুকরে কেঁদে ফেলল সাজাহান ভাই। ‘এই রকম অনেক স্বপনের রক্ত দিলে দেশ স্বাধীন হবে মানু চাচা।’ সাজাহান ভাইয়ের কণ্ঠ ভরাট। ফুঁপিয়ে কাঁদে মানু মুন্সী। এসব ছেলের জন্য এত স্নেহের বাসা রয়েছে মানু মুন্সীর। আজকে গুলিবদ্ধ স্বপনকে দেখে তা যেন কান্নায় প্রকাশ পেয়ে গেল। তারো একটু পর হাঁপাতে হাঁপাতে বারী ডাক্তার এলো। মুক্তিবাহিনীর ছেলেরা জানে বারী ডাক্তার এদের লোক। ইলেকশনের সময় শেখ মুজিবের পক্ষে খেটেছে সেই যা বিশ্বাস। মাঝরাত অবধি বারী ডাক্তার অনেক চেষ্টা করে রক্ত বন্ধ করতে পারল না স্বপনের। রক্তশূন্য হয়ে খুব অসহায়ভাবে মানু মুন্সীর উঠানে স্বপন মরে গেল। চাপা কান্নায় মাঝরাতের বাতাস বেদনার্ত করে তুলল মানু মুন্সীর বাড়ির আবহাওয়া। ‘সাবধান থাকবেন, মানু চাচা।’ মানু মুন্সীর মনে হলো তার যেন কী নেই।

সোনানগর বাজার এখন রাজাকারদের দখলে। চেয়ারম্যান সাব ঘোড়া হাঁকিয়ে রাজাকারদের সুখ-দুঃখ তদারকি করছে। মুক্তিবাহিনীর ছেলেরা এখন এদিকে নেই। মিলিটারির উৎপাত বেড়েছে। শোনা যাচ্ছে, মুক্তিবাহিনী হঠাৎ হঠাৎ কোনো ক্যাম্প আক্রমণ করে রাতের আধারে হারিয়ে যায়। এখন মুক্তিবাহিনীর সঠিক হদিস কেউ বলতে পারে না। গ্রাম দিয়ে রাজাকার ঘোরে। ইচ্ছা হলে গরু-ছাগল ধরে নিয়ে যায়। লোকমুখে শোনা যাচ্ছে দক্ষিণপাড়ায় মকবুল শেখের মেয়েটাকে ধরে নিয়ে ক্যাম্পে রেখেছিল দুই দিন। মেয়েটিকে ছেড়ে দেয়ার পর আধামরা হয়ে গেছে। কেউ এসব তথ্য ঠিক ঠিক বলতে পারে না। শুধু লোকশ্রুতি। মানু মুন্সীর উৎকণ্ঠা বাড়ে। ক’দিন যাবৎ অবর বৃষ্টি হচ্ছে। চারদিক জলে

সয়লাব, বড় ঘরের কোনায় বসে কাক ভিজছে। এই বৃষ্টিতে কোনো কামকাজ নেই মানু মুন্সীর। বসে থাকলে আরো খারাপ লাগে। নানান রকম চিন্তা মাথায় আসে। দ্যাশ যদি স্বাধীন না হয়! বুকটা হু হু করতে থাকে। বউ খাওয়ার তাগিদ দেয়। কিছু ভালো লাগে না মানু মুন্সীর। বকের ছটফটানি থামে না। উদাসীন দিন সব সময় কষ্ট দিতে থাকে সোনানগর বাজারের প্রাণবন্ত মানুষটিকে।

আট। মাঝে মাঝে খুব মিহিন সুরের কান্নায় এ বাড়ির আকাশ-বাতাস উতলা হয়ে ওঠে। বড় ফুফু কাঁদে। জামিল সাহেব বড় ফুফুকে সন্তুনা দিতে চেষ্টা করে। স্বামীর সোহাগ পেয়ে বড় ফুফু আরো ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদে। বাচ্চু এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার পর হঠাৎ করে পাল্টে যায় সব। জামিল সাহেব আজকাল খুব মনোযোগ দিয়ে স্বাধীন বাংলা বেতার শুনছে। মুক্তিবাহিনীর সংবাদ শোনার জন্য পাড়াময় ঘুরে বেড়াচ্ছে। বাইরে থেকে ফিরে বাড়ির দোরগোড়ায় পা দিয়ে বলল, ‘করিম সাহেব, দ্যাশটা স্বাধীন হবেই। অত্যাচারীর রাজত্ব টিকতে পারে না।’ করিম সাহেবের পরিবার এখনো এ বাড়িতেই আছে। আর যাবেই বা কোথায়? ঢাকা তো এখন জানোয়ারদের আড্ডাখানা। দেশের বাড়ি যাওয়া এখন আর সম্ভব নয়। তার চেয়ে সবাই এখানেই থাকবে। মৃত্যু হলে একসঙ্গেই মরবে। এটা হলো বড় ফুফুর মন্তব্য। দিন দিন করিম সাহেবের চোখে মুখে বিষন্নতার কালিমা পড়ছে। কী যে হয়! কতদিন এখানে এভাবে আটকে থাকতে হবে? সবচেয়ে বেশি চিন্তা মিতুলকে নিয়ে। বিয়েযোগ্য মেয়ে। কারো সঙ্গে আজকাল ভালো করে কথা বলতে পারে না। দুশ্চিন্তায় হাত কাঁপে। নির্লিপ্ত বসে থাকে। মিতুল ভাবে, বাচ্চু ভাই এখন এক বাংকার থেকে আরেক বাংকারে লাফিয়ে পড়ছে শত্রু নিধনের আনন্দে উল্লসিত হয়ে। অবসর মুহুর্তে বাচ্চু ভাই কী ভাবে? বাড়ির কথা মনে কি পড়ে তার? বাচ্চু ভাইয়ের বুকে খুব কষ্ট। এ ধরনের মানুষ তা প্রকাশ করতে পারে না। শোভন পাড়াময় ঘুরে বেড়িয়ে নানান সংবাদ নিয়ে আসে। কামালপুর যুদ্ধে ১০০ জন পাক সেনা মারা গেছে। ক্যাপটেন আইয়ুব নিহত। প্রকাশহীন এক চরম উত্তেজনা শোভনের ভেতর কাজ করতে থাকে। সরল মায়াময় ওর চোখের দিকে তাকালে মনে হয়, স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা ওর চোখের মণিতে পতপত করে উড়ছে। বড় ফুফু আজকাল খুব একটা কাঁদে না। তবুও তার উৎকণ্ঠার কমতি নেই। মাস দেড়েক ধরে বাচ্চুর খোঁজখবর নেই। কোথায় যে আছে ও?

গেরামের মধ্যে শান্তি কমিটি হয়েছে। চেয়ারম্যান সাব ঘুরে ঘুরে জনগণকে পাক বাহিনীর প্রতি আস্থাশীল হওয়ার কথা বলছে। জামিল সাহেবকে শাসিয়ে গেছে

বাচ্চুকে ফিরিয়ে না আনলে বাড়ি জ্বালিয়ে দেয়া হবে। জামিল সাহেব হতভাগ্য পিতৃত্বের হৃদয় নিয়ে চেয়ারম্যান সাবকে বলেছে, ‘আমার কী করার আছে চেয়ারম্যান সাহেব, আজকালকার ছেলে-পেলেরা কি কারো কথা শোনে!’ অবুঝ সন্তান জামিল সাহেবের। চেয়ারম্যান সাব ওসব শুনতে রাজি নয়। সে আরো ভয়ঙ্কর মূর্তি ধরে প্রকাশ করতে থাকে। ‘বাঁশের লাঠি দিয়ে ওনারা দ্যাশ স্বাধীন করব। গোলা ঘরে আনেন, নইলে খারাবি অইব।’ তার পর থেকে এ বাড়ি নিরুন্ন হয়ে গেছে। সব সময় সম্ভ্রান্ত একটা ভাব বিরাজ করছে। সবাই যেন কেমন একাকী। কারো মুখের দিকে তাকানো যায় না। হাত-পা অজান্তে কাঁপে।

একদিন মধ্যরাতে বাচ্চু এ বাড়িতে এসে দাঁড়াল। ট্রেনিং শেষ করে বর্তার পেরিয়ে স্বদেশের মাটিতে পা রাখতেই মায়ের কথা মনে পড়ল ওর। বাড়িটি খুব অচেনা মনে হলো। কোথায় যেন এ বাড়ির ছন্দ কেটে গেছে। কী নিদারুণ বিষন্নতার ছাপ। তারপর বড় ঘরের শেষ জানালাটায় টোকা মেরে মিতুলকে ডাকল, ‘মিতুল! আমি বাচ্চু।’ মিতুল তন্দ্রার মধ্যে থেকে বাচ্চুর কণ্ঠস্বর শুনতে পায়। অজানা আশঙ্কায় বুক কাঁপল ওর। তারপর আস্তে আস্তে জানালা খুলল। মেটে জোছনায় একজন মানুষের ছায়ামূর্তি নজরে এলো। জানালা খুলতে বাচ্চু এগিয়ে এসে বলল, ‘আমি! বাইরে আয়, কথা আছে তোর সঙ্গে।’ জানালা বন্ধ করে পা টিপে টিপে বাইরে এলো মিতুল। উঠান পেরিয়ে এসে বাচ্চুর পাশ ঘেঁষে দাঁড়াল। ‘গতকাল ফিরেছি। মা কেমন আছেন? তোরা সব?’ ‘বড় ফুফুকে ডাকি?’ ‘না, ডাকলে জানাজানি হবে। বরং তুই মাকে বুঝিয়ে বলিস।’ ‘আমরা খুব অশান্তিতে আছি। নানান লোক ভয় দেখায়। তোমার জন্য বড় ফুফু কাঁদে।’ ‘এখন আমি এসেছি। সব দেখব। মাকে চিন্তা করতে মানা করবি।’ ‘তুমি অনেক রোগা হয়ে গেছ, বাচ্চু ভাই?’ বাচ্চুর স্টেন ধরা হাত স্পর্শ করে মিতুল। ‘বন-জঙ্গলে ঘুরতে হয়। তুই কেমন আছিস, মিতুল মণি?’ ‘খুব ভালো! তুমি ভালো থাকতে দিয়েছ এই বাড়ির বাসিন্দাগুলোকে?’ অভিমান ঝরে পড়ে মিতুলের কণ্ঠে। ‘মিতুল মণি তো আবার শহরের মানুষ। গেরাম কেমন লাগছে?’ ‘আমি আজীবন গেরামে থাকব। গেরামের প্রেমে পড়েছি।’ ‘আচ্ছা এতক্ষণ পর বুঝলাম।’ ‘বাচ্চু ভাই! তুমি যে কী’ বলে বাচ্চুর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে মিতুল। বাচ্চু এতটা আশা করেনি। হতভম্ব হয়ে যায়। তারপর একজন আদম রমণীর তৃষ্ণা টের পায়। কতক্ষণ কথা বলে না। উভয়ের বুকেতে অনেক কথা জমা হতে থাকে। ‘মিতুল! যুদ্ধ শেষ হলে আমরা আরো কাছে হতে পারতাম।’ বাচ্চুর কণ্ঠে দীর্ঘশ্বাস শোনা যায়। ‘যুদ্ধ কবে শেষ হবে বাচ্চু ভাই?’ মিতুল অবুঝের মতো প্রশ্ন করে। মেটে জোছনায় মিতুলের চোখ আবছা দেখা যায়। বাচ্চু অনেকক্ষণ কথা বলে। আবার অনেকক্ষণ নীরবে

দাঁড়িয়ে থাকে।

একসময় বাচ্চ বলে, 'যুদ্ধ তো একদিন শেষ হবেই মিতুল মণি। আমি যাই।'

'আরো কিছুক্ষণ থাক না? কিছু খাবে না?'

না, ওরা সব অপেক্ষা করছে আমার জন্য। আমি যাই। পরে আবার আসব। মিশে যায় বাচ্চ। মিতুল অনেকক্ষণ মৌন দাঁড়িয়ে থাকে। মিতুল আকাশের দিকে তাকায়। গা ছমছম করে ওঠে। বাচ্চ ভাইয়ের জন্য বুকটা টনটন করে।

নয়.

নারকেলডাঙ্গার প্রচণ্ড যুদ্ধজয়ের সংবাদ নিয়ে ফিরে এলো ওপাড়ার তকী মিয়ার বড় ছেলে আজমত। পাড়ায় পাড়ায় মুক্তিবাহিনীর যুদ্ধজয়ের আনন্দ বয়ে গেল। মানুষজন বলাবলি করে 'পাক বাহিনীর জন্য তিরিশেক মরেছে। নারকেলডাঙ্গায় স্বাধীন বাংলার নিশান উড়ছে।'

মানু মুসী ছয় দিন পর বাড়ি থেকে বের হলো। পাড়ায় বের হয়ে সংবাদটা শোনার পর বুকটায় সুখ অনুভব করল। নিরাপেক্ষ জনের কাছ থেকে সঠিক সংবাদ নেয়ার জন্য বার বার জিজ্ঞাসা করল। ঠিক এই সময় উত্তরপাড়া থেকে সংবাদ নিয়ে এলো ময়েনউদ্দিন।

'সব পালাও মিয়া, মিলিটারি আইতাকে।'

দ্রুতগতিতে সামনের দিকে এগিয়ে গেল মানু মুসী। নিজেকে প্রথম দিকে বোকা মনে হলো। অজান্তে বুকটা দুরন্দুর করছে থাকে। পরক্ষণেই চোখটা জ্বলে উঠল তার। ভাবতে লাগল দ্রুত, ওরা আইলে মানুষ মারব, ঘরবাড়ি জ্বালাইয়া দিব। স্বপনের রক্তাক্ত দেহটা মনে পড়ে ওর।

হুড়হুড় করে মানুষের দল সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ঘরবাড়ি উদ্যম ফেলে যে যেদিকে পালাচ্ছে দৌড়াচ্ছে। কারো দিকে তাকানোর অবসর নেই। ময়েনউদ্দিনের বাঁশঝাড় কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে একটা বাঁশের লাঠি হাতে নেয় মানু মুসী। হাতের পেশিগুলো শক্ত হয়ে ওঠে।

'এই রাস্তা দিয়ে যাবে হারামজাদারা। সব কয়ডারে মাইরা ফ্যালাইমু।' ভাবে মানু মুসী।

বাঁশঝাড়ের আড়াল থেকে উত্তর দিকে তাকায়। খাঁখাঁ করছে। কেউ নেই। নেকাবরের গোয়ালঘরের বেড়া দেখা যায়। অল্পক্ষণ পর কয়েকজন রাজাকার হেঁটে এলো। হাতে থ্রি নট থ্রি রাইফেল। মানু মুসীর মাথায় রক্ত খেলছে এখন। ওই তো বাঁশঝাড় পরিণত

মৌড়ালের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। কিছুই করতে পারল না মানু মুসী। ও মরতে চায় না। এখন ওদের সামনে যাওয়া মানেই নির্ধাত মৃত্যু। হঠাৎ করে যেন মানু মুসীর মাথায় চিত্তার জোয়ার বয়ে যায়। পেছন থেকে ডাকে, 'মানু ভাই নাকি? ওরা গেছে গা।'

চমকে পেছনে তাকাল মানু মুসী।

'কেভা, তবারক নাকি?'

'হ গেছে গা।'

'কোন দিকে গেল?'

'দক্ষিণ মুহী। মিলিটারি না, রাজাকার?'

তবারক হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। মানু মুসী নিজের বাড়ির দিকে হাঁটতে থাকে। বৃকের ভেতর এখন শান্ত। ভাবে, 'মিলিটারি কথা শুইনা বইডা ডরাইবার পারে।'

এর দুই দিন পর মানু মুসীকে ধরে নিয়ে যায়

রাজাকাররা। রাজাকারদের সঙ্গে চেয়ারম্যান সাহেবের বড় ছেলে ছিল, পাড়ার লোক তাই দেখেছে। তার এক

দিন পর মানু মুসীর লাশ ভেসে উঠল বড় পুলটার কাছে। গেরামের লোক শব্দ দেখল মানু মুসীর বেদনার্ত মুখ। যারা মানু মুসীকে জানে চেনে তাদের মাঝে নেমে আসে ভয়ানক শোকের ছায়া। যারা সাজাহান ভাইয়ের কোম্পানিতে আছে তাদের কাছে মানু মুসীর মতো একজন আপনজন হারানোর বেদনা তীব্রতর হয়ে ওঠে। সাজাহান ভাইকে খুব গভীর মনে হলো। একসময় সাজাহান ভাই মৃদুস্বরে বলল, 'মানু চাচার মতো লোককে ওরা মারতে পারে!'

সাজাহান ভাই দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে সোনানগর বাজার আক্রমণ করবে। সব কটা রাজাকার খতম করতে হবে। ভোররাতের দিকে মেশিনগানের গুলির শব্দ বাতাসে ভেসে এলো। এই এলাকার লোকজন রাতের মধ্যেই গ্রাম ছেড়েছে। সারা দিন পর সন্ধ্যার দিকে গোলাগুলি থামে। সোনানগরের দিক থেকে স্লোগান ভেসে এলো, 'জয় বাংলা'।

পরদিন সকালবেলা মানু মুসীর দক্ষ চার দোকানের সামনে স্বাধীন বাংলার পতাকা উড়তে লাগল।

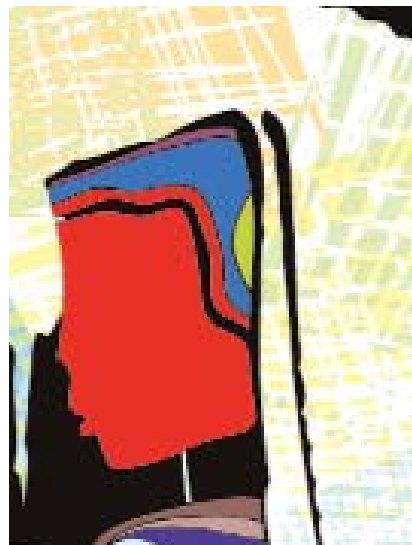
চেয়ারম্যান সাহেবকে ধরা হলো নৌকা করে পালাবার সময়। হুমায়ুন সিকদারের স্টেনের গুলিতে চেয়ারম্যান সাহেবের লাশ নদীর পাড় থেকে জলের দিকে গড়িয়ে পড়ল। সোনানগরের মানুষ আগের মতোই জীবনযাপন করতে লাগল। শব্দ একজন মানুষের অনুপস্থিতি তীব্র বেদনার সঞ্চার করল। মানু মুসীর অতীত নিয়ে দীর্ঘ বক্তৃতা করল সাজাহান ভাই।

সাজাহান ভাই প্রতিনিয়ত আশঙ্কা করছিল পাক বাহিনী কর্তৃক আক্রমণ হওয়ার। পাঁচ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর সাজাহান ভাই সিদ্ধান্ত নিল সামনে এগিয়ে যাওয়ার।

দেখতে দেখতে একদিন ঢাকার পতন ঘটল।

মুক্তিবাহিনী শহরে উঠে এলো। গ্রামগঞ্জ, লোকালয়ে গুলি ফাটছে পটাপটা। বিজয় উল্লাস করছে সবাই।

বাচ্চ যুদ্ধ থেকে ফিরে এলেই ঢাকা ফিরে যাবে মিতুলরা। নয় মাসের দিনগুলো মিতুলের কাছে স্বপ্নের মতো মনে হতে থাকে। এত তাড়াতাড়ি স্বাধীনতা এসে যাবে ওরা কেউ ভাবেনি। হঠাৎ আলোর মধ্যে আনন্দে উদ্বেলিত সারা দেশ। বাচ্চ ফিরে এলো সপ্তাহখানেক পর। বড় ফুফু হাউমাউ করে কাঁদল কতক্ষণ। বাচ্চ



অনেক বদলে গেছে। কেমন রোগাটে হয়েছে। মুখের দিকে তাকানো যায় না।

মিতুল বলল, 'বাচ্চ ভাই! যুদ্ধের পর কেমন লাগছে?' 'ভালো।' ছোট করে উত্তর দেয় বাচ্চ।

এ বাড়ি-ও বাড়ি থেকে মানুষজন এসে যুদ্ধের গল্প শোনে।

অনেক বলাবলি করে, 'আহা, দ্যাশ স্বাধীনতার নিগা পোলাপানগুলো কত কষ্ট করছে।'

মিতুল সুযোগ পেলে বাচ্চ ভাইয়ের কাছে বসে গল্প করে। ওদের গল্পে বেশির ভাগ জুড়ে থাকে যুদ্ধ, পরবর্তী দেশের অবস্থা।

বাচ্চ ভাই বলে, 'বঙ্গবন্ধু ফিরে না এলে কিছুই হবে না।'

বাচ্চ ভাই ফিরে আসার পর বড় ফুফুর ব্যস্ততা বেড়েছে। এর দুই দিন পর করিম সাহেবের পরিবার ঢাকায় চলে গেল। যাওয়ার সময় বড় ফুফু কাঁদল। বাচ্চ বলল, 'মিতুল মণি, তুমি কাঁদছ। এ বাড়ি তোমার ভালো লেগেছিল।'

শোভন বলল, 'বাসায় আসবেন, বাচ্চ ভাই।' বাচ্চের খুব কষ্ট হতে লাগল, প্রকাশ করল না।

সোনানগর থেকে নৌকায় পাঁচ মাইল যেতে হবে, তারপর ঢাকার বাস ধরবে। নৌকায় উঠতেই মিতুল ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে। নৌকায় ওদের উঠিয়ে দিয়ে বাচ্চ সোনানগর বাজারের দিকে হাঁটতে লাগল। শীতের সকাল। ঘাসের ডগায় শিশির। সূর্য অনেক ওপরে উঠতে থাকে। আর জমাট কুয়াশা আঁতে আঁতে কেটে যায়।

উত্তরপাড়া থেকে হট্টগোল ভেসে আসছে। ছেলে-পেলেরা তারস্বরে চিৎকার করছে, 'রাজাকার ধরোছে, রাজাকার ধরোছে।' সমস্ত চিত্তার স্রোত বন্ধ হয়ে গেল বাচ্চের। রাস্তা দিয়ে দলে দলে লোক এগিয়ে যাচ্ছে সোনানগর বাজারের দিকে। স্কুলের মাঠে লোকের জটলা বাড়ছে। বাচ্চ আরো এগিয়ে যেতেই দেখে

সাজাহান ভাই সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে হাত নেড়ে কী যেন বলছে। আর জনতার চিৎকার, 'সাজাহান ভাই জিন্দাবাদ, শেখ মুজিব জিন্দাবাদ। জয় বাংলা।'

সমবেত জনতার কলরব থেমে গেলে বিষয়টা জানতে পারল বাচ্চ। যে পলাতক আসামি ধরা পড়েছে সে

যুদ্ধের সময় নিরীহ মানুষের ওপর অনেক নির্যাতন করেছে। সাজাহান ভাই শক্ত বিচার করবে বলে জনতাকে আশ্বাস দিয়েছে। জনতার চিৎকার এজন্য।

আন্তে আন্তে জনতা স্থান ত্যাগ করল। বাচ্চ সাহাজান ভাইয়ের কাছে এগিয়ে যায়।

সাজাহান ভাই বলে, 'যুদ্ধ তো শেষ হলো এখন

দেশটাকে গড়ে তুলতে হবে।'

বাচ্চ কোনো কথা বলে না।

সোনানগর বাজারের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। নতুন নতুন দোকান উঠছে। মানু মুসীর চার দোকানের

জায়গাটিতে কোনো এক সংঘের ঘর দণ্ডায়মান। মানু মুসীর চার দোকানের আড্ডাবাজ ছেলে-ছোকরারা

নেতার পেছনে জিন্দাবাদ দিয়ে বেড়াচ্ছে। সাজাহান ভাইকে দেখা যায় নেতার গাড়ি থেকে নেমে

দ্রুততার সঙ্গে চলতে। হাতে দামি সিগারেট।

অলৌকিক পরিবর্তন হয়ে গেছে সাহাজান ভাইয়ের চেহারা।

হঠাৎ একদিন সকালবেলা সোনানগর জুড়ে কলরব ওঠে, 'নেতা আসছে, বঙ্গবন্ধু আসছে।'



আখ্যান

পদ্মাবতী আখ্যান

নুসরাত শারমিন তানিয়া

বন্দনা
আইসো পদ্মা মাগো
ভরা আসরে ॥
আসিলে বসিতে গো দিব
আমার মস্তকের উপরে রে
আইসো পদ্মা মাগো... (ধুয়া) ॥
পশ্চিমে বন্দনা করি
ভাল হিমালয় পর্বত রে
ও আইসো পদ্মা মাগো... (ধুয়া) ॥
পূবেতে বন্দনা গো করি
ভাল ভানুর চরণ রে
আইসো পদ্মা মাগো... (ধুয়া) ॥
দক্ষিণে বন্দনা গো করি
ভাল বাইম নদী সাগর রে
আইসো পদ্মা মাগো... (ধুয়া) ॥
সবশেষে বন্দনা গো করি

আমার গুরু চরণ রে
আইসো পদ্মা মাগো... (ধুয়া) ॥

বর্ণনা (কথক)

এই আসরে উজ্জ্বল যত গুণী সাধুজন, সবার চরণে
করি প্রণাম নিবেদন। বেহুলা, লখিন্দর, চাঁদ আর
মনসার গল্প আমরা সবাই জানি এক রকম। মনসা
নারীসাধারণের দেবী। উচ্চ সমাজের চাঁদ
সওদাগরের পূজা বিনা হয় কি তার প্রতিষ্ঠা? আর
ওইদিকে মনসার প্রতি শক্তিমান বিদ্রোহের প্রকাশ
নাগবিদ্রোহী চাঁদ সওদাগরের প্রতিষ্ঠা রঞ্জে রঞ্জে। এ
নিয়মিত তো বিবাদ মানুষ আর দেবতার। ধর্ম
প্রতিষ্ঠার এ কাব্যই বাংলার সর্বপ্রধান লোকপুরাণ।
বাংলার গ্রাম পর্যায়ে প্রথম থেকেই বাত্তুদেবতা,
আরোগ্যের দেবতা অথবা সম্পদের দেবতা বলে

বিভিন্ন নামে রয়েছে মনসার পূজার প্রচলন, যা ৬০০ বছর ধরে কত না আঙ্গিকে, কত না ভঙ্গিতে, কতই না রীতিতে আমরা শুন আসরে আসরে। কিন্তু আজকের এই পালায় তাকে আর দেব-দেবতার ধর্মকাহিনী না মনে করে ভেতরের সোজা সার কথাটাই চলে নাকি বারি যাচাই। চাঁদ মনসার ক্ষমতা দেখলে যে লড়াই তা কি মনসার সঙ্গে চাঁদের, মনসার সঙ্গে বেহুলার নাকি চাঁদের সঙ্গে লখিম্দের। আজকের এই আসরে অনুমতি দেন যদি চলে নাকি দেখে আসি কী সত্যের সামনে দাঁড়াই তবে—

শিব ও বাসুকির অপরূপ কন্যা মনসা। মনসা যখন জানতে পারলেন শিব তার পিতা তখন তিনি শিবদর্শনে যাত্রা করলেন। কিন্তু শিব তার কন্যাকে চিনতে পারলেন না। পার্বতীও অস্বীকার করলেন কন্যাকে। পরে সব ঝুট-ঝামেলার অবসানে শিব মনসাকে করলেন কন্যারূপে গ্রহণ এবং মহাধু-মধামে করলেন তার বিয়ের আয়োজন। মনসার এ বিয়ের আসরে উপস্থিত ছিলেন কতই না রাজা, সওদাগর আর মুনিঋষি। আর সেখানে আরো উপস্থিত ছিলেন চম্পকনগরের রাজা শিবভক্ত চাঁদ সওদাগর। উচ্চ সমাজের বণিক চাঁদের দেখে মনসার মনে তার পূজা পাওয়ার সাধ জাগিল।

(গান) পদ্মা

শুন হরি মো দান দিলে গো বহুতর
ভিক্ষা মাগি গো যদি মোরে দয়া থাকে

শুন হরি গো... (ধূয়া)

দিয়ে দিবে আমার দিবে গো

আমার বাড়িবে সম্মান

শুন হরি গো... (ধূয়া)

ত্রিভুবনে যত জীবে গো

হরি তোমারে সেবে

শুন হরি গো... (ধূয়া)

শিষ্য কোন নাহি মোর ও গো

হরি শোন মোরও কথা

শুন হরি গো (ধূয়া)

বলি আমি সভা মাঝে গো

মাগি চাঁদের নফর

শুন হরি গো... (ধূয়া)

মনসা (রাগাশ্রিত হয়ে) :

দেখিয়াছ পিতা তুমি তাহার আচরণ

আমা সনে বিবাদ তাহার কিসেরও কারণ

বাসুকিকন্যা বলে কি নেই মোর মান

বিবাহ আসরে পাইলাম এই রূপ দান

তুমি মোর পিতা ওগো তুমি ভগবান

তুমি ছাড়া কে বুঝিবে মোর অপমান

শিব : নিজ গুণে কর কন্যা কার্য সমাধান

আশীর্বাদ তোমাপ্রতি রবে বিদ্যমান

তোমা সাথে প্রতি পদে ভগ্নি নেতা রবে

মানিবে সকল বাক্য যাহা সে কবে

চাঁদ সওদাগর (রাগাশ্রিত হয়ে) :

শুনিয়াছ দেবগণ পদ্মার উত্তর

কোন ছার মুখে মোরে চাহিল নফর

পক্ষীর গভেতে জন্ম লঘুজাতি কানী

আমাকে না চিনি বলে অহংকার বাণী

গুরুকন্যা হয়ে মোরে বলে কদাকার

ত্রিভুবনে নাহি দেখি হেন দুরাচার

যদি সেবা করে থাকি শংকর ভবানী

তবে তোরে প্রতিফল দেব লো নাগিনী

কথক : এই বলি পঞ্চ গোটা মাগিক্য ফেলিয়া

চলিয়া যায় কুপিত হইয়া

হেথা হৈতে পদ্মাবতী চলিলা সত্বরে

ভগ্নি নেতা সঙ্গে প্রবেশিকা চম্পকনগরে

চন্দ্রধর অপমান অন্তরেতে উঠে

গম্বকী তীরে দেবী বসিল কপটে

(বর্ণনাত্মক গদ্য) : চম্পকনগরের পাশ দিয়া বয়ে

চলেছে গম্বকী নদী। জেলেরা সেথা মাছ ধরি বাঁচে

কোনোরকম। নেতার সঙ্গে পদ্মাবতী সেথা হাজির

হলেন। গ্রহণ করলেন এক কুটকৌশল, তিনি নিজ

পূজার প্রতিষ্ঠার লাগি জলের মাছগুলোকে করলেন

অদৃশ্য—

জেলে ১ : হার... ওই হার... জালে কি মাছ ধরা

পড়ে?

জেলে ২ : না তো দাদা... আইজ জালে মাছ ধরা

পড়ে না।

জেলেবউ ১ : চাচি ও চাচি... মাছ কি ধরা পড়ে?

চাচি : ও বউ ওত কতা কয়ো নাকো... মাছ তো

উটি নৌড় দিবি।

(সবাই মিলে মাছ না ধরা পড়ার কারণে ক্রন্দন

শুরু করে)

জালু : হায় হায়, আজ এ কি হইল

মালু : জালে যে মাছ ধরা পড়ে না ভাই

জেলে ৩ : এ রূপ চলিলে কেমনে বাঁচিব হায়

নেতা : ওহে নৌকা পাড়ে ভিড়াও। আমাদের

দুজনের একটু চম্পকনগরে পৌছাইয়া দেও না

ভাই।

জালু : পাড়ে ভিড়াতে পারব না, মাছ ধরিতে

হইবে এই ক্ষণ।

নেতা : আমাদের না করিলে পার, মৎস্য কখনই

পাইবে না আর।

মনসা : চম্পকনগরে পৌছাইয়া দাও তুরা করি,

আশীর্বাদে মোর মৎস্য পাইবে ডালা ভরি।

এই কথা শুনি জালু মালু পদ্মা ও নেতাকে নিয়া

চম্পকনগরের উদ্দেশে যাত্রা করলেন। মাঝনদীতে

ঘটিল এক আশ্চর্য ঘটনা। দেবীর আশীর্বাদে নদীতে

জাল ফেলে জালু মালু অনেক মাছ পাইল, সঙ্গে

পাইল একটি ঘট। তখন মহাখুশি মালু জিজ্ঞাসে

মনসারে—

মালু : মা, মাগো, তুমি কে?

মনসা : আমি দেবী মনসা।

জালু : ক্ষমা কর মাগো, আমরা যে তোমায় চিনতে

পারিনি।

মনসা : এই ঘট নিয়া বাড়ি যা তোরা,

ভক্তিসহকারে নিত্য পূজা কর আমায়। মোর

আশীর্বাদে রাজার মতো সম্পদশালী হয়ে উঠবি

তোরা।

জালু ও মালু : তাই হবে মা, তাই হবে।

মাগো পদ্মাবতী জননী সুরসা সাপিনী

নাগেশ্বরী ত্রিলোচনী... (ধূয়া)

কৃপা কর যারে ধন্য সে সংসারে

তুমি কলুষনাশিনী

মাগো পদ্মাবতী জননী... (ধূয়া)

মহাদেবকন্যা চণ্ডীতনয়া

দেবী মুক্তি বিধায়িনী

মাগো পদ্মাবতী জননী... (ধূয়া)

মহিমা তোমার ভুবনও একাকার

তুমি সত্যসনাতনী

মাগো পদ্মাবতী জননী সুরসা সাপিনী

নাগেশ্বরী ত্রিলোচনী।

বর্ণনা (গদ্য)

মা মনসার পূজা করে জালু মালুর প্রচুর ধনসম্পত্তি

হতে লাগল। এ সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল মানুষের মুখে

মুখে জনে জনে। দিকে দিকে মা মনসার পূজার

প্রসার ঘটলে লাগল। আর এদিকে চাঁদ সওদাগরের

স্ত্রী সনেকা এ সংবাদ শুনিয়া তিনিও মা মনসার

পূজা দেবেন বলে মনস্থির করলেন। জালু ও মালুর

ঘর থেকে অনেক মিনতি করে মা মনসার ঘট এনে

সনেকা নিজের ঘরে স্থাপন করলেন এবং নিত্য চাঁদ

সওদাগরের অনুপস্থিতিতে মা মনসার পূজা করতে

লাগলেন। একে দুয়ো করি দিন যেতে লাগল,

মনসার নিত্য পূজা চলতে লাগল। কিন্তু একদিন

সনেকার এ সত্য চাঁদ সওদাগরের কাছে প্রকাশ

পেল—

চাঁদ : সনেকা তুমি কি পূজার ঘরে?

সনেকা : (ঘট আড়াল করে) প্রভু! আমার পূজার

বিলম্ব হবে, আপনি যান।

চাঁদ : ভেতরে আসব না, বাইর হতে মহাদেবের

প্রণাম দিয়ে চলে যাব। মহাদেব রক্ষা কর, ওই চ্যাং

মুড়ি কানী মনসার থেকে রক্ষা কর, রক্ষা কর।

সনেকা : মা, মাগো, রাগ করো না, নির্বোধ

স্বামীয়ে মোর কর ক্ষমা।

চাঁদ : (রাগাশ্রিত হয়ে) সনেকা চাঁদের স্ত্রী তুমি,

একি তোমার কাজ

মনসারে পূজা তুমি নাহি কোন লাজ

ধিক ধিক রানী তোর বুদ্ধি নাহি মনে

লঘুজাতি কানী পূজা কর কী কারণে

এই কথা হয় যদি জগতে প্রকাশ

সম্মান খুঁজিবে মোর হবে জাতিনাশ

সনেকা : শান্ত হও পতি তুমি

শোন মোর কথা

মনসারে গালি তুমি

কেন দেও বৃথা

চাঁদ : মোর ঘরের বধু তুমি

কর প্রবঞ্চনা

চ্যাং মুড়ি কানীর

কিসের বন্দনা

(লাথি মেরে মনসার পূজার ঘট ভেঙে

দেয় চাঁদ সওদাগর)

(মনসার প্রবেশ)

মনসা : শোন ওগো মা জননী মোর বচন

চাঁদের কারণে তুমি না করিও ক্রন্দন

তোমা সাথে আমি আছি নাহি কোনো ডর

নিশ্চিন্ত মনে তুমি যাও আপন ঘর

আমারে পূজো তুমি সদা কায়মনে

মঙ্গল হইবে তব প্রতি ক্ষণে ক্ষণে

সনেকা : অপরাধ ক্ষমা কর দীনহীন জনে

শরণ লইন মাগো তোমারই চরণে

তোমার চরণ ধরি করি যে মিনতি

নিজগুণে কৃপা কর ক্ষম মোর পতি

বর্ণনা (গদ্য)

চাঁদ সওদাগর কর্তৃক অপমানিত হয়ে দারুণ

ক্রোধে জ্ঞানশূন্য পদ্মাবতী ভগ্নি নেতার কাছে

উপনীত হলে ভগ্নি নেতা তাকে পরামর্শ দেয় চাঁদ

সওদাগরের ছয় পুত্রকে দংশন।

তৎক্ষণাৎ পদ্মাবতী স্থির করে মন, ছয় পুত্র দংশিত

করলেন গমন।

উদ্যানেতে ক্রীড়া করে যত পুত্রগণ



সন্ধান পাইয়া পদ্মা গেল ততক্ষণ
মক্ষিকার রূপ ধরি অন্তরীক্ষে যায়
ব্রহ্মরন্ধ্রে গিয়া পদ্মা কামড় লাগায়
(মনসার বিষে ছয় পুত্র ঢলে পড়ে মাটিতে।
তৎক্ষণাৎ চাঁদ সওদাগরের প্রবেশ)
সনেকা (চাঁদের প্রতি) : ওরে পাণ্ডিত্য সাধু! কী
কন্ম করলে
মনসারে বিভ্রম্নি নির্বংশ হলে
চাঁদ সওদাগর : কী করিবে কানী আমারে হিংসিয়া
বাঁচাইব ছয় পুত্র মহাজ্ঞান দিয়া
আমার সঙ্গে কানী না পারিবে আঁটিয়া
ইহার কারণে তুমি ভাব কী লাগিয়া
(জিয়াইয়া উঠল চাঁদের ছয় পুত্র)

চাঁদ সওদাগর তৎক্ষণাৎ ব্রহ্মজ্ঞানে ছয় পুত্রকে
জিয়াইয়া
মনসার প্রতি তার তাপ ভর্ৎসনা প্রকাশ করল। আর
ওইদিকে পদ্মাদেবী নেতার নিকট পুনরায় উপনীত
হলেন।
মনসা : কী আর বলিব নেতা দুঃখের কাহিনী
চান্দ্রিয়ার অপমান না সহ্যে পরানী
যদি তারে প্রতিফল দিতে নাহি পারি
মনসা বলিয়া ডাক অকারণে ধরি
নেতা : বলিগো শুন পদ্মা আমার বচন
চাঁদের মহামন্ত্র করগো হরণ
পদ্মাবতী গো তুমি মনস্তির কর হিয়া
নটীর বেশে চল তুমি সকল জিনিয়া
সাধুর সহিত গিয়া নিসর্গ করিয়া
মহাজ্ঞান মন্ত্র তাহার আনহ হরিয়া।
অন্তঃপুরে যাও তুমি নটীরূপ ধরি
বন্দিবে সাধু তোমারে কর কিসে দেরি
যতনে রাখিবে সাধু তোমারে পাইয়া
মহাজ্ঞান শুনাইবে কামেতে মজিয়া
ছলেবলে কার্য সিদ্ধি করিয়া যতনে
প্রবঞ্চনা করিয়া আসিবা হুস্ত মনে
গান (চাঁদ সওদাগর)
এমনও সুন্দরী কন্যা
আমার গৃহে এইসেছে
নয়ন পাগল কইরাছে রে... (ধূয়া) ॥
কন্যা যে সুন্দরী এমন
কী বলিব রূপের বর্ণনা।
ভুলিব না থাকলে জীবন ॥
যে একবার দেখেছে
নয়ন পাগল কইরাছে রে... (ধূয়া) ॥
কন্যা যে ভাই মনোলোভা
রূপে যে তার চান্দের শোভা ॥
খোঁপার মাঝে রক্তজবা
নবীন যৌবন অঙ্গে
নয়ন পাগল কইরাছে রে... (ধূয়া) ॥
(গান-মনসা)
আরে ও নাগর ও নাগর বলি তোমারে
নাগর বলি তোমারে
নবীন যৌবন আমার
সঁপি তোমারে
আরে ও নাগর ও নাগর বলি তোমারে... (ধূয়া)
নাগর বলি তোমারে
আমায় তুমি রানী কইরা
রাখো গো পুরে... (ধূয়া)
আরে ও নাগর ও নাগর বলি তোমারে

নাগর বলি তোমারে
আলিঙ্গনে বাঁধো আমায়
যতন করে...
আরে ও নাগর ও নাগর বলি তোমারে... (ধূয়া)
মনসা : শোন সাধু ধনরত্ন কিছু নাহি চাই
মহাজ্ঞান মন্ত্র যদি তোমা স্থানে পাই
এ জন্মের মত তোমা দিব আলিঙ্গন
অনুগত হইয়া আমি থাকিব সর্বক্ষণ
চাঁদ সওদাগর : শোন তবে বলি তোমায় মন্ত্র
মহাজ্ঞান
বাঙ্গা তোমার পূরণ হইল করিলাম প্রমাণ
(চাঁদ মনসার কানে মহাজ্ঞান মন্ত্র বলে)
মনসা (হেসে) : মহাজ্ঞান শুনিলাম সুস্থ হইল মন
আজ্ঞা কর করে আসি মুখ প্রক্ষালন
ওরে পাণ্ডিত্য সাধু আর কিবা চাও
মনোবাঙ্গা পূরণ হইল যমখরে যাও
আমারে করিয়াছ যত বিভ্রম্ন
সবংশে বধিব তোরে রাখে কোন জন।
বর্ণনা (গদ্য)
মহাজ্ঞান মন্ত্র পাইয়া মনসা তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হইল
চাঁদ সওদাগরের উদ্যানে। সেখা মা সনেকার সঙ্গে
ক্রীড়ারত ছয় পুত্র চাঁদের। মক্ষিকার রূপ ধরি
মনসা সেখা যায়—
গান (সনেকা)
ও পুত কোলে আয়রে... (ধূয়া)
ডাকে তোমার দুঃখিনী মা
কোলে আয়রে
দশ মাস দশ দিনের বাবা
রাখিলাম উদরে
একবার তুমি মা ডাইকা রে বাবা
দুঃখ নিবা দূরে রে
ও পুত কোলে আয়রে ডাকে তোমার দুঃখিনী মা...
(ধূয়া)
কোলে আয়রে... (ধূয়া)
কথা কয় না কথা কয় না
বাগানের মাঝারে
পরানের ধন কই গেলি
বুকটা খালি করে
ও পুত কোলে আয় রে
ডাকে তোমার দুঃখিনী মা
কোলে আয়রে ... (ধূয়া)
বর্ণনা
পরানের ধন ছয় পুত্রকে হারিয়ে চোখের জলে বুক
ভাসায় মা সনেকা। কান্দে পিতা চাঁদ সওদাগর।
তবুও সে মাথা না নোয়াইবে মনসার কাছে। চাঁদের
এ অহংকার রূপ দেখে ক্রুদ্ধ মনসা ফের যুক্তি করে
নেতার সঙ্গে—
মনসা : চান্দ্রিয়ার ক্রোধ মোর না সহ্যে শরীরে
পুত্রশোকে পাশরিয়া গালি দেয় মোরে
রাজা চন্দ্রধর যদি পূজা নাহি করে
ত্রিভুবনে কেহ আর না পূজিবে মোরে।
ইহার উপায় ভগ্নি তুমি কহ শীঘ্র করি
হারিনু চান্দের এই ঠাই সহিতে না পারি।
নেতা : শোন বলি পদ্মাবতী স্থির কর মন
সত্ত্বর অতি বাগিজ্যে চান্দ করিবে গমন
হেনকালে হেথা তুমি উপস্থিত হইয়া
চৌদ্দ ডিঙ্গা ভুবানোর ডর দেও গিয়া
প্রাণভয়ে সাধু আর বিকল্প না পাইয়া

পূজিবে তোমার চরণ শুভবুদ্ধি নিয়া।
 মনসা : যাই তবে ভগ্নি দেরি নাহি আর
 চান্দেয়া পূজা দূর নহে এই বার।
 (চাঁদ সওদাগরের প্রবেশ সভাসদে)
 চাঁদ : শোন বলি সভাসদগণ শোন বিবরণ
 ছয় পুত্র হারায়ে মোর সুখ নাই মন
 থাকি থাকি পুত্র ব্যথা জাগি ওঠে বৃকে
 দহিছে যে হৃদয় ওগো দারুণ শোকে।
 করিয়াছি স্থির তাই শোন দিয়া মন
 লংকা দ্বীপে যাব আমি বাণিজ্য কারণ।
 যশাই পণ্ডিত : ফাল্গুনের শুরুপক্ষ ত্রয়োদশী তিথি
 বুধের প্রথম দণ্ড নক্ষত্র রেবতী
 চন্দ্র তারা শুদ্ধ তাতে কহিলাম সার
 এমন উত্তম দিন না হইবে আর।
 চাঁদ : ঠিক তবে এইলগ্নে সত্বর অতি যাব
 দৈবজ্ঞ বাক্ষণ ভট্ট সঙ্গে করি নিব।
 বহর সাজাও, পাল খাটাও
 চৌদ্দ ডিঙ্গা সাগরে ভাসাও।
 (সমবেত সাথীরা)
 হেইয়া হো... হেইও ॥
 চাঁদ : ওহে সাথী
 ডিঙ্গা চালাও দ্রুত গতি।
 ডিঙ্গা ছাড়িল ছাড়িল রে
 ডিঙ্গা ছাড়িল ছাড়িল রে ॥
 কালিদয় সাগরে ডিঙ্গা ছাড়িল রে ॥
 চাঁদ (সংলাপ)
 পূর্বজন্মে বুঝি কত করেছিলুম পাপ
 সে কারণে পুত্রশোকে পাই মনস্তাপ
 নবীন বয়সে বধু পতিহীনা হয়
 মরে যত পুত্রগণ দহিছে হৃদয়।
 মারিলি ছয় পুত্র মোর ওরে নীচ কানী
 তবুও দিব না পূজা শোন পাষণী।
 ব্রাহ্মণ : ওগো সাধু শুন শিরোমণি
 তোমার কারণে সবে হারানু পরানি
 ব্রাহ্মণ : তোমার চরণ ধরি করি যে মিনতি
 সর্বজন রক্ষা কর ভক্তি পদ্মাবতী
 ব্রাহ্মণ : তোমার কারণে মরি বিদেশে আসিয়া
 কুশল রহিবে তব সংসার ভরিয়া
 মনসা : ওরে সওদাগর চান্দ আর কিবা চাও
 মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল যমঘরে যাও
 জীবনের সাধ যদি থাকে তোর মনে
 গন্ধ পুষ্প দিয়া পূজা আমার চরণে
 ধনজন রক্ষা হবে যাইবে বাঁচিয়া
 মারিয়াছি ছয় পুত্র দিব জিয়াইয়া।
 চাঁদ : ওলো পাষণী কী কহিলে বাণী
 প্রাণভয়ে কদাচিৎ না পূজিব কানী।
 মরিলে হইবে জন্ম, জন্মিলে মরণ
 ইহার কারণে চিন্তা না করে সুজন।
 মনসা : দেখি আর কত কষ্ট সহিবারে পারে
 অবশ্য ঘুচিবে বল ভাসিলে সাগরে।
 মনসার ক্রোধে চাঁদ সওদাগরের চৌদ্দ ডিঙ্গা ডুবল
 সাগরে। কিন্তু তাতেও কি হয় প্রাপ্তি মনসার
 ক্ষমতার দখল, নাকি আরো শক্ত হয়ে চাঁদ
 সওদাগরের মনোবল? ক্রোধে জ্ঞানশূন্য মনসা চাঁদ
 সওদাগরের যে চৌদ্দ ডিঙ্গা ডুবিল তাতে প্রাণরক্ষা
 হলো শুধু চাঁদের। আর মরল বাকি সবাই। ক্ষমতা
 দখলের এ লড়াইয়ে সমুদ্রতল থেকে রিক্ত, সর্বস্বান্ত
 ফিরে আসে একা চাঁদ সওদাগর।

রিক্ত হাতে সনেকার কাছে ফিরে এসে চাঁদ পেল
 পরমধন পুত্র লখিন্দর। যার মুখ বিনা দর্শনে
 গিয়েছিল বাণিজ্যে, ফিরে এসে পেল সাবালক
 পুত্ররতন। মহাখুশিতে পিতা চাঁদ সওদাগর পুত্রের
 বিয়ের আয়োজনে হলো ব্যস্ত। ঘটক মহারাজ
 ভট্টের কাছে পেল বেহুলা নামধারী, অপরূপ সুন্দরী
 কন্যার সন্ধান। সবাই যখন ব্যস্ত বিয়ের আয়োজনে
 তখন মা সনেকা বলল কী কথা—
 সনেকা : শুন শুন প্রাণপতি কর অবধান
 এক বাক্য বলি তোমায় আমি বিদ্যমান।
 বিবাহের কালে পুত্রে আছে নাগ ডর
 ইহার উপায় তুমি কর নরেশ্বর।
 চাঁদ : কর্মকার ওগো তুমি কর অবধান
 লোহা বাসর এক করহ নির্মাণ।
 সাবধানে কর কার্য কহিনু তোমারে
 পিপীলিকা যেন তাতে প্রবেশিত নাহে।
 মনসা : শোন বলি নরাদম শোন মোর বচন
 আমা সনে বিবাদ তোর কিসের কারণ
 যেই মোর সহিত করে বৈরী আচরণ
 ফুরাইবে সুখের কাল হইবে মরণ
 বাসরে দুই বন্ধু কাটিয়া রাখিয়া
 আচ্ছাদন দিবি তাতে হরিতাল দিয়া
 এই বাক্যের যেন কোন না হয় নড়চড়
 নহিলে কায়মনে মরণ জপ কর।
 মনসার এই বাক্য শুনিয়া কামারে ভীত হইয়া
 করিলেন এক ছিদ্র সৃজন। লোহার বাসরের যেই
 ছিদ্র ডাকি আনিবে লখিন্দরের কালমরণ। অতি
 সুনিপুণ বাসর দেখিয়া চাঁদ সওদাগর হইলেন সন্তুষ্ট
 কিন্তু তিনি বুঝিলেন না তাতে রয়েছে মনসার
 অভিপা। যথাদিনে নিরাপদ বাসরে প্রবেশিলেন
 নববধু বেহুলা তার পতি লখিন্দরযোগে। কিন্তু
 সুখেরও রজনী পোহাইল না বিনা বিধবার
 আত্মনাদে। লোহার বাসরে তাই দংশিত লখিন্দরের
 পাশে সিঁদুরহীনা বেহুলার বিলাপ আমাদেরকে
 ভাসায় শোকের সাগরে।
 কোন দোষে দংশিলা লখাইরে
 এই না লোহার বাসরে বিধি
 কী হইল... (ধূয়া)
 শাড়ির আঁচল, নাকের নোলক কিসেরও কামগো
 প্রভু তোমা বিনে
 অভাগিনী বধুরে তোমার
 নাও না মোরে চিনে
 কোন দোষে দংশিলা লখাইরে... (ধূয়া)
 হাতের শঙ্খ, মাথার সিঁদুর মলিন হইল
 এই না বয়স কালে
 কালনাগিনী সাপেরে খাইল
 কিনা দারুণ ছলে...
 কোন দোষে দংশিলা লখাইরে... (ধূয়া)
 এই না লোহার বাসরে বিধি
 কী হইল।
 প্রভুরে...
 স্বামী বিনে এই না অভাগিনী
 কেমনে বাঁচিবে রে...
 ওরে লখাই...
 সোনার পুতলি...
 কোন দোষে দংশিলা লখাইরে... (ধূয়া)
 উঠ উঠ প্রাণনাথ
 কত নিদ্রা যাও
 আঁখি মেইলা চাও

বেউলা মোক বুলাও
 কোন দোষে দংশিলা লখাইরে... (ধূয়া)
 কথক (বর্ণনাভূক গদ্য) কী দোষে দংশিল মনসা
 লখিন্দরকে? কী দোষে বধু হারাইল স্বামী, মা
 হারাইল তার সন্তান? একি লখিন্দরের পূর্বজন্মের
 কোনো পাপ, নাকি শুধুই মা মনসার সন্তাপ?
 দংশিল যে মনসা লখিন্দরকে সে কি শুধুই বলি নয়
 ক্ষমতা দখল নীতির। চাঁদ এবং মনসা উভয়ের
 মধ্যে ক্ষমতা দখলের যে লড়াই তা থেকে শুধু
 প্রাপ্তি হয় ধ্বংস আর মৃত্যু। ক্ষমতা যদি হয়
 মানুষের কল্যাণনীতির জন্য তাহলে এ লড়াইয়ের
 মাধ্যমে হয় কি প্রাপ্তি সেই কল্যাণের সেই মঙ্গলের?
 মানবের কল্যাণের তরে যে ক্ষমতা সেই ক্ষমতাই
 কি কাল হয়ে দাঁড়ায় না মানবের?
 ক্ষমতা দখলের
 এই খেলায়
 যদি জীবন
 থেকে ঝরে
 যায় একটি
 একটি করে
 ফুল তাহলে কী
 লাভ এই
 ক্ষমতার?
 মনসার পুজোর
 বাসনা, চাঁদ
 সওদাগরের
 তাতে ভৎসনা
 আর এ দুয়ের
 জাঁতাকলে পিষ্ট
 হয়ে মা হয়
 পুত্রহারা বধু
 হয় সিঁদুরহীনা।
 এই যদি হয়
 পরিণাম তাহলে
 কিসের ক্ষমতা,
 কিসের ভক্তি
 আর কিসের
 পূজাদান?
 মঙ্গলগীত
 মঙ্গল হোক
 আজি মানবের
 তরে... (ধূয়া)
 ॥
 এই না হিংসা হানাহানি
 ভুলে এক হইলে সকলেরে
 ওরে মঙ্গল হোক... (ধূয়া) ॥
 এই না জনম কল্যাণের লাগি
 তবে কিসেরও বিভেদ ওরে
 ওরে মঙ্গল হোক... (ধূয়া) ॥
 প্রেমে আল্লাহ প্রেমেই ঈশ্বর
 প্রেমে জীবন হোক রঙিন ওরে
 ওরে মঙ্গল হোক... (ধূয়া) ॥
 হিন্দু মুসলিম বৌদ্ধ খ্রিস্টান
 সবাই মনুষ্য সন্তান রে
 ওরে মঙ্গল হোক... (ধূয়া) ॥
 এই না আসরে গেয়ে যাই আমরা
 প্রেমশক্তির জয়গান রে
 ওরে মঙ্গল হোক... (ধূয়া) ॥



গল্প

বীরেন স্যারের চেহারার শেষ পরিণতি

ইকবাল আজিজ

বীরেন স্যার আমার শৈশবের হিরো, আমার দেখা জীবিত মানুষের মধ্যে সবচেয়ে রূপবান। বীরেন স্যারের সঙ্গে আমার শৈশবের শিল্পচেতনা ও সৌন্দর্যচেতনার অনেকখানি জড়িয়ে আছে; তার কথা কি আমি ভুলতে পারি? তার চেহারা ছিল অতিবিস্ময়করভাবে নায়ক উত্তম কুমারের মতো। সেই আমলে ষাট দশকের শুরুর্তে উত্তম কুমার ছিলেন যে কোনো বিখ্যাত জননেতার চেয়েও অনেক বেশি জনপ্রিয়। আর নায়িকা সুচিত্রা সেন ছিলেন প্রতিটি বাঙালির মনের মন্দিরে অধিষ্ঠিত দেবীর মতো। হ্যাঁ, এটা ছিল সেই সুচিত্রা-উত্তমের যুগ এবং আমাদের সহজ-

সরল মফস্বল নাটোরে আমরা এক অবিকল মফস্বলি উত্তম কুমার পেয়ে গিয়েছিলাম বীরেন স্যারের মধ্য দিয়ে। এ ব্যাপারে আমার গৌরব ছিল একটু বেশি; কারণ তিনি ছিলেন আমার স্কুলশিক্ষক, সেই সঙ্গে গৃহশিক্ষকও। উত্তম কুমারের সঙ্গে তার এই শরীর-স্বাস্থ্য, আচরণ ও চেহারার মিলের কথা স্যার হয়তো জানতেন, হয়তো তাকে গোপনে অনুকরণ করতেন। তা না হলে এমন আশ্চর্য মিল হলো কীভাবে? তিনি পাঞ্জাবি ও ধুতি পরতেন উত্তম কুমারের মতো আর যখন হাসতেন, তখন মনে হতো অবিকল সেই টালিগঞ্জের উত্তম কুমার আমাদের পাশে

বসে হাসছেন; কারণ তার দাঁতগুলোও ছিল উত্তম কুমারের মতো।

শুধু একটু পার্থক্য ছিল উত্তম কুমারের সঙ্গে আমাদের বীরেন স্যারের; আর তা হলো স্যারের গৌফ। স্যারের ঠোঁটের ওপর ছিল খুব সরু গৌফ, যেন এক গৌফধারী উত্তম কুমার ষাট দশকের শুরুর্তে আমাদের স্মৃতিময় নাটোর শহরে জীবন সংগ্রামের অভিনয়ে নেমেছিলেন। স্যারের ছিল একটি চমৎকার র্যালি সাইকেল; প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলায় আমাদের নানাবাড়ির দরজায় স্যারের সাইকেলের ক্রিং ক্রিং ধ্বনি যখন বেজে উঠত, তখন আশপাশের বাড়িঘরের জানালা খুলে যেত; পাড়ার কিশোরী-যুবতী-বুড়ি প্রভৃতি নানা বয়সের নারী স্যারের চেহারা এক নজর দেখার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠতেন; দু-এক জন হয়তো মনে মনে স্যারের প্রেমে পড়েছিলেন, তবে হৃদয়ের সেই গোপন কথাটি কোনো দিন মুখ ফুটে বলা হয়নি।

বীরেন স্যার বাসায় আমাদের বাংলা, ইংরেজি ও অঙ্ক শেখাতেন। তবে উত্তম কুমারের সঙ্গে স্যারের যত মিলই থাক না কেন, স্যার কিছু উত্তম কুমারের মতো কলকাতার বাংলায় কথা বলতেন না; তিনি কথা বলতেন নাটোরের আদি আঞ্চলিক ভাষায়। স্যার বলতেন, ‘স্বপন, তুই স্কুলের পাঠ্যবইয়ের বাইরে গল্পের বইও পড়বু। তাইলে তোর একটা আলাদা মন তৈরি হবি। আর প্রতিদিন দৈনিক পত্রিকা পড়বু।’ আমার এ খবরের কাগজ পড়া নিয়ে স্যার আমাকে কোনো দিন হারাতে পারতেন না। কারণ শৈশব ও কৈশোরে অনেক খারাপ অভ্যাসের পাশাপাশি খবরের কাগজ পড়া আমার নিয়মিত অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। তখন অবশ্য ঢাকার বাইরে বেশির ভাগ মফস্বলে খবরের কাগজ পাওয়া যেত এক দিন পর। অর্থাৎ ঢাকায় সোমবার যে পত্রিকা প্রকাশিত হতো, তা নাটোরে পাওয়া যেত মঙ্গলবার দুপুরে। পত্রিকার ওপর ছোট হরফে লেখা থাকত ‘ঢাকা-সোমবার, মফস্বল-মঙ্গলবার’। এটা ছিল ষাট দশকের পত্রিকা জগতের একটি পরিচিত নিয়ম। আমার নানাবাড়িতে আসত দৈনিক আজাদ, আমি স্কুল থেকে বাসায় ফিরে সবার আগে পড়তাম পত্রিকা। এরপর যেতাম বাড়ির কাছে গোপাল ডাক্তারের দোকানে দৈনিক ইত্তেফাক পড়তে। এ দুটি বাংলা পত্রিকাই তখন পাওয়া যেত। আমি তখন প্রতিটি খবর পড়তাম মনোযোগ দিয়ে। তাই পত্রিকার খবর বিষয়ে প্রশ্ন করার সময় স্যার হুঁশিয়ার থাকতেন। আমি এসব বিষয়ে অনায়াসে নানা ধরনের প্রশ্নের জবাব দিতাম। তখন স্কুলের পাঠ্যবইয়ের বাইরে এসব জ্ঞানকে লোকে বলত ‘আউট নলেজ’। স্যার আমার অতিসমৃদ্ধ আউট নলেজের বিষয়ে গর্ববোধ করতেন। অনেক সময় হয়তো স্কুলের ওপরের ক্লাসের ছাত্ররা বলতে পারত না পৃথিবীর প্রথম মহাশূন্যচারীর নাম কী, অথবা চিলি কোন মহাদেশে অবস্থিত; ঠিক তখনই আমার ডাক পড়ত, স্যার আমাকে ডেকে পাঠাতেন। আমি সহজেই এসব বিষয়ে সঠিক জবাব দিয়ে দিতাম। স্যার তখন আমার চেয়ে বয়স্ক ছাত্রদের শুনিয়ে শুনিয়ে বলতেন, ‘এই ছোট চ্যাংড়ার যে

জান, তার এক কোনাও তোদের মধ্যে নাই। তোর সব গলায় দড়ি দিয়ে মরেক।’ নাটোরের আদি আঞ্চলিক ভাষায় উচ্চারিত স্যারের এ বাক্যগুলো এখনো আমার কানে বাজে। স্যার আমার সম্পর্কে বলতেন, ‘এই চ্যাংড়া একটা জিনিয়াস। অর যাওয়া উচিত ছিল ঢাকায়। কেন যে নাটোরে পইড়তে আইসল বুইঝতে পারিছছি না।’

আর স্যার কী সুন্দর বাঁশি বাজাতেন, বাঁশের বাঁশি এমন দরদ দিয়ে বাজাতে আমি আজ পর্যন্ত কাউকে দেখিনি; অবশ্য স্যারের বাঁশি শোনার সুযোগ খুব ছাত্রই পেয়েছে। স্যার আমার মতো তার দু-এক জন অতিপ্রিয় ছাত্রকে তার বাড়িতে আমন্ত্রণ করতেন; সেদিন আমরা তার বাড়িতে খুব মজা করে লুচি, আলুর দম আর মিষ্টি খেতাম। স্যারের বাড়ির ভেতরে খুব বড় জায়গা জুড়ে ছিল একটি ফুলের বাগান। সেখানে ছিল দেশ-বিদেশের নানা ধরনের ফুল, অর্কিড আর পাতাবাহারের গাছ। স্যার আমাদের সবাইকে নিয়ে বাগানের মাঝখানে বসতেন। তারপর তার সেই বাঁশের বাঁশিটি বাজাতে শুরু করতেন, স্যারের বাঁশির সুরে যেন এক আশ্চর্য জাদু ছিল; আমরা শুদ্ধ বিস্ময়ে শুনতাম সেই মায়াবী মূর্ছনা, বাঁশির সুরে আমরা এক রূপকথার আলাদা জগতে ভেসে বেড়াতাম। তবে স্যারের বাঁশিতে আমরা বেদনার সুরই বেশি শুনতে পেতাম; মনে হতো আমাদের সব আনন্দের আড়ালে আছে দুঃখের অবিশ্রান্ত ঝরনাধরা। বীরেন স্যার তখনো অবিবাহিত ছিলেন; প্রায়ই মনে হতো স্যার হয়তো তার যোগ্য পাত্রী কোনো দিনই খুঁজে পাবেন না।

কিন্তু বীরেন স্যার একদিন বিয়ে করলেন; স্যারের অতিশয় অসুস্থ মা দাবি জানিয়েছিলেন, তার একমাত্র পুত্রকে এক সপ্তাহের মধ্যে বিয়ে করতে হবে। মৃত্যুপথযাত্রী মায়ের আদেশ অমান্য করতে পারেননি স্যার। একদিন খুব সকালে তিনি তার কয়েকজন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়, স্কুলের আট-দশ জন শিক্ষক আর দু-তিন জন অতিপ্রিয় ছাত্র নিয়ে বিয়ে করতে গেলেন। নাটোর থেকে সাত্তাহার লাইনে দু-তিন স্টেশন পরে মাদনগর। মনে আছে শীতের সকালে আমরা স্যারের সঙ্গে বরষাত্রী হয়ে নাটোর স্টেশন থেকে ট্রেনে রওনা হয়েছিলাম আর কত আনন্দের মধ্য দিয়ে। স্যার নববিবাহিতা স্ত্রীকে নিয়ে ফিরে এসেছিলেন অনেক রাতে। এরপর ঘোড়ার গাড়ি টমটমে চড়ে যার যার বাড়িতে ফিরেছিলাম। কিন্তু স্যারের স্ত্রীর চেহারা আমাদের কারোই পছন্দ হয়নি। আমাদের উত্তম কুমার যদি বিয়ে করতে গিয়ে সুচিত্রা সেনকে না পান ক্ষতি নেই; কিন্তু তার স্ত্রী নিদেনপক্ষে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় বা সন্ধ্যা রায়ের মতো হওয়া দরকার— এই ছিল আমাদের অভিমত। আমাদের সেই স্বপ্ন এতটুকু সফল হয়নি; স্যারের স্ত্রীর চেহারা কোনো নায়িকার মতোই নয়। আমাদের বীরেন স্যারের স্ত্রী হয়েছেন একেবারে অতিসাধারণ খেঁদি কিংবা পেঁচীর মতো। তার গায়ের রং কালো এবং চোখ টেরা। তবু এই কালো ও টেরা বউ নিয়ে স্যার বেশ সুখেই ছিলেন বলে মনে হয়। বিয়ের পর স্যার আরো বেশি প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিলেন।





আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ‘স্বপন! বউদিকে কেমন লাইগল?’ আমি বলেছিলাম, ‘স্যার! খুব আলো হয়েছে।’ স্যার একটু চুপ করে থেকে নিজেই বলেছিলেন, ‘মানুষের বাইরের রূপ দিয়ে কী হবি? রূপ আইজ আছে, কাইল নাই। গুণ কিন্তু থাইকে যাবি মৃত্যু পর্যন্ত।’ যাই হোক, স্যারের বিয়ের কিছুদিন পরই আমি নাটোর ছেড়েছিলাম এবং আমার পৈতৃকনিবাস কুষ্টিয়া শহরে চলে এসেছিলাম। তখন শুরু হয়েছিল আমার অন্য জীবন। নাটোর ছাড়ার আগে স্যারের কাছে বিদায় নিতে গিয়েছিলাম এবং ভক্তিসহকারে তার পা স্পর্শ করেছিলাম। স্যার আমাকে আশীর্বাদ করে বলেছিলেন, ‘তুই অনেক বড় হবু স্বপন। আমি আইজ বইলে দিলাম, তুই রাজশাহীর ডিসি হবু।’ স্যার তার কল্পনার সর্বোচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন চাকরির কথাই হয়তো সেদিন উচ্চারণ করেছিলেন।

এরপর বহু বছর পার হয়ে গেছে। আমিও জীবনের বহু পথ পার হয়ে ঢাকায় স্থায়ী হয়েছি; কিন্তু রাজশাহীর ডিসি বা ডেপুটি কমিশনার হতে পারিনি। হয়েছে এক স্নেহস্বাসবী সংস্থার পরম অনুগত গবেষক এবং সেই সংস্থার কাজে প্রায় চল্লিশ বছর পর আবার একদিন হাজির হলাম নাটোর শহরে। জীবনের এই এক অদ্ভুত নিয়ম; পুরনো জীবনের সব সঙ্গীই আবার ফিরে আসে নতুন পরিচয় নিয়ে। ২০০৭ সালের ডিসেম্বরে আমার শৈশব-কৈশোরের স্মৃতির শহর নাটোরে গিয়ে মনে হলো, এ শহরের প্রতিটি মানুষ, বাড়িঘর, বৃক্ষ, নদী— সব যেন এককাল ধরে আমার অপেক্ষায় প্রহর গুনেছে। তবে তারা সবাই যেন বদলে গেছে। নিমতলায় দুলালের দোকানে মিষ্টি খেতে গিয়ে শুধু কষ্টই পেলাম; সেই অপূর্ব পাত্রতোয়া, কাঁচাগোল্লা, সন্দেশ সব যেন কেমন বিস্মাদ হয়ে গেছে। দোকানের প্রাচুর্য বেড়েছে। সততা ও আন্তরিকতার অভাবে ঐতিহ্যবাহী সেসব মিষ্টির মূল স্বাদই হারিয়ে গেছে। শুধু যোগাযোগব্যবস্থার অনেক উন্নতি হওয়ায় ব্যবসা গেছে বেড়ে। এরপর অনেক ফাঁকিবাজি দেখলাম। আমার শৈশবের ‘উত্তম কুমার’ বীরেন স্যারের কথা মনে হলো। তিনি কি এখন বেঁচে আছেন? পরিচিত একজন জানালেন, স্যার শিক্ষকতা থেকে অবসর নিয়ে হেমাঙ্গিনী সেতুর কাছে একটি দোকান ভাড়া নিয়ে হোমিওপ্যাথ প্র্যাকটিস করছেন। আমার শৈশব-কৈশোরের হিরো এখন কেমন ডাক্তার হয়েছেন, তা খুব দেখতে ইচ্ছা হলো। নাটোর শহরে নারদ নদের ওপর হেমাঙ্গিনী সেতুর সঙ্গে আমার কৈশোরের অনেক স্মৃতি জড়িয়ে আছে। সেতুর কাছেই স্যারের দোকান। একটি বড় সাইনবোর্ডে বড় বড় হরফে লেখা আছে ‘হ্যানিমান হোমিও হল’। তার নিচে কিছুটা ছোট হরফে লেখা আছে ‘এখানে বীরেন স্যারের দক্ষ চিকিৎসায় জটিল রোগ নিরাময় হয়।’ বুঝলাম এখনো শিক্ষক হিসেবে এ শহরে স্যারের প্রধান পরিচিতি। বীরেন পালকে এখনো সবাই বীরেন স্যার হিসেবে চেনে, চিকিৎসক হিসেবে নয়। আমার খুব কৌতূহল হলো এককাল পরে স্যারের চেহারা কেমন হয়েছে তা দেখার। আমার স্বপ্ন ছিল, আমাদের কৈশোরের তরুণ উত্তম কুমার হয়তো প্রবীণ উত্তম কুমারের স্নিগ্ধ

শ্রান্ত রূপ ধারণ করেছেন; কিন্তু ‘দেখিলাম এ কোন ভূত!’ বাস্তবিকই, এত পরিবর্তন কি কোনো মানুষের হয়? যিনি নিজেকে বীরেন স্যার হিসেবে পরিচয় দিলেন, তিনি এক বৃদ্ধ কঙ্কালসার ব্যক্তি। তার চোয়াল বসে গেছে, চোখ কোটরাগত এবং নাক ও কপাল বিদ্যুটে রূপ ধারণ করেছে। আমাদের শৈশবের উত্তম কুমারের এতটুকু অবশিষ্ট নেই তার মধ্যে। নিজের পরিচয় দিলাম। স্যার হাসলেন, মনে হলো প্রেতের কান্নাময় হাসি; সেই প্রাণবন্ত কণ্ঠস্বর নয়, কেমন যেন ঘড় ঘড় শব্দ বের হলো তার গলা থেকে — ‘তুই সেই স্বপন! কেমন আছ বাবা? এখন কী করতিছ? আমি মাস্টারি ছাইড়ে দিছি অনেক আগে। এখন হোমিওপ্যাথ ডাক্তারি করতিছি। তবে প্র্যাকটিস একেবারে খারাপ না।’ এতদিন পরে মনে হলো, স্যার আমাকে বাংলা, ইংরেজি ও অঙ্কের পাশাপাশি ভূগোলও পড়াতেন। আমার মনে আছে, বীরেন স্যার ভূপ্রকৃতির পরিবর্তন সম্পর্কে বলতেন, ‘স্বপন! এই যে নদী, পাহাড়, বন, সমতল ভূমি সবই বদলায়— তুই কি ব্যাপারটা বুঝতে পারতিছ? লক্ষ বছর ধইরে এই পরিবর্তন। নদী শুকায় যায়, চিরসবুজ বন মরুভূমি হয়। পাহাড় ক্ষয়ে যায়, হাজার বছর ধইরে বাতাসের ঘর্ষণে তার চেহারা বদলায়। পরিবর্তনই জগতের নিয়ম।’ আমার মনে হলো, আমি সেই মহাপরিবর্তনশীল জীবন ও প্রকৃতির মুখোমুখি হয়েছি। পাকিস্তান আমলের শেষ দিকে ঢাকার চলচ্চিত্রে একজন বিদ্যুটে কঙ্কালসার অভিনেতা ছিলেন। তার নাম রবিউল। তিনি অভিনয়ের সময় কান নাড়াতে পারতেন। দর্শকরা খুব আনন্দ পেত তাকে দেখে। আমার মনে হলো, সময়ের বিবর্তনে আমার কৈশোরের উত্তম কুমার বীরেন স্যার আজ অভিনেতা রবিউলে পরিণত হয়েছেন। উত্তম কুমারের চেহারার এতটুকু অবশিষ্ট নেই তার মধ্যে। এতদিন পরে অনুভব করলাম, স্যারের সেই কথাটি কতখানি সত্যি। আর তা হলো, পরিবর্তনই জগতের নিয়ম! জগতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি কথার অন্যতম মনে হলো এই কথাটিকে। আমি যখন এসব বিচিত্র দর্শনের কথা ভাবছি, এখন বীরেন স্যার বলে চলেছেন, ‘স্বপন! তুই এতদিন পরে আসলু। তোর কথা আমি কতবার ভাবিছি। আমার এখন কেউ নাইরে। তোর বউদি স্বর্গে গেছেন। ছেলেমেয়ে দুইজনই কইলকাতায়। আমাক তাদের কাছে থাইকতে বলে। আমি বলিছি, আমার দেশ ছাইড়ে আমি কোথাও যাব না। স্বপন! তুই এতদিন পরে আসলু কেন বাপ? তোর মতো ছাত্র আমি আর পাইনি। এতদিন তুই কোথায় ছিলি? আমার হইছে ডায়াবেটিস, এ আর সাইরবে বইলে মনে হইছে না। কত চিকিৎসা করাইলাম। এতদিন পরে নাটোর আইসে তুই কোথায় উঠিছ?’ আমার শৈশবের উত্তম কুমার আমার দিকে তাকিয়ে অনবরত কথা বলে যাচ্ছেন, যদিও তার চেহারার কিছুই আজ আর অবশিষ্ট নেই। চশমা পরা এক উদ্ভট প্রেতের মতো উত্তম কুমার আমার চোখের সামনে বসে কথা বলছেন।



গল্প

ফাঁদ

সারোয়ার কবীর

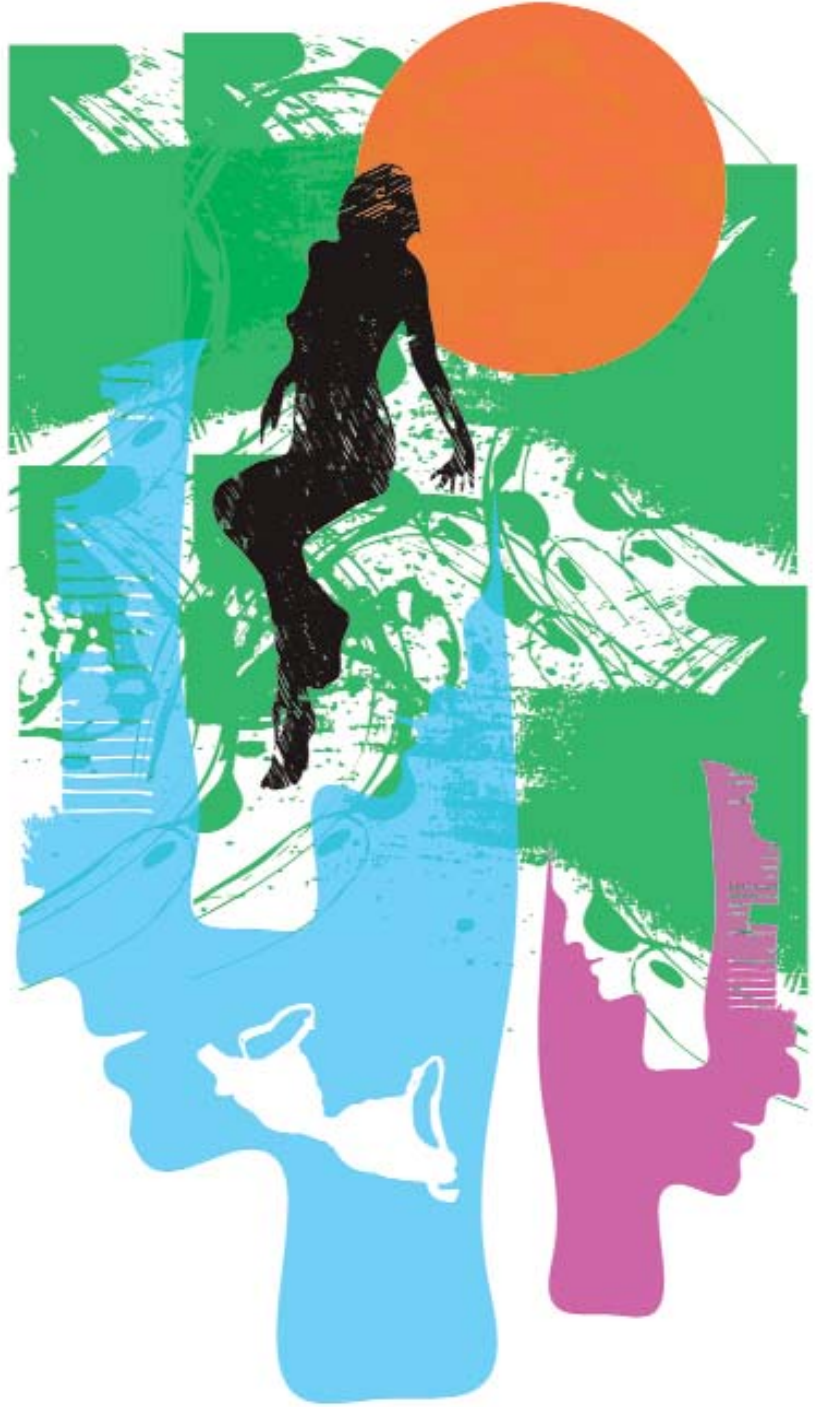
- হ্যালো, কাকে চাচ্ছেন?
 - আপা, আমি মোতালেব। ওই যে, সেদিন মিরপুরে যাওয়ার সময় বাসে আপনার সঙ্গে পরিচয় হলো, আমার বাড়ি বাগেরহাটে, পীর খান জাহান আলী মাজারের কাছেই।
 - হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়ছে। কেমন আছেন ভাই?
 - আপনার দোয়ায় ভালো। ফোন নাম্বার সেদিন স্টোর করে রাখলাম, ভাবলাম, আপাকে একবার ফোন করি।
 - ভালোই করেছেন। আমিও আপনার কথা ভাবছিলাম। ওই যে, আমার ভাইয়ের ব্যাপারটা নিয়ে ...
 - আ-রে, চিন্তা করবেন না। কেএমপির কমিশনার আমার খাতিরের লোক। তাকে দিয়ে ফোন করালেই সোনাডাঙ্গার ওসি ফাইনাল রিপোর্ট দিয়ে দেবে। আপা, আপনি মোটেও চিন্তা করবেন না।

- বুঝলেন ভাই, একেবারে মিথ্যে মামলা। মেয়ের সাথে এক ছেলের লাভ অ্যাফেয়ার্স ছিল, তার হাত ধরে চলে গেছে। এখন কিডন্যাপিং কেসে আমার ভাইকে আসামি করেছে। আমার মা-বাবার বয়স হয়েছে, ছেলের চিন্তায় চিন্তায় কখন যে তাদের কী হয়, আল্লা মালুম।
 - একদম চিন্তা করবেন না আপা। দরকার হলে আমি খুলনায় যাব।
 - সত্যিই যাবেন?
 - আ-রে, যাব না কেন? আপনি যখন আমাকে ভাই ডেকেছেন! জানেন, আমার কোনো বোন নেই। আমরা তিন ভাই।
 - ওমা, তাই?
 - তারপর খুলনা, বুঝলেন তো আমার প্রিয় শহর।
 - সত্যি!
 - মিথ্যা বলতে যাব কেন? গত বছর গিয়েছিলাম।

কী ছিমছাম সুন্দর রাস্তাঘাট, ঢাকার মতো এত জ্যাম নেই সেখানে। কালকের কথাই ধরুন, অফিসের গাড়ি নিয়ে আব্দুল্লাহপুরে ওদিকে কামারপাড়া বলে একটা জায়গা আছে, সেখানে যাই জমি দেখতে। রাস্তায় শুধু জ্যাম আর জ্যাম। এদিকে রামপুরা-বাড্ডা-নতুন বাজার- নন্দা, ওদিকে উত্তরা-আজমপুর। কামারপাড়া থেকে ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা।

- গত বছর আপনি খুলনায় কোথায় গিয়েছিলেন?
- ময়লাপোতা বলে একটা জায়গা আছে না, সেখানে আমার খালাতো বোনের মেয়ের বিয়েতে।
- নিরালার কাছে না জায়গাটা?
- হ্যাঁ।
- জানেন, আমার এক ননদের স্বামী আছে, খুলনার নামই শুনতে পারে না। বলে, খুলনার পানি নাকি তার পেটে সয়না। ওখানে গেলেই রক্ত আমাশা। এটা একটা কথা হলো?

- কি আর করবেন আপা, সব মানুষ তো এক রকম না। আমি হলফ করে বরতে পারি, খুলনা শহরে জন্মাইনি, নাড়ির সম্পর্ক বলতে যা বোঝায় সেটা নেই ঠিকই, কিন্তু খুলনার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা তার চেয়ে কম নয়। আমি যখন হাফপ্যান্ট পরতাম বাবার সাথে প্রথম খুলনা যাই। বাবা এক সময় রাজনীতি করতেন। তার বন্ধু খুলনার গাউস মিয়া ছিলেন যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রী। তার বাসাতেই গিয়েছিলাম। খুলনায় অবশ্য আমার অনেক আত্মীয়-স্বজন, পরিচিতজন আছে। কতবার খুলনায় গেছি কখনো হিসাব করে দেখিনি। ওখানকার মানুষের মন আর আন্তরিকতায় কোনো তুলনা হয়না। বিশেষ করে মেয়েদের। ঘরে কিছু না থাকলে অন্তত পান-সুপারি দিয়ে আপ্যায়ন করতে ভুলবে না। আরেকটা ব্যাপার খেয়াল করেছি, খুলনার মানুষেরা ধর্ম পরায়ণ মুসলমানরা তো বিনা অজুতে জবাই মুরগির মাংস পর্যন্ত ছোঁবে না- তাই না, আপা?
প্রশ্নটা করেই মোতালেব টের পায় টেলিফোনের অপর প্রান্তে সাড়াশব্দ নেই। লাইনটা কেটে গেছে। অফিসের ল্যান্ডফোন থেকে কল করেছে সে। সুমাইয়া আক্তারের নাম্বারটা সেল ফোনের। ইচ্ছে করেই লাইন কেটে দেয়নি তো! অত কথা বলতে যাওয়া ঠিক হয়নি। আবার মনে হলো হয়তো নোটওয়ার্কের গড়মিল। চার্জও ফুরিয়ে যেতে পারে। ফের ওর নাম্বার ডায়াল করে। লাইন পাওয়া গেল না। মাত্র দুদিন আগে বাসে তাদের পরিচয়। মহিলা বেশ খোলামেলা স্বভাবের। বয়স ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ হবে। বড়জোর দুই এক বাচ্চার মা। ফর্সা। দেখতে শুনতে মন্দ নয়। দুইগালে ব্রহ্মের দাগ আছে একটু। কালো ডাগর দুটি চোখ। খুলনার মেয়ে বলেই অতটা আন্তরিক। তাকে ফোন নাম্বার আর নামটা পর্যন্ত দেয়। প্রেসক্রুবার সামনে থেকে বাসে চড়েছিল সে। পেছনের দিকে বাঁ পাশের জানালা ঘেঁষে বসা সুমাইয়ার ডানপাশের সিট ফাঁকা দেখেই বসে পড়ে। শাহবাগ মোড়ের আগে শিশু পার্কের সামনে জ্যামে আটকা পড়া অবস্থায় দুই একটা কথা বলতে বলতে আলাপ ঠিকই জমিয়ে ফেলে। লজ্জা-সঙ্কোচ খেড়ে ফেললে মেয়েদের সঙ্গে ভাব জমানোটা কোনো ব্যাপারই নয়। ল্যান্ডফোনের পাশাপাশি মোতালেব মোবাইলে বারকয়েক চেষ্টা



করে। লাইন না পেয়ে শেষে হাল ছেড়ে দেয়। দুদিন অফিসে কাজের চাপ এত ছিল যে সুমাইয়া আক্তারকে ফোন করার ইচ্ছা থাকলেও উপায় ছিল না। এক ঝামেলা শেষ না হতেই আরেকটা হাজির। পরদিন কাজটাজ মেড়ে বিকেলের দিকে অফিস থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আগে রিল্যাক্স মুডে চা গিলছিল এমন সময় মোবাইল ফোনের রিংটোন। সেটের পর্দায় স্টোর করা সুমাইয়া নামটা জ্বল জ্বল করতে থাকে। রিসিভ করেই মোতালেব বলে-

আপা, কেমন আছেন?

- আর বলবেন না ভাই, সেদিন লাইন কেটে গেল হঠাৎ করে। আমার মোবাইলে তখন চার্জ ফুরিয়ে গেছিল।
- সেটা আমি অনুমান করেছি। কয়েকবার ট্রাই করে আপনাকে পাইনি।
- কাল-পরশু করলে পেতেন।
- কেমনে করি আপা! অফিসে খুব ঝামেলা গেছে। বাসতেও ফিরেছি রাত করে।

- কাজের লোক, ব্যস্ত তো থাকবেনই।
 - আজ অনেকটা ফ্রি। আপনি ফোন না করলেও আমি করতাম। আপা, আপনার পয়সা নষ্ট হচ্ছে। আমি ল্যান্ডফোন থেকে কল দিচ্ছি।
 আপত্তি করে না সুমাইয়া আক্তার। মিনিট খানেকের ভেতর ল্যান্ড ফোনের ডিজিট টিপে কল করতেই লাইন পাওয়া গেল। মোতালেব বলে— এখন খুলনার কথাই বলি। ওখানকার পিকচার প্যালেস সিনেমা হলে আমি জীবনে প্রথম ছবি দেখেছিলাম। উর্দু ফিল্ম। নামটা মনে নেই। নায়কের নামটা অবশ্য মনে আছে— ওয়াহিদ মুরাদ।
 - ওমা, সে তো অনেকদিন আগে, নিশ্চয় সেই পাকিস্তান আমলের কথা! আমার তো তখন জন্মই হয়নি। ভাই, একটা কথা জিজ্ঞেস করবো, আবার মাইন্ড করবেন না তো!
 - মাইন্ড করবো কেন, বলেন কী কথা?
 - আপনার বয়স কত?
 - এই ধরুন ফিফটি পেরিয়ে গেছে।
 - আপনাকে দেখ তো মনে হয়না। একহারা গড়ন তো! আমি তে ভেবেছিলাম চল্লিশ-বিয়াল্লিশ হবে। চুলে কলপ দেন?
 - না। আসলে কী জানেন, মানে আমার ফ্যামিলির লোকেরা বলে আমি নাকি বয়স চোরা হয়েছি, আমার মায়ের মতো। আমার বড় বোনকে দেখে কেউ বিশ্বাস করতে চাইতো মার পেটের মেয়ে। মনে করতো দুজনে বোন।
 - আপনার মা বেঁচে আছেন?
 - নাহ্, মা মারা গেছেন।
 - কিভাবে?
 - স্টোমাক ক্যান্সারে।
 - তাই নাকি! বেচারি তো খুব কষ্ট পেয়ে গেছেন।
 - যাক গে ওসব কথা। খুলনা সম্পর্কে আপনাকে আরেকটা কথা না বললেই নয়, পাকিস্তান আমলের শেষ দিকে আমার চাচাতো ভাইয়ের সঙ্গে আমি খুলনায় গিয়েছিলাম, সার্কিট হাউস ময়দানে শেখ সাহেবের মিটিং শুনতে। ওই প্রথম এবং একবার আমি বঙ্গবন্ধুকে নিজ চোখে দেখেছি। বুঝলেন, একেবারে মঞ্চের কাছে আমরা বসেছিলাম। আমার চাচাতো ভাই তো আওয়ামী লীগের নামকরা কর্মী ছিলেন। সব নেতারা তাকে চিনতো। স্বাধীনতার পর নকশালরা গুলি করে না মারলে আমার সেই ভাই এ্যাডমিনে মিনিস্টার না হলেও এমপি থাকতেন। ওই নকশালরাই শেষ করে দিলো।
 - হ্যাঁ, এক সময় খুলনা-বাগেরহাটে খুব নকশাল ছিল, এখনো কিছু কিছু আছে। আপনি বুঝি ভাই আওয়ামী লীগ করেন?
 - আমি আসলে লীগ-টিগ কিছু করি না। তবে বঙ্গবন্ধুকে শ্রদ্ধা করি। উনি না জন্মালে বাংলাদেশ স্বাধীন হতো কিনা সন্দেহ।
 - না ভাই, আমি রাজনীতি পছন্দ করি না। তাছাড়া আমাদের ফ্যামিলি সবুর খানের সাপোর্টার, বলতে পারেন, অ্যান্টি আওয়ামী লীগ।
 - অসুবিধা নেই। আমরা তো গণতান্ত্রিক সমাজে বসবাস করি। সবাই যে একদল সাপোর্ট করবো এমন কোন শর্ত নেই।
 - থাক ভাই, ওসব রাজনীতি নিয়ে কথা বলতে চাই না। আসল কথাটা বলি, আপনার সম্পর্কে আমি বাবাকে জানিয়েছি। বাবা বললেন, খুলনায় আপনি গেলে আমাদের বাসায় গিয়ে উঠবেন।

- সে যখন যাবো তখন দেখা যাবে।
 ফোনের ভেতর কলিং বেলের আওয়াজ স্পষ্টই শোনা গেল। সুমাইয়া বলে ওঠে— ভাই, কে যেন এসেছে, পরে কথা হবে।
 রিসিভার রেখে মোতালেব চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ায়। দরকারি কাগজপত্র আগেই ভরে রেখেছে ড্রয়ারে। কোন ফাঁকে অফিসের পিয়ন এসে চায়ের খালি কাপ পিরিচ নিয়ে গেছে। অফিসের সহকর্মী রাজ্জাক সাহেব জিজ্ঞেস করে— কী ভাই, এতক্ষণ কার সঙ্গে কথা বললেন?
 - আমার এক আত্মীয়।
 - জবাবটা দিয়ে বাইরের দিকে পা বাড়ায় মোতালেব। মে মাসে দিন বড়। লম্বা বিকেলটা যেন ঝুলে আছে। রাস্তার উল্টাদিকে উঁচু অ্যাপার্টমেন্ট হাউজের গায়ে শেষ বেলার রোদ। ফুরফুরে বাতাস বইছে দেখে গরমটা পাত্তা পাচ্ছে না। হাঁটতে হাঁটতে সুমাইয়ার কথা ভাবে। মহিলার কণ্ঠস্বরে কেমন একটা মাদকতা আছে। তার দেহমানে এক ধরনের অনুভূতি উস্কে দেয়। কোনো মহিলার কণ্ঠে তাকে এমনভাবে চুষকের মতো টেনে ধরার নজির নেই। খুলনার কথা মনে পড়ে। ভৈরব নদে এখন নিশ্চয় জোয়ার বইছে। উজানের দিকে তরতড়িয়ে চলা শ্রোত তাকে পৌঁছে দেয় দৌলতপুরের পতিতা পল্লীতে। একেবারে নদীর পাড় ঘেঁষে ছিল পাড়াটা। এক বন্ধুর পাল্লায় পড়ে সেখানে গিয়ে কৌমার্য বিসর্জন দিয়ে এসেছিল। তবে সুমাইয়াকে বলা যাবে না। প্রথম রমলীর স্বাদ গ্রহণের সেই ঘটনা। অতটা খোলাশ্রমে হওয়া যাবে না। তাকে বাজে লোক বলে ভাবতে পারো। দেখা গেল তার ফোন আর রিসিভই করছে না।
 মাঝখানে একদিন কেটে গেল। সুমাইয়ার ফোনের অপেক্ষায় না থেকে নিজেই কল করে। অন্যান্য কলিগের মতো টিফিন বস্ত্রে বাসা থেকে খাবার এনে লাঞ্চ করার অভ্যাস মোতালেবের কোনকালেই ছিল না। অফিসের আশেপাশে বেশ কয়েকটি ভালো রেস্টুরেন্ট আছে। সেদিকে পা বাড়িয়ে মোবাইল ফোনে কলটা করতেই কদিনেই বেশ পরিচিত হয়ে ওঠা সুমাইয়ার গলা শুনতে পায়- হ্যালা...
 - আমি মোতালেব, কেমন আছেন আপা? খেতে বসেছেন বুঝি!
 - না, না, রান্নাই তো এখনো কমপ্লিট হয়নি। কাজের বিটা আজ দেরি করে এসেছে বলেই এত লেট হচ্ছে।
 - আমি লাঞ্চ করতে বেরিয়েছি আপা, আপনি কোনদিন ফ্রি থাকেন, বলেন তো আমাকে।
 - কেন?
 - আমরা ভালো কোনো জায়গায় গিয়ে লাঞ্চ কিংবা ডিনার করবো।
 - পরিচয় যখন হয়েছে তখন লাঞ্চ বলুন ডিনার বলুন সেটা আমাদের হবে। আর আপনি তো খুলনায় আমাদের বাড়ি যাচ্ছেন। আমার মায়ের রান্না পাপসে মাছের সালুন খেয়ে দেখবেন, জীবনে স্বাদটা ভুলবেন না।
 - তাই নাকি!
 - আমার মা খুব ভালো রান্না করে। আর খুলনার পাপসে মাছের তুলনা হয় না। ইলিশের চেয়ে সুস্বাদু।
 - ঠিকই বলেছেন আপা।

- তা ভাই, আর কোনো কথা আছে?
 - জানেন, কাল রাতে আমি একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছি। খুলনা শহরে আমার প্রিয় জায়গা ছিল, রূপসা নদীর পাড়ে, ওই যে শিপইয়ার্ড এলাকা। ওখানে গিয়ে নদীরপাড় দিয়ে হাঁটছি, এমন সময় দেখি উল্টাদিক থেকে একটা লোক আসছে। কেমন চেনা চেনা লাগছে, পরে বুঝতে পারলাম, এরশাদ সিকদার....
 - সর্বনাশ অমন একটা খুনির দেখা পেলেন আপনি?
 - ওকে দেখে তো আমি অবাক, একবার জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হলো, আপনি এখানে কেন? আপনার তো পাঁচ নম্বর ঘাটে থাকার কথা। বিশ্বাস করেন, ভয়ে প্রশ্টি আর করতে পারলাম না। অমন ভয়ঙ্কর ক্রিমিনাল, মেজাজ বিগড়ে গেলে আমাকে আর আস্ত রাখবে না। আমি তো ভয়ে ঘামতে থাকি। এমন সময় কোনো মসজিদ থেকে ভেসে এলো আজান, আমার ঘুম ভেঙ্গে যায়। বিছানায় শোয়া নিজেকে দেখে বুঝতে পারলাম, আমি স্বপ্ন দেখেছি, বাইরে তখন ফজরের আজান হচ্ছে।
 - ভালো স্বপ্ন দেখেছেন ভাই। এরশাদ সিকদার কিন্তু সাংঘাতিক লোক ছিল। নইলে অতগুলো মানুষ খুন করতে পারে। আমাদের খুলনার বদনাম করে ছেড়েছে লোকটা। তবে জানেন ভাই, আমি না একবার খুলনায় শিববাড়িতে এক বিয়ের অনুষ্ঠানে ওকে আর ওর ছোট বউ শোভাকে দেখেছিলাম। এরশাদ সিকদার দেখতে কিন্তু খুব হ্যান্ডসাম ছিল, দেখে তো মনে হতো ভাজা মাছও উল্টে খেতে জানেন। আর দ্যাখেন, সে কিনা কত বড় ক্রিমিনাল।
 - আপা, এরশাদ সিকদারের মতো অনেক ক্রিমিনালই আছে বাংলাদেশে। ও ব্যাটা বলির পাঁঠা হয়ে গেছে, যাকে বলে ঘটনার শিকার।
 - আপনি ঠিকই বলেছেন, আমি ঢাকার ওল্ড টাউনের এক হাজী সাহেবকে চিনি, ও লোকটা নাকি চার-পাঁচটা মার্ভার করেছে, এবার নিজেদের কথা বলি।
 - ঠিক আছে। আপা, দুলাভাইয়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবেন কবে?
 - কী করে করাই ভাই, উনি তো নেই।
 - মানে?
 - সডিদি আরবে থাকেন। আমিও ছিলাম কয়েক বছর। মরুভূমির দেশ, মোটেই পছন্দ হয় না। তাই চলে এলাম।
 - ভালই করেছেন। তবে খুলনায় থাকলেই তো পারতেন। বাবা-মা, আত্মীয় স্বজন আছে ওখানে?
 - তা কী করে সম্ভব ভাই! ছেলেমেয়ের পড়াশোনা আছে না। আমার ছেলে তো এবার মিরপুর কমার্স কলেজে ভর্তি হয়েছে।
 - বাহ্! খুব ভাল কলেজ ওটা।
 কথটা শেষ হতেই লাইন কেটে যায়। সুমাইয়া কেটে দিয়ে না অন্য ব্যাপার! প্রচন্ড ক্ষিদে পাওয়ায় ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামায় না আর। এতক্ষণ রেস্টুরেন্টের সামনে রাস্তার উল্টোদিকে দাঁড়িয়ে ডানকানে ফোন ঠেকিয়ে কথা বলছিল সে। ক্ষিদে চোটে ফের কল না করে রাস্তা পেরিয়ে রেস্টুরেন্টে ঢুকে পড়ে। বেশির ভাগ-মুখটা ধুয়ে কোণের খালি টেবিলে গিয়ে বসে। খাবারের অর্ডার দেওয়ার পর ঠিক করে অফিসে গিয়ে সুমাইয়াকে

ফোন করবে। পরে অফিসে ফিরে গিয়ে আর সম্ভব হয়নি। বস তাকে ডেকে এমন কাজ গছিয়ে দেয় যে অন্য কিছু চিন্তা করার সুযোগ ছিল না।

পুরো তিনদিন বেশ চাপের ভেতর থাকতে হয় মোতালেবকে। এরপর এলো সুমাইয়ার ফোন- কী খবর, আর যে ফোন করলেন না? ওদিকে গত রাতে বাবা ফোন করে জানতে চেয়েছেন আপনি কবে খুলনা যাচ্ছেন।

- বিশ্বাস করেন আপা, খুব ঝামেলার মধ্যে আছি। একবারও সময় পাইনি আপনার সঙ্গে কথা বলার।

- তা তো বুঝতেই পারছি।

- আপা, আমি একটু ফ্রি হলেই খুলনায় যাওয়ার ব্যাপারটা সেটেল করে ফেলবো। জানেন, আপনি খুলনার কথা বলতেই আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলো ভৈরব নদ, আমি ঘাটে দাঁড়িয়ে আছি, সামনে দিয়ে কলকলিয়ে শ্রোত বয়ে যাচ্ছে ভাটির দিকে....

- থাক ভাই, অত বর্ণনা দিতে হবে না। যে কারণে ফোনটা করলাম, আগামী শুরুর কোনো কাজ হাতে রাখবেন না। আমার বাসায় আপনার দাওয়াত।

- ঠিক আছে আপা, দাওয়াত কবুল করলাম।

আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেও যাবে কি যাবে না তা নিয়ে দোটানায় পড়ে মোতালেব। ভদ্রমহিলা যে জন্য এত খাতির করছে তার কিছুই তো করেনি। অত সময় কোথায়! নিজের ধাক্কায় ব্যস্ত। অফিসে ঝামেলার পর ঝামেলা। তবে সুমাইয়ার প্রতি সত্যিই একটা টান জন্মে গেছে মাত্র কদিনের আলাপে। ওর সঙ্গে ফোনে কথা বলার সময় কেমন একটা অনুভূতি খেলে যায় তার ভেতর। মিথ্যা আশ্বাস দেয়নি সে। খুলনার পুলিশ কমিশনার আসলেই তার পরিচিত। এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর বড় ভাই। উনার বদলির ব্যাপারে একবার সে কম নৌড়ানৌড়ি করেনি। খুলনায় গেলে কাজটা হয়ে যাবে। সুমাইয়ার ছোট ভাইকে নিজের কাজিন বলে চালাবে। খুলনা থেকে একবার ঘুরে এলে মন্দ হয় না। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় অফিস ছাড়ার আগে ফোন করতেই সুমাইয়ার প্রশ্ন- কাল তাহলে আসছেন তো?

- সেজন্যই ফোনটা করলাম।

- আমি কিন্তু বাজার করে রেখেছি। নিউ মার্কেট, কাওরান বাজার, মিরপুর এক নম্বর, তারপর কচুক্ষেত বাজার পর্যন্ত গিয়েছি কোথাও পাপসে মাছ পেলাম না। পেলে আপনাকে ভেজে খাওয়াতাম। ঢাকায় ওই মাছ আসে না। চিংড়ি কিনেছি। আপনার আবার অ্যালার্জি নেই তো?

- না, না, আমার কোনো কিছুতেই অ্যালার্জি নেই।

- তাহলে তো খুব ভালো।

- আপনি নিশ্চিন্তে থাকুন। আমি কাল আসছি।

- মিরপুর এগারো নম্বর তো চেনেন। সি ব্লকে আমার বাসা। পল্লবীতে যাওয়ার সময় রাস্তার ডান পাশে। আপনি এগারো নম্বরে এসে আমাকে কল দেবেন। আমি তখন বলে দিব কীভাবে আমার বাসায় আসবেন।

- আপা, অত চিন্তা করবেন না। এগারো নম্বর সি ব্লক আমার চেনা। ওদিকে বিহারিদের ক্যাম্প আছে না, ক্যাম্পের কাছেই ভাসানী হোটেল। সেখানে কত আড্ডা দিয়েছি।

কথাটা বলেই মোতালেব বুঝতে পারে লাইন কেটে গেছে। ইচ্ছে করে সুমাইয়া লাইন কেটে দেয় কিনা কে বলবে। তবে আজকাল মোবাইল ফোনের নেটওয়ার্ক বড় ডিস্টার্ব দিচ্ছে। আগামীকাল সূর্য পশ্চিমে ওঠলেও মিরপুর যাবে সে। মিরপুরের বদলে খুলনায় যেতে পারলে আরো ভালো হতো। রাতের কোচে টিকিট কাটলেই সাত-সকালে পৌঁছে যেত। আজকাল খুলনায় ভালো ভালো হোটেল হয়েছে। দরকার পড়লে অফিস থেকে কদিনের ছুটি নিয়ে ওখানে বেড়াবে। রূপসা নদীর উপর খান জাহান আলী ব্রিজের মাধ্যমানে দাঁড়িয়ে বুক ভরে শ্বাস নিতো ফুরফুরে বাতাসে। হঠাৎ মনে হলো অস্থির হওয়ার কোনো মানে নেই। কদিন পরেই তো খুলনায় যাচ্ছে। সুমাইয়াকে কথা দিয়েছে। ওকে দেখিয়ে দেবে তদবিরে সে কতটা পারদর্শী।

মিরপুর তার চেনাজানা। ছয় নম্বর সেকশনের বড় মসজিদের উল্টাদিকে টানা দুই বছর কাটিয়ে গেছে। এগারো নম্বরের সি ব্লকে তার মুখস্ত। একবার ভেবেছিল সিএনজি ডাকবে। পরে পল্টন মোড় থেকে বিআরটিসির ডাবল ডেকারে চড়ে সাপ্তাহিক ছুটির দিনের ফাঁকা রাস্তার সুবাদে আধা ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে যায় এগারো নম্বর বাস স্টপেজে। সুমাইয়াকে ফোন করে জেনে নিয়েছে বাসার হোল্ডিং নম্বর। বড় রাস্তা পার হয়ে ছয়তলা ফ্ল্যাট বাড়িটা খুঁজে পেতে অসুবিধা হয়নি কোনো। বাড়িটার কাছাকাছি যেতেই চোখে পড়ে সুমাইয়া। তিন তলার ডানদিকের ব্যালকোনিতে তাকে দেখে হাসিমুখে হাত নাড়ানো। সালোয়ার-কামিজ পরনে। বয়সটা যেন কমে গেছে। কে বলবে কলেজ পড়ুয়া ছেলের মা। সিঁড়ি ভেঙ্গে তিন তলায় উঠতেই সুমাইয়া দরজা খুলে দেয়। একগাল হাসি ঝেড়ে বলে- আসতে কী খুব কষ্ট হয়েছে?

- আরে না, না, শুরুর, রাস্তাঘাট ফাঁকা।

- জুতো জোড়া খুলেই ভেতরে পা রাখে মোতালেব। পাশে দাঁড়িয়ে দরজা বন্ধ করার সময় সুমাইয়ার কোমল বাহুর স্পর্শে একটা শিহরন খেলে যায় তার ভেতর। ড্রইং রুমের নরম সোফায় গা এলিয়ে দিতেই খেয়াল হলো একেবারে খালি হাতে চলে এসেছে- এই যা, আমাকে আবার বেরোতে হবে।

- সুমাইয়া অবাক- ক্যান, কী হয়েছে!

- খালি হাতে চলে এসেছি। আশেপাশে মিষ্টি বা ফলটলের দোকান আছে নিশ্চয়?

- ভাই, যা হওয়ার হয়ে গেছে। আমার ফ্রিজ বোঝাই ফল-মিষ্টি। আর বাইরে যাওয়ার দরকার নেই। আরেকদিন না হয়ে নিয়ে আসবেন। নিজেকে কেমন বেকুবের মতো লাগছে। ফের সোফায় বসলো মোতালেব। বাসাটা কেমন খালি খালি মনে হচ্ছে। সুমাইয়া গেছে কিচেনে। নাকে পোলাওর ঘ্রাণ আসছে। ঘিটা মনে হয় খাঁটি। খুলনার ঘি! হাতেও পারে। তার জন্য মাগলাই খানা হচ্ছে দেখে কিছুটা অবাক না হয়ে পারে না।

কয়েক সপ্তাহ আগেও মহিলাকে চিনতো না। কদিনের ভেতর কেমন আপন করে নিয়েছে। খুলনার মেয়ে তো! একা চুপচাপ ভালো লাগছিল না দেখে মোতালেব গলা একটু চড়িয়ে বলে-

আপনার ছেলে মেয়েরা কোথায়?

- মেয়ে তো গেছে নানাবাড়ি। আর ছেলে গেছে

কোচিংয়ে, সেখান থেকে যাবে মোহাম্মদপুরে বন্ধুর বাসায়।

- মোতালেব মুখে ভাষা হারিয়ে ফেলে। একা তার জন্য এই আয়োজন! সত্যিই সুমাইয়ার মতো এমন আন্তরিক মহিলা কম আছে। কিচেন থেকে ভেসে এলো ওর গলা- ভাই, একা একটা খারাপ লাগছে?

- না, না বেশ আছি।

- টিভিটা অন করতে পারেন। আমার রান্না প্রায় শেষ। আর লতটা যে কী- এত দেরি করছে কেন?

- লতা আবার কে?

- ওহ হো, ওর কথা তো বলাই হয়নি। এলেই দেখতে পাবেন। আমাদের খুলনার মেয়ে।

পাইকগাছায় ওদের বাড়ি। ওর বাবার বিরাট চিংড়ির ঘের আছে।

- তাই নাকি? খুলনায় বেড়াতে গেলে তো চিংড়ি খাওয়া যাবে বেশ।

- শুধু খাবেন কেন, দরকার হলে দুই-তিন কেজি নিয়েও আসবেন। আমি তো আবার চিংড়ি খেতে পারি না।

- অ্যালার্জি?

- সেকথা আর বলবেন না ভাই, তা আপনি খুলনায় কবে যাচ্ছেন?

- এই তো সামনের বৃহস্পতিবার। তাবছি, নাইট কোচে রওনা দেব। শুরুর আর শনিবারটা থাকবো ওখানে।

কেমন একটা খটকা লাগছে মোতালেবের। লতাকে কেন এ সময় ডেকেছে? ওর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবে বলে ব্যাপারটা অন্যরকম লাগছে। একবার সুমাইয়াকে জিজ্ঞেস করার ইচ্ছে জাগে। পরক্ষণে মত পাল্টায়। জিজ্ঞেস করাটা অভদ্রতা হবে। হঠাৎ চাচাতো ভাই নুরুল হককে মনে পড়লো। যার হাত ধরে ছোট ন্যারাগেজ রেলগাড়িতে চড়ে রূপসায় গিয়ে খেয়া পেরিয়ে বঙ্গবন্ধুর সভা শুনতে খুলনা শহরে পা রাখে। একদিন তার কানে কানে চাচাতো ভাই সেদিন বলেছিল- তুই খুলনার লোক সম্পর্কে একটা কথা মনে রাখবি। ওরা তোকে মুরগি জবাই করে খাওয়াবে ঠিকই, আবার বেড়ার আড়ালে ছ্যান ধারিয়ে রাখবে। বুঝেছিস আমার কথা? আর তুই তো ছোট ভাই তোকে আর কী বলবো। তবুও সাবধান করছি, খুলনার মেয়েরা তোকে মামা বলবে ঠিকই, আবার বিছানাতেও নিয়ে তুলবে। সাবধানে থাকিস।

এত বছর পরও চাচাতো ভাইয়ের কথাগুলো স্পষ্টই মনে আছে। তবে ওই সতর্কতার অর্থ মোতালেব কখনো খুঁজে পায়নি। কতবার গেছে খুলনায়। কতজনের সঙ্গে মিশেছে। তার ভেতরে মেয়েরাও আছে। নুরুল হকের কথার কোনো প্রমাণ মিলেনি কোথাও। আর তখনই কলিং বেলটা বেজে ওঠে।

তার মানে লতা এসে গেছে। কিচেন থেকে সুমাইয়া বলে ওঠে- কিছু মনে করবেন না ভাই, দরজাটা দয়া করে খুলে দেন।

- আরে আপা, এর মধ্যে আবার দয়ার কী আছে? কেন অত বিনয় দেখাচ্ছেন?

- এটাই তো খুলনার মেয়েদের দোষ। আমরা বিনয়ী বলেই লোকে আমাদের দুর্বল ভাবে।

কয়েক হাত দূরে দরজাটা। সোফা থেকে উঠে গিয়ে ছিটকিনি খুলে দেয়। পাল্লা সরতেই এক হারা গড়নের লতা। বেশ ফর্সা। মাথা ভরা লম্বা

চুল, মাঝখানে সিঁথি। চোখাচোখি হতেই মোতালেব একপাশে সরে দাঁড়ায়। লতা ভেতরে ঢুকতেই পারফিউমের সুবাসে সারাঘরে ছড়িয়ে পড়ে। কিচেনে সুমাইয়া বলে ওঠে- লতা, তোর এত দেরি কেন? আরো আগে আসতে পারলি না?
- আর বোলো না আপা। শুরুর তোর বাসায় অনেক কাজ জমেছিল।
লতা কিচেনের দিকে এগিয়ে যায়। ওর ঘন কালো লম্বা চুল পিঠি জুড়ে। সুডৌল নিতম্ব। সুমাইয়ার গলা শোনা গেল- চা খাবেন ভাই?
- এ সময় আবার চা বানানোর ঝামেলায় যাবেন?
- অসুবিধা নেই। লতা খুব সুন্দর চা বানাতে পারে। দুধ চিনি চলবে তো?
- হ্যাঁ চলবে। ডায়াবেটিস নেই আমার।
কথাটা শুনে কিচেনে ঢোকানোর আগে লতা ফিরে দাঁড়ায়। হাসি মাখা মুখ। কালো চোখজোড়া আবষ্টি করে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। বেশ মিষ্টি স্বরে বলে- বেশি চিনি দিলে অসুবিধি নেই তো?
- না।
কিচেনে ঢুকে পড়ে লতা। ওর টাইট ফিটিং সিল্ক জাতীয় গোলাপি কামিজের সঙ্গে ত্বকের কোনো পার্থক্য আছে বলে মোতালেবের মনে হলো না। তার মনোভাবটা যেন আঁচ করতে পেরে সুমাইয়া বলে ওঠে- ভাই লতাকে কেমন লাগছে আপনার?

মোতালেবের মুখ ফসকে জবাবটা বেরিয়ে আসে দারুন
- তা তো লাগবেই। একে তো খুলনার মেয়ে, তারপর সুন্দরী। কোথাও এর তুলনা খুঁজে পাবেন না।
কিচেনের আড়াল থেকে লতার গলা শোনা গেল- তুমি যে কী আপা, মুখে কিছু আটকায় না। খিলখিল হাসি একচোট বোড়ে সুমাইয়া বলে- অত লজ্জা কিসের, উনি তো ধরতে গেলে আমাদের ঘরের ছেলে, বাগেরহাটে বাড়ি।
কথাটা শেষ হতেই বেশ উৎসাহ নিয়ে মোতালেব স্বরণ করিয়ে দেয়- এখন কিছু বাগেরহাট আলাদা ডিস্ট্রিক্ট।
- হোক আলাদা, একসময় তো খুলনার অংশ ছিল।
- ঠিক বলেছেন আপনি।
নানা কথাবার্তা চললেও মোতালেবের মনে খটকা দূর হয়না। লতাকে ডেকে এনে এভাবে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার ভেতর কেমন একটা রহস্যের গন্ধ। তার বয়স হয়েছে। সে বিবাহিত সুমাইয়া জানে। যদিও স্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ প্রায় নেই বললেই চলে। আবার ডিভোর্সও হয়নি। রানী থাকে চাঁদপুরে। একমাত্র ছেলে মায়ের সঙ্গেই থাকে। এখন অবশ্য চট্টগ্রামে পড়াশোনা করছে। বেশ আছে মোতালেব। গোপীবাগ থার্ড লেনে এক বন্ধুর বাসায় পেয়িং গেস্ট হয়ে রয়েছে প্রায় চার বছর। ওদিকে তাদের কোম্পানির পূর্ব রামপুরার প্রজেক্টে এক ফ্ল্যাট বুকিং দিয়ে রেখেছে। বেতন থেকে মাসে মাসে কাটা যাচ্ছে টাকা। সুমাইয়া কী তার হালদশা জেনেই লতাকে ডেকেছে। সেটা কী করে সম্ভব! পারফিউমের ঘ্রাণ উল্কে দিয়ে লতা তার সামনে হাজির। হাতের ট্রেতে চায়ের কাপ। টি- টেবিলটা সামনে টেনে আনতেই কিচেনে ব্যস্ত সুমাইয়া বলে ওঠে- রান্নাবান্না প্রায় কমপ্লিট। তাই শুধু চা দিলাম, টা আর দিলাম না।

মোতালেব সাই দেয়- ভালোই করেছেন। আর এ সময়ে চা না দিলে আরো ভালো হতো।
অমনিই তার দিকে চায়ের কাপ বাড়িয়ে লতার প্রশ্ন- খুব চিন্তায় পড়ে গেছেন বুঝি?
খানিকটা চমকে মোতালেব বলে ওঠে- কিসের চিন্তা?
- আপনার মুখ থেকে মনে হচ্ছে। চাটা বোধহয় ক্ষিদে নষ্ট করে দিবে- তাই না!
- আরে না না, দিনে কত কাপ চা খাচ্ছি, সেই হিসাব রাখি? বলতে পারেন এখন চা প্রফ হয়ে গেছি।
- তাই বুঝি! তবে আপনার হাতের রান্না কিন্তু অমনিতেই ক্ষিদে বাড়িয়ে দেয়। পোলাও-মাংসের কী সুন্দর ঘ্রানটা পাচ্ছেন না?
- তা তো হবেই, আপা তো খুলনার মেয়ে। খুলনার মেয়েরা সাধারণত গুণি হয়।
সুমাইয়া যে বেশ গুণী ঘরের পা রেখেই সেটা আঁচ করেছে মোতালেব। তার রান্নার হাতটাও যে চমৎকার ভাইনিং টেবিলে পোলাও-মাংস খেয়ে সেটা টের পায়। রীতিমতো ভুরিভোজ। বেসিনে



হাত ধুয়ে সোফায় বসতেই আলস্য ছড়িয়ে পড়ে সারা শরীরে। আর তা সুমাইয়ার নজরে ধরা পড়ে- ভাই, ডানপাশের বেডরুমে গিয়ে একটু রেস্ট নেন। বিকেলে চা-টা খেয়ে আমরা লতার গান শুনবো। ওর গানের গলা চমৎকার।
লতা তখন খেয়ে দেয়ে কেবল হাত ধুচ্ছে বেসিনে। কথাটা শুনে সুমাইয়ার দিকে ফিরে বলে- তুমি না আপা সত্যিই... শুধু ফ্যাসাদ বাড়াও। কে বলেছে আমি গান গাইতে পারি?
- আরে তুই অত লজ্জা পাচ্ছিস ক্যান! উনি কী আমাদের পর? আমার নতুন ভাই।
হাসিমুখে স্বাভাবিক থাকলেও মোতালেব ভেতরে ভেতরে অবাক না হয়ে পারে না। তাকে এত আদর-আপ্যায়ন করার অর্থটা কেমন ঘোলাটে মনে হয়। সুমাইয়ার ভাইয়ের জন্য খুলনায় পুলিশ

কমিশনারের কাছে তদবির করবে বলেই তাকে এত খাতির-যত্ন! সেটা না হয় বোঝা গেল। কিন্তু লতাকে যেভাবে তার দিকে ঠেলে দিচ্ছে মনে হচ্ছে যেন ঘটকালি। ফের বিয়ে করার বয়সটা কী আছে! তারপর স্ত্রীর সঙ্গে স্যাপারেশন বা অঘোষিত ছাড়াছাড়ি চললেও আর কাউকে বিয়ের করার খবরটা পেলে রানী কী এত সহজে ছেড়ে দেবে!
ওর সন্তানের তো ভবিষ্যৎ বলে কথা আছে। তারপর উকিলের মেয়ে। ওর ভাইরাও একেবারে নিরীহ নয়। প্রকৃত অবস্থাটা জানতে পারলে সুমাইয়া নিশ্চয় লতাকে এতটা ঠেলতো না। যদিও বাসে যখন তাদের পরিচয় তখন কথায় কথায় সুমাইয়া জানতে চেয়েছিল- কোথায় বাসা আপনার? ভাবী কী কিছু করেন? মোতালেব জবাবটা দিয়েছিল- গোপীবাগে থাকি আর আপনার ভাবী চাঁদপুরে আছে, ওখানকার স্কুলের টিচার। কথাটা শোনার পর সুমাইয়া তার দিকে তাকিয়ে যেন কিছু একটা আঁচ করতে চেয়েছিল। আর কিছু জিজ্ঞেস করেনি। এখন তো মনে হচ্ছে রানীর সঙ্গে সম্পর্কটা আলগা হয়ে গেছে সেটা সুমাইয়া ঠিকই ধরতে পেরেছে।
ভুরিভোজের পর সত্যিই আলস্য পেয়ে বসেছে। চোখজোড়াও ভারী ঠেকছে। ড্রইং রুম থেকে বেড রুমে পা রাখে মোতালেব। রুমটা ছোট হলেও পরিপাটি। জানালা ঘেঁষে সেমিডবল বক্সাটা। একপাশে এটাচ বাথরুমের দরজা। তার পেছন পেছন দরজা অবধি আসা সুমাইয়া বলে- কোন রকম আনইজি ফিল করবেন না ভাই, নিজের ঘর মনে করেই রেস্ট নেন।
জুতোজোড়া আগেই খুলে রেখেছিল। পায়ে শুধু মোজা। বিছানায় টান হতেই দরজার কাছে দাঁড়ানো সুমাইয়া একটা মুচকি হাসি উপহার দিয়ে পর্দা টেনে নিজেকে আড়াল করে। সত্যিই অবাক লাগছে মোতালেবের। কয়েকদিন আগেও এই মহি-লার কোনো অস্তিত্ব ছিল না তার কাছে। এমন করে এত সহজে কেউ আপন করে নিতে পারে আগে জানা ছিল না। বিশেষ করে মেয়েদের ব্যাপারে। রানীর সঙ্গে বিয়েটা হয়েছিল ঘটকের মাধ্যমে। বছরের পর বছর সহবাস করলেও সুমাইয়ার মতো এমন আন্তরিক স্ত্রীকে কোনোদিন মনে হয়নি। এখন তো থেকেও নেই। তবে সুমাইয়ার একটা দিক কেমন যেন মনে হচ্ছে। লতাকে ডেকে আনার মানোটা কী! ঠিক ঠাহর করতে পারছে না। ঠিক তখনই দরজা পর্দা সরিয়ে একরাশ পারফিউমের সুবাস চালান দিয়ে ঘরে পা রাখে লতা- একা একা বোর লাগছে?
- আপনি!
- আসতে বারণ নাকি? আপা পাঠালো আপনাকে সেবা নিতে।
- আমাকে সেবা!
- বারে, মনে হচ্ছে আকাশ থেকে পড়লেন? বিছানায় গা এলিয়ে দিয়েছিল মোতালেব। উঠে বসে। লতা একেবারে কাছে এসে ডানহাতটা বাড়িয়ে তার নাকে আলতো চাপ দিয়ে বলে- আহা, দুধের বাচ্চা। যেন ভাজা মাছটাও উল্টে খাতি জানে না।
মোতালেবের মুখে কথা নেই। বিস্ময়ে তার দুচোখ প্রায় ছানাবড়া। লতার শরীর থেকে পারফিউমের ঘ্রাণ বুকুর ধুকপুকু বাড়িয়ে দিচ্ছে। রক্তের

ভেতরও চাঞ্চল্য। একবারে গায়ের সাথে গা লাগিয়ে বসলো লতা। আর তাতেই সঙ্কোচের বাঁধ ভেঙ্গে যায়। লতার বুক উড়না নেই। গোলাপি রঙের টাইটফিটিং কমিজের আড়ালে ব্রার অস্তিত্ব অস্পষ্টভাবে ধরা দেয়। একহারা গড়ন। সরু কোমর। এ যেন মেঘ না চাইতেই বৃষ্টি। কতক্ষণ আর নিজকে সামলে রাখবে! মোতালেব বাঁ-হাতটা ওর সুডৌল বাহুতে রাখতেই লতা বলে ওঠে- প্লিজ, এক মিনিট।

কথাটা বলেই খাট থেকে সরে যায়। দরজাটা বন্ধ করে। তারপর ফিরে দাঁড়িয়ে বলে- আগে ড্রেসটা খুলে ফেলি। আপনিও খুলে ফেলুন। আমরা আজ জন্মদিনের পোশাক পরে এনজয় করবো।

- আমার আপত্তি নেই। তুমি যেমন বলবে তেমনি হবে।

- তাই নাকি সোনা! যদি বলি তিনতলার ব্যালকনি থেকে লাফ দাও। তাই করবেন?

- আমি জানি, অমন প্রস্তাব তুমি কখনো দেবে না। খুলনার মেয়েরা অমন নিষ্ঠুর হতে পারে না।

- ওমা, তাই! খুলনার মেয়েদের দেখি আপনি ভালো করেই চেনেন।

- চিনবো না আবার, আমার বাড়ি তো বাগেরহাটে। আর একটা কথা তামাকে বলবো। লতা ততক্ষণে সিন্ধের কমিজটা খুলে ফেলেছে। সাদা ব্রাটা খুলতেই সুডৌল স্তনজোড়া যেন মুক্তির আশ্বাদ নেয়। তার দিকে মিটিমিটি হেসে জিজ্ঞেস করে- বলেন, কী যেন বলবেন?

- তোমাকে প্রমিজ করতে হবে। কথাটা আর কাউকে বলবে না।

- ঠিক আছে বলবো না। কিন্তু আপনি শার্ট-প্যান্ট খুলছেন না কেন?

- এই খুলছি। প্রথমে শার্ট পরে প্যান্টটা খুলতে খুলতে মোতালেব ফের বলে- আমি না, জীবনে প্রথম নারীর স্বাদ ওই খুলনাতেই নিয়েছিলাম।

- তাই নাকি সোনা! তো কোথায়?

- দৌলতপুরে, একটা পাড়া ছিল সেখানে।

- পাড়া, মানে বেশ্যাবাড়ি! ছিছিছি আপনি এত খারাপ ছিলেন!

কথাটা শোনামাত্রই চুপসে যায় মোতারেব। ক্ষণেক পর তাকিয়ে দেখে পাজামা খসানোর পর লতা একদম উদাম। ওর তলপেট দারুন মসৃণ। তার ফ্যালফ্যাল চাউনিতে লতার ফর্সা কপাল একটু কুচকানো- আন্ডার ওয়্যার আবার রেখেছেন কেন, ওটাও খুলে ফেলুন।

দুজনে সেমি ডবল খাটে একেবারে আদম-হাওয়া। সত্যিই সুমাইয়ার কোনো তুলনা হয়না। লতার মতো মেয়েকে ডেকে এনে এমন সারপ্রাইজ দেবে ভাবতেও পারেনি মোতালেব। যে করেই হোক সুমাইয়ার ভাইয়ের জন্য তদবিরটা করে দিতে হবে। কাল অফিসে গিয়ে পুরো এক সপ্তাহের ছুটির দরখাস্ত দেবে। তার ইএল পাওনা আছে। খুলনায় গিয়ে সদর থানার সামনে পরিচিত হোটেলই উঠবে। হোটেল থেকে সামান্য হেঁটে গেলেই ভৈরব নদ। সেটা ভাবতেই তার শরীর প্রায় মিশে যাওয়া লতার ফর্সা শরীর নদী হয়ে দ্রুত বয়ে যেতে থাকে। বাইরে থেকে হঠাৎ দরজার করাঘাতে দৃশ্যটা ছিন্নছিন্ন হয়ে যায়। লতা দ্রুত তার বাহু মুক্ত হয়ে খাট থেকে নেমে যায়। একটা শেয়ারের উপর রাখা সালোয়ার কমিজ-ব্রা হাতে তুলে দ্রুত বাথরুমের ভেতর ঢুকে পড়ে। দরজায় করাঘাত সমানে চলছে। মোতালেবের মনে হলো সুমাইয়া নয়, অন্য কেউ। কেমন নার্ভাসেস ছড়িয়ে পড়ে তার শিরা-উপশিরায়।

কাঁপা হাতে আন্ডারওয়্যার তুলে কোনরকমে ফাঁকে দুই ঠ্যাং গলিয়ে কোমর পর্যন্ত টেনে আনে। করাঘাতের বদলে দরজায় যেন লাথি। তেড়ে আসে পুরুষ কণ্ঠ-এই দরজা খুলছোস্ না ক্যান, দরজা খোল?

প্যান্টটা হাতে তুলে পরার আর ভরসা পেলনা মোতালেব। যেভাবে লাথি পড়ছে দরজা বোধহয় ভেঙ্গে যাবে যে কোনো মুহূর্তে। সুমাইয়া কোথায়? তার তো কোনো সাড়া শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। প্যান্ট ধরা হাত থরথর কাঁপছে। কী যে করবে ভেবে পাচ্ছে না। তখনই বাথরুমের ভেতর থেকে লতা বলে ওঠে- আপনি পাগল নাকি! দরজা খোলেন। ওরা তো ভেঙ্গে ফেলবে।

মোতালেবের আর ফুলপ্যান্ট পরা হয় না। দরজার দিকে পা বাড়ায়। ছিটকিনি খুলতেই হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ে তিন-চারজন। সাদা পোশাকে ওরা। একজন তো মোতালেবের ডানগালে একটা ঘুষি কষিয়ে বলে- শালা, দরজা খুলতে দেরি করছিলি ক্যান? ঠাপাতে বড় ভাল লাগে তাই!

আরেকজন জিজ্ঞেস করে- মাগীটা কই?

ঘুষি খাওয়া মোতালেবের ডানগালে প্যান্ট চেপে কান্না জড়ানো গলায় জবাব দেয়- বাথরুমে।

জবাব পেয়ে ওকিটকি হাতে হাতে ধরা লোকটা বাথরুমের দিকে ফিরে বলে- এই মাগী বাইরে আয়। তগো আইজ ড্রেস ছাড়াই ফটো খিচু।

কথাটা শোনামাত্রই মোতালেবের অন্তরাআ কঁপে ওঠে। সাহস করে সুমাইয়ার উদ্দেশ্যে গলা ছাড়ে- আপা ও আপা....

তাকে ঘুষি মারা লোকটা আবার তেড়ে আসে- এই ব্যাটা চুপ কর। শালা ঘুঘু দ্যাখছে, ফাঁদ দ্যাখো নাই। এবার ফাঁদ দেখবা!

খালি গায়ে শ্রেফ আন্ডারওয়্যার পরা মোতালেবের মনে হলো ফাঁদ নয় যেন সরিষার ফুল দেখাচ্ছে। এমন অসহায় নিজকে লাগেনি আর কখনো।





গল্প

সৈকতে দুজনে

মঈনুদ্দিন কাজল

সমুদ্রসৈকতে বসে গল্প করছে অনীক ও বৃষ্টি।
এখানকার বিশাল আকৃতির রঙিন ছাতার নিচে
ভালোই লাগছে ওদের। পর্যটকদের জন্য
সারিবদ্ধভাবে সাজানো রংবেরঙের ছাতাঘেরা
এলাকাটুকু পর্যটনবান্ধব একটি সংস্থা
ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে থেকে পর্যটকদের কাছে
ভাড়া দিচ্ছে। অনীক ও বৃষ্টি দুই ঘণ্টার জন্য
ভাড়া নিয়ে একটি ছাতার নিচে বৈষ্ণবে বসে
গল্পে মেতেছে। ওদের গল্পের যেন শেষ নেই।
সামনে দৃষ্টি মেলে দিলে দেখা যায় সৈকতের
জলকেলি। অসংখ্য নারী-পুরুষ, ছেলেমেয়ে
সমুদ্রের জলে খেলছে। কেউ ক্যামেরাবন্দি করছে
আনন্দঘন মুহূর্তগুলোকে। কি বৃদ্ধ, কি কিশোর-
কিশোরী, কি যুবক-যুবতী সবাই সমুদ্রসৈকতের
নোনা জলে দাপটের সঙ্গে হৈছলোড়ি করে
সমুদ্রের বিশালতায় সব রুগ্নিকে যেন বিলীন

করার শপথ নিয়েছে। সমুদ্রের বালুকায় ভাড়া
করা ঘোড়ার ওপর বসে রাজকীয় ভঙ্গিমায় ছুটে
চলেছে অনেকে। কেউবা ব্যস্ত বিনুক কুড়াতে।
সমুদ্রের নোনা জলে প্রেমিক-প্রেমিকা,
নবদম্পতিরা হাস্যোজ্জ্বল আনন্দে যুগলবন্দি হয়ে
সমুদ্রশ্রোণে মগ্ন।
অনীক ও বৃষ্টি জলে না নেমেই এসব দৃশ্য
উপভোগ করছে। অনীক বৃষ্টির দিকে তাকিয়ে
বলে, চল যাই।
কোথায়?
ওখানে।
ওখানে কোথায়?
সবার সঙ্গে সমুদ্রের জলে ভিজব।
আমি রাজি।
সত্যি?
সত্যি, আমি তো সমুদ্রের জলে ভিজতেই এসেছি।

তবে চল।

চল।

অনীক বৃষ্টির হাত ধরে সমুদ্রের জলের দিকে এগিয়ে যায়।

একি করছ বৃষ্টি?

ঠিক করছি। জলে ভিজিয়ে দেব তোমায়।

অত জল ছিটিও না, চোখে লাগে।

লাগুক। আজ কাদাজলে ভেজাব তোমায়।

কাদাজল কোথায় পেলে, এখানে সব বালুকাময়।

তাহলে বালুজলেই ভেজাব।

ছাড় ছাড়, আমি নিজে নিজেই ডুবতে পারি, ভিজতে পারি।

তোমায় একা ডুবতে দেব না আমি।

কেন?

ভয় করে, যদি সত্যি সত্যি ডুবে যাও।

ডুবব না, আমি সাঁতার জানি।

সাঁতার জানা বহুলোক সমুদ্রে ডুবে মরেছে।

তা ঠিক, তবে তা কল্পবাজারে ঘটেছে অনেক।

এখানে ঘটেনি, এটা কুয়াকাটা। এখানে সমুদ্র

অনেক শান্ত তেমন চেউ নেই। নেই সমুদ্রের

উত্তাল গর্জন।

তবু আমার ভয় করে, বৃষ্টি বলল।

ভয় নেই, আমাকে শক্ত করে ধরে রাখ।

আমি তো তোমাকে ধরেই আছি।

অনীক ও বৃষ্টি মুখোমুখি দুজন দুজনাকে জড়িয়ে

ধরে কুয়াকাটার সমুদ্রের নোনা জলে ডুবের পর

ডুব দিয়ে আনন্দের স্রোতে মিশে যায়।

সূর্য দুপুরের তীব্রতা ছড়ালেও শীতের শুরুতে

সূর্যতাপ মিষ্টি মনে হয়। সমুদ্রস্নান শেষে অনীক ও

বৃষ্টি সি প্যালাসে চলে আসে। দুপুরে খাবারের

সময় হলেও মিষ্টি পানিতে আবার গোসল না

করে খাওয়া ঠিক হবে না। তাই বৃষ্টি ও অনীক

মিষ্টি পানিতে স্নান সেরে দুপুরের খাওয়া শেষে

বিলম্ব না করে ড্রেস পাল্টাতে থাকে। সবুজ রং

শাড়ি পরেছে বৃষ্টি। নিজের শাড়ির সঙ্গে ম্যাচিং

করে একটি সবুজ রঙের শার্ট বের করে অনীককে

পরতে দেয় বৃষ্টি।

তাড়াতাড়ি পরে নাও সৈকতে যেতে হবে, বৃষ্টি

বলল।

পরে গেলে হয় না? এখন ঘুমাব।

না, ঘুমাতে হবে না, সমুদ্রে সূর্য ডোবার দৃশ্য

দেখব।

দেখতেই হবে।

অবশ্যই। শুনছি সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের দৃশ্য

দেখার জন্যই পর্যটকরা কুয়াকাটায় আসে।

তা তো জানি।

জানই যখন তবে ঘুমাতে চাইছ কেন?

ইচ্ছা করে আমার জান, তোমাকে দেখলাম।

কী দেখলে?

তোমাকে সবুজ রঙের শাড়িতে ভালোই

লাগছে... বলেই অনীক বৃষ্টির কাছাকাছি গিয়ে

চুলের ড্রাগ নিয়ে বলে, অপূর্ব! আরো কাছে

যেতেই একটু সরে গিয়ে বৃষ্টি মুচকি হেসে বলে,

এখন না...

সি প্যালাস থেকে বেরিয়ে অনীক ও বৃষ্টি

সমুদ্রতীরের অনেক দূর এলাকা ধীর পায়ে হাঁটতে

থাকে। অদূরে তীরবর্তী একটি এলাকায় বড় বড়

পাথরের চর জেগে উঠেছে। সেখানে বড় দুটি

পাথরে বসে সূর্য ডোবার দৃশ্য দেখার জন্য

পশ্চিমে তাকিয়ে গল্প জুড়ে দেয় ওরা। সূর্য ডুবতে

এখনো অনেকটা সময় বাকি। লাল আভা ধারণ

করে সূর্য আকৃতিতে যেন বড় হয়ে পশ্চিমে হেলে

পড়েছে। লাল রং ছড়িয়ে দিয়েছে চারদিকে। সেই

লাল রং ছুঁয়েছে অনীক ও বৃষ্টির মুখমণ্ডল। ওদের

সবুজ জামা ও শাড়ির সঙ্গে লাল সূর্য ওদের যেন

বাংলাদেশের পতাকার রঙে সাজিয়ে দিয়েছে।

দেখ... দেখ... কী সুন্দর লাল সূর্য।

দেখোছি। রক্তিম সূর্যের লাল আলো তোমার সবুজ

শাড়িতে ছোঁয়া লেগেছে, তোমাকে করেছে

সুন্দর।

সত্যি?

সত্যি এক অপূর্ব আবেশ ও আমেজ উপভোগ

করছি।

আমিও। দেখ অনীক! পশ্চিমের আকাশটা

পুরোপুরি লাল হয়ে গেছে।

তাই তো! তোমার কি মনে আছে বৃষ্টি,

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষা সফরে আমরা পতেঙ্গা

সমুদ্রসৈকতে এমনই এক সূর্য ডোবার দৃশ্য

দেখেছিলাম।

খুব মনে আছে, আমাদের বিয়ের দুই বছর আগে

তুমি আর আমি পতেঙ্গার বিশাল আকৃতির পাথরে

বসে কত স্বপ্নের সূতা বুনেছি। দেখতে দেখতে

আঠারোটি বছর আমাদের জীবন থেকে চলে গেছে

তাই না অনীক। পরিবর্তনশীল সমাজে মানুষ

কেমন বদলে গেছে অথচ সূর্যটি তেমনই আছে।

সূর্য যেমন আছে তোমার আমার বন্ধুত্বও তেমন

আছে বৃষ্টি। কলেজসঙ্গিনী থেকে আজ আমরা

জীবনসঙ্গিনী।

কলেজজীবন, বিশ্ববিদ্যালয়জীবন, কর্মজীবন,

সংসারজীবন আমাদের এক সুতায় গাঁথা তাই না

অনীক?

ঠিক তাই, কলেজজীবনে বন্ধুত্ব, বিশ্ববিদ্যালয়ে

ভালোবাসা, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করে একটি

ওষুধ কোম্পানিতে একসঙ্গে কর্মজীবন শুরু

তারপর বিয়ে। সময়ের পরিক্রমায় মানুষ বদলায়,

খায়ে যায় রূপ, যৌবন। সূর্যের মতো ডুবে যেতে

হয় একদিন, তবে পার্থক্য সূর্য আবার জেগে

ওঠে, ফিরে আসে। মানুষ আর ফিরে আসে না।

বিকালের সোনা রোদ যত নরম কোমল হয়ে

সমুদ্রসৈকতে আলোকরশ্মি ছড়িয়ে দিতে থাকে,

ততই সূর্য ডোবার দৃশ্য দেখতে পর্যটকের ভিড়

বাড়তে থাকে। নির্জনতার দেয়াল ভেঙে কোলাহল

অনীক ও বৃষ্টির একান্তে আলাপচারিতায় বিঘ্ন

ঘটায়। ওরা দেখতে পায় সৈকতের চারদিকে

জড়ো হতে থাকে অনেক পরিবার। ছোট ছোট

ছেলেমেয়েরা দৌড়াদৌড়ি, হৈছল্লোড়, আনন্দ-

উল্লাসে একাকার। গভীর মনোযোগে বৃষ্টি ও

অনীক ছোট ছেলেমেয়েদের খেলার দৃশ্য দেখতে

থাকে। কোমলমতি বাচ্চাদের হৈছল্লোড়, চৈচামেচি

ওদের ভালোই লাগে। একপর্যায়ে সাত-আট

বছরের একটি ফুটফুটে সুন্দর মেয়ে ওদের কাছে

এসে বলে, তোমরা এখানে বসে আছ কেন!

তোমরা খেলবে না?

আমরা গল্প করছি, অনীক বলল।

কিসের গল্প?

রাজপুত্র, রাজকন্যার গল্প।

আমি শুনব।

তুমি শুনবে?

হ্যাঁ।

তোমার নাম কী মামগি? বৃষ্টি জানতে চাইল।

আমার নাম... আলো।

আলো... খুব মিষ্টি নাম।

তোমরা কয় ভাইবোন।

আমার কোনো ভাইবোন নাই।

তাই! তুমি বাবা-মার একমাত্র নয়নের আলো?

জি...। বলেই মেয়েটি এক দৌড়ে ছুটে চলে যায়

সৈকতে দাঁড়ানো ওর বাবা-মার কাছে।

অনীক ও বৃষ্টির বুকটা যেন হাহাকার করে ওঠে।

আলোর স্পর্শে ওরা যেন কিছুটা সময়ের জন্য

আলোকিত হয়ে পড়েছিল। মুহূর্তে সেই আলো

চলে যাওয়ায় ওদের মাঝে যেন নেমে আসে

আলোহীন অন্ধকার। কিছুটা সময় ওরা চূপ করে

বসে থাকে। মুখে কোনো কথা নেই। কী যেন

ভাবনা, কী যেন হতাশা, কী যেন অতৃপ্তি ওদের

ওপর ভর করে বসেছে। অব্যক্ত অন্তর্জালায় পুড়েছে

ওরা। দুজনই মনে মনে ভাবতে থাকে যদি

আলোর মতো একটি ফুটফুটে সন্তান ওদের

জীবনকে আলোকিত করত। তবে ওদের জীবন

হতো পরিপূর্ণ। সুখ আর আনন্দে ভরে যেত

ওদের সংসার। জীবনটা হতো রঙিন। সন্তান না

থাকার অব্যক্ত বেদনা থেকে মুক্তি পেত ওরা।

অনীক ও বৃষ্টি দুজনই একজন অন্যজনের অন্তরের

ভাষা অন্তর দিয়ে বুঝতে পারে, জানতে পারে।

দুজনই অন্তরের জটিল ভাষাগুলো উপলব্ধি করে।

ঘোলাটা বছর সন্তান না পাওয়ার গভীর একটা

কষ্ট, একটা বেদনা দুজনকেই গ্রাস করছে

প্রতিনিয়ত। সন্তান না পাওয়ার কষ্ট ভেতরে

ভেতরে রক্তক্ষরণের খরস্রোতা নদীর মতো

প্রবাহিত হয় ওদের জীবনে। দিনের পর দিন,

মাসের পর মাস, বছরের পর বছর এ যন্ত্রণায়

হটফট করে সারাক্ষণ। ঘুণ পোকার মতো কুরে

কুরে খাচ্ছে ওদের বুকুর ভেতরটা। নিবিড় মমতা

ও স্নেহের পরশ দিয়ে সন্তানের সঙ্গে খেলা করতে,

ঘুরতে, আদর করতে প্রবল ইচ্ছা করে ওদের।

ওরা অবিরত অনুভব করে সন্তান না থাকার

শূন্যতা, যা ওদের কর্মস্পৃহা ও ভবিষ্যৎ চিন্তা

বিকল করে দিচ্ছে প্রতিনিয়ত।

শূন্যতার মাঝে কোনো মানুষ তার নিজের অস্তিত্ব

অনুভব করতে পারে না। শুধু নিজের অস্তিত্ব নয়,

একজন মানুষের আচার-আচরণ, কর্মস্পৃহা,

কর্মপদ্ধতি সব কিছুই নিয়ন্ত্রিত হয় তার চারদিকের

বিরাজমান সামাজিক পারিবারিক পরিবেশ ও

পরিস্থিতি দিয়ে। অনীক ও বৃষ্টিও এর বাইরে নয়।

তাই তো একটি সন্তানের জন্য হাহাকার করে

ওঠে ওদের বুকুর ভেতরটা। সন্তান না থাকার

কষ্টের আগুন জ্বলতে জ্বলতে ওরা হাঁপিয়ে

উঠেছে। আর কোনো কষ্ট বহন করার মতো

শক্তি নেই ওদের। জীবনের জটিল ধাঁধায় বিপর্যস্ত

মানসিক অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পেতে ওরা ছুটে

আসে কুয়াকাটার সমুদ্রসৈকতে। সুখ-দুঃখের

জোয়ার-ভাটায় অনীক ও বৃষ্টির দিন ভেসে চলে

সমুদ্রের বিশালতায়। অন্তিমিত সূর্য যেন ধীরে ধীরে

ডুবে যাচ্ছে সমুদ্রগর্ভে। অন্ধকার ধেয়ে আসছে

সৈকতজুড়ে। পর্যটকরা চলে যাচ্ছে। পাখিরা

ফিরছে নীড়ে। শুধু ওরা দুজনে নিঃশব্দে বসে

থাকে আলোর সন্ধানে।



গল্প

মানবী

কাজী লাবণ্য

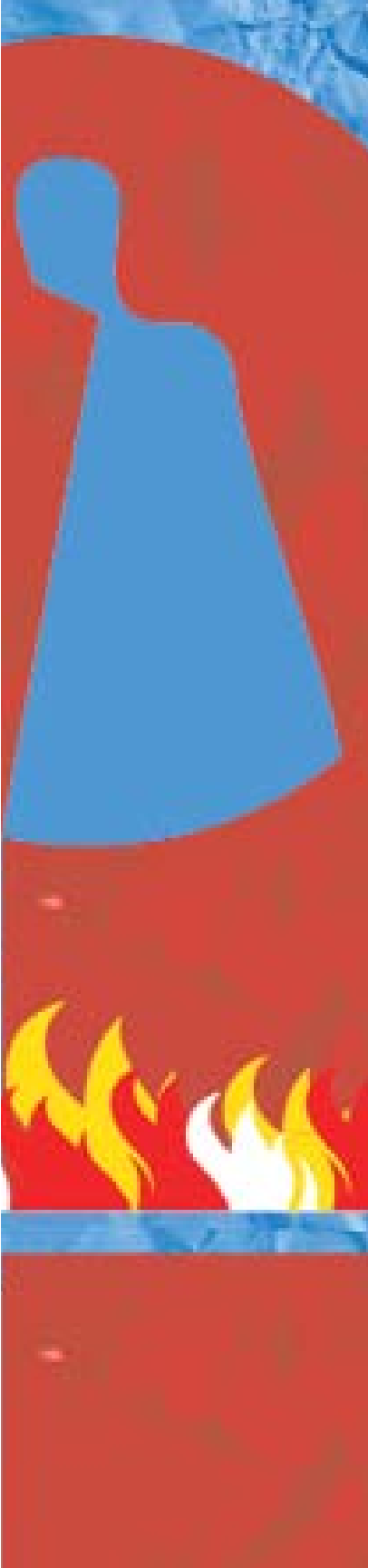
সুমিতা দেবী পুত্রবধূ নন্দিনীর কাঁধে আলতো হাত ছুয়ে- কিছুটা অনুরোধের সুরেই বললেন, যাও মা পরণের শাড়িখানা ছেড়ে পরিকার গরদখানা পরে এসো। নন্দিনি নত মুখে স্বামী-শুশুরের সামনে দিয়ে চলে গেল নিজের ঘরে শাড়ি পাল্টাতে। সব আয়োজন সম্পন্ন। সব লাইট অফ করে বাড়ি অন্ধকার করে রাখা হয়েছে। এরপরও পাশের হাইরাইজ বিল্ডিংয়ের প্রতি ফ্লোরের কোণে কোণে লাগানো উজ্জ্বল এনার্জি লাইটের আলোক আভাষ এক চিলতে উঠোন প্রায় পরিকার দেখা যায়। বারান্দার ইজিচেয়ারে বসে আছেন এই বাড়ির কর্তা পরান বন্দ্যোপাধ্যায়, কিছু দূরে আরেকটা চেয়ারে বসে তার ছেলে সুমিত ব্যানার্জি, মেয়ে সুনীতি বারান্দায় পিলারে একবার হেলান দিয়ে, একবার সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে, আবার হাত দিয়ে পিলারটা জড়িয়ে ধরে অস্থির অঞ্চল হয়ে সবার মুখের দিকে

তাকিয়ে, আবার উদাস হয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে।

একটি মোড়ায় বসে আছেন পুথুলা সুমিতা দেবী। মনে মনে মাকে ডাকছেন- মা, উদ্ধার করো তোমার নামে পূজো দেব, উপোস দেব, তবু সংসারের এই বিপদ থেকে উদ্ধার করো মা। পুরো ব্যাপারটা উনি নিজে পছন্দ করছেন না, আবার বদরাগী স্বামীর মতের বিপক্ষে কিছু বলার সাহসও পাচ্ছেন না।

বারান্দার খুব কাছেই ছোট্ট একটি তুলসি মঞ্চ। তুলসি গাছের গোড়াটি নিচের অংশে ইটের গাঁথনির ওপর গ্রিল দিয়ে ঘেরা এবং গ্রিলের মাথাগুলো বেশ চোখা চোখা।

একচিলতে উঠোন, বারান্দা ঘিরে যেন একটা আলো-আঁধারি, একটা ভৌতিক পরিবেশ। তুলসি মঞ্চের কাছেই একটি লৌহ পাত্রে কাঠকয়লার আগুন, কিছু কাঠের টুকরো জ্বলে জ্বলে গলগলে অঙ্গার রূপ



নিয়চ্ছে, আর কিছু কাঠ খিকি খিকি জ্বলছে অঙ্গার হবার অপেক্ষায়। অঙ্গার যেন গণগণে থাকে যে জন্য মাঝে মাঝেই সুন্দর করে ছোট ছোট টুকরো করে রাখা কাঠগুলি আগুনের মাঝে ফেলে দিচ্ছেন, বাড়ির কর্তা পরান বন্দোপাধ্যায়।

রাগে, কষ্টে এবং এক ধরনের ভয়ে কলেজছাত্রী সুনীতির খুব অস্থির লাগছে। ওর মনে মনে খুব ইচ্ছে করছে, এক লাখি মেরে আগুনের পাত্রটা উল্টে দিয়ে, এখান থেকে চলে যেতে। কিন্তু বাবার ভয়ে তা করার সাহস নেই। ওর বুকের ভেতরটা টিপ টিপ করছে। ও খুব পরিশ্রমভাবে জানে, একটা অনুচিত, বর্বর, অন্যায্য কাজ হতে যাচ্ছে। তাই ও ওর দাদাকে বলেছিল-

- দাদা এ অমানুষিক কাজ যেভাবেই হোক বন্ধ কর, এসব আদিম যুগের বর্বর কাজ করা ঠিক নয়। আধুনিক যুগে এসব কেউ করে, কেউ মানে? আশ্চর্য!

ওর দাদা উত্তরে নিরুত্তাপ কণ্ঠে বলেছে-

- তুই ছোট মানুষ চুপ করে থাক, বড়রা যা করেন তা জেনে বুঝে ভালোর জন্য করেন, মঙ্গলের জন্য করেন। কাজেই কষ্ট হলেও তা মেনে নেয়াই আমাদের উচিত, বাবা-মার শিক্ষান্ত মানাই আমাদের ধর্ম। এতে ভগবান প্রসন্ন থাকেন, মঙ্গল করেন। দাদার নিরুত্তাপ কণ্ঠ ও এমন উত্তরে রাগে প্রায় উন্মাদ হয়ে যায় সুনীতি, নিষ্ফল ক্রোধে সে ছটফট করতে থাকে। এমন নিষ্ঠুর কাজে ভগবান কি মঙ্গল করবেন, প্রিয় বৌদিকে অপমান করা, বৌদির হাতে ঘা হওয়া ছাড়া কি মঙ্গল আছে, তা কিছুতেই বুঝে উঠতে না পেরে সুনীতি রাগে এক রকম মুখ ঝামটা দিয়ে পা দপদপিয়ে দাদার সামনে থেকে চলে যায়। নিজের ঘরে শুয়ে শুয়ে ভাবে, কিভাবে এসব মোস্ট ফালতু কাজ বন্ধ করা যায়। আজকাল টিভি, পত্র-পত্রিকায় নারী নির্ধাতনের কথা ফলাও করে বলা হয়, মাঝে মাঝে ঘোষণা করা হয়, নারী নির্ধাতন, বাল্যবিবাহ, বা এ ধরনের অপরাধমূলক কাজ দেখলে এই এই নাম্বারে ফোন করুন- সেখানে কিছু নাম্বার দেয়া থাকে। কিন্তু এখন তো সেগুলি কিছুতেই মনে পড়ছে না। সুনীতি কি কোনো দিন ভেবেছিল, যে ওই নাম্বারগুলি কখনো প্রয়োজনে আসতে পারে। আচ্ছা এই ব্যাপারটি কি নারী নির্ধাতনের পর্যায়ে পড়ে? সুনীতি ঠিক জানে না, তবে এটি যাই হোক অত্যন্ত অন্যায্য তা নিশ্চিত জানে সুনীতি।

আচ্ছা, সুনীতির কি উচিত এই কথাগুলি ওর বন্ধুদের বলা- ওরে বাবা, বাবা তাহলে পাশের বাসার ফাতেমাদের গরু কোরবানির ইয়া বড় ছুরি দিয়ে সুনীতিকে জবাই করে ফেলবে। স্লিফ, পবিত্র, লাল পেড়ে গরদ শাড়িতে যেন মা দুর্গার মতো এক রূপ নিয়ে নন্দিনি এসে দাঁড়ায় তুলসি মঞ্চের পাশে। এখন ওর শিশুর এক টুকরো রক্তিম কয়লা নন্দিনির হাতে দিলে, সেটি মুঠোয় নিয়ে নন্দিনি গোল তুলসি মঞ্চ প্রদক্ষিণ করে প্রমাণ দিবে সে সত্যী। সত্যীত্ব প্রমাণের অভিনব আয়োজন। নন্দিনি প্রস্তুত। সে অতি শান্তভাবে গভীর দৃঢ়তার সাথে এসে দাঁড়ায়। দুচোখ বন্ধ করে, বুক ভরে বাতাস টেনে নিয়ে মনঃসংযোগ স্থাপন করে। হ্যাঁ, এদের এই অদ্ভুত প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে সে যাবে, এদের ব্যবস্থামত এই পরীক্ষা সে দিবে। যদিও সে নিজে এসবের কিছুই মানে না, বিশ্বাস করে না। তাতে কি! দেখাই যাক না এরা কতদূর যেতে পারে,

বাকিটা তো নন্দিনির হাতে রইলই। অঙ্গার হাতে নেয়ার জন্য যেই সে হাত বাড়াতে যায়...

- ছুটকি! ছুটকি!

কার কণ্ঠ! কে ডাকে এই নামে! মা! এখানে মা এলো কোথেকে! মা কিভাবে আসবে!

মাতো ইলেকট্রিক চুল্লিতে নাই হয়ে গেছেন সেই কবে, মা এখানে এই পাঁঠাবলীর মঞ্চে আসবে কিভাবে? মানুষের আত্মা বলে যদি কিছু থেকেও থাকে, সে আত্মা কি রাতের আকাশের ছুটে যাওয়া তারা হয়ে বা অন্য কিছু হয়ে আমার কাছে এসেছে! নাকি ভয়াবহ পরিস্থিতিতে আমার দিশাহারা ব্রেইন মায়ের কণ্ঠস্বর তৈরি করেছে!

-ছুটকি, তুই ওটা হাতে নিস না। না ছুটকি, তোকে কোনো কিছুর প্রমাণ দিতে হবে না। আমি তোকে বিয়ের আগে বলেছিলাম, কখনো কোন অবস্থাতেই স্বামীর ঘরের চৌকাঠ ডিঙ্গাবি না, মানসম্মান, সমাজের কথা ভাববি, সে কথা আমি তুলে নিচ্ছি মা। তুই এ কাজ করিস না, কোন অবস্থাতেই না। কার ওপর তোর এত অভিমান মা! কার উপর! মা হয়ে আমি তোর কাছে ক্ষমা চাইছি, তুই এ কাজ করিস নারে মা ... করিস না ওটা হাতে নিস না ...

হঠাৎ যেন একটা দমকা হাওয়া দিল। এতক্ষণ বাতাসের অস্তিত্বও টের পাওয়া যাচ্ছিল না। প্রচণ্ড ধার্মিক, ইংরেজিতে সুপার, কড়া হেড মাস্টার মশাই একটি চিমটাতে এক খণ্ড আগুন নিয়ে অপেক্ষমান, আদরের পুত্রবধূর হাতে তুলে দিবেন বলে- বেশ গরম পড়েছে। ঘামে নন্দিনির মুখ, গলা, ব্লাউজ ভিজে গেছে। দমকা বাতাসের সাথে মায়ের কণ্ঠস্বর কোথায় যেন মিলিয়ে গেল। মায়ের কণ্ঠস্বর কি বলল, অভিমান! কার ওপর নন্দিনির অভিমান! মৃত্যু মা! বাবা! দাদা! এদের ওপর কি অভিমান করা যায়! নাকি অভিমান আসে! তবে কি পরমপতি সুমিত! আহ বিবমিষা! তাহলে কি নন্দিনির আকাশের সব অভিমানী মেঘ ধোঁয়ে যায় রাজের দিকে!

নন্দিনি একটু দম নেয়া। জল তেষ্ঠায় গলা-বুক যেন একেবারে চৈত্রের দুপুর। চাইলেই জল পাওয়া যায়, কিন্তু জল চাইবে না নন্দিনি, জলের বদলে সে হাত পাতল, এবার সে ওই জ্বলন্ত অঙ্গার হাতে নেবে, নিয়ে তুলসি বেদী ঘুরে এলেই প্রমাণিত হবে সে সত্যী। কি প্রমাণিত হবে, না হবে তাতে আদো আগ্রহ নেই নন্দিনির, কিন্তু এরপরও সে এই অবাস্তব কুপমণ্ডিকতার ভেতর দিয়ে যাবে। ওর স্বামী সুমিত সব জেনে চুপ করেই থাকল, একটি টু শব্দও করল না। নিজের সব অস্তিত্বের বিশ্বাস যার কাছে জমা রেখে নিজের ২৫ বছরের সব ছেঁড়ে ছুঁড়ে যার বুকে পরম নির্ভরতায় নিজেকে সঁপে দিয়েছিল, এখানে এই বলীদানে তার কোন ভূমিকা নাই! হায়রে স্বামী! আশ্চর্য্য! ভীষণ আশ্চর্য্য!

গেল সপ্তাহে বরের সাথে ঝগড়া শেষে রাগ করে সে বাসার বাইরে ছিল তিন দিন। “চিড়া নয়, মুড়ি নয়, একেবারে ভাত, এ যে অল্প পাপ”। সে রকম এটা কোন ছোটখাট অপরাধ নয়, বাড়ির বাইরে তিন দিন কাটানো তাও আবার একা ‘মেয়েমানুষ’। কাজেই হেড মাস্টার মশাইয়ের মতো নীতিপরায়ণ মানুষের বাড়িতে সত্যীত্বের প্রমাণ দিতেই এই অভিনব অগ্নি পরীক্ষার আয়োজন। অগ্নি স্নানে সৃষ্টি হোক বংশভিটা। “ওম জবা কুসুমসঙ্কাশ কাশ্যপেয় ... নিত্যদিন ছাত্র ঠাপানো ঠনঠনে কণ্ঠের এই উচ্চারণ- সূর্য ভোরে নিত্য নিত্য ডানা মেলে আকাশে- ডানা মেলে, কিন্তু

ওড়ে কি? নাকি মেঘ বাতাসে ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসে এসব ভণ্ড মানুষের আত্মকড়ে।
দাঁতে দাঁত চেপে, সমস্ত শরীরকে স্থির করে, সব ইন্দ্রিয়কে সুদৃঢ় করে সে হাত বাড়ালো-নন্দিনি অপেক্ষা করছে, এক্ষণি তার নরম তালুতে টকটকে লাল টুকরোটা পড়বে ...

ভয়ে নন্দিনি চোখ বন্ধ করে ফেলে-
-নন্দিনি! আমার সোনা! তুমি একি করছ! তুমি ঢাকা ভার্টিটির সর্বোচ্চ ডিগ্রি নেয়া মেয়ে, তুমি এই শতাব্দীর মেয়ে, তুমি এসব কিসের মধ্য দিয়ে যাচ্ছ! নন্দিনি ভীষণ বিচলিত হয়ে পড়ে, নিজের অজান্তে ডানে-বায়ে তাকাতে যায়...

-কে! এ কার কণ্ঠ!

এ কণ্ঠ যে চিরচেনা রাজর্ষীর ব্যাকুল কণ্ঠ। রাজর্ষি এখানে কিভাবে এলো? এসব কি হচ্ছে?

-আহ, রাজ তুমি এতদিন কোথায় ছিলে?

-আমিতো আমার জায়গাতেই আছি নন্দিনি। আমি আজও তোমার জন্যই আছি সোনা। তুমিই তো আমার কাছ থেকে হারিয়ে গেলে, আর তো তুমি আমার রইলে না, সে সময় সব শুনে আমি ছুটে এসেও তোমাকে পাইনি।

-তোমার পিএইচডিতে এত সময় লেগে গেল, হাজার হাজার মাইল দূরে তুমি রইলে যে, মা শূন্য সংসারে বাবা, দাদা আর অপেক্ষা করতে পারল না। শিক্ষিত, আদর্শবান পিতার উপযুক্ত পুত্রের সাথেই আমার গাঁটছড়া বেঁধে দিল। যদিও গাঁটছড়া বাঁধতে গিয়ে করপোরেটের উচ্চপদস্থ কর্তাকে 'পণ' দিতে হয়েছিল। যথেষ্ট পণ দিয়েই এই অফিসারের দরোজার প্রবেশপত্র আমি নিয়েছিলাম। কিন্তু, কিছু মায়ের কণ্ঠের মতো তুমিও কি মিলিয়ে যাবে? যেও না! যেও না রাজ! কেবল কণ্ঠস্বর হয়ে নয়, রক্তমাংসের মানুষ হয় এসো রাজ, জলজ্যান্ত মানুষ হয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়াও। আমি তোমার বুকে আঁছড়ে পড়তে চাই। তোমার বুকের ভেতর আমি একটা আশ্রয় নিতে চাই- প্লিজ প্লিজ রাজ আমার ভীষণ ভয় করছে ...

নন্দিনির ভেতরটা যেন নরম, কোমল দুর্বল হতে চায়... আবার বাট করে সে নিরেট বাস্তবতায় ফিরে আসে, সে আবার কঠোর হয়, শক্তি সঞ্চয় করে। নন্দিনি এসব কি ভাবছে, ওর ভার্চুয়াল মন নিজের অজান্তেই এসব নানাবিধ আশ্রয় কি ওর জন্য তৈরি করছে!

তাই যদি হয়, হে আমার অবচেতন তুমি আরো শক্তিশালী হও, রাজকে কেবল কণ্ঠস্বর নয়, মানুষ হিসেবে নিয়ে এসো। আমি বাঁচি।

রাজর্ষী এখানে নেই জেনেও যখন ওকে পাওয়ার ইচ্ছা প্রবলভাবে মনের ভেতর ডানা বাপ্টাচ্ছিল, ঠিক তখন...

হেড মাস্টার মশাই চিমটার মাথায় ধরা লাল গণগণে টুকরোটা ছেড়ে দিলেন- সেটি পড়ছে- পড়ছে -যেন অনন্তকাল ধরে সাত আসমানের ওপর থেকে ধোঁয়ে আসছে এক জলন্ত অগ্নিরুপ ...

ত্রিকাল কাঁপানো এক আর্চিটেকচার বহু কষ্টে গিলে খেয়ে নন্দিনি অঙ্গারসহ হাত সামনে নিয়ে এগিয়ে যেতে থাকে। প্রতি মুহূর্তে মনে হয় ছুড়ে ফেলে দেয় এই অর্থহীন অমানসিক যন্ত্রণা, কিন্তু নিজের প্রতিজ্ঞায় অটল থাকে সে। তুলসি গাছের বেদীটা খুব বড় বৃত্ত না হলেও নন্দিনির মনে হয়, এ এক অনিশ্চেষ্ট জ্বলন্ত পথ। ওইটুকু পার হতেই নন্দিনির জীবন বের হয়ে

যায়।

একবারে শেষ পদক্ষেপে এসে মনে হয়, একবার ঘুরে দেখি না- এই ক বছরের সুখ-দুঃখ, শরীর-মন, দিবা-রাত্রীর সঙ্গী করপোরেটের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা আমার সুমিতের সুদর্শন বদনখানা। প্রজ্বলন্ত হাতের তালু কবজি, কনুই, বাহু, কাঁধ সর্বাস্থ স্থির ধরে রেখে নন্দিনি মাথা ঘোরায়- স্বামীর মুখ দেখবে বলে- কিন্তু, কিন্তু ওই গরাদের ওপাশে- কে? ও কার মুখ?

তুলসি মঞ্চের গ্রিল যেন কয়েদখানার গরাদ, সেই গরাদের ফাঁকে দৃশ্য অবয়বে বিদ্রূপে ঝলসানো শান্তির সেই এলোকেশী চন্দ্রার মূর্তি- 'বউ গেলে বউ পাওয়া যায়, ভাই গেলে ভাই পাওয়া যায় না' চির সত্য এই আশুবাণী শুনে 'চন্দ্রা'র সেই রাগ, দুঃখ, অভিমান, প্রেমে মাখামাখি হওয়া তত্ত্ব মুখ-

নন্দিনির মাথা ঘোরানো দেখে বলে উঠলো-

-আহ! মরণ!

কতদিন আগে রাজর্ষির সাথে রবি ঠাকুরের 'শান্তি' দেখেছিল। একবার দেখার পর আবার এবং আবার দেখেছিল, কেবল এই 'চন্দ্রার' জন্য। এই নিয়ে রাজ মাঝে মাঝেই মশকরা করে নন্দিনিকে 'চন্দ্রা' বলে ডাকত।

বৃত্ত ঘোরা শেষ হতে না হতেই সুনীতি এক লাফে এসে নন্দিনির হাত ঝাঁকুনি দিয়ে সতীত্ব প্রমাণের কষ্টিপাথর ফেলে দিয়ে রাগান্বিত স্বরে হিস হিস করে বলে ওঠে- এনাফ বৌদি, এনাফ যতসব...

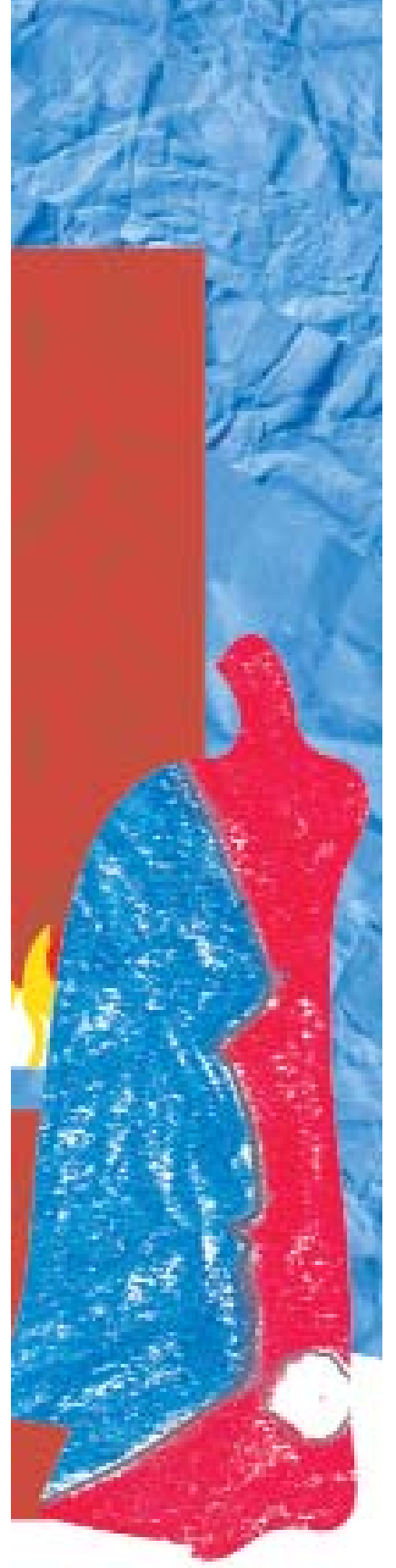
পেছন থেকে বিদ্যাকুর উচ্চ বিদ্যালয়ের কঠোর আদর্শবান প্রধান শিক্ষক গলা খাঁকারি দিয়ে বলে ওঠেন- সুমিতের মা, বৌমাকে ঘরে নিয়ে যাও। এতক্ষণে মা ঠাকুরগেরও স্বর ফোটো- তিনি বেশ উচ্চকিত স্বরেই বলে উঠেন-

-বলেছিলাম না! আমি বলেছিলাম না! বৌমা সতী, আমার ঘরের লক্ষ্মী প্রতিমা। দেখেছ, কেমন তার সতীপনার জোড়, তোমার সবচেয়েই বাড়াবাড়ি, শোন কালই আমি আমার সতী লক্ষ্মীর জন্য জামদানি শাড়ি আর একখান গলার হার কিনে আনব। কিছুটা কহিতে পারবা না কিন্তু হ্যাঁ- এই আমি বলে রাখলাম ...

নন্দিনির শশুর 'হুম' জাতীয় একটি শব্দ করলেন। বৈশাখের আকাশ বুঝি এতক্ষণে থম ধরা ভাবটা ছেড়ে বাতাস দিয়ে উঠল।

নন্দিনির কাঁধ জড়িয়ে ওর শাশুড়ি স্নেহে বললেন, চলো মা- ঘরে চলো, কইরে খোকা! বৌমাকে নিয়ে ঘরে যা। ওর হাতে একটা ক্রিম ট্রিম লাগানোর ব্যবস্থা কর...

নন্দিনি স্থির দাঁড়িয়ে সোজা তাকাল এই বাড়ির প্রবেশদ্বারের দিকে। প্রবেশ পথই তো প্রস্থানেরও পথ। পথ একই আসাও যায়, যাওয়াও যায়। এই একচিলতে উঠোন দু'কদমে পার হলেই সেই চৌকাঠ, আর চৌকাঠ ডিম্বালেই বাইরে সেই অবাধ পৃথিবী, যেখানে সতী-অসতী সবাই এঁটে যায়। যেখানে মেয়েরা কেবল মেয়ে নয় তারাও মানুষ। যেখানে মানবতা এভাবে চিতার অনলে অঙ্গর হয় না। এই চৌকাঠ ডিম্বালেই নন্দিনি হয়ে যাবে ফিনিক্স পাখি। তখন কেঁপে উঠবে তোমাদের এই তুলসি মঞ্চ, কেঁপে উঠবে এই বসন্তভিটা, কেঁপে উঠবে তোমাদের অবিশ্বাসী মন। নন্দিনি এবার সম্পূর্ণ মানবী হয়ে উঠবে, হবে সে মানবিক স্বাধীনতায় পরিপূর্ণ।





গল্প

জহরি

স্বপ্না রেজা

দাঁড়িয়ে গেলে কোনোভাবেই এগোনো যায় না। শত শতবার দাঁড়িয়ে এ প্রমাণ পেয়েছে অর্ক। কোনো দাঁড়ানোটাই তার ইচ্ছাকৃত নয়। অথচ দাঁড়িয়ে গেছে, যেতে হয়েছে। পরিবেশ বলে যে চাদরখানা অর্ককে চেপে থাকে, জড়িয়ে রাখে, দাঁড় করিয়ে রাখাটা মূলত তারই কারসাজি। এমন এক চাদরমোড়া পরিবেশে অর্কের জন্ম, বেড়ে ওঠা যেখানে পদে পদে বাধা। কেবল বিছানা ছেড়েছে অর্ক। গলিবাসী নেড়ি কুকুর যেউ যেউ শুরু করেছে। সঙ্গে যোগ দিয়েছে কাকের কা কা শব্দ। দু'একজন পথচারীর মোটা গলার কাশির শব্দও আসছে। জানালা দিয়ে বাইরে চোখ ফেলতেই শোনা শব্দের প্রাণীগুলো চোখে পড়ে অর্কের। দিন শুরুর বিচিত্র সব দৃশ্য মনকে একটু অন্যমনস্ক করে দেয়। সহসায় চোখ ফিরিয়ে নেয়া যায় না, উপরত্ব কিছু ভাবনার সূত্রপাত ঘটায়। আবার বেশিক্ষণ

দেখার সুযোগও নেই।

আজ অর্কের চাকরি জীবনের প্রথম দিন। মা সার জেগে গেছেন অর্কের বেশ আগে। রান্নাঘর থেকে মায়ের কাজের শব্দ ভেসে আসে। বাবা রঞ্জুর নাক ডাকার শব্দ, মা সারার কাজের শব্দের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার। রঞ্জুর সুখনিদ্রার সঙ্গে সারার ব্যস্ততার যদিও কোনো মিল নেই। ব্যবধানের ছোটখাটো নদী বয়ে যায় মাঝ বরাবর। ঘরের কাজে সহায়তার জন্য সারা বুয়া রাখেন না। এই ৬০ বছরেও তার অনেক বাতিক আছে। কাজের বুয়ারা ভালোমতন ঘর পরিষ্কার করে না, থালা-বাসন, কাপড়-চোপড়ও পরিষ্কার করতে পারে না, সারা যেমনটি চান। একগাদা অপছন্দ নিয়ে সারা সবসময় অস্তির থাকেন। সবচেয়ে বড় সমস্যাটি হলো, ঘরে কাজ করতে আসা মানুষ একপর্যায়ে সারার ৬০ বছরের জীবনটার ওপর খবরদারি শুরু

করে দেয়, যা সারা কোনোভাবেই মানতে পারেন না। আজ অর্কের চাকরির বিষয়টি সারার রুটিনমাসিক জীবনটাকে একটু এগিয়ে আনে। তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে জেগে ওঠা, তাড়াতাড়ি রান্না-বান্না করা, সব কিছুতেই তার তাড়াহুড়ো। বুয়ারা কাজের আগপিছের গুরুত্ব বোঝে না, বুঝতে চায় না। সব ভাবনার ফলাফল, সারা একাই কাজ করবেন। শরীর মন ভালো থাকুক, আর নাই বা থাকুক।

সাতসকালে ধুমকেতুর মতন বাসায় প্রবেশ করেন বড় মামা দস্তগীর সরকার। আর দরজা খুলতে হলো অর্কেই। মহাখুশি মামা। চোখের পলক পড়ে না তার।

আরে মামু! কি করে বুঝলে আমি এসেছি, তোমাকেই দরকার! বড় মামা মায়ের পরপরই সন্তান নানির। ৫৮ বছর তো হবেই। কিন্তু ভাবসাবে অতিসবুজ। আধুনিকতার কমতি নেই পোশাক-আশাকে। সাতসকালে কী দরকার তার অর্কে, মাথায় ঢোকে না।

প্রথম দরকারটা আগে বলি। হে হে হে। নিচে দারোয়ানের কাছে আমার ব্যাগ রেখে এসেছি, চট করে নিয়ে এসো তো মামু! ততক্ষণে রান্নাঘর থেকে সারার কণ্ঠ পৌঁছে গেছে অর্কের কাছে, অর্ক! কে এলো রে? অর্কের উত্তর দিতে হলো না। দস্তগীর সরকার চেঁচিয়ে উঠলেন, বুবু আমি যে দস্তগীর! যাও মামু ব্যাগটা নিয়ে এসো! গলার জোর দিয়ে ব্যাগ আনার কথা বলে গেলেন, আর শরীরের জোর দিয়ে অর্কের পাশ কাটিয়ে ঘরের ভেতর ঢুকলেন। বয়স্ক আত্মীয়স্বজনদের বেশ আধিপত্যবোধ কাজ করে অল্প বয়স্কদের ওপর। জোর করে কাজ করিয়ে নেয়ার এই মানসিকতা প্রায় প্রতি পরিবারে দেখা যায়। ছয়তলা থেকে নিচে নেমে অর্কের মাথা নষ্ট। ব্যাগ তো নয়, রীতিমতন একটা বস্তা পড়ে আছে মুখ খুবড়ে। তরুণ দারোয়ান নুরু অর্কেকে দেখে হেসে ফেলে।

আপনাদের এই মেহমান সাহেবকে বললাম, আমি সিঁড়ি বেয়ে ছয়তলা ব্যাগ দিয়ে আসি। উনি বিরক্ত হয়ে বললেন, না বাপু তোমাকে বকশিস দেয়ার ক্ষমতা আমার নেই। ভাইয়া আপনি যান। আমি দিয়ে আসছি বাসায়। নুরুর বয়স ১৮ সম্ভবত। বেশ বিনয়ী। এই ফ্ল্যাটের সবাই তাকে পছন্দ করে। দস্তগীর সরকার তাকে চিনতে ভুল করেছেন। তার ভুল চেনা মাত্রা ছাড়িয়ে যায় যখন নুরু মাথায় করে ছয়তলায় ব্যাগ পৌঁছে দেয় এবং অর্ক তার পিছপিছ ঘরে ঢোকে।

ওকে কেন ব্যাগটা আনতে দিলে! মামু তুমিই তো আনতে পারতে! মনে হলো দস্তগীর সরকারের মাথায় কেউ রড দিয়ে আঘাত করল। মা বেশ বিরক্ত নিয়ে বললেন, কী বলছিস তুই! দস্তগীর সরকার থমকে গেলেন। নুরু ব্যাগ নামিয়ে চলে যাওয়ার জন্য পা বাড়ালে অর্ক তাকে দাঁড়াতে বলে। ফ্রিজ থেকে ঠাণ্ডা পানি বের করে অর্ক নুরুকে এগিয়ে দেয়। মা শাড়ির আঁচলের গিট্টা খুলে ২০ টাকার একটি নোট নুরুর হাতে গুঁজে দেন। বড় মামা দস্তগীর সরকারের মধ্যে কোনো আড়ম্বল নেই। যা ঘটছে, সেটাই ঘটান, ভাবটা এমনই।

ঘরের ভেতর থেকে পুরুষ কণ্ঠ বেজে ওঠে,

অর্কের মা! এক গ্লাস পানি দাও তো! রঞ্জুর আদেশ। ঘর শুরু করার পর থেকে আজ অবদি এই আদেশ কখনো ক্লান্ত হয় না। একই উদ্যমে চলে। আর এই কণ্ঠস্বর দস্তগীর সরকারের দেহে যেন প্রাণ সঞ্চার করে। দৌড়ে গেলেন কণ্ঠ বরাবর। পথটা বেশ সোজা।

১০টার মধ্যে অফিসে প্রবেশ করতে হবে। গতকাল অফিস থেকে সুকণ্ঠী এক নারী মোবাইলে ফোন করে জানিয়েছে। বাংলা স্পষ্ট করে উচ্চারণ না করতে পারাটা এক ধরনের আধুনিকতা। ভাবে অভিজাত হয়ে থাকাও বটে। বড় মামা দস্তগীর সরকারের নাগপাশ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে অর্ক তৈরি হওয়ার চেষ্টা করে। ইতোমধ্যে দেয়াল ঘড়িতে পাখি কুক কুক করে সকাল ৮টার কথা জানিয়ে দিয়েছে। সারা টেবিলে ছেলের জন্য খাবার গুছিয়ে দিয়েছেন। গরম ভাত, ইলিশ ভাজা আর গরু ভুনা। সকালে ভাতজাতীয় খাবার খেতে ভালো লাগে না অর্কের। এই ভালো না লাগা হার মানে মায়ের ভালো লাগার কাছে। দস্তগীর সরকার হাত-মুখ ধুয়ে টেবিলে বসে খেতে শুরু করলেন। সারার চোখেমুখে বিস্ময়ের বেদনা। প্রকাশ করলেন না। বাপের বাড়ির লোকজন হাজার হলেও। বরং তাড়াতাড়ি ছেলের জন্য তরকারি উঠিয়ে রাখলেন। আর গলা উচিয়ে ডাকতে শুরু করলেন, অর্ক! অর্ক!

আহ বুবু এত চোঁচাচ্ছে কেন! ছেলে তোমার বেশ বড়। বড় ছেলেকে আবার ডাকা লাগে নাকি? মোটেও ভালো লাগে না ভাই দস্তগীর সরকারের কথা সারার। মেজাজ বিগড়ে যায় সারার। কণ্ঠে বিরক্ত প্রকাশ করে, না করে উপায় নেই। কী বলিস এসব! বোনের কথায় ঝাঁঝ। আশা করেনি দস্তগীর সরকার। মর্মাহতের পোচ চেহারায় ডলে বেসিনে গিয়ে হাত ধুয়ে ফেলে। প্লোটে অবশিষ্ট খাবার অভাগার মতন চেয়ে থাকে। অর্ক বড় মামার এই আদিখ্যেতা দেখতে অভ্যস্ত। মা তার মাথায় হাত বুলালেই সব ঠিক হয়ে যাবে। অর্ক কেবল প্লোটে ভাত নিয়েছে, দস্তগীর সরকার উড়ে এসে অর্কের হাত ধরে টেনে ওঠায়।

তোমার সঙ্গে আমার জরুরি কথা আছে, একটু পরে খাও! সারা ও অর্ক দুজনই অবাক। অর্কেকে টেনে পাশের ঘরে নিয়ে যাওয়ার উপক্রম। সারা বাধা দেন।

কি করছিস দস্তগীর! অর্কেকে এভাবে টানছিস কেন ছাগলের মতন! ওর আজ প্রথম অফিস! ছাড়! ছেড়ে দে!

কিন্তু আমার যে মহাবিপদ করে দিয়েছে তোমার এই গুণধর! মহাবিপদ! সারার চোখ তড়াক করে কপালে উঠে গেছে। অস্বস্তির চরম সীমা লঙ্ঘন। অর্ক আশ্চর্য প্রদীপ জ্বলে ধ্যানে বসে গেছে যেন সৃষ্টিকর্তা মহাবিপদে তাকে না ফেলে দেয়।

আমার রাত্রির ঘুম হারাম করেছে গো বুবু! বলে কি দস্তগীর সরকার। সারা অর্কের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করে ঘটনা। ঘড়ির পাখি ফের কুক কুক করে ৯টার সংকেত জানান দিল। মুখে ভাষা নেই অর্কের।

কিন্তু কী সর্বনাশ করল অর্ক তোদের! আমি লোকসমাজে বলতে পারব না। আর চুপ

থাকতে পারল না অর্ক। মায়ের চোখ সন্দেহ আর সংশয়ে উতলে উঠেছে। এসব আপনি কী বলছেন মামা! আপনার রাত্রির কী ক্ষতি আমি করলাম!

আমার সঙ্গে গিয়েই দেখে আসবে তা। আজ নাইটেই তোমাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে। আমি কিছুইতেই ছাড়ব না! দস্তগীর সরকারের এমন আচরণে সারা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। অর্ক অফিস যাক। সে ফিরলে আমি শুনব। সারার কণ্ঠ বেশ উত্তপ্ত। মায়ের সমাধান অর্কের পছন্দ হলো না। তার দ্বারা সংঘটিত রাত্রির সর্বনাশের কথা না জেনে কোনো কাজে মন দেয়া প্রায় অসম্ভব। খেতে বসার মায়ের চোখের আদেশ পালন করতে পারে না। মামাকে নিয়ে পাশের ঘরে যায়। তারপর মুখোমুখি।

বলুন কী সর্বনাশ করেছে আপনার রাত্রির। বলেছি তো মামু তোমাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে। গিয়েই না হয় দেখো নিজ চোখে। মুহূর্তের মধ্যে মানুষের চেহারা এত বদলায় তা অর্কের জানা ছিল না।

চাকরি তো আর আমার মামুর বাড়ির না যে আপনি চাইলেই আমি যেতে পারব। শক্ত করেই কথাটা বলা।

তুমি আমার চাকরিই করবে। সারা আর পারলেন না। জোর করে ঠেলে অর্কেকে অফিসে পাঠালেন। না খেয়েই অর্ক রওনা দিল অফিসে। ১০ মিনিট লেট। হাঁপাতে হাঁপাতে অর্ক কাজে যোগদান পত্র জমা দেয় এইচআর-এ। ইলেক্ট্রনিক কোম্পানির সেলস ডিপার্টমেন্টের কাজ জুটেছে অর্কের। অভিজ্ঞতা ছাড়া চাকরির শুরুরটা এর চেয়ে বড় হয় না। গতকাল যে মেয়েটি তাকে ফোন দিয়েছিল সম্ভবত এই মেয়েটিই হবে। বেশ শান্ত ও গম্ভীর প্রকৃতির মনে হলো। অর্কেকে পিয়নের সঙ্গে পাঠানো হলো মার্কেটিং বিভাগে। এক অতীব সুন্দরী রমণী ইরিনা, অর্কের বস। চোখ নয় যেন দৃষ্টির মহাসমুদ্র নিয়ে বসে আছে। পাতলা ঠোঁট। পরনে সালোয়ার কামিজের সঙ্গে ম্যাচিং লিপসটিক। পারফিউমের তীব্র গন্ধ অর্কের নাকে অবলীলায় পৌঁছে।

বসুন। মিষ্টি শব্দ তার কণ্ঠ থেকে বের হয়ে যেন অর্কেকে ছুঁয়ে গেলে। কাছ থেকে এত সুন্দরী রমণী খুব একটা দেখা হয়নি অর্কের। লজ্জা পাওয়ার মতন চেয়ে থাকা। সকালে বাসায় মামার কীর্তিকলাপের ছিটফোঁটাও এখন মাথায় নেই। ঘুম থেকে জেগে যতকিছু চোখ দিয়ে দেখা হয়েছে। এ দেখা হলো সর্বোত্তম সুন্দর।

দাঁড়িয়ে কেন! বসুন! যিনি বসতে বলছেন তিনি বুঝতে পারছেন না দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটি তার রূপে স্তম্ভিত। রূপের এমন সর্বনাশা আহ্বান অর্ক ছাড়া কে বুঝতে পারবে, কেউ না। একেবারেই ফ্রেশ দেখাচ্ছে।

জি। অর্কের মুখ থেকে বের হওয়া এই ছোট্ট শব্দটিতে ইরিনা উচ্ছল হয়ে ওঠে।

থ্রেট! সব কিছু শিখে নেয়া ভালো, ঠিক? অর্ক পুতুলের মতন মাথা দোলায়। অর্ক নয়, কেউ যেন তার মাথা দুলিয়ে দিচ্ছে। কিছু কিছু পরিবেশ বা কিছু কিছু মানুষের উপস্থিতি কাউকে নির্বাক করে দেয় হতবিস্ময়কর। ইরিনা ল্যাপটপে বসে টুক টুক করে লিখে প্রিন্ট নেয়। কপালের স্নিগ্ধতার

মাঝে চিকন দু'তিনটে ভাঁজ। এক বলক পড়ে লেখাটা অর্কের দিকে এগিয়ে দেয়।
 নিন। কবের থেকে কাজ শুরু করতে চান? কাগজে লেখা কবিতা। কবির নাম নেই। তবে কি ইরিনা নিজেই একজন কবি। অর্কে দেয়ার কারণই বা কী, বুঝতে পারে না অর্ক। চাকরির প্রথম দিনের অভিজ্ঞতা, ইতোমধ্যকার দেখা-শোনার অভিজ্ঞতার সঙ্গে মেলে না। অর্ক কোনোদিন কবিতা পড়ে সময় গড়িয়েছে, এমন জলজ্যন্ত কোনো দৃষ্টান্ত নেই। বরং যারা কবিতা-টবিতা লেখে অর্ক তাদের খুব একটা সুস্থ ভাবে না। ভাবতে পারে না। সোজাসাপটা কবিদের কল্পনাবাসী প্রাণী মনে হয় অর্কের।
 ইরিনাকে প্রথম দেখায় অবশ্য অসুস্থ মনে হয়নি। বরং ভালোলাগার মতো চাক বেঁধেছে। ইরিনা বেশ চালাক। অর্কের থমকে পড়াটা বেশ টের পেয়েছে। পাবে না কেন সে তো অর্কে চমকে দিতেই চেয়েছে।
 বলুন কবের থেকে কাজ করতে চান? একই প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি এবার সত্যিই অর্কে লজ্জায় ফেলে দেয়। মুখের গোড়ায় এসেও অর্ক ভেতরে ঢুকিয়ে নেয়।
 আগামীকাল হলে অসুবিধে হবে?
 পাতলা ঠোঁট সরু করে ইরিনা বলে, নো প্রবলেম। ঠিক আছে তাহলে কাল সময়মতো চলে আসুন। কথা শেষ করে ইরিনা একটি ভিজিটিং কার্ড বের করে দেয়।
 আমার সেল নাম্বার আছে। প্রয়োজনে ফোন দেবেন।
 জি। প্রয়োজন আছে নিশ্চয়ই। কার্ড প্রদানকারী প্রয়োজন তৈরি করে দিয়েছেন। কার্ড নয় যেন অর্ক ইরিনার হাতের ছোঁয়া নিল। চুম্বকের মতন টেনে নিচ্ছে ইরিনা অর্কে। সমুদ্রের বুকে জেগে ওঠা হঠাৎ তেউ তীরে আছড়ে অর্ক টেনে নিচ্ছে তার ভেতর। এ রকম কেন লাগছে অর্ক বুঝতে পারছে না। এর আগে কাউকে দেখে তো এমন লাগেনি। অফিস থেকে বের হয়ে বাসায় নয়, সোজা রমনা পার্কের গ্রিন ভিউ। কল্পনায় ইরিনাকে নিয়ে বসে থাকে অর্ক একাকী। মানসপটে একে চলে হাজারো কল্পনার ছবি।
 সারা নাছোড়বান্দা। শক্ত করে ধরে দস্তগীর সরকারকে।
 রাত্রির কী সর্বনাশ করেছে অর্ক? প্রশ্নটা এত শক্ত যে, উত্তর না দিয়ে রক্ষা নেই। সমস্যা হলো দস্তগীর সরকার গুছিয়ে বলতে পারে না। আমতা আমতা করে। আর ততই মেজাজ খারাপ হতে থাকে সারার।
 এমন ভাবে বললি যে, না জানি আমার সোনার টুকরো ছেলে তোর মেয়ের জীবন নিয়ে খেলেছে। বুঝু গো সে রকমই তো। অর্কে না পেলে আমার রাত্রির জীবন থাকবে না। তোমার ছেলে আমার রাত্রির মাথা নষ্ট করে দিয়েছে। ভাইয়ের মেয়ে রাত্রির জন্য সারার বুকোর বা পাশে একটু একটু করে জায়গা তৈরি হতে শুরু করেছে, বেশ বুঝতে পারে সারা। প্রকাশ করে না। বাঙালি সমাজে ভাইয়ের সন্তান আর নিজের সন্তানের মধ্যকার ফারাক খুবই সামান্য। রঞ্জু এসে দস্তগীর সরকারের কথাকে কিছুটা এগিয়ে দেয়।
 যা দিনকাল পড়েছে তাতে নিজেদের মধ্যে সম্পর্ক করা ভালো। তোমারও একটা মেয়ে, আমাদেরও

একটা ছেলে। অর্ক চাকরির জীবন শুরু, এখনই একটা ব্যবস্থা করে ফেলা ভালো। ছেলে আবার কোথায় কী করে, রাত্রি যখন ভালোবাসেই অর্কে তাহলে আর দেরি কেন। কথাটা বলে ভুঁড়ি দুলিয়ে হেসে ওঠে রঞ্জু।
 আগে অর্কের কথা শুনবে না? সারার প্রশ্নে রঞ্জুর জ্ঞান ফেরে। বিজ্ঞের মতন চোঁচিয়ে বলে, সেটা আবার না বলতে। ওহে ওকে তো সবার আগে জিজ্ঞেস করা দরকার। আমার সোনার টুকরা! রঞ্জু এমনভাবে কথা বলছে যেন অর্কের বিষয়ে সব জান্তা। ছেলের বিন্দুমাত্র খোঁজ না রাখার দলের একজন মহাসচিব। সুযোগ পেলেই ভাব ছাড়ে, ভাব মারে। বক্তৃতায় ওস্তাদ। কাজে নেই। শাড়ির আঁচল দিয়ে মুখের ঘাম মুছতে মুছতে সারা বলে,
 আমি আগে শুনতে চাই অর্কের কথা। সে ফিরুক। দস্তগীর সরকার ভ্রু বাঁকিয়ে ফেলে। মোটেও পছন্দ হলো না সারার কথা। ভাইকে অসম্মান করা হলো বলে ভাবছে। রঞ্জুর দুই নৌকায় পথ পাড়ি দেয়ার স্বভাব বরাবর। ভেতরের ঘরে একরকম কথা বলে এসে সারার সামনে স্বর বদলিয়েছে। ৩০ বছর এরকম স্বভাবের মানুষটার সঙ্গে ঘর করে সারা অভ্যস্ত হয়ে গেছে।
 সে না হয় হবে। কিন্তু কোনো কারণে যদি অর্ক রাত্রির কথা না ভাবতে চায়?
 এ আবার কেমন কথা! পছন্দ করে থাকলে না ভাবার কি আছে? প্রশ্ন রঞ্জু করে বসে।
 আজকাল ছেলেপুলে তো।
 এ কথা তো রাত্রির জন্যও প্রযোজ্য। সারার কাছে অহেতুক লাগে এসব কথাবার্তা। নিজের কাজে মন দিতে উঠে যায়। দস্তগীরের বস্তুর মতন সুটকেস দেখে ফিরে আসে।
 ওতে কী আছে?
 এই যা! ভুলে গেলাম যে! ওতে রাত্রির মা অর্কের জন্য গায়ের কাঁথা পাঠিয়েছে। সঙ্গে নাড়ু, পিঠা আর কী কী সব। কত কি যে আছে। গাছের নারিকেলও আছে। অর্ক নাকি মুড়ি দিয়ে নারিকেল খেতে খুব পছন্দ করে রাত্রি বলেছে সেই কথা তার মনে। এত ঘটনা ঘটে যাচ্ছে সারা তার কিছুই জানে না। কোল ঘোঁষে বেড়ে ওঠা অর্কের এত গল্প, সে জানে না তাও কী সম্ভব। একটু চিন্তিত হতেই হলো।
 সন্ধ্যা সঙ্গে করে ঘরে ফেরে অর্ক। মা ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে অর্কের ফেরার পথপানে চেয়ে থাকে। কী অধীর প্রতীক্ষা। ছেলের মুখজুড়ে সারা খুঁজে ফেরে আজকের দিনের পুরো সংবাদ। কেমন কাটল চাকরির প্রথম দিন। অর্ক হাতে করে মায়ের জন্য বেলিফুলের মালা নিয়ে এসেছে। খুব পছন্দ সারার বেলিফুল। বেলিফুলই যেন কথা বলছে। আর সারা যেন সে কথা শুনতে পাচ্ছেন। ছেলের কপালে চুমু একে দেন সারা।
 আমি জানতাম বাবা তুই অনেক সুখী হবি! মায়ের আত্মবিশ্বাস অর্কে দোলা দেয়। নিশ্চিত লক্ষ্যে পৌঁছে যাবে তেমন সংবাদ পৌঁছে অর্কের বুকোর বাম পাশে। মায়ের হাতে বেলিফুল নয়, অর্ক যেন তার জীবনকেই তুলে দিল।
 রাতে খাবারের পর শুরু হলো রাত্রি সমাচার। মা বন্ধুর মতন মিশতে চেষ্টা করে অর্কের সঙ্গে। মা ছেলেতে নিরিবিলা খুঁজে নেয়। কীভাবে কথা শুরু

করবে সারাদিন ভেবে গুছিয়ে নিলেও শেষ পর্যন্ত সারা ভেবে রাখা পথ ধরে কথা শুরু করতে পারে না। ছেলের মুখ দর্শনে আবেগটা মুখ্য হয়ে দাঁড়ায়। তোর সঙ্গে রাত্রির সম্পর্ক কী? এভাবে সরাসরি প্রশ্নের অপেক্ষায় ছিল না অর্ক। হোঁচট খায়। বেশ ভালোই হোঁচট।
 মানে!
 তোর মামা বলছিল রাত্রি তোকে ছাড়া বাঁচবে না। এমন মৃত্যুর সম্ভাবনা তুই কীভাবে ঘটতে পারলি? কঠিন জেরা সারার।
 অবাক করা কথা মা! কখনো এমন কিছু হয়েছে বলে মনে পড়ে না। অর্কের কথার সঙ্গে দস্তগীর সরকারের কথার মিল নেই। বেশ ভাবনায় পড়ে যান সারা। মায়ের চিত্তিত মুখ দেখে অর্কও চিত্তিত হয়ে পড়ে।
 আমার একটা কথা রাখবি বাবা?
 একটা বলছ কেন অনেক কথাই রাখতে পারব, বলো।
 না হয় একবার ঘুরে আয় রাত্রিদের ওখান থেকে। নিজের কৌতূহলের চেয়েও মায়ের দুঃশ্চিন্তা বেশি প্রাধান্য পায় অর্কের কাছে।
 নতুন চাকরি, এতটা সুযোগ কেন দেবো। তারপর কি ভেবে খানিকক্ষণ অর্ক রাজি হয়ে যায়। চাকরির প্রয়োজনের চেয়ে ইরিনার প্রতি অতুলিত রকমের মোহ বাসা বেঁধেছে মনের ভেতর প্রথম দর্শনেই। সেই অনুভূতি, আবেগকে কী করে শান্ত রেখে যাওয়া যায় রাত্রির কাছে, বিশাল এক প্রশ্নের ভেতর ঘুরপাক খেয়েও রাজি হতে হলো মায়ের কারণে। ইরিনার সেল নাম্বারে ছোট্ট একটা চিরকুট পাঠায় অর্ক। অবাক করে দিয়ে তৎক্ষণাৎ ইরিনা প্রতি উত্তর দিয়ে বসে। অর্ক চাইলে দুদিন পরে কাজে যোগদান করতে পারে।
 যশোর জেলার সুন্দরপুর গ্রামে বড় মামারবাড়ি। খুব সকালে রওনা দেয় অর্ক ও দস্তগীর সরকার। পরিবারকে গ্রামে রেখে মামা থাকেন শহরে। গ্রামের ধান, চাল, গরুর দুধ, শাক-সবজি খেয়ে পরিবার পুষ্টিতে বেড়ে উঠুক, এই স্বপ্ন নিয়ে চলেন। রাত্রি আর তার মাকে সুন্দর ভাঁজ দিয়ে দস্তগীর সরকার এমন ব্যবস্থায় রেখে দিয়েছেন।
 অর্ক পুরোটা রাত্তায় ভেবেছে রাত্রিকে। কোন রাত্রির কাছে সে যাচ্ছে। দ্রুতবেগে ছুটে চলা বাসের জানালা দিয়ে বাইরের সবুজ ধান ক্ষেতের মাঝে তার উত্তর নেই। দস্তগীর সরকার বাসে চড়ার পর থেকেই বেশ চুপচাপ। চোখ বন্ধ করে আছেন। বাস স্টপেজ থেকে রিকশা করে যেতে হয় বাড়ি। দস্তগীর সরকারের বিশাল প্রায় খালি সুটকেস পায়ের ওপর বসিয়ে চাপাচাপি করে দুজন বসে। বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে রাত্রি। ওড়না দিয়ে মাথা ও মুখ ঢাকা। মনে হলো রাত্রি পরপুরুষের সামনে দাঁড়িয়ে। বরং ওড়না দিয়ে আরটুকুন ঢেকে নেয়। যেন আঁধার দিয়ে নিজেকে মুড়িয়ে নেয়া। এমন আড়ম্বল্য আগে দেখেনি অর্ক। মামাতো বোনের সঙ্গে সহজ-সরল সম্পর্ক ছিল।
 রাত্রি! দরজার সামনে থেকে আড়াল হতেই ডাক দেয় অর্ক। সামনের দিকে না হলে পরিপাটি হয়ে দাঁড়িয়ে যায় রাত্রি। দস্তগীর সরকার খালি প্রায় বিশাল সুটকেস টেনে টেনে বাড়ির ভেতর মিলিয়ে যায়। খুউব কাছে অর্ক এসে দাঁড়ায় রাত্রির। কী ব্যাপার রাত্রি! কী হয়েছে তোমার? বিস্ময়ের

গোটা গোটা চোখ রাত্রির। আঁধার মেঘে ঢাকা রাত্রির আকাশে বিনা নোটিশে প্রচণ্ড বজ্রপাতের সম্ভাবনা। মুখের ওপর থেকে ওড়না সরিয়ে পাল্টা প্রশ্ন, কী হবে আমার?

কিছু হয়নি তোমার? প্রশ্নের পাল্টাপাল্টি খেলা চলে। অর্ক কম অবাক হয় না। এবার রাত্রির মাথার ওপর থেকে ওড়না খসে পড়ে।

কী হওয়ার কথা ছিল বলুন তো? রাত্রির এমন প্রশ্নের জবাব অর্কের কাছে নেই। অপ্রস্তুত হয়ে পড়া ছাড়া কোনো উপায় নেই। কথা না বাড়ানোই ভালো। অর্ক কথা না বাড়িয়ে বাড়ির ভেতরে পা বাড়াতোই রাত্রি তার হাত ধরে ফেলে। হার্ডব্রেক যেন।

বাবা কী বলেছে আপনাকে? আমার মন বলছে সে আপনাকে জোর করে নিয়ে এসেছে। আপনি জেনেই এসেছেন, তাই না? কী বলবে অর্ক কথা খুঁজে পায় না। রাত্রির কাছে কী বলা উচিত সেটাও বুঝে উঠতে পারে না। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকা ছাড়া কোনো কাজ নেই। এটুকুন পরিষ্কার রাত্রির জীবনে আকস্মিক পরিবর্তনের কোনো কারণ নয় অর্ক। কারণ অন্য কিছু, অন্য কেউ।

যান। বিশ্রাম নিয়ে আমবাগানে আসুন। ওখানে আমি আপনার অপেক্ষায় থাকব। কথা কটি বলে রাত্রি হন হন করে অদৃশ্য হয়ে গেল। মামি খাবার নিয়ে বসে। ঠোট পান খেয়ে লাল টসটসে মামির। বেশ সুন্দরী। বেশ আদর-যত্নে খাওয়ালেন অর্ককে। খাবার সময় মামি কোনো কথাই বললেন না। শুধু ঠোটজুড়ে হাসি মেখে থাকলেন। বড় ধরনের অতিথি আপ্যায়নের মতন লাগে অর্কের।

বাড়ির গা ঘেঁষেই আমবাগান। অর্ক খেয়াল করে গাছদের জড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার মাঝ বরাবর রাত্রি। ছায়ার মতন লাগে প্রথম দর্শনে। বরাপাতা দলে কচমচ শব্দে অর্ক সেই দিকে পা বাড়ায়।

রাত্রির মাথা ও মুখ ওড়না দিয়ে আড়াল করা। অসম্ভব এক রহস্যে রাত্রির বসবাস। বরাপাতার শব্দে রাত্রি অর্কের উপস্থিতি টের পায়। আপনি খুঁউব ভালো ছেলে। আপনার জীবন নষ্ট করার ইচ্ছা আমার নেই। বাবা-মা কিছুতেই বুঝতে চাইছেন না যে আপনাকে আমার মোটেও পছন্দ নয়। আপনি ভালো মানুষ, কিন্তু আপনাকে ভালোবাসা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। ঘৃণা করারও কোনো উপায় নেই আপনাকে। মনে হলো কোনো সিনেমার নায়িকা কথাগুলো বলছে নায়ককে। নায়ক হতভম্ব হয়ে শুনছে অপ্রত্যাশিত সংলাপ। আর এই সিনেমা হলে বসে দেখছে অর্ক। ছোট্ট একটা যতিচিহ্ন বসিয়ে রাত্রি আবার বলা শুরু করে, কষ্ট করে ঢাকা থেকে এতদূর আসার জন্য আমি দুঃখিত। আমি চাই আপনি ফিরে যান। আমি তো না জেনে যাব না। অর্ক রাত্রির কথাকে মাটিতে পড়তে দেয় না। রাত্রি বিরক্ত।

কী জানতে চান?

আমাকে পছন্দ না হওয়ার কারণ। অর্ক কম অবাক হয় না নিজের মুখ থেকে এমন কথা বের হওয়ার কারণে। মামার মুখে শোনা গল্প, রাত্রি অর্ককে ছাড়া বাঁচবে না এমন কথা শোনার পরও অর্কের মনে হয়নি কোনো দিনও সে রাত্রির প্রতি দুর্বল ছিল বা তেমন কথা প্রকাশ করেছে। কিংবা রাত্রিও বলেনি। কেউ যখন কাউকে অপছন্দ করে তখন অপছন্দের

কারণ উদ্ঘাটনের জন্য অপছন্দের শিকার মানুষটি মরিয়া হয়ে ওঠে। আপনি কী আমাকে ভালোবেসেছিলেন যে অপছন্দের কারণটা জানতে চাইছেন? অসংখ্য সুইফোর্টা প্রশ্ন রাত্রির। কথা তো ঠিক। অর্ক কী তাকে ভালোবেসেছে কোনো দিন, যে ভালোবাসার দাবিতে জানতে চাইছে। যাকে মনে ধরা হয় না তার পছন্দ বা অপছন্দের কী যায় আসে। অর্কের ভেতর পুরুষত্ব জেগে গেছে সম্ভবত। নড়েচড়ে ওঠে আগে না দেখানো পুরুষত্ববোধ। হার মানতে চায় না।

ভালোবাসি যদি বলি। অর্কের কথায় রাত্রির মুখ আর মাথার ওপর থেকে ওড়না খসে পড়ে। ঠোটজুড়ে হাসি। তারপর মৃদু কণ্ঠে বলে, এই ভালোবাসা এফুনি আপনে গড়লেন এবং একজন পুরুষ হয়ে অপমানিত না হওয়ার জন্যই ভালোবাসার কথা বললেন। অর্ক তাইয়া আমাদের আত্মসম্মানবোধটা স্বার্থরক্ষার্থেই বেশ থাকতে চায়। আপনি কখনই আমাকে ভালোবাসেননি, আমিও না।

তাহলে ভালোবাসার এত গল্প কেন! রাখালকে আমি ভালোবাসি। আমার গ্রামের সাধারণ ছেলে। বাবা-মা চান না, পছন্দ করেন না। তাদের কল্পনায় আপনি। তাদের বিশ্বাস আপনার সঙ্গে আমার দেখা হলেই আমি রাখালকে ভুলে যেতে পারব। কিন্তু না, সেটা সম্ভব নয়। একজনকে ভালোবেসে আরেকজনকে কীভাবে ভালোবাসার কথা ভাবা যায়, বলুন তো? আমি খুব দুঃখিত অর্ক তাইয়া!

অর্ক দেখতে পায় আমবাগানে ঝরে থাকা পাতাগুলো সবুজ হয়ে উঠেছে। রাতের বাসে ফেরা। দস্তগীর সরকার অর্ককে বাসে তুলে দিতে এলেন। একটা কথাও বললেন না। অর্ক মামার হাত ধরে বিদায় নেয়ার সময় বলল, মিথ্যে কল্পনা, এক ধরনের অসম্ভব কল্পনা। কী দরকার ছিল? মেনে নিন সত্যকে। রাত্রি আর রাখালের জীবনকে বেঁধে দিন।

রাতের বাসে ফেরা অর্ক সকালে ঘুম দেয়। ঘুম ভাঙে না অর্কের বিকেল অন্দি। সারা অবাক। ছেলেকে ডেকে তোলেন, আজ অফিসেও গেলি না! এখনো ঘুমাইছি যে? অর্ক মায়ের স্নিগ্ধ মুখটার দিকে অর্ককে তাকিয়ে থাকে।

কী হয়েছে তোমার? প্রথম প্রশ্নের উত্তর না পেয়েই দ্বিতীয় প্রশ্ন। মায়ের অস্থিরতা এমনই। অর্ক বিরক্ত হয় না।

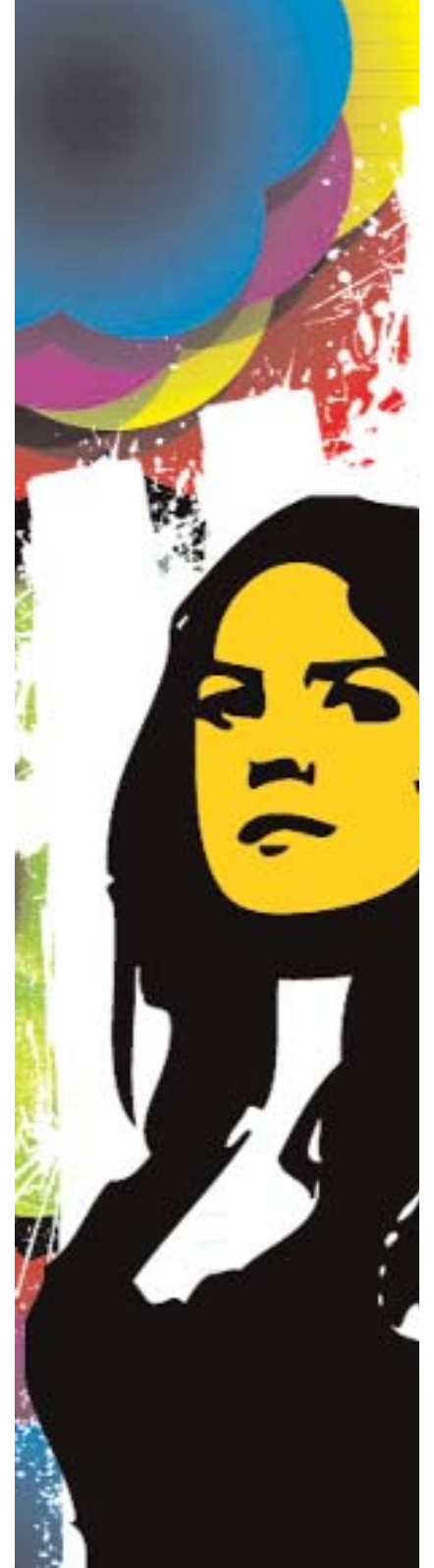
মা, আমি একটা ভালো চাকরি পেয়ে যাব ইনশাল্লাহ! সারা হতবাক, কী বলছে অর্ক। এই চাকরি করবি না! অর্ক মাথা দোলায়।

কেন অর্ক?

মা এই প্রশ্নের উত্তরটা শুধুই আমার কাছে থাকুক। অর্ক কখনো কোনোদিনও কিছু মায়ের কাছে আড়াল করেনি। চাকরি বা রাত্রির বিষয়ে কিছু বলল না।

সন্ধ্যায় অর্ক একাকী ছাদে বসে সূর্যাস্ত দেখে।

ইরিনার লেখা কবিতা কুচিকুচি করে ছিঁড়ে ফেলে। অহেতুক কল্পনার জাল থেকে নিজেকে মুক্ত করা ভালো। হঠাৎ করে কিছু না হওয়া আরো ভালো। মোবাইলে ম্যাসেজ অপশনে ইরিনার ছোট্ট একটা ম্যাসেজ, দুঃখিত আপনার পদটা আর খালি নেই।





নিবন্ধ

যত মত তত পথ বৈচিত্র্য যত সৌন্দর্য তত

প্রশান্ত হালদার

কিছুদিন আগের কথা। এক বিয়ের অনুষ্ঠানে গিয়েছি। হিন্দু বিয়ে। বর ও বরযাত্রীরা এলো। আসরে প্রস্তুত পুরোহিত। বর ও কনেকেও আনা হলো বিবাহবাসর বা বিবাহকুঞ্জে। শুরু হয়েছে বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা। আনুষ্ঠানিকতার এক পর্যায়ে 'সাত পাক'-এর সময় বর ও কনে পক্ষের তর্কাতর্কি শুরু হলো। কী নিয়ে তর্ক? কনে পায়ে হেঁটে সাত পাকের পর্ব শুরু করছিলো মাত্র— আর অমনি বরপক্ষের একজন থামিয়ে দিয়ে বলে বসল: না, আমাদের এলাকায় তো কনে পায়ে হেঁটে সাত পাক ঘোরে না! আমার তিন মেয়ে বিয়ে দিয়েছি, তারা কেউ হেঁটে ঘোরেনি। —আমাদের এলাকায় তো ঘোরে। আমার বড় মেয়েকে

বিয়ে দিয়েছি, তাকেও তো...

—এটা নিয়ম না।

—এটা নিয়ম, আমাদের এলাকায় এভাবেই বিয়ে হয়।

—না, আমরা তা মানব না। কোনো অনিয়ম আমরা মানতে পারবো না। মেয়েকে পিড়ির উপর বসিয়ে, দুজন পিড়ি ধরে তাকে সাত পাক ঘোরাবে— এটা নিয়ম।

—ও, আমাদেরটা তাহলে অনিয়ম?

—তাছাড়া কী? সত্যি, হাসালেন, বাপের জন্মেও এরকম বিয়ে দেখিনি!

—বেশি কথা বলবেন না। খুব বেশি কথা বলছেন

আপনারা।

—শাস্ত্রের বাইরে আমরা যেতে পারব না, ব্যস।

—শাস্ত্রে আছে হেঁটে সাত পাক দেয়া যাবে না?

—আছে।

—সত্যি আছে?

—আলবৎ আছে।

—দেখান শাস্ত্র।

—আপনি গিয়ে দেখুন।

—না-না দেখান, শাস্ত্র খুলে দেখান।

—আপনি গিয়ে দেখেন না, আমাকে বলছেন কেন?

তুমুল হট্টোপোল। সবাই কথা বলছে, তর্ক করছে,

শিশু-কিশোর-যুবা-বৃদ্ধ সবাই। কনে ও কনের

সহচররা ঠায় দাঁড়িয়ে রইল; কিংকর্তব্যবিমূঢ়।

কনেপক্ষ-বরপক্ষ নিজ নিজ সিদ্ধান্তে অন্য। পরিস্থিতি

খুব জটিল হয়ে গেল। বিয়ে ভেঙে যাবে—এরকম

একটা থমথমে মুহূর্ত! তখন একজন প্রৌঢ় উঠে

দাঁড়িয়ে বরপক্ষের উদ্দেশ্যে হাতজোড় করে খুব

বিনয়ের সঙ্গে বলল: আমার একটা নিবেদন আছে।

আমরা মেয়ে বিয়ে দিচ্ছি, না হয় আমাদের নিয়মেই

সাতপাক ঘুরুক। বাসি বিয়েটা তো আপনার

ওখানে গিয়ে হবে, তখন আনুষ্ঠানিকতাগুলো

আপনাদের নিয়মেই সারবেন। প্রৌঢ় কিছুক্ষণ থেমে

আরও বিনয়ের সাথে বলল: এই বিয়ের ভেতর দিয়ে

আপনাদের সঙ্গে আমাদের আত্মীয়তার সম্পর্ক হচ্ছে,

আপনারা আমাদের পরম আত্মীয়। আজ আমরা

আমাদের নিয়মেই আপনারদের আপ্যায়ন করি? বিবাহ-

সহ কনে বিদায় পর্যন্ত আমাদের নিয়মে করার সুযোগ

দেন। আমরা তো হিন্দু, ধর্ম এক। বিবাহও এক। তবে

কিনা আচার-আচারেণে একটু-আধটু পার্থক্য হয়ে

যাচ্ছে। কাল কন্যাযাত্রী হয়ে আমরা তো আপনারদের

ওখানে যাব। তখন আমাদের অভ্যর্থনা জানানো,

আপ্যায়ন করা, বিদায় পর্যন্ত যেসব আনুষ্ঠানিকতা তা

আপনাদের নিয়মেই করবেন। তখন আমাদের সঙ্গে না

মিললেও আমরা মেনে নেব। অনুমতি দেন।

নরম কথায় বেশ কাজ হলো। প্রৌঢ়ের এই কথার পর

পুরো আসরের গুমোট পরিবেশ কিছুটা নমনীয় হয়ে

এলো। তবু বরপক্ষের দু-একজন তখনও অল্পস্বল্প

গজরাতে লাগল। আর কন্যাপক্ষের নীরব থাকলেও

‘জিতছি’ এমন একটা ভাব। খানিকক্ষণ চুপ থাকার

পর বরপক্ষের যে ভদ্রলোক, মূল তার্কিক — সে বলল,

তাহলে আমাদের কথার কোনো দাম থাকল না?

আপনারাই জিতলেন?

যখন কোনো তর্ক-বিতর্ক হয়, কিংবা যুদ্ধ শুরু হয়—

তখন যুক্তির চেয়ে ‘আমার’ কথার মূল্য থাকা- না

থাকা, মানবিকতার চেয়ে ‘হার-জিৎ’ বড় হয়ে দাঁড়ায়।

সহনশীলতার চেয়ে ‘ইগো’টাই তখন মূল। ‘আমিই

সত্য’, ‘আমিই সঠিক’ কী এক ভয়াবহ তত্ত্বের নাম!

হিন্দু বিয়েতে এই যে ‘সাতপাক ঘোরা’—অনেক

অঞ্চলে অনেক রকম দেখেছি। কোথাও কনে হেঁটে

হেঁটে সাত পাক ঘুরেছে, পিঁড়িতে বসিয়ে ভাই কিংবা

ভগ্নিপতিরা সাতপাক ঘুরিয়েছে কোথাও, কোনো

অঞ্চলে কনেকে কোলে চড়িয়েও সাতপাক ঘুরাতে

দেখেছি, কোথাও বর-কনে একসঙ্গে পরস্পরের হাত

ধরে বিবাহকুঞ্জের চারদিক ঘিরে ঘুরেছে সাতপাক।

আবার কোনো বিয়ের অনুষ্ঠানে আলাদা আলাদাভাবে

কনে বরকে ঘিরে যেমন, তেমনি বরও কনেকে ঘিরে

সাত পাকের আনুষ্ঠানিকতা সেরেছে দেখেছি।

আমার ছোটবেলার কিছু মন খারাপ করা স্মৃতি আছে।

দেখেছি, অনেক সময় হিন্দুদের কেউ কেউ

মুসলমানদের ‘বিয়ে’ নিয়ে কটাক্ষ করছে : ফ্যা!

মুসলমানদের আবার বিয়ে। বিবি কবুল?—কবুল; হয়ে

গেল বিয়ে। বাদ্য নেই-বাজনা নেই—লগ্ন নেই, কিসের

বিয়ে? তার মানে ওই হিন্দু মানুষটি তারটাই সঠিক

মনে করছে, সুন্দর মনে করছে, একমাত্র সত্য মনে

করছে; তাই অন্যেরটা তুচ্ছ ভাবছে। আবার

মুসলমানদের দু’একজনকে দেখেছি হিন্দুদের ধর্ম নিয়ে

হিন্দুদের সামনেই কটাক্ষ করতে: তোদের আবার ধর্ম

কী? মাটির মূর্তি পূজা করিস, আল্লাহ-খোদা মানিস না,

মানুষ মারা গেলে আগুনে পুড়িয়ে দিস, এটা কোনো

ধর্ম হলো? ওই ছোটবেলায় খুব মন খারাপ হয়ে যেত।

বিভ্রান্তিবোধ করতাম। ওই হিন্দু কিংবা মুসলিম

মানুষটার কথা বা আচারণ বা ধরণ আহত করত,

বিব্রত করত। কিন্তু কী করার আছে—আমি ছোট মানুষ

যে। সেই বালকবেলার আরও কিছু ঘটনা মনে পড়ে।

খুবই ছোটখাট ঘটনা হয়ত অনেক সময় অনেক

ছোটখাট ঘটনার মাধ্যমেই অনেক বড় ঘটনার বীজ

(বিষ) লুকিয়ে থাকে। কিংবা এই যে ‘ছোটখাট’

বললাম—সবসময় আদৌ কি তা ছোটখাট? সেই সময়

কোনো অনুষ্ঠান বা আয়োজনে কলাপাতায় খাওয়ার

রেওয়াজ ছিল। হিন্দুরা খেত কলাপাতার ওপর পাশে,

আর মুসলমানরা খেত কলাপাতার নিচের দিকটায়।

এমনটি অন্য কোথাও প্রচলিত ছিল (আছে) কিনা জানি

না। আমি একেবারে আমার নিজের অঞ্চলের কথা

বলছি। তো এই কলাপাতায় খাওয়া নিয়েও উভয়

সম্প্রদায়ের মধ্যে একটু-আধটু খোঁচা দিয়ে পরস্পরের

সঙ্গে ঠাট্টা-বিতর্দপ করতে দেখেছি। খোঁচা-খুঁচি করতে

গিয়ে মন কালা-কালিও হয়েছে। আরও একটা প্রসঙ্গ

বলি: ভাত খাওয়ার সময় হিন্দু পরিবারে সাধারণত

ভর্তা-ভাজি-সবজি-ডাল-মাছ-মাংস এমন

ধারাবাহিকতায় খাওয়া চলে। আর মুসলিম পরিবারে

ভর্তা-ভাজি-সবজি-মাছ-মাংস এবং সবশেষে ডাল।

সব একইরকম, শুধু ডালটুকু তারা সবার শেষে খায়।

তো এই ‘ডাল’ খাওয়া নিয়েও অনেক সময় পরস্পরের

প্রতি বিরূপ মন্তব্য ছুঁতে দেখেছি, পরস্পরকে খাটো

করতে দেখেছি।

এবার একটু পূজা বিষয়ে ঘুরে আসা যাক। এই বাংলা

অঞ্চলে (বাংলাদেশ ও পশ্চিম বাংলাসহ) হিন্দুদের

প্রধান পূজা উৎসব কী? দুর্গাপূজা। উত্তর ভারত

অঞ্চলের হিন্দুদের কাছে প্রধান উৎসব গণেশপূজা।

আবার কোনো অঞ্চলে কালীপূজা প্রধান উৎসব।

আবার এক হিন্দু হয়েও ভারতবর্ষের সব অঞ্চলের

বিবাহিত নারীরা শাঁখা-সিন্দুর পরে না। আগে হিন্দু

বিধবারা চুল কেটে ফেলত, নিরামিষ খেত, সাদা শাড়ি

পরত; এখন চুল কাটে না, নিরামিষ খায় না, এমনকি

সাদা শাড়ি পরার রেওয়াজও উঠে যাচ্ছে। তাহলে

কোনটা ভালো? কোনটা সঠিক? কোনটা উচিত?

আচ্ছা, এটা কি আদৌ কোনো সঠিক-বেঠিক, ভালো-

মন্দ, উচিত-অনুচিতের ব্যাপার? নাকি যার যার

বিশ্বাস-ভালোলাগা-ভালোবাসা-অঞ্চল-গোষ্ঠী-

সম্প্রদায়-সংস্কৃতি-ঐতিহ্য ও সময় এর বিষয়? আমরা

‘এক’ হয়েও অনেক সময় অঞ্চলভেদের কারণে

ধর্মভেদের কারণে, জাতিভেদের কারণে কিংবা

সময়ভেদের কারণে সেখানে এক একটা সংস্কৃতি-

ঐতিহ্য-আদল গড়ে ওঠে। যার সঙ্গে হয়ত আমার

সংস্কৃতি-ঐতিহ্য-আদলের পুরোপুরি মিল থাকে না,

কখনও হয়ত একেবারেই মিল থাকে না। তাই বলে

তাদেরটাকে আমি ভুল বলব? মন্দ বলব? কেন?

আবার ওরা যদি আমারটাকে ভুল বলে? মন্দ বলে?

তাহলে? পরস্পর পরস্পরকে ‘ভুল’ বলে অটল দাঁড়িয়ে

থাকলে তার কী সমাধান? অথবা সমাধানের আদৌ

প্রয়োজন আছে কিনা?

খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের মাথ্যেও মতভেদ আছে,

ক্যাথলিক ও প্রটেস্ট্যান্ট, কিন্তু উভয়েই যীশুকে মানে।

নিরীশ্বরবাদী হয়েও বৌদ্ধদের মাথ্যে মতভেদ, হিনজান-

মহাজান, কিন্তু দুপক্ষই গৌতম বুদ্ধকে মানছে। আবার

মুসলমানদের মাথ্যেও ভিন্নতা লক্ষ্য করি। একই

ইসলাম ধর্মের হয়েও কেউ শিয়া, কেউ সুন্নি কিংবা

অন্য কিছু। সবাই কিন্তু হজরত মুহাম্মদ সা-কে নবী

মেনেই কেউ কেউ কোনো কোনো ব্যক্তি বা বিষয়কে

কখনো কখনো আলাদা আলাদা প্রাধান্য দিচ্ছে।

আমাদের এখানে মিলাদ পড়ার রেওয়াজ আছে, যা

আরব দেশগুলোতে নেই। একই আরবভুক্ত হয়েও

আবার সেখানকার দেশে দেশে নানা বিষয়ে নানা

ভিন্নতা আছে। একেশ্বরবাদী হয়েও হিন্দুরা বিভিন্ন

দেব-দেবীর আরাধনা করে। দেব-দেবী ছাড়াও বিভিন্ন

ধর্মীয় গ্রন্থের মতানুসারীও তারা হয়—যেমন, লোকনাথ

ব্রহ্মচারী, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র

এমন সব। আর হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান এর

বাইরেও পৃথিবীতে আরও আরও ধর্ম আছে। আছে না?

কী বলব তার বেলা? ইতিহাস সাক্ষী—এই ভিন্নতা

নিয়ে সম্প্রদায় সম্প্রদায়ে দেশে দেশে বহু কমে

হয়নি, কমে রক্ত ঝরেনি।

তাহলে কী দাঁড়াল ঘটনাটা? এক ধর্মীয় সম্প্রদায়ের

মানুষের সঙ্গে অন্য ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মানুষের ভিন্নতা

শুধু নয়, নিজ নিজ ধর্মের নিজ সমাজের নিজ অঞ্চলের

মানুষের মাথ্যেও ভিন্নতা। আর এই ভিন্নতার প্রতি

আমরা সহনশীল নই, শ্রদ্ধাশীল নই। নই বলেই রাষ্ট্রে-

ধর্মে-সমাজে বিরোধ ও বিভেদের শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত

হচ্ছে। আচ্ছা, ধরা যাক—বাংলাদেশ ভাবল: এ দেশে

মুসলমান ছাড়া আর কেউ থাকবে না; ভারত ভাবল:

সেখানে হিন্দু ছাড়া আর কেউ থাকবে না; ওদিকে

আমেরিকা ভাবলো ওখানে খ্রিস্টান ছাড়া আর কারো

জায়গা নেই; মিয়ানমার মনে করল: বৌদ্ধ ছাড়া অন্যের

স্থান এখানে হবে না—অনেকে তো খানিকটা খানিকটা

এমনটা ভাবি, স্বপ্ন দেখি—না? কী ঘটবে তাহলে?

ধরে নিই—আমার উঠানে কিংবা ছাদে ফুল বাগান

করলাম, সেখানে চাষ করলাম শুধুই গোলাপ বা শুধুই

গাঁদা কিংবা শুধুই রজনীগন্ধা। হ্যাঁ এটার একটা

সৌন্দর্য আছে। কিন্তু তারচেয়ে যদি এক এক কোণে

গোলাপ, অন্য কোণে গন্ধরাজ, কিছুটা জায়গাজুড়ে

গাঁদা, গোটা কতক বেলিফুল, দু-একটা জবা, মাধবী,

হাস্লামহো ইত্যাদি ইত্যাদি—এমনটা হয় যদি? কোনটা

বেশি সুন্দর? আসলে একক কোনো সত্তা, একক

কোনো বস্তু বা একক বিষয় কখনোই তেমন কোনো

অর্থবহ হয়ে ওঠে না, বৈচিত্র্য থাকলে যেমনটা সুন্দর

ও অর্থবহ হয়ে উঠতে পারে। বিচিত্রতাই প্রকৃতির

নিয়ম, জীবনের নিয়ম। এই যে পৃথিবীতে, দেশে দেশে

কত রকমের উদ্ভিদ, কত রকমের ফুল, কত রকমের

প্রাণি! এই জন্যই তো এই পৃথিবী, এই প্রকৃতি এত

সুন্দর! এই জন্যই তো জীবনটা অর্থবহ।

কোরালয় গিয়েছিলাম ফেব্রুয়ারিতে। সেখানে খেতে

গিয়ে সমস্যা পড়ছিল। কোনো কিছুই ভালোভাবে

খেতে পারছি না। কেননা ওরা নারকেল তেল দিয়ে

রান্না করে, আর ওখানকার রান্নার ধরনটাও অন্যরকম।

বাংলাদেশের সঙ্গে মিল নেই। তো এক দুপুরে খেতে

গিয়ে দেখলাম মেনুতে বেগুন ও টেঁড়স আছে। দেখে

খুশি হলাম, কিন্তু তাও ভালো লাগলো না। ঠিকমতো

থেতে পারলাম না। আমার সহকর্মী বিরক্ত হয়ে বলে উঠল: শালারা যে কী খায়! ওই একই কথা তো কেরালার একজন ঢাকায় এসে থেতে বসে বলবে। বলবে না? বাংলাদেশেও কি এক জেলার রান্নার সঙ্গে অন্য জেলার পার্থক্য থাকে না? জেলা বাদ দিলাম—আমার বাড়ির রান্না আর পাশের বাড়ির রান্নাও কি এক হয়? আর একই পরিবারের দুই বউয়ের রান্নাও কি হুবহু এক?

বিষয়টা ধীরে ধীরে হালকা হয়ে যাচ্ছে কী? আচ্ছা, একটু হালকাই করা যাক। আমরা যারা গান শুনি কিংবা গান চর্চা করি তারা অনেক সময় কিছু তর্কে লিপ্ত হই। যেমন: রবীন্দ্র সংগীতই সেরা-কারো সঙ্গে এর তুলনা হয় না; ব্যান্ড সংগীতের কেউ মনে করল-ধুর! রবীন্দ্র সংগীত, প্যানপ্যানানি! কোনো শহুরে নাগিরক যে আধুনিক গানের শ্রোতা সে হয়ত বলল—পল্লীগীতি আবার গান নাকি, ওসব তো চাষার শোনে; যে ক্লাসিক্যাল চর্চা করে বা শোনে সে হয়ত অন্যান্য সংগীত নিয়ে উন্মাদিত প্রকাশ করতে কুণ্ঠাবোধ করে না। এর বিপরীতে আমরা যদি ভাবি—আরও কত কত রকমের গান এই ভূখণ্ডে, কত বৈচিত্র্য আমাদের সংগীতে; সব মিলেই না আমাদের সঙ্গীত সমৃদ্ধ হয়েছে। যদি শুধুই রবীন্দ্র সংগীত শুনতে হতো আমাদের, কিংবা শুধুই ব্যান্ড, শুধুই ক্লাসিক্যাল? কী বিপত্তি ঘটত, ভাবা যায়? যদি একই খাদ্য প্রতিদিন গ্রহণ করতে হতো আমাদের? শরীরের পুষ্টি কোথা থেকে আসত? কেমন অরুচিকর ও একঘেয়ে হতো না বিষয়টা? এই যে বাংলাদেশে নানা ধর্মের, নানা জাতিসত্তার মানুষের বাস; এই যে নানা ধরনের সংগীত; কত ধরনের খাদ্য যে আমরা খাই; কত রকমের পোশাক যে আমরা পরি; কত রকমের ফুল-পাখি-নদী—এই যে বিচিত্রতা, এই বিচিত্রতাই জীবনের মান ও গতি বাড়িয়ে দেয়, সৌন্দর্য বাড়িয়ে দেয়। জীবনটাকে, পৃথিবীটাকে আর একঘেয়ে মনে হয় না, বেঁচে থাকাটা আরও অর্থবহ ও আনন্দময় হয়ে ওঠে। আমরা অন্যেরটাকে সাধারণত কম গুরুত্বপূর্ণ ভাবি, কখনো কখনো গুরুত্বহীনও ভাবি। যে ছাত্র সঙ্গীত নিয়ে পড়ছে সে হয়ত গণিতকে কম গুরুত্বপূর্ণ ভাবে; যে গণিত নিয়ে পড়ছে সে হয়ত ভাবে দর্শন শাস্ত্র নিয়ে কী এমন হবে; দর্শনের লোকটি হয়ত বুঝতে চায় না বিজ্ঞানের গুরুত্ব, আর বিজ্ঞানের অধ্যাপক হয়ত সাহিত্যের প্রয়োজনীয়তা খুঁজেই পায় না। এমনটাই সাধারণত হয় আর কি। অন্যেরটার গুরুত্ব বুঝতে পারি না— বুঝতে চাই না, আর নিজেরটাকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মনে করি। তো সাহিত্যের কথা এসে গেল যখন, তখন আরও একটা কথা বলা যাক। এটা হয়ত আরও একটু হালকা কথা। যখন যশোর মাইকেল মধুসূদন কলেজে পড়ি—আমাদের পাঠ্য ছিল ‘সাজাহান’ নাটক। তো পরীক্ষায় প্রশ্ন এসেছিল: সাজাহান নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র কে? আমি লিখেছিলাম— সাজাহান নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র ‘জাহানারা’ এবং সেভাবে যুক্তি দাঁড় করিয়েছিলাম। আমার দ্বিতীয় সহপাঠী বন্ধু কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসেবে উল্লেখ করেছিল ‘সম্রাট সাহাজান’-কে এবং সেভাবেই ব্যাখ্যা করেছিল সে। আর তৃতীয় সহপাঠী ‘আওরঙ্গজেব’-কে কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসেবে উল্লেখ করেছিল। স্যার কিন্তু সবাইকেই নম্বর দিয়েছিল। আচ্ছা, স্যার কি সাজাহান, জাহানারা, আওরঙ্গজেব এই তিনজনকেই কেন্দ্রীয় চরিত্র মনে করে? এই তিনজন ছাত্রের সঙ্গেই কি সে একমত? নিশ্চয়ই না। স্যারেরও

নিশ্চয়ই নিজস্ব একটা মত ছিল। সাজাহান নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র সম্পর্কিত তার মতের সঙ্গে, ভাবনার সঙ্গে এই তিন ছাত্রের ভাবনার কারোর মিল ছিল, কারোর ছিল না। তাহলে স্যার তিনজনকেই নম্বর দিল কেন? আমার ভাবনাই একমাত্র ভাবনা, আমারটাই সঠিক— এমনটি না ভেবে এখানে স্যার তার ছাত্রদের ভাবনা-বিবেচনা-ব্যাখ্যা-যুক্তিকেও গুরুত্ব দিয়েছিল। আর একটা কথা দিয়ে এবার শেষের দিকে এগোনো যাক, এটাও নিতান্তই হালকা কথা। ধরা যাক— আমরা নয়জন বন্ধু, ঢাকায় থাকি সবাই। কোনো ছুটিতে আমরা পরিবার-পরিজনসহ যশোর যাবো। যশোর আমাদের গন্তব্য। তো কোন পথে যাব তা নিয়ে একটু মতবৈতন্য হলে। আমি ও অন্য একজন— এই দুই পরিবার একসঙ্গে সড়কপথে সোহাগ পরিবহনের বাসে করে পটুরিয়া-দৌলতদিয়া ঘাট পার হয়ে যশোর গেলাম। তৃতীয়জন ওই একই পথে গেল কিন্তু সে গেল ঈগল পরিবহনে করে। চতুর্থ বন্ধুটি গেল মাওয়া ঘাট হয়ে, ডেঙে ডেঙে। পঞ্চম বন্ধু মাইক্রোবাস রিজার্ভ করে যমুনা নদীর বঙ্গবন্ধু সেতু হয়ে যশোর পৌঁছল। ষষ্ঠ বন্ধু একটু দেরিতে রওনা দিয়ে প্লেনে করে যশোর নামল। সপ্তম বন্ধুটি সদরঘাট থেকে নৌপথে আগেই চলে গিয়েছিল বাগেরহাট, সেখান থেকে সড়কপথে খুলনা হয়ে যশোর এলো। কিন্তু অষ্টম বন্ধুটি মত পরিবর্তন করে যশোর না গিয়ে গেল রাঙামাটি। আর নবম বন্ধু ছুটিতে কোথাও গেল না, ঢাকাতেই থাকল। যশোর তো পৌঁছানো গেল, তবে ভিন্ন ভিন্ন পথে, আবার একই পথে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে। কেউ যশোরে না এসে গেল অন্যত্র, কেউ আবার কোথাও গেল না— ঢাকাতেই রয়ে গেল। আচ্ছা, আমরা যদি এমন করতাম: ধরা যাক, আমি বললাম— যশোর অনেক সুন্দর, অনেক ভালো, সবাইকে যেতেই হবে যশোর। অথবা যে বন্ধু রাঙামাটি গেল, সে যদি বলল— সবাইকে রাঙামাটি যেতে হবে, যশোর এমন কি আর, রাঙামাটি যশোরের চেয়ে অনেক সুন্দর! আর ঢাকায় থেকে যাওয়া বন্ধুটি যদি জোর করত ঢাকায় থেকে যাবার জন্য? আর যে বন্ধু প্লেনে গেল সে যদি জোর খাটাতো যে সবাইকে প্লেনে যেতে হবে। তাহলে? সবাই যদি যার যার পছন্দ-আকাঙ্ক্ষা-ভাবনা-ভালোলাগা-স্বাদ-সুবিধা নিয়ে গৌ ধরে থাকতাম— কী হতো তাহলে? আমি জোর খাটালে অন্য একজন শুনবে কেন? তার পছন্দ-অপছন্দ, সুবিধা-অসুবিধা আছে না? সে জোর খাটালে আমি কি মানতাম? তো আমি না মানলে সে মানবে কেন? কদিন ধরে সবাই মিলে যশোরে ঘুরে এই যে অনেক আনন্দ নিয়ে ঢাকায় ফিরে এলাম, রাঙামাটি থেকে ফেরা বন্ধুর মুখে সেখানকার কত মজার মজার গল্প শুনলাম, আমরাও আমাদের গল্প ওকে বলেছি, আর ঢাকায় থেকে যাওয়া বন্ধুটি আমাদের সব গল্প শুনে ও-ও খুব মুগ্ধ হলো, যেন ও-ও গিয়েছিল আমাদের সঙ্গে। আমরা যার যার ইচ্ছামতো জবরদস্তি করলে পরিস্থিতি কী দাঁড়াতো? যশোর যাওয়া হতো? হলেও আনন্দ নষ্ট হতো না? অনেক আলাপ হলো। অনেক ভারী বিষয়, অনেক হালকা বিষয় নিয়ে কথা হলো। কাউকে মনোকাঙ্ক্ষা দেবার জন্য নয়, মনে আনন্দ নিয়ে শেষ করার জন্য এতো সব বলা। শেষ করা যাক তাহলে এবার। আসলে সকল বিষয়ে, সকল কাজে একমত্যের প্রয়োজন নেই বোধহয়, বোধ করি তা সম্ভবও নয়। বিবাহে কনে সাতপাকের সময় কীভাবে ঘুরবে তা কে ঠিক করে দেবে? আগেই বলেছি— শাস্ত্রের বাইরে

দেশভেদে, জাতিভেদে, ধর্মভেদে, অঞ্চলভেদে, গোত্রভেদে, সমাজভেদে বা সম্প্রদায়ভেদে মূল সংস্কৃতির বাইরেও আলাদা আলাদা এক একটা সংস্কৃতি গড়ে ওঠে; একটা শাখা-প্রশাখার মতো। এটা বিভেদ নয়, ভিন্নতা। এই ভিন্নতা প্রকৃতির নিয়ম, প্রকৃতির নিয়ম কি বদলানো যায়? তবে হ্যাঁ, অনেক সময় কারো কারো সঙ্গে একমত্য হবে, হবে যে না তা তো নয়। হয়েছে বলেই তো আমরা এতগুলো বন্ধু ছুটি কাটাতে যশোর গিয়েছি। আরও একমত্য হয়েছে আমাদের দ্বিতীয় বন্ধুটির সঙ্গে; সে আমার সঙ্গে একইসঙ্গে একই বাসে একই পথে যশোর গিয়েছে। বাকি বন্ধুরা তো তা করেনি; করেনি বলেই কি তারা খারাপ? তারা আর আমার বন্ধু থাকবে না? শত্রু বলে ধরে নেব তাদের? ক্ষুব্ধ হবো তাদের ওপর? আসলে সমস্যা হয় তখন— ‘আমিই সেরা’, ‘আমিই সঠিক’, ‘আমিই একমাত্র সত্য’, ‘আর সব মিথ্যে’— এমন মনোভাব পোষণ করি যখন। সে ধর্মই হোক, সমাজই হোক, কিংবা রাজনীতিতে। যখন ‘আমিই’ এবং ‘একমাত্র’ শব্দ দুটি আমাদের মগজে ঢুকে যায় তখনই সমস্যা জটিলতর হয়। তখনই আমি অন্যের ঘাড়ে চেপে বসি, তাকে অসম্মান করি, তাকে নিগৃহীত করি, হত্যা করি। আমিই সঠিক, আমিই একমাত্র সত্য—এ কথা তো শুধু আমি একা বলছি না, সেও বলছে, অন্য আরও কেউ বলছে। তাহলে কে সঠিক? কে সত্য? কে নির্ধারণ করবে তা? এর সমাধানই বা কী? হয়ত আমি ভাবলাম এভাবে সাতপাক ঘোরা উচিত, কিন্তু ওরা অন্যভাবে ঘুরল— তাতে তার হিন্দুত্ব নষ্ট হয়ে গেল কি? বা আমার কোনো ক্ষতি হলো? আমরা অনেক সময় শাস্ত্রের কথা বলি। হ্যাঁ, শাস্ত্র মানব কল্যাণের জন্য, সমাজের বন্ধনের জন্য। কিন্তু সব শাস্ত্র কি একই কথা বলে? সব শাস্ত্র কি একই শাস্ত্র? আবার সব সমাধান কি শাস্ত্রে থাকে? শাস্ত্রের বাইরেও আরও কত কিছু আছে না? তাই তো শাস্ত্রের বাইরে গিয়েও মানুষ তার জীবনের অনেক সমাধান খুঁজে নেয়, নিতে হয়। তাতে দোষ ধরার কিছু নেই বোধহয়। মূল কথা অপরের মত ও পথের সঙ্গে একমত না হলেও তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা, তাকে সম্মান করা। আরও একটু নিচে নেমে বলি: শ্রদ্ধা বা সম্মান করতে না পারলেও অন্তত এটুকু তো করা যায়, অশ্রদ্ধা বা অসম্মান করা থেকে বিরত থাকা। একটু সহনশীল থাকা। চুপ থাকা। মোট কথা কারো ভাবনা, কারো বিশ্বাস, কারো কাজ দ্বারা যদি আমি আক্রান্ত না হই, আমার জীবন বিপন্ন না হয়, এই পৃথিবী বিপন্ন না হয়, তাহলে আমার ভাবনা-বিশ্বাস-কাজের সঙ্গে অমিল থাকলেও ততক্ষণ পর্যন্ত আমার ক্ষুব্ধ হবার প্রয়োজন কী? যশোরে তো নানা পথে নানা যানে নানা ভাবেই পৌঁছানো গেল, তাই না? আবার কেউ কেউ তো যশোর না গিয়ে রাঙামাটিও যেতে পারে, কেউ যশোর-রাঙামাটি না গিয়ে ঢাকাতেই থাকুক। তাতে ক্ষতি কী? ক্ষতির তো কিছু নেই।

পৃথিবী আরও... আরও সুন্দর হয়ে উঠুক। ফুলে-ফলে শোভিত হোক শস্যক্ষেত, পুষ্পলতা, বৃক্ষকূল। আনন্দে-বিষাদে মানুষের পাশেই থাকুক আরেক মানুষ। চন্দ্র উঠুক, সূর্য উঠুক, বৃষ্টি নামুক। আকাশময় উড়ুক রঙিন বেলুন পাখির ঝাঁক; একটা সাদা পতাকা উড়ুক আকাশময়। পৃথিবীর এই ভিন্নতা তথা বৈচিত্র্য প্রতিষ্ঠিত থাকুক, বিভেদ আর বিরোধ দূর হোক। ‘সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই’।



YOUR
Dream
OUR PLEDGE ...

APARTMENTS FOR SALE...

Banani (2245 sft.)
Bashabo (1170-1185 sft.)
Bashundhara (1640 sft.)
Chamelibagh (1365-1575 sft.)
Dhanmondi R/A (2200-2235 sft.)
Kathalbagan (1180-1220 sft.)
Maghbazar (1470-1675 sft.)
Mirpur (965-1575 sft.)
Motijheel (895 sft.)
Siddheswari (1335-2060 sft.)
Uttara (805-1600 sft.)

COMMERCIAL SPACE FOR SALE...

Mirpur (525-1615 sft.)
Siddheswari (1565 sft.)



শেলটেক  *Since 1988* SHELTECH

SHELTECH TOWER: 55, Bir Uttam Qazi Nuruzzaman Road (West Panthapath), Dhaka-1205, Bangladesh
01713-091701, 01713-091702, 01713-091703, 01713-091704, 01713-091705
01713-091707, 01713-091708, 01713-091709, 01713-091710, 01713-091715

FOUNDER MEMBER
BEHAB # 036/1502



গল্প

হৃদয়ের নিভূতে

আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ

উৎকর্ষ হয়ে শোনে সৈয়দ। মাঝে মাঝে যেন আরো তীব্র হয়ে উঠতে চায়। তখন অস্পষ্ট শব্দ স্পষ্ট হয়ে তরঙ্গের মতো ছড়িয়ে পড়ে এ ঘরে। কিন্তু কাঁদছে কেন রানু? দেহের ডাল ভেঙে যাওয়ার দুঃখে। সৈয়দ নিজেই আশ্চর্য হয়ে যায় এ কথা ভাবার পর। তার কান্নার ভেতরের আত্ননাদ তাকে বিন্দুমাত্র স্পর্শ করে না। অথচ তার প্রকৃতি এমন নয়। আশ্চর্য এক তমিষায় তার সহানুভূতি বিলীন হয়ে গেছে। ব্যর্থতার কান্না মনে হয় কুৎসিত ব্যাধিগ্রস্তের আত্ননাদের মতো। এ কথা মনে হতেই নিজেকে অনেক ছোট বলে মনে হয়। বালিশে মুখ গুঁজে চুপ করে থাকে অনেকক্ষণ ধরে। এক সময় কান্নার শব্দ আর শোনা যায় না। সৈয়দ আগের মতোই নীরবতার মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে রাখে।

এখনই হয়তো রানু এ ঘরে এসে বসবে চেয়ারের ওপর। যেমন করে সে অন্যদিনের মতো আসে এখানে। প্রতীক্ষায় বসে বসে টেবিলের ওপর সাজানো বইগুলো নাড়াচাড়া করে দেখে। বই কেনা পছন্দ করত না রানু।

‘এত বই কেন কেনো?’

গল্প করার এক ফাঁকে একদিন প্রশ্ন করেছিল সৈয়দের চোখের দিকে তাকিয়ে। সৈয়দ হেসেছিল অনেকক্ষণ ধরে।

‘প্রশ্নটা মেয়েদের মতোই শোনাগে রানু। এর উত্তর এক অর্থে নেই, আবার অন্যদিকে আছেও। বই কেনা নেশা হলেও তোমাদের চুড়ি, শাড়ি কেনার নেশার মতো ক্ষণভঙ্গুর নয়। এত সহজে ভাঙেও না, নষ্টও হয় না। বরং পুরনো হলে মর্যাদা বাড়ে।’

দৈনিক যায়যায়দিনের সংশ্লিষ্ট
সকলকে পবিত্র ঈদুল ফিতরের
শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন



পত্রিকাজগতের সাথে আমাদের বসবাস অঙ্গাঙ্গিভাবে

শ্রদ্ধাশী ট্রেডার্স

৬/৭, নওয়াব ইউসুফ রোড (আরমানিটোলা), ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭৩৯৪১৮৫, ৭৩৯২৩০৪, ৭৩৯৩৫৮৯ (অফিস)
ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৭৩৯১২৪৮

অপমানে রানুর মুখ লাল হয়ে গিয়েছিল। বইগুলোর ওপর বিরূপতা জন্মালেও চেয়ারে বসলেই আনমনে বই টেনে পাতা ওলটাতো। অনেক পাতায় সৈয়দ পেন্সিলের সরু শিস দিয়ে মূল্যবান লাইনগুলো দাগ দিয়ে রেখেছে। কোথাও লাল দাগ, কোথাও বা সবুজ। আর পাতার পাশে মাঝে মাঝে ছোট করে টিপ্পনি লেখা। অন্যদিনের মতো আজো আনমনেই রানু বইয়ের পৃষ্ঠা ওলটাইছিল। চোখ দুটো ক্রমশ ভারি হয়ে আসছে। সৈয়দ তার অস্তিত্ব টের পেয়েও নিশ্চিন্ত হয়ে শুয়ে আছে। নিরুদ্বেগ, নিরুদ্ভাপ মন। অথচ প্রতিদিনের পরিবেশের মধ্যে থেকেও আজ তার ভেতরটা স্রোতবিহীন নদীর পানির মতো নির্বিকার। রানু সৈয়দের দিকে চেয়ে থাকে এক দৃষ্টিতে। পরিচিত দেহ যেন আজ অপরিচিত পরিবেশে পরিমূলা। আগে তার পিঠে হাত রেখেছে অনেক পরে বিকেলে। রানু বুকের ওপর মুখ রেখে হেসেছে ওর কাণ্ড দেখে। সৈয়দ সঙ্কুচিত হয়ে মুখ তুলে নিয়ে বলেছে, হাসছ কেন?

‘তোমার ছেলেমানুষি দেখে।’

‘তার মানে?’

সৈয়দের কপালের ওপর দু-একটা চুল জড়িয়ে ছিল। রানু সেগুলো সরিয়ে দিতে দিতে হাসল। সৈয়দ অনেকক্ষণ ধরে নারীর চুলের সৌন্দর্য সম্পর্কে বক্তৃতা দেয়। সৈয়দের লোভ ছিল ঘন চুলের দ্বারা নেয়া। রানু সে কথা যেন কোনোক্রমেই ভুলতে পারে না শায়িত সৈয়দের বিস্তৃত চুলের দিকে তাকিয়ে।

রানু মুখ নিচু করে অনেকক্ষণ ভাবে। রানুর কান্না পেল এবার। চোখ দুটো চকচক করে ওঠে।

‘শুনছ?’

সৈয়দের মাথা ঝিমঝিম করে ওঠে। রানুর দেহের তীব্র পারফিউমের গন্ধ তার উপস্থিতি অনেক আগেই বুঝিয়ে দিয়েছিল। এবার উঠে পড়ে সে। রানুর দিকে তাকিয়ে চমকে ওঠে সৈয়দ। দুদিনের মধ্যে এত পরিবর্তন হয়েছে তার? অনবরত কান্নার চিহ্ন দু’চোখে।

‘তুমি?’

রানু বিচলিত হয় না। সৈয়দের প্রশ্নে হাসার চেষ্টা করে। ভীরা চোখ দুটো সামান্য কঁপে উঠেই থেমে যায়।

‘ভাবতে পারিনি, তাই না, তবুও আসতে হলো একটা কথা জিজ্ঞেস করার জন্য।’

রানু মুখ নামিয়ে ভাবে কিভাবে কথা শুরু করবে। দুজন সামনা-সামনি বসে অন্যদিনের মতোই। তবুও যেন তাদের মধ্যে দূস্তর ব্যবধানের প্রশস্ত বেড়া।

সৈয়দ আজ রানুর দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে যায়। এমন সাজসজ্জা করে কোনোদিন আসেনি রানু। দামি শাড়ি পরেছে। কানে ভারি দুলা। বুকের খানিকটা জুড়ে মস্তবড় হারের বিস্তৃত অংশ ঝলমল করছে। রানুর দিকে বিস্মিত দৃষ্টি মেলেই চোখ নামিয়ে নেয় সৈয়দ।

‘তোমার কী আর কিছুই বলার নেই?’

স্থির, প্রশস্ত দৃষ্টি সৈয়দের দিকে মেলে ধরে জিজ্ঞেস করে রানু।

‘আমি তো সব কথা খুলেই জানিয়েছি তোমাকে।’

‘তবুও আর একবার ভেবে দেখনি তারপর?’

‘না।’

‘কিন্তু’।

রানু নিজেকে সামলাতে পারে না। চোখের দু’পাশ বেয়ে কয়েক ফোঁটা পানি গালের ওপর গড়িয়ে পড়ে।

‘আমরা এতদূর এগিয়েছি, তারপর এভাবে ফিরে আসা কী এতই সহজ বলে মনে করো?’— রানু জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে ধরে সৈয়দের দিকে।

‘অনেক পরিকল্পনা করেছিলাম আমরা। এত সহজে সেগুলো নষ্ট করে দিতে চাও?’

সৈয়দ কোনো কথা না বলে চুপ করে বসে থাকে। তার সব কথাই যেন তিন পাতায় শেষ হয়ে গেছে।

নিজেকে নতুন করে চিন্তার কিছুই নেই।

সংশোধনের ইচ্ছাও অনুপস্থিত। অথচ অবাক লাগে রানুর। ক্রান্তিপূর্ণ দুপুরগুলো গল্প আর পরিকল্পনায় অতিক্রান্ত হয়ে যেত। টের পেত না দু’জনের কেউই। মাঝে মাঝে বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস করতো না রানু। পালিয়ে আসত সৈয়দের নির্জন ঘরে। পা টিপে টিপে দরজার কাছে এসে টোকা দিত মৃদু করে।

‘এসো।’

বিছানার একদিকে আধপড়া বইটা রেখে দিয়ে উঠে বসত সৈয়দ।

‘আজও ক্লাসে যাওনি?’

‘ভালো লাগছিল না। তাই চলে এলাম।’

রানু স্টোভ জ্বলে চা করত দু’কাপ। সৈয়দ ওর দিকে তাকিয়ে বলত, এ কী? টিপ দাওনি? রানু পোয়ালায় চিনি ঢালতে ঢালতে মুখ তুলে তাকাত।

‘ও, তাই। মনে ছিল না হয়ত।’

সৈয়দ রানুকে টেনে পাশে বসাত। লাল পেন্সিল এনে কপালে বড় করে টিপ তৈরি করত।

‘যাও এবার।’

সৈয়দ চেয়ারে বসত আর রানু বিছানার ওপর কনুইয়ের ওপর হাত রেখে কাটিয়ে দিত প্রহরের অনুক্ষণ।

‘ছোট একটা বাড়ি থাকবে আমাদের। তিন কামরার। সৈয়দ চায়ের কাপ থেকে মুখ তুলে কৌতূহল নিয়ে তাকাতো রানুর দিকে।’

‘আর বাইরে থাকবে ফুলের বাগান। রোজ বিকেলে একটা করে ফুল তুলে গুঁজে দেব তোমার খোঁপায়।’

রানু চোখ বঁাকা করে ভৎসনা করত। একদিন সৈয়দ স্পষ্ট করে উপলব্ধি করল সে রানুকে ভালোবাসেনি। প্রথম দিন থেকে আজ পর্যন্ত সে চেষ্টা করেছে, কিন্তু তার মনের শূন্যতাকে অতিক্রম করতে পারেনি। যে শূন্যতা তাদের পরিচয়ের মধ্যে দিয়েও পূর্ণ হয়ে ওঠেনি। এতদিনের আলাপ একটা শূন্য ভূমিকার মতো হয়তো বইয়ের প্রচ্ছদের মতো, ভেতরের পৃষ্ঠা নয়। রানুকে

ভালবাসতে পারেনি— একথা অনুভব করার পর থেকেই সচেতন হয়ে উঠেছে সৈয়দ।

রানুর সঙ্গে পরিচয়ের দিন এখনো স্পষ্ট মনে আছে তার। সেদিন নতুন ঠেকেছিল পুরনো রানুকে।

কলেজে দেখেছে অনেক দিন। কখনো উত্তেজনা অনুভব করেনি, কিংবা আবেগও। কৌতূহলও জমা হয়নি। প্রায় ভুলেই গিয়েছিল তার কথা। চার বছর পর নতুন করে দেখা। সে তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের

নতুন পাস করা তরুণ। রানুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল এক অনুষ্ঠানে। তাকে দেখে চোখ তুলে তাকিয়েছিল মাত্র। আগের কিশোরীর মধ্যে অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। সে বিস্ময় নতুন করে চেতনার মধ্যে আশ্রয়

নেয়নি। বরং তখনই মিলিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু রানু নতুন করে মুগ্ধ হয়েছিল সৈয়দকে দেখে। চোখ নামিয়ে নিয়েছিল। গালের দু’পাশ অকারণেই হয়ে উঠেছিল রক্তিম। সৈয়দ তা লক্ষ না করলেও অন্য আর একজন তার অলক্ষ্যে লক্ষ করেছিল। রানুর বাম্ববী অনু।

‘ভালোবেসে ফেলেছিস?’

বাড়িতে ফেরার সময় রিকশায় চড়ে রানুর কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করেছিল অনু। রানু ওর হাতে মৃদু চাপ দিয়ে হেসে ফেলে। অনু সৈয়দকে সব কথা খুলে বলে। বিস্মিত সৈয়দ কোনো কথা বলেনি। পরদিন থেকেই সৈয়দের কাছে রানুর মোটা মোটা চিঠি আসতে থাকে। ক্রমাগত চিঠি পেয়ে খানিকটা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে সৈয়দ। নিজের ভালোবাসার রং যেভাবে চিঠিতে রানু রঞ্জিত করে দেয়। চিঠিগুলো পড়তে ভালো লাগে। কিন্তু সে কোনোদিনই রানুকে কল্পনা করেনি। যারা তার মনের মধ্যে এসে ভিড় জমায়, রানু তাদের মধ্যে পড়ে না। তোমাকে চাইনি, কোনো সময়েই চাইনি রানু— চিৎকার করে বলতে চায় সৈয়দ— তোমাকে কোনোদিন মনের মধ্যে রাখিনি। তবুও একসময় শেষ হয় রূপকথার।

খানিকটা নেশা লেগেছিল তার চোখে। কোনো মেয়ে তার মুখের সামনে ঠোট বাড়িয়ে দিলে এক মুহূর্তে স্পর্ধিত অহংকার চূর্ণ হয়ে যায় পৌরুষের বিকাশে। সৈয়দও তাই করেছিল। রানু যতবার এগিয়ে এসেছে সে নিজের ঠোট দিয়ে তার ঠোটকে বিচূর্ণ করে দিয়েছে প্রচণ্ডভাবে। সৈয়দের কুয়াশাগ্রস্ত চোখ ক্রমশ যোর কাটিয়ে উঠেছে।

আমায় ক্ষমা করো রানু তোমাকে ভালোবাসতে পারিনি।

‘জোর করে কারুর ঠোটের কাছাকাছি আসা যায়; কিন্তু মনের কাছাকাছি আসা যায় না। এত চেষ্টা করেও তোমাকে মনের মধ্যে বসাতে পারিনি।’

বিড়বিড় করে আবৃত্তি করে সৈয়দ।

‘তুমি আমার রাধা নও, চন্দ্রমল্লিকা ফুলও নও।’

পিঙ্গল রোদে বসন্তের প্রশাস্য ক্লাস্ত হয়ে পড়ে। রানু এসে ঘরে ঢোকে। সিল্কের শাড়ি যেন ওর দেহে মানায়নি। প্রসাধনের স্পর্শ যেন প্রাণপল বলে মনে হয়। রানুর দিকে একবার তাকিয়ে মুখ ফিরিয়ে নেয় সে। না, এ মেয়েকে কোনোদিন

ভালোবাসেনি— প্রচণ্ড স্বরে চিৎকার করে বলতে যেন ইচ্ছা করে।

রানু চেয়ার টেনে বসে।

‘শরীর খারাপ নাকি তোমার?’

‘কেন যেন ভালো লাগছে না।’

‘দেখি।’

রানু এগিয়ে এসে সৈয়দের কপালে হাত দেয়।

সৈয়দ তার হাত সরিয়ে দেয় অবচেতন মনে।

‘না, না, তেমন কিছু নয়।’

রানু আবার চেয়ারে এসে বসে। অনেকক্ষণ কেটে যায় নীরব নৈশন্ডে। কেউ কোনো কথা বলে না।

সৈয়দ হাতের বইটা নাড়াচাড়া করতে থাকে।

না, সে আর ভুল করবে না। স্পষ্ট করেই সব কথা বলবে আজ। যাকে ভালো লাগেনি, তাকে জোর করে ভালোবেসে তাকেও অসুখী করতে চায় না।

প্রথমেই এ কথা রানুকে বলতে চেয়েছিল, রানু একেবারে ভেঙে পড়বে বলে সরে এসেছিল। রানু

আঘাত পাবে। কিন্তু আজ? নির্মম সত্যের জন্য

Manufacturer and Exporter of Quality Offset Printing Ink



ISO 9001 & 14001 Certified

TOKA INK BANGLADESH LIMITED

A JOINT VENTURE INDUSTRY OF BANGLADESH AND JAPAN

2 DIT Avenue (Extn.) Motijheel C.A. Dhaka 1000 Bangladesh

Tel: 9568888, 9554143 Fax: 8802-9568887

তাকে আঘাত দিতেই হবে।
আমাকে ক্ষমা করো, ক্ষমা করো। চিৎকার করে
বলতে ইচ্ছা করে সৈয়দের।
তোমাকে আজো ভালোবাসতে পারিনি।
রানু অবাক হয়ে তাকায় সৈয়দের দিকে।
এমন করছ কেন?
কী?
সৈয়দ বই বন্ধ করে রানুর দিকে তাকায়। রানুকে
আজো স্পষ্ট করে কোনো কথা বলতে পারে না।
এ যেন তার মধ্যে পৌরুষের অভাব। অথচ সে
কোনোদিন ভাবেনি এ ধরনের কলঙ্কিত ইতিহাস
রচনা করার।
চলো, আজ সিনেমায় যাই। মায়া হলে ভালো
একটা ফিল্ম এসেছে।
ভালো লাগছে না। অন্যদিন যাব বরং।
রানু কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে চলে যায়।
যাচ্ছি।
আচ্ছা।
অন্যদিনের মতো দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এলো
না সৈয়দ। নিজেই রিকশা ডেকে দিত। কাজের
ছেলটাকে ডেকে বলে দিল রিকশা ডাকতে। রানু
চলে যাওয়ার পর তার মাথাটা যেন হালকা হয়।
রানু যতক্ষণ এখানে ছিল ততক্ষণ ক্রান্তিকর গ্লানি
থেকে কাউকে মুক্ত করতে পারেনি। নিজেকেও
নয়, আর রানুকেও নয়।
রানু এসে ঘুরে গেছে দুদিন। সৈয়দ তার আসার
সময় ইচ্ছা করেই বাইরে থেকেছে। না, রানুর সঙ্গে
আর প্রতারণা করতে চায় না। মিথ্যে মায়ায়
কাউকে ভুলিয়ে রাখবে না। সব প্রসঙ্গ খুলে বলার
জন্য চিঠি লিখতে বসে। টেবিলের ওপর রানুর
চিরকুটটা চোখে পড়ে। তাকে না পেয়ে লিখে রেখে
গেছে।
আমার বড় সন্দেহ হচ্ছে আজকাল। তুমি কী
আমাকে আগের মতো ভালোবাসতে পারছ না?
চিরকুট পড়ে সৈয়দের বুঝতে অসুবিধে হয় না
একজন নারীর মন তার ভেতরটা ঠিকই পড়তে
পেরেছে। রানুর মুখটা মুহূর্তের জন্যে তার চোখের
সামনে ভেসে ওঠে। সৈয়দ চিরকুটটা দুহাতে চেপে
ধরে পিণ্ড পাকিয়ে ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে ছুড়ে
ফেলে দেয়।
না, এবার সব কথা লিখব তোমাকে। এমনভাবে
মনের সঙ্গে প্রবঞ্চনা করব না। তোমাকে সত্যি
ভালোবাসতে পারিনি।
রানু খানিকটা বিস্মিত হয়ে যায় সৈয়দের দিকে
তাকিয়ে সারা দেহ অবসাদে পূর্ণ।
কী হয়েছে তোমার?
রানু সৈয়দের পাশে এসে নিজের একটা হাত তার
পিঠের ওপর রাখে।
কিছু হয়নি। তুমি বসো।
রানু সৈয়দের মুখের দিকে তাকিয়ে হাসে। ক্লান্ত
আর বিশীর্ণ হাসি।
তোমার দিকে তাকালেই বোঝা যায় কিছু একটা
হয়েছে। লক্ষ্মীটি, লুকিও না, আমার কাছে খুলে
বলো সব।
ভুল বুঝছ তুমি। সে ধরনের কিছুই নয়।
দুজনের মধ্যে তেমন আলাপ জমে না, সেতারের
মীড় যেন অনবরত কেটে যায়।
আজ যাই বরং। রানু উঠে দাঁড়ায়।
শোনো। সৈয়দ একটা খাম ওর হাতে তুলে দেয়।

বাড়ি গিয়ে পোড়ো। সবকিছু লেখা আছে ওতে।
কিসের চিঠি?
পড়লেই বুঝতে পারবে।
সৈয়দ আর দাঁড়ায় না, পাশের ঘরে চলে যায়।
তার আচরণে বিস্মিত হয়ে রানু চিঠিটা ব্যাগের
মধ্যে রেখে দেয়। মস্তুর গতিতে বাইরে গিয়ে একটা
রিকশা ডাকে।
সৈয়দের মনে অনেক কথা দোলা দিচ্ছিল। এতক্ষণ
নিশ্চয়ই চিঠিটা পড়ে ফেলেছে রানু। পরের অবস্থা
যেন চিন্তা করতে পারে না। অসহনীয় বেদনায়
ফেটে পড়েছে কান্নায়।
আমাকে ভুল বুঝো না, আমি সত্যিই এমন করতে
চাইনি। তোমার জন্যই তোমাকে অস্বীকার করতে
চেয়েছি। নিজের মধ্যেই অনুবৃত্তি করে সৈয়দ। সেই
মুহূর্তে ঝড়ের বেগে ঘরে ঢোকে রানু। হাতে চিঠিটা
ধরা দৃঢ়ভাবে।
সৈয়দ!
আর কোনো কথা বলতে পারে না রানু। কান্নায়
ওর দু গাল প্লাবিত হয়ে যায়। টেবিলে মাথা রেখে
ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে। খানিকক্ষণ পর শাড়ির প্রান্ত
দিয়ে চোখ মুছে সৈয়দের দিকে তাকিয়ে বলে,
আমাকে অস্বীকার করছ তুমি, আর ভালোবাসতে
পারছ না?
সৈয়দের মুখ বিবর্ণ হয়ে যায়। কোনো কথা বলতে
পারে না।
তোমার চিঠি পড়ে এখানে না এসে পারলাম না।
ভাবতেই পারছিলাম এগুলো সব সত্যি। আমি কী
বিশ্বাস করব চিঠিতে যা লিখেছ তা তোমার মনের
কথা?
সৈয়দ মুখ নিচু করে বইয়ের পাতা ওলটাতে



থাকে।
হয়তো তোমার মন ঠিক নেই এখন। বলো, চিঠিতে
আবার সব কথা জানাবে। জানাবে এসব মিথ্যে!
সৈয়দ মুখ তুলে তাকায় রানুর দিকে।
জানাবে চিঠি দিয়ে।
রানু উঠে দাঁড়ায়। মৃদু হাসল শূন্য ঠোঁটে। চিঠিখানা
ভাঁজ করে হাতের মধ্যে চেপে আস্তে আস্তে বেরিয়ে
গেল ঘর থেকে।
রানু নিজেই এলো দুদিন পর। সৈয়দের চিঠির
প্রতীক্ষায় সে থাকেনি। চিঠি যে আর আসবে না
একথা চিন্তা করতে দেরি হয়নি। সৈয়দ প্রথমে
অবাক হলো। বিছানার ওপর চুপ করে বসে রইল।
রানু চেয়ারে বসে আনমনে বই দেখতে থাকে। এর
মধ্যে কয়েকটা নতুন কেনা বইও আছে। সৈয়দ
অলঙ্কারভূষিতা রানুকে চেয়ে দেখে। না, নেশা
লাগে না মনে।
আমরা অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছি সৈয়দ। এতদিন
পর সেখান থেকে আর ফিরে আসা যায় না। তুমি
ভেবে দেখো একবার।
অনেক ভেবে দেখেছি রানু। তুমি আমাকে
ভালোবেসেছিলে কিন্তু আমি তোমাকে কোনোদিনই
ভালোবাসিনি। জোর করে তোমাকে ভালোবাসতে
চেয়েছিলাম বলে হোঁচট খেয়েছি। সৈয়দের বিমর্ষ
চোখের সামনে একে একে অনেক ছবি ভেসে ওঠে।
মনে মনে গুঞ্জন করত একটা ধ্বনি। আবেগে
পরিপূত হয়ে উঠত কল্পনা-বিমথিত মন। রানু যেন
একটা উপলক্ষ মাত্র। তাই কোনো বাধা পায়নি
নিজেকে বিস্তৃত করতে। এখানেই ভুল করেছিল
সৈয়দ।
কথা বলছ না যে!
রানু সৈয়দের দিকে তাকায়। সৈয়দের উপলব্ধি
করতে কষ্ট হয় না তার চিঠি লেখার সঙ্গে সঙ্গেই
সমস্ত উজ্জ্বল এক মুহূর্তে নিভে গেছে।
আমি তো সবকিছুই জানিয়েছি চিঠিতে।
আর কী কোনো কথা বলার নেই তোমার?
রানুর সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে সৈয়দের দিকে।
কোনো কথা বলে না সে। ঘড়ির কাঁটা ক্রমশ
সরতে থাকে নিজের ঘর থেকে।
বেশ।
উঠে দাঁড়ায় রানু। সৈয়দের দিকে একবার তাকায়।
কত যেন চেনা সে। এ ঘরের খুঁটিনাটি সবকিছু
পরিচিত তার কাছে। আজ ঘরের সব তার দৃষ্টিতে
অস্পষ্ট লাগছে। পায়ের পাতা বোধ হয় একবার
কঁপে ওঠে। আর কোনোদিকে না তাকিয়ে দরজার
একপাশে গিয়ে দাঁড়ায়।
পারলে আমাকে ক্ষমা করো তুমি।
সৈয়দ কী বলে বোঝা যায় না। খানিকক্ষণ বসে
থাকে অস্ত্রাগ্রস্তর মতো।
বিকেলের রোদ ছড়িয়ে পড়েছে বিছানার ওপর।
সেদিকে তাকিয়ে সৈয়দ উঠে বসে। টেবিলের ওপর
থেকে বইগুলো আলমারির ভেতর রাখার সময়
হাত লেগে একটা শিশি মেঝেতে পড়ে যায়
পারফিউমের শিশি-রানুর। সৈয়দ নিচু হয়ে মেঝে
থেকে ভাঙা শিশিটা তুলে একপাশে রেখে দেয়।
প্রহর কেটে যায় সময়ের কাঁটা ধরে। বিবশ চোখের
ঘরের মধ্যে তাকাতাই সৈয়দ দেখে অন্ধকার
ছড়িয়ে পড়েছে সারা ঘরে। মৃদু বাতাসে তার
মাথার চুলগুলো উড়ছে। পারফিউমের খালি শিশিটা
এখন আর দেখা যায় না।



বিশ্বমানের ওয়ান স্টপ

মেডিকেল সার্ভিস

ডা. সিরাজুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ এন্ড হসপিটাল লিঃ (জেনারেল ও বিশেষায়িত)

আমাদের ডায়াগনস্টিক সেবা সমূহ:

- এন আর আই • সিটি স্ক্যান • সিটি এনজিওগ্রাম • বি এন ডি • ও পি জি • মেনোথ্রাক্সি
- এন্ডোস্কপি • কোলনোস্কপি • ই আর সি পি • ই টি টি • হৃষ্টার মনিটর (৭ দিন রেকর্ডিং)
- ই এস ভরিত্রিউ এল (স্টোন ক্রাস) • ই ই জি • ই এন জি • **ই ডি** (বোন অক্ষত) বাংলাদেশে প্রথম।

বায়োস্কোপিস্ট্রি, ইমিউনোলজি, ক্যান্সার মার্কারসহ যাবতীয় প্যাথলজিক্যাল ও সকল প্রকার ড্রাগ এবং হরমোন পরীক্ষা করা হয়।

সার্বজননিক বিশেষত্ব চিকিৎসক কর্তৃক পরিচালিত বহিঃবিভাগ ও অন্তঃবিভাগ:

- মেডিসিন • স্ট্রোক ও প্রসূতি • শিশু • কিডনি বিভাগ • ডায়ালাইসিস • নিউরোলজি
- অর্থোপেডিক্স • নাক, কান, গলা • ইউরোলজি • দন্ত • নিউরো সার্জারি • মনোরোগ
- অনকোলজি • এনজিওগ্রাম, এনজিওপ্লাস্টি (স্টেন্টিং) ও পেসমেকার স্থাপন
- ওপেন হার্ট সার্জারি (বহিঃশাস সার্জারি, ভান্ সার্জারি, জন্মগত হৃদরোগ সার্জারি)
- সি.সি.ইউ • অ.সি. সি. ইউ • এন. অ.সি. সি. ইউ • পি.অ.সি.সি.ইউ

২৪ ঘণ্টা কার্ডিয়াকসহ ইমারজেন্সি

২৪ ঘণ্টা ফার্মেসী সুবিধা

স্বল্প মূল্যে সকল বিভাগে চিকিৎসা সেবা দেয়া হয়

১২/৩, মিউ সার্কুলার রোড
(মৌচাক মার্কেট এর পশ্চিম পাশে) ঢাকা ১২১৭

ফ্যাক্স নং : +৮৮ ০২ ৮০২২১২১
০১৯২৭ ৩৩০০০০

প্রতিটি জীবনই আমাদের কাছে অমূল্য

24x7
EMERGENCY
SERVICE

Design : Green Frame



ইউনিভার্সেল ফ্যাশন লাইন

০৯-৬৬৬-৯৯৯-৬৬৬



নতুন **ভাইল** এখন ২টি দারুণ সুবাসে



মিলনের জলছবি

তপন বাগচী

তোমার পায়ের কাছে একা বসে থাকি
যেন এক ডানাভাঙা রাতজাগা পাখি।

উড়ে-উড়ে দূরে যাব খুঁটে খাব দানা
কেউ তো কখনো ডেকে করবে না মানা।

জেনেছি তোমার ঘরে আর নাই ঠাঁই
স্বপনের আলো দিয়ে বাসর সাজাই।

হয় তো বা ভুল করে দিয়েছিলে ছুঁয়ে
সেই শিহরণে আমি থাকি আজো নুয়ে

সবকিছু ছেড়ে পড়ে রয়েছি একাকী
মিলনের জলছবি মনে শুধু আঁকি।

নষ্ট সময়ের প্রেম

রওশন মতিন

করিডোরের পাশে একজোড়া কবুতর দম্পতি
খুব সুখে আছে— খুব সুখে আছে ভেবে
ওদের পারদ আনন্দ দেখে, আমিও ভারী সুখ পাই,
ওদের ছোট সংসার নির্বন্ধাট, যেন সাজানো বাগান
আহা, নোটন পায়রা আনন্দে কেমন পুচ্ছ তুলে নাচে,
যদিও কখনো ভালোবাসা বড় বেশি যন্ত্রণার গান।

এ রকম অগোছালো সুখের আসরে প্রজাপতি মন
আমারও ভীষণ ইচ্ছে জাগে তোমাকে নিয়ে প্রেম প্রেম খেলে
গায়ে মেঘে অজস্র বর্ণালি বিকেল, নষ্টামি আর দুষ্টামিতে
মেতে ভেসে যাই নষ্ট সময়ের হাত ধরে,
আমরাও ভেসে যাই নষ্টামির স্রোতে,
ছবি ঘরে যেমন সবাই রাজা-রানী সাজে
এ সোনা, আমরাও রাজা-রানী সাজি ক্ষণিকের তরে।

তোমার তমালের মতো দীঘল দেহের তরঙ্গিত সবুজ উঠোনে
আমি বিকেলের ঘাসফড়িং হব স্মৃতির আলাপে আনন্দে লাফাব।

প্রজাপতি প্রেমে স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ বিহারে আত্মমগ্ন চাঁদ
ভালোবাসা হোক রাতের তিমিরে নক্ষত্রখচিত আকাশ
চুম্বনে চুম্বনে হৃৎপিণ্ডের দ্রুত ওঠানামা, অটল তৃপ্তিতে
চোখেমুখে ক্ষণিক সঙ্গমের কামজ হলাহলের অগ্নিচ্ছটা,
বরফের দেয়াল গলতে থাকে সুতীর আবেগে।

আগুন ভালোবাসি

কামরুজ্জামান

আগুন আমি ভালোবাসি, তাই তোমাকে ভালোবাসি
আমাকে পোড়ায় আগুনের লেলিহান শিখা
সহস্র লক্ষ কোটি বছর আমি পুড়তে পুড়তে
অসংখ্য ফিনিক্স পাখি হয়ে জন্ম নিই পৃথিবীতে।

কাকচক্ষু স্ফটিক স্বচ্ছজলে অবগাহন করে
কোমল মসৃণ স্নিগ্ধ গ্রাবী পার হয়ে এসে,
দেখি তোমার প্রজ্বলিত রক্তাভ ওষ্ঠ যুগল—
জানি আমি স্পর্শমাত্রই পুড়ে অঙ্গার হয়ে যাব
তবু আমি স্পর্শ করি, ইচ্ছে করে পুড়ি তোমার আগুনে।
শ্রেণিচক্র, যৌবনের অসামান্য স্থাপত্য সৌকর্য পিয়াসায়
আমাকে মুগ্ধতায় স্থবির করে রাখে লক্ষ কোটি বছর।

রক্তজবার প্রস্ফুটিত নাভিমূলের কাছে এসে বসে থাকি
আমি আর এক কদম এগোতে পারি না, রহস্যভরা পথ
জ্বলে আছে উৎক্ষিপ্ত এক লাভার ভিসুভিয়াস,
শরীরে গনগনে আগুনের হলকা এসে লাগে
গলে যেতে থাকে কোমল ত্বক, মাংসপিণ্ড
প্রতিটি কোষ, প্রতি রক্ত ফোঁটার শ্বেত লোহিত—
কণিকা থেকে জন্ম নিতে থাকে আবার অসংখ্য ফিনিক্স
উড়ে যেতে থাকে সীমাহীন অনন্তকালের দিকে
যে পাখিগুলো পৃথিবীতে আর ফিরবে না কোনো দিন।

আগুন আমি ভালোবাসি তাই তোমাকে ভালোবাসি
আমাকে পোড়ায় আগুনের লেলিহান শিখা
আগুন ভালোবাসি আমি লক্ষ লক্ষ কোটি বছর
লক্ষ লক্ষ কোটি বছর আমি তোমাকে ভালোবাসি...

তক্ষশীলার পাঠ

শাহীন মাহমুদ

চাণক্যের দেয়া বিষ খায়
চন্দ্রগুপ্ত আর দুর্ধরা ভুল করে
মরে দুর্ধরা চাণক্যের দেয়া বিষে
পেট কেটে বেঁচে যায় বিন্দুসার
বনে যায় মৌর্যের সম্রাট।
বৃদ্ধ চাণক্য মরে সুবন্ধুর চালে
চাণক্য ভাবেনি কভু কী ভুল ছিল তার
বিষে মরি বিষে বাঁচি; খেলি বিশেষ বিশেষ
কালো আলখেল্লা গিলি অমৃত ভেবে
ক্লেদ নগরে শিখি তক্ষশীলার পাঠ।



নং-১

মমতাজ
হেয়ার রিমুভার ক্রিম

20% Extra
MUNTAS No-1
Hair removal cream
Flower fragrance
With Moisturizer

লোমহীন ত্বক নারীর সৌন্দর্য

মমতাজ হারবাল প্রোডাক্টস



তোমার গুরুত্ব আমরা বুঝি
তুমি নারী, তুমি মহীয়সী...

তুমি কখনো নমস্কার মা,
কখনো গৃহের চাদরে বোন।
কখনো বা তুমি চলার পথের সঙ্গী,
আবার কখনো তুমি প্রেরনা...

তোমাকে সুরক্ষিত রাখতে আমাদের
এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা তোমার সুরক্ষায়...

Femecare
Sanitary Pads

Wings With Heavyflow

Femecare Ultra MaX
Sanitary Pads

10 Pads
10 Pads With Wings

মমতাজ হারবাল প্রোডাক্টস

Mumtaz Herbal Products
www.mumtazherbal.com

Easy & Comfortable

আসাদ এন্টারপ্রাইজ
মমতাজ হারবাল প্রোডাক্টস এর একটি পণ্য

বৃষ্টিভরা রাত

জাকির আবু জাফর

বৃষ্টিভরা হৃদয় আমার বৃষ্টিভরা হাত
বৃষ্টি আমার আকাশ জুড়ে খেলছে সারারাত
রাতের বৃষ্টি রাত নেমেছে নিঃশব্দতা ঢের
রহস্যময় রাত্রি আমার ভীষণ আনন্দের

আনন্দে আজ আপ্ত এই শ্রাবণ রাতের বোন
মনের সাথে মন জড়িয়ে করছে আলাপন
বৃষ্টি যখন মন ছুঁয়েছে মন হয়েছে পাখি
মধ্যরাতে এই পাখিকে কোথায় ঢেকে রাখি

কোন ভুবনে বসতবাড়ি কোন নগরে ঘর
নিঝুম রাতে কাঁদছে কেন অচেনা অন্তর
অন্তরে এক দহন লীলা পুড়ছে গোপন দ্বার
বৃষ্টিজলে মনের আগুন নেভাব বার বার

হায়রে আমার বৃষ্টিবীণা আমার বৃষ্টি বুরে
আমার বৃষ্টির বৃষ্টি এখন তোমার বৃষ্টির ঘরে
বৃষ্টির চালায় বৃষ্টি যখন অবর ধারার ঢল
বৃষ্টিজলে ফুটছে তখন সুখের নীলোৎপল

আয়রে আমার বৃষ্টিপাখি মন ভুবনে আয়
অবর ধারা ঢালো আমার গভীর নিরালায়
বৃষ্টিভরা সন্ধ্যা আমার বৃষ্টিভরা রাত
জনমভরে বৃষ্টি আমার প্রেমের ধারাপাত

আমার বিকেল আমার শাহবাগ

মানস বিশ্বাস

প্রতিদিন শাহবাগ যাই
বাসে লোকাল, সিটিং কখনো পায়ে
যেন এক অনন্ত তৃষ্ণার আধার।
এখানে আমার চেনাজানা খুব বেশি নেই
তুবও যাই, যেতে হয়
স্বপ্নবাজ, ঘূর্ণায়মান কবিদের সাথে দেখা হয়,
দৃষ্টির দু'প্রান্তে জ্বলে ওঠে পোশাকে আঁটা বেদনা ভরা মানুষ।
কথা নেই মাপা সময়ের আবর্তেই অতীত হতে থাকে এই বর্তমান কোলাহল।
অবশিষ্ট থাকে বন্ধুদের প্রিয়নাম বাবুলের চায়ের দোকান।
ভালোলাগে চেনা কাপের উষ্ণতা
চলমান পায়ের ছায়ায় বাবুলের ব্যস্ত চোখ
টুংটাং শব্দ, জীবনের কত আয়োজন
আঙ্গুলের ফাঁকে সিগারেট ধরিয়ে চলে আসি
পিঁজির ভিতর বটতলায়।
ধোঁয়ার উঠোন ছাড়িয়ে ভেসে ওঠে ছায়াভরা পাতা
কত স্বপ্ন, কত মুখ, মানুষে মানুষে কী বিস্তার ব্যবধান
গোধূলি ফিরে যেতে থাকে, সন্ধ্যা নামে।
বন্ধুদের ফোন বেজে ওঠে
বলি আসবি তো?
আমি বসে থাকি পাথর সময়ে গোলাপের গন্ধ মেখে।
কখনো প্রয়াণ, স্বীকৃতি, দুর্জয়, উষ্ণতা কখনো
আবার সেলিম আরিফের অপেক্ষার
জানি দূরনক্ষত্রকে ভালোবেসে রাতের চাঁদ জেগে উঠেছে
মানুষের যাত্রায়
আমার বিকেল ভরা শাহবাগের কাছে।

দুটি কবিতা, শুধুই প্রেমের

ফারুক আফিন্দী

মহামিলন

এসেছি পাথর হয়ে!
প্রেমের আচ্ছাদনে ঢেকো
আমার সকল লজ্জা অপ্রেম
কসম প্রিয়, মহামিলন দিনের

গোসল

অবশেষে
কালো যৌবনকে
আঙুলেপৃষ্ঠে আলিঙ্গন
চুম্বনের প্রবল চিৎকার
নগ্ন
গোসল

প্রত্যাবর্তন

নাভেদ আফ্রিদী

একদিন জল ছিল আকাশের সবটুকু নীল
একদিন নীল ছিল সাগরের সবটুকু জল
একদিন শেওলা
একদিন মাটি
একদিন উদ্ভিদ
একদিন গাছ

অতঃপর, ধীরে ধীরে আমরা মানুষ
একদিন মাটি
একদিন জল



পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর
উপলক্ষে
সবাইকে জানাই
শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন

ঈদ মোবারক

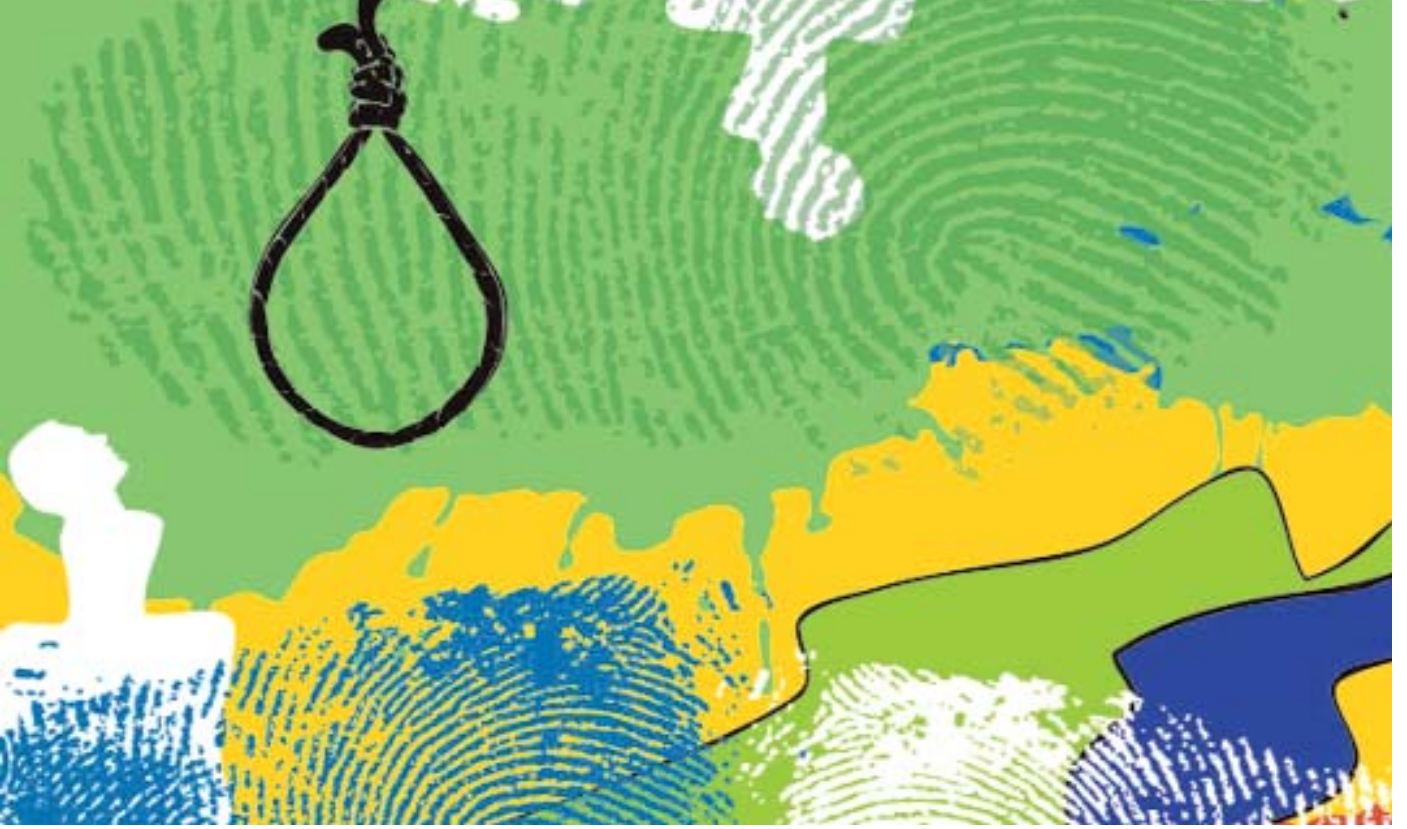
Letter n Colour Ltd.
Adding life to paper

Head Office :
43, Shilpacharya Zainul Abedin Sarak
(Old 16, Shantinagar), Dhaka-1217
Phone : 9335826, Fax : 8318526
Web : www.lcl.com.bd



শেখ সিরাজ উদ্দিন
চেয়ারম্যান





উপন্যাস

আলো-আঁধারির জীবন

সালাম সালেহ উদদীন

কফিনবন্দি লাশের মতই তার আদল। ময়লাযুক্ত সাদা চাদর মুড়ি দিয়ে সটান হয়ে শুয়ে থাকার কারণে তাকে তেমনটাই মনে হচ্ছে। যে ঘরটিতে তিনি শুয়ে আছেন, এটা তার নিজেরই এবং স্ত্রী চলে যাওয়ার পর বিগত সাড়ে ৪ বছরে কোনো রকম পরিচ্ছন্নতার আঁচড় পড়েনি। ফলে রাজ্যের ধূলি, মাকড়সার জাল, তেলাপোকা ও ছাড়পোকাকার বিপজ্জনক বিস্তার ঘরটিতে। কাজ শেষে শেষরাতের দিকে তিনি যখন বাসায় ফেরেন তখন অত্যন্ত ক্লান্ত ও ঘুমহীন থাকার কারণে ঘরের দুটো ফ্যান চালিয়ে চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েন। ফ্যানের তীব্র বাতাসে ঘরের ভেতর ত্বরীভূত ধুলো-ময়লা ঘুরপাক খেতে থাকে প্রবল স্রোতে পানির ঘূর্ণন সৃষ্টির মতো। যেন এটা ময়লার গুদামঘর। লোকটির সে দিকে খেয়াল নেই। কর্মরুস্তা দেহ বিশ্রামের নাগাল পেলেই হলো। বাইরে থেকে এসে যখন তিনি রুমটি খুলেন তখন

ভ্যাপসা গন্ধ নেমে এসে ধাক্কা খায়, যেটা তিনি হয়তো অনুমান করতে পারেন না অথবা তিনি এমন পরিবেশে অভ্যস্ত হয়ে গেছেন। ঘর বা রুম বলতে জানালাবিহীন গুদামঘরের মতো। যে খাটে তিনি ঘুমান তার দুই-তৃতীয়াংশজুড়ে নানা ধরনের পুঁটলি। কোনোটাতে শার্ট, লুঙ্গি, কোনোটাতে কম্বল আবার কোনোটাতে চাদর। এভাবে অন্তত গোটা তিরিশেক ময়লাযুক্ত পুঁটলি খাটের ওপর পড়ে আছে। যার প্রত্যেকটির চারপাশে ধুলো আর মাকড়শা জালের বিস্তার। তিনি খাটের যে এক-তৃতীয়াংশ জায়গায় গা এলিয়ে দেন, ওই টুকুই কিছুটা পরিচ্ছন্ন, বলতে গেলে ঘরের অন্যান্য স্থান থেকে পৃথক। খাটটি যে মাত্রায় বড় ঠিক সেভাবে তিনি গা বা পা এলিয়ে দিয়ে ইচ্ছামতো ঘুমাতে পারেন না, জিনিসপত্রের কারণে। অর্থাৎ চিৎ হলে চিৎ-কাত হলে কাত, ঠিক এমন এক অবস্থায় তাকে ঘুমাতে হয়। ঘরের মাঝখানে ঝুলে আছে



গোটা পাঁচেক সাগর কলা, তারই পাশে পলিথিনে মোড়ানো তিনটি কোট। আর খাটের চারপাশে মেঝেতে বিচিত্র সব জিনিস। এগুলো একদিন তিনি শাখের বসে নিজের ব্যবহারের জন্য উচ্চ মূল্যে কিনে এনেছিলেন। তবে দোকান থেকে কিনে আনা নানা কিসিমের পানির বোতলের আধিক্যই বেশি চোখে পড়ে। যেমন ৫ লিটার মামের বোতল অন্তত ১২টি, আড়াই লিটার বোতল ১০টি, দুই ও এক লিটার আরো অন্তত ৩০টি বোতল। রুমটি যেন পানির বোতলের গোড়াউন। কোমল পানীয় কোকোকোলা, মিরিন্ডা ভর্তি বোতলও এক লিটার আধা লিটারের বেশ কয়েকটি। এ ছাড়া ঘরের অন্যান্য জায়গায় ঠাসাঠাসি হয়ে আছে নানা ধরনের ছোটবড় পুটলি। প্রত্যেকটিতেই ধূলা-ময়লার পুরো আস্তর। রুমে কোনো ফ্রিজ নেই। একটি টেলিভিশন সেট পড়ে আছে বহুদিন থেকে, যেটা সচল কি অকেজো তা তিনি নিশ্চিত করে

বলতে পারবেন না। পলেন্সুরা খসা দেয়াল। দেয়ালের চারপাশজুড়েও মাকড়শার জাল। দেয়ালের পাশ ঘেঁষে বৃষ্টির দিনে টপটপ করে পানি পড়ে। ঘরের মধ্যে জীবনের ছন্দ বলতে এই বৃষ্টির ফোঁটাই। তিনি যখন চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকেন, বৃষ্টি শুরু হলে ফোঁটা ফোঁটা পানি তার মাথা ও পা ঘেঁষে পড়তে থাকে। পানির ছাঁটে তিনি যখন অর্ধভেজা হয়ে যান তখন তার ভেতর অসহায়ত্ত ফুটে ওঠে। পুরো ঘরের মধ্যে একটি জিনিস বেশ পরিচ্ছন্ন, তা হচ্ছে দুধ জাল দেয়ার ছোট পাতিলটি। কারণ প্রায় প্রতিদিনই কাজ থেকে ফেরার পথে তিনি বেকারি থেকে পাউরুটি এবং পাশের দোকান থেকে আধালিটার আড়ং দুধ কিনে আনবেন। কখনো কখনো ডিমও আনেন। আড়ং দুধ এর ঘনত্ব ও পুষ্টি নাকি বেশি। ঘরের বাইরে খোলা জায়গায় ডাবল বার্নারের গ্যাসের চুলা রয়েছে। রান্না বলতে তিনি

www.aiub.edu

*Eid
Mubarak*



AMERICAN INTERNATIONAL UNIVERSITY-
B A N G L A D E S H



AIUB

83/B, Kemal Ataturk Avenue, Banani,
Phone: 58815387, 9897387, 9894229
Ext. 100, 199

দুধ গরম ও ডিম সিদ্ধ করা এই দুটিই পারেন। যার কারণে নিজস্ব উদ্যোগে বা ব্যবস্থাপনায় তিনি এই সাড়ে ৪ বছরে কপালে ভাত-তরকারি জোটাতে পারেননি। ফলে শেষরাতের খাবার তার পাউরুটি, ডিম-দুধ নৈমিত্তিক ও পানসে হয়ে পড়েছে। তিনি এসব খাওয়ার পর টানা ৬ থেকে ৮ ঘণ্টা ঘুমাবেন। এরপর উঠবেন দুপুরে। লাঞ্চ করবেন কোনো স্থানীয় রেস্টুরেন্টে। তবে পুরনো ঢাকার মোরগ পোলাও, কাচ্চি বিরিয়ানি, তেহারি, এসব তার প্রিয় খাবার। সব দিন তার এসব খাওয়ার সুযোগ হয় না। অন্যান্য দিন হয়তো বাখরখানি, ডালপুরি, মিষ্টি অথবা কলা খাবেন। ভাত-মাছ-মাংসও খাবেন কোনো কোনো দিন। তবে একাকী জীবন-যাপন করার কারণে এসবের তার বালাই নেই। সামনে যা পান তাই খান। লাঞ্ছের পর বেশিরভাগ সময় ঘরে ফেরেন না তিনি। বন্ধু-আত্মীয়দের নিয়ে হাই হুল্লোড় করেন। দলবঁধে বড়িগঙ্গা ভ্রমণ না হয় সাহিত্যমোদী বন্ধুদের সঙ্গে টিএসসি শাহবাগে আড্ডায় মেতে ওঠেন। সন্ধ্যার পর অথবা রাতের এক প্রহরে কর্মস্থলে চলে যান। তিনি কর্মস্থল থেকে ফিরেন ফজরের আজানের সময়। এটাই তার জীবন। এভাবেই তার বেঁচে থাকা।

দুই.
ধোলাই খালের লোহার পুলের উত্তর পাশে তার বাড়ি। খাল ঘেঁষে বাড়ি হওয়ার কারণে একসময় বর্ষা মৌসুমে বড়শি দিয়ে মাছ ধরতেন তিনি। ছোটবেলায় অত্যন্ত ডানপিটে হওয়ায় মা তার কোমরে ঘণ্টি বেঁধে দিতেন। বাড়ির ডানে না বাঁয়ে যাচ্ছে ঘণ্টির শব্দে মা বুঝতে পারতেন। ফলে সন্ধ্যাবেলা সেভাবেই তাকে খুঁজে আনতেন। ৯ ভাইবোনকে সামাল দেয়া মায়ের পক্ষে কঠিন হতো। প্রতিটি ভাই-বোনের বয়সের ব্যবধান ছিল আড়াই বছর। এরপরও মা সন্তানদের কল্যাণে সব সময় ছিলেন দরদি, ত্যাগী ও সংগ্রামী। ওই খাল ভরাট করে প্রধান সড়ক বানানো হয়েছে। লোহার-পুল কাঠেরপুল আর নেই। খাল ভরাট করে পুরনো ঐতিহ্য কাঠেরপুল লোহারপুল ভেঙে শহরের এই অঞ্চলকে আধুনিক রূপ দেয়া হয়েছে। উঁচু উঁচু ভবন উঠেছে সড়কের দুই পাশে। যারা এই এলাকায় নতুন এসেছে তারা ভাবতে ও পারবে না কী ছিল আর কী হয়েছে এখানকার চেহারা। যারা পুরনো ও স্থায়ী বাসিন্দা তারা ধোলাই খালের নতুন সড়কে দাঁড়িয়ে স্মৃতির জাবর কাটতে পারেন অনায়াসে। তারা ভাবতে পারেন প্রবহমান সেই খালের কথা। খালে মাছ ধরার স্মৃতি ও হয়ত কারো কারো মনে পড়বে। কেউ কেউ ভাবতে ভাবতে অনমনস্কও হয়ে যেতে পারেন। কারণ স্মৃতি যেমন বেদনার আবার মধুরও। স্মৃতি থেকে একেকজনে একেক বিষয় আহরণ করেন। মানুষ সুযোগ পেলেই স্মৃতিকাতর হয়ে পড়ে। কারো কারো জীবনে স্মৃতিই কেবল সম্বল।

খাল যখন ছিল তখন এক ধরনের গ্রামীণ আবহ বিরাজ করত। শিশু-কিশোররা খালে সাঁতার কাটত, মাছ ধরত। গ্রীষ্ম মৌসুমে খালের পানি নিচে নেমে গেলে, দুই পাড়জুড়ে তারা বিকালে খেলায় মত্ত হয়ে উঠত। কাদাপানিতে লেপ্টালপেটি অবস্থা হতো অনেকের। কোমরে ঘণ্টাবাঁধা ছেলেটিও অন্য অনেকের সঙ্গে এসব খেলায় যোগ দিত। তার

কর্মকাণ্ড দেখে মা বেশির ভাগ সময়ই বিরক্ত হতো। দেখা গেল রাকিব সকালে বাড়ি থেকে বের হয়েছে, তো দুপুরে ফেরার নাম নেই। মা চারদিক খোঁজাখুঁজি করেও রাকিবকে পায় না। সারাদিন টাই টাই করে ঘুরে খেয়ে না খেয়ে রাকিব হয়ত সন্ধ্যায় বাড়িতে ফিরত। মা হুন্ফা বেগম রাগারাগি বকাবাজি করলেও রাকিব কোনো কথা বলত না। তার এই কর্মকাণ্ডের জন্য মা ব্যথিত ও বিরক্ত হতেন। মহল্লার লোকেরা বলতেন রাকিবকে দুধ দিয়ে গোসল করলে ওর সমস্ত পাগলামি দূর হবে। ও স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসবে। পরামর্শ অনুযায়ী ওর মা হুন্ফা বেগম ১০ সের দুধ কিনে দুপুরে রোদে খালের পাড়ে দাঁড় করিয়ে রাকিবকে গোসল করান। এর ফলে রাকিব উৎফুল্ল হয় এবং ওর পাগলামি আরো বেড়ে যায়। রাকিবের মা হতাশ হয়ে পড়েন এবং এও ভাবেন যে, তার ১০ সের দুধই জলে গেল। পাগলামিকে সঙ্গে নিয়েই রাকিব বেড়ে উঠেছে।

এ ঘটনার ৫০ বছর অতিবাহিত হয়েছে। রাকিব খানের বয়স এখন ৬০। মা পরপারে চলে গেছেন ২০ বছর আগে। জরাজীর্ণ ঘরে একা শুয়ে শুয়ে খান সাহেব আজ মায়ের কথা ভাবছেন। মনে পড়ছে বাবার কথাও। শত অন্যান্য করলেও বাবা তাকে কিছুই বলতেন না। বাবা ঢাকা মিউনিসিপ্যাল করপোরেশনের কর্মকর্তা ছিলেন। তখন ঢাকা ওয়াসা ছিল না। তবে তিনি ঢাকার পানি সরবরাহের দায়িত্বে ছিলেন। এমন কি মুক্তিযুদ্ধের সময়ও তাকে সপরিবারে ঢাকা থাকতে হয় সরকারি কাজে। মুক্তিযুদ্ধে অংশ না নেয়ারদের একজন তার বাবা। ফলে তাদের পরিবার যুদ্ধের সময় ঢাকাতেই বেশির ভাগ সময় অবস্থান করে। রাকিব যেমন দেখতে সুদর্শন, তেমনি ওর বড় দুই বোনও অনিন্দ্য সুন্দরী, নবম ও দশম শ্রেণির ছাত্রী। বোনদের নিরাপত্তার কথা ভেবে যুদ্ধের মাঝামাঝি সময় তাদের গ্রামের বাড়ি বাঞ্ছারামপুর পাঠিয়ে দেয়া হয়। পরিবারের অন্য ৯ সদস্য ঢাকাতেই থাকে। ওই সময়ও তার দূরন্তপনায় এতটুকু ঘাটতি পড়েনি। মা তাকে বহুদিন বলতেন, তোকে আজ খাবার দেব না। এমনকি বাসায়ও ঢুকতে দেব না। এই কথা মা বহুবাব বলেছেন এবং এটা ছিল মায়ের মুখের কথা। ডানপিটে হওয়ার কারণে রাকিব লেখাপড়ায় মনোযোগী ছিল না। মা বরাবরই চাইতেন রাকিব লেখাপড়ায় মনোযোগ দিক। মানুষের মতো মানুষ হোক। রাকিব খান মায়ের স্বপ্ন পূরণ করতে পারেন নি। সংসার ও সন্তানদের জন্য মায়ের ত্যাগ, নিষ্ঠা সংগ্রাম আজ তার চোখের সামনে ভেসে উঠছে। তিনি দেখতে পাচ্ছেন, মা তাকে খালের পাড়ে নিয়ে দুধ দিয়ে গোসল করাতেন। বাড়ি ফিরতে দেরি হলে অন্য ভাইবোনদের কাছে মা তার খোঁজ নিচ্ছেন। রাকিব দেরিতে ফিরছে, আর মা উঠানো তার জন্য অপেক্ষা করছেন। মায়ের মুখে হাসি, রাগের কোনো বালাই নেই। রাকিবকে হাত ধরে ঘরে নিয়ে যান তিনি। সারাদিনের না খাওয়া ছেলেটিকে নিজের হাতে খাইয়ে দেন। এসব স্মৃতি তাকে খোঁচায় জ্বালায়। ব্যথিত হয়ে ওঠেন খান সাহেব। মনের অজান্তে তার চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। জীবনে তিনি দুধ-গোসল একবারই করেছেন। মা ভেবেছিলেন দুধ-গোসল করানোর পরই রাকিব স্বাভাবিক

জীবনে ফিরে আসবে। মায়ের প্রত্যাশা পূরণ হয়নি। রাকিব চলেছে আগের নিয়মেই। নিজেকে পরিবর্তন করা অনেক কঠিন কাজ। এই উপলব্ধি আজ খান সাহেবের ভেতর কাজ করছে। এখন জীবনের শেষ বেলায় এসে নিজেকে আর কী পরিবর্তন করবেন তিনি। আজ তার মনে পড়ছে, মা তাকে অন্য ভাইবোনদের চেয়ে বেশি আদর করতেন। হয়ত সে কারণেই তিনি ভেবেছিলেন, রাকিবের ভবিষ্যৎ পথচলা নিশ্চিত হোক। মা এ ব্যাপারে চেষ্টাও কম চালাননি। এলোমেলো জীবনই রাকিবের ভালো লাগে। রাকিব মনে করেন, সুস্থ জীবনের মধ্যে কোনো বৈচিত্র্য ও স্বাদ নেই। কুয়োর ব্যাঙ হয়ে লাভ কী? তিনি আরো ভাবেন, জীবন তো একটাই, একে যতভাবে যত কায়দায় রাঙিয়ে তোলা যায়, উপভোগ করা যায়।

খানদের এই মহল্লায় দুটি বাড়ি। একটি ভাড়া দেয়া। এই দুটিকে ঠিক বাড়ি বলা যাবে না। প্রকৃত বাড়ির আদলও নয়। যেটি ভাড়া দেয়া সেটিও টিনসেট, আর যেটিতে খান সাহেব থাকেন সেটি প্রান্তের চেয়ে লম্বায় অন্তত দশগুণ। এমন জায়গায় আর যাই হোক দৃষ্টিনন্দন বাড়ি তৈরি করা যায় না। বিশাল টিনের ঝাঁপ ঠেলে বাড়িতে ঢুকতে হয়। ঢুকতেই চোখে পড়বে রিকশা গ্যারেজ। গ্যারেজ অতিক্রম করলে ডান দিকে কলতলা বামে টয়লেট। চারদিকে স্যাঁৎস্যাঁতে ও ঘিজি ভাব। যেন পুরনো ঢাকার শাখারী বাজারের চিত্র। আরো একটু এগিয়ে গেলে পরপর কয়েকটি টিনসেড রুম। প্রথম দুটি রুমের ছাদে রয়েছে ছোট আরো একটি রুম। প্রথম ও ছাদের রুমটিতে রাকিবের ছোট ভাই থাকে সপরিবারে। এর পরের রুমটি তার বোনের। রুমটির দরোজায় এমনভাবে তালো দেয়া যেন সিলগালা করা হয়েছে। প্রথম রুমের দেয়ালে ছোট একটি আয়না ঝুলানো। বোনের রুমটি অতিক্রম করলেই একটি বিধ্বস্ত রুম। যেন দিন কয়েক আগে ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে রুমটিতে। দেয়াল ধসে গেছে। ইট-সুরকির ছড়াছড়ি। ছাদের টিন কাঠও মেঝেতে পড়ে আছে। এর ভেতর মাকড়শা ইচ্ছামতো বাসা বেঁধেছে। তেলাপোকারও বিস্তার রয়েছে রুমটিতে। এই বিধ্বস্ত রুমের পাশেই ছোট ঘর। নিচের ডাবল বার্নার চুলা। পাশে রশিতে ঝুলছে একটি পুরনো রঙচটা গামছা। রান্নাঘর এটাকে বলা যাবে না এ কারণে যে, চুলা ছাড়া এই রুমে আর কিছুই নেই। এর আগে এই বাড়ির সব চেয়ে আকর্ষণীয় যে জিনিস চোখে পড়বে, তা হচ্ছে নয়নতারা ও গোলাপ ফুল। বেগুনি রঙের নজরকাড়া নয়নতারা ফুটে আছে, হাসছে। নিচে গোলাপ গাছে এক-দুটি গোলাপ চোখে পড়ে। রান্নাঘরের পরই আরেকটি ঘর। ঘরের এই দেয়ালেও ছোট আয়না টাঙানো। আয়নার সাহায্যে খান সাহেব মাঝে মাঝে সেভ করেন। এই ঘরটিতেই রাকিব খান থাকেন।

বছর কয়েক আগেও ঘরের অবস্থা এমন করুণ ছিল না। ঘরটি ছিল দৃষ্টিনন্দন। নতুন বউ আসবে এ জন্য ঘরটি প্রশস্ত করা হয়েছিল। ঘরটিই ছিল রাকিবের সংসার। সংসার বলতে স্ত্রী মিনারা বেগম ও একমাত্র ছেলে সজীব। রাকিব যেমন দেখতে খুব সুদর্শন, রোমান্টিক নারীরা তার দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারে না। একইভাবে, মিনারাও অনিন্দ্য সুন্দরী। লাখনোর নারীদের মতো তার ফিগার ও

চেহারা। মুখে সব সময় হাসি লেগেই থাকতো। মহল্লার লোকেরা বলত যেমন রাকিব, তেমন মিন-রা। এমন জুটি এই মহল্লায় একটিও নেই। যেন দিলীপ কুমার-মধুবালা, ধর্মেন্দ্র-হেমা মালিনি, রাজেন্দ্র কুমার-বৈজয়ন্তি মালা, উত্তম-সুচিত্রা জুটি। তারা যখন দুইজনে একসঙ্গে রাস্তায় বের হয়, কোথাও ঘুরতে যায়, কিংবা অংশগ্রহণ করে কোনো অনুষ্ঠান-পার্বণে প্রধান আকর্ষণ এই দুইজন। রাকিব আগাপাছতলা রোমান্টিক মানুষ, এই রোমান্টিকতার চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে চায় স্ত্রী মিনারার সামনে। কিন্তু মিনারা তেমনটা নয়। মিনারা অতি বাস্তববাদী নারী। সে চায় রাকিব রোমান্টিকতার উর্ধ্বে ওঠে বাস্তবতা বরুক। কারণ কেবল রোমান্টিকতা দিয়ে জীবন ও সমাজকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করা যায় না। সংসারকেও এগিয়ে নেয়া কঠিন। বিয়ের প্রথম দিকে নতুন বউ হিসেবে রাকিবের কথাগুলো মিনারা চলেছে। পরে সে নিজস্ব সত্তা ও ব্যক্তিত্ব নিয়ে বাকিবের মুখোমুখি হলো, বলল সংসার শুরু করেছে, এসব চলবে না। মিনারা যখন স্বমূর্তিতে আবর্তিত হলো তখন রাকিব খান রীতিমতো হোঁচট খেলেন। নতুন বউকে ঘরে আনলে সংসার জীবনে কতগুলো ধাপ অতিক্রম করতে হয়, প্রথম ধাপে নতুন অবস্থায় সাধারণত বউরা কিছু বলে না। কিন্তু বিয়ের কিছু দিন পর দ্বিতীয় ধাপ অতিক্রম করতে গেলেই সব কিছু স্পষ্ট হতে শুরু করে।

স্ত্রীর ও সাংসারিক চাহিদা পূরণ করাই কঠিন হয়ে পড়ে। ধনাত্ম পরিবারের কথা আলাদা। ওইসব পরিবারের স্ত্রীরা চাওয়ার আগেই সব কিছু পেয়ে যায়। গাড়ি, বাড়ি, টাকা, দামি পোশাক ও অলংকার। খান সাহেব ছাপোষা মানুষ, এসব দেয়ার তার সামর্থ্য নেই। এমনিতেই সুন্দরী নারীদের চাহিদার শেষ থাকে না। তারা দেমাগী ও মেজাজি হয়। মেজাজি-দেমাগি খান সাহেবেরও কম নেই। ইতোমধ্যে তিনি বেশ কয়েকটি সিনেমা নাটকে অভিনয় করেছেন। জনপ্রিয়তাও কম পাননি, তবে পার্শ্চরিত্রে অভিনয় করার কারণে অর্থের মুখ দেখেননি। সনাতন কথা হলেও 'অর্থই প্রধান, কাঁচা টাকার দাপটই আলাদা।' এই দাপট তার নেই। তাই মিনারা বাধ্য হয়ে স্কুলের চাকরি নেয়। পাশাপাশি কোচিংও শুরু করে একটি রুম ভাড়া নিয়ে। খানের বিষয়টি পছন্দ নয়। মিনারাকে তিনি এতটা স্বাধীনতা দিতে চাচ্ছেন না। প্রকৃতপক্ষে তার মধ্যে স্ত্রীকে কেন্দ্র করে সামন্ততান্ত্রিক মানসিকতা কাজ করে। মিনারা তার কথার বাইরে চলুক এটা তিনি কখনো-ই চান না। স্কুলে চাকরি নেয়া, কোচিং সেন্টার খোলা একমাত্র সন্তান নিয়ে কোচিং সেন্টারে বেশ কয়েকদিন রাত কাটানো। এসবই ছিল রাকিবের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ। মূলত দাম্পত্য সম্পর্কে অবনতি এখান থেকেই শুরু। এ ছাড়া নিজেদের জমিতে সাদামাটা টিনসেড ঘরে বসবাসও মিনারার পছন্দ নয়। এ ব্যাপারে রাকিবকে মিনারা স্পষ্ট জানিয়েছে। রাকিব বিষয়টিকে আমলে নেন না। এ ছাড়া রাকিব ঘরমুখী নয়। সারাদিন বাইরে টো টো করে ঘুরে বেড়ায়। বাউন্ডলে পুরুষের স্বভাব রয়েছে তার ভেতর। প্রধানত এ কারণেই মিনারা আজ ঘরছাড়া।

তিন, দুটি কারণে তার মনটা একেবারেই কুঁচকে যায়।

যখন তার শৈশবের স্মৃতি মনে পড়ে। বিশেষ করে মনে পড়ে কাকলীর কথা। কাকলীদের বাড়ি কলুটোলাতেই ছিল। কাকলী তখন নবম শ্রেণির ছাত্রী। খান সাহেব তখন কলেজে উঠি উঠি করছেন। মহল্লার মধ্যে কাকলীকে তার বেশ পছন্দ। কাকলীর ছিল নজরকাড়া চেহারা আর ভুবনমোহিনী হাসি। ওর হাসির কারণে মহল্লার ছেলেরা পাগল ছিল। কিন্তু কাকলীর একটা প্রধান সমস্যা ছিল, ও কোনো ছেলেকেই পাত্তা দিত না। রাকিবের ধারণা ছিল, রাকিব যেহেতু সুদর্শন এবং কাকলীর মতোই সন্দা হাস্যোজ্জ্বল, সুতরাং সে ওকে পাত্তা দেবে। হয়ত প্রেমের প্রস্তাবেও সাড়া দেবে। রাকিবের এ ব্যাপারে যথেষ্ট আস্থা ছিল। এই আস্থা তৈরি হওয়ার পেছনে একটি শক্তিশালী কারণও ছিল। কারণটি হলো কাকলী ওকে দেখলেই হাসতো, কুশল বিনিময়ও করতো। এর ফলে রাকিবের মনে এ ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে যে, কাকলী হয়ত তাকে পছন্দ করে, হয়ত ভালোবাসে। তাই কাকলীকে উদ্দেশ্য করে একটি চিঠি লেখে সে। প্রথমে সারা রাত জেগে যে চিঠিটা লিখেছিল, সেটা তার মনোপূত হয়নি। তাই সে চিঠি সে ছিড়ে ফেলে। এরপর দ্বিতীয় চিঠি লিখতে শুরু করে সে। দ্বিতীয় চিঠিও সে সারা রাত জেগে লিখে। এরপর বারবার পড়ে সে চিঠিটা। এই চিঠিটাও তার মনোপূত হয়নি। তাই সে দ্বিতীয় চিঠিও সে একই কায়দায় ছিড়ে ফেলে। এরপর সে হতাশ হয়ে পড়ে। কাকলীকে দেখলে তার মনের ভেতর যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়, যে মুগ্ধতা কাজ করে চিঠির ভাষায় সে সেটা আনতে পারছে না। এ কারণে নিজের প্রতি নিজেই বিরক্ত প্রকাশ করে। রাত গভীর হতে শুরু করলে তার ভেতর কাকলীকে কেন্দ্র করে অদম্য আগ্রহ দেখা দেয়। তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে নির্মল প্রাণোজ্জ্বল হাসি। তার মনে হয়, এই হাসি কেবল একজনই হাসতে পারে। তাই রাতের আঁধারে কাকলী জীবন্ত হয়ে ধরা দেয়। তার মধ্যে অন্যরকম মাদকতা তৈরি করে। আবার সে খাতা কলম নিয়ে চিঠি লিখতে বসে যায়। 'একবার না পারিলে চেষ্টা কর বারবার' এই নীতিতে বিশ্বাসী ও অনুপ্রাণিত হয়ে রাকিব তৃতীয় বারের মতো চিঠি লেখায় মনোযোগী হয়। আজো সারা রাত জেগে চিঠি লেখে। এক লাইন লেখে তো ১০ বার কাকলীর কথা ভাবে। এই ভাবনা আর লেখার যেন শেষ নেই। যেন চিঠির প্রতিটি অক্ষর পাথরে খোদাই করা হচ্ছে। আর রাকিব হচ্ছে একজন বড় ভাস্কর। চিঠি লেখা শেষ হলে সেটা বারবার পাঠ করা হয়। এবার তার বদ্ধমূল ধারণা চিঠির ভাষা কাকলীর পছন্দ হবে। চিঠি লিখতে গিয়ে পরপর তিন রাত জাগার কারণে তার শারীরিক অবস্থারও কিছুটা অবনতি হয়েছে। তাতে কী। চিঠিটা তো ঠিক মতো কাকলীর কাছে পৌঁছাতে হবে।

সকাল পেরিয়ে দুপুর এবং দুপুর পেরিয়ে বিকাল হলে রাকিব কাকলীদের বাসার সামনে ঘুরঘুর করতে থাকে। এই সময়টা কাকলী সাধারণত দোতলার বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। অথচ আজ কাকলীকে বারান্দায় দেখা যাচ্ছে না। এরপরও সে রাস্তায় অপেক্ষা করতে থাকে। রাকিব মহল্লায় এতটাই পরিচিত যে, রাস্তার এক জায়গায় বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকাটাও তার জন্য মহা

বিরক্তিকর কাজ। এরপরও সে অনেকটা আড়াল-আবডাল করার মতো রাস্তায় আরো আধঘণ্টা থাকলো। এ সময় সে দেখতে পেল কাকলী বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে। কাকলীকে দেখা মাত্র তার চোখ-মুখে এক অজানা আনন্দ খেলে গেল। চিঠিটা আগে থেকেই একটা ইটের টুকরোর সঙ্গে বাঁধা ছিল। সে কাকলীকে দেখে হাসলো এবং কাঁপা কাঁপা হাতে চিঠিটা বারান্দায় ছুড়ে মারল। কাকলী বুঝতে পারল রাকিব কিছু একটা তাকে দিয়েছে। সে গভীর মনোযোগের সঙ্গে চিঠিটা তুলে নিল। চিঠির ভাঁজ খুলে, না পড়েই চিঠির মধ্যে থুথু দিয়ে সেটা ছিড়ে ফেলল। চিঠির টুকরোগুলো রাকিবের সামনেই রাস্তায় ছড়িয়ে পড়ল। এই ঘটনায় রাকিব যারপরনাই ব্যথিত হলো। তার ভালোবাসা বা চিঠি লেখার প্রতিদান কাকলী ঠিক এইভাবে দেবে সেটা সে ভাবতে পারেনি। এ ব্যাপারে দীর্ঘদিন তার মন খারাপ ছিল।

দ্বিতীয় ঘটনাটি তার স্ত্রী মিনারাকে নিয়ে। মিনারা তার জীবনে একমাত্র নারী, যার সঙ্গে অন্য কোনো নারীকে তিনি মিলাতে পারেন না। রাকিব খান সুদর্শন থাকার কারণে মিনারার মা-ই তাকে পছন্দ করেছিল। মা-মেয়ে একসঙ্গে রাস্তায় যাচ্ছেন, এমন অবস্থায় খান সাহেব তাদের অনেক দিন দেখেছেন। তিনি তার স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে হাসিমুখে তাদের সালামও দিয়েছেন। খান সাহেব যেহেতু উজ্জ্বল মুখ আর দাঁতের অধিকারী। হাসি দিলেই দাঁতের উজ্জ্বলতা চোখে পড়ে। দাঁতও যে মানুষের বড় আকর্ষণ হতে পারে তার প্রমাণ খান সাহেব দিয়েছেন মিনারার মায়ের কাছে। অবশ্য দাঁত নিয়ে অন্য একটি গল্প রাকিব খানের মনে পড়ে গেল। তাদের ক্লাসে একটি ছেলে পড়তো, নাম হাবীব। ছেলেটি ছিল আলাবোলা স্বভাবের। ডানে যেতে বললে বামে যেত। আর বামে যেতে বললে যেত সোজা পথে। ওকে নিয়ে সহপাঠীদের গল্পের শেষ নেই। হাবীবের একটি বাজে অভ্যাস ছিল, সম্ভবত দাঁত পরিষ্কার করতো না। যার কারণে একেবারেই হলুদাভ অবস্থা ধারণ করেছে। একদিন বন্ধুরা ওকে ধরল দাঁত পরিষ্কার না করার অপরাধে ওকে মারবে। জটলা দেখে রাকিব এগিয়ে এসে ঘটনাটা জানলো। এরপর হাবীবকে মারের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য বললো। হাবীব দাঁত পরিষ্কার করে না তাতে কী হয়েছে। চেপ্সি খানতো সারা জীবন দাঁত পরিষ্কার করেননি। তাতে কি তিনি রাজ্য শাসন করেননি, খ্যাতির শীর্ষে যাননি। সেদিন রাকিবের কথায় হাবীব মারের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিল। এই দাঁতের আর মুখের আকর্ষণের কারণেই মিনারার মা ওয়াহিদা বেগম রাকিবকে জামাতা হিসেবে পছন্দ করেছিল। মিনারা বেগম যে তাকে পছন্দ করেননি, সেটা বলা যাবে না। মায়ের পছন্দের কারণেই মিনারা বেগমের সঙ্গে তার আধা-প্রেম গড়ে উঠেছিল। বিয়ের বাজারে নারী-পুরুষ উভয়েই পণ্য। যদিও পুরুষতান্ত্রিক সমাজ কেবল নারীকে পণ্য হিসেবে দেখে। নারী যত সুন্দরী এবং লেখাপড়ায় বংশ-মর্যাদায় উন্নত বিয়ের বাজারে তার চাহিদা বেশি। একইভাবে যে পুরুষ সুদর্শন স্মার্ট অর্থশালী এবং বংশ মর্যাদায় উন্নত তার চাহিদাও ততোবেশি। সুতরাং বিয়ের ক্ষেত্রে উভয়েই পণ্য। ভালো পণ্যের ভালো দাম খারাপ পণ্যের খারাপ দাম, বাজারের এটাই রীতি। এই

পরিপ্রেক্ষিতে রাকিবকে কেউ-ই ফেলে দিতে পারবে না। এর মধ্যে সিনেমা নাটকে অভিনয় করেও তিনি যথেষ্ট সুনাম কুড়িয়েছেন। সব মিলিয়ে পাত্র হিসেবে তাকে কেউ মূল্যহীন ভাবে না। এমন পরিস্থিতিতে ওয়াহিদা বেগম কিংবা মিনারার রাকিবকে অপছন্দ হওয়ার কোনো কারণ নেই। বিয়েটা তাদের আগ্রহ-উদ্যোগে এবং রাকিবের পিতামাতার সম্মতিতেই হলো। বিয়ের প্রথম দিনগুলো ভালোই কাটছিল রাকিব আর মিনারার। তাদের অভিব্যক্তি আর চাল-চলন এমন ছিল যে, দেখলেই বোঝা যেত এরা দুইজন প্রেম করে বিয়ে করেছে। চেহারা ফিগারে দুইজনকেই ভালো মানিয়েছে। দুইজনই দেখতে অনেক সুন্দর। আজকাল অবশ্য দম্পতিদের মধ্যে অসমতাই বেশি লক্ষ করা যায়। দেখা যায় স্ত্রী অনেক সুন্দর তো স্বামী খাটো ও কালো। বিপরীত চিত্রও চোখে পড়ে। স্বামী অনেক সুদর্শন অথচ স্ত্রী কালো। সবই সৃষ্টিকর্তার কৃপা ও আশীর্বাদ, এর পড়েও চোখে লাগে। সেই হিসেবে জুটি হিসেবে রাকিব মিনারা অন্যরকম নজরকাড়া। তারা দুইজনে যেখানেই যায় সবার দৃষ্টি পড়ে। এমন সুন্দর জুটি তারা দেখেনি এমন কথাও বলেন কেউ কেউ। রাকিবের মিনারাকে নিয়ে অনেক স্বপ্ন। সেই স্বপ্নের সফল বাস্তবায়ন করতে চায় সে। তাই বিয়ের পর থেকেই নতুন বউকে নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়ান তিনি। এই ঘুরে বেড়ানোর ক্ষেত্রে প্রাধান্য পায় গ্রাম ও প্রকৃতি। দেখা গেল রাকিব ফজরের আজনের পরপরই মিনারাকে নিয়ে ঘুরতে বের হলো। গ্রামের রাস্তার পাশে তখনো হয়ত কুয়াশা জাল বিস্তার করে আছে। রাকিব দূরে দৃষ্টি প্রসারিত করলেও কুয়াশার কারণে স্পষ্ট কিছুই দেখতে পায় না। মিনারাকে রাকিব ওইদিকে তাকাতে বলে কুয়াশা দেখার জন্য। সকালের শীতালু গ্রামীণ পরিবেশের স্বাদ নেয়ার জন্য। অথচ মিনারার সেদিকে খেয়াল নেই। রাকিবের উচ্ছ্বাসকে সে ভালোভাবে গ্রহণ করতে পারছে না। এর পর যতোই দিন অতিবাহিত হতে থাকে সাংসারিক নানা টানাপড়েন শুরু হয় জটিলতা বাড়ে। আস্তে আস্তে দুইজনের মধ্যে দূরত্ব বৃদ্ধি পায়। এক সময় মিনারা সংসার ছেড়ে চলে যায়।

চার.

মিনারা চলে যাওয়ার পর থেকে রাকিবের জীবনটা চরম অস্থিরতার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হতে থাকে। তিনি একেবারেই দিশাহারা হয়ে পড়েন। সাধারণত স্ত্রী চলে যাওয়ার পর স্বামীর দ্বিতীয় বিয়ের কথা চিন্তা করে। অনেক সময় আত্মীয়স্বজনরাই অতি উৎসাহী হয়ে আগবাড়িয়ে মতামত প্রকাশ করে। এই মতামত প্রকাশের ক্ষেত্রে বন্ধুরাও পিছিয়ে থাকে না। কিন্তু যে যতোই মতামত দিক না কেন, রাকিব এ ব্যাপারে একেবারেই অনড়। তিনি কোনোভাবেই দ্বিতীয় বিয়ের পক্ষে নয়। তিনি মনে করেন, ভদ্রলোক বিয়ে করে একটাই। আসলে দ্বিতীয় বিয়ে রাকিবের জীবনের কোনো সমাধান নয়। মিনারা ফিরে এলেই তার জীবনে আবার স্থায়ী ছন্দ ফিরে আসবে। এখন তার জীবনে কোনো ছন্দ নেই। প্রতিদিনের যে টুকু গতি বা ছন্দ তা আরোপিত। কবরের অন্ধকার নিয়ে যে ঘরটিতে তার বসবাস, এই ঘরটি থেকে বের হয়ে তিনি প্রতি মুহূর্তে আলোতে আসতে চান। যে আলো তার

জীবন বদলে দেবে। নতুন জীবনের জয়গান গাইবেন তিনি। তাই তো তিনি ঘর থেকে বের হয়েই সদর রাস্তায় আসেন। জনকোলাহলপূর্ণ রাস্তায় দাঁড়িয়ে তিনি শরীরের সমস্ত শক্তি চোখে এনে আকাশ দেখায় ব্যস্ত হয়ে পড়েন। আকাশ তাকে খুব টানে। তার ইচ্ছা করে পাখির মতো আকাশে উড়ে বেড়াতে। তিনি মনে করেন, অসীম আকাশে অব্যাহত হাতছানি আর অসীম শান্তি রয়েছে। তিনি যেহেতু পাখি নন, উড়তে পারেন না। আকাশ পথে ভ্রমণেরও তার কোনোদিন সুযোগ হয়নি। তাই অনেকটা দুধের স্বাদ ঘোলে মোটানোর মতো করে তিনি আকাশের দিকে তাকিয়ে ভুবন চিল দেখেন। চিলের ওড়াওড়ি তার মনোজগৎকে আন্দোলিত করে। অন্যরকম আনন্দ এনে দেয় তার ভেতর। তবে সদর রাস্তায় চিলের দেখা পাওয়া যায় না। বাধ্য হয়েই তাকে বুড়ি গঙ্গার তীরে এসে দাঁড়াতে হয়। বিকাল বেড়ানো অনেক চিলই তার চোখে পড়ে। চিলগুলো কখনো পানির কাছাকাছি যাচ্ছে, আবার কখনো বেশ দূরত্ব নিয়ে উড়ছে। চিলকে একাকী উড়ে বেড়াতেও দেখছেন তিনি। একাকী চিল যেন তার মতোই, এর কোনো দিক নেই, গন্তব্যও, আছে কেবল এলোমেলোভাবে ওড়াওড়ি। তবুও চিলের দখলে বিশাল এক আকাশ। ডানা ঝাঁপটিয়ে চিলটি অনায়াসে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে পারবে। রাকিব খানের জীবনে সে সুযোগ নেই। তার জন্য উন্মুক্ত কোনো আকাশ নেই, আছে ঘন বসতিপূর্ণ রাজধানী। যেখানে মানুষ আর মানুষ। যানবাহন আর যানবাহন, দুর্ভোগ আর দুর্ভোগ। ব্যয়বহুল জীবনযাত্রায় মানুষ এখানে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করে বেঁচে আছে। এসব সমস্যা রাকিবের জন্য যেমন দুঃস্বপ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে, একইভাবে নগরবাসীর জন্যও দুঃস্বপ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাজধানীর কোথাও স্বস্তি নেই, শান্তি নেই, ভোগান্তির শেষ নেই। এমন অবস্থায় রাকিব ভুবন চিলের মতো হব কী করে। এরপরও তার ভুবন চিল হতে ইচ্ছা করছে। চিলের সঙ্গে উড়তে চায় সে। এ ধরনের সুযোগ যদি তার জীবনে আসে তবে তিনি হয়ত স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারবেন। রাকিবের পছন্দ প্রকৃতিপ্রধান জায়গা। যেমন খাল, নদী লেক-সাগর বৃক্ষ ফুল পাখিদের আকাশে ওড়াওড়ি, ঝাঁক বেধে অথবা একাকী, দিগন্ত বিস্তৃত আকাশ, আকাশের মেঘ এরপর বৃষ্টি ও দমকা হাওয়া এবং কোলাহলময় কোনো জায়গা। প্রকৃতি ও মানুষ তাকে নিরন্তর বাইরে ডাকে। ঘরের কিংবা সংসারের সৌন্দর্যের চেয়ে বাইরের সৌন্দর্যই তাকে বেশি টানে। যার ফলে বাইরের আসক্তি তার সবচেয়ে বেশি। মিনারা যেহেতু রোমান্টিকতাকে নিজের মধ্যে ধারণ ও লালন করে না। রাকিবের এই বহিঃমুখী আকর্ষণের কারণে সে বিরক্ত। সঙ্গত কারণেই সংসারের প্রতি তার মনোযোগ কম। এমন বহিমিয়ান স্বামী তার প্রত্যাশা ছিল না। রাকিব অতিরিক্ত আবেগ বরিয়ে যা বলতে চান বা করেন তা মিনারা ব্যক্তিগত ও সাংসারিক জীবনে কতটুকু গ্রহণ বা বর্জন করে সে দিকে তার মনোযোগ নেই। রাকিবের চাপের মুখে কোটিং সেন্টার থেকে বাসায় ফিরে এলেও এবং মিনারাকে সংসার গোছানোর প্রতিশ্রুতি দিলেও সংসারের প্রতি তার মনোযোগ লক্ষণীয় নয়। এটা মিনারা ধীরে ধীরে

বুঝতে পারেন এবং সংসারের প্রতি তার নাভিশ্বাস ওঠে।

শেষ পর্যন্ত মিনারার পক্ষে রাকিবের ঘর করা সম্ভব হয় না। যদিও রাতের বেলা মশারি টাঙানো নিয়ে প্রকাশ্য দ্বন্দ্বের সূত্রপাত এবং এটাকে কেন্দ্র করেই মিনারা সংসার ছেড়ে মায়ের কাছে চলে যায় একমাত্র ছেলেকে নিয়ে। রাকিব খান প্রতিদিন মশারি টাঙানো পছন্দ করেন না। যার কারণে খাটে মশারি টাঙানো থাকে দিনের পর দিন। এভাবে নাকি ৬ মাসও চলে গিয়েছে। এ এক অতুত ব্যাপার। ঘর-সংসার গুছিয়ে রাখা রুচিবোধসম্পন্ন স্ত্রীরা এটা সহ্য করবে কেন?

প্রথমদিকে একাকিত্বটা রাকিব খান উপলব্ধি করতে পারেন নি। স্ত্রীর প্রতি তার জিদ কাজ করেছিল। কিন্তু দিন যতই অতিবাহিত হয় তার নিঃসঙ্গতা একাকিত্ব ততই বেড়ে যেতে থাকে। আস্তে আস্তে তার মধ্যে এই ধারণাও প্রতিষ্ঠিত হয়, স্ত্রী-সন্তান তার জীবনের জন্য অনিবার্য। এরপর তিনি তাদের ফিরিয়ে আনারও চেষ্টা করেন। কিন্তু পারেন না। মিনারা ফোন দিলে সামান্য পরিচিত মানুষের মতো কথা বলে। রাস্তায় হঠাৎ দেখা হলে রাকিবই আগ বাড়িয়ে কথা বলেন, মিনারা ওকে পাত্তা দেয় না। এক কি দুশব্দে উত্তর দিয়ে সটকে পড়ে, যেন মহান্নার কোনো মাস্তানের সঙ্গে দেখা হয়েছে তার। রাকিব বুঝে উঠতে পারেন না মিনারা কেন তার সঙ্গে এমন আচরণ করছে।

পাঁচ.

স্ত্রী ও ছেলের ভরণ-পোষণের বিষয়টি শেষ পর্যন্ত আদালতে গড়ায়। আদালতের নির্দেশ অনুসারে স্ত্রী ও সন্তানকে এখন প্রতি মাসে ৫ হাজার টাকা দিতে হয়। আগে ৩ হাজার টাকা দিতেন অনিয়মিতভাবে। ছেলের কথা স্মরণে এলে রাকিবের কান্না পায়। ছেলটাকে বারবার ফোন করেও কাছে পান না তিনি। ওর মায়ের মতই ছেলের ভেতরে বাবাকে কেন্দ্র করে কোনো আবেগ নেই। হয়তো ভালোবাসাও নেই। কখনোই বাবার ব্যাপারে সে উচ্ছ্বসিত হয় না। ১০ বার ফোন দিলে ছেলে একবার রিসিভ করে। বাবা কেমন আছেন, কী খাচ্ছেন, কীভাবে জীবন-যাপন করছেন এসব ব্যাপারে মিনারার যেমন কৌতূহল নেই, একইভাবে কৌতূহল নেই ছেলেরও। অথচ রাকিব খান চান তার স্ত্রী-সন্তানরা তার কাছে ফিরে আসুক। তার ছেলের চতুর্থ-পঞ্চম শ্রেণির পরিচয়পত্র তার কাছে ছিল। ছেলের কথা মনে হলেই খান সাহেব পরিচয়পত্র বের করে ছেলের ছবি দেখেন। নিবিষ্টচিত্তে দেখতেই থাকেন। আস্তে আস্তে তার দুই চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। ছেলটি এখন তার মতোই সুদর্শন হয়েছে, পড়ছে নবম শ্রেণিতে। ছেলে যদি কোনো কারণে বাসায় ফিরতে দেরি করে, মা উতলা হয়ে যায়। তখন বাধ্য হয়ে রাকিবকে ফোন দেয়। ছেলেকে কেন্দ্র করে দুইজনের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়। এ নিয়ে একে অপরকে দোষারোপ করেন।

একবার এক কাঁঠাল কিনে রাত সাড়ে ১১টার সময় শশুরবাড়ির গেটে নিয়ে গিয়ে মিনারাকে ফোন দিল কাঁঠালটা নিয়ে যেতে। মিনারা কাঁঠাল নিতে অসম্মতি জানালো। অবশেষে কাঁঠাল ফেরত নিয়ে এলেন তিনি। এভাবে আম, জাম, দুধ, ডিম, কলা অনেকবারই ফেরত এনেছেন তিনি। আবার কখনো

কখনো ছেলে বাসায় নিয়েও গেছে এসব। আরেকবার রুই ও তেলাপিয়া মাছ কিনে পাঠালেন মিনারার কাছে। সেবার প্রত্যাখ্যাত হননি খান সাহেব। এক দুপুরে তিনি দেখতে পান ছেলে তার জন্য ভাত আর মাছের দো-পিয়াজি নিয়ে এসেছে। এই দৃশ্য দেখে যারপরনাই খুশি হয়েছেন তিনি। এও ভেবেছেন এবার হয়তো মিনারার মনে বরফ গলতে শুরু করবে। অনেকদিন পর মিনারার হাতের রান্না খেয়ে পরম তৃপ্তি লাভ করলেন তিনি। খাওয়ার পর ওকে ফোন দিলে ও আগের মতই আচরণ করে। মিনারার এই আচরণে তার খাবারের তৃপ্তি উঠে যায় এবং আশাভঙ্গ হয়। মিনারা তাকে আগেই বলেছিল, বাসা-বাড়ি সংস্কার করলে সে ফিরে আসবে। ওকে ফিরিয়ে আনতে হলে কমপক্ষে দুটি রুম ঠিকঠাক করতে হবে। কারণ, ছেলে বড় হয়েছে। কিনতে হবে টিভি, ফ্রিজসহ ঘরের অন্যান্য আসবাবপত্র। এতে খরচ হবে কয়েক লাখ টাকা। তিনি সামান্য চাকুরে,

বেতন পান মাত্র ১০ হাজার টাকা। এই টাকা উচ্চ মূল্যের বাজারে কিছুই না। এর মধ্যে ৫ হাজার টাকা দিতে হয় খোরপোষ। সুতরাং তার পক্ষে এত টাকা খরচ করে বাসা-বাড়ি সংস্কার করা সম্ভব নয়। ঋণের মাধ্যমে সংস্কার করার মানসিকতাও তার নেই। রাকিবের কখনো কখনো মনে হয় মিনারা এসব অযৌক্তিক অজুহাত। স্বামীকে ভালোবেসে তার সংসারে আসতে চাইলে বাসা সংস্কার না করেও আসা যায়। সংসারে ফিরে দুইজনের সম্মিলিত প্রচেষ্টায়ও এসব ঠিকঠাক করা সম্ভব। খান সাহেব বহুবার নিশ্চিত হয়েছেন, মিনারা এই সংসারে আর ফিরে আসবে না। এরপরও ‘আশায় বসতি’। যদি কোনো দিন ফিরে আসে, তবে তার ঘর-সংসার-জীবন আগের মতই আলোকিত হবে। স্ত্রী-পুত্রকে কেন্দ্র করে খান সাহেব আবার উল্লসিত-উজ্জ্বল হয়ে উঠবেন। আহা কী আনন্দ আকাশে বাতাসে। একদিকে মিনারার ফিরে আসার জন্য তিনি

অপেক্ষা করেন অন্যদিকে মন ও শরীরে রোশনাই ও উদ্দীপনা সৃষ্টির জন্য তিনি নারীকেন্দ্রিক অন্য ভূবনও সৃষ্টি করেন। এই ভূবনের বাসিন্দা এখন অনেকই। যাদের নানা কাজের পৃষ্ঠপোষকও তিনি। বন্ধু-বান্ধবীদের ব্যাপারে বরাবরই তিনি দিলাখোলা। প্রতিদিনের খরচ থেকে কিছু টাকা সঞ্চয় করে বন্ধুদের জন্য উপহার কিনবেন তিনি। তবে বান্ধবীরা উপহারপ্রাপ্তির দিক থেকে থাকে এগিয়ে। সেলাই মেশিন দেয়া থেকে শুরু করে, নগদ অর্থ এবং ছোটখাটো উপহার তো আছেই। ছয়।

বেদানা ফার্মেসির মধ্যবয়সী শিউলিকে তার খুব পছন্দ। মুক্ততার ভালোলাগার যেহেতু কোনো সীমারেখা নেই, তাই শিউলিকে দেখে, তাকে নানা উপহার দেয়ার মধ্যেই তিনি অপার আনন্দ খুঁজে পান। প্রায় প্রতিদিনই খান সাহেব তাকে উপহার দেবেন। ডিম, দুধ, ঘি, চানাচুর, পাউরুটি, কলা, বাখরখানি, মধুবন, মিষ্টি, সবজি, রসমালাই কোনো কিছুই বাদ নেই এই তালিকায়। শিউলির প্রশ্ন কেন আনেন এসব টাকা খরচ করে। রাকিবের প্রেমিকসুলভ উত্তর ‘ভালো লাগে তাই’। উপহার দেয়া ছাড়াও তিনি প্রতিদিন ১০ টাকা ভাঙাবেন শিউলির ওষুধের দোকান থেকে। নেবেন ৫টি দুই টাকার নোট। টাকা ভাঙানোর অজুহাতে তিনি শিউলির হাত স্পর্শ করবেন। ওর হাতের ছোঁয়া পাওয়াই নাকি খান সাহেবের জন্য চরম সৌভাগ্যের ও আনন্দের ব্যাপার। এটা নাকি তার জীবনের শ্রেষ্ঠ প্রেমের অনুভূতি। এই অনুভূতি তিনি অন্য কোনো নারীর কাছ থেকে পাননি। শাহবাগের আড্ডায় যখন তিনি যাবেন, আড্ডায় যদি থাকে কোনো সুন্দরী নারী তাহলে তো কথাই নেই, হৃদয়ে পুঞ্জীভূত সব রোমাঞ্চের প্রেমের ঝাঁপি খুলে দেবেন তিনি অনায়াসে। তাদের নাম দিয়েছেন তিনি ‘মধুবালা’ ‘মধুমলা’। যাদের উদ্দেশ্যে ঝাঁপি খুলে দেন তারা সম্মোহিত আকর্ষিত না হয়ে বিস্ময় প্রকাশ করে এই ভেবে যে, লোকটির বউ চলে যাওয়ার পর মাথা ঠিক নেই। জিদের বশবর্তী হয়ে তিনি যে দ্বিতীয় বিয়ে করবেন তেমন দৃঢ়চেতা একগুয়েমি মানসিকতাও তার নেই, নেই অর্থনৈতিক সামর্থ্য। বরাবরই তার দাবি তিনি ‘একজন প্রেমিক ও কামকাতর পুরুষ’ তার এ কথা শুনে আড্ডায় উপস্থিত লোকজনের মধ্যে হাস্যরসের সৃষ্টি হয়। রাকিব খান অভিনেতা হওয়ার কারণে কথার ফুলঝুরি সাজাতে পারেন। তিনি প্রায়ই বলেন, ‘হায় পৃথিবীর তাবৎ রমণী যদি আমার প্রেমিকা হয়ে যেত।’ তার এই আক্ষেপও আড্ডার প্রধান রসদ। মানুষের বেশিরভাগ প্রত্যাশা ও স্বপ্ন পূরণ হয় না। যেমন রাকিব খানের হয়নি। আজ এসব কথা বুড়িগঙ্গার তীরে দাঁড়িয়ে তিনি ভাবছেন আর চোখের পানি ফেলছেন। খান সাহেব জানেন না এই অনিরাময়যোগ্য ব্যাধি তিনি কতদিন বয়ে বেড়াবেন। রাকিব খানের একটি বিশেষ গুণ হচ্ছে তার অতিথিপরায়ণ স্বভাব। এই স্বভাবটা সমাজ-সংসার থেকে ব্যক্তি নিজেই উঠিয়ে দিয়েছে তার আত্মকেন্দ্রিকতার কারণে। অতিথি নারায়ণ সঙ্গত কারণেই এই কথাটি উচ্চারিত হয় না বললেই চলে। এই শহরে এমনও মানুষ রয়েছে বাসায় কোনো অতিথি ৩-৪ ঘণ্টা কাটালেও চা-বিস্কুটের



অফার করবে না। কলকাতায় নাকি এই সংস্কৃতি চালু রয়েছে। বাংলাদেশেও এখন এই সংস্কৃতি চালু হয়েছে। তবে রাকিব খানের মানসিকতা এ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এমন দিলখোলা মানুষ পাওয়া খুব কঠিন। তার পকেটে সব সময় ৫-১০ হাজার টাকা থাকে। কোনো বিল পরিশোধ করার সময় পুরো টাকাই তিনি বের করেন, যেটা অনেকটা প্রদর্শনের মতো। তার কোনো ব্যক্তিগত ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নেই। ঘরের পরিবেশ নগদ অর্থ রাখার উপযোগী নয়, প্রধান সমস্যা নিরাপত্তা। যার কারণে তিনি সব সময়ই পকেটভর্তি করে টাকা রাখেন। এ ছাড়া আড্ডায় যে কোনো সময় বড় ধরনের বিল পরিশোধ করা লাগতে পারে, এই বিবেচনায়ও তিনি নগদ অর্থ পকেটে রাখেন। এ ধরনের অর্থের প্রবাহ মধ্যবিত্ত পরিবারের কোনো সদস্যের মধ্যে খুব কমই দেখা যায়।

নারীর বিপদে এগিয়ে আসার মতো পুরুষ খুবই কম। বিশেষ করে কোনো পরিচিত কিংবা ঘনিষ্ঠ নারীর মধ্যে যদি আর্থিক কিংবা মানসিক সমস্যা দেখা দেয় তা হলে রাকিব সাহেব পাশে দাঁড়াবেন। কারো মোবাইলে টাকা না থাকলে টাকা দিয়ে দেবেন। আড্ডা শেষে দুপুরের খাবারের পর যদি কেউ রাতের খাবারের ইচ্ছা পোষণ করেন, তা হলে তার রাতের খাবারও নিশ্চিত করবেন তিনি। যদি কারো মন খারাপ থাকে, বিশেষ করে কোনো নারীর, তা হলে তিনি ওই নারীকে সারাদিন শহরের বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে যাবেন। প্রয়োজনবোধে নিয়ে যাবেন ঢাকার বাইরে। ওই নারীর পেছনে সব ধরনের খরচ করবেন তিনি। কেবল তাই নয়, বিদায় নেয়ার সময় তাকে যাতায়াত খরচও দেয়া হবে। কোনো নারী যদি তাকে অপমানজনক কথা বলে, তা হলে তিনি তা কখনোই গায়ে মাখবেন না। মিস্তি হাসির সুভাস ছড়িয়ে তা তিনি সহজভাবে গ্রহণ করবেন। কেউ যদি তাকে বলে, ওই নারী তো আপনাকে অপমান করেছে। প্রতিউত্তরে তিনি বলবেন, করতেই পারে। তার অপমান করার অধিকার রয়েছে। কোনো নারী না চাইলেও তিনি অবলীলায় অধিকার দিয়ে দেন। এটাও তার চরিত্রের আরো একটি বিশেষ দিক। তবে নারীরা তার দেয়া অধিকারকে খুবই বাজেভাবে মূল্যায়ন করে। এটাই তার বড় ধরনের আক্ষেপ ও বেদনার কারণ। কেউ যদি রাকিব খানকে জিজ্ঞাসা করে, আপনি নারীদের পেছনে এতো অর্থ ব্যয় করছেন, এতে আপনার কী লাভ? তিনি হয়ত বলবেন, আমি উপকৃত না হলাম ওরা তো হলো। তবে রাকিব খান যে উপকৃত হন না এ কথা তিনি নিশ্চিত করে বলতে পারবেন না। কারণ, এর মধ্যেও তিনি এক ধরনের আনন্দ খুঁজে পান। যে আনন্দ সাধারণভাবে হয়ত আহরণ করা সম্ভব নয়। এ ক্ষেত্রে খান সাহেব নিবেদিত প্রাণ এক ব্যক্তিত্ব। দৃষ্টিভঙ্গি যে ধরনেরই হোক না কেন এভাবে কেউ কাউকে টাকা কিংবা উপহার দেয় না। ফল পেলে পেলাম না পেলে না পেলাম, আমার কাজ আমি করবই, খান সাহেব এই দর্শনে বিশ্বাসী। এটা যে কেবল নারীদের ক্ষেত্রে ঠিক তা নয় পুরুষ বন্ধুদের পেছনেও তিনি অবলীলায় অর্থ খরচ করেন। নারী বন্ধুদের পাশাপাশি পুরুষ বন্ধুদেরও তিনি বিভিন্ন ধরনের উপহার দেন। উপহার কিংবা খাদ্য খাবারের ব্যাপারে তার আরো

একটি গুণ হচ্ছে, তিনি এসব করে অন্য বন্ধুদের মতো প্রচারে নামেন না। এক হাতে দান করলে অন্য হাত জানবে না, তিনি সবসময় এই নীতিতে বিশ্বাসী। এর সরল অর্থ হচ্ছে তার যেটা ভালো লাগবে সেটাই তিনি করবেন। অতিরিক্ত স্বাধীনচেতা মানুষ যেমন হন, তিনিও তেমনটাই। তবে অতিরিক্ত স্বাধীনচেতা মানুষ যেমন অত্যন্ত রগচটা স্বভাবের হয়ে থাকে তিনি তেমনটা নন। বিনয় প্রকাশ তার চরিত্রের একটি উজ্জ্বল দিক। এই বিনয় প্রকাশের মাধ্যমে তিনি তার চিরাচরিত হাসিটা ধরে রাখেন। মানুষকে সম্মোহিত কিংবা আবিষ্ট করার এটাও একটি শক্তিশালী দিক। এ ছাড়া স্বভাবে-আচরণে তার ভেতর কোনো ধরনের জড়তা নেই। সুযোগ পেলেই তিনি বুড়িগঙ্গা ছাড়াও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও হাতিরবিল এলাকায় যান। তার এক কবি বন্ধু রাকিবের ব্যাপারে যথেষ্ট সহানুভূতিশীল। যদিও রাজনৈতিক আদর্শের দিক থেকে দুইজনেই দুই মেরুতে। কবিবন্ধু আশেক মাহমুদ মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী, তার আদর্শ বাঙালি বাংলাদেশ ও বঙ্গবন্ধু। আশেক দেশকে ভালোবাসে। শত টানাপড়েনের মাঝেও তিনি এই দেশেই থাকতে চান। কবি ও মানবতাবাদী আশেক সুযোগ পেলেই সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়ান। কাব্যচর্চাই হোক আর জীবনচর্চাই হোক তার মূল প্রেরণা এদেশের মানুষ। একই মানসিকতা রাকিবেরও রয়েছে। দুইজনেই প্রেমিক ও মানবতাবাদী। কবি আশেক আবেগপ্রবণ হলেও অন্য কবিদের মতো আবেগে গা ভাসিয়ে দেন না। তিনি সবসময় যুক্তি মেনে কথা বলেন। তার জীবনের প্রধান সঙ্গী বাস্তবতা। যেটা বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয় সেটা তিনি কল্পনা করেন না স্বপ্নও দেখেন না। তিনি মনে করেন, কল্পনার স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে কবিতা লিখা আর জীবন-যাপনের ক্ষেত্রে বাস্তবতা বোঝা বা উপলব্ধি করা এক নয়। রাকিব এক্ষেত্রে অনারকম। তিনি সবসময় বাস্তবতাকে অতিক্রম করে চলতে চান। এ কারণে তিনি জীবন চলার ক্ষেত্রে অনেকবার হেঁচট খেয়েছেন। কথায় আছে ঠেকছি যেথায় শিখছি সেথায়। এ ধরনের শিক্ষা রাকিব নিতে চায় না। ফলে কবিতা না লিখলেও আপাদমস্তক কবি কবি ভাব তার। শ্রীল-অশ্রীল যে ধরনের কথাই বলা হোক না কেন। রাকিব আশেকের স্বীকৃতি চাইবে। বলবেন, আশেক ভাই এটা কি সাহিত্য। আশেক হয়ত বললো পুরোটাই সাহিত্য। এসব দিকে আশেকের সঙ্গে মিল আছে। দুইজনেই তুমুল আড্ডাবাজ এবং দুইজনেই চায় হাসি-তামাশার মাধ্যমে জীবন অতিবাহিত করতে। কারণ নীরব থাকা কিংবা গোমরা হওয়ার মধ্যে বিশেষ কোনো কৃতিত্ব নেই। ওই আদর্শিক জায়গায় দুইজনের মধ্যে প্রায়ই মতভেদ দেখা দেয়। তবে দুইজনের মধ্যে সম্পর্কের ফাটল ধরে না। রাকিবের যে অনেকটা সংসারবিহীন জীবনযাপন এবং ব্যক্তিজীবনের নিঃসঙ্গতা, বিশেষ করে অন্যের প্রতি সহর্মিতা, সাহিত্যের প্রতি ভালোবাসা এসবের কারণে আশেকের ভেতর এক ধরনের ভালোলাগা তৈরি হয়। এ ছাড়া ৫৯ বছর বয়সেও তিনি যেভাবে তারুণ্যকে ধরে রেখেছেন, সেটা ৪০ বছরের অনেকের পক্ষেই সম্ভব নয়। তার তারুণ্যই তার সম্বল ও বেঁচে থাকা।

সাত.

আশেক দীর্ঘদিন থেকে লক্ষ করে আসছে খান সাহেব পাকিস্তানের ব্যাপারে অতিমাত্রায় দরদি। একদিন বাণিজ্যমেলায় দেখা গেল তিনি পাকিস্তানি স্টল খুঁজছেন। পাকিস্তানি প্যাভিলনে ঢুকে উর্দুতে বিক্রেতাদের সঙ্গে কথা বলছেন। কারো কারো সঙ্গে আলিঙ্গনও করছেন। এরপর কেনাকাটার পালা। আশেক দেখে অবাক হলো যে, তিনি সব জিনিসই পাকিস্তানি প্যাভিলন থেকে নিচ্ছেন। তার অতিমাত্রায় পাকিস্তানপ্রীতি তার ভালো লাগনি। তার ভাবখানা এমন যে, তিনি ওদের সঙ্গে স্থায়ীভাবে পাকিস্তান চলে যেতে পারলেই ভালো হতো।

মেলা থেকে বের হয়ে আশেক তাকে প্রশ্ন করলো – খান ভাই আপনি সব জিনিসপত্রই পাকিস্তানি প্যাভিলন থেকে কিনলেন যে?

– তাতে কি আপনার কোনো অসুবিধা আছে।

– অসুবিধা নেই, তবে এর ফলে আপনার ভেতর পাকিস্তানপ্রীতিটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

– এ ধরনের মন্তব্য আপনি এর আগেও আমাকে করেছেন।

– করাটা অযৌক্তিক বা অসঙ্গত মনে হচ্ছে না আমার কাছে।

– এর আগে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সম্পর্কে ভীষণ আপত্তিকর একটি কথা বলেছেন, যেটা গর্হিত অপরাধ এবং ইতিহাস বিকৃতির নামান্তর।

– কোন কথাটা?

– আপনি আমার সামনে বলেছেন, শেখ মুজিব যদি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রিত্ব না চাইতো এবং পাকিস্তানের সঙ্গে আপস করতো তা হলে ৩০ লাখ মানুষ অকাতরে প্রাণ দিত না এবং আড়াই লাখ মা-বোন ইজ্জত হারাতো না।

– কথাটার মধ্যে মিথ্যা কোথায়?

– কথাটা পুরোটাই মিথ্যা। কারণ ‘আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না, আমি এদেশের জনগণের মুক্তি চাই’ ৭ মার্চের ভাষণে এ কথা স্পষ্ট উল্লেখ আছে। এরপরও আপনি ইতিহাস বিকৃতি করছেন। আর পাকিস্তানের সঙ্গে বাঙালির আপস করার কিছুই ছিল না একথা যে কেউ বলবেন। আপনি এর আগে বলেছেন পাকিস্তান আমাদের শোষণ করেনি। আপনি মনে হয় ইতিহাস ভুলে গেছেন।

– ইতিহাস ভুলবো কেন?

– নিশ্চয়ই ভুলে গেছেন। আপনি নিশ্চয়ই জানেন, ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ বিভক্ত হয়ে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি দেশ জন্ম নেয়। ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ ছিল হিন্দু, পাকিস্তানে প্রাধান্য ছিল মুসলমানদের। পাকিস্তানের ছিল দুটি অংশ—পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান। পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার দূরত্ব ছিল হাজার মাইলেরও বেশি। সংস্কৃতিগতভাবে পূর্ব পাকিস্তান তথা পূর্ববাংলা পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল। পাকিস্তান রাষ্ট্রের ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত ছিল তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানি সামন্ত ও সামরিক কর্মকর্তাদের হাতে। পাকিস্তান সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই দেশ শাসন ও অর্থনৈতিক নীতিতে উভয় অংশের মধ্যে বৈষম্য দেখা দেয়। পূর্ব পাকিস্তান থেকে কৃষিপণ্য ও অন্যান্য সম্পদ পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হতে থাকে।

— পাচারের কথা কেন বলছেন? কেন্দ্রীয় শাসন ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। সেখানে এখানকার উৎপাদিত কৃষিপণ্য যেতেই পারে।
— আগেও বলেছি, আপনি সবসময় পাকিস্তানের পক্ষে কথা বলেন এবং মুক্তিযুদ্ধকে ছোট করে দেখেন। আপনার মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গি মানবতাবিরোধী অপরাধীদের চেয়েও খারাপ।
— স্বাধীনতার ৪৫ বছরে কী পেয়েছেন? এতো বছর পরও স্বাধীনতার স্বপ্নগুলো কতটুকু প্রতিফলিত করতে পেরেছেন, সেটা নিজেদের বিবেকের কাছে প্রশ্ন করুন। আমরা আসলে কী চেয়েছিলাম আর কী পেয়েছি? আমরা চেয়েছিলাম গণতন্ত্র। আমরা কি সেটা পেয়েছি? আমাদের স্বপ্ন ছিল, এ দেশের মানুষ যাতে না খেয়ে কষ্ট না পায়, এর ব্যবস্থা করা। আমাদের দেশের মানুষ যাতে অশিক্ষিত না থাকে, তার ব্যবস্থা করা। আমরা সেটা পারিনি। এটা আমাদের জাতীয় ব্যর্থতা। এই ব্যর্থতা তো আপনি স্বীকার করবেন না।
— করব না কেন? যেটা সত্য সেটা মেনে নিতে আমার কোনো আপত্তি নেই।
— আপনি বলতে চাচ্ছেন, পশ্চিম পাকিস্তানিদের শোষণের কারণে এ দেশের জনগণ অবহেলিত থেকে গেছে বারবার। এখন কি থাকছে না? দুর্নীতির দায়ে এ দেশকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়েছে। এ যে কত বড় লজ্জার, সেটা ভাবতেও পা শিউরে ওঠে। আমাদের দেশের কর্তাব্যক্তির মুখে দেশপ্রেমের কথা বললেও অন্তরে বিষ নিয়ে এগিয়েছেন সামনের দিকে। তারা নিজেদের আখের গোছাতেই ব্যস্ত থেকেছেন। ক্ষমতা গ্রহণ করে নিজ পরিবারের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভেবেছেন। দেশের কথা ভাবেন নি। বাকশালের নামে এক দলীয় শাসন কায়ম করেছেন। এ সব তো আবার আপনার চোখে ধরবে না।
— আপনি তো যুদ্ধাপরাধীদের বিচারকে সমর্থন করেন না। আপনার মনোভাব ও ভাবাদর্শ কী সেটা আমার জানা হয়ে গেছে।
— বিচার মানসম্মত হয়নি। বিচার প্রশ্নবদ্ধ হয়েছে।
— এটা তো পাকিস্তানপন্থীদের কথা।
— আপনি তো সবসময় আমাকে পাকিস্তানপন্থী ভাবেন। আশেক ভাই আমি আসলে চেয়েছিলাম মুসলমানরা একসঙ্গে ভাই ভাইয়ের মতো থাকব।
— একজন মুসলিম হিসেবে এটা আপনি ভাবতেই পারেন। কিন্তু ১৯৪৮ সাল থেকে ৭১ পর্যন্ত আপনার তথাকথিত বড় ভাইয়েরা বাঙালিদের ওপর কী আচরণ করেছে সেটা আপনাকে ভাবতে হবে।
— আমি কারো ব্যক্তি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করি না। যার যার মতামত সে সে দেবে। তবে কেউ যদি আমার নীতি আদর্শের পরিপন্থী কাজ করে, সেটা হলে তো কথা থেকেই যায়। আপনি একজন ভাগ্যবিড়ম্বিত মানুষ। তাই আপনার ব্যাপারটা আমি অন্যদৃষ্টিতে দেখি এবং বিবেচনা করি।
— এটা আপনার মহানুভবতা। আপনি কবি, কবিতা হচ্ছে দৈশ্বরের প্রতিনিধি। আপনার ওই কবিতার চরণটি আমার ভীষণ ভালো লাগে।
— কোন কবিতা?
— ভালোবাসা আজ পণ্য, তাই তোমাকে ভালোবেসে আমি ধন্য।
— এটাই বাস্তবতা। আচ্ছা খান ভাই আপনি ভাবীকে ফিরিয়ে আনবেন কবে।

— কেন বলুন তো।
— এভাবে তো আর জীবন চলে না।
দুইজনের মধ্যে আর কথা আগায় না। আশেক দীর্ঘদিন থেকেই লক্ষ করে আসছে, ভাবীকে ঘরে ফিরিয়ে আনার কথা বললেই রাকিব এড়িয়ে যায়, আবার স্ত্রীর জন্য আক্ষেপও করেন। এই বৈপরিত্য তাকে ভাবিয়ে তোলে।
আট।
বিকালে আকাশ ভয়াল রূপ ধারণ করল। হঠাৎ পৃথিবীতে অন্ধকার নেমে এলো। বিকালে অন্ধকার নেমে আসা মানেই রাকিব খানের মনটা বিষণ্ণতায় ছেয়ে যাওয়া। দরজা লাগিয়ে দিলে এমনতেই তার জানালাবিহীন ঘরে অন্ধকার নেমে আসে, তার ওপর আজ পৃথিবীই অন্ধকার। খান সাহেবের প্রশ্ন, তাহলে কিয়ামত কি ঘনিয়ে এলো? কিয়ামত ঘনিয়ে এলে অবশ্য তার জন্য ভালোই হয়, পৃথিবী ধ্বংস হয়ে গেলে তার জীবনেরও অবসান ঘটবে। এমন কষ্টকর জীবন তিনি আর চান না। খাবারের ঠিক নেই, তো ঘুমের ঠিক নেই, এমনকি সুস্থ জীবনযাপনেরও কোনো সুযোগ নেই। যতক্ষণ তিনি বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা মেরে হৈ-হুল্লোড় করে কাটান ততক্ষণ এক ধরনের স্বর্গীয় সুখ অনুভব করেন। বাকি সময়টা বিষণ্ণতার মধ্যে কাটে। হতাশা, গ্লানি, একাকিত্ব তাকে জাপটে ধরে। এমন অবস্থায় পৃথিবী ধ্বংস হয়ে গেলে তাকে আর আত্মহননের পথ বেছে নিতে হবে না। এসব জীবনহানিকর আত্মবিধ্বংসী চিন্তায় যখন সে মগ্ন তখন আকাশে ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকতে শুরু করে। তার ভয়হীন মন ভয়কাতর হয়ে ওঠে।
বাইরে এক ধরনের উপদ্রব, অন্ধকার ঘরে আরেক ধরনের উপদ্রব। অন্ধকার ঘরে উইপোকা দিকশূন্যভাবে ওড়াউড়ি করছে। রাকিবের চোখেমুখেও এসে পড়ছে। এ উপদ্রব তার মহাবিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কবরের অন্ধকার তো এমনই। তাহলে কি সে কবরে আছে? এমন প্রশ্ন উদয় হওয়ার পাশাপাশি তার এও মনে হয়, এই অস্বাভাবিক ভয়কাতর পরিবেশে তার স্ত্রী-সন্তান কেমন আছে? পৃথিবী ধ্বংস হওয়ার আগে ওদের সঙ্গে একবার দেখা হওয়া দরকার। তার আপনজন বলতে তো ওরা দুজনই। যদিও স্ত্রী তাকে ছেড়ে চলে গেছে অনেক আগেই। এই ভাবনা যখন তাকে তাড়িত করে তখন সে অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং চিন্তার পর চিন্তা এসে তার মাথায় ভিড় জমলে ঘুমের ঘোরে আচ্ছন্ন হয় যান তিনি। তিনি দেখতে পান, স্ত্রী মিনারা তার কাছে ফেরত এসেছেন। সঙ্গে তার একমাত্র সন্তান। ওদের দেখেই চোখেমুখে হাসির কুচি খেলে যায় তার। এক ধরনের স্বর্গীয় আনন্দ অনুভব করেন তিনি। তার এই মধুর স্বপ্নের মধ্যেই দরজায় শব্দ শোনা যায়। ঘুম ভেঙে যায় খান সাহেবের। ঘুম জড়ানো চোখে দরজা খুলে দেন তিনি। প্রথমে বাইরে তাকান। সবে সন্ধ্যা নামতে শুরু করেছে। আকাশের পরিস্থিতি এখন স্বাভাবিক। আকাশের পরিস্থিতি স্বাভাবিক দেখে তার মনটা উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। তার এখনই বাইরে যেতে ইচ্ছে করছে। অন্ধকার কবরের মতো ঘরে আর কতক্ষণ কাটাতে দে? তার সব সময়ই মনে হয় তিনি কবরে আছেন। কবরই যেন তার স্থায়ী ঠিকানা।
বাইরে বের হওয়ার প্রবণতা যখন তীব্র হয়ে ওঠে,

তখন তিনি দেখতে পান দরজায় পুলিশ দাঁড়িয়ে। পুলিশ দেখে তার অন্তর কেঁপে ওঠে। পুলিশ খান সাহেবকে সালাম দেয়, তারপর বলে, আপনাকে ওসি সাহেব সালাম জানিয়েছেন, আমার সঙ্গে আপনাকে একটু থানায় যেতে হবে।
পুলিশ কেন তার দরজায় এসেছে, আর কেনই বা তাকে থানায় যেতে হবে— এটা খান সাহেব বুঝে উঠতে পারেন না। পুলিশকে তিনি বরাবরই জনগণের বন্ধু মনে করেন। গভীর রাতে যখন তিনি অফিস থেকে বের হন, তখন অনেক সময় পুলিশ তাকে ডাকে। এত রাতে কেন রাস্তায় চলাচল করছেন, জিজ্ঞেস করে। রাকিব যেহেতু সুন্দর করে গুছিয়ে কথা বলেন এবং হাস্যোজ্জ্বল ব্যক্তি তাই পুলিশকে বলেন, আমি কোনো ক্রিমিনাল নই, শ্রমিক, অর্থাৎ গতরখাটা মানুষ। ভাইজানরা, আপনাদের দায়িত্ব হচ্ছে চোর-বাটপাড়, ডাকাতি, ছিনতাইকারী ধরা আর আমাদের রক্ষা করা। এসব কথার মাধ্যমে রাস্তাঘাটে কত পুলিশের সঙ্গে যে তিনি সম্পর্ক গড়ে তুলেছেন, তার ইয়ত্তা নেই। পুলিশকে আহাির করিয়েছেন এমনকি উপহারসামগ্রীও দিয়েছেন। অথচ সেই পুলিশই তার দরজায় দাঁড়িয়ে এবং তাকে থানায় যেতে বলছে। থানায় যাওয়ার কারণ অনুমান কতে পারেন তিনি। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি কোনো দাগি অপরাধী নন। জালিয়াতি, প্রতারণা, হত্যা মামলার আসামিও নন। তার পরও তাকে থানায় যেতে হচ্ছে। এর প্রধান কারণ সম্ভবত তার স্ত্রী মিনারা বেগম।
মিনারার দেয়া একটি মামলা দীর্ঘদিন যাবৎ অমীমাংসিত অবস্থায় রয়েছে। মামলার রায় অনুযায়ী তিনি প্রতি মাসে ৫ হাজার টাকা করে পরিশোধ করে যাচ্ছেন। মিনারা যখন ভরণ-পোষণসংক্রান্ত মামলাটি দায়ের করে, মামলা চলাকালে রাকিব কোনো ভরণ-পোষণ বা খোরপোশ দেননি। তাতে প্রায় দেড় লাখ টাকা বাকি পড়ে। ওই বাকি টাকার জন্য হয়তো মিনারা মামলাটি উজ্জীবিত করতে পারে।
তার আন্দাজ অবশেষে সত্য হলো। মিনারা বেগম খোরপোশ না দেয়ার অভিযোগ করেছিল মূলত আইন ও সালিস কেন্দ্রে। রাকিবের সঙ্গে যখন তার সেপারেশন হয়। অর্থাৎ রাগ করে বাবার বাড়ি যায়, তখন ভরণ-পোষণসংক্রান্ত মামলাটি দায়ের করে সে।
রাকিবের বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি অভিযোগ আনে সে। ১. রাকিব তাকে গভীর রাতে তালা দিয়ে আটকে রেখে অন্য নারীর সঙ্গে ফোনে প্রেমলাপ করে। ২. মিনারার আপন মামি রোখসানার সঙ্গে রাকিবের অনৈতিক সম্পর্কের অভিযোগ তোলে। ৩. সংসারের ব্যাপারে রাকিব একেবারেই উদাসীন, মিনারার প্রতি কোনো মনোযোগ নেই। ৪. টাকা-পয়সা যা উপার্জন করে তা বাইরের নারীদের পেছনে খরচ করে। ৫. রাকিবের আচরণ সামস্ত প্রভুদের মতো। সম্পূর্ণ স্বৈরতান্ত্রিক মানসিকতা তার ভেতর কাজ করে। মিনারাকে তিনি শতভাগ নিয়ন্ত্রণ করতে চান। ৬. তার ভারসাম্যহীন আচরণ। যদিও রাকিবের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, কেবল মশারি টাঙানোকে কেন্দ্র করে মিনারা বাবার বাড়ি চলে গেছে।
আসলে স্বামী কিংবা স্ত্রী যখন একে অন্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে সে অভিযোগের অন্ত নেই। যা

ভিত্তিহীন বা সত্য নয়, সে অভিযোগও চলে আসে অনায়াসে। মূলত একে অন্যকে ঘায়েল করার জন্য এটা করা হয়ে থাকে। রাকিবের বিরুদ্ধে মিনারার যত অভিযোগই থাকুক না কেন, ওর ব্যাপারে তিনি বরাবরই সহনশীল। দাঁত থাকতে যেমন দাঁতের মর্যাদা বোঝা যায় না, একইভাবে স্ত্রী সংসার ছেড়ে চলে যাওয়ার পর বোঝা যায় তার শূন্যতা ও অনিবার্যতা। মিনারা চলে যাওয়ার পর জীবনের প্রায় সব দিক থেকে ক্ষতি হলেও একটাই লাভ হয়েছে খান সাহেবের। তিনি বন্ধু-বান্ধবীদের নিয়ে ইচ্ছেমতো হৈচৈ করতে পারছেন, আড্ডা মারতেও পারছেন। এই আড্ডার নির্দিষ্ট সীমা-পরিসীমা নেই। রাকিবের এক বন্ধু ওকে বলেছিল, খেলার মাঠে যখন আমরা খেলতে যাই, তার নির্দিষ্ট সময় থাকতে হবে কেন, যতক্ষণ ইচ্ছে খেলব। যেমন আহার করার সময় কেউ কাউকে সময় বেঁধে দেয় না যে, তোমাকে ১০ মিনিটের মধ্যে শেষ করতে হবে। প্রত্যেকের চাহিদামতো থাকবে। খাবার টেবিলে এমন দৃশ্যই চোখে পড়ে। রাকিব মনে করে আড্ডার ক্ষেত্রেও তাই হওয়া উচিত। যার যতক্ষণ ইচ্ছে আড্ডা মারবে। তারপর যার যার কাজে চলে যাবে। বাঙালি মধ্যবিত্তের প্রধান সমস্যা হলো, স্ত্রীগণ কেবলই গৃহবধূ। তারা চার দেয়ালের বাইরে এসে আড্ডায় শরিক হন না। রক্ষণশীল যারা তারা এটাকে ধর্মবিরোধী, সমাজবিরোধী কাজ মনে করে। যারা শিল্প-সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত, তারা নিতান্ত গৃহবধূ নয়, তারা সংসারও সামাল দেয় এবং একই সঙ্গে আড্ডাও মারে। রাকিব যাদের সঙ্গে আড্ডা মারেন, তাদের সঙ্গে এই শ্রেণির মহিলাও রয়েছে। এরা আসর মাতোতে পারেন। এরা স্মার্ট, সুন্দরী এবং অসাধারণ বাচনভঙ্গির অধিকারী। এদের চোখেমুখে রোমান্টিকতা খেলা করে। রাকিব এদের প্রত্যেকের প্রতিই আসক্ত। সন্ধ্যার শাহবাগের আড্ডায় এদের কেউ কেউ রাত ১১টা পর্যন্তও থাকে। তাতে রাকিবের জন্য বিশেষ সুবিধা হয়। কারণ গভীর রাত পর্যন্ত হৈচৈ-আড্ডা মারাটা তিনি খুব পছন্দ করেন। তিনি মনে করেন আড্ডার মধ্যেই প্রকৃত জীবন নিহিত। মিনারা সংসারে থাকার সময় খান সাহেব এখনকার মতো আড্ডায় মেতে উঠতে পারতেন না। নির্দিষ্ট সময়ের পর বাসায় ফিরলে রীতিমতো জবাবদিহি করতে হতো। রাকিব মনে করেন, এটা তার ব্যক্তিস্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ। তাই ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও তিনি স্বাধীনভাবে চলাফেরা ও আড্ডা মারতে পারতেন না। এটি তার মর্মপিড়ার একটি কারণ। সময় ও আড্ডা নিয়ে মিনারার সঙ্গে রাকিবের বহুবার ঝগড়া হয়েছে। তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে কেউ কোনো কাজ করলে তিনি সহজে মেনে নেন না। এটা তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। এ বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন করাও তার পক্ষে কখনো সম্ভব নয়। অথচ তিনি ইচ্ছে করলেই এটা পরিবর্তন করতে পারতেন না। যখন তখন কাজে হস্তক্ষেপ করা, মিনারা চলে যাওয়ার এটাও একটা কারণ। এমন অনেক স্ত্রী এই সমাজে রয়েছে তারা মতে অমিল হওয়ার কারণে রাগ বা অভিমান করে স্বামীর সংসার থেকে চলে যায়। কেউ কেউ বছরের পর বছর থাকে, ফিরে আসে না। আবার কেউ ফিরে আসে। কিন্তু খোরপোশের জন্য মামলা করার ঘটনা খুবই কম। মিনারার মামলা করার প্রধান কারণ

হচ্ছে সে রাকিবের সংসার থেকে চলে যাওয়ার পর দুই বছরের মধ্যে কোনো খোরপোশ না দেয়া। এমনও অনেক স্বামী রয়েছে স্ত্রীর সঙ্গে তালাক হয়নি, স্ত্রী মা-বাবা কিংবা ভাই-বোনের সংসারে রয়েছে অথচ স্বামী নিয়মিত খোরপোশ দিয়ে যাচ্ছে। রাকিব হয়তো মনে করেছিল, মিনারা চলে গেছে, নিজে চাকরি, টিউশনি করে। রাকিবের কাছে খোরপোশের অর্থ চাইবে না।

নয়। আইন ও সালিস কেন্দ্রের মাধ্যমে মামলা করে মিনারা। নিম্ন আদালত মাসিক ৩ হাজার টাকা খোরপোশ ধার্য করলে মিনারা তাতে সন্তুষ্ট হতে পারে না। এর ফলে সর্বোচ্চ আদালতে আপিল করে সে। আপিলে মাসিক ৫ হাজার টাকা ধার্য করা হয়। আদালত কর্তৃক ৫ হাজার টাকা খান সাহেব নিয়মিত দিয়ে আসছেন। এই টাকার বাইরেও ছেলে ও ছেলের মাকে যখন তখন টাকা ও উপহার দিচ্ছেন। কিন্তু ফলাফল শূন্য। আইন ও সালিস কেন্দ্রের রেকর্ড অনুযায়ী খান সাহেব দুই বছর ধরে কোনো অর্থ মিনারা বেগমকে দেননি। খান সাহেব অথবা মিনারা বেগমকে এ বিষয়ে কোনো জিজ্ঞাসাবাদ না করে মামলাটি পুনরুজ্জীবিত করা হয়েছে। পুনরায় তার ওপর সমন জারি হয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে পুলিশ তো তার দরজায় এসে দাঁড়াবেই।

রাকিব খানের এক রাত হাজতবাসের অভিজ্ঞতা অত্যন্ত করুণ। রাতের বেলা তাকে যখন সূত্রাপুর থানা হাজতে ঢোকানো হলো তখন তার মনে হলো তিনি এক কবর থেকে উঠে এসে আরেক কবরে ঢুকলেন। হাজতের ভেতরটা ঘূটঘূটে অন্ধকার। জানালাবিহীন এমন একটি ঘরে, যেখানে পাখা নেই, তেলাপোকা, ইঁদুরের অস্তিত্বও টের পাওয়া যাচ্ছে। সব মিলিয়ে খান সাহেবের দম বন্ধ হয়ে মরে যাওয়ার অবস্থা। তিনি মনে মনে আল্লাহকে ডাকতে লাগলেন। এমন বিপদ থেকে কেবল সৃষ্টিকর্তাই তাকে রক্ষা করতে পারেন। এতদিন তিনি থানা হাজতে রাত কাটানোর গল্প শুনছেন, আর আজ তার তিক্ত বাস্তব অভিজ্ঞতা হলো।

বোনের জামাতা চৌকস উকিল হওয়ার কারণে এ যাত্রায় রাকিব সাহেব রক্ষা পেলেন। শুরুর বিশেষ আদালত থেকে জামিন নেয়া হলো। আদালতে মিনারা বেগম হাজির হয়ে এই মর্মে জবানবন্দি দিল যে, সে নিয়মিত খোরপোশের টাকা পাচ্ছে। এ ঘটনায় মিনারার প্রতি খান সাহেবের দরদ ও আন্তরিকতা আরো বেড়ে গেল। তিনি মিনারাকে ফোনে ধন্যবাদ জানালেন। মিনারা যদি আদালতে দাঁড়িয়ে বলত, আমি এ পর্যন্ত কোনো টাকা পাইনি, তাহলে রাকিবের কিছুই করার ছিল না। তাকে জেল খাটতে হতো। স্বামীর ভবিষ্যতের কথা বিবেচনা করেই হয়তো সে ওই পথ অবলম্বন করত। এমনকি মামলা চলাকালে দুই বছরের খোরপোশের টাকা যে বাকি ওই ব্যাপারেও সে আদালতকে কিছুই বলেনি। এসব কারণেও খান সাহেবের মিনারার প্রতি কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। খান সাহেব সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, মিনারার বকেয়া টাকা ধীরে ধীরে পরিশোধ করে দেবেন। পুরনো ঝামেলা ঝুলিয়ে রেখে লাভ কী? এক রাতের হাজতবাস তাকে নতুন জীবন

দিয়েছে। একদিকে স্ত্রী-সন্তানকে তিনি কাছে পাচ্ছেন না, অন্যদিকে তাকে হাজতও খাটতে হলো, মামলাও বুলে আছে মাথার ওপর। মানবাধিকার সংগঠন ইচ্ছে করলে বকেয়া টাকা পরিশোধ না করার অজুহাত তুলে তার মামলা পুনরুজ্জীবিত করতে পারে। তখন খান সাহেব আরেক বিপদে পড়ে যাবেন। হাজত বাস শেষে তিনি যখন বাড়ি ফিরলেন, তখন দেখলেন, তার স্বপ্নের নয়নতারা গাছটি কে যেন কেটে ফেলেছে। সম্ভবত একাজ করেছে তার ছোট ভাই। ওর ছোট ভাই হয়ত ভেবেছে রাকিব আর ফিরবে না। দৃশ্যটি দেখে তিনি ব্যথিত হলেন। তিনি কাটা গাছের দিকে অপলক তাকিয়ে থাকলেন। তার চোখ জলে ভিজে গেল।

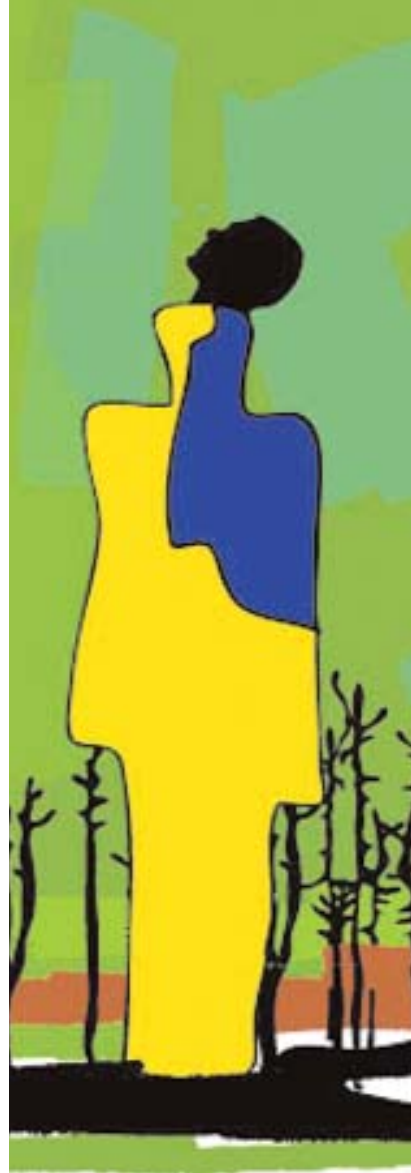
দশ। তার কবি-বন্ধু আশেক মাহমুদ তাকে বার বার অনুরোধ করেছিল ভাবীকে সংসারে ফিরিয়ে আনতে। এ ক্ষেত্রে রাকিবের কথা হচ্ছে— ও এই ভাঙা বাড়িতে ফিরবে না। আমিও মা-বাবার স্মৃতিবিজড়িত বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র বসবাস করতে চাচ্ছি না। তা ছাড়া মিনারাকে নিয়ে আলাদা ফ্ল্যাটে থাকতে হলে কমপক্ষে মাসে ১২ হাজার টাকা ভাড়া গুনতে হবে। সংসারের অন্যান্য খরচ তো আছেই। আমার সামান্য চাকরি, এত টাকার জোগান দেয়া তো সম্ভব নয়।

রাকিবের কথার পরিপ্রেক্ষিতে আশেকের মতামত হচ্ছে, কষ্ট হলেও সংসারের সুখের জন্য মানুষ অনেক কিছু করে। প্রয়োজনে ঋণ করে হলেও আপনি ভাবীকে ঘরে তুলে আনুন। আপনার জীবনে স্থিরতা ঘরে আসবে। আপনি আগের মতো সুখে জীবনযাপন করতে পারবেন। রাকিব আশেকের কথাকে আমলে নেয় না। তিনি চলেন তার নিজের মতো করে। আগে তাকে দুটো জগৎ সমানভাবে টানত। একটি ঘর অন্যটি বাহির। ঘরে ছিল মিনারা, আর বাইরে ছিল মিনারার মতো অনেকেই। আড্ডাবাজ, প্রেমিক মানুষের যে স্বভাব হয়। তারা ঘরে বাইরে সমানতালে চলে। এর মধ্যে একশ্রেণির পুরুষ রয়েছে, যারা ঘরকে গোঁণ করে দেখে, বাইরের বন্ধু-বান্ধবীদের বেশি প্রাধান্য দেয়। এই অধিক প্রাধান্য দেয়াটা সংসারেও প্রভাব পড়ে। কারো কারো সংসার ভেঙে ও যায়। মিনারা চলে যাওয়ার আগ পর্যন্ত রাকিব ঘর ও বাহির দুটোই সমানতালে চালিয়েছিল। কিন্তু গত পাঁচ বছরে বাহিরই তার কাছে প্রধান। বন্ধু-বান্ধবীদের ডেকে ডেকে আড্ডা মারা। তাদের লাঞ্চ অথবা ডিনার খাওয়ানো, উপহার দেয়া। নারী বান্ধবী হলে মোবাইলে টাকা দেয়া, যাতায়াত ভাড়া হিসেবে হাতে টাকা গুঁজে দেয়া এসব প্রবণতা অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে মিনারাকে তিনি মাঝেমাঝে ফোন করেন। একমাত্র ছেলের খোঁজখবর তো তিনি বলতে গেলে সারাক্ষণই রাখেন। ছেলের ইচ্ছে পূরণের জন্য তিনি হাজার হাজার টাকা খরচ করেন। স্মার্ট ফোন, দামী কেডস, দামী পোশাক, হাতখরচ এবং নিত্যদিনের বাড়তি খাবার তো আছেই। ঘরে ও বাইরে খরচের ফিরিস্তি যা দেয়া হলো আশেকের মতে তাতে মিনারাকে তিনি আলাদা ফ্ল্যাটে মর্যাদার সঙ্গে রাখতে পারেন। কিন্তু বাইরের আড্ডার খরচ অতিমাত্রায় বাড়ার কারণে এবং বাইরের বান্ধবীদের প্রতি ঝোঁক থাকায় এখন আর এটা সম্ভব নয়। ঘরের আকর্ষণ আর বাইরের

আকর্ষণ যে এক নয় তা রাকিব হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করতে পারছে। তারপরেও তিনি ছুটলেন নীলক্ষেতের দিকে, হোম ইকনোমিকস কলেজের দুই তরুণীর সঙ্গে তার গভীর সম্পর্ক। প্রায়ই দুজনের সঙ্গে কথা হয়, দেখা হয়। দুজনেই হোস্টেলে থাকে। খান সাহেবের ভাষায় সনি-রুমি খুব ভালো মেয়ে। ওরা নাকি তাকে ভালোবাসে। খান সাহেবের কথা শুনে হাসি পায় আশেকের। আশেক লক্ষ করেছে, রুমির প্রতি তার ঝোঁকটা একটু বেশি। অবশ্য রুমি দেখতে অনেক সুন্দরী ও আবেদনময়ী। বর্তমানের তরুণীদের মধ্যে একটি বাজে ও বিপজ্জনক প্রবণতা কাজ করে। কেউ যদি তাদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়তে চায়, তাহলে একগাদা ব্যক্তিগত চাহিদার ফিরিস্তি ধরিয়ে দেবে। যেমন তার আগের ফোনটি সেকেন্ডে বা নষ্ট, একটি স্মার্ট ফোন লাগবে, অথবা লাগবে একটি ল্যাপটপ। কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে বেতন বাকি, হোস্টেল বা সাবলেটে থাকলে সেখানে অনেক টাকা বাকি। তার একটি দামি পোশাক দরকার। মোবাইলে টাকা নেই লোড পাঠাতে বলবে। দেখা হলে দামি ও মুখরোচক খাবার খাওয়াতে হবে এবং বিদায়ের সময় হাতখরচের টাকা ধরিয়ে দিতে হবে। এসব চাহিদা পূরণ করতে না পারলে সম্পর্ক বেশি দূর এগোয় না। খান সাহেব এসব জানেন। তিনি খরচের ক্ষেত্রেও উদার। সনি-রুমিও সেই দিকে এগোচ্ছে। ইদানীং খান সাহেব প্রায়ই নীলক্ষেত যান এবং ওদের বিভিন্ন ফলমূল ও কাচি বিরিয়ানির প্যাকেট কিনে দেন। হাতে টাকাও কিছু ধরিয়ে দেন। তবে সম্প্রতি সনি-রুমিদের ব্যাপারে তিনি হতাশ। তিনি ওদের মোবাইলে টাকা পাঠালেও ওরা তাকে ফোন দেয় না। খান সাহেবের প্রশ্ন, তাহলে টাকাটা ওরা কোথায় খরচ করে? যেহেতু রুমির প্রতি খান সাহেবের মুগ্ধতা তৈরি হয়েছে, তাই ওর প্রতি তিনি উদার, সহানুভূতিশীল। কিন্তু আচরণে খটকা লাগে। গতকাল ৫০০ টাকার একটি নোট দেয়ার পরও আজ আবার টাকা চাচ্ছে। এর মানে খুঁজতে গিয়ে হতাশ হয়ে পড়েন তিনি। তাই ইদানীং নীলক্ষেত যাওয়া কমিয়ে দিয়েছেন। এগারো।

রাকিবের একটি বড় ধরনের প্রবণতা হচ্ছে দীর্ঘক্ষণ মোবাইলে কথা বলা। তিনি যাকে অতিমাত্রায় পছন্দ করেন, সে নারীই হোক, পুরুষ হোক, কথা বলতেই থাকবেন। কথা বলার সময়টা আধা ঘণ্টা থেকে দুই ঘণ্টাও হতে পারে। কথার ধরনও বহুমাত্রিক। প্রথমে হয়তো নারীর ভালোবাসা ও শরীর নিয়ে কথা বললেন, তারপর হয়তো তার নিঃসঙ্গ জীবনের ফিরিস্তি তুলে ধরবে। এরপর শিল্প, সাহিত্য, রাজনীতি, সমাজনীতি, ইতিহাস সবই একে একে তার কথায় উঠে আসবে। তবে ব্যক্তি বুঝে তিনি কথার ধরনও পরিবর্তন করেন। যে ব্যাপারে আগ্রহী তিনি তার সঙ্গে সে ব্যাপারে কথা বলবেন। এই সমাজে অনেক পুরুষ রয়েছে, সে কেবল নারী পেলেও দীর্ঘক্ষণ কথা বলবেন। পুরুষ বন্ধুদের তারা নিতান্ত দায় ঠেকা না হলে ফোন করবেন না। এমনকি ঘরের স্ত্রীদের সঙ্গে ভালো আচরণ করেন না। কেবল বাইরের নারীদের সঙ্গে কথা বলতে আগ্রহী। আশেক মাহমুদের বেশ কয়েকজন বন্ধু রয়েছে তারা প্রায়ই আশেককে ফোন করে বিরক্ত করে। তাদের একটাই আবদার,

দোস্ত আমাকে কয়েকটা সুকণ্ঠী নারীর নাম্বার দাও। প্রতি উত্তরে আশেক যদি বলে, নাম্বার দিয়ে কী করবে? প্রতি উত্তর আসে, কিছুই করব না, কেবল কথা বলব। নারীদের সঙ্গে কেবল কথা বলার বাঙালিও এই দেশে রয়েছে, এটা ভেবে আশেক অবাক হয়। মহাদেব সাহা হয়তো এ কারণেই লিখেছিলেন করুণা করে হলেও চিঠি দিও, ভুল করে হলেও বলো ভালোবাসি। করুণাপ্রার্থী হয়ে যখন তারা আশেকের কাছে নাম্বার চায়, তখন যেসব নারী উদার ও প্রগতিশীল, তাদের নাম্বার সে দেয়। রাকিব খানের কাছে যেহেতু নারী-পুরুষ উভয়ের মর্যাদা সমান, তাই তিনি কথা বলার সময় প্রায় একই আচরণ করেন। নারী-পুরুষ উভয়ের ব্যাপারেই অত্যন্ত দরদি হয়ে ওঠেন। এরই ধারাবাহিকতায় খান সাহেব কবি আশেক মাহমুদকে প্রায়ই ফোন দেন। আশেক ব্যস্ত না থাকলে কথা বলতে থাকে, নানা বিষয়ে। আশেক যদি বলে, খান ভাই আমি তো এখন একটু ব্যস্ত,



পরে কথা বলি। আশেকের ব্যস্ততার মাত্রা যাই হোক না কেন, খান সাহেব ফোন রাখতে যাচ্ছেন না। আশেক যেহেতু একটি বিজ্ঞাপন সাংস্থার সৃজনশীল শাখায় কাজ করেন, সেহেতু তার ব্যস্ততা থাকতেই পারে। খান সাহেব হয়তো বলবেন, কবি ভাই আরো একটু কথা বলি। কবি হয়তো বলল, আমি লিখছি। খান সাহেব হয়তো বলল, আপনি তো সাধক লেখক, সারাক্ষণই লেখেন। যেদিন আশেক ব্যস্ততার কারণে কথা বলতে পারল না, এক দুই ঘণ্টা পরে যদি খান সাহেবকে ফোন দেয়া হয়। ওই প্রান্ত থেকে হয়তো খান সাহেব বললেন কবি ভাই, ওই সময়ে আমার আবেগ আসছিল, তাই কথা বলতে চেয়েছিলাম। এখন তো সে আবেগ নেই।

বারো। মানুষ যখন একাকী জীবনযাপন করে, তখন তার মধ্যে নানা ধরনের চিন্তা ঘুরপাক খেতে থাকে। কেউ কেউ এসব চিন্তায় থিতু হয়ে পড়ে। দীর্ঘদিন কারো সঙ্গে শেয়ার না করার কারণে মনের ভেতরে গুমোটভাব ধারণ করে। চারদিক থেকে হতাশা, নিঃসঙ্গতা বার্থতা জড়িয়ে ধরে। এ ধরনের মানুষ হয় এক সময়ে বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়ে, না হয় ধীরে ধীরে আত্মহত্যার দিকে চলে যায়। খান সাহেবের ক্ষেত্রে দুটো ইতিবাচক দিক রয়েছে। প্রথমত তার কাছে দুটো মোবাইল সেট রয়েছে। সুযোগ পেলেই নিঃসঙ্গতা দূর করার জন্য তিনি যে কারো সঙ্গে কথা বলতে পারেন।

অন্যদিকে বন্ধুরা ডাকলেই তিনি আড্ডা মারতে বাইরে চলে যান। বিশেষ করে ইদানীং শাহবাগের সড়কদ্বীপে আড্ডা বেশ জমে ওঠে। আশেক মাহমুদ যেহেতু কবি, সুতরাং তার কবি বন্ধুর অভাব নেই। ইদানীং আড্ডাতে বাউল ঘরানার কিছু শিল্পীও জুটেছে। তরুণরা পপসম্রাট আজম খানের গান উচ্চ শব্দে গিটার বাজিয়ে গায়। গানের তালে তালে খান সাহেবের বিবাগী মন নেচে ওঠে। তিনিও তরুণদের সঙ্গে গান ধরেন, গান ধরেন কবি আশেক মাহমুদও। ইদানীং আড্ডায় নতুন মাত্রা যোগ করেছে, ফাতেমা আকতের সুহি ও ফারুক আহমেদ। দুজনেই পুরনো দিনের গানের খুব ভক্ত। বিশেষ করে খান সাহেব ও ফারুক সাহেব শামশাদ বেগম, মেহেদী হাসান, মুকেশ, তালাত মাহমুদ, মোহাম্মদ রফি ও লতার উর্দু-হিন্দি গানের খুব ভক্ত। অনেক গানই দুজনে একসঙ্গে আওড়ান। তাদের দুজনের সঙ্গে দোহা হিসেবে কণ্ঠমেলান সুহি ও আশেক। ফলে আড্ডাটা বেশ জমে ওঠে। পুরনো দিনের গানের ব্যাপারে ফারুক সাহেবের কণ্ঠ বেশ দরদি ও মায়াবী। হিন্দি-উর্দুর পাশাপাশি সন্তর-আশির দশকের বাংলা সিনেমার গানও পরিবেশন করেন দুজন। এমন পরিবেশে আশেক যখন খান সাহেবের দিকে তাকায় তখন তার মনে হয়, জগতের সমস্ত উল্লাস, সুখ, আনন্দ কেবল তার ওপরই ভর করেছে। তার মতো সুখী মানুষ পৃথিবীতে একজনও নেই। তার মুখ গহ্বরের উজ্জ্বল দাঁত থেকে বেরিয়ে আসা হাসি, তার সব ধরনের শারীরিক কসরত এবং অভিব্যক্তি সব মিলিয়ে অন্য রকম এক খান সাহেবকে প্রত্যক্ষ করে আশেক। উচ্চ শব্দে বলে ওঠে, ‘কেয়া বাত, কেয়া বাত’ আড্ডা চলে রাত ১০টা থেকে ১১টা পর্যন্ত। মিরপুর থেকে বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মতিউর রহমান খাবার,

বিশুদ্ধ পানি, কোকাকোলা, ওয়ান টাইম গ্রাস নিয়ে আসেন, পুরনো ঢাকা থেকে খান সাহেবও কখনো কখনো খাবার নিয়ে আসেন। আড্ডাতে খাবারের কোনো সমস্যা হয় না। আড্ডার মাঝখান থেকে দুজন কবি হয়তো উঠে যাচ্ছেন আবার দুজন এসে বসছেন। খান সাহেব কিংবা মতিউর রহমান সেদিন খাবার আনতে পারেন না, সেদিন শাহবাগের চাল ভাজা, মুড়ির ভর্তা, বাদাম, চানাচুর, কাঁচা বুট, লাল চা, কখনো কখনো আইসক্রীম, এসব চলতে থাকে।

আসর যখন বেশ জমে ওঠে, তখন খান সাহেবের আনন্দে নাচতে ইচ্ছে করে। তিনি ফারুক সাহেবের মনোযোগ আকর্ষণ করে প্রেম ও বিরহে পূর্ণ পুরনো দিনের হিন্দি গান গেয়ে ওঠেন, যার মধ্যে চিরকালীন আবেদন রয়েছে।

ও বাচপানকে দিন ভুলানা দেনা, আজ হাসে কাল রুলানা দেনা। (শেষবের স্মৃতি ভুলে যেও না আজ হাসিয়ে কাল কাঁদিয়ে না)। অথবা বাহারো ফুলও বরষাও, মেরা মেহবুব আয়া হে, মেরা মেহবুব আয়া হে। (গাছ সুন্দর পুষ্প বর্ষণ করো, আমার বন্ধু এসেছে)। কিংবা, টুটা হওয়া দিল ক্যায়সে দিখায়ে, গামকা ফাসানা কিসকো শোনায়ে। (এ ভাঙা হৃদয় কীভাবে দেখাবো, দুঃখের কথা কাকে শোনাবো)। রাকিব খানের কণ্ঠে যখন এসব অমর গান নিঃসৃত হতে থাকে তখন ফারুক সাহেব গেয়ে ওঠেন, পুছনা মোহাব্বতকে আছর আয়ে না, পুছ আয়ে না আছর। (প্রেমের কী জ্বালা আমাকে প্রশ্ন করো না, আমাকে প্রশ্ন করো না)। এর পর দুজনে একসঙ্গে গাইতে শুরু করলেন, চ্যালে যা না নেহি, নয়ন মিলাকে ছাইয়া বেদরদি। (দৃষ্টি দিয়ে মন কেড়ে চলে যেও না, বেদরদি)। তাদের দুজনের গানে সুহি ও আশেক মাতোয়ারা হয়ে পড়ে। আসরে যোগ দেন কবি সুজাউদ্দিন কায়সার, সমর চক্রবর্তী, রুহুল মাহবুব, মানস বিশ্বাস, জুলফিকার চমন, নাহিদা আশরাফী, শেলী সেলিনা, ডা. জালাত, সাবেক ছাত্রনেতা আলী আক্কাস নাদিমসহ অনেকেই। এই আড্ডার নাম দেয়া হয়েছে শনিবারের আড্ডা। খান সাহেব না এলে এই আড্ডায় প্রাণ পায় না, জমে ওঠে না। এক শনিবার হয়তো পুরনো দিনের হিন্দি গান হলো অন্য শনিবার পুরনো দিনের বাংলা সিনেমার গান। যেমন, নীল আকাশের নিচে আমি রাস্তা চলেছি একা, পিচঢালা এই পথটাকে ভালোবেসেছি, তার সাথে এই মনটাকে মেলে দিয়েছি, প্রেমের নাম বেদনা, সে কথা বুঝিনি আগে, হয় যদি বদনাম হোক আরো, কারো আপন হইতে পারলে না অন্তর, আমার ভালোবাসার শূন্য ভিটায় কেউ বাঁধলো না ঘর, ওরে পান্না যৌবন তোর বৃথা যাবে দূরে থাকিস না রে, আমার হাতে ধরা দিলে মান যাবে না এসব গান অন্যরকম উদ্দীপনা তৈরি করে। ফলে খান সাহেবের মনে স্বর্গীয় আনন্দ খেলা করতে থাকে। গভীর রাতে বাসায় ফিরেও তিনি এই আমেজ ধরে রাখতে চান। ঘুমের মধ্যেই গান গেয়ে ওঠেন, হেসে ওঠেন। বলে ওঠেন, কেয়া বাত হায়।

এর দুদিন পর তার স্বভাবসুলভ কায়দায় খান সাহেব কবি আশেককে ফোন দেন। বলেন, ভাইজান, আজ আমার মনটা অনেক ভালো। আজ রাতে আপনাকে মগবাজারের ক্যাফে ডি তাজে

পোলাও আর গরুর ভুনা মাংস খাওয়াবো হাতির বিলে বসব। আপনি আমার জন্য একটু সময় বের করবেন। প্রতি উত্তরে আশেক তাকে জানায় আপনি বিকালে আসুন বিলপাড়, আমিও আসছি।

হাসিনা সরকারের একটি অন্যতম সাফল্য হাতির বিল। নগর সৌন্দর্যের একটি প্রধান দিক এটা।

এখানকার চক্রাকারের রাস্তা বেশ দৃষ্টিনন্দন। গাছগুলো বেড়ে উঠছে। বিলের ব্রিজগুলোতে দাঁড়ালে প্রথমেই দৃষ্টি নিষ্কিন্ত হবে বিলের পানিতে। যদিও বিলের পানি দূষিত। তারপরেও বিলে

বাতাস প্রবাহিত হলে এখানে ঘুরতে আসা মানুষের মনে অন্যরকম অনুভূতি জাগে। বিলের চারদিকেই বেঞ্চ পাতা রয়েছে। রাকিব আর আশেক বিলের মাঝ বরাবর উত্তরদিকের একটি বেঞ্চিতে বসে আছে। বিলের পানি ঘেঁষে ভুবন চিল উড়ছে। একা একা ওড়া চিলের সংখ্যাই বেশি। রাকিবের মনে হচ্ছে চিলগুলো কেবল বিলই প্রদক্ষিণ করছে না, প্রদক্ষিণ করছে সারা শহর। রাকিবের প্রশ্ন—কবি ভাই, হাতির বিলটা এত সুন্দর, তা তো জানতাম না। আপনি তো হাসিনা সরকারের কোনো কাজেরই কৃতিত্ব দিতে চান না।

—কেন চাইব না, ভালো কাজের অবশ্যই প্রশংসা করা উচিত।

—বিল থেকে উঠে আসা বাতাস, যা আমাদের গায়ে লাগছে, কেমন?

—অপূর্ব, অনেকদিন পর মনটা জুড়িয়ে গেল।

—দেখুন শুধু চিলই উড়ছে না, মাছরাঙাও আছে। রাজধানী ঢাকাতে মাছরাঙা আছে, ভাবতে অবাক লাগে।

—একবার আমরা রমনা বটমুলের কাছে বেঞ্চিতে বসেছিলাম, আপনার মনে আছে।

—থাকবে না কেন? হঠাৎ পৃথিবী অন্ধকার হয়ে এলো, আকাশ কাঁপিয়ে বৃষ্টি শুরু হলো। পুকুরের পানিতে অন্যরকম কাঁপন দেখা দিল।

—হ্যাঁ, আপনি বলেছিলেন, জীবনে এমন দৃশ্য খুব কমই দেখা যায়।

—ওইদিনের দৃশ্যটি সত্যিই মনে রাখার মতো। আমরা গাছের নিচে দাঁড়িয়েছিলাম। গাছ আমাদের রক্ষা করতে পারেনি। আমরা বৃষ্টিতে ভিজলাম। কী অপূর্ব সে দৃশ্য।

—জীবনে কিছু কিছু দৃশ্য স্মৃতি হয়ে থাকে, ওইদিনের দৃশ্যটি তেমনই।

—আজকের বিকালের দৃশ্যটিও মনে রাখার মতো। সন্ধ্যা নামলে চারদিকে যখন আলো জ্বলে উঠবে, আকাশে থাকবে পূর্ণ চাঁদ তখন আরো ভালো লাগবে। মনে হবে, এর মধ্যে প্রকৃত জীবন নিহিত। আচ্ছা আপনি না ফোনে বললেন, আপনার জন্য সুখবর আছে?

—ও আচ্ছা। ওই খবরটার জন্য আমি আজ আনন্দিত। আমার স্ত্রী বলেছেন, মামলাটা তুলে নেবেন।

—কী কারণে তুলে নেবেন?

—তা তো জানি না।

—আমার কাছে বিষয়টি রহস্যজনক মনে হচ্ছে। যিনি টাকার জন্য মামলা করেছিলেন, তিনি কী কারণে তুলে নেবেন। এ সববাদের আপনার আনন্দিত হওয়ার কিছু দেখছি না।

—আপনি কিছু না দেখলেও আমার দেখার আছে,

আমার ওপর থেকে মানসিক চাপ কমে যাবে আমি ভারমুক্ত হবো।

—ভারমুক্ত হবেন, নাকি ভার আরো বেড়ে যাবে।

—এভাবে মন্তব্য করবেন না। চলুন মগবাজার যাই।

তাজে গিয়ে পোলাও আর গরুর ভুনা মাংস খাই।

ওই খাবারটা আমার খুব প্রিয়। আমার যখন মোটরবাইক ছিল, বছর সাতেক আগের ঘটনা, তখন গভীর রাতে এখানে আড্ডা মারতে আসতাম।

—চলুন এবার উঠি।

দুজনে তাজে আসে। আশেক লক্ষ করে ম্যানেজার তার পরিচিত। আরো নিশ্চিত হলো, যখন তার কাছ থেকে কোকাকোলার দাম রাখল না। আশেক অনেক দিনপর তৃপ্তিসহকারে পোলাও ভুনা মাংস খেলো। এরপর দুজন দুজনের দিকে তাকালো।

আশেক ভালোভাবে তাকিয়ে দেখল, আসলেই খান সাহেবের মনটা আজ বেশ উৎফুল্ল। রেস্টুরেন্ট থেকে বের হয়ে খান সাহেব প্রথমে চারদিকে তাকালেন, তারপর গুনগুনিয়ে গান শুরু করলেন, কী আশায় বাঁধি খেলাঘর বেদনার বালুচরে, নিয়তি আমার ভাগ্য লয়ে নিশিদিন খেলা করে, বেদনার বালুচরে। কবি আশেক মাহমুদ তার দিকে শেষবারের মতো তাকায়। তারপর বাসার দিকে রওনা দেয়। ভাবে, জীবন কি এমনই?

তের.

রাকিব তাজ রেস্টুরেন্ট থেকে বের হয়ে অনেকক্ষণ রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকেন। তার এখন কী করা উচিত, তিনি ভেবে পান না। এত তাড়াতাড়ি বাসায় গেলেও ভালো লাগবে না। বাসায় যাওয়া মানেই তো কবরের মধ্যে ঢুকবে পড়া। তাই তার বাসায় যেতে ইচ্ছা করছে না। তাজ রেস্টুরেন্টের সামনে ধুলোমলিন রাস্তায় তিনি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেন। মৌচাক-মগবাজার ফ্লাইওভারের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে। আগে এ রাস্তায় অসংখ্যবার যাতায়াত করেছেন তিনি। আজ এ রাস্তাটাকে তার

অচেনা মনে হচ্ছে। তাহলে কি তিনি ভুল করে কোনো অজানা-অচেনা জায়গায় চলে এসেছেন। তার আনমনা মন কাকে যেন খুঁজতে লাগল। হঠাৎ তার সুহিকে ফোন দিতে ইচ্ছা করল। আগে নাহিদা, শেলী, অলকা, জালাত, চন্দনা, সনি, রুমি, রুমা এরা তাকে ভীষণভাবে আকর্ষণ করত।

একসময় শাহবাগের আড্ডায় নাহিদার মাথার ওপরে পুষ্প বর্ষণ করা হয়েছে। এখন সবকিছু ছাপিয়ে সুহি তার প্রিয় হয়ে উঠেছে। গতকাল সুহির সঙ্গে ফোনে দেড় ঘণ্টা কথা হয়েছে। সুহির হাসিটা অদ্ভুত, মন হরণ করা। সুহিকে দেখলেই মনে হয় সাধারণের মাঝে অসাধারণ সে। সুহির চোখ, মুখ, কপালের বড় টিপ, পরনের জিসের

প্যান্ট-ফুতয়া সব মিলিয়ে ওকে অন্যরকম মনে হয়। সুহির একটি ইতিবাচক দিক হচ্ছে, শাহবাগে যারা খান সাহেবের সঙ্গে আড্ডা মারেন তারা বেশি

সময় দিতে পারেন না, ওর সে সীমাবদ্ধতা নেই। রাত ১১টা পর্যন্ত আড্ডা মারতেও সুহির কোনো অসুবিধা হয় না। রাকিবের ইচ্ছা তার কোনো

বান্ধবীর সঙ্গে সারা রাত আড্ডা মারা। সেই সুযোগ এখনো হয়ে ওঠেনি। যে আড্ডা রাত ১০টায় শেষ হয়, সুহি এসে তা ১১টা পর্যন্ত বৃদ্ধি করেছে, এটা রাকিবের জন্য কম পাওয়া নয়।

আড্ডার ক্ষেত্রে রাকিবের একটি ইচ্ছা ছিল, স্বপ্ন

ছিল, যা আজো পূরণ হয়নি। ওর ইচ্ছা ছিল একটি মাইক্রোবাস ভাড়া করে বন্ধু-বান্ধবীদের নিয়ে রাজধানী ঢাকার সব ফ্লাইওভার ঘুরে বেড়ানো, ফ্লাইওভারের ওপর বাস থামিয়ে সবাই মিলে হেঁয়ালি করা, ছবি তোলা। ফ্লাইওভারের ওপর দাঁড়িয়ে রাতের ঢাকাকে উপভোগ করা। অবশ্য আকাশে থাকতে হবে পূর্ণ চাঁদ। যে চাঁদের আলোয় স্নাত হবে বন্ধুরা সবাই। সবাই ফিরে পাবে নতুন জীবন। রাতের ঢাকা একেবারে নির্জন হয়ে গেলে অন্যরকম এক পরিবেশ তৈরি হবে, যা উপভোগ করবে সবাই। এর মধ্যে মগবাজারের তাজ রেস্টুরেন্টকে বলে রাখা হবে গভীর রাতে আহা করবে সবাই। ফজরের আজান পর্যন্ত এভাবে চলবে আড্ডা আর ঘোরাফেরা। আগে থেকেই একটি হোটেল বুকিং দেয়া হবে। রাত শেষে সবাই ওই হোটেলে আসবে। এরপর টানা ঘুম। ঘুম শেষে দুপুরে লাঞ্চ করে যে যার বাসায় চলে যাবে। রাকিবের এ পরিকল্পনা তিনি কবি আশেককে জানান। আশেক বলেন, এটা বাস্তবায়ন করা কঠিন। প্রথমত, অনেক টাকার মামলা। দ্বিতীয়ত, সারা রাত এভাবে আড্ডা ও ঘোরাফেরার অনুমতি পাওয়া যাবে কিনা। এর মধ্যে নিরাপত্তা ঝুঁকিও রয়েছে। কারণ গভীর রাতে মাইক্রোবাস নিয়ে অপরাধীরা চলাফেরা করে। আশেকের কথায় নিরুৎসাহিত হন না তিনি। পরিকল্পনা মাথার মধ্যে ঘুরপাক খেতে থাকে।

এর আগে খান সাহেব যে মেয়ের সঙ্গেই বন্ধুত্ব করেছেন তাদের পেছনে হয় অর্থ খরচ করতে হয়েছে, না হয় উপহার দিতে হয়েছে। অনেকেই টাকা ও উপহার সরাসরি চেয়েছে। হাজির বিরিয়ানি, নান্নার মোরগ-পোলাও অথবা ঘরোয়া, স্টার, কস্তুরীতে খাওয়ানোর কথা বলেছে। সুহি অন্তত এ দলে নেই। ওকে চানচুর, বাদাম, ঝালমুড়ি অফার করলেই ও বেজায় খুশি। এই দিক দিয়ে খান সাহেব সুহির প্রতি সন্তুষ্ট। এসব লোভ ওর মধ্যে নেই। আমাদের দেশের উঠতি শিল্পপতিদের একটি সমস্যা হচ্ছে পেছন দিক দিয়ে হাতী গেলেও তাদের চোখে পড়বে না, আর সামনে দিয়ে সুই গেলে হেঁটে বাধিয়ে ফেলবে। এই স্বভাবের সঙ্গে রাকিব খানের স্বভাবের সাজুয় রয়েছে। খান সাহেব হজুগে পড়ে গেলে দোদার অর্থ খরচ করবে। আবার ক্ষেত্রবিশেষ পাঁচ টাকাও খরচ করবে না। সুহি যেহেতু নিজেই সম্ভল, আজিজ মার্কেটে হাতছানি নামে টি-শার্টের দোকান রয়েছে। দোকান ফেলে তো তার পক্ষে সব সময় আড্ডা মারা সম্ভব নয়। তবে রাত ৮টা থেকে ১১টা-সাড়ে ১১টা পর্যন্ত সে ফ্রি। এ সময়টাতেই সে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা মারে। বন্ধুদের ব্যাপারে তার রয়েছে উদার মনোভাব। সুহি নারী-পুরুষ এভাবে বন্ধু ভাবে না। নারী-পুরুষ উভয়েই তার কাছে সমান। সুহির এ দৃষ্টিভঙ্গি রাকিবের ভালো লাগে। একমাত্র কন্যাকে নিয়ে তার সংসার।

জনাকীর্ণ রাস্তায় দাঁড়িয়ে খান সাহেবের কেন সুহি সম্পর্কে ভাবছেন, তা বুঝে উঠতে পারছেন না। হঠাৎই ওকে ফোন দেন।

- সুহি বলছ, আমি খান ভাই।
- কেমন আছেন?
- তোমাকে মনে পড়ল।
- ধন্যবাদ, আপনাকে।

- আজ কি শাহবাগ আসবে?

- এক ঘণ্টা পরে আসব, হাতে একটু কাজ আছে।
- ঠিক আছে আসো, আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করছি।

এক ঘণ্টা নয়, সুহি এলো দেড় ঘণ্টা পর, সঙ্গে নিয়ে এলো বন্ধু রাসেলকে। ইদানীং রাসেলের সঙ্গেই তাকে দেখা যায়। রাসেল অন্তর্মুখী স্বভাবের ছেলে। এক ধরনের লাজুক লাজুক ভাব রয়েছে ওর মধ্যে। অত্যন্ত বিনয়ী স্বভাবের। সুহির প্রতি তার গভীর টান রয়েছে, তবে খান সাহেবের মতো উচ্ছ্বসিত নয়।

সুহি রাসেলের হাত ধরে রিকশা থেকে নেমেই বলল, জানেন খান ভাই, রাসেল সারা দিন কিছুই খায়নি।

অন্য আরেক দিন সুহি সবার সামনে বলেছিল, আমার সঙ্গে রাসেলের সম্পর্ক থাকুক এটা অনেকেই চায় না। এসব কথা দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয়, সুহি রাসেলের প্রতি নির্ভরশীল এবং রাসেলও সুহির খুব বিশ্বস্ত। নির্ভরশীল বিশ্বস্ত এসব শব্দ ব্যক্তি সম্পর্কের ক্ষেত্রে ক্ষয়ি যাচ্ছে, হারিয়ে যাচ্ছে; এর পরিবর্তে ভর করছে প্রতারণা, মিথ্যাচার, ভণ্ডামি। যার কারণে একে অন্যের প্রতি যে আস্থা, নির্ভরতা এসবের আবেদন অনেক আগেই হারিয়ে গেছে, এটা মনে করেন খান সাহেব। তার পরও বেঁচে থাকার জন্য ব্যক্তি সম্পর্কের বড় প্রয়োজন। প্রয়োজন আস্থা ও নির্ভরশীলতারও, যা সুহি আর রাসেলের মধ্যে আছে। খান সাহেব দুজনের সঙ্গে রাত সাড়ে ১১টা পর্যন্ত আড্ডা মারেন। বার বার উঠে গিয়ে নানা জিনিস সুহির জন্য কিনে আনেন। কখনো বাদাম, কখনো ঝালমুড়ি সঙ্গে লাল চা। সুহির প্রতি তার মুগ্ধতা রয়েছে, এটাই সত্য, আরো সত্য যে ওকে আড্ডায় গভীর রাত পর্যন্ত পাওয়া যায়। রাসেলের সঙ্গে তার বন্ধুত্বের সীমারেখা কী, তা ভাবার সময় তার নেই। পুরুষ নারীর কাছে কী চায় তা যে কোনো নারীই বোঝে। সুহিও বোঝে খান সাহেব কী চান। সুহি চলে তার নিজের মতো করে।

খান সাহেব একদিন তার ব্যক্তিক ও পারিবারিক দুঃখ-হতাশার কথা সুহিকে শোনাতো গেলে ও অনাগ্রহ প্রকাশ করে। ও বলে, খান ভাই আমি কোনো দুঃখ-হতাশার কথা শুনতে রাজি নই। যদি জীবনের পজিটিভ কোনো কথা থাকে, তা বলুন। এর আগের এক আড্ডায় কবি আশেক মাহমুদ সুহিকে বলেছিলেন, আপনার ভেতর ভাব আছে, তা প্রকাশও করতে চান, লেখালেখি শুরু করুন। প্রতি উত্তরে সুহি বলেছিল, দেখুন আশেক ভাই! আমি লিখলে জীবনের সুখের কথা লিখব। আপনাদের মতো বস্তাপচা দুঃখ-হতাশা, হাহাকারের ফিরিস্তি লিখব না। এই কথার পরিপ্রেক্ষিতে আশেক বললো, আপনার জানা আছে কিনা, একজন মানুষ যদি ৮০ বছর জীবিত থাকে, তবে তার চূড়ান্ত সুখের সময় মাত্র ৭২ ঘণ্টা। কখনো ১ সেকেন্ড কখনো বা ৫ মিনিট ওই সুখ তিনি নানা সময়ে উপভোগ করে থাকেন। আপনার কথার হয়তো সত্যতা রয়েছে তবে আমি লিখলে ওই চূড়ান্ত সুখের মুহূর্তগুলোই লিখব, বলল সুহি। আশেক বললো, সুখ-দুঃখ দুটোই জীবনের অনিবার্য অংশ। কোনোটিকে বাদ দিয়েই জীবন চলে না। কেবল দুঃখ-হতাশার কাহিনীও যেমন আবেদন-

উপযোগিতা কম, আবার কেবল সুখের কাহিনীও বৈচিত্র্যহীন। ৭২ ঘণ্টার সুখের কাহিনী লিখতে হলে সেখানে মনের অজান্তেই দুঃখ, হতাশা, একাকিত্ব, নিঃসঙ্গতা, ব্যক্তির টানাপড়েন, স্বপ্নভঙ্গ এসব এসে যাবে। সব মিলিয়েই তো জীবন, আর সাহিত্য জীবনের পরিশীলিত শিল্পিত রূপ। ওই দিন আশেকের কথায় সুহি সন্তুষ্ট কি অসন্তুষ্ট হয়েছিল ঠিক বোঝা গেল না। সে অন্যদের সঙ্গে আড্ডায় মেতে উঠেছিল। খান সাহেব বরাবরই একটি বিষয় লক্ষ্য করেছেন, এক ব্যক্তি যদি অন্য ব্যক্তির নাম শুনতে না পারে, তাতে বোঝা যায়, ব্যক্তিটি তাকে ঘৃণ্য করে কিংবা দেখে বিরক্তির দৃষ্টিতে। ব্যক্তির সম্পর্কঘটিত সংস্কৃতির এও একটা অংশ। দেখা গেল কেউ ওই ব্যক্তির প্রশংসা করছে, তখন যে তাকে অপছন্দ, হিংসা বা ঘৃণা করে সে ওই স্থান থেকে উঠে চলে যায় অথবা একেবারেই নীরব থাকে।

এর মধ্যে হয়তো ব্যক্তির উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও মানবিকতা চোখে পড়ে না। একইভাবে সুহি দুঃখকে পাশ কাটিয়ে কেবল সুখ নিয়ে থাকতে চায়, এর মানে কী। দুঃখকে সে ঘৃণা করে। যারা দুঃখভারাতুর কিংবা দুঃখই যাদের জীবনের প্রধান তারা দুঃখের সাগরে ভেসেও সুখ খোঁজে, পায় না। তাই তো কবি আশেক মাহমুদ লিখেছিলো, 'দুঃখ দিয়ে জীবন গড়া সুখের ছোঁয়া চাইব না, এ পৃথিবী নিষ্ঠুর জেনে দুঃখ পেয়ে কাঁদব না'। কবিতা শুনে খান সাহেব সেদিন আড্ডা থেকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন, আশেককে জড়িয়ে ধরে বলেছিলেন, কেয়া বাত কবি, কেয়া বাত। অথচ সুহি বলছে অন্য কথা। এ পর্যন্ত কেউ কেবল সুখের কথা লিখেছে, অন্তত সাহিত্যে, তা আশেকের জানা নেই। বরং অমর সাহিত্য বা গাথা, কাহিনীর সবই দুঃখের ওপর প্রতিষ্ঠিত। দুঃখ আর বিরহকাতরতার কাহিনীই মানুষ মনে রেখেছে। সুহি কেন দুঃখকে পাশ কাটিয়ে যেতে চাচ্ছে তা রাকিব কিংবা আশেক কেউ জানে না। এমনকি উপলব্ধিও করতে পারে না।

চৌদ্দ.

দুজনে আলাদাভাবে থাকার পাঁচ বছর চলছে। এই সময়ে মিনারা বেগম খান সাহেবকে খুব কমই ফোন দিয়েছেন। ফোন দেয়ার প্রয়োজনও মনে করেননি। যাকে ছেড়ে চলে এসেছেন তাকে ফোন দিয়ে কী লাভ, এই বোধ হয়তো মিনারা বেগমের মধ্যে সব সময় জাগ্রত থাকে। তার পরও যে কবার ফোন দিয়েছেন তা কেবল সজীবের কারণেই। একমাত্র ছেলে সজীব বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে মাঝে মাঝে উধাও হয়ে যায়। সকালে বাসা থেকে বের হলো তো সারা দিন খবর নেই। এমন অবস্থায় মায়ের মন বিচলিত হয়ে ওঠে। দুপুর গড়িয়ে বিকাল হলো যখন সজীবের ফেরার কোনো নাম নেই তখন বাধ্য হয়ে মিনারা রাকিবকে ফোন দেবে। বলবে, আপনার ছেলে সকালে বের হয়েছে, আর ফেরেনি। প্রতি উত্তরে খান সাহেব হয়তো বলবেন, ছেলে তো আপনারও খোঁজ নিন, আমাকে ফোন দিয়েছেন কেন? বিশেষ দায় ঠেকা না হলে তো ফোন দেন না। মিনারা রাকিবের কথার কোনো উত্তর করে না। এর আগে একদিন ফোন দেয় মিনারা। তখন খান সাহেব অসুস্থ ছিলেন। কথার মধ্যে আন্তরিকতা ফুটে

ওঠে। দুপুরে কী খেয়েছেন, রাতে ছেলেকে দিয়ে খাবার পাঠাব কিনা ইত্যাদি। খান সাহেবের ব্যক্তিগত খোঁজখবর সাধারণত সে রাখে না অথবা রাখার প্রয়োজনও মনে করে না। সেখানে এসব প্রশ্ন তার মধ্যে বিশ্বাসের জন্ম দেয়। কিছুক্ষণ পর বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায়। পুলিশের ডিআইজি করিম সাহেবের সঙ্গে তার আগের মতো যোগাযোগ আছে কিনা। রাকিব বলেন, কেন কী হয়েছে। প্রথমে মিনারা এ কথা-সে কথা তুলে তারপর আসল কথায় আসে। আসল কথাটা হচ্ছে, তার এক চাচাতো ভাই পুলিশে আছে, তাকে খাগড়াছড়ি থেকে ঢাকায় বদলি করাতে হবে। এসব কথা শুনে খান সাহেবের মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। বলে, আপনাকে কাজ ছাড়া তো একদিনও ফোন দিতে দেখলাম না। মিনারা ওকে বলে, মানুষ কাজের জন্য একজন আরেকজনের সঙ্গে যোগাযোগ ও সম্পর্ক রাখে। সবাই আপনার মতো অন্ধ না।

তবে মিনারা যে কবার ফোন দিয়েছে, বেশির ভাগই ছেলে সজীবকে কেন্দ্র করেই। দুজনের মধ্যে ফোনে ঝগড়াও হয়েছে। মিনারা রাগ করে চলে যাওয়ার পর থেকে যতবার কথা হয়েছে, দুজন একে অন্যকে আপনি সম্বোধন করে। গ্রামে অবশ্য ভিন্ন ধরনের সংস্কৃতি রয়েছে। গ্রাম্য বধূরা স্বামীকে আপনি সম্বোধন করেন। এ সংস্কৃতিরও এখন বদল ঘটেছে। অনেকেই তুমিও বলেন। তো মিনারা বেগম রাকিবকে হঠাৎ ফোন দিল। রাকিব তার স্বাভাব-সুলভ ভঙ্গিতে বললেন, বলুন, এই অধমকে কেন স্মরণ করেছেন। মিনারা বলল, মামলাটি তুলে নিতে চাই। আগামী বুধবার মামলার হাজিরার তারিখ, ওই দিনই আমি আদালতে দরখাস্ত দেব। মিনারার কথা শুনে রাকিব কোনো কথা বলেন না। তিনি কাঁদবেন না হাসবেন, বুঝতে পারছেন না। বললেন, আপনার মজি। মিনারার সঙ্গে কথা শেষ করে রাকিব কবি আশেক মাহমুদকে ফোন দেন। বলেন,

—ভাইজান! একটি সুসংবাদ আছে।

—নতুন কোনো মধুবারার সন্ধান নিশ্চয়ই পেয়েছেন।

—হ্যাঁ, গতকাল রাতে পরিচয় হয়েছে। থাকে তাজমহল রোড, আপনার মহল্লাতেই। রাতে ওর সঙ্গে দুই ঘণ্টা কথা বলেছি।

—ভালো কথা, এই সমাজে কেউ দেখে সময় পার করে, কেউ ফোনে কথা বলে সময় পার করে। কেউ আবার ঝগড়া করে, লিখে, সমাজসেবা করে, মহান আল্লাহর ইবাদত করে সময় পার করে। সৃষ্টিকর্তা সময়কে নির্ধারণ করে দিয়েছেন— যেভাবে পারে তার পার করছে।

—আপনাকে ফোন দিয়েছি অন্য একটি কারণে।

—বলুন কী কারণে।

—আপনার ভাবী একটু আগে আমাকে ফোন দিয়েছিল।

—খুবই আশাজাগানিয়া কথা? তো তিনি কী বললেন, সজীবের কোনো সমস্যা হয়েছে অথবা তার নিজের?

—না, বলল, মামলাটি তুলে নেবেন।

—কী কারণে তুলে নেবেন।

—তা তো জিজ্ঞেস করিনি।

—সে টাকার জন্য মামলা করেছে, সে কী কারণে

মামলা তুলে নেবে, তা আমার মাথায় ধরছে না। এর মধ্যে হয়তো অন্য রহস্য লুকিয়ে আছে। এ ক্ষেত্রে আপনার উৎফুল্ল হওয়ার বিশেষ কোনো কারণ দেখছি না।

—আমি উৎফুল্ল নই, অবাক হচ্ছি। সে তো গত পাঁচ বছরে আমার সঙ্গে একই আচরণ করছে। আমি যতই আবেগ দেখাই না কেন, সে বরাবরই নিরাবেগ, উদাসীন। আমাকে সব সময় পাগল বলে। এও বলে, এ ধরনের পাগলের সঙ্গে ঘর করা যায় না।

—মানুষমাত্রই কমবেশি পাগল। যার ভেতর পাগলামিটা বেশি সে অস্বাভাবিক, লোকে বলে বিকারগ্রস্ত। আর যারা কবি-সাহিত্যিক, অভিনেতা তাদের মধ্যে এ পাগলামির মাত্রাটা একটু বেশি।

—বিষয়টি আপনি যেভাবে উপলব্ধি করছেন, মিনারা হয়তো পারছে না।

—সবার ধারণা, উপলব্ধি এবং মানুষকে চেনার-বোঝার ক্ষমতা এক নয়। যার কারণে আমরা বলি



সাধারণ মানুষ আর অসাধারণ মানুষ। যারা সৃষ্টিশীল পাগল তারা অসাধারণ। আপনার ভেতর সেই অসাধারণত্ব রয়েছে, ভাবী আপনাকে চিনতে পারেননি, সে অনুযায়ী মর্যাদাও দেয়নি।

—এটাই তো আমার দুঃখ। অনেক স্বামীই তো স্ত্রীর বৈষয়িক চাহিদা পূরণ করতে পারে না, অর্থনৈতিক টানাপড়েনের কারণে। অনেক স্ত্রীরই তো সংসারকেন্দ্রিক স্বপ্ন মাঠে মারা যায়, তারা কি সংসার চেড়ে চলে যায়?

—সংসার হচ্ছে আগে ত্যাগের জায়গা পরে ভোগের। ত্যাগ না করে কেবল ভোগের দিকে মনোযোগ দিলে তো সংসার টিকবে না। সংসার টিকিয়ে রাখার দায়িত্ব এককভাবে স্ত্রী বা স্বামীর নয়, উভয়েরই। যা হোক, ভাবী যদি মামলাটি তুলে নেয়, ভালো কথা, তবে সে আপনার ঘরে ফিরে আসবে— এমন নিশ্চয়তা নেই।

—দেখা যাক কী হয়।

দুজনের আলাপ যখন শেষ হলো তখন কবি আশেক মাহমুদের কথা খান সাহেব গভীরভাবে ভাবতে লাগলেন। তার ভাবনার ফল এটাই দাঁড়াল যে, মিনারা যে কারণেই মামলাটি তুলে নিক, তাকে আর খোরপোশের বামেলা পোহাতে হবে না। মামলার হাজিরার দিন রাকিবের সঙ্গে মিনারাও এলো এবং মামলাটি তোলার জন্য আবেদন করল। বিচারক আবেদনটি মঞ্জুর করলেন। মিনারার আচরণে রাকিব মহাখুশি। এবার নিশ্চয়ই মিনারা খান সাহেবের ঘরে চলে আসবে। আদালত থেকে বের হয়ে দুজনে একটি ফাস্টফুডের দোকানে বসে। প্রায় ছয় বছর পর দুজনে মুখোমুখি বসল। কথা খান সাহেবই বললেন—

—আপনাকে ধন্যবাদ যে, আজ আমার মুখোমুখি আপনি বসেছেন।

—হ্যাঁ, বসেছি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলাপ করতে।

—কী আলাপ বলুন।

—আমি আপনাকে খুব তাড়াতাড়িই ডিভোর্স লেটার পাঠাব, আপনার সঙ্গে আমার সংসার করা সম্ভব নয়, আপনি আমাকে কিছুই দেননি। সুখ, বিভূভৈবব, টাকা-পয়সা, ভালোবাসা, সুন্দর সংসার কিছুই না। একজন আমাকে ভালোবাসে। তিনি আমাকে দুটো বাড়ি লিখে দেবেন, দুজন চাকর সব সময় আমার জন্য রাখবেন সেবা করার জন্য আর হাত খরচ বাবদ ৪০ হাজার টাকা দেবেন।

—ভালো কথা। আমার ভালোবাসা ও সংসারকে মাড়িয়া যদি আপনি সুখের জন্য বিক্রি হয়ে যান তবে আমার কী করার আছে। মনে রাখবেন, সুখের হাতছানি কিন্তু সুখ নয়। তার মধ্যে দুঃখের বেদনার বার্তাও থাকে।

—আপনি আমাকে মানসিক নির্যাতন করেছেন, আমাকে ও সংসারকে গুরুত্ব দেননি। তাই শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্ত নিলাম।

—আপনার জীবন, আপনার মন, সিদ্ধান্তও আপনার, ভবিষ্যৎ সুখের জন্য আপনি এ সিদ্ধান্ত নিতেই পারেন। তবে আমার দিকে না হোক একমাত্র ছেলের দিকে তাকানো উচিত ছিল। মা হিসেবে এটা আপনার কর্তব্য।

খান সাহেবের এই কথার যথাযথ উত্তর মিনারা দিতে পারে না। এখন তার দুই চোখজুড়ে স্বপ্ন খেলা করছে। কয়েক দিনের মধ্যে সে হয়ে যাবে

রাজরানী। খান সাহেবের চোখ ঝাপসা হয়ে আসে, তিনি সামনে বসা মিনারাকে অস্পষ্ট দেখতে পান। তার মনে হয়, মিনারা তার কেউ নয়। তার অতীত মৃত, ভবিষ্যৎ মৃত, আর বর্তমান নিবৃত্ত প্রদীপ। পনেরো।

দিন কয়েক আগে খান সাহেবের ছোট ভাইয়ের স্ত্রীর সঙ্গে মিনারার দেখা হয়েছিল। তাকেও একই কথা বলেছে। পাশের মহল্লার সামাদ সাহেবকে রাকিব আগে থেকেই চেনেন। বছর পাঁচেক আগে তার স্ত্রীবিয়োগ ঘটেছে। মেয়েটা পাত্রস্থ করেছে অনেক আগই, একমাত্র ছেলে নবম শ্রেণিতে পড়ছে। ওই মহল্লায় তার তিনটি বাড়ি। তিনি মাসে ভাড়া গোণেন দুই লাখ টাকার ওপরে। সামাদ সাহেব রাকিবের চেয়ে বছর দুয়োর বড়। সাটোর্ধ্ব সামাদ সাহেবের জৈবিক তাড়না না থাকারই কথা। একইভাবে মিনারা বেগমও মধ্যবয়সী নারী। যদি তাদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে তা কেবলই আত্মিক, জৈবিক নয়। ভদ্রলোক যেহেতু ধনী সুতরাং মিনারাকে অর্থবিত্তের মালিক তিনি করে দিতেই পারেন, রেখে দিতে পারেন গোটা তিনেক চাকরানিও। এসবই ভবিষ্যতের কথা। ভবিষ্যৎ আর বাস্তবতা এক নয়। রাকিব মিনারাকে একদিন ফোন করে বলেন, আপনি তো টাকার কাছে বিক্রি হয়ে গেছেন। আপনার সঙ্গে রাস্তার নারীর পার্থক্য কোথায়? আপনি তো আমার ছেলের ভবিষ্যৎ নষ্ট করে দিলেন।

ফোনের এ প্রান্ত থেকে রাকিব আবেগ বরাতেই থাকেন, আজ ভীষণ উত্তেজিত তিনি। সব কথা তিনি ওকে শোনাতে চান। রাকিব একটু পরে লক্ষ করে নিজে একা একাই বকবক করছেন। ওই প্রান্তে কেউ নেই, মিনারা লাইনটা কেটে দিয়েছে। এ কাজ মিনারা আজই কেবল করেনি; বহুবার করেছে। কারো সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে হঠাৎ লাইন কেটে দেয়া ভদ্রতা-সৌজন্যতার মধ্যে পড়ে না। অথচ এ কাজটি বার বার সে করেছে। আসলে মিনারার রাকিবের কোনো ব্যাপারে আগ্রহ কিংবা মনোযোগ নেই। সুবোধ ঘোষের জতুগৃহ গল্পে দীর্ঘ আট বছর পর তালাক হওয়া স্বামী স্ত্রীর একটি রেলস্টেশনে দেখা হয়। দুজনেরই আলাদা সংসার। স্বামী অসুস্থ, পিপাসার্ত। স্ত্রী তাকে পাশের কক্ষ থেকে পানি এনে পান করায়। তালাক হওয়ার আট বছর পরও স্বামীর প্রতি স্ত্রীর যে ভালোবাসা ও সহর্মিতা ফুটে উঠেছে, মিনারা বেগম তার ধারেকাছেও নেই, তা সত্ত্বেও রাকিব তাকে সময়ে অসময়ে ফোন করেন। এর আগে বেশ কয়েকবার বেড়াতে যাওয়ার অফারও দিয়েছে। মিনারা এসব অফার সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছে।

মিনারাকে কেন্দ্র করে রাকিবের মন আগের মতোই আবেগ ও ভালোবাসাপ্রবণ। যেন বিয়ের সময়ের মানসিকতা লালন করছেন তিনি। অথচ মিনারা সম্পূর্ণ বদলে গেছে। ও হয়তো রাকিবকে নয়, সামাদ সাহেবকে ভালোবাসে। এ ভালোবাসা আত্মিক অথবা অর্থ-বিত্ত, দাস-দাসী পাওয়ার লোভে। এ বিষয়ে রাকিব আর ভাবতে চাচ্ছে না। আবারো তার চোখ ঝাপসা হয়ে আসছে। এক দুপুরে কবি আশেক মাহমুদ অফিসের কাজে ব্যস্ত। এমন সময় রাকিব সাহেবের ফোন এলো। অন্যদিন হ্যালো ভাইজান কেমন আছেন, এসব

বলেন। আজ প্রথমে গানের কলি আওড়ালেন, ‘কেন ভালোবাসা হারিয়ে যায়, দুঃখ হারায় না।’ এরপর অবর ধারায় কাঁদতে লাগলেন। কান্না আর থামে না। যেন তিনি দীর্ঘ প্রতুতি নিয়ে কাঁদতে বসেছেন। কান্না শুনে বিব্রতকর অবস্থার মধ্যে পড়ে গেলেন আশেক। খান সাহেবের এমনিতেই পছন্দের মানুষের সঙ্গে ফোনে দীর্ঘক্ষণ কথা বলা অভ্যাস। যার সঙ্গে তিনি অনর্গল কথা বলছেন, তিনি বিরক্ত হচ্ছেন কিনা কিংবা তিনি ব্যস্ত কিনা, সে দিকে তার খেয়াল নেই। নিজের কথা বলতেই থাকবেন। আজকের পরিস্থিতিটা অন্যরকম। অনেকক্ষণ কাঁদার পর তিনি বললেন, আমার স্ত্রী আজ আমাকে ডিভোর্স দিয়েছে। এ কথা বলে আবার কাঁদতে লাগলেন। কান্না শুনে আশেকের গ্রামজীবনের একটি ঘটনা মনে পড়ে গেল। গ্রাম সম্পর্কে তার এক দাদার দুই স্ত্রী ছিল। দুজনে সারা দিন ঝগড়া করত। তাদের ঝগড়ায় গ্রামের মানুষ অতিষ্ঠ। গ্রামবাসী তার দাদাকে চাপ প্রয়োগ করল, যে কোনো একজন স্ত্রীকে তালাক দিতে হবে। শেষ পর্যন্ত দাদা রাজি হলেন। আগামীকাল এ ব্যাপারে শালিস বসবে, শালিসে সিদ্ধান্ত হবে, কোন স্ত্রীকে তিনি তালাক দেবেন।

দাদা পালাক্রমে দুই স্ত্রীর সঙ্গে রাত কাটাতেন। আজ ছোট স্ত্রীর সঙ্গে কাটানোর রাত। ছোট স্ত্রীর বাড়ি ফরিদপুরের চরভদ্রাসন উপজেলায়। ছোট স্ত্রী আজকের রাতকে বাসররাতে রূপান্তরিত করলেন। দাদাকে সব উজাড় করে দিলেন, আদর-সোহাগে পরিতুষ্ট হলেন দাদা। শেষ রাতের দিকে দাদি বললেন, ‘আপনি কিন্তু আমারে ছাড় দিয়োন না।’ দাদা বললেন, ‘তুই আমার সোহাগ চাঁদ বদনি, তোরে ছাড়ুম ক্যান? ছাড়ুন তো বড়ডারে।’ দাদার কথায় ছোট দাদি আশুস্ত হলেন।

সকালে শালিস বসল। বড় দাদি যেহেতু গ্রামেরই মেয়ে সুতরাং শালিসে সিদ্ধান্ত হলো, ছোট স্ত্রীকেই ছাড়তে হবে। দাদা বাধ্য হয়ে সিদ্ধান্ত মেনে নিলেন। ছোট দাদিকে নৌকা করে চরভদ্রাসন পাঠিয়ে দেয়া হলো। সারা পথ তিনি অবর ধারায় কাঁদলেন আর বললেন, ‘রাইতে কইল কী আর দিনে করল কী।’ কেবল ছোট দাদিই দিল, গ্রামের যে কোনো অসহায় মহিলাকে তালাক দিলে, তারাও অবর ধারায় কাঁদে, কেউ কেউ মাসের পর মাস কেঁদে তার অসহায়ত্ব প্রকাশ করে। খান সাহেবের অবস্থা হয়েছে গ্রামের মহিলাদের মতো। তারপর খান সাহেবকে তিনি শাহবাগে আসতে বলে, যাতে তাকে স্বাভাবিক করা যায়। আড্ডার সবাইকে আশেকই খবর দিলো। যে করেই হোক আড্ডাটা আজ জমাতে হবে। ব্যবসায়ী মতিউর রহমানকেও খবর দেয়া হলো। মতি মুসলিম সুইটস থেকে চার রকমের চার কেজি মিষ্টি নিয়ে হাজির।

আড্ডার অধিকাংশ সদস্যই এসেছে। বিশেষভাবে উপস্থিত হয়েছে কবি নাঈদ আফ্রিনী। যিনি একজন ভালো গীতিকার, সুরকার ও শিল্পী। নেত্রকোনার আঞ্চলিক গানে বেশ দক্ষ। তিনি বাউলের ভঙ্গিতে গান ধরলেন— পিরিতি পিরিতি মধুরও পিরিতি, কানে কানে শুধু লাগেরে মধু। অন্তরে আগুন জ্বলে। এরপর ধরলেন— আমি তো মথুরার কৃষ্ণ না, গোকুলে রাখি না ধেনু, বৃন্দাবনে থাকি না। এরপর গাইলেন, কৃষ্ণ-রাধা পিরিতের ধাঁধা, জল ফেলে জল আনে জলের ছলে। এভাবে নাভিদ নেচে নেচে

অন্তত ৮টি গান গাইলেন। খান সাহেব গান শুনে আমোদিত, আত্মাদিত হলেন। চিৎকার করে বললেন, ‘মানুষ কত নিষ্ঠুর, তার পরও চলে যায়, চলে যায় সবকিছু ছেড়ে।’ ওই দিন আড্ডায় তার এ কথার মর্মার্থ আর কেউ না উপলব্ধি করলেও কবি আশেক ঠিকই বুঝেছিলেন এবং তার মনটা কুঁচকে গিয়েছিল।

মোল.

আড্ডা শেষে আশেক বাসায় চলে আসে। বাসায় এসে গভীর রাতে ভাবে খান সাহেবকে একবার ফোন দেয়া দরকার। তার মনের অবস্থা কেমন জানা প্রয়োজন। হ্যালো রাকিব ভাই আমি আশেক। হ্যাঁ আশেক ভাই, যতক্ষণ আড্ডায় থাকি ভালো থাকি। ঘরের ভেতর ঢুকলেই মনটা হাহাকার করে ওঠে, বিষণ্ণতায় ছেয়ে যায়। কেবল কান্না পায়। শুনুন খান ভাই, এ ক্ষেত্রে আমার দর্শন অন্যরকম। যে আমাকে ছেড়ে চলে গেছে, কিংবা আমাকে অবজ্ঞা করেছে, অপমান করেছে, তার জন্য আমি কাঁদব না। আপনি গভীরভাবে লক্ষ করুন, গত পাঁচ বছরে ভাবী আপনার সঙ্গে কী ধরনের আচরণ করেছে। বলল আশেক।

রাকিব বললেন, আশেক ভাই, সবই আমি বুঝি কিন্তু মনটাকে মানাতে পারি না। মিনারা আমাকে তালাক দেবে এটা আমি কখনই ভাবিনি। আমি কেবল ভেবেছি ও আমার কাছে ফেরত আসবে। যত কথাই বলেন, বাস্তবতা হচ্ছে এই, ভাবী আপনাকে ছেড়ে চলে গেছে, আশেক বলল। আমি নিজের জন্য ভাবী না, ভাবী আমার ছেলেটার জন্য। কয়েক মাস পর ওর এসএসসি পরীক্ষা। ছেলেটির ভবিষ্যতের কথা না ভেবে, সিদ্ধান্তটি নিয়ে ফেলল। বললেন রাকিব।

আশেক বলল, যারা এ ধরনের সিদ্ধান্ত নেয় বা লোভে পড়ে তারা স্বামী-স্ত্রীদ্বয়ের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে না। কিন্তু যখন তাদের মোহ ভাঙে তখন তারা দুঃখের সাগরে হাবুডুব খায়। খান ভাই আমার অনুরোধ, আপনি ভেঙে পড়বেন না, কাঁদবেন না। আজ রাখি পরে আবার কথা হবে। আশেক দ্রুত লাইন কেটে দেয়। আশেক কিছুতেই ভেবে পায় না, খান সাহেব এত ভেঙে পড়েছে কেন।

এর মধ্যে খান সাহেবের আরেক বিপত্তি দেখা দেয়। মহল্লায় চলা তার জন্য মহা দায় ঠেকা হয়ে দাঁড়ায়। যেহেতু এই মহল্লার স্থায়ী বাসিন্দা তিনি। রাস্তায় বের হলেই পরিচিত জন জিজ্ঞেস করে, ভাইজান, ভাবী নাকি আপনাকে তালাক দিয়েছে। প্রশ্ন শুনে খান সাহেব অবাক হন না, বিব্রতকর অবস্থায়ও পড়েন না, বলেন, হ্যাঁ দিয়েছে। কেন তালাক দিয়েছে কী জন্য দিয়েছে, কার দোষ কতখানি—এসব কেউ খান সাহেবকে জিজ্ঞেস করে না।

রাতে খান সাহেব যখন ঘুমতে যান, ঘুম তার দুচোখ স্পর্শ করে না। কবি আশেক তাকে বলেছিল, আপনার ঘুম না এলে, আল্লাহ আল্লাহ বলতেই থাকবেন। দেখবেন এক সময়ে ঘুমিয়ে পড়বেন। আশেকের উপদেশটা কাজে লেগেছে। আগে তার গভীর ঘুম হতো, এখন তিনি ঘুমের ক্ষেত্রে আগের পর্যায়ে আর যেতে পারেন না। ঘুমের মধ্যে কে যেন তাকে বলছে— আপনার বউ আপনাকে তালাক দিয়েছে। ঘর্মাক্ত শরীরে ঘুম

ভেঙে যায় তার। ইতোমধ্যে দরজার ফাঁকগলে সূর্যের আলো আসতে শুরু করেছে। বেলা কটা বাজে তা তিনি বলতে পারবেন না। তার নিঃশ্বাস ঘন হয়ে আসছে। কেউ কি তাকে বাবা বলে ডাকছে? তার একমাত্র ছেলে কি তার দরজায় দাঁড়িয়ে? প্রায় প্রতিদিনই সজীবের সঙ্গে তার দেখা হয়। সজীব স্বেচ্ছায় আসে তা নয়, খান সাহেবই তাকে ডাকে। বার বার ফোন করার পর সজীব নিচে নেমে আসে। এটা সাধারণত হয় রাত ১০টা থেকে ১১টার মধ্যে। ডিম, দুধ, কলাসহ নানা ধরনের ফলফলারি বেকারির খাদ্য সামগ্রী, নগদ টাকা প্রায় প্রতিদিনই ছেলেকে দেন তিনি। এ ছাড়া যখন পোশাক-পরিচ্ছদ, জুতা বা অন্যান্য জিনিস লাগে, ছেলেকে নিয়ে মার্কেটে যাবেন। ছেলে খান সাহেবের ব্যাপারে তেমন উচ্ছ্বসিত নয়। অনেক সময় ফোনও ধরে না। গত রাতে সজীবের সঙ্গে তার দেখা হলে তাকে জিজ্ঞেস করে, ‘বাবা’ তোমার মা যে আমাকে তালুক দিয়েছেন, তুমি জানো? সজীব অবলীলায় বলল, জানি। খান সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, কীভাবে? সজীব বলল— ‘মা রেগে একদিন আমাকে বললেন, তোর বাপরে তালুক দিচ্ছি, তোরও বাসা থেকে বের করে দেব।’ কেন তোমাকে বাসা থেকে বের করে দেবে? বললেন, খান সাহেব। সজীব বলল, তাতো জানি না। এ কথা শোনার পর খান সাহেব ছেলেকে জড়িয়ে ধরে কাঁদলেন। বললেন, বাবা চিন্তা কইরো না, তোমারে আমার কাছে নিয়া আসব।’ বাবার কথাই কোনো উত্তর করে না সজীব। সজীবকে দুদিন আগে তার এক বন্ধু বলেছিল, অই সজীব তোর বাপকে নাকি তোর মা তালুক দিয়েছে? সজীব এর কোনো উত্তর দিতে পারেনি। বাবা-মায়ের পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়টি সজীবের আগে থেকেই ভালো লাগত না। অনেকেই বাবা-মায়ের সঙ্গে ঘুরতে বেড়ায়, সজীবের সে সুযোগ নেই। ও যখন পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ত তখন একবার শিশুপার্কে গিয়েছিল। ওই যে শেষ ঘোরা-ফেরা। এরপর মায়ের সঙ্গেই বেশির ভাগ সময় বের হয়েছে। বাবাকে মা তালুক দিয়েছে, এই কথাটা সজীব সহজভাবে মনে নিতে পারছে না। মা নাকি সামাদ সাহেবকে বিয়ে করবে, এমন কথাও তার কানে এসেছে। মা তাকে রেখে অন্যের ঘরে চলে যাবে, অথবা তাকে বাসা থেকে বের করে দেবে। একদিন সে মোবাইলে গেমস খেলছিল, গভীর রাত। তার ভালো লাগছিল না। হয়তো বাবা মাকে ফোন দিয়েছে। মা এ প্রস্তাব থেকে বলছে, ওই কুত্তার বাচ্চা, তোর ছেলেরে তুই নিয়া যা, আমি আর ওকে রাখতে পারব না। সজীব এই বাসায় থাকুক, মা এটা চাচ্ছে না। বাবা যে বাসায় থাকে, এখানে থাকার উপযোগী নয়, তা হলেও থাকবে কোথায়? মা এত তাড়াতাড়ি পর হয়ে যাবে, তা সজীব ভাবতে পারেনি। বাবাকে তালুক দেয়ার পর মা অনন্যরকম হয়ে গেছে— এটা সজীবের মনে হয়েছে। ওর সঙ্গেই আর আগের মতো আচরণ করে না। ও যেন এখন ওর মায়ের বোঝা। একটু খুঁত পেলেই মা ওর ওপর ক্ষেপে যায়। মায়ের এই আচরণ সে বাবার কাছেও বলতে পারছে না। রাত একটা বাজে, তখনো সজীব মোবাইল নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল, ইদানীং তার পড়তে ইচ্ছে করছে না। মা তার ওপর খেপে

গেল। বাপ তুলে, বিশ্রী, একটা বকা দিয়ে বলল— ‘এত রাইত পর্যন্ত মোবাইল টিপতাহিস কেন? প্রতিউত্তরে সজীব বলল, তুমিও তো গভীর রাত পর্যন্ত ফেসবুকে বন্ধুদের সঙ্গে কথা বল। এ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে মিনারা বেগম ওর ওপর ভয়ানকভাবে রেগে গেল। ওকে মারতে উদ্যত হলো। সজীব মনে করে তার মায়ের মাথাটাই খারাপ হয়েছে। মা গভীর রাতে একজনের সঙ্গে কথা বলে, ওই ব্যক্তি সামাদ সাহেব কিনা তা সে জানে না। সে শুনেছে বাবা, মা আর সন্তান ছেড়ে অন্য একটা বিয়ে করে। কিন্তু এটা শোনেনি যে মা সন্তানকে ফেলে অন্য জায়গায় বিয়ে করে। এসব কথা ভেবে সজীবের মনটা উদাস হয়ে যায়। তার লেখাপড়ায় মন বসে না। মা যদি সত্যি সত্যি সামাদ সাহেবের ঘরে চলে যায়, তবে সে কি নানির কাছে থাকবে; নাকি নানিও তাকে বের করে দেবে? প্রকৃত অর্থে তার থাকার কোনো জায়গা নেই। বাবা বার বার বলেছেন, ঘরটি ঠিকঠাক করবেন, কিন্তু তার মনোভাবে বোঝা যায় না। হয়তো তিনি ওকে হোস্টেলে রাখবেন অথবা কারো সঙ্গে মেসে। কিন্তু তার অন্য বন্ধুদের মতো সে তো পরিবারের মধ্যে আর বসবাস করার সুযোগ পাচ্ছে না। পনিরদের বাড়িতে সে প্রায়ই যায়। ওদের বাবা-মায়ের সঙ্গে কী মধুর সম্পর্ক। ওরা একসঙ্গে খেতে বসে। একে অন্যকে চা বানিয়ে দেয়। একসঙ্গে ঘুরতে যায়। আর ওর মা থেকেও আজ নেই, বাবা ছলছাড়া। ওর নিজের অস্তিত্ব আজ বিলীন।

সতেরো।

সজীব একদিন বাবাকে বলেছিল, মা ফেসবুক খুলেছে। ওর মোবাইলে একদিন বাবাকে দেখিয়েছিল। সজীবই মাকে একাউন্ট খুলে দিয়েছিল। মায়ের ফেসবুক মাঝেমাঝে সজীবও ব্যবহার করত। মা বাবাকে তালুক দেয়ার পর দেখা গেল, ওর মা পাসওয়ার্ড পরিবর্তন করে ফেলেছে, ফলে সজীব আর ঢুকতে পারছে না। এই ঘটনা রাকিবও জানে। কিন্তু এ ব্যাপারে বাবা-ছেলের কিছুই করার নেই। বাবা পর হয়ে গেছে। ছেলেও পর হওয়ার পথে। নতুন জীবনের স্বপ্ন দেখছে মিনারা বেগম।

পুরষভাত্তিক সমাজে বেশির ভাগ সময়ে স্বামীই স্ত্রীকে তালুক দেয়। স্ত্রী স্বামীকে তালুক দেয়ার হার খুবই কম। খান সাহেবের ক্ষেত্রে ঘটল এমন ঘটনা। যেসব নারী স্বাবলম্বী, অতিরিক্ত স্বাধীনচেতা, অসহায়ত্বের বেড়া জাল থেকে মুক্ত হয়েছে অনেক আগেই, তারা সংসার করতে না চাইলে স্বামীকে ছেড়ে দেয়ার চিন্তা করে অথবা ছেড়ে দেয়। আর যারা অসহায় নারী তারা চোখ-মুখ বুজে, স্বামীর শত অন্যায়-অত্যাচার সহ্য করে সংসার করে। মিনারা বেগম স্বাবলম্বী নারী তার আত্মীয়-স্বজনরাও বনেদি, অন্যদিকে সামাদ সাহেবের মতো ধনাঢ্য মানুষ তার প্রেমিক, এরপর তো তার খপ্পর সাহেবের দিকে তাকানোর কোনো সুযোগ নেই। কদিন আগে রাকিবের ছোট বোনের স্বামীর সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল— ওকে ও বলেছে ‘পাগলের সঙ্গে ঘর করা যায় না’ একথা শুনে খান সাহেবের দুঃখের মধ্যেও ওর একটি গল্প মনে পড়ে গেল। এই গল্প তিনি শাহবাগের আড্ডায় বহুবার বলেছেন। আড্ডার লোকজন গল্পটি শুনে বেশ মজা

পেয়েছে। গল্পটি এমন; পাগলা গারদে এক পাগল আরেক পাগলের দিকে এক নাগাড়ে দুই ঘণ্টা তাকিয়ে আছে পলকহীন চোখে। কেউ কারো সঙ্গে কথা বলছে না। গারদের লোকজন এই দৃশ্য দেখে অবাক হয়। তারা পাগল দুটোর পাশে দাঁড়িয়ে থাকে। আরো এক ঘণ্টা অতিবাহিত হয়। একজন আরেক জনের দিকে একই কায়দায় তাকিয়ে আছে। তিন ঘণ্টা অতিবাহিত হওয়ার পর একজন অন্যজনকে বলছে— ‘এতক্ষণ ধইরা চাইয়া চাইয়া কী দেখতাহা’ একথা শুনে পাগল উত্তর করে, সেই যে পাগল হইলি, আর ভালো অইলো না।’ খান সাহেবের স্ত্রী হয়তো তার সম্পর্কে এমনই দৃষ্টিভঙ্গি লালন করে।

মিনারা বেগম খান সাহেবকে তালুক দেয়ার পর থেকে আশেক তাকে সকাল-বিকেল ফোন দেয়, শাহবাগ আসার জন্য অনুরোধ জানায়। আশেক একটি বিষয় কিছুতেই বুঝতে পারছে না, খান সাহেবকে যখনই ফোন দেয়, তখনই তিনি কাঁদেন। তার একই কথা— ‘আমি জীবনেও ভাবতে পারিনি, আমার বউ আমাকে তালুক দেবে।’ তারপরে বলবে— ‘তুই টাকার কাছে বিক্রি হয়ে গেলি, ছেলেভার দিকেও তাকাইলি না।’ খান সাহেবের এই দুটো কথার উত্তর আশেকের জানা নেই। তিনি আশেককে বলেন, জানেন, আশেক ভাই, মিনারা বিয়ের সময় আমাকে অনেক ভালো বাসত। গায়ে হলুদের দিন হলুদের ডালা কেনার টাকা আমার ছিল না। ও ওর নিজের সঞ্চিত টাকা আমাকে পাঠাল। এরপর থেকে আমি ওকে আকাশসমান ভালোবাসতাম। এখানে বাসি। কিন্তু ও কী কাজ করল আমাকে তালুক দিল। এই কথার জবাবও কবি আশেক মাহমুদের জানা নেই। কারণ আশেক মাহমুদ জীবনে এমন প্রান্তিক অবস্থায় কখনো পৌঁছেনি।

কবি হলেও তার সংসারে এমন সংকট কখনো দেখা দেয়নি। কারণ আশেক স্ত্রী-সন্তানদের ভালোবাসে। তাদের ইচ্ছে পূরণের চেষ্টা করে সব সময়। মিনারা যদি সত্যিই রাকিবকে ভালো বেসে থাকে তা হলে, দূরে চলে গেল কেন; খান সাহেব কি জানে না, ভালোবাসা হচ্ছে পরিচর্যার ব্যাপার। নিরন্তর ভালোবাসা মানে নিরন্তর পরিচর্যা। এ ব্যাপারে প্রথম ঘটিত হলো, তিনি মিনারা বেগমের ইচ্ছা পূরণের জন্য কিছুই করেননি। প্রথমত নিজের বাড়ি ঠিক করেননি, যদি ভাইবোনদের স্বস্তির কারণে বাড়িটি সংস্কার করা সম্ভব না হয়, তবে তার উচিত ছিল অন্য একটি ফ্ল্যাটে মিনারা বেগম ও সজীবকে ওঠানো। তিনি তাও করেননি। স্ত্রীকে তার চাহিদামতো অর্থ দেয়া হয়নি। তার ওপর সব সময় কর্তৃত্ব খাটানো হয়েছে। এসব কারণেই হয়তো মিনারার মানসিকতার ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে বলে কবি আশেক মাহমুদ মনে করে। সময় অনেক গড়িয়ে গেছে, এখন কান্না করে কী হবে? মিনারা বেগমের সামনে স্বপ্নের হাতছানি, যে স্বপ্ন তার প্রেমিক সামাদ সাহেব দেখিয়েছেন। এই স্বপ্নের সফল বাস্তবায়ন হবে কীভাবে, তা মিনারা জানে না। মিনারা জানে, যারা প্রেমিক, তারা যখন স্বামী হয় তখন তাদের মানসিকতার ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে, যেমন ঘটেছে রাকিবের।

কবি আশেক মাহমুদের একটি ইতিবাচক দিক হচ্ছে, বন্ধু হোক আর বান্ধবী হোক, যখন কেউ

জীবনের প্রান্তিক পর্যায়ে পৌঁছে তখন সে তাদের পাশে দাঁড়ায়। নিজের গুরুত্বপূর্ণ সময় নষ্ট করে তাদের সঙ্গ দেয়। তাদের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে নিয়ে যায় দামি রেস্টুরেন্টে খাওয়ায়। জীবনের ইতিবাচক কথাগুলো তাদের সামনে তুলে ধরে। তাদের নতুন জীবনের স্বপ্ন দেখায়। কঠিন বাস্তবতার মধ্যদিয়ে সময় অতিক্রম করাই জীবন, এসব কথাও বলে। এভাবে আশেক তার চার বান্ধবীকে আত্মহত্যা থেকে ফিরিয়ে এনেছে। এখন তারা স্বাভাবিক জীবনযাপন করছে এবং রীতিমতো আশেককে ভুলে গেছে। তাতে অব্যয় তার আক্ষেপ নেই। বিপদাপন্ন অবস্থা থেকে সে তাদের ফিরিয়ে আনতে পেরেছে, এটাই তার সাফল্য। খান সাহেবকেও সে ফিরিয়ে আনতে চায়। দুজনের নীতি-আদর্শ বিপরীতমুখী হলেও তিনি তো মানুষ। মানবিক দিকটা তার উজ্জ্বল। যে কারণেই হোক সে মানুষকে সাহায্য করে, আনন্দ দেয়, মানুষের পাশে দাঁড়ায়। সুতরাং খান সাহেবকে বাঁচিয়ে রাখা দরকার। তাই তিনি আজ তাকে শাহবাগ আসতে বলে।

খান সাহেবকে ফোন দেয় কবি। খান সাহেব বলেন,
— আশেক ভাই আমার মনটা ভীষণ খারাপ। আপনি কবি মানুষ, আপনার আহ্বান উপেক্ষাও করতে পারি না।

— কেন আপনার মন খারাপ? আপনাকে না বলেছি, সব কিছু ভুলে যেতে হবে। এটা মনে করার তো কোনো কারণ নেই, আপনার জীবনে যা ঘটেছে, এটা আর কারো জীবনে ঘটেনি।

— ঠিক তা নয়, আমি আবেগপ্রবণ মানুষ। আবেগ সামলে দেয়া আমার জন্য বড় কঠিন।

— আবার কী ঘটেছে, তাই বলুন।

— মিনারা আমাকে ফোন দিয়ে ইচ্ছেমতো গালাগালি করেছে। বলেছে ‘তুই বেহায়া তোর পুলাও বেহায়া। তোর না কইছি, তর পুলারে নিয়া যা।’

— উনি হঠাৎ রোগে গেল কেন।

— ছেলে তার কথা শোনে না। ঠিকমতো পড়ালেখা করে না, কিম মেরে ঘরের কোনোজায় বসে থাকে। মাকে ব্যঙ্গ করে লেখাপড়া নিয়ে।

— আমি তো আগেই বলেছি, ছেলেকে আপনার কাছে নিয়ে আসুন। ছেলে যতদিন ওখানে থাকবে সংকট আরো তীব্র হবে। আমার মনে হয়, নতুন জীবনের স্বপ্ন দেখে ভাবী সজীবকে সহ্য করতে পারছে না।

— আমি তাকে বলেছি, আপনার বাজারদর অনেক উপরে উঠছে, জানি। তার পরেও বলছি অতীতের সব কিছু ভুলে যান, আসুন, আমরা একটা ভালো বাসা নিই, সজীব, আপনি আমি একসঙ্গে থাকি।

— প্রতি উত্তরে ভাবী কী বলেছে।

— বলেছে, ওই কুণ্ডা তরে না তালাক দিছি, এসব বলতে তর লজ্জা করে না। বলেই ফোন রেখে দিল।

— ভাবীর মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। আপাতত আপনি তাকে ফোন দেবেন না।

— আশেক ভাই, আমি যে ওরে ভুলতে পারি না, হাজার হলেও আমার সন্তানের মা। একথা বলেই খান সাহেব আবার কান্না শুরু করলেন। তার আজকের কান্নায় আশেক হতবিস্ত্রল

হয়ে পড়ল। ফোন রেখে দিয়ে ভাবতে লাগল কী করা যায়।

কবি আশেক মাহমুদের একটি ভয়, ওই অন্ধকার ঘরে যদি খান সাহেব কাদতে কাদতে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন, অথবা আত্মহত্যা করেন। তাই আধা ঘণ্টা পরে আবার ফোন দেয় তাকে। শাহবাগ আসার অনুরোধ করে। এবার খান সাহেব অনেকটা স্বাভাবিক। কবিকে তিনি আসার ব্যাপারে আশুস্ত করেন।

গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি থাকার কারণে খান সাহেব দাঁড়িয়েছিল জাতীয় জাদুঘরের ছাউনিতে। ওখানে বেশ কয়েকজন তরুণ-তরুণীও দাঁড়ানো। খান সাহেব দুজন তরুণ-তরুণীর সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলছিলেন তরুণীটি বেশ সুন্দরী নাম অনমিকা মানবী। তরুণের নাম লিটন। কবি আশেক মাহমুদ যাওয়ার পর খান সাহেব আরো উৎফুল্ল হলেন। কাকভেজা হয়ে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন মোহন ভাই, যিনি অ্যারোমেটিক ইঞ্জিনিয়ার, কবি ও সঙ্গীতশিল্পী। আশেক তাকে ডাকলেন। রাকিব খান মানবীর সঙ্গে পরিচয় করে দেয়ামাত্র তিনি গান শুরু করলেন। আশেক দীর্ঘদিন থেকে লক্ষ করে আসছেন, মোহন ভাইয়ের সঙ্গে কোনো সুন্দরী নারীর পরিচয় হলেই তিনি উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন এবং ওই নারীর নামের সঙ্গে অথবা সৌন্দর্যের সঙ্গে মিলিয়ে গান গান। এটা তার একটা অদ্ভুত গুণ।

আজো তাই করলেন। গান শুনে খান সাহেব কিয়া বাত কিয়া বাত বলে উঠলেন। খানিক পরে মোটরসাইকেলে এলো কবি ও আবৃত্তিশিল্পী সনাতন উল্লাস, তার শরীরও ভেঙা। ও এসে মানবীর ওড়নায় মুখ মুছল, ওর হাতের আঙুল টিপে দিয়ে বলল, জাদুঘরের সামনের যে বড় তালগাছটা, তার মাথায় থাকে মানবী। আমি ওকে সেভাবেই দেখি ও মূল্যায়ন করি। বোঝা গেল ওদের সম্পর্কের গভীরতা। কোন ফাঁকে মোহন ভাই চলে গেছে ওরা টেরও পায়নি। একটু আগে বৃষ্টি থেমে গেলে

আড্ডার জায়গায় এসে সবাই বসে। এর মধ্যে কবি শাহজাহান আবদালীও এসেছে। এসেছে ফারুক ভাই ও জুয়েল। সবাই যখন পাশাপাশি নতুনভাবে আড্ডা শুরু করতে যাবে, তখন মানবী সনাতনের মোটরসাইকেলের পেছনে, ইডেন কলেজের হোস্টেলে যাচ্ছে। পেছন থেকে হাত নেড়ে ও সবাইকে টাটা দিল। ওর হাসি ছড়িয়ে পড়ল সর্বত্র।

মানবী চলে যাওয়ার রেশ না কাটতেই, খান সাহেব রাস্তার ওপারে পারফিউম কোম্পানি হা-এর গাড়ি থেকে দুজন তরুণীকে ডাকল, ওদের একজনের নাম সুমনা অন্যজন অ্যানি। আজ ওদের সঙ্গে পরিচয়। দুজন তরুণীই বেশ সুন্দরী ও স্মার্ট।

ওরা খান সাহেবকে বন্ধু সন্মোদন করল। খান সাহেব ওদের সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। আশেক খান সাহেবকে জিজ্ঞেস করল, সুহি আসবে কিনা। উত্তরে খান সাহেব বললেন, সুহি যেহেতু ফারুক ভাইয়ের ভক্ত, তিনিই ফোন দিক। ফারুক ভাই সুহিকে ফোন দিলেন। এর মধ্যে গান শুরু হলো, জুয়েল নেচে নেচে হাত নাড়িয়ে দরাজ কণ্ঠে গান গাইতে শুরু করলেন। ওর গানে সবাই মুগ্ধ। ও গাইল লালনের জাত গেল জাত গেল, লালন মইলো জল পিপাসায় থাকতে নদী মেঘনা—

এমন বেশ কয়েকটি গান গেয়ে মাত করে দিল জুয়েল। এর মধ্যে সনাতন ফিরে এসে বলল কবির

দেখছি কবিতা বাদ দিয়ে সঙ্গীতচর্চায় মত্ত। ওর কথা শুনে আশেক বলল, সঙ্গীত যতটা সরাসরি আকর্ষণ করতে পারে, বেদনা ঝরাতে পারে কবিতা হয়তো তা পারে না। আড্ডার কবির বিরহ কাতর বলেই হয়তো তারা গানকেই প্রাধান্য দিচ্ছে। আবৃত্তি নিশ্চয়ই হবে। আপনি শুরু করুন। সনাতন দুটো কবিতা আবৃত্তি করল দরাজ কণ্ঠে। এর মধ্যে সুহি এসে হাজির। এলো রাসেলও। সুহি এসে এবার রাকিব ও আশেকের মাঝে বসল। ওর জন্য আগেই জায়গাটি নির্ধারিত ছিল। সুহিকে উদ্দেশ্য করে রাকিব বললেন, শাহবাগে প্রেম নেই। এর উত্তরে সুহি বলল, ‘কে বলেছে শাহবাগে প্রেম নেই, আপনাদের প্রেমের টানেই তো এসেছি।’ সুহির কথায় যারপরনাই আনন্দিত হলেন খান সাহেব। সুহির উদ্দেশ্যে ফারুক ভাই আর খান সাহেব দ্বৈত কণ্ঠে পুরনো দিনের হিন্দি গান ধরলেন। সুহি মুগ্ধ, বিমোহিত। তাকে আজ দেখে কেউ-ই বলতে পারবে না যে, তার জীবনের ওপর দিয়ে ঝড়-বৃষ্টি হয়েছে, আর তিনি কেবলই কাদছেন।

আঠারো।

রাকিবের জঞ্জালময় অধ্যায়ের অবসান ঘটিয়ে নতুন জীবনের স্বপ্ন দেখছে মিনারা বেগম। রাকিব এত বছর বিষফোঁড়ার মতো ছিল। ওকে তালাক দেয়ার পর ওর মনটা বেশ হালকা। রাকিব স্বপ্নচাষী মানুষ, স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসে। নিজের উদাস মনটাকে যেখানে-সেখানে মেলে ধরতে চায়। রাকিবের মনের এই বিশেষ দিকটা ও জানত না। বিয়ের পর আস্তে আস্তে টের পেতে শুরু করল। যারা আড্ডাবাজ পুরুষ, তাদের জীবনেও একটা শৃঙ্খলা থাকে।

যেমন আড্ডা মেরে যথাসময়ে বাসায় যাওয়া। কিংবা গুরুত্বপূর্ণ কাজের সময় আড্ডাকে প্রাধান্য না দেয়া। রাকিব আড্ডাবাজ অর্থাৎ সময়ের দিক থেকে বিশৃঙ্খল। একদিন রাত ১০টায় ফেরে তো অন্যদিন ১১টায়। কোনো কোনো দিন আরো গভীর রাতে, হয়তো রাতই কাবার করে দেয়। পুরুষের এই ধরনের স্বভাব তার একেবারেই না পছন্দ।

বিয়ের কিছুদিনের মাথায় মিনারা টের গেল, মামি রোখসানার প্রতি তার বেশি আগ্রহ। রোখসানা যেহেতু মিনারার বান্ধবী, আবার মামি। সুতরাং রোখসানার রাকিবের বাড়িতে যাতায়াত আছে। এই সুবাদে রোখসানার সঙ্গে তার গভীর বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে— শেষ পর্যন্ত বিষয়টি মিনারার কাছে অসহনীয় ঠেকে। এ ব্যাপারে রাকিবকে নিষেধ করা

সত্ত্বেও, সে চলে তার নিজের মতো করে। রাকিব যে পরনারীতে আসক্ত, এটা টের পেয়েছে সে মোবাইলে কথা বলার ভঙ্গি দেখে। গভীর রাতে কার সঙ্গে কথা বলত রাকিব, সে কি তার বিশেষ কেউ। এ ব্যাপারে মিনারা কিছু বললেই রাকিব ক্ষেপে যায়, বলে ব্যবসাসংক্রান্ত আলাপ করছে।

এত রাতে কেউ ব্যবসাসংক্রান্ত আলাপ করে। রাকিব দেখল আর কথা বলার ক্ষেত্রে মিনারাই প্রধান বাধা। তাই সে তাকে ঘরে রেখে বাইরে তাল্লা লাগিয়ে দিত। এমন আচরণ একজন নারী কতদিন সহ্য করতে পারে?

এক রুমে তিনজন থাকা যায় না। এটা বার বার বলা সত্ত্বেও রাকিব মিনারার কথায় কোনো গুরুত্ব দেয় না। বাড়ি সংস্কারের কথা প্রায় বলত মিনারা কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। ফলে ধীরে ধীরে

মিনারার মন বিষিয়ে ওঠে। মিনারা কখনো যদি রাকিবের কাছে হাত খরচের টাকা চায় তা হলে ওই টাকা রাকিব দিতে গড়িমসি করে। তার একটিই ইতিবাচক দিক হলো মিনারাকে নিয়ে সে এদিক-সেদিক ঘুরতে চায়। ওকে নিয়ে বহু জায়গায় ঘুরেছে ও সে।

ঘুরে বেড়ানোটা তার নেশা। বিয়ের প্রথম দিকে ঘুরে বেড়ানোটা মিনারা ভালোই উপভোগ করত। রাকিব বেশ রোমান্টিক এটাও সত্য। সজীব পৃথিবীতে আসার পর ও বদলে যেতে থাকে। ধীরে ধীরে রাকিবের বাইরের জগতের প্রতি আকর্ষণ বাড়ে। গভীর রাত পর্যন্ত বাইরে আড্ডা মারে। মিনারা বেগম এ ব্যাপারে নিষেধ করা সত্ত্বেও ও ঘরমুখী হতে পারেনি। মিনারা যা বলে, রাকিব তার উল্টো পথে চলে। স্ত্রীর ইচ্ছাকে প্রাধান্য দেয়ার ক্ষেত্রে তার কোনো আগ্রহ নেই। মিনারাও স্বাধীনচেতা মহিলা। সংসারের খুটিনাটি বিষয় নিয়ে রাগ করে সজীবকে নিয়ে অন্তত পাঁচবার মায়ের কাছে চলে গিয়েছে সে। মিনারাকে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে রাকিব যে খুব অন্তরিক তাও নয়। ওর বক্তব্য হচ্ছে ‘ও চলে গেছে নিজের ইচ্ছায়, আসবেও নিজের ইচ্ছাতেই।’ রাকিবের এই একগুঁয়েমি স্বভাবের কারণেই দুজনের মধ্যে দূরত্ব বৃদ্ধি পেতে থাকে।

মিনারা লক্ষ করেছে তার বান্ধবীদের স্বামীরা স্ত্রীর কথামতো চলে। স্ত্রীর ইচ্ছা পূরণের জন্য তারা সব সময় চেষ্টা করে। তাদের মধ্যে আগের মনোভাব ও স্ত্রীর প্রতি সহমর্মিতা রয়েছে অথচ রাকিব তার প্রতি সেভাবে মনোযোগী নয়।

সংসারের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন না করলে, সংসারের প্রতি উদাসীন থাকলে কেবল অসহায় স্ত্রীরাই বিষয়টি মেনে নেয়। কিন্তু যে স্ত্রী স্বাবলম্বী, যার চাকরি রয়েছে সে তো মেনে নেবে না। মেনে নেয়নি মিনারাও। ধীরে ধীরে তার ভেতর যখন ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হয়েছে, তখনই সে রাকিবের সংসার ছেড়ে মায়ের কাছে চলে এসেছে।

রাকিব তাকে, ফিরিয়ে নিতে চেয়েছে বার বার। মিনারার একটাই শর্ত আলাদা ফ্ল্যাট নিতে হবে। ওই অন্ধকার কুঠরিতে সে একমাত্র সন্তান সজীবকে নিয়ে যাবে না। রাকিব স্ত্রী-সন্তানের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করেনি, চিন্তা করেছে অর্থের কথা। বিপুল অঙ্কের অর্থ খরচ করে মিনারাকে তিনি মর্যাদার আসনে বসাবেন না। এটাকে হয়ত তিনি অপচয় মনে করেন। তিনি এও মনে করেন, এটা তার সামর্থ্যের বাইরে। অথচ প্রতিমাসে গড়ে এর চেয়ে বেশি টাকা তিনি বন্ধু-বান্ধবীদের পেছনে খরচ করছেন, আড্ডার লোকজনকে খাওয়াচ্ছেন, দামী উপহার দিচ্ছেন।

তার এই মানসিকতায় একটি বিষয় মিনারার কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তা হলো ঘর গোছানো কিংবা ঘরের আনন্দের চেয়ে বাইরের আনন্দে প্রাণ আছে, জীবনের উদ্দীপনা আছে, আছে সজীবতা। এ ক্ষেত্রে কবি আশেক মাহমুদ তার বিপরীত। সে সংসারকে গুরুত্ব দেয় সবচেয়ে বেশি। সংসারে কোনো বিষয়েই আঁচড় লাগতে দেয় না। সংসার ঠিক রেখে সে বাইরে হৈচৈ করে আড্ডা মারে। আশেক আনন্দোপভোগ করে সংসার থেকেও, আড্ডা থেকেও। এ ক্ষেত্রে রাকিব এক পেশে। যার

কারণে তার সংসার টেকেনি। আশেক সুখে সংসার যাপন করছে।

মিনারার পরিবারের সদস্যরা রাকিবের সঙ্গে সম্পর্কের বিষয়টি বুলিয়ে রাখতে পক্ষপাতি ছিল না। মিনারার আত্মীয়দের ভাষায়, রাকিব একটা বাউন্ডেল, সংসার-বিরাগী মানুষ। ও তোমাকে কখনই কদর করবে না। তোমাকে সংসারে ফিরিয়ে নেয়ার আগ্রহ ও মনোযোগ কোনোটাই তার নেই। মুখে মুখে যা করছে বা বলছে এসবই ওর অভিনয়। তোমার তাকে তালাক দেয়া উচিত। তোমার জীবনের মূল্য আছে। কারণ বিগত ৫ বছরে তার ভেতরে কোনো পরিবর্তন হয়নি। আত্মীয়-স্বজনরা যখন চাপ প্রয়োগ করতে লাগল, এমনই সময় এক বিয়ের অনুষ্ঠানে পরিচয় হয় সামাদ সাহেবের সঙ্গে। তিনি পাশের মহল্লায় থাকেন। সামাদ সাহেবের চরিত্র রাকিবের বিপরীতমুখী। সামাদ সাহেব শান্ত, ভদ্র, বিনয়ী, ত্যাগী। পরিচয়ের পর থেকে না চাইতেই তাকে অনেক কিছু দিয়েছে। সামাদ সাহেবের উজ্জল যে দিকটি তা হলো, মিনারা যা বলে, তাই শোনে। আজ ১০ হাজার টাকা লাগবে তো পাঠিয়ে দেন। দেখা হলে জোর করে মার্কেটে নিয়ে গিয়ে দামি শাড়ি, থ্রি-পিস গয়না কিনে দেন। দামি রেস্তোরাঁয় খাওয়ান। গত মাসে ৪০ হাজার টাকা দিয়ে একটি স্মার্ট ফোন কিনে দিয়েছেন। মাত্র ১ বছরের মাথায় সামাদ সাহেব তার মন জয় করে ফেলেছেন। এ পর্যন্ত একবারও ওর সঙ্গে ধমকের স্বরে কথা বলেননি। মিনারার পরিবারের সবাই সামাদ সাহেবকে পছন্দ করেন। এমন অবস্থায় রাকিবের সঙ্গে সম্পর্ক টিকিয়ে রেখে মিনারার কোনো লাভ নেই, বরং দিনে দিনে আপদ আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাই মিনারা তাকে তালাক দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। স্বচ্ছন্দময় অভিজাত জীবনযাপন সবাই চায়, সবাই চায় ভালোবাসা ভালো ব্যবহার। এমন জীবনের হাতছানি থাকতে মিনারা কেন তা উপেক্ষা করবে, পায়ে ঠেলে দেবে।

রাকিবদের দুটো জায়গায় রয়েছে এটা ঠিক, তবে ওই জায়গা নিয়ে ভাই-বোনদের মধ্যে যে মতবিরোধ, দ্বন্দ্ব তীব্র তাতে, ওই জায়গার ভবিষ্যৎ অন্ধকারো। তাই ভেবে-চিন্তেই মিনারা রাকিবকে তালাক দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। রাকিবকে তার এখন আর সহ্য হচ্ছে না। এই শহরে রাকিবই তার বড় শত্রু। সে তার জীবনকে বিপন্ন, বিষন্ন করে তুলেছে। ভালো স্বামী পাওয়া যে ভাগ্যের ব্যাপার তা মিনারা এখন হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে। তাই ওর কাছ থেকে সে মুক্তি চেয়েছে। কিন্তু পুরোপুরি মুক্তি পায়নি। ছেলে সজীবের সূত্র ধরে তার সঙ্গে বাধ্য হয়ে যোগাযোগ রাখতে হচ্ছে। ছেলেকে নিয়ে যাওয়ার কথা বললে সে গা করে না। এ ক্ষেত্রে মিনারার প্রশ্ন, বউ-ছেলেকে ভালোবাসলে তো আগেই ফ্ল্যাট ভাড়া নিত। এখন ছেলেকে সে কোথায় রাখবে?

রাকিব যেখানে, যে পরিবেশে ঘুমায় সজীব তো ৫ মিনিটও সেখানে থাকতে পারবে না। তা হলে সজীব থাকবে কোথায়? এই প্রশ্ন মিনারার সামনে বড় হয়ে দেখা দেয়। রাকিব একবার তাকে বলেছিল, সজীবকে সে সাবলেটে রাখবে অথবা বাসা সংস্কার করবে, দুটো ক্ষেত্রে তার যত টাকা খরচ হবে, ওই টাকা খরচের তার সামর্থ্য আছে; কিন্তু মানসিকতা নেই। সুতরাং মিনারার মনে হচ্ছে

সজীবকে সে নেবে না। মিনারা সামাদ সাহেবের কাছে চলে গেলে সজীবকে নানির কাছেই থাকতে হবে। মিনারা যখন এসব ভাবছে, ঠিক তখনই রাকিব তাকে ফোন দেয়। কী করছেন?

- আপনাকে না ফোন দিতে বারণ করেছে।

- কী করব বলুন। আপনার মুখ আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলেই আমার কান্না পায়। আপনার মতো মায়াবী মুখ পৃথিবীতে একটিও দেখিনি।

- মিথ্যা আর অভিনয়ই আপনার জীবনের প্রথম সম্বল। একথা আমাকে আজই শুধু বলেননি গত ২৫ বছর ধরে বলে আসছেন।

একথা বলেই মিনারা ফোন রেখে দেয়। মিনারা তার একমাত্র পুত্র সজীব কিংবা তার পাগল বাবা রাকিব, কারো কথাই ভাবতে চাচ্ছে না। সে ঈদের পরই নতুন জীবনে পদার্পণ করতে যাচ্ছে। বাকি মাত্র ২২ দিন। মিনারার ধারণা ও যখন সামাদ সাহেবের সংসারে যাবে তখনো তার রাকিব তাকে ফোন দেবে। কারণ পাগলের মাত্রাজ্ঞান থাকে না।

যদি সিম পরিবর্তনও করে সে, তারপরেও নতুন নাম্বার কোনো আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে জোগাড় করবে। সুতরাং তালাক দিয়েও ওর হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে না। তবে রাকিবের কাছে যদি সজীব থাকে তবে মিনারা কিছুটা হলেও মুক্তি পেত। কেবল মিনারা বেগমেরই নয়, সজীবেরও বাবা সম্পর্কে যে মানসিকতা তাও ইতিবাচক নয়।

সজীব মনে করে, তার মায়ের জীবন তার নিজের জীবনকে বাবাই এমন পর্যায়ে নিয়ে এসেছে। আগে থেকেই যদি বাবা মায়ের কথামতো চলাফেরা করত তাহলে বর্তমান অবস্থার সৃষ্টি হতো না।

মিনারা এও ভাবে সামাদ সাহেবের সংসার শুরু করার পর রাত্তায় যদি রাকিবের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়, তখন কী বলবে সে। পাগল হোক আর যাই হোক এক সময় তো তার ঘর করেছে সে। তার সন্তানের জননী সে। নাহ এসব বিষয় মিনারা ভাবতে চাচ্ছে না। ওই গানের মতো, ‘যা হবার তা হবেই হবে, যা হবার তা হবে না— এটা কোনো ভাবনা না।’ রাকিবের হাসিটা তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। রাকিবকে অচেনা দূরবর্তী মানুষ মনে হয়। তার এও মনে হয় কোনো এক জনপদে ওর সঙ্গে একবারই দেখা হয়েছিল। দ্বিতীয়বার দেখা হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। কারণ রাকিবের জীবন থেকে সে চিরতরে হারিয়ে যাচ্ছে।

উনিশ।
রুটিনমারফিক আজো ফোন দিল কবি আশেক মাহমুদ। দুটো ফোনই বাজছে, কেউ ধরছে না, কেউ বলতে ওই অন্ধকার প্রকোষ্ঠে রাকিব একাই থাকে। ফোন যখন ধরল না, তখন তার মনে হলো হয়তো তিনি ঘুম থেকে ওঠেননি। একপর্যায়ে আশেক ঘড়ি দেখে। বেলা দুটো। এই সময়ে তো তার ঘুম থেকে ওঠার কথা। ফোনে না পেয়ে হতাশ হলো কবি।

মিনিট পাঁচেক পরে খান সাহেবই ফোন দিলেন। বললেন,

- কবি ভাই ফোন দিয়েছিলেন,

- হ্যাঁ। ফোন দিয়েছিলাম।

- কেন, দিয়েছিলেন ভাই?

- আপনার খবর জানার জন্য।

-ও এই কথা, আপনার ভাবীকে বললাম, আপনাকে আমি আকাশ সমান ভালোবাসি। দেখুন সব

পুরস্কার তো আর্থিক সক্ষমতা সমান থাকে না। তাই বলে কি স্বামীর ঘর করে না? আপনি যদি ফিরে না আসেন তা হলে গাছের নিচে বসে কেবল কাঁদবো। কেঁদে কেঁদে মরবো।

—ভাবী কী বলল।

—উনি বললেন, আপনি মরলে ভাববো আমার জন্য কেউ মরেছে। ও আমাকে এই কথা বলতে পারল, জানেন কবি ভাই, বিয়ের পর ওর দিকে তাকিয়ে কাঁদতাম, ওটা ছিল আনন্দের কান্না, ওকে পাওয়ার কান্না।

—ভাবীর প্রতিক্রিয়া কী ছিল?

—ও বলত, অভিনয় করো। এভাবে বছরের পর বছর ও আমাকে উপেক্ষা করেছে। ওকে আমি সারাক্ষণ আদর করতাম, ও বলত তুমি পাগল হয়ে গেছ, এখন আর স্বাভাবিক মানুষ নেই।

—খান ভাই, এসব আলোচনা ও স্মৃতিচারণ মূল্যহীন। এসব বাদ দিন।

—কীভাবে বাদ দেব ভাই, ছেলের সঙ্গে রাগারাগী করে ছেলের মোবাইলটা আছাড় দিয়েছে। মোবাইল তো নয় যেন, আমাকে আছাড় দিয়েছে। একথা শুনে আমি ওদের বাড়ির সামনে গিয়ে চিৎকার করলাম। ও নিচে নেমে এলো। আমি ওকে বললাম এসব বাদ দেন। সংসারে ফিরে আসুন। আমরা নতুনভাবে সংসার গুছাই। ও আমার কথা শুনলো না, হঠাৎ গेट বন্ধ করে দিল। দুঃখের কথা কী আর বলব আপনাকে, আমার স্বপ্ন ছিল, আমার ছেলে আমার সামনে ওকে আমি বলে উচ্চশব্দে ডাকবে আর আমি শুনব। সে সৌভাগ্য আর হলো না।

—অনুগ্রহ করে এসব ভাবনা মাথা থেকে দূর করে ফেলুন। পাঁচজন বান্ধবীকে ফোন দিন, দু'একজনের সঙ্গে ঘুরে বেড়ান, দেখবেন সব ঠিক হয়ে গেছে।

—ব্যাপারটা আপনি যত সহজ মনে করেছেন ততটা নয়। আমার পক্ষে ওকে ভোলা সম্ভব নয়। তা ছাড়া আমি তো এখন কোনো মেয়েকে ফোন দিই না।

—কেন, বান্ধবীরা কী অপরাধ করেছে।

—নাহ, আর কাউকে ফোন দেব না, শাহবাগ দেখা হলে আড্ডা মারব। আমি কেবলই ভাবী আমার একমাত্র ছেলের ভবিষ্যৎটা নষ্ট হয়ে গেল। আমার মা গ্রামের মানুষ, ছেলেমেয়েদের কত আদর করতেন। আর ও বলে 'তোমার ছেলে তুই নিয়া যা।' —এটাই বাস্তবতা। বাস্তবতা আপনাকে মেনে চলতে হবে।

—হৃদয়ের আকৃতির কাছে সব বাস্তবতাই পরাজিত।

এ কথা বলেই আবার হাউমাই করে কাঁদতে শুরু করেন তিনি। তার কান্না খামে না। রাকিবের কান্না দেখে আশেক পড়ল বিপদে। আজ তাকে সে সন্ধ্যায় শাহবাগে আসতে বলল। প্রথমে রাকিব গড়িমসি করেন। পরে তিনি নিজেই সবাইকে আসতে বললেন। আজ আবার আড্ডা জমে উঠল। নাভিদ আজ নেচে নেচে গাইল—

—‘আমার ভাল লাগে না ভালোবাসা মিছে মায়ার সংসারে, ভংচং ভংচং লাগে দুনিয়াডারে।’

এই গান শুনে রাকিব বেসামাল হয়ে পড়লেন। আজ আড্ডার জন্য তিনি লাল গোলাপের পাপড়ি নিয়ে এসেছেন। আজ সবার মাথার উপরে এই পাপড়ি ছিটাবেন তিনি। একদিকে সুই অন্যদিকে আশরাফী দুজনের মাথার ওপর ফুল ছিটিয়ে দেন তিনি। গোলাপের পাপড়ি ছিটানোর কারণে দুজন সুন্দরী আরো মোহনীয় হয়ে উঠল। ফুলের পাপড়ি ছিটিয়ে পড়ল রাজপথে। হালকা বাতাস প্রবাহিত হতে লাগল। দু'এক ফোটা বৃষ্টিও এলো। বৃষ্টির মধ্যেই গান চলছে। এবার নাভেদ আরো একটি গান ধরলেন, ‘কী এমন ধন দিতে পারি, যাতে তোমার মন রাজি, তোমায় পেলে পরানে বাঁচে।’ ফারুক ভাই গাইলেন— ‘তুমি যে আমার কবিতা, প্রেমের নাম বেদনা...’ রাকিব খান কেয়া বাত কেয়া বাত বলে আবার ফুলের পাপড়ি বর্ষণ করলেন। যেন এটাই জীবন, এটাই বেঁচে থাকা।

খান সাহেব আজকের মতো আনন্দ আর কোনো

আড্ডায় পাননি। যেন তিনি আজ আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছেন। তিনি আজ ভুবন চিল, মাছরাঙা। উত্তরবঙ্গের এক ভদ্রলোক হাতিরঝিলে তাকে বলেছিল, সারস পাখি রাতের বেলায় ওড়ে, আজ খান সাহেব রাতে উড়বে, উড়তেই থাকবে। একে একে আড্ডার সবাই চলে গেছে। তিনি একা বসে আছেন। তার সামনে ফুটপাথে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে গোলাপের লাল পাপড়ি। পাপড়িগুলোও আজ তার মতো অসহায়। রাত গভীর হলে তিনি বাসার দিকে পা বাড়ান।

বিশ.

ঘরের অন্ধকার আজ বেশি গাঢ় মনে হচ্ছে তার কাছে। তিনি শুয়ে আছেন। ঘুম আজ তার দু'চোখ স্পর্শ করছে না। তিনি একটি সুন্দর গোছানো ভালোবাসাপ্রবণ সংসার চেয়েছিলেন, পাননি। অন্য নারীর ভালোবাসা প্রত্যাশা করেছিলেন, তাও পাননি। আক্ষেপ, শূন্যতা, হাহাকার, চোখের জলই তার প্রধান সম্বল। মিনারা চলে যাওয়ার পর অন্তত ৫ বার আত্মহত্যা করার চেষ্টা চালিয়েছেন তিনি, পারেননি।

এবার যখন সে তাকে তালুক দিল, তখন তিনি টানা সাতদিন ফ্যানের সঙ্গে রশি লাগিয়ে রেখেছেন। তার স্ত্রী সন্তান ফিরে না এলে জীবন অর্থহীন। আর এই অর্থহীন জীবনের সমাধানই হচ্ছে আত্মহত্যা। এই বোধ আজ তার মধ্যে তীব্র হচ্ছে। তিনি অন্ধকারে শুয়ে আছেন ধুলোমলিন সেই জীর্ণ খাটে। তিনি রশির দিকে তাকানোর চেষ্টা করেন। গাঢ় অন্ধকারে আজ রশিটা দেখা যাচ্ছে না। অন্ধকার ভেদ করে হাসির শব্দ ভেসে আসছে। কে একজন বলছে, ‘তুমি একটা পাগল, যা বলো সবই মিথ্যা। তুমি হচ্ছে এ সমাজের একজন বড় অভিনেতা, সংসারবিমুখ ভালোবাসাহীন একজন মানুষ, ভণ্ড প্রতারক। তুমি হচ্ছে কফিনবন্দি লাশ।’

১৬, জুন ২০১৬





নাটক

আমি ও রবীন্দ্রনাথ

নূনা আফরোজ

[শূন্য মঞ্চ। যে কোনো একটা উঁচু লয়ে কোনো মিউজিক বাজছে। ডাকতে ডাকতে মঞ্চে ঢোকে নেহাল।]

নেহাল : অঁথে, অঁথে... কোথায়? কিরে এখানো তৈরি হোসনি? আরে বাবা সাড়ে পাঁচটা বাজে।

[অঁথে আসে। নেহাল মুগ্ধ হবার ভান করে তাকিয়ে থাকে। অঁথে চোখের সামনে হাত দিয়ে ঘোর ভাঙবার চেষ্টা করে।]

অঁথে : কি রে বোবা হ'য়ে গেলি নাকি, হুম?

নেহাল : এ তো দেখছি বনলতা সেন! (দুঃস্থমি করে আবৃত্তি করে) চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার দিশা, মুখ তার শাবিত্তীর কারুকার্য। অতিদূর সমুদ্রের পর হাল ভেঙে যে নাবিক হারিয়েছে দিশা, সবুজ ঘাসের দেশ যখন সে চোখে দেখে..... কি দেখে কি দেখে.....তারপর যেন কি.. তারপর যেন কি.....

অঁথে : থাক আর কি যেন.... কি যেন করতে হবে না। যাচ্ছি শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথের কুঠিবাড়ি দেখতে আর আমাকে দেখে তোর মনে হলো জীবনানন্দের বনলতা সেন, কেন রবীন্দ্রনাথের লাগণ্য বা নন্দিনী মনে হতে পারত না তোর?

নেহাল : ইয়েস- রাইট, রাইট, রাইট। 'কালের যাত্রার ধ্বনি শুনতে কি পাও? তারি রথ নিতাই উধাও, জাগাইছে অগুরীক্ষে হৃদয় স্পন্দন- চক্রে পিষ্ট আঁধারের বক্ষ ফাটা তারার দ্রন্দন"

অঁথে : বাবো আমার বন্ধুটির ওপর হঠাৎ জীবনানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ভর করল কী ভাবে?

নেহাল : জী ম্যাডাম আপনার সঙ্গে কুষ্টিয়ার শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথের কুঠিবাড়ি দেখতে যাচ্ছি এখন যদি দু'চার লাইন রবীন্দ্র-নজরুল-জীবনানন্দ না বলতে পারি তাহলে কি মানায়?

অঁথে : ইয়েস, রাইট রাইট।

নেহাল : তাই কাল বিকালে শাহবাগ থেকে শেষের কবিতা, বনলতা সেন আর সন্ধিতা কিনে ফেললাম।
অথৈ : দাঁড়া দাঁড়া। তুই নেহাল, শাহবাগ গিয়ে শেষের কবিতা, বনলতা সেন আর সন্ধিতা কিনে ফেললি?

নেহাল : হুম.... বহু কষ্টে শেষের কবিতার চার লাইন আর বনলতার দু'লাইন মুখস্থ করলাম। ভেবেছিলাম কুঠিবাড়ি দেখতে দেখতে আবৃত্তি করে তোকে চমকে দিব কিন্তু তোকে এভাবে দেখে...
অথৈ : এই এভাবে দেখে কিরে। এভাবে কিরে...?
নেহাল : না না না, সুন্দর সুন্দর।
অথৈ : ইয়েস, সুন্দর।

নেহাল : ভয়ঙ্কর সুন্দর।
অথৈ : ভয়ঙ্কর সুন্দর?
নেহাল : খুব সুন্দর, খুব সুন্দর। এত সুন্দর যে আর ভেতরে রাখতে পারলাম কই, একেবারে উগড়ে দিলাম।

অথৈ : বাহ বাহ, খুব ভালো.... খুব ভালো। তুই রবীন্দ্রনাথের চার লাইন মুখস্থ করেছিস, জীবনানন্দের দু লাইন মুখস্থ করেছিস, অবশ্য অথৈর বন্ধু হতে গেলে এটুকুতো দরকারই। তাই না?

নেহাল : চেষ্টা করছি।
অথৈ : যদিও আবৃত্তির আ-ও হয়নি। আর বেশি না বেশি না উচ্চারণে মাত্র আটটি ভুল।
নেহাল : তুই সবসময় আমার উচ্চারণের ভুল ধরিস। এত ফাটাফাটি আবৃত্তি করলাম..

অথৈ : (নেহালের বলার ঢং-এ অথৈ হেসে ফেলে।
হঠাৎ নেহালের দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখে) এই তোকে না আমি পাঞ্জাবি আর ধৃতি পরতে বলেছি?

নেহাল : মাফ চাই বন্ধু, মাফ চাই আমি ওগুলো পরতে পারব না। তুমি রবীন্দ্রনাথের নাতি।
অথৈ : (রেগে) এই ফাজলামো করবি না।

নেহাল : ওকে ওকে তুই রবীন্দ্রনাথের ভক্ত। না না শুধু ভক্ত না মহাভক্ত। তুমি শাড়ি পড়েছ, লাল টিপ পড়েছ। ভালো.... ভালো আমাকে বলো না।
অথৈ : উহ তুই না একটা.....

নেহাল : গাধা। (দুজনে হেসে ফেলে)..... ইস চল চল দেরি হয়ে গেছে অনেক। সন্ধ্যা হয়ে গেলে তোর এত সাধের কুঠিবাড়ি আজ আর দেখতে পারবি না।

অথৈ : চল চল আর কথা নয়.....(দুজনে বেরিয়ে যায়, লাইট অফ হয়। মোর বীণা সুরটি চলতে থাকে)

(মঞ্চের যেদিক দিয়ে ওরা বেরিয়ে যায় তার উল্টোদিকে জোন লাইটে দাঁড়ানো অথৈ। আসে নেহাল)

নেহাল : অথৈ কুঠিবাড়ি ১৫ মিনিটের মধ্যে বন্ধ হয়ে যাবে। এখন আর ভিজিটর অ্যালাও করছে না, কাল সকালে দেখতে হবে।

অথৈ : মানে আজ আমরা ভেতরে ঢুকতে পারব না?
(নেহাল ওর কান্না কান্না মুখটা মজা করে দেখে, হেসে ফেলে)

নেহাল : পাবেন ম্যাডাম। আমি অনেক বলে কয়ে রাজি করিয়েছি। আধাঘণ্টার পারমিশন দিয়েছে।

অথৈ : সত্যি!
নেহাল : হ্যাঁ। বলেছি, রবীন্দ্রনাথের মহাভক্ত। আজই যদি কুঠিবাড়ি দেখতে না পারে নির্ধাত হার্ট অ্যাটাক করে মারা যাবে। এখন চল আর দেরি করিস না।
অথৈ : আমি দেরি করছি? তুই... তো দেরি করিয়ে দিচ্ছিস উল্টোপাল্টা কথা বলে।

নেহাল : এখন আমার দোষ না আমার দোষ?
অথৈ : না আমার দোষ। এখন চল।
(লাইট চেক্স হয়)

(মঞ্চে কুঠিবাড়ির আলো দৃশ্যমান হতে শুরু করে। মোর বীণা গানটি বেজে ওঠে। সেই সুরে উচ্ছ্বসিত নেহাল এবং অথৈ কুঠিবাড়িতে প্রবেশ করে এবং ঘুরে ঘুরে পুরো কুঠিবাড়ি দেখতে থাকে। নেহাল একটা ছবি দেখতে দাঁড়িয়ে যায়। অথৈ এগিয়ে গিয়ে একটা সিঁড়িতে দাঁড়ায়)

অথৈ : নেহাল কোথায় তুই? আমি দোতলার সিঁড়িতে। তাড়াতাড়ি আয়। আমাকে একা পেয়ে রবীন্দ্রনাথ না আবার জাপটে ধরে।

নেহাল : (চাপাস্বরে চোঁচিয়ে) হুম তাহলে তো তুই খুশিই হবি।

অথৈ : (হাসতে হাসতে) তা একটু হই।
(সিঁড়িতে অথৈ পা রাখতেই গাটা কেমন হুমহুম করে উঠল। নেহাল অনেকটাই পেছনে পড়ে গেছে। সিঁড়িতে পা রাখতে যাবে হঠাৎ একটা কণ্ঠস্বর। অথৈর মাথা নিচু ছিল। কণ্ঠস্বরে চমকে তাকায়। যুবক রবি হাত বাড়িয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।)

রবি : এসো.....(অথৈ অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে যেন পৃথিবীটা থেমে গেছে) কই এসো.....তুমিতো আমাকেই এসপেক্ট করছিলে। কি করছিলে না? (অথৈ একইভাবে তাকিয়ে আছে) এসো.....

অথৈ : (অথৈ একটা ঘোরের ভিতর থেকে হাত বাড়ায়। ব্যাকগ্রাউন্ডে মিউজিক ('এই লিভিন সঙ্গ তব.....') হুম এসপেক্ট করেছিলামতো। কিন্তু সত্যি সত্যি তুমি আমার সামনে এসে এভাবে হাত বাড়িয়ে ডাকবে তাতো কল্পনাও করিনি।
রবি : কেন তুমি জানো না মানুষ এক মনে যদি কিছু চায় সে তা পায়? আমি তোমাকে সবটা ঘুরিয়ে দেখাব। (রবি এবং অথৈ ঘুরে ঘুরে দেখে)। আমি জানি অথৈ তোমার সেকি আফসোস তোমার জন্য কেন আমার সময়ে হলো না।

অথৈ : (অবাক) তুমি কেমন করে জানলে?
রবি : এও জানি বিসর্জন নাটকে উনত্রিশ বছর বয়সে আমি কেন রঘুপতি চরিত্রে অভিনয় করলাম। সেটা নিয়ে তোমার আক্ষেপের শেষ নেই তাও আমি জানি।
অথৈ : ঠিকই তো। কেন তুমি ২৯ বছর বয়সে রঘুপতি করলে আবার কিনা ৬২ বছর বয়সে জয়সিংহ। অবশ্য তোমার ৬২ বছর বয়সে জয়সিংহ করা নিয়ে আমার আপত্তি নেই কারণ তুমি আমার চোখে তোমার ২৯ বছর বয়সেই থেমে আছে।

রবি : ১৯ নয় ৩৯ নয় ৪৯ বা ৬৯ নয়, ২৯ কেন?
অথৈ : তোমাকে যখন ভাবি তখন যে তোমার ২৯ এর মুখটাই আমার চোখে ভেসে ওঠে।
রবি : (রবি একটু দুষ্ট হাসি হাসে) আচ্ছা অপর্ণার সংলাপ তোমার মনে আছে?

অথৈ : থাকবে না আবার.....!
রবি : তাহলে এসো, তুমি অপর্ণা আর আমি.....কি রঘুপতি না জয়সিংহ তুমিই হলো।

অথৈ : তুমি আমার জয়সিংহ।
রবি : হুম জানি।
অথৈ : কেমন করে জানলে?

রবি : তুমি ভীষণ রোমান্টিক তাই.....
অথৈ : আর তুমি বুঝি.....
রবি : আমি কি তা তুমি আমার চেয়েও বেশি জানো

বলেই আমার বিশ্বাস।
অথৈ : সত্যি, তুমি তাই বিশ্বাস করো.....ধন্য হলাম আমি।

রবি : না না অথৈ এমন কথা তোমার মুখে মানায় না।
অথৈ : কেন? কেন মানায় না?

রবি : কারণ তুমি মনে মনে যদি বিশ্বাসও করো যে ধন্য হলাম কিন্তু মুখে স্বীকার করবার মতো মেয়ে তুমি নও।

অথৈ : তুমি এতটা কী করে জানো আমাকে?
রবি : যেমন করে তুমি আমাকে জানো.....

অথৈ : আমি তো তোমার লেখা পড়ে তোমাকে বুঝতে পারি, জানতে পারি। কিন্তু আমিতো লিখি না।
রবি : তুমি যখন আমার লেখা পড় তখন তোমার ভেতরটা কেমন হয় আমি বুঝতে পারি। কতটা যত্নে তুমি আমার সঞ্চয়িতা, গীতবিতান, আমার সমগ্র রচনাবলী ছাও আমি জানি।

অথৈ : তোমার কাছে স্বীকার করতে দ্বিধা নেই। আমার মনে হয় তোমার লেখা বইটার গায়ে যদি একটু আঘাত লাগে সে আঘাত তোমার গায়ে লাগবে।
রবি : জানিতো, আমার রচনাবলী তোমার বিছানার কাছেই থাকে, যেন চোখ খুলেই এক নজরে সবটা দেখতে পাও।

অথৈ : (আবেগে কণ্ঠস্বর বুজে আসে) সত্যি তাই। রবি.....
রবি : আর কথা নয়। এসো তুমি অপর্ণা আমি জয়সিংহ। (রবি অথৈর হাতটা ধরে। অথৈ তার আরেক হাত দিয়ে রবির হাতটি পরম আবেগে চেপে ধরে। ব্যাকগ্রাউন্ডে গান বাজে "আমি একেলা চলেছি এ ভবে.....")

কেবলই একেলা। দক্ষিণ বাতাস যদি বন্ধ হয়ে যায়, ফুলের সৌরভ যদি নাহি আসে। দশ দিক জেগে ওঠে যদি দশটি সন্দেহ-সম, তখন কোথা সুখ, কোথা পথ? জান কি একেলা কাহারে বলে?

অপর্ণা : জানি। যাবে বসে আছি ভরা মনেড়- দিতে চাই, নিতে কেহ নাই।
রবি : সৃজনের আগে দেবতা যেমন একা! তাই বটে! তাই বটে! মনে হয় এ জীবন বড় বেশি আছেড়- যত বড় তত শূন্য, তত আবশ্যকহীন।

অপর্ণা : জয়সিংহ তুমি বুঝি একা!
তাই দেখিয়াছি, কাঙাল যে জন তাহারো কাঙাল তুমি। যে তোমার সব নিতে পারে তারে তুমি খুঁজিতেছো, যেন ভ্রমিতেছ দীন দুঃখী সকলের দ্বারে।

এতদিন ভিক্ষা মেগে ফিরিতেছিড়ড়- কত লোক দেখি, কত মুখ পানে চাই, লোকে ভাবে শুধু বুঝি ভিক্ষা তরেড়ড় দূর হতে দেয় তাই মুক্তি ভিক্ষা ক্ষুদ্র দয়াভরে।

এত দয়া পায়নি কোথাওড়ড়ড়ড় যাহা পেয়ে আপনার দৈন্য আর মনে নাহি পড়ে।
রবি : অপর্ণা, জানিস কিছু সুখ ভরা সুধা ভরা কোনো কথা? শুধু তাই বল। যা শুনিলে মুহূর্তে অতলে মগ্ন হয়ে ভুলে যাব জীবনের তাপ। অপর্ণা, এমন কিছু বল ওই মধু কণ্ঠে তোর, ওই মধু আঁখি রেখে মুখপানে।

বল রে অপর্ণা, যা শুনিলে মনে হবে চারিদিকে আর কিছু নাই, শুধু ভালোবাসা ভাসিতেছেড়ড়ড়ড় অপর্ণা : হায় জয়সিংহ, বলিতে পারিনে কিছু বুঝি মনে আছে কত কথা।

রবি : তবে আরো কাছে আয়, মন হতে মনে থাক কথা।ড়ড়- এ কী করিতেছি আমি! অপর্ণা, অপর্ণা, চলে যা মন্দির ছেড়ে!

অপর্ণা : জয়সিংহ, হোয়ো না নির্ভুর! বার বার

ফিরায়ো না! কী সহেছি অন্তর্যামী জানে!

রবি : তবে আমি যাই। এক দণ্ড হেথা নহে।(রবি মুহূর্তে কোথাও চলে যায়। অথৈ পাগলের মতো চিৎকার করে ডাকে)

অথৈ : জয়সিংহ! জয়সিংহ, রবি, জয়সিংহ, রবি তুমি কোথায়? (অথৈ পাগলের মতো রবিকে খুঁজতে থাকে)

(হঠাৎ ধোঁয়ার মধ্য দিয়ে ভেসে ওঠে ৬৯ বছরের রবীন্দ্রনাথ)

অথৈ : কোথায় তুমি গেলে বলতো?

রবি : আমি জানি এখন তুমি ৬৯ বছরের রবিকে চাইবে। তাইতো ৬৯ হ'তে হলোড়ড়

অথৈ : ৬৯? হ্যাঁ চাই, না চাই না ৬৯।

রবি : কেন?

অথৈ : কারণ তোমার পুরোটা ৬৯ জুড়ে ছিল ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো। ও কে আমি ঈর্ষা করিড়ড় আবার ভালোও বাসি। কারণ 'ও' অনেক অর্থব্যয় করেছে বলেই ১৯৩০ সালের ২রা মে ১২৫ টি চিত্র নিয়ে প্যারিসে তোমার প্রথম চিত্র প্রদর্শনী হয়।

রবি : হুম তা ঠিক।

অথৈ : আচ্ছা ও কে তুমি ভালোবেসেছো?

রবি : বেসেছি তোড়ড়ড়- (অথৈর মুখটা কালো হয়ে যায়) আবারড়ড়ড়- কি করি বলতো, তুমিতো আমার লেখা প্রতিটি নারী চরিত্রকে ঈর্ষা করো। নন্দিনী, লাবণ্য, এলা, বিনোদিনীড়ড় কি করো না?

অথৈ : করিতোড়ড়আবার প্রতিটি চরিত্রকে ভালোও বাসি তাও বলা।

রবি : তা ঠিক, তা ঠিক।

অথৈ : আমি ইন্দিরা দেবীকেও ঈর্ষা করি।

রবি : ও কে কেন? ও তো আমার দাদা

সত্যেন্দ্রনাথের মেয়ে।

অথৈ : জানি, কিন্তু ভেবে দেখো 'ছিন্নপত্রাবলী'র ২৫২টি পত্রের মধ্যে ২১৬ খানাই তুমি ইন্দিরা দেবীকে লিখেছো। তুমি যখন ৩৪ তখনই। ইন্দিরার কি সৌভাগ্য বলা।

রবি : আর আমার সৌভাগ্য তুমি অথৈ আজ আমার সঙ্গে আছো। কি সৌভাগ্য আমার বলা।

অথৈ : সত্যি বলছো?

রবি : সত্যি নয়তো কি? তোমার মতো পাঠককে তো আমার পুজো করা উচিত।

অথৈ : এ্যাঁই বাড়িয়ে বলবে না কিছু।

রবি : সত্যি অথৈ, তোমার মাঝেই আমি বেঁচে আছি— থাকব।

অথৈ : জানো মৈত্রেয়ী দেবীকেও আমার ঈর্ষা হয়। ওর লেখা “গ হগতে” বইটি আমি পড়েছি। ও তোমার এত সান্নিধ্য পেয়েছিল! তোমার উপদেশেই ওর জীবনটা ও নুতনভাবে সাজাতে পেরেছিল। মিচা ইউক্লিডের যখন মৈত্রেয়ী দেবীকে ছেড়ে চলে যেতে হ'লো তখন তোমার বাগীই ও কে বাঁচিয়ে রেখেছিল সেকি আমি জানি না মনে করেছো?

রবি : হুম তাইতো দেখছি।

অথৈ : মিচা ইউক্লিড মৈত্রেয়ী দেবীকে ছেড়ে যেতে বাধ্য হলেন। ফিরে গেলেন তার নিজ দেশে। এদিকে মৈত্রেয়ী দেবীর বাবা মৈত্রেয়ী দেবীর মতামতকে উপেক্ষা করে তার জন্য বিয়ে ঠিক করলেন। তখন তোমার ৬৯। মৈত্রেয়ী দেবীর তখন ২০। তুমি মৈত্রেয়ী দেবীকে ডাকতে অমৃত বলা। বিয়ের পর তোমার সাথে দেখা করতে এসে তোমার কোলের উপর পড়ে সেকি কান্না..... (মৈত্রেয়ী দেবী রবির কোলে মাথা

রেখে কাঁদছে)

রবি : অমৃত, আমি উপদেশ দিতে ভালোবাসি না। বড় বড় কথার পাখর চাপিয়ে আমি আর্থ মনকে আরো ক্লান্ত করতে চাই না। তবু আজকে আমার তোমাকে কয়েকটা কথা বলতেই হবে।ড়ড়- তোমার বাবা তোমার স্বামীকে নিয়ে আজ সকালে এসেছিলেন। তার সঙ্গে আর কি কথা বলবে? কেবল পণ্ডিতরাই পারেন এরকম নিষ্ঠুরতা করতে। কিন্তু তোমার ওপর কেউ নিষ্ঠুরতা করেছে বলে তুমিও নিজের উপর নিষ্ঠুরতা করবে এটা কোনো কাজের কথা নয়। আমি জানি না যার সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়েছে তিনি কেমন, তার পারিপার্শ্বিক তোমার অনুকূল কিনা, কিন্তু অবস্থা যেমনই হোক, ভাগ্য যেমনই হোক, তুমি তার চেয়ে বড় হবে। আমি আশা করছি, তুমি তোমার চারপাশে যারা আছে তাদের সকলকে সুখী করবে। সবচেয়ে বড় কথা তুমি নিজে সুখী হবে। যদি তুমি সুখী না হও অমৃত, যদি ভেঙে পড়, পরাজিত হও প্রতিকূল অবস্থার হাতে, তাহলে আমি মনে করব সে আমারি পরাজয়। কিন্তু আমি জানি তা হবে না। তুমি নিশ্চয়ই পারবে। একটি সুন্দর সংসার সৃষ্টি করাও একটি শিল্পকর্ম। যদি তুমি একখানি নীড় তৈরি করতে পারো যেখানে তোমার আনন্দের সংসারে সকলে আনন্দিত হয় তাহলে আমি কথা দিচ্ছি আমি যাব তোমার সেই ঘরে।

অমৃত : (অথৈ পায়ে প্রণাম করে) তাই হবে, তাই হবে (চোখের জল মুছতে মুছতে হেসে অথৈ হয়ে যায়)। কি এই বলেছিল তো তোমার অমৃত? আচ্ছা অমৃত একদিন তার বাবা এবং মিচা ইউক্লিডকে নিয়ে শান্তিনিকেতনে তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। সেদিন কি তুমি মনে মনে মিচাকে ঈর্ষা করেছিলে?

(রবি একটি দুষ্ট হাসি হাসে)

রবি : তোমার কী মনে হয়?

অথৈ : আমার তো মনে হয় করেছিলে।

রবি : তবে তাইড়ড়-

অথৈ : হেয়ালি করো না, সত্যি বলা।

রবি : একটি মনে করিয়ে দাও না কী কী কথা হয়েছিল সেদিন অমৃতার সঙ্গে।

অথৈ : কেন তোমার মনে নেই?

রবি : তোমার মতো করে তো মনে নেই।

অথৈ : থাক আর ঢং করো নাড়-(অথৈ ঠোঁট ফুলিয়ে থাকে, রবি হাসে)

রবি : ঠিক আছে, এখন মনে করা যাক সেদিন কী কথা হয়েছিল অমৃতার সঙ্গে।

কি গো, সাহেবের

সঙ্গে কী গল্প হচ্ছিল? কত কথা বলছিলে, কথার ফুলঝুরি। আমি সাহেবকে বলেছি, মেয়েদের কথা খানিকটা বাদ দিয়ে বিশ্বাস করবে। যত পদচারণা তত বাক্য চারণ।

অমৃত : (অথৈ আবার অমৃত হয়ে যায়) আপনি কী করে দেখতে পেলেন?

রবি : কেন, দেখতে দিতে চাও না নাকি? তাহলে তো আর একটি সাবধান হ'তে হতো। আমার জানালা দিয়ে নিচের বাগানটা দেখা যায়তো.....

অমৃত : আঃ আমার রাগ হচ্ছে।

রবি : তাতো হচ্ছেই কিন্তু রাগ নাকি অনুরাগ? (রবি অমৃতার আঁচল ধরে টান দেয়) একি নীলাম্বরী? (রবি অমৃতার বিনুনিটা ধরে টান দিয়ে মুখটা উর্ধ্বমুখী করে তোলেন। অমৃত চোখ বুজে আছে, তাকাতে পারছে না, চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে) দেখো কাণ্ড! কাঁদে কেন? আমি যা যা বলব ভেবেছিলাম সব ভুলে

গেলাম। (রবি অমৃতার মাথায় হাত রেখে আঙুলে আঙুলে বললেন) অমৃত, তোমার বয়স অল্প, মনটাকে নিয়ে এত নাড়াচাড়া করো না। সেটা স্বাস্থ্যকর নয়। মনটা কাকচক্ষুর সরোবরের মতো স্থির রাখ, তার নিচে বহুদূর গভীরতা। এখনই তাকে চঞ্চল করে উত্তাল করার দরকার নেই— শান্ত হয়ে থাক। সে মনে বাইরের নানা ছায়া পড়বে, সহজভাবে তা গ্রহণ করো। সেই যে আমি লিখেছি 'কেউবা তোমায় ভালোবাসে, কেউবা বাসতে পারে না যে। কেউ বা বিকিয়ে আছে, কেউ বা সিকি পয়সা ধারে না যে। মনেরে আজ কহো যে, ভালো মন্দ যাহাই আসুক, সত্যেরে লও সহজে'ড়ড় তোমার নিজের ভেতরে যে মাধুরীলতা আছে দূরে নেমে যাবে তার মূল, তার উপরে ফুল ফুটবে। অপেক্ষা করো। এখন উঠে বসো, একটু গল্প করা যাক। (অমৃত রবির হাঁটুর উপর থেকে মুখ তোলে। গাল ফুলিয়ে আছে) অথৈ, আবার কি হ'লো?

অথৈ : (অমৃত থেকে অথৈ হয়ে যায়) ইস.. আমার জন্য কেন সে সময়ে হলো না, ঈর্ষা হচ্ছে আমার ঈর্ষা..... মৈত্রেয়ী দেবী তোমার এত সান্নিধ্য পেয়েছেড়ড়ড়- (রবি হাসে) আচ্ছা তুমি তো বললে না মিচাকে তোমার ঈর্ষা হয়েছিল কিনা।

রবি : (একটু দুষ্ট হাসি হেসে) তা একটু আধুতো হয়েছিলই।

অথৈ : জানো বাংলাদেশের একজন লেখক তার নাটকে একটা সংলাপ লিখেছিল। নাটকটির নাম ঈর্ষা। খুব শক্তিশালী লেখক কিন্তু। ধরো তোমার পরে বাংলা নাটকে কয়েকজনের মধ্যে যার নামটি অন্যায়সে উচ্চারণ করা যায় সেই লেখক সৈয়দ শামসুল হক। রবি : হুম বুঝলাম। কিন্তু তার নাটকে কি সংলাপ ছিল সেটা বলা।

অথৈ : সংলাপটা ছিল 'প্রেমিকের হৃদয় যদি পোড়ে একমাত্র ঈর্ষার আগুনেই পোড়ে। ঈর্ষায় যে পোড়েনি, প্রেম সে হৃদয়ে ধরেনি। ঈর্ষা এক ঠাণ্ডা নীল আগুন'। (অথৈ হঠাৎ রবির দিকে তাকায়, রবি অন্যমনস্ক) কি হ'লো রবি? কি ভাবছো?

রবি : কিছু নয়।

অথৈ : কিছুতো বটেই, তোমাকে অন্যরকম লাগছে। রবি : (অন্যমনস্কভাবে উত্তর দেয়) তুমি যখন সৈয়দ শামসুল হকের কথা বলছিলে তোমার চোখটা ভীষণ চকচক করছিল।

অথৈ : তোড়ড়-

রবি : (উঠে দাঁড়ায়) নাহ কিছু নাড়ড়ড়ড়-

অথৈ : একে ঈর্ষা বলে। জানো আমার ভীষণ ভালো লাগছে ভী-ম-ণ্ আমার জন্য তোমার মনে ঈর্ষার জন্য নিয়েছে। উহু কী যে ভালো লাগছে আমার। ঈর্ষায় যে পোড়েনি, প্রেম সে হৃদয়ে ধরেনিড়ড় ঈর্ষায় যে পোড়েনি, প্রেম সে হৃদয়ে ধরেনি। (অথৈ খুব হাসতে থাকে। রবি বিরত, রবিও হাসে। হঠাৎ অথৈ জিজ্ঞেস করে) আচ্ছা রবি তুমি কাদম্বরী দেবীকে খুব ভালোবেসেছিলে তাই না? (রবি প্রিয়মাণ হয়ে যায়) কি চুপ হয়ে গেলে যে? কাদম্বরী দেবী সুইসাইড করেছিল কেন? সে কি তোমার দাদা জ্যোতিন্দ্রনাথের অবহেলায় নাকি তোমার কারণে। (রবি অস্বস্তি বোধ করে)

রবি : অথৈ এই বিষয়টি থাক। এসো আমরা রাজা ও রাণী নাটকের সংলাপ বলি।

অথৈ : রবি আমার যে ভীষণ জানতে ইচ্ছে করছে কাদম্বরী দেবী কেন সুইসাইড করল। তুমি ছাড়া সত্যি

কথাটা কিভাবে জানব বলো? যতটুকু জানি আত্মহত্যার কারণ জানিয়ে একটি চিঠি লিখেছিলেন। সেই চিঠি এবং আত্মহত্যার সব প্রমাণ নষ্ট করে ফেলা হয়েছিল তোমার বাবামশায় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নির্দেশে। (রবি অস্থির) বিষ খাওয়ার পরও জীবন-মরণের দোলাচলে বেঁচে ছিলেন দুদিন। সে দুদিনের কথাও কাউকে জানতে দেয়া হয়নি। বল না রবি কাদম্বরী দেবী কেন আত্মহত্যা করলেন?

রবি : (খুব অসহিষ্ণুভাবে) আমিড়- আমি জানি না। অথৈ : অবাক করলে। তুমিইতো কাদম্বরী দেবীর সবচেয়ে কাছের মানুষ ছিলে।

রবি : (রবি ধৈর্য ধরে রাখতে পারছে না) হ্যাঁ আমি ওর কাছের মানুষ ছিলাম, ওর নিঃসঙ্গ জীবনের সঙ্গী ছিলাম। তার মানেতো এই নয় ওর আত্মহত্যার কারণ আমি জানি?

অথৈ : কিন্তু কাদম্বরী দেবী তো তোমার বিয়ের ৪ মাস পর আত্মহত্যা করেছিল। তোমার বিয়েটা কি ওর আত্মহত্যার কারণ নয় বলো?

রবি : হতে পারে, হতে পারে অনেকগুলো কারণের মধ্যে এটিও একটি কারণ। কারণ আমার বিয়ের পর ও অনেকটা একা হয়ে গিয়েছিল। বিয়ের আগে বৌঠানকে ভেতরে সময় দিতে পারতাম, বিয়ের পর স্বাভাবিকভাবে সেটা সম্ভব ছিল না।

অথৈ : (খুব নরম করে বলে) খুব ভালোবেসেছিল তোমাকে বেচারী, হ্যাঁ তুমিও বেসেছিলেডুডু-

রবি : নতুন বৌঠান আমাদের কর্মচারী শ্যামগাঙ্গুলীর মেয়ে তাই আমাদের ঠাকুরবাড়ির মহিলামহলে অনেক গল্পনা শুনতে হয়েছিল ওকে। কথা শুনতে হয়েছিল গায়ের রং কালো বলেও। অথচ ওর লাভগম্য শ্যামলবর্ণ আর কালো হরিণ চোখ আমার কি ভীষণ প্রিয় ছিল। ও নিঃসন্তান বলেও অনেকেই খোঁটা দিতেও ছাড়তো না। জ্যোতি দাদার ব্যস্ততা তো ছিলই, সময় দিতে পারত না খুব একটা। ওর প্রতি আমার ভালোবাসা ঠাকুরবাড়ির হৃদয়হীনতার বিরুদ্ধে আমার একটা প্রতিবাদও বলতে পার।

অথৈ : শুধুই প্রতিবাদ?

রবি : না শুধু প্রতিবাদ নয়, আমার শিশু বেলায়, আমার কৈশোরে ‘ও’ ইতো ছিল আমার সাথি। ও যখন আমাদের বাড়ি বউ হয়ে আসে তখন ওর বয়স ৯ আমার ৭। আমি আমার মায়ের সবচেয়ে কনিষ্ঠ সন্তান, তাই মা বেচারী আমার প্রতি তেমন নজর দিতে পারেননি। তাই ‘ওর’ কাছেই ছিল আমার সব আবদার। ‘ও’ ছিল আমার লেখার সবচেয়ে ভালো পাঠক এবং সমালোচক। ও না থাকলে আমি হয়তো আজকের এই রবীন্দ্রনাথই হয়ে উঠতাম না। হ্যাঁ ‘ও’ কে ভালোবেসেছি আমি। কিন্তু সে কেমন ভালোবাসা? কি নাম দেবে এই ভালোবাসার?

অথৈ : তোমার জ্যোতি দাদার তোমার মেজো বৌঠাকুর গজননানন্দীনের প্রতি একটু বেশিই টান ছিল, তাইনা?

রবি : জ্যোতি দাদা বিয়ে করেছিলেন বাবা মশায়ের আদেশে। বাবা মশায়ের আদেশতো জানোই চাপা হুকুম। বলতে পারো বাধ্য হয়েছেন। তাই জ্যোতি দাদা আর নতুন বৌঠানের সম্পর্কটা কোনোদিন সহজ হয়ে ওঠেনি।

অথৈ : রবি আমি জানতে চেয়েছিলাম জ্যোতি দাদার মেজো বৌঠানের প্রতি একটু বেশিই টান ছিল।

রবি : হুম ছিল। মেজো ঠাকুর ছিল বিলেতি শিক্ষায় শিক্ষিত। তার রুচি, তার মেধা, তার শিক্ষা জ্যোতি

দাদা পছন্দ করত।

অথৈ : আচ্ছা তোমাদের ফ্যামিলিতে মানে তোমার জ্যোতি দাদার এমনকি তোমার জন্যও কোনো উচ্চ বংশীয় ঘরের মেয়ে পাওয়া যাচ্ছিল না? তোমার স্ত্রী মৃণালিনী দেবী সেওতো তোমাদের কর্মচারী বেগীমাধব রায় চৌধুরীর মেয়ে ভবতারিনী। যশোরের ফুলতুলি গ্রামের মেয়ে ভবতারিনী, তোমাদের ঠাকুরবাড়িতে এসে হলো মৃণালিনী দেবী। আমারতো অবাক লাগে জ্যোতি দাদা, তুমি যেমন সুদর্শন তেমনি গুণবান। রূপ, গুণ অর্থ, অভিজাত্য কোনো কিছুইই কমতি ছিল না তোমাদের তবু কেন সমান সমান ঘরের কোনো মেয়ে পেলে না তোমরা?

রবি : অথৈ, আমার বিশ্বাস সবই তুমি জানো তবু কেন আমাকে জিজ্ঞেস করছো?

অথৈ : জানি এক রকম, পড়েছি কোথাও। কিন্তু তোমাকে কাছে পেয়ে তোমার কাছ থেকে জানবার কৌতূহল আমি কেমন করে সংবরণ করি বলোতো?

রবি : তুমি আমাকে যেভাবে জেরা করছোডুডু কিছুই যেন ঢাকা থাকতে দেবে না। শোনো অথৈ, যে শালগ্রাম শিলা সাক্ষী রেখে হিন্দু বিয়ে হয় আমার বাবা মশায় বা আমাদের পরিবার সেই শালগ্রাম শিলাই মানে না। আমরা মুসলমানের জল খাওয়া পিরালী ব্রাহ্মণ। কোনো হিন্দু ব্রাহ্মণ হয়তো আমাদের পরিবারকে ব্রাহ্মণই ভাবেন না।

অথৈ : পিরালী ব্রাহ্মণ কী?

রবি : আমাদের একাদশ কি দ্বাদশ পুরুষ আগে জগন্নাথ কুশারী। তিনি কাশ্যপগোত্রীয় রায় চৌধুরী বংশের দুই ভাই পির-আলী নামে কোনো মুসলমানের দ্বারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণে বাধ্য হয়েছিলেন। তাই এই জগন্নাথ কুশারী বিবাহ সূত্রে পিরালী। তখন আত্মীয়-স্বজনরা তাদের পিরালী ব্রাহ্মণ বলতো।

অথৈ : এই দাঁড়াও দাঁড়াও আমার যেন কেমন সব গোলমালে লাগছে। তাহলেতো তোমরা কুশারী বা পিরালী, ঠাকুর পদবী কেমন করে হলো?

রবি : (রবি হাসে) সে আরেক ইতিহাসডুডু জগন্নাথ কুশারীর ৫ কি ৬ পুরুষ পরে অর্থাৎ আমাদের ৭ কি ৮ পুরুষ আগে পঞ্চানন কুশারী, কলিকাতায় এসে আদি গঙ্গার তীরে বাস স্থাপন করে। ওই জায়গাটির নাম গোবিন্দপুর। পঞ্চানন কুশারী যেখানে ঘর বাঁধেন সেখানে হরিজনদের বাস ছিল। ব্রাহ্মণ পঞ্চাননকে তারা ভক্তি ভরে ঠাকুর মশাই ডাকতো। পঞ্চানন তখন ইংরেজ জাহাজি কান্তানদের মাল সরবরাহ করতেন। সাহেবরা পঞ্চাননকে ট্যাগোর নামে ডাকতো। সেই থেকে কুশারীর পরিবর্তে ঠাকুর বা ট্যাগোর নাম প্রচলিত হয়।..... উহ্ আর নয় ইতিহাস.....।

অথৈ : ঠিক আছে, আর ইতিহাস জানতে চাইব না। কবি, তোমার মুখে একটি কবিতা শুনতে চাই। শুনাবে?

রবি : তোমায় নিয়ে না আর পারি না। বলো কোন কবিতাটি শুনতে চাও?

অথৈ : নিষ্ফল কামনা কবিতাটি।

(রবি একটু অনমনস্ক হয়ে যায়। ম্রিয়মাণ লাগে তাকে। রবি একটু অনমানস্কভাবেই শুরু করে।)

বৃথা এ ক্রন্দন, হায়রে দুরাশা
এ রহস্য, এ আনন্দ, তোর তরে নয়
যাহা পাস তাই ভালো
হাসিটুকু, কথটুকু, নয়নের দৃষ্টিটুকু, প্রেমের আভাষ
সমগ্র মানব তুই পেতে চাস,

এ কী দুঃসাহস।

অথৈ : কবি, আর একটি কথা শুধু জানতে চাইব। এই কবিতাটি কি তুমি কাদম্বরী দেবীকে নিয়ে লিখেছ?

রবি : অথৈ, আর কোনো কথা নয়, আর কোনো কথা নয়।

(রবি দ্রুত পায়ে এগিয়ে যায়। অথৈ ডাকতে থাকে ‘রবি’ ‘রবি’। ঝোঁয়ার মধ্যে আবির্ভূত হয় ২১ বছরের রবি)

রবি : আমি ২১, তুমি?

কাদম্বরী : তাহলে আমি ২৩ বছরের কাদম্বরী।

রবি : নতুন বৌঠান.....

কাদম্বরী : রবি..... (গান বেজে ওঠে)

রবি : বুঝিগো সন্ধ্যার কাছে শিখেছে সন্ধ্যার মায়া

ওই আঁখি দুটি,

চাহিলে হৃদয়পানে

মরমেতে পড়ে ছায়া

তারা উঠে ফুটি।

কাদম্বরী : রবি, ছাদের উপর দুজনে মিলে এই বাগানটিতো শেষ করলাম আমরা। এখন এই বাগানটির কি নাম দেয়া যায় বলোতো?

রবি : নাম হবে..... হুম.....

নামটি হবে নন্দনকানন। (রবি কাদম্বরীর পায়ে চুমু খেয়ে জিজ্ঞেস করবে) নতুন বৌঠান ‘নন্দনকানন’ নামটি তোমার পছন্দ হয়নি?

কাদম্বরী : এমন দুঃসাহস ভালো নয়, কেউ দেখে ফেললে সহজ ভাবে নেবে?

রবি : (হেসে) এত নন্দনকানন। মর্ত্যলোকের দৃষ্টি এখানে এসে পৌঁছায় না নতুন বৌঠান।

কাদম্বরী : তোমার সঙ্গে কথায় পারব না রবি। তোমার আমার সম্পর্ক তো শুধুই আমাদের। তাকে প্রকাশ করতে যেও না। আমার ভয় করে।

রবি : শুধু ভয়, ভয়, আর ভয়। তোমার কিসের এত ভয়?

কাদম্বরী : তোমাকে হারানোর ভয়। এ বাড়িতে তুমি ছাড়া আমার আর কোনো বন্ধু নেই। এই মর্ত্যলোকের মানুষ যদি তোমার আমার এই সহজ সম্পর্ককে না নেয় সহজ, তাই এত ভয়।

রবি : নতুন বউঠান, কী হবে ছোটখাটো দুঃখের কথা মনে রেখে? ভুলে যাও, সব ভুলে যাও।

কাদম্বরী : ভুলে যাব, ভুলে যাব রবি? ভালো যায়? কতদিনের কত অপমান, কত কষ্ট, সেই ন’বছর বয়সে তোমাদের বাড়ির বউ হয়ে এসে অবধি সহ্য করছি। তুমি যারে বলো কৃষ্ণকলি, কালো যে বলে তারে গায়ের লোক। দেখো দেখো সেই কালো মেয়েটি না আবার নিঃসন্তান। হায়রে অন্তঃপুরের সাধারণ মেয়ে, হায়রে বিধাতার শক্তির অপব্যয়।

রবি : থামো বৌঠান, থামো, এমন করে বলো না। কিছুই ভুলিনি আমি। তুমি যখন আমাদের বাড়িতে বউ হয়ে এলে, আমি তখন সাত তুমি নয়। দুজনে মিলে হয়ে গেলাম ছেলেবেলার খেলার সাথি। স্কুল পালানো রবি ছুটে আসতো তোমার কাছে শুধু তোমার হাতের পাত্তা খেতে। মাত্র তের বছর বয়সে মাকে হারালাম। বালিকা বয়সেই তুমি হয়ে গেলে কেমন স্নেহময়ী মা। মমতাময়ী তুমি মায়া দিয়ে, মমতা দিয়ে, ভালোবাসা দিয়ে ভুলিয়ে দিলে আমার মা হারানোর দুঃখ। বহু ভাগ্যগুণে তুমি যে আমার নতুন বৌঠান।

কাদম্বরী : বাদ দাও তো, একটুও মন খারাপ করবে

না।..... আচ্ছা রবি, তুমি কি আজ মেজো বৌঠাকুরপের ওখানে গিয়েছিলে?

রবি : হুম, গিয়েছিলাম।

কাদম্বরী : তোমার জ্যোতি দাদা ওখানে আছেন নিশ্চয়?

রবি : হ্যাঁ আছে, না মানে, মেজ ঠাকুরপের ওখানে গানবাজনার আসর বসেছিল। আমি ছিলাম কিছুক্ষণ। জ্যোতি দাদা যে সেই মজলিশ ছেড়ে সারারাত আসতে পারবে না।

কাদম্বরী : ও!

রবি : (রবির চোখও ছলছল করে ওঠে, রবি কাদম্বরীকে বুকের ভিতর নিয়ে মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বলে) নতুন বৌঠান, কি হবে দুঃখকষ্টের কথা এত ভেবে- ভুবনজুড়ে এত আনন্দ সেই আনন্দধারাকে অন্তরে গ্রহণ কর। দেখবে, বরাপাতার মতো পুরনো দুঃখ সেই আনন্দস্রোতে ভেসে গেছে। কাদম্বরী : (রবির হাতটা নিজের বুকের উপর রাখে) শত দুঃখের মধ্যেও সে আনন্দকে আমি ধরে আছি এই মুহূর্তে আমার বুকের মাঝখানটিতে। (কাদম্বরী রবি থেকে দূরে সরে গিয়ে সমস্ত মঞ্চ ঘুরে আবার রবির সামনে দাঁড়ালো) ঠাকুরপো মনে পড়ে, আমার হাসি যার জন্য সত্যিই তুমি পাগল হয়ে গিয়েছিলে। আর সেই হাসি দেখার জন্য তোমার কত না কথা, কত দুষ্টিমি, কত ফন্দি।

রবি : আর তুমি। আমাকে দিয়ে সুপারি কাটাবার কাজ করিয়ে নিতে, তোমার কত যে কথা, কত যে দুষ্টিমি, কত যে ফন্দি (দুঃজনে হেসে ওঠে)

রবি : ধীরে ধীরে প্রাণে আমার এসো হে, মধুর হাসিয়ে ভালোবাসো হে।

কাদম্বরী : নতুন লিখলে?

রবি : হুম।

কাদম্বরী : আমি জানি রবি তোমার এই 'হে' মানে কে।

রবি : জানো? বলো তবে কে?

কাদম্বরী : তোমার জ্যোতিদাদার লেখা 'অলীক বাবু' নাটকে আমরা দুজন অভিনয় করলাম। তুমি অলীক বাবু আর আমি হেমাস্কিনী। আমি কি বুঝি না রবি, তোমার গানে কবিতায় 'হে' মানে হেমাস্কিনী, আর হেমাস্কিনী মানে

রবি : তুমি... হে চির নতুন, আজি এ দিনে প্রথম গানে জীবন আমার উঠুক বিকাশে তোমার পাশে।

কাদম্বরী : হে আকাশ বিহারী নিরোদ বাহন জল

আছিলো শৈল শিখরে শিখরে তোমার লীলাঙ্গল।

রবি : আমি চঞ্চল হে, আমি সুদূরের পিয়াসী।

সত্যি নতুন বৌঠান, তোমার মতো করে কে বুঝবে আমার লেখা।

(রবি কাদম্বরীর চিবুক ধরে মুখটা তুলে চোখে চোখ রেখে বলে) তোমার যে চকিতে চাঁউনির দান

সংসারের সমস্ত ছাড়িয়ে আমারই হাতে এসে পৌঁছেছে, নতুন বৌঠান একে আমি রাখবো আমার গানে গেঁথে, ছন্দে বেঁধে।

কাদম্বরী : আমার চোখের জলে সেই অমৃত নেই যাতে এক নিমেষের চাঁউনিকে চিরকাল বাঁচিয়ে রাখতে পারে। হাজার কথার আবর্জনা, হাজার বেদনার স্তূপে তুমি আজকের এই মুহূর্তটিকেও হারিয়ে ফেলবে একদিন।

রবি : আমি চাইনে রাজার প্রতাপ, আমি চাইনে ধনীর ঐশ্বর্য। তোমার চোখের মায়াই আমার চিরদিনের ধন, নতুন বৌঠান। (লাইট চেষ্টা, একটা রবীন্দ্র সংগীত

বাজবে) নতুন বৌঠান, তুমি শুনতে ভালোবাসতে প্রতাপাদিত্যের গল্প। প্রায়ই দুপুর বেলা তোমার ঘরে শুয়ে শুয়ে পড়ে শোনাতাম প্রতাপচন্দ্র ঘোষের বঙ্গাধিপ পরাজয়ের কাহিনী। তোমাকেই গল্প শোনাতে শোনাতে আর হাত পাখার বাতাস খেতে খেতে আমার মনের মধ্যে নিঃশব্দে রচিত হলো 'বউঠাকুরাণীর হাট'।

কাদম্বরী : (কাদম্বরী অস্থিরভাবে পায়েচাট্টা করছে, হঠাৎ খুব শান্ত ভঙ্গিতে বললো) সেদিন ছিল ৫ই জুলাই, আমার জন্মদিন। আবার বিয়ের দিনও। তোমার জ্যোতি দাদাকে বলেছিলাম যেন একটু তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরে। (কাদম্বরী অস্থির হয়ে ওঠে, ক্রমশ অস্থিরতা বাড়তে থাকে) তিনি সেদিন বাড়িই ফিরলেন না। জানি না সারারাত কোথায় ছিলেন। মেজো বৌঠাকুরপের কাছে না থিয়েটারের মজলিসে। বুকের মধ্যে কী যে আগুন জ্বলছিল- সেই রাতেই আমি চিতায় পড়েছি ঠাকুরপো। আমার মরণ হয়েছে সেই রাতেই। এমন সময়ে তুমি ঢুকলে ঘরে। বললাম এত রাতে কোথা থেকে? তুমি বললে, 'আজ তোমার জন্মদিন, সবাই ভুলে গেলেও আমি ভুলিনি, নতুন বৌঠান।' আমার তখন সব জ্বলছে। বলসে গেছে সব শরীর মন, তুমি জড়িয়ে ধরলে আমার জ্বলন্ত শরীরটাকে। জানি না কতক্ষণ আমার সঙ্গে তুমিও পড়েছিলে। জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলাম না ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানি না। জেগে দেখি তুমি রেখে গেছ তোমার দুলাইনের একটা চিঠি। 'মেঘের দুঃস্বপ্নে মগ্ন দিনের মতো, কান্দিয়া কাটিবে কিরে সারাটি যৌবন।' কয়েকদিনের মধ্যে আত্মহত্যার চেষ্টা করি। সেই আমার প্রথম চেষ্টা। কিন্তু মরলাম না। তুমি লিখলে, 'জ্যোতির্ময় তীর হতে আঁধার সাগরে ঝাপায়ে পড়িল এক তারা, একেবারে উন্মাদের পারা।' কাদম্বরী : (কাদম্বরীর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। হঠাৎ প্রসঙ্গ পাল্টানোর জন্য বললো) কী মুশকিল বলোতোড়

রবি : কেন কি হয়েছে?

কাদম্বরী : এই যে তোমার জন্য কিছুতেই একটা পাত্রী খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

রবি : কেনো তোমাদের এত তাড়াছড়ো কিসের?

কাদম্বরী : তুমি এত বোকা কেন রবি। তোমার বউ আসবে, কত আনন্দ হবে। আমার কথা বলার একজন সঙ্গী হবে। ওর সঙ্গে আমি কত গল্প করব। তোমার বউকে আমি মনের মতো সাজাব।

রবি : তাই? মেজো বউঠাকুরপোতো সেদিন বললো আমার বউকে তার বাড়িতে নিয়ে রাখবেন। আদব-কায়দা শিখিয়ে ঠাকুর বাড়ির উপযুক্ত করে তুলবেন। (কাদম্বরীর হাসি হাসি চেহারাটা হঠাৎ বদলে যায়) নতুন বৌঠান?

কাদম্বরী : ওহ..

(রবি অসহায় বোধ

করে। কি বলবে বুঝতে পেরে বেরিয়ে যায়)

রবি আমি তোমাকে

ছাড়া কেমন করে বাঁচব, কেমন করে নিঃশ্বাস নিবো? শুধু তোমার জন্য বেঁচে ছিলাম রবি। এখন আমার বেঁচে থাকার আর কোনো অর্থ নেই, কোনো মানে নেই।

(নেপথ্যে গান 'এই করেছো ভালো নির্ভর হে.....')

কাদম্বরীর চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ছে। লাইট চেষ্টা হয়। কাদম্বরী আধশোয়া। রবি এসে পায়ে হাত রাখে। কাদম্বরী ব্যস্ত উঠে চোখের জল আড়াল করে)

কাদম্বরী : রবি, কখন আসলে?

রবি : নতুন বৌঠান, তুমি আমার উপর রাগ করেছো? কাদম্বরী : না না, রাগ করব কেন?

রবি : এই যে আমি এ বাড়ি ছেড়ে তোমাকে ছেড়ে মেজ বউঠাকুরপের বাড়িতে থাকছি কতদিন ধরে।

কাদম্বরী : তুমি সবসময় আমার কাছেই থাকবে

নাকি? তোমার বিয়ে ঠিক হয়েছেডু- মেজ বউঠাকুরপ তোমার বিয়ের সব দায়িত্ব নিয়েছেন,

তোমার জন্য পাত্রী পছন্দ করেছেন।

রবি : নতুন বৌঠান, আমার একটা কথার ঠিক উত্তর

দেবে?ডু আমি যেড়- মানে আমার যে বিয়ে হচ্ছে

তুমি তাতে খুশি হয়েছো?

কাদম্বরী : (কাদম্বরী আধশোয়া অবস্থা থেকে ধড়মড়

করে উঠে বসে) সেকি কথা, খুশি হবো না কেন?

তোমার বিয়ে কত আনন্দের ব্যাপার। মেয়ে তোমার

পছন্দ হয়নি? অবশ্য পছন্দ না হলেও তোমার তো

কিছু করার নেই, মেজো বউঠাকুরপ পছন্দ করেছেন।

তারপর আবার বাবাশায়ের নির্দেশ তোমার তো

মেনে নেয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই।

রবি : নতুন বৌঠান, এগারো বছরের একটি

বালিকাকে জীবনসঙ্গিনী করে তার সঙ্গে আমি কোন্

সুখ-দুঃখের আলোচনা করব বলতে পারোডু? আমার

মানস সঙ্গী কি সে কথনো হতে পারবে?

কাদম্বরী : (দীর্ঘশ্বাস ফেলে) ভেবো না, দেখো,

একদিন গুটিপোকা ঠিক প্রজাপতি হয়ে পাখা মেলাবে।

সত্যি করে একটি কথা বলোতো রবি আমার সেই

হাসি আজো তোমার আগের মতো দেখতে হচ্ছে

করে?

রবি : এ তুমি কেমন কথা বলছো, বৌঠান? নতুন

বৌঠান, তুমি সেরে ওঠো, সুস্থ হয়ে ওঠো, তোমার

অসুখ দেখলে আমার একটুও ভালো লাগে না। আমি

কালই ও বাড়ি ছেড়ে এখানে চলে আসব।

কাদম্বরী : (রবির হাতটা চেপে ধরে) না না রবি

এমন কাজ করো না। ওরা সবাই তোমাকে নিয়ে কত

আনন্দ করছে। ওদের মন খারাপ করে দিও না।

রবি : আর তুমি যে এখানে একা একা থাকছো...

কষ্ট পাছো? নতুন বৌঠান তুমিও চলো না ও বাড়িতে

সবার সঙ্গে থাকলে তুমিও ভালো থাকবে। দেখবে

তাড়াতাড়ি সেরেও উঠবে।

কাদম্বরী : আমাকে তো ওরা কেউ ডাকেনি?ডু- আর

আমারও কোথাও যেতে ভালো লাগে না রবি।

রবি : কেন তুমি নিজেকে সবার কাছ থেকে দূরে

সরিয়ে রাখো?

কাদম্বরী : বাদ দাওতো এসব। এত ভেবো না

আমাকে নিয়ে। তুমিইতো লিখেছো 'হে থা হতে যাও

পুরাতন। হেথায় নতুন খেলা আরম্ভ হয়েছে।' নতুন

বৌঠানতো আজ পুরাতন ঠাকুরপো। নতুনকে জায়গা

ছেড়ে দিতে হবে। (কাদম্বরীকে কেমন অস্বাভাবিক

লাগবে। পুরো মঞ্চ ঘুরে ঘুরে পাগলের মতো চিৎকার

করে বলছে) হেথা হতে যাও পুরাতন। হেথায় নতুন

খেলা আরম্ভ হয়েছে। (ধোঁয়ার মধ্যে হারিয়ে যেতে

কাদম্বরী বলে) রবি, রবি আমি চলে যাচ্ছি। তোমার

কবিতা, তোমার গানই আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছিল।

তোমার লেখার মধ্যে আমি নিজেকে খুঁজে পেয়ে ধন্য

হয়েছি। রবি, রবি আমি চলে যাচ্ছি, নতুন বৌঠান

এখন পুরাতন হয়ে গেছে। পুরাতন আজ বিদায় নিচ্ছে,

রবি।

রবি : (ধোঁয়ার মধ্যে কাদম্বরীকে খুঁজতে থাকে) নতুন

বৌঠানডু নতুন বৌঠান কেবল একটি মানুষের মনে

মনে জানা দিয়ে গড়া, এই আমি। যে মানুষটি এত বছর ধরে আমাকে গড়লো সে তুমি নতুন বোঁঠান, সে তুমি।' (ধোঁয়ার মধ্যে দু'জন হারিয়ে যায়। লাইট এবং মিউজিক উচ্চস্বরের থেকে ধীরে ধীরে শান্ত অবস্থার মধ্যে আসে।)

(অঁথে বেরিয়ে আসে। অঁথে অবাক তাকিয়ে আছে, ধীরে ধীরে হুইল চেয়ারে বসা ৮০ বছরের রবীন্দ্রনাথ একটু একটু করে চাকা ঘুরিয়ে এগুতে থাকে। অঁথে নোড়ে যায় সাহায্য করার জন্য)

অঁথে : আমি চাই না, আমি চাই না ৮০ বছরের রবীন্দ্রনাথকে দেখতে।

রবি : কেন গো মেয়ে?

অঁথে : তোমাকে যে আর পাবো না, তুমি যে চলে যাবে আমাকে ছেড়ে।

রবি : এ যে চির সত্য। এই অমোঘ নিয়তি খণ্ডবার সাধ্যতো তোমার আমার নেইগো মেয়ে।

অঁথে : না না তুমি যাবে না, কোথাও যাবে না।

রবি : আমিতো তোমার সঙ্গেই আছি সারাটা ক্ষণ।

বলো আছি না? আমি যেদিন থাকবো না সেদিন আরো বেশি করে থাকবো তোমার ভেতর সেও আমি জানি। এই শরীরী থাকার মূল্য তার কাছে যে অতি তুচ্ছ।

অঁথে : হুম তা ঠিক, তবুও মন যে মানে না।

রবি : পাগলিভূড়-

অঁথে : হ্যাঁ, হ্যাঁ বিশু পাগল আমি তোমার পাগলি।

রবি : এই যে পুরনো কষ্টটা আবার মনে করিয়ে দিলি।

অঁথে : জানিগো জানি, তুমি রক্তকরবী নাটকটি মঞ্চস্থ করতে পারানি যে তাই তোমার কষ্ট। কোনো একটি লেখা হয়ে গেলে সেটি মঞ্চস্থ করার জন্য তোমার সেকি ব্যাকুলতা! অভিনয়টা করতেও যে তুমি খুব ভালোবাসতে।

রবি : হ্যাঁ রে, মনের মতো একটা নন্দিনী খুঁজে পেলাম না। খুব আফসোস হয় জানিস তুই কেন আমার সময় জন্মাননি। তাহলেতো আমার নন্দিনী নিয়ে ভাবনাই থাকতো না।

অঁথে : থাক, ঠাট্টা করো না।

রবি : ঠাট্টা না রে পাগলি, সত্যি।

অঁথে : তোমার সময়েই নন্দিনীর জন্ম হয়েছিল। কিন্তু যদি আর ১৩টা বছর আগে জন্মাতো বা তুমি যদি আর ১৩ বছর আমাদের মাঝে থাকতে- তুমি চলে গেলে ১৯৪১-এ আর শব্দমিত্রের নির্দেশনায় রক্তকরবীর মঞ্চায়ন হলো ১৯৫৪-তে। নন্দিনী করেছিলেন তুষ্টি মিত্র। অসাধারণ করেছেন। আমি অডিও শুনেছি।

রবি এসো না তোমার সঙ্গে একটু রক্তকরবীর অংশ করি, বড় সাধ।

রবি : তুই আমায় কোন রূপে দেখতে চাস?

অঁথে : আমি যে তোমায় সব রূপেই দেখতে পাই।

রাজা, বিশুপাগল, অধ্যাপক এমনকি ফাগুলালও।

তবে এখন তুমি শুধুই বিশুপাগল।

রবি : পাগলি, তুই আমাকে রক্তকরবী করতে বলছিস, বিশুপাগল করতে বলছিস, কিন্তু এই বয়সে, এই কণ্ঠে

বিশুকে কি ধারণ করতে পারব? তার চেয়ে আয়

বিদায়ের ক্ষণে বিদায় অভিশাপের একটু অংশ করি।

অঁথে : তুমি কেন বিদায় অভিশাপের কথা বললে?

রবি : মনটা চাইছে যে। আয় না।

(দু'জনে হঠাৎ হেসে ফেলে। হাসতে হাসতে রবি কাশতে শুরু করে। রবিকে খুব অসুস্থ মনে হবে। রবি কিছু বলতে চায়, অঁথে থামিয়ে দিয়ে.....)

অঁথে : একটি কথাও বলবে না তুমি রবি। এই অসুস্থ

শরীরে তোমার এত ঘুরে বেড়ানোর কী দরকার?

ডাক্তারের নিষেধ অমান্য করে তুমি কালিম্পং গেলে।

কী হ'লো তারপর, ১০ দিন যেতে না যেতেই প্রচণ্ড

অসুস্থতার জন্য কলকাতায় ফিরে আসতে হ'লো।

তারপর তো দু'মাস বিছানায় পরে রইলে।

রবি : (রবির কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে। রবি দম নিয়ে

নিয়ে কথা বলছে) অঁথে আমার শেষ কবিতাটি

তোমার মনে আছে?

অঁথে : আছে রবি আছে, তুমি কথা বলো না রবি।

তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে তাই না।

রবি : আমি চাইনি অঁথে আমার শরীরে কোনো

:অস্ত্রোপচার হোক, কোনো কাটাছেঁড়া হোক। কিন্তু

ডাক্তার মানলে না।

অঁথে : আমি জানি রবি সব জানি।

রবি : বলো না আমার শেষ কবিতাটি যা আমি

লিখতে পারিনি, মুখে মুখে বলেছিলাম।

অঁথে : (অঁথের চোখ দিয়ে জল পড়ছে) তুমি আমাদের

ছেড়ে চলে গেলে ৭ আগস্ট ১৯৪১ বেলো ১২.৩০

মিনিটে। আর তুমি তোমার শেষ কবিতা 'তোমার

সৃষ্টির পথ' মুখে মুখে বলেছিলে ৩০ জুলাই সকাল

সাড়ে নটায়।

রবি : এসো না একটু আবৃত্তি করি।

অঁথে : তোমার শরীর ভালো নেই রবি। তোমার কষ্ট

হবে।

রবি : তোমার সাথে আবৃত্তি করার যে আনন্দ তার

কাছে এই কষ্ট যে বড়ই তুচ্ছ।

অঁথে : তোমার সৃষ্টির পথ

রেখেছ আকীর্ণ করি

বিচিত্র ছলনা-জালে,

হে ছলনাময়ী।

রবি : মিথ্যা বিশ্বাসের ফাঁদ পেতেছ নিপুণ হাতে

সরল জীবনে

এই প্রবঞ্চনা দিয়ে

মহত্ত্বের করেছ চিহ্নিত;

তার তরে রাখনি

গোপন রাত্রি।

অঁথে : তোমার জ্যোতিষ্ক তারে যে পথ

দেখায়

সে তার অন্তরের পথ

সে যে চিরস্বচ্ছ

সহজ বিশ্বাসে সে যে

করে তারে চির সমুজ্জ্বল।

রবি : বাহিরে কুটিল হোক

অন্তরে সে খাজু

এই নিয়ে তাহার

গৌরব।

সত্যরে সে পায়

আপন আলোকে ধৌত

অন্তরে অন্তরে।

অঁথে :

অনায়াসে যে পেরেছে

ছলনা সহিতে

সে পায় তোমার

হাতে

শান্তির অক্ষয়

অধিকার।

রবি : অনায়াসে যে পেরেছে

ছলনা সহিতে

সে পায় তোমার

হাতে

শান্তির অক্ষয়

অধিকার।

(অঁথে এবং রবি

দু'জনে মিলে শেষ ৩টি লাইন একসাথে বলবে। গলা

এবং ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক উপরে উঠবে। টেনশন

বাড়তে থাকবে। রবির অস্তিত্বটা বাড়তে থাকায় অঁথে

পাগলের মতো চিৎকার করতে থাকবে।)

অঁথে : আমি তোমাকে যেতে

দেবো না রবি, আমি তোমাকে যেতে দেবো না।

রবি : (রবি বিড় বিড় করে

বলবে.....) সত্য যে কঠিন,

কঠিনেরে

ভালোবাসিলাম

সে কখনো করে না

বঞ্চনা।

অঁথে : কবি তুমি এমন করছো কেন? কী হয়েছে

তোমার?

রবি : প্রথম দিনের সূর্য,

প্রশ্ন করেছিল.....

সত্তার নূতন আবির্ভাব- কে তুমি?

মেলেনি উত্তর।

বৎসর বৎসর চলে গেল।

দিবসের শেষ সূর্য

শেষ প্রশ্ন উচ্চারিল

পশ্চিম সাগর তীরে নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়ভূড় কে তুমি?

(ব্যাকগ্রাউন্ডে গান 'যখন পড়বে না মোর পায়ে

চিহ্ন..)

মেলেনি উত্তর।

ভয়ের বিচিত্র চলচ্ছবি.....

মৃত্যুর নিপুণ শিল্প বিকীর্ণ আঁধার।(রবি ধোঁয়ার মধ্যে

মিলিয়ে যেতে থাকে।)

অঁথে : (অঁথে পাগলের মতো

বলতে থাকে) রবি, রবি তুমি আমার কাছে জানতে

চাইবে না তুমি এটা কবে লিখেছিলে? রবি তুমি প্রথম

দিনের সূর্য ২৭ জুলাই লিখেছিলে। রবি, রবি যেও না,

যেও না রবি।

ভয়ের বিচিত্র চলচ্ছবিভূড়

মৃত্যুর নিপুণ শিল্প বিকীর্ণ আঁধার।

এটি 'দুঃখের আঁধার রাত্রির' কবিতার দুটি লাইন রবি।

রবি, রবি..... (অঁথে বারবার বিড়বিড় করে বলতে

থাকে) মৃত্যুর নিপুণ শিল্প বিকীর্ণ আঁধার..... বিকীর্ণ

আঁধার.....।

নেহাল : (নেহাল এসে অবাক

তাকিয়ে থাকে অঁথের দিকে) অঁথে..... অঁথে.....

কী হয়েছে তোর..... ? অঁথে....

অঁথে : মৃত্যুর নিপুণ শিল্প বিকীর্ণ

আঁধার..... রবি..... রবি তুমি কোথায়?

নেহাল : অঁথে, অঁথে আমি নেহাল।

অঁথে... (নেহাল চিৎকার করে ডাকে) অ..... থৈ.....

অঁথে : (অঁথে যেন বাস্তবে ফিরে

আসে) ওহ নেহাল, তুই এতক্ষণ কোথায় ছিলি?

নেহাল : আশ্চর্য..... তুই হঠাৎ

সিঁড়ি দিয়ে উঠে কোন ঘরে ঢুকে গেলি আমি খুঁজেই

পাচ্ছিলাম না। কী হয়েছে তোর?

অঁথে : নাহ কিছু না, চল বাইরে

যাই খোলা আকাশের নিচে.....

(দু'জন বেরিয়ে যায়।

গান বাজবে 'যখন পড়বে না মোর পায়ে

চিহ্ন এই

বাটে...')



ভ্রমণ

সাগরবালা মালদ্বীপ

তপন কুমার দাশ

ঢাকা থেকে চেন্নাই হয়ে উড়ুছলাম মালে শহরের দিকে। রাত সাড়ে বারোটার দিকে কমে এলো মালদ্বীপ এয়ারলাইন্সের মাঝারি সাইজের বোয়িংটির গতি। ধীরে ধীরে বিমানটি কিছুটা বামদিকে কাত হয়ে গেল। আর তখনই কিছুটা মিনমিনে কিছু বিশুদ্ধ ইংরেজিতে পাইলট জানিয়ে দিল আমরা মালদ্বীপের এয়ারপোর্টের আকাশে পৌঁছেছি। সঙ্গে সঙ্গেই যাত্রীদের সিট বেল্ট বাঁধার অনুরোধ জানিয়ে সিটের মাঝখানের ফুটপাথ দিয়ে দ্রুত হেঁটে গেল শ্যামলা সুন্দরী বিমানবালা, বাংলাভাষাতেও সিট বেল্ট বাঁধার অনুরোধ জানানো হলো। অনেক বাঙালি শমিক রয়েছে এয়ারক্রাফটে। তাদের উদ্দেশ্যেই মূলত বাংলায় সিট বেল্ট বাঁধার অনুরোধ জানানো হয়েছে।

ততক্ষণে খেট করে খুলে গিয়েছে এয়ারক্রাফটের চাকা। আমি জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখলাম আকাশে জ্বলজ্বল করছে বিশালাকার চাঁদ। মনে হয়,

যেন একেবারে হাতের কাছে। সঙ্গে লক্ষ-কোটি তারা। সত্যি বলতে কী, এমন বলমলে চাঁদ ঢাকায় বহুদিন দেখিনি। এটা চাঁদের কার্পণ্য নয়, বরং ঢাকার আকাশে উড়ে বেড়ানো ধুলোময়লাই আমাদের থেকে আড়াল করে রাখে এ সুন্দর চাঁদ আর আকাশটাকে।

আমি পরিষ্কার দেখতে পেলাম ভারত মহাসাগরের বিস্তীর্ণ জলরাশি। মৃদু ঢেউ তোলা এ সাগরজলে মুক্তোর মতো জ্বলজ্বল করছে শত-সহস্র লাল, নীল, সবুজ আর হলুদ বাতি। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে আশপাশে ভাসছে অজস্র বোট। আর মাঝে মাঝেই দেখা যাচ্ছে দ্বীপের মতো গাছপালা, ঘরবাড়ি সমেত কিছু কিছু এলাকা, জনবসতিস্থল। সেখানেও তীব্র আলোর ছড়াছড়ি।

তার মধ্যেই জলের সীমানা ছাড়িয়ে একরকম হঠাৎ করেই আমাদের এয়ারক্রাফটি যেন লাফিয়ে পড়ল রানওয়ার ওপর। দু'পাশেই জলরাশি। কিন্তু মাঝখানে

প্রায় আধা কিলোমিটার চওড়া এ স্থলভাগের মাঝখানেই তৈরি হয়েছে রানওয়ে। নিমিষে আমরা পৌঁছে গেলাম টার্মিনালের এরাইভাল অংশে। এখানে পাসপোর্ট জমা দিতেই ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ ভিসার সিল দিয়ে দিল। অবশ্য অত্যন্ত মৃদুস্বরে জানতে চেয়েছিলেন ইমিগ্রেশন অফিসার, আপনি কোথায় যাবেন? মিনিস্ট্রি অব এডুকেশন-এর নাম বলাতে আর কথা বাড়াননি। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ইমিগ্রেশনের ফর্মালিটিজ সেরে লাগেজ বেল্টে আসতেই সালাম জানিয়ে হাত বাড়িয়ে দিলেন মালদ্বীপে বাংলাদেশ দূতবাসের তিন নাম্বার কর্মকর্তা হারুন-অর-রশীদ। কুচকুচে কালো স্যুটের সঙ্গে ম্যাচ করে কালো টাই আর কালো সু-এর সঙ্গে যেন একাকার হয়ে গেছে ভদ্রলোকের হলুদ মুখমণ্ডলের দু'ধারে অত্যন্ত পরিপাটি করে সাজানো কালো দাড়ি। তার সঙ্গে থাকা দুজন বাঙালিই ধরাধরি করে আমাদের লাগেজপত্র টেনে বোটো ভুলে ফেলল। আমরাও হারুন-অর-রশীদে সঙ্গে গিয়ে বোটো উঠে গেলাম। আমরা উঠতেই চালক বোট ছেড়ে দেয়ার সংকেত জানাল। আর সঙ্গে সঙ্গেই গর্জন করে একটু পেছনে সরে এসে মাথা উঁচু করে যেন এক লাফ দিয়ে বোটটি ছুট দিল সামনের দিকে। হারুন-অর-রশীদে পাশে বসেই বললাম, আপনি নিশ্চয়ই 'কবি প্রতীক রশীদ', আর আমার নাম 'তপন'। ঢাকা থেকে কবি সুমন সরদারের মোবাইল ফোন থেকে আপনার সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। এ কথা শুনাই ডান হাত দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন কবি প্রতীক রশীদ। বললেন, সুমন সরদার আমার বন্ধু। তিনি কেমন আছেন? আমি সুমনের কুশল জানালাম। বোটো বসেই জানলাম মালদ্বীপের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরটি একটি আলাদা দ্বীপ। অনেক দেশ থেকেই বিমান আসে এখানে। এমিরাতস, লঙ্কান, ইন্ডিয়ান বিমানের পাশাপাশি মালদ্বীপস এয়ারলাইন্সের দু'তিনটি বিমানও এখন পাল্লা দিয়ে ছুটেছে উত্তরে-পশ্চিমে। তবে যারাই যেখান থেকে আসুন না কেন, আর মালদ্বীপের যেখানেই যান না কেন, বোটো উঠতেই হবে। মালদ্বীপের মূল ভূখণ্ড মালে শহর। এখানে সব অফিস, আদালত, মন্ত্রণালয়, উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ব্যবসায়-বাণিজ্য ইত্যাদি পাঁচ থেকে দশ মিনিটের মধ্যেই এয়ারপোর্ট থেকে মালে পৌঁছা যায়, তবে বোট বা জাহাজে। আমরাও কয়েক মিনিটের মধ্যেই পৌঁছে গেলাম এয়ারপোর্টে। সেখানেই আমাদের জন্য দেড়টনি ট্রাকের মতো একটি ছোট ট্রলি দাঁড়ানো ছিল। অ্যামবাসি থেকে ভাড়া করা এ ট্রলিতে মালপত্র উঠিয়ে সঙ্গে থাকা মোট চারটি ট্যাক্সিতে চড়ে আমরা রওনা হলাম হোটেল মোকাই সুইটস-এর দিকে। স্থলভূমি কিংবা পাকা সড়ক থেকে মাত্র দেড় ফুট নিচে থাকা সাগরের জলরাশির ছোট ছোট টেউগুলোকে ডানপাশে রেখে বামপাশে ফলমূল ও শাকসবজি আর মাছ বাজার ছাড়িয়ে আমরা বামদিকে একটু মোড় নিয়ে ডানদিকে একটু আসতেই পেলাম মালদ্বীপস পুলিশ হেড কোয়ার্টার। তারপরই রাস্তার ধারে হোটেল মোকাই সুইটস। একেবারেই ছবিতো যা দেখেছিলাম তার মতোই এ হোটেলটির অবয়ব। কাঁচের দরজা টেনে রিসিপশনে প্রবেশ করতেই মাথা নুইয়ে সালাম জানিয়ে আমাদের বরণ করে নিল

সুদর্শনা দুই তরঙ্গী। শ্যামলা কিন্তু অত্যন্ত মায়াবী এই দুই তরঙ্গী আমাদের কক্ষের চারি বুঝিয়ে দিয়ে সকাল ৮টার মধ্যে নাস্তার জন্য ক্যাফেটেরিয়ায় আসার অনুরোধ জানাল। আমরা সেখানে দাঁড়িয়ে মি. রশীদসহ দূতবাসের প্রতিনিধিদের শুভরাত্রি বলে বিদায় জানালাম। অতঃপর লিফটে চড়ে পাঁচশ' দুই নাম্বার কক্ষে এসে পৌছলাম মালদ্বীপে সময় রাত প্রায় ১টা। ফাইভস্টার মানের এ হোটেলটিকে আমাদের দেশের গুলশান এলাকার অতি সাধারণ হোটেলের সঙ্গে তুলনা করা চলে। অথচ এক কক্ষের ভাড়া প্রায় দুইশ' ডলার। আমি পেননের জানালার পর্দা সরিয়ে দেখলাম পাশেই রাস্তার অপর পাশে একটি সিনেমা হল। দু'এক জোড়া কাপলকেও মোটরবাইকে চড়ে এদিক-সেদিক যাওয়া-আসা করতে দেখলাম। নিকট দূরে সাগরে দাঁড়িয়ে থাকা মাছ ধরার বোটগুলো দেখতে পেলাম। দেখতে পেলাম সাগরের জলে প্রতিবিম্বিত হয়ে আছড়ে পড়া অজস্র তারার আলোর সঙ্গে শত শত লাল-নীল বাতির আলো। পরদিন হোটেল মোকাই সুইটসের ছোট ক্যাফেটেরিয়ায় দুধের সঙ্গে কর্নফ্লাক্স, সাউথ ইন্ডিয়ান স্বাদের নাস্তা সেরে সকাল ৮টায় লাউঞ্জে এলাম। সেখানেই হাত বাড়িয়ে হ্যান্ডস্যাক করে মালদ্বীপে আমাদের স্বাগত জানালো শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা এম. এস. শর্মা। কালো টাইটসের সঙ্গে হালকা কমলা প্রিন্টের শার্ট, পায়ে কালো সু. একটু ভারী শরীর, মাথায় কালো ওড়না পের্টিয়েছে মেয়েটি ইন্দোনেশিয়ার মেয়েদের মতো করে। লম্বাটে এ মেয়েটিকে দারুন দেখাচ্ছিল। তার অনুরোধে হোটেলের রিসিপশনে একে একে তিনটি ট্যাক্সি এলো। আমরা পাঁচ সাত মিনিটের মধ্যেই পৌঁছে গেলাম শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের গেটে। বলে রাখা দরকার, মালেশহরের আয়তন নয় বর্গ-কিলোমিটার। যা দৈর্ঘ্যে ছয় কিলোমিটার আর প্রস্থে তিন কিলোমিটারের মতো। এখানে যানবাহন মানেই ট্যাক্সি। আর মালপত্র আনা-নেয়ার জন্য ছোট ছোট লরি। মন্ত্রী থেকে শুরু করে শিক্ষক, শিক্ষার্থী কিংবা জেলে সবাই ব্যাটারিচালিত মোটরবাইক ব্যবহার করে। সর্বত্রই রাস্তার দু'পাশে সারিবদ্ধভাবে রাখা থাকে মোটরবাইক। তার মাঝখান দিয়ে চলাচল করে মানুষ। শিক্ষা মন্ত্রণালয় সে যাক, লিফটের ছয় তলায় উঠে ডানদিকের কক্ষে প্রবেশ করতেই আমাদের স্বাগত জানানেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রী মি. আদম শরীফ। আদম শরীফের গায়ের বর্ণ একেবারেই ফর্সা ইংরেজদের মতো। আর তার সঙ্গে থাকা নীলাভ ফুলপ্যান্টের সঙ্গে সাদা শার্ট আর গোলাপি সবুজাভ ওড়নায় মাথা পৌঁচানো ডেপুটি মিনিস্টারকে দেখে মনে হচ্ছিল বলিউডের কোনো নায়িকা। তারা দুজন মিলেই আমাদের পাশের সভাকক্ষে নিয়ে বসতে বললেন। অত্যন্ত সাদামাটা আমাদের দেশের প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের সভাকক্ষের মতো একটি কক্ষ। তবে এ কক্ষটি আরো অনেক ছোট। সেখানেই মালদ্বীপের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে একটি পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন দিলেন মাননীয় মন্ত্রী। প্রণোত্তরে অংশ নিলেন ডেপুটি মন্ত্রীও। তিনি মূলত নারী উন্নয়ন বিষয়ে কথা বললেন। তারা বললেন, মালদ্বীপের জনসংখ্যা বর্তমানে ৩ লাখ ৮০ হাজারের মতো। এর মধ্যে শতকরা

চুরানবই জনই লেখাপড়া জানে। তারা প্রায় সকলেই লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃত দশম শ্রেণির শিক্ষামান সম্পন্ন। এসব শিক্ষার্থী অনায়াসেই বিলেতে গিয়ে ক্যামব্রিজসহ যে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি হতে পারে। এরপর আমরা কথা বললাম স্কুল হ্যাপিনেস প্রোগ্রামের মহাপরিচালক ফাতেমা আজ্জার সঙ্গে। তিনি বললেন, বিশেষ করে দূর-দূরান্তের দ্বীপগুলোতে দেখা যায় কিছু কিছু শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ে আসতে চায় না। তাদের জন্য রয়েছে হাতেকলমে প্রশিক্ষণ নিয়ে দক্ষতা অর্জন করে চাকরিজীবনে প্রবেশ করার সুব্যবস্থা। মহাসাগরের বুকে ডুসাঁতার দিতে শেখা, নাচ-গান শেখা, হোটেল রিসোর্টে অতিথি আপ্যায়ন কিংবা খেলাধুলায় প্রশিক্ষণ নেয়ার সুযোগও রয়েছে তার কার্যক্রমে। আমাদের দেশের শিক্ষা নিয়েও কথা উঠল। আমরা মূলত প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ড. জ্ঞানেন্দ্র প্রসাদের নেতৃত্বে মালদ্বীপে শিক্ষা সফরে এসেছি। গণসাক্ষরতা অভিযান কর্তৃক আয়োজিত এ সফরে আমাদের সঙ্গে ছিলেন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. আলমগীর। তিনি বললেন, আমাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের সংখ্যা প্রায় বিশ মিলিয়ন। আর শিক্ষক রয়েছে প্রায় চার লাখ, যা মালদ্বীপের জনসংখ্যার চেয়েও বেশি। এ কথা শুনে বিস্মিত হলেন মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ও সহকারী মন্ত্রী। মন্ত্রণালয়ের সভা শেষ করে নিচে এসে দাঁড়িয়ে ট্যাক্সি ডাকলাম, হোটলে ফিরে আসব বলে। ড. জ্ঞানেন্দ্র ও ড. সৌরভ সিকদার ততক্ষণে হাঁটা দিয়েছে হোটেলের উদ্দেশ্যে। আমরা ট্যাক্সিতে চড়ে হোটলে এসে দেখি তারা লাউঞ্জে বসে আছে। সে যাই হোক, ভাত খাওয়ার জন্য আবার রাস্তায় এলাম। হোটেলের পেছনেই রয়েছে একটি খাবারের দোকান। কাচের দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকেই দেখি ভাত, মাছসহ নানা রকমের তরকারি কাচের বস্ত্রে সাজানো। আমাদের ডিজিসাহেব এগিয়ে গিয়ে একটু ভর্তার মতো কী যেন দেখে জানতে চাইলেন, হোয়াট ইজ দিস। কালো প্যান্টের সঙ্গে লালশার্ট ও কালো টাই পরা ওয়েটার উত্তর দিল, দিস ইজ মুসি, মুসি মেশ। মহাপরিচালক সাহেব আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, আমাদের বেগুন ভর্তার মতো। তক্ষুনি ওয়েটার বলল, ওটা বেগুন ভর্তাই স্যার। আরে বাঙালি নাকি! ছেলেটি বলল জি স্যার, এ দোকানে সব কর্মচারীই বাঙালি। সে আরো বলল, মালদ্বীপের সব খাবারের দোকানেই বাঙালি ছেলেরা কাজ করে। সাধারণত সাউথ ইন্ডিয়ানরাই এসব দোকান চালায়। সে যাক, সেদিন মাছ, ভর্তা আর ডাল দিয়ে ভাত খেলাম। তারপর হোটলে এসে কিছুক্ষণ রেস্ট নিলাম। এরপর একটি টি শার্ট গায়ে চাপিয়ে বেরিয়ে পড়লাম মালদ্বীপ দেখব বলে। হোটেলের সামনের রাস্তাটি পিচ ঢালা নয়। মনে হয় যেন পোড়া মাটির টাইলস বসানো। এই রাস্তা ধরে পঞ্চাশ গজ ডানদিকে গিয়ে সাগরের পাড় ধরে হাঁটতে হাঁটতে এক কিলোমিটারের মতো সামনে গেলাম। এখানে পৌঁছেই দেখি মালদ্বীপ যেন থেমে গিয়েছে। এখানে সব মানুষ বিদেশি। চমৎকার সুন্দর করে এখানে সাগরের পাড় বেঁধে দেয়া হয়েছে উঁচু করে। সেই পাড়ের গায়ে আছড়ে পড়ছে নীলসাগরের সবুজ

ঢেউগুলো। একটু সামনে গিয়ে দেখলাম সিঁড়ি দেয়া একটু উঁচু স্থান। সেখানে অনেক পর্যটক। চীনাাদের একটি দলকেও দেখলাম। অস্ত্রচলগামী সূর্যের বিদায়ী দৃশ্যধারণ করার জন্য তারা বেইজিং থেকে এসেছে। বিকেল তিনটা থেকে ক্যামেরা সেট করে তারা এদিকসেদিক ঘোরাঘুরি করছে। চীনা ফিল্মের সঙ্গে যুক্ত একেবারেই স্নিম নায়িকারাও রয়েছে এ দলে। তাদের কাছেই জানলাম, সূর্যাস্ত ধারণ করার জন্য পৃথিবীর সর্বোৎকৃষ্ট রোমাঞ্চকর স্থান এটি। সে রোমাঞ্চের ভাগিদার হওয়ার জন্যই হংকং হয়ে তারা গতকাল মালদ্বীপে এসেছে। থাকবে সাত দিন। তারপর দুবাই হয়ে চলে যাবে গ্রিসের সমুদ্রতটে। বলমলে গ্রীষ্মের খোলামেলা সমুদ্রতটে গাউন পরা চীনা নায়িকাদের সঙ্গে যখন ছবি তুলছিলাম তখন দেখি পশ্চিম আকাশ লালে লাল হয়ে গেছে। আর তার নিচে ভারত মহাসাগরের জল ধারণ করেছে লাল রঙ। আমাদের সামনের জল একেবারেই সবুজ। এ সবুজ জলের মধ্যে ছোট মাছ বড়শিতে গাঁথে প্রায় ত্রিশগজ দূরে ছুড়ে মারছে বিদেশি তরল-তরলীরা। আর মাঝে মাঝেই টেনে তুলছে বড়শিতে গাঁথা দুতিন কেজি ওজনের সামুদ্রিক মাছ। ওগুলো হাতে করে ঝুলিয়ে দৌঁদৌঁড়িও করছে কেউ কেউ। আমাদের দৃষ্টির সামনে প্রায় একশ' গজ দূরের জলরাশিকে মনে হচ্ছে ঘননীল। এক কিলোমিটার দূরের জলে যেন গোলাপি আভা আর কয়েক কিলোমিটার দূরে আকাশ আর সাগর যেখানে একাকার হয়ে গেছে সেখানে মনে হলো আগুন লেগেছে। এমন লাল যেন আর এ জীবনে দেখিনি। আমার পাশেই ক্যামেরার লেন্সে চোখ রেখে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে সে রূপই দেখছিলেন চীনা ছায়াছবির পরিচালক ও ক্যামেরাম্যান টোয়ান জিংয়া। তিনি আমাকে ইশারায় ডেকে লেন্সে চোখ রাখতে বললেন। আমি তাই করলাম। বিস্তৃত হলম জিংয়া'র এ ফ্রেমিং দেখে। আমি লেন্স থেকে চোখ সরিয়ে এনে নিজের ক্যামেরাটা অন করে চীনা সুন্দরী যুগলের ছবি উঠাতে গেলাম। তৎক্ষণাৎ তারা পোজ দিতে উদ্যত হলো। ছিপছিপে পাতলা লম্বা এ দুজন নায়িকা তক্ষুনি একে অপরের কোমরে জড়িয়ে একদম গায়ের সঙ্গে লেগে গেল এবং কোমর থেকে শরীরের উপরিভাগ পেছনের দিকে এলিয়ে দিল। একজনের পরনে গোলাপি আর অন্যজনের পরনে হাঁটু অবদি হলুদ প্রিন্টের গাউন। মাঝখানে থাকল ভারত মহাসাগরের সুনীল জলরাশির মধ্যে ডুবতে থাকা জলন্ত এক অগ্নিপুণ্ড। চীনা নায়িকাদের আগুন বারানো রূপমালদ্বীপের এ গোখুরিলেবোয় রচনা করল এক অভূতপূর্ব দৃশ্য, যা ধারণ করে ধন্য হলাম। হাত মেলালাম নায়িকাদের সঙ্গে, পরিচালকের সঙ্গে। একরকম হঠাৎ করেই দেখি ড. জ্ঞানেন্দ্র আর সৌরভ সিকদার সমুদ্রের পাড়ঘেঁষা পথ ধরে দ্রুত হাঁটা দিয়েছেন সামনের দিকে। মুহূর্তেই তারা চলে গেলেন প্রায় আধা কিলোমিটার। ফোন করে জানতে চাইলাম কী হলো, কোথায় যাচ্ছেন? পেছন ফিরে পশ্চিম দিকে সাগরের বুকে আবছা আবছা দেখা যাওয়া দ্বীপটির দিকে আঙুল উঁচিয়ে চিৎকার করে সৌরভ বলল। গিলিগিনি, গিলিগিনি। তার মানে, ঐষে ডানদিকে যে দ্বীপটি দেখা যাচ্ছে সেটার নাম হিলিগিলি। মাইল খানেক সামনেই রয়েছে পোর্ট। সেখান থেকে মিনিটে মিনিটে বোট ছাড়ে আর গিনিহিলি পৌঁছে দশ মিনিটের মধ্যেই। ভাড়া প্রতিজন

পাঁচ রুপেয়া। তারা দু'জন এখন সেদিকেই রওনা হয়েছেন। আমার সঙ্গে ছিল খাগড়াছড়ির মথুরা ত্রিপুরা। চীনা নায়িকাদের সঙ্গে ছবি তোলায় সময় তাকে একেবারে চীনা নায়ক বলেই মনে হচ্ছিল। তাকে টেনে এনে আমরা দু'জনও গিনিগিনির উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। দশ মিনিট হেটেই ক্লান্ত হয়ে পড়লাম। সেখানে থেকেই দেখলাম অনেকগুলো বোট আসা-যাওয়া করছে। কিন্তু ততক্ষণে ভারত মহাসাগরের সব রঙ মন্দা হতে শুরু করেছে। সূর্যদেবের বিদায়ের বিষাদ যেন সবকিছুকে কালিমাময় করতে শুরু করে দিয়েছে। আবার ফোন করে ড. সৌরভের সঙ্গে কথা বললাম। আজ আর এ অন্ধকারে অজানা দ্বীপে যেতে বারণ করলাম। তাতে কাজও হলো। একসঙ্গেই রওনা হলাম হোটেলের উদ্দেশ্যে। এ হোটেলের গার্ড হিসেবে কাজ করে ব্রাহ্মণাড়িয়ার সোবহান। হোটেলের আসতেই সে জানতে চাইল, আজ কিতা দেখলো? চীনা নায়িকাদের কথা বলতেই সে বলল, মালদ্বীপের বাইরে অনেক রিসোর্ট আছে, যেগুলো এক একটি দ্বীপ। সেগুলোতে গেলেই দেখা যাবে বিদেশিদের। সে আমাদের একদিন সেদিকে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব দিল। সেদিন এয়ারপোর্টে থাকাকালীনই প্রতীক রশিদ জানিয়েছিল মালে শহরে কোনো রকম মদ, জুয়া, নেশা, কিংবা অনৈতিক কার্যকলাপের কোনো সুযোগ নেই। তবে বিদেশিদের জন্য আলাদা আলাদা দ্বীপে যেসব রিসোর্ট আছে সেখানে পানাহার চলে। বিদেশিরা সেসব পানীয় সঙ্গে করেই নিয়ে আসে। এখানে শুধুমাত্র এয়ারপোর্টে মদের একটি বৈধ দোকান আছে। এখান থেকে হচ্ছে করলেই শুধু বিদেশিরা মদ কিনতে পারে বলেও এ রাষ্ট্রদূত আমাদের জানিয়ে দিলেন। আমরা এসব কিছু আগে থেকেই জানতাম। ড. সৌরভ ইউরোপে থেকেছে দীর্ঘদিন। লীডস, লন্ডন, টোকিও কিংবা ওয়াশিংটনের অলিগলি দু'চারটে আমারও চেনা। আর মথুরা বিকাশ ত্রিপুরা তো ঐতিহ্যগতভাবেই এসব কিছুর সঙ্গে পরিচিত। তাই আসার সময় ড. সৌরভ ও মথুরা মিলে একটি বড়সড় রেড লেভেল নিয়ে এসেছে। মথুরার কক্ষে বসে যখন চুমুক দিছিলাম তখন কড়া মিউজিক ভেসে আসছিল পাশের সিনেমা হল থেকে। 'হাবিবি হাবিবি' করে আরবীয় সুরের এ গানটি তখন মালদ্বীপে খুবই জনপ্রিয়। পরদিন সকাল ৮টায় গোলাম জামালুদ্দিন হাইস্কুল দেখতে। চমৎকার সুসজ্জিত গোটে যখন এসে দাঁড়িলাম তখনি মোটরবাইক থেকে নামলেন এ স্কুলের প্রধান শিক্ষক। তিনি আমাদের সঙ্গে পরিচিতি হয়ে বললেন, বছর দশেক আগেই তো আমরা ঢাকা গিয়েছিলাম। সেখানে একটা এনজিওর প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম দেখছি। কীভাবে শিক্ষার্থীদের কাজের মাধ্যমে শিক্ষা দিতে হবে তা তো সেই এনজিও থেকেই আমরা শিখেছি। প্রধান শিক্ষকের এ কথা শুনে সবাই একে অপরের দিকে চাইল। মহাপরিচালক মহোদয় বললেন, কোন এনজিও? নিশ্চয়ই ব্র্যাক। আমি বললাম না, জিএসএস। জিএসএসএর নাম শুনেই ভদ্রলোক বলে উঠলেন। ইয়েস, উই হেভ বিন টু ঢাকা টু ডিজিট এডুকেশন প্রোগ্রাম অব জিএসএস। হলুমালেহ

দুপুর ঠিক দুটোয় সি-পোর্টে এসে হাজির হলাম। আগেই এসে দাঁড়িয়ে আছে শর্মা। আজ তার সঙ্গে তার সহকর্মী হানিফও রয়েছে। আমাদের দেখেই শর্মা পাশে দাঁড়িয়ে থাকা বোটটি দেখিয়ে বলল, উঠুন বোটে উঠে যান। এখানে ছোট্ট একটি প্লাটফর্ম রয়েছে সেখানেই টিকিট বিক্রি হয়। একটার পর একটা বোট এসে পন্থুনে দাঁড়ায়। ছেড়ে যায় দু'মিনিটের মধ্যেই। সবগুলো একই রুটে যায় না। কোনোটি যায় দূরে, কোনোটি কাছের কোন দ্বীপে কিংবা যায় একে একে বিভিন্ন দ্বীপে। আমাদের বাস স্টপেজের মতো। স্থানীয়রা জানে কোন বোটটি কোথায় যাচ্ছে। সেখানে নামার দিয়ে তা লেখাও আছে। আজ শর্মা পরেছে হালকা মেরুন রঙের প্যান্ট, গায়ে একটি ছোট কোর্টও চাপিয়েছে, মাথায় যথারীতি মেরুন রঙের স্কার্প। আজ এখানে অনেক জাপানি ছেলে-মেয়েরা এসেছে। তারাও আমাদের সঙ্গে একই বোটে যাবে মনে হয়। জাপানি মেয়েরা মাথায় খুব সুন্দর হ্যাট পরেছে। ওদের প্রায় সবার চোখেই কালো চশমা। সূর্যের প্রখর তেজ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যই বোধ হয়। শর্মা এসে বসতেই বোট ছেড়ে দিল। মুহূর্তে পঞ্চাশ ষাট জন যাত্রী নিয়ে নেচে উঠল বোটটি। কিছুটা ধীরে হলে দূরে রওনা হলো মালে থেকে উত্তর-পশ্চিম দিকে, সূর্যের একেবারে বিপরীতে। আধাঘণ্টা কিংবা চল্লিশ মিনিট লাগবে হলুমালেহ দ্বীপে পৌঁছাতে। অসংখ্য ছোট বড় বোট চলাচল করছে এদিকে সেদিকে। আশপাশ দিয়ে কিছু কিছু স্পিড বোট ছুটে যাচ্ছে প্রায় শতক মাইল বেগে। সাদা সাদা এ প্যাসেঞ্জার বোটগুলো প্রায় আধা কিলোমিটার সামনে চলে যাওয়ার পরও পেছনের বিভক্ত জলরাশি আর তার সাদা ফেনা মিলিয়ে যায় না। পাশ দিয়ে এরকম একটি স্পিড বোট যেতেই দূলে উঠল আমাদের বোটটি। শর্মা বলল, ও কিছু না। আমরা একটু আঁকাবাঁকা হয়ে আবার সোজা হয়ে বসলাম। শর্মা বলল, হলুমালেহ দ্বিগুণ নতুনভাবে তৈরি। এখনও এ দ্বীপের নির্মাণ কাজ শেষ হয় নি, ভরাটের কাজ চলছে। আর ধীরে ধীরে অফিস আদালত স্থাপিত হচ্ছে এখানে। ভরাট হচ্ছে মানে? কী ভরাট হচ্ছে? কেন ভরাট হচ্ছে? শর্মা বলল, আসলে সাগরের বুক চিরে মাটি তুলে এনে বড় করা হচ্ছে এসব দ্বীপের স্থলভাগ। আর উঁচু করা হচ্ছে ক্রমাগত। এই তো ২০০৪ সালে এ হলুমালেহ দ্বীপের নির্মাণ কাজ শুরু করেন প্রেসিডেন্ট মামন আব্দুল গাইয়ুম। সিংগাপুরের এক কোম্পানি এখানে দালানকাঠা নির্মাণ করছে, গড়ে তুলছে একটি আধুনিক শহর। রাজধানী মালে শহর যদি ডুববেই যেতে থাকে তাহলে হয়ত এ দ্বীপেই স্থাপিত হবে মালদ্বীপের রাজধানী। এরই মধ্যে এ দ্বীপে বসতি স্থাপন করেছে প্রায় শ' পাঁচেক পরিবার, তৈরি হয়েছে শ'-খানেক হোটেল, স্কুল-কলেজও নির্মিত হয়েছে। আমরা আজ গোলমালেহ এসেছি মূলত এখানে নবনির্মিত রেহেন্দী সেকেন্ডারি স্কুল দেখার জন্য। বোট থেকে নেমেই চক্ষু চড়কগাছ। এত সুন্দর উপকূলভাগ জীবনে দেখছি বলে মনে হয় না। একমুঠো বালুকা হাতে নিয়ে ঝুরঝুর করে নিচের দিকে ছেড়ে দিলাম। একটি ধূলিকণাও পাশের দিকে

উড়ে গেল না। পড়ে গেল সোজা নিচের দিকে। কারণ এগুলো সবই হচ্ছে ভারত মহাসাগরের বুকে সৃষ্ট কোরালের জীবশা।

কালো রঙের একটি মাইক্রোবাসে চড়েই এলাম রেহেন্দী স্কুলে। মাইক্রোবাসটি চালাচ্ছিল কুমিল্লার এক যুবক, নাম হোসেইন। সে বলল এ দ্বীপে নির্মাণ শ্রমিক হিসেবে কাজ করছে প্রায় দশ হাজার বাঙালি যুবক। সে যাক, বিশালকার মাঠের দক্ষিণ পাশ দিয়ে প্রবেশ করলাম রেহেন্দী স্কুলের অফিস কক্ষের পাশের হল রুমে। এ বিশাল মাঠের পশ্চিমপাশ এবং উত্তরপাশ পুরোটাই ছয় তলা দালান। উজ্জ্বল ফিরোজা রঙের দেয়াল আর হালকা নীল রঙের কাঠামো সম্বলিত এ বিশাল দালান ঘর দেখে মন জড়িয়ে গেল।

আমরা পৌছামাত্র কালো বোরখাপরা খোলা মুখমণ্ডলে হাসির ঝিলিক তোলা শ্যামলা গোছের তরুণীরা আমাদের হাতে তুলে দিল স্ট্র-সমেত গেরুয়া রঙের এক একটি ডাব। ডাবের কাটা অংশে লাগানো এক একটি চমৎকার হলুদ আর সাদা মেশানো বড় বড় করবী ফুল। ডাবের জল ঠোঁটে লাগতেই করবী ফুলের বোঁটা থেকে খসে পড়া একটুখানি মধু যেন জিহ্বায় ছোঁয়া দিয়ে গেল। আমাদের স্বাগত জানিয়ে প্রধান শিক্ষক বললেন, উজ্জ্বল নীলাকাশ আরসুনিল জলরাশির রঙের সাথে মিল রেখে এ বিশাল ভরনের রঙ ও নকশা নির্মিত হয়েছে। বিশাল আকারের প্রায় পঞ্চাশটি কক্ষ রয়েছে এ স্কুলে। শিক্ষার্থীদের পোশাক একেবারেই সাদা, ছেলে-মেয়ে উভয়েরই।

আমরা ঘুরে ঘুরে পুরো স্কুলটাই দেখলাম। স্কুলের কমনরুম বসে শিক্ষক ও অভিভাবকদের সঙ্গে মিটিং করলাম। একজন শিক্ষক চমৎকার করে একটি প্রজেন্টেশন দিলেন। তিনি বললেন, এই প্রথম একজন নারীর নামে এ স্কুলের নামকরণ হয়েছে। আমাদের সঙ্গে থাকা যুগ্ম সচিব রুহী রহমান এ কথা শুনে কিছুটা উৎফুল্লই হলেন। তিনি জানতে চাইলেন, কে এই ভাগ্যবান নারী?

শিক্ষক বললেন, তিন বারে প্রায় বারো বছর ধরে মালদ্বীপের প্রধান শাসক ছিলেন রানী রেহেন্দী শায়েরি রাধা। তার নামেই ২০১৫ সালে এ স্কুলটির উদ্বোধন করা হয়। এ শিক্ষক বলেন, অচিরেই রেহেন্দী স্কুল মালদ্বীপের সেরা স্কুলে পরিণত হবে। এ স্কুলে মালদ্বীপের শিক্ষকদের সঙ্গে ভারত, শ্রীলংকা ও ইউরোপীয়ান শিক্ষকরা কাজ করছে। একটি শ্রেণিকক্ষের বাইরে জটলা করছিল আমাদের দলের প্রায় সবাই। আমিও উঁকি দিলাম। দেখি ভিতরে নাচের ক্লাস চলছে। সম্পূর্ণ হিজাব করা লম্বা পাতলা একজন মেয়ে শিক্ষিকা শিক্ষার্থীদের ওয়েস্টার্ন ড্যান্স শিখাচ্ছেন। নাইন-টেনে পড়ুয়া এসব শিক্ষার্থীর মধ্যেও কয়েকজন হিজাবধারী রয়েছে। অভিভাবকরাই বাড়ি থেকে আমাদের জন্য নাশতা তৈরি করে এনেছে। চমৎকার বিলতিত কায়দায় তারা মালদ্বীপের ঐতিহ্যবাহী খাবার পরিবেশন করল। একজন বলল, উই আর মালদেভিয়ানস, বাট উই লার্নড ইংলিশ কালচার। ইট কুড বি সেইড দ্যাট ইটস এ গুড মিকশচার।

স্কুল থেকে বের হওয়ার পথে দেখলাম একটি মিনি জাদুঘর। শিক্ষার্থীরাই তৈরি করেছে। এখানে একটি আশু নারকেলের ডগা কেটে এনে পাতাগুলোকে দুপাশ থেকে নিচের দিকে নামিয়ে দেয়া হয়েছে।

তারপর ওপর থেকে ডগার কাণ্ডটি সামনের দিকে নামিয়ে এনে প্রান্ত দেশ সমান মধ্য খানে কেটে দুই পাশে ছড়িয়ে দিয়ে হা করা কুমিরের একটি মডেল তৈরি করা হয়েছে। এ আইডিয়া দেখে মুগ্ধ হলাম, এদের শৈল্পিক বোধের তারিফ করলাম। কুইন রেহেন্দীকে মনে মনে ধন্যবাদ জানিয়ে একই মাইক্রোবাসে চড়ে বসলাম। ডানদিকের একটি গলি দেখিয়ে হোসেইন বলল, এটা রেসিডেন্সিয়াল এলাকা, দুই পাশেই ঘর-বাড়ি। বড় বড় চোখ তুলে সদা-হাস্যোজ্জ্বল মুখে উৎসুক্যের সোনালি আভা ছড়িয়ে ড. সৌরভ বলল, বিচ কোথায়? এই বাড়িগুলো পার হলই, এই তো সামনে। দুই মিনিটের মধ্যেই চলে গেলাম সাগরতটে। বলে রাখা দরকার, এখানে নির্দিষ্ট কোনো বিচ নেই, দ্বীপের চারপাশই বিচ। সবখানেই সাগর জলে নামা যায়। সাঁতার কাটা যায়। তবে নিজ দায়িত্বে। এখানেই দেখি সেই জাপানি ছেলেমেয়েদের কেউ সাঁতার কাটছে। কেউ ছবি তুলছে, কেউবা প্রিয়জনের কোমর জড়িয়ে ধরে ভয়ার্ত চোখে আমাদের দেখছে। আর একটু সামনে এগিয়ে দেখি একটি এলাকা সাগরের জল থেকে ওপরের রাস্তা পর্যন্ত শুকনো নারকেল পাতা আর সুপারির ডগা দিয়ে আড়াল করা।

ছোটবেলা নোয়াখালী এলাকায় গ্রামের পুকুরঘাটে দেখতাম এরকম শুকনো সুপারির ডগা বুলিয়ে ঘেরা দেয়ার দৃশ্য। সে দৃশ্য মালদ্বীপের এ আধুনিক সি-বিচে দেখেও কৌতুক অনুভব করলাম। ততক্ষণে সৌরভ সিকদার, মথুরা বিকাশসহ কেউ কেউ কাঁপিয়ে পড়ছে সমুদ্রে। প্রায় ১০০ গজ দূরে গিয়ে সৌরভ সিকদার জাপানি মেয়েদের ধবধবে সাদা শরীর ধোয়া জলের ছোঁয়া নিল। আমি মহাপরিচালক সাহেবসহ এসে বসলাম সাগরের জল ঘেঁষে। জ্ঞানেন্দ্র দার আপেক্ষ আগে জানলে তিনি শর্টস নিয়ে আসতেন। অগত্যা তিনি প্যান্ট খুলে ছোট অন্তর্বাসটি পরেই অবলীলায় নেমে গেলেন সমুদ্রে। অকুপণ ভারত মহাসাগরের সুনীল জলরাশী নিমিষেই আড়াল করে দিল সব অনাবরণ্ যা ছিল তার একান্ত অনিচ্ছার।

শর্মা বলল, আপনিও এই ঘেরা দেয়া অংশে প্রবেশ করতে পারবেন। তবে সে জন্য আপনাকে পাশের হোটেলের বর্ডার হতে হবে। এখানে সব ওয়েস্টার্ন ট্রানিস্টার আছে। তারাই এখানে বিকিনি পরে দৌড়াদৌড়ি করছে। কিংবা জলে সাঁতার কাটছে। তক্ষনি এক ইউরোপিয়ান নারীকে দেখলাম বিকিনি পরা অবস্থায় দুই হাতের তালুতে দুটি ডাব নিয়ে দৌড়ে আসছে। হলুদ রঙের এ কচি নারকেল আর তার গায়ের রং যেন একেবারেই একাকার। যেন তার জন্যই সেজেছে এই দ্বীপ, জন্ম দিয়েছে গাঢ় সবুজের বুকে এই হলুদ রঙের। এসব দৃশ্য বহু দেখেছি ম্যাগাজিনের পাতায় পাতায় আর টিভি সিনেমার পর্দায়। আজ সচক্ষু দেখে ধন্য হলাম।

শর্মা বলল, এসব দ্বীপে টাকা হলে সব পাওয়া যায়, সব সবকিছু। জীবন এখানে শুধুই উপভোগের আর বিলাসের। এখানে ডলার, ইউরো উড়ে বেড়ায়। জমা হয় মালদ্বীপবাসীর ক্যাশ বাক্সে। আমাদের সঙ্গে থাকা সায়কা আর সান্ত্বনা যখন পড়ন্ত সূর্যের আভা দেখতে দেখতে একটি দোলনায় বসে দোল খাচ্ছিল, তখন ওদের দিকে চেয়ে কিছুটা কৌতুক করেই শর্মা বলল, আমার নামের অর্থই তো

লজ্জা। আমাদের সমাজে মেয়ে মানাই তো লাজুক, আর এ জন্যই আমাদের এই পিছিয়ে পড়া। আমাদের সব সাধ-আহ্লাদ, তৃপ্তি এই দোলনায় দোল খাওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

সে যাক, সঙ্গে হওয়ার আগেই আবার একই বোটে ফিরে এলাম মাল্ভেতে। আসার সময় পথেই পড়ল এক বিরাট মিছিল। মালদ্বীপের ভাষা অর্থ্যাৎ দিবাহি ভাষায় তারা শ্রোগান দিচ্ছে আর আরবি ভাষায় লেখা প্লেকার্ড বহন করছে। জানা গেল- এটা বর্তমান শাসকের বিপক্ষের মিছিল। দেশের সকল যুবক শ্রেণি বর্তমান শাসকের বিপক্ষে। তারা মনে করে, এ শাসক গাইয়ুমের সহচর। সুতরাং তারা এ শাসকের পতন চায়।

হোটেল ফিরেই দেখি পাশের সিনেমা হলে ঝলমলে অবস্থা। ঝলমলে বাতির সঙ্গে সোনালি আর রূপালি জরি দিয়ে নির্মিত হয়েছে চমৎকার গেট। হাবিবি, হাবিবি করে আরবীয় সুরে হলিউডের গান বাজছে উচ্চৈঃস্বরে। কিছুক্ষণের মধ্যেই দামি মার্সিডিজ চড়ে এলেন মালদ্বীপের সেরা সুন্দরী এক নায়িকা। তিনি ফিতা কেটে একটি নতুন ছবির শো উদ্বোধন করলেন। ইচ্ছা হলো এ সিনেমা হলে ঢুকে সিনেমা দেখার। দেখা যাক কি হয়। এই ভেবে ঘুমাতে গেলাম।

মাফুসি

তার পরদিন সকালবেলা আমিনুদ্দিন স্কুল ভিজিট করলাম। দুপুর ঠিক দুই টায় এসে হাজির হলাম পাঁচ নাম্বার জেটিতে। এখান থেকেই স্পিড বোটে যাব মাফুসি দ্বীপে। আমাদের আগেই এসে পৌঁছেছে শর্মা। আজ তার সঙ্গে তার একজন বান্ধবীও এসেছে। সাগরের নীল জলরাশির চেয়েও যেন গভীর কালো দুটি চোখে আমাদের দিকে চেয়ে চমৎকার হাসি ছড়িয়ে দিয়ে বান্ধবী বলল, আই উইল জয়েন। ড. সৌরভ, ড. জ্ঞানেন্দ্র এবং আমাদের মনির তিনজনেই একসঙ্গে বলল, ওয়েলকাম।

আমাদের জন্য ঘাটে লাগানো ধবধবে সাদা রঙের স্পিড বোটটিও যেন দূলে উঠে আমাদের ওয়েলকাম জানাল। হাফপ্যান্ট আর স্যান্ডো গেঞ্জি পরা ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছরের এক যুবক আমাদের সবার হাত ধরে আমাদের একে একে বোটে উঠাল। সাদা রঙের কাপড়ে মোড়া চমৎকার সোফাবিছানো বিশ জনের সিট রয়েছে এ বোটটিতে। আমরা উঠে বসতেই গর্জন করে উঠল বোটের পিছনের অংশ। তক্ষণাৎ জল থেকে প্রায় আট ফুট উপরে উঠে গেল বোটের সামনের অংশ আমরা পিছনের দিকে হেলে পড়লাম। নিমিষেই বোটের স্পিড উঠে গেল ষাট, সত্তর কিংবা আশি। ভারত মহাসাগরের নীল জলরাশিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দুই পাশে ফেনিল ঢেউ তুলে প্রচণ্ড বেগে স্পিড বোট নিয়ে ছুটল কুচকুচে কালো চশমা পরিহিত প্রায় বিয়াল্লিশ ইঞ্চি বুকের ছাতিওয়ালা শ্রীলংকান চালক।

মাত্র ত্রিশ মিনিটের মধ্যেই আমরা প্রায় পঞ্চাশ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে পৌঁছে গেলাম মাফুসি। এ এক আশ্চর্য দ্বীপ। সম্পূর্ণ সাদা বালুকাবেলা, তার উপর ন্যাড়া ন্যাড়া লম্বা লম্বা নারকেল গাছের সারি। তার মাঝখানে দিয়ে হেঁটেই পৌঁছলাম মাফুসি স্কুলে। মাঠের চারদিকে ঘুরানো বিশাল স্কুল প্রাসাদ। মাঠের মাঝখানে একটি গাছতলে এসে বসতেই কালো বোরখায় ঢাকা শিক্ষিকা এবং অভিভাবকরা হাতে একটি করে ডাব এনে সুন্দর করে আমাদের হাতে

তুলে দিল। স্ট্রুতে ঠোঁঠ লাগিয়ে ডাবের সুমিষ্টজল পান করতে করতেই কথা হলো শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সঙ্গে।

শর্মার বান্ধবী এতক্ষণে তার মাথার স্কার্ফ খুলে ফেলেছে। বিলেতে থেকে সে ইতিহাসে পড়াশোনা করেছে। মালদ্বীপের ইতিহাসও তার ঠোঁটস্থ। সেই বলল, ছোট-বড় মিলিয়ে কয়েক হাজার দ্বীপ রয়েছে মালদ্বীপে। তবে সব দ্বীপে জনবসতি নেই। তার মধ্যে এই মাল্ফুসি দ্বীপও ছিল এক সময় জেলখানা। দাগী অপরাধীদের এখানে চালান করা হতো। ধীরে ধীরে এখানে গড়ে ওঠে জনবসতি, তাও প্রায় পনেরশ' বছর আগে।

দুই হাজার পাঁচ সালের সুনামিতে একেবারে লণ্ডভণ্ড হয়ে যায় মাল্ফুসি। ইউরোপিয়ান দেশগুলো, বিশেষ করে নেদারল্যান্ডস নৌবাহিনী এখানে ব্যাপক উদ্ধার কাজ চালায়। তারা আবার গড়ে তোলে মাল্ফুসিকে আরো মনোরম সাজে। প্রায় আড়াই হাজার জনসংখ্যা রয়েছে এখানে, তার মধ্যে হাজার খানেক বিদেশি। ইতোমধ্যেই প্রায় পঞ্চাশটি হোটেল প্রস্তুত হয়েছে বিদেশি পর্যটকদের আতিথেয়তা দেয়ার জন্য। এ দ্বীপটারও যেখানে খুশি সেখানেই সাগরে নামা যায়। সর্বত্রই স্বচ্ছ নীল জলরাশি। গোটা দ্বীপটাই উঁচু করা হয়েছে প্রবালের জীবাশ্ম দ্বারা, তাই কাদা বলতে তেমন কিছু নেই।

মাল্ফুসি স্কুল থেকে বের হয়ে বাম দিকে একটু গিয়েই হাতের বামে দেখলাম চমৎকার মিনারওয়ালা একটি মসজিদ। ওয়েবসাইটে গিয়ে মাল্ফুসি আইল্যান্ড সার্চ দিলেই এ মসজিদটি দেখা যাবে। তার একটু সামনে গিয়েই দেখি থাই খাবারের একটি রেস্টুরেন্ট, পাশেই একটি স্যুভেনিরের দোকান। সব কিছুর অসম্ভব দাম। এখানে একটি সাদা গেঞ্জির দাম প্রায় বিশ ডলার। ভারত কিংবা বাংলাদেশে এর দাম হয়তোবা পঞ্চাশ বা ষাট টাকা। বলা বাহুল্য, এসব পোশাক-আশাক সবই আসে ভারত থেকে। তবে কিছু কিছু দ্রব্যসামগ্রী এখন চায়না, হংকং কিংবা তাইওয়ান থেকেও আসতে শুরু করেছে। আর এটা নিয়েই ভারতীয়দের এখন মাথাব্যথা।

সে যাক, আর একটু এগিয়ে গিয়েই বামদিকে আবার দেখা পেলাম জলরাশি। আহ, হালকা এই নীলাঞ্জনার কিনারেই যেন কেলি করছিল ধবল বলাকারা। দুপুরের রোদ তখন কিছুটা তেজ্জ্বা হয়েছে। সাদা রোদের সঙ্গে মিশতে শুরু করেছে কমলার আভা। মনে হচ্ছিল সে রঙেই রঙিন হয়েছে বলাকারা। ইউরোপীয়ান এসব তরুণীরা হঠাৎ আমাদের দেখে বোধহয় কিছুটা সচকিত হলো। তবে ওরা উড়াল দিল না, আস্তে করে নেমে গেল নীলজলে। বড়ই অকৃপণ এ জলধারা। এক গলা জলের মধ্যেও যেন ছায়া হয়ে ভেসে থাকল বলাকাদের ধবল পালক, হলদে ঠোঁট আর বক্সিম দেহ বল্লরির অপূর্ব চেউ। ভারত মহাসাগরের জলরাশিকে এ দৃশ্যের অবতারণা করার জন্য কৃতজ্ঞতা জানালাম।

শর্মাকে বললাম, এখানে স্থানীয় কোনো লোকজন দেখছি না কেন? সে বলল ওরা এখন দিবানিদ্রায় রত। এখানকার বাসিন্দারা সবাই হোটেল-রেস্টুরেন্টের মালিক। আশপাশেই তিন-চার তলা বাড়িতেই তারা থাকে। অনেকেরই তিন-চারটে স্ত্রী রয়েছে। তারাি ভিন্ন ভিন্ন ফ্লোরে থাকে। আর নাকে তেল দিয়ে ঘুমায় তাদের স্বামী। একটা হোটেল

থাকলেই তো হলো, আর কি কিছু লাগে।

সত্যিই তো মালদ্বীপে হোটেল ভাড়া অনেক বেশি। টুরিস্টদের উপযোগী হোটেলগুলোয় এক রাত থাকতে কমপক্ষে একশ' থেকে দুই হাজার ডলার পর্যন্ত লাগতে পারে। এই মালদ্বীপে কোনো কোনো হোটলে রাত কাটাতে গুনতে হয় দশ হাজার পর্যন্ত ডলার। কোনো কোনো দ্বীপ মানেই একটি হোটেল। সাগরের তলদেশ কিংবা উর্ধ্ব আকাশে বিচরণ থেকে শুরু করে মানব জীবন উপভোগের সব ব্যবস্থাই রয়েছে এখানে। আমাদের তো সেসব ক্ষমতা, যোগ্যতা এমনকি ইচ্ছাশক্তি কোনোটিই নেই। আমরা দেখেই শান্তি পেলাম। সন্ধ্যা নামার আগেই আবার বোট উঠলাম, দিলাম ছুট, মালের উদ্দেশ্যে। বোটে বসেই শর্মার বান্ধবী বলল, খ্রিস্টপূর্ব পাঁচশ' বছর আগেও মালদ্বীপের জনবসতি ছিল। কারো কারো মতে ভারত থেকে সিংহল কিংবা সিংহল থেকে ভারত যাওয়ার পথে এক রাজপুত্র ঝড়ের কবলে পড়ে তার শত শত সঙ্গীসহ মালদ্বীপে এসে পড়ে। তারাই স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে পরাভূত করে এখানে গড়ে তোলে শাসনব্যবস্থা। কালক্রমে সম্রাট অশোকের দিগ্বিজয়ের প্রাক্কালে এখানে প্রতিষ্ঠিত হয় বৌদ্ধরাজ্য। তারা প্রায় চৌদ্দশ বছর মালদ্বীপ শাসন করে। বৌদ্ধ সাম্রাজ্যের টলটলায়মান সময়ে এখানে আফ্রিকান, আরবীয় বণিকদের আগমন বেড়ে যায়। সে সময়ে ইবনেবতুতাও মালদ্বীপে আসেন। তিনিই তার লেখনির মাধ্যমে তুলে ধরেন যে, এখানে মালার মতো জড়িয়ে আছেন অসংখ্য দ্বীপ। আর এসব দ্বীপের রয়েছে অপার সৌন্দর্য, ঐশ্বর্য।

তার পর পরই এখানে বারাকাত নামক এক মুসলিম বিজেতা মতান্তরে ধর্ম প্রচারকের আগমন ঘটে। তার সাহচর্যে এসে অথবা তৎকালীন মুসলিম সাম্রাজ্য বিস্তারের পটভূমিতেই এখানে বৌদ্ধ বা হিন্দু যুগের অবসান ঘটে। তবে নাটকীয় ব্যাপার হলো এখানকার রাজা ইসলাম গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে গোটা মালদ্বীপ রাজ্যকেই মুসলিম রাজ্য ঘোষণা করা হলো এবং সব নাগরিকরাই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করল। মালদ্বীপে আজ পর্যন্ত অন্য ধর্মের অনুসারী কোনো নাগরিক নেই এবং প্রকাশ্যে অন্য কোনো ধর্মের কোনো আচার-অনুষ্ঠান এ দেশে একেবারেই নিষিদ্ধ। ততক্ষণে আমাদের বোট এসে ডিঙেছে মালের পাঁচ নাম্বার জেটিতে। দ্রুত নেমে বিদায় নিলাম শর্মার কাছ থেকে। এতক্ষণ অনর্গল কথা বলতে থাকা শর্মার বান্ধবীর নরম তুলতুলে হাতের ছোঁয়া লাগিয়ে তার চমৎকার হাসি আর কাশো চোখের তারায় ভাসতে থাকা নীল সাগরের অপার বিস্ময়টুকু দুই চোখে ধারণ করে আমরা সাগরের কিনার ধরে ডানদিকে হাঁটা দিলাম।

সেখান থেকেই ট্যাক্সিতে চড়ে গিয়ে নামলাম মালদ্বীপের বাংলাদেশ দূতাবাসের সামনে। প্রথমে তো বিশ্রাসই হয়নি এখানে কোনো দূতাবাস থাকতে পারে। একেবারে আমাদের নুরজাহান রোডের মতো ঘিঞ্জি গলির দুই পাশে সারি সারি দালানকোঠা। তারই মধ্যে দেড়ফুট বাই এক ফুটের মতো হবে একটা সাইনবোর্ড, যেখানে লেখা বাংলাদেশ দূতাবাস। সন্ধ্যা সাড়টায় এ দালানের পঞ্চম তলায় দূতাবাসের রিসিপশনে পৌঁছালে আমাদের স্বাগত জানালেন হারুন-অর-রশীদ ওরফে প্রতীক রশিদ। আমরা গিয়ে দূতাবাসের ড্রয়িং রুমে বসলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই হালকা আঁশ কালারের সুট পরা

সামরিক বাহিনীর সাবেক কর্মকর্তা খুবই স্মার্ট রাষ্ট্রদূত এসে আমাদের সামনে বসলেন। অনেক কিছুই আলাপ হলো, তিনি জানালেন এখানকার বাঙালি শ্রমিকদের অধিকাংশই নিরক্ষর এবং অদক্ষ শ্রমিক। মালদ্বীপের প্রায় সব দ্বীপেই তারা কাজ করে। সেসব দ্বীপ পরিচালনার জন্য যে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা তার অধিকাংশ সদস্যই নিরক্ষর। বাংলাদেশি শ্রমিকরাও অনেকে নিরক্ষর। তাই মাঝে মাঝে ভুল বোঝাবুঝি হয়, হয় মতানৈক্য। এ নিয়ে বাঙালি শ্রমিকরা একবার আন্দোলনও করে। আর এসব কারণেই কদিন আগে একজন বাঙালি শ্রমিক এখানে খুন হয়েছে। তাই এখন বাঙালি শ্রমিক ও মালদ্বীপবাসীর মধ্যে কিছুটা উত্তেজনা বিরাজ করছে। তবে অচিরেই পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে যাবে। আমাদের সঙ্গে ছিলেন শ্রম মন্ত্রণালয়ের একজন যুগ্ম সচিব। তিনি পরদিন এসব বিষয় নিয়ে বাংলাদেশি শ্রমিকদের সঙ্গেও কথা বলেছিলেন। তারাি বলল, এখানকার দূতাবাস, তাদের কল্যাণে তেমন কিছুই করে না। শ্রীলংকার দূতাবাস যেমন মালদ্বীপে তাদের লোকদের সমস্যা সমাধান করতে পারে, আমাদের দূতাবাস তা পারে না বা করে না। দূতাবাসের আলোচনায়ও এসব বিষয় উঠে আসে। রাষ্ট্রদূত নিজেই বললেন, বেশ কিছুদিনই মালদ্বীপে রাষ্ট্রদূতের পদটি খালি ছিল। অধস্তনরাই তা চালিয়ে নিচ্ছিল। এখন রাষ্ট্রদূত যোগ দিয়েছেন, হয়তো এখন সব সমস্যার সমাধান হবে।

সে আসা নিয়েই সেদিন হোটেল ফিরলাম এবং ঘুমাতে গেলাম। পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে যথারীতি মাজিদিয়া সেকেন্ডারি স্কুলে গেলাম। ভিলিংগিলি

সকাল নয়টায় হোটেল থেকে বেরিয়ে সাগরের পাড় ধরে হাঁটতে হাঁটতে চলে এলাম ইন্দিরা গান্ধী হাসপাতালের কাছে। হাসপাতালকে বামে রেখে বদুখাফুরুপান রোড ধরে সোজা চলে এলাম মালের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে ভিলিংগিলি ফেরিঘাটে, যাকে সেদিন সৌরভ বলেছিল গিলিগিলি। এখান থেকে পাঁচ রূপিয়ার টিকেট কেটে চড়ে বসলাম বোটে। আর চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মধ্যেই পৌঁছে গেলাম ভিলিংগিলি।

সাগরের নীল জলরাশির কিনারে সাদা ফেনাগুলো যেন রেখার মতো জড়িয়ে ধরে আছে এ দ্বীপটিকে। ঘন সবুজ গাছ আর ফুলে ফলে ভরপুর এ দ্বীপের স্থলভাগ। নির্জন ছায়াঘেরা এ দ্বীপে পাখির কলতান ছাড়া আর কোনো শব্দই যেন নেই। একটি মাত্র পাকা রাস্তা আট-দশ ফুট চওড়া হবে। সে রাস্তায় চলাচল করে মাত্র দু'তিনটি হুড খোলা ট্যাক্সি। তবে মনে হয়, একটি ব্যাটারি, স্টয়ারিং হুইল আর চারটি চাকা ছাড়া এ গাড়ির আর কোনো যন্ত্রপাতি নেই। এতে পনের-ষোল জন উঠে বসতে পারে আর ঘুরে আসতে পারে সারাটি দ্বীপ, দুশ রূপিয়া খরচ করেই। আমরাও ভাগ্যগুণে একটা পেয়ে গেলাম, রওনা হলাম দ্বীপ দেখতে। বামপাশে দিগন্ত বিস্তৃত মহাসাগরের উদাম জলরাশি, ডানপাশে পাতলা বনাঞ্চল, মাঝে মাঝে দু'একটি বাড়িঘর, মানুষজন দেখতে দেখতে চলে এলাম বিশাল এক রিসোর্টের সামনে। সাংরীলা হোটেল অ্যান্ড রিসোর্টটি একটি পৃথিবী বিখ্যাত অবকাশ কেন্দ্র। হংকংয়ের একটি কোম্পানি এবং মালদ্বীপের সরকার সত্তর পার্সেন্ট আর ত্রিশ পার্সেন্ট লভ্যাংশের ভিত্তিতে যৌথভাবে এ

হোটেলটি পরিচালনা করে। হোটেল একদিন থাকার জন্য ভাড়া গুনতে হয় কমপক্ষে এক হাজার ডলার। মূলত ১৯৯৭ সালে এ দ্বীপে ইকোটুরিজমকে প্রমোটি করার জন্য আমেরিকান এক কোম্পানির সঙ্গে চুক্তি সই করে মালদ্বীপের সরকার। সে অনুসারে প্রায় তিন কিলোমিটার লম্বা আর এক কিলোমিটার চওড়া এ দ্বীপটিকে অপরূপ সাজে সজ্জিত করা হয়, যা একেবারেই ন্যাচারাল। এখানে সাজানো বাগানের আঁকেবাকি, গাছ-গাছালির ফাঁকে ফাঁকে দল বেঁধে বসে থাকে টুরিস্টরা। আর তাদের গায়ে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ে ঝরাপাতা আর পাপড়ি, সারি সারি। পেয়ারা, জামরুল, গোলাপজাম কিংবা কামরাঙা ফলগুলো যেন ডালসমেত উপড়ে পড়ে টুরিস্টদের গায়ের ওপর। মিষ্টি করে হেসে যায় নুইয়ে পড়া পাতাসমেত মিষ্টি সুগন্ধিতে ভরপুর বনফুলের কলিরা। মনে হয় যেন স্বর্গ, নেমে এসেছে ধরায়। এখানে বসেই আলাপ হলো গ্রিসের এক দম্পতির সঙ্গে। সম্পূর্ণ খালি গায়ে বসেছিলেন মার্গস, সঙ্গে স্ত্রী আর ছোট একটি মেয়ে। মেয়েটিকে কোলে তুলে নিয়ে আদর করলাম। একটি স্যান্ডো গেঞ্জি গায়ে বসে থাকা মেয়েটির মা এসে মেয়েটিকে আমার কোল থেকে নিতে চাইলে মেয়েটি কেঁদে উঠল। থাকতে চাইল আমার কাছেই। হয়তো মশকরা করেই মেয়েটির বাবা বলল, ও ইন্ডিয়ান হয়ে গেছে, আমাদের আর পছন্দ করছে না। আমার সঙ্গীরা, সান্ত্বনা, সায়কা সবাই তখন নেমে গেছে সাগরজলে। সৌরভ, মথুরা, জ্ঞানেন্দ্র দা তৌ অনেক আগেই নেমেছে। আমি অনেকক্ষণ বসে বসে নীল আকাশের রূপ দেখলাম। দেখলাম, এই নীলাকাশের মধ্যভাগে সাদা আগুন জ্বলতে থাকা সূর্যের তেজ। সূর্যের এত তেজোবীজ্ঞ ঝলমলে রূপ আর স্বচ্ছতা বোধ হয় এখানে না এলে বুঝতাম না। এখানকার আকাশে এক সূর্যের তেজ প্রতিবিম্বিত হয় হাজার খণ্ডে, সাগরজলে। চকচক করতে থাকে মহাসাগরের নীল জলের ওপর সৃষ্ট হালকা ঢেউগুলো। মনে হয় যেন আমি বসে আছি কোনো এক জাদুর রাজ্যে, যেখানে আলোর ঝলকানি ছাড়া আর কিছু নেই। ধন্য হলো সৃষ্টির এ রূপ প্রত্যক্ষ করে।

হাঁটতে হাঁটতে আর একটু সামনে গিয়েই রাস্তার ডানপাশে সারিবদ্ধভাবে কয়েকটি দোকানপাট পেলাম। একটি ছোট চুল কাটার দোকানও দেখলাম। ভিতরে ঢুকেই দেখি লক্ষ্মীপুরের গৌতম চুল কাটার কাজ করছে। আমাদের দেখেই লুঙ্গি পরা আর এক লোক এগিয়ে এসে বলল তার নাম পরিমল। সেও এখানে চুল কাটার কাজ করে। তার বাড়ি চন্দ্রগঞ্জে। সে একটি বাইসাইকেল চালিয়ে দুপুরের খাবার খেতে যাচ্ছিল। তার বাইসাইকেলটি একটু চালাতে চাইলে সে বলল, নিষেধ আছে। এ দ্বীপে বাইসাইকেল ছাড়া আর কোনো ব্যক্তিগত যানবাহন নেই। তবে এটা চালাতেও কর্তৃপক্ষের অনুমতি লাগে। অনেক কাঠখড় পড়িয়ে সে অনুমতি নিয়েছে। সে আরো বলল, মাত্র বিশ-বাইশ জনকেই এ দ্বীপে বাইসাইকেল চালানোর অনুমতি দেয়া হয়েছে। সেখানেই একটি রেস্তোরাঁয় বসে লাল রঙের ভাত খেলাম মুরগির মাংস দিয়ে। ভারতীয় লোকেরাই এ রেস্তোরাঁ চালায়। তবে কাজ করে বাংলাদেশের ছেলেরা। ওদের সঙ্গে বসে অনেকক্ষণ কথা বললাম। তারা বলল, মালদ্বীপে আর কোনো বাংলাদেশি শ্রমিকের না আসাই ভালো। কারণ এখানে কোনো কাজ নেই। তারাও এসে ভুল করেছে। এখন খেয়ে-দেয়ে বছর শেষে বাড়িতে পঞ্চাশ হাজার টাকাও পাঠাতে পারে না। আসলেই তো, মাত্র সাড়ে তিন লাখ মানুষ মালদ্বীপে। তারাও অনেকে বেকার। চাকরি-বাকরির জন্য তারা ছুটে বেড়ায় বিদেশ, বিভূঁইয়ে। অথচ এরই মধ্যে চাকরির খোঁজে মালদ্বীপে চলে এসেছে প্রায় এক লাখ বাংলাদেশি। কী করবে এখানে এত লোক? বিকাল চারটার দিকে ফেরার পথে দেখা হলো এক দল বাংলাদেশি যুবকের সঙ্গে। প্রায় দশজন একসঙ্গে এসেছিল ভিলিংগলি দ্বীপে বেড়াতে। তাদের কোম্পানিই আজ ছুটির দিনে তাদের এ বেড়ানোর বন্দোবস্ত করে দিয়েছে। বিশ থেকে পঁচিশ বছর বয়সী এ দলটিকে দেখে খুব মায়া লাগল। মনে হলো এরাই তো আমাদের দেশের দূরন্ত ডানপিটে ছেলে। এখানে এসে কেমন যেন চুপসে গেছে। হয়ে গেছে কেমন যেন নিজেজ, কিংবা সুশৃঙ্খল। কেমন যেন শান্তশিষ্ট হয়ে তারা বসে আছে বোটের এক পাশের

কয়েকটি সিটে। চোখে-মুখে যেন বিস্ময়, সাগরের অতল জলরাশির মতোই। এবার আমাদের বিদায় নিতে হবে। ফিরতে হবে নিজ দেশে। সেদিন বিকালে মন্ত্রণালয়ে বসে অনেক কথা হলো আরেক প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ শাফিউ-এর সঙ্গে। তিনিই বললেন, বাংলাদেশে মালদ্বীপের অনেক শিক্ষার্থী পড়াশোনা করে, বিশেষ করে মেডিকলে। ইঞ্জিনিয়ারিংও পড়ছে অনেক শিক্ষার্থী। ভবিষ্যতে আরো শিক্ষার্থীরা আসবে বলে তিনি মতামত জানালেন। বাংলাদেশের শিক্ষকরাও মালদ্বীপে কাজ করতে পারে বলে আমরা অভিমত জানালাম। তিনি দূতবাসের মাধ্যমে প্রস্তাব দেয়ার জন্য অনুরোধ করলেন। তার সঙ্গে সভা শেষ করে নিচে নেমে এসে গাড়ির জন্য অপেক্ষা করছিলাম। আর ঠিক তখনই আমাদের পাশ দিয়েই নেমে এলেন মন্ত্রী। রাস্তার পাশে দাঁড় করিয়ে রাখা একটি মোটরসাইকেল স্টার্ট দিয়ে ভাঁ করে আমাদের সামনে দিয়ে শাঁ শাঁ করে চলে গেলেন। আমরাও হতবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম। ভাবলাম, আমাদের দেশে এটা কোনোদিন সম্ভব হবে কি! পরদিন সকাল সাতটায় ঢাকার উদ্দেশে রওনা হবো বলে আবার বোটে উঠলাম। অনেকের সঙ্গে আমাদের পাশে এসে বসল সবুজ আর সোনালি রং মেশানো শাড়ি পরা শ্যামলা এক তরুণী, বিমানবালা। সেও আমাদের সঙ্গে যাবে ঢাকায়। আমাদের দিকে চোখ পড়তেই মুচকি হেসে সালাম দিল মেয়েটি। আমরা বললাম, উই আর গোল্ডিং টু ঢাকা। মাথা নুইয়ে মেয়েটি উত্তর দিল, ইয়েস আই অলসো। প্রায় পঞ্চাশ জন যাত্রীর সঙ্গে এই মেয়েটিও বোটে যাওয়া-আসা করে প্রতিদিনই। বিমান বন্দরের ফর্মালিটি সারতে লাগল ঘণ্টা খানেক। আর এক ঘণ্টার মধ্যেই আমাদের নিয়ে নাক উঁচু করে দিয়েছে মালদ্বীপস এয়ার লাইন্সের বোয়িং টি। জানালা দিয়ে নিচের দিকে তাকলাম। ভারত মহাসাগরের উন্মত্ত জলরাশিকে মনে মনে প্রণতি জানালাম। বসে থাকলাম দুই চোখ বন্ধ করে অনেকক্ষণ।





গল্প

ফিরে যাওয়া হলো না

রেজাউল করিম খোকন

লতার সাথে আমার সম্পর্কটা নিয়ে আজকাল অনেক কথা হচ্ছে। আত্মীয়স্বজন বন্ধুমহলে আলোচনা-সমালোচনার ঝড় বয়ে যাচ্ছে। এতোদিন এটা আড়ালে ছিল। তবে এখন তা আর আড়ালে নেই। ইদানীং অনেকেই লতা প্রসঙ্গে প্রশ্ন করেন, জানতে চান অনেক কিছুই। লতা সম্পর্কে সবার এতো কৌতূহল আমাদেরও বেশ বিব্রত করেছে। আমি নিজেও ভাবছি, কী করা যায়। গত কয়েক মাসে লতার সাথে আমার সম্পর্কটা অনেকদূর পর্যন্ত গড়িয়ে গেছে, যেখান থেকে আর ফিরে আসা সম্ভব নয়। আমি লতাকে ভীষণ ভালোবাসি। মাঝে মাঝে মনে হয় ওকে ছাড়া এই পৃথিবীর সব কিছু আমার কাছে অর্থহীন। লতার আগে একবার বিয়ে হয়েছিল। স্বামীর সাথে আমেরিকায় দেড় বছর ঘর সংসার করেছে।

তারপর স্বামীর সাথে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। ডিভোর্সের পর লতা দেশে ফিরে এসেছে। এখন একটা প্রাইভেট রেডিও চ্যানেলে আরজে মানে রেডিও জকি হিসেবে কাজ করছে। এর মধ্যেই আরজে হিসেবে লতার একটা আলাদা পরিচিতিও ছড়িয়ে পড়েছে মিডিয়ায়।

লতা অসাধারণ সুন্দরী মেয়ে না হলেও এক ধরনের স্নিগ্ধ লাবণ্য তার পুরো অবয়বে জড়িয়ে থাকে সব সময়ে। যা যে কাউকে খুব সহজেই মুগ্ধ করে, আকৃষ্ট করে। লতাকে প্রথম যদিন দেখি সেদিনই ভালো লেগেছিল আমার। আমি কেমন যেন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। ওর ব্যবহার এবং কথাই আমি আবিষ্ট হয়ে পড়েছিলাম। লতা চমৎকার গুছিয়ে কথা বলতে পারে। ওর কথা

শুনলে কেউ মুগ্ধ না হয়ে পারে না। ওর কাছাকাছি যারা এসেছে সবাই লতার চমৎকার মিস্তি ব্যবহারের প্রশংসায় মেতে উঠেছে।

এত ভালো একটি মেয়েকে তার স্বামী ডিভোর্স করতে পারে— আমার কেন জানি মেনে নিতে কষ্ট হয়। ওর স্বামী কেন ডিভোর্স করলো— আমি জানতে চাইনি লতার কাছে। ওর অতীত বিবাহিত জীবনের কথা জেনেও আমি লতাকে প্রচণ্ডভাবে ভালোবেসে ফেলেছি। ওকে আরও আপন করে পেতে চাই। জীবনসঙ্গী করতে চাই।

শম্পা আমার কাজিন। বয়সে দু'বছরের বড় হলেও ওর সাথে আমার সম্পর্ক ঠিক বন্ধুর মতো। ভার্টিসিটিতে একসঙ্গে পড়াশোনা করেছি আমরা। শম্পা এখন একটা এনজিওর প্রোগ্রাম অর্গানাইজার হিসেবে কাজ করছে। সব সময় ব্যস্ত থাকতে হয়। শম্পার হাসবেশ জিয়া ভাই আমার খুব কাছের মানুষ আরো আগে থেকেই। দারুণ মজার মানুষ। আমার সব কথাই জানেন জিয়া ভাই। লতার সঙ্গে আমার সম্পর্কের ব্যাপারটা তার গোড়া থেকেই জানা।

শম্পা এবং জিয়া ভাই দু'জনেই সেদিন আমাকে ঢেপে ধরেছিল। লতার ব্যাপারে নানা প্রশ্ন করেছে আমাকে। তারা কেউই লতার সঙ্গে আমার সম্পর্কটাকে কোনোভাবেই সাপোর্ট করতে পারছে না। তাদের কথা একটাই, 'লতা দারুণ একটা মেয়ে, বাবার অচল টাকা, বাড়ি, গাড়ি, স্ট্যাটিস সবই আছে, মিডিয়াতে আরজে হিসেবেও লতার বেশ খ্যাতি আছে। কিন্তু ওর প্রবলেম একটাই, একবার বিয়ে হয়েছিল তার, দু'বছর আমেরিকাতে স্বামীর ঘর করেছে। দেশে কি বিয়ে করার জন্য মেয়ের আকাল পড়েছে যে ওর মতো একটা ডিভোর্সি মেয়ের জন্য পাগল হতে হবে?'

লতার অতীত জীবন নিয়ে আমি মোটেও মাথা ঘামাই না। ওর স্বামী কেন ওকে ডিভোর্স করেছিল, আমি কোনোদিন জানতে চাইনি। আমার জানারও দরকার নেই। লতার অতীত নিয়ে কোনোভাবেই কৌতূহলী হতে মন চায় না আমার। ওর কোথায় বিয়ে হয়েছিল, কার সঙ্গে দেড় দুই বছর ঘর-সংসার করেছে, বিয়ের পর কি হয়েছিল না হয়েছিল, তা জানার কোনো আগ্রহ নেই আমার। লতার বর্তমান নিয়ে আমি ভবিষ্যতের দিকে এগোতে চাই।

শম্পা আমাকে ধমকের সুরে বলে, লতা মেয়েটা তোকে জাদু করেছে আসলে। কোনো মন্তব্য দিয়ে বশ করে ফেলেছে। তা না হলে তুই এতটা ডিপলি ওর প্রেমে জড়িয়ে পড়লি কিভাবে, মেয়েটার পাস্ট লাইফ নিয়ে কোনো মাথাব্যথা নেই তোর, ম্যারেড তার ওপর ডিভোর্সি একটা মেয়ের সঙ্গে রিলেশনশিপে তোর মনে কোনো লজ্জা, সঙ্কোচবোধ হয় না, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়স্বজনদের সামনে দাঁড়ান কিভাবে, এতটা নিলজ্জ হয়ে গেছিস। এখন আবার লতাকে বিয়ে করতে চাইছিস। ঠিক, লোকে বলবে কি, আসলে তুই কি বলতো, ইশতি?

'আমি একটা মানুষ, রক্ত-মাংসে গড়া সুস্থ মানুষ, আমার বিবেকবোধ, নীতিবোধ সবই ঠিক আছে, আমার মাথা বিগড়ে যায়নি মোটেও, কেউ আমাকে জাদুটোনাও করেনি।' আমি হাসতে হাসতে জবাব দেই।

আমার হাসি দেখে আরও বেশি রেগে যায় শম্পা। রাগের চোটে ফোঁস ফোঁস করতে থাকে। এটা তার স্বভাব। সেই ছোটবেলা থেকে দেখে আসছি।

শম্পা আরো রেগে যাবে, হয়তো কেন সিনক্রিয়েট করবে, করুক। তারপরও আমি তাকে বলি, 'লতাকে ছাড়া আমি অন্য কাউকে বিয়ে করবো না, করতে পারবো না, লোকজনের কথার পরোয়া করি না আমি, যে যাই ভাবুক, যা খুশি বলুক, তাতে আমার কিছু যায় আসে না।'

নাহ! আমার কথায় রিঅ্যাক্ট করে তেমন কোনো সিনক্রিয়েট করে না শম্পা। ভীষণ রেগে সামনের সোফা থেকে উঠে দুপধাপ পা ফেলে কিচেনের দিকে চলে যায়।

পরিস্থিতি হালকা করতে জিয়া ভাই উঠে সোফায় আমার পাশে এসে বসেন। আমার সেন্টিমেন্ট বুঝতে পারেন। অনেকটা নরম সুরে বলতে থাকেন, 'লতার সঙ্গে তোমার রিলেশন হয়েছে, ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করছো তোমরা, মেয়েটাকে তোমার ভালো লেগেছে হয়তো বা, বেশ ভালো কথা। মনে কর, লতা তোমার জাস্ট একজন গার্লফ্রেন্ড ছিল, এরকম তো আজকাল প্রায় ছেলেই করে থাকে, তারা কতো কি করে। মাসে মাসে গার্লফ্রেন্ড বদলায় অনেক ছেলেই, তাই বলে সবাইকে তো বিয়ে করতে চায় না তারা এবং তা করাও সম্ভব নয়। লতাকে ওরকম একজন গার্লফ্রেন্ড মনে করলেই তো সব ঝামেলা চুকে যায়—'

জিয়া ভাইয়ের কথা শেষ করতে দেই না আমি। সাথে সাথে বলি, 'লতাকে তো আমি ঝামেলা মনে করি না কোনোভাবেই, আমি ওকে ভালোবাসি, ওকে ছাড়া অন্য কাউকে বিয়ে করার কথা ভাবতে পারি না। লোকনিন্দার পরোয়া করি না আমি, এ নিয়ে যতই স্ক্যান্ডেল আর বদনাম হোক না কেন আমি লতার সাথে সম্পর্ক ছেড়ে আসতে পারবো না কোনোভাবেই।'

আমার মুখের কথাগুলোতে এক ধরনের দৃঢ়তা ছড়িয়ে পড়ে। 'লতাকে আমি শ্রেফ একজন গার্লফ্রেন্ড ভাবতে পারি না কোনোভাবেই।' বেশ হতাশ হয়ে মাথা নিচু করে বিভ্রিড় করতে থাকেন জিয়া ভাই। 'কোন দুঃখে যে লতার সাথে তোমার পরিচয় করে দিয়েছিলাম আমি, সব দোষই আমার, আমিই দায়ী এতোসব কিছুর জন্য। ওহ, গড।'

আমার হাসি পায় জিয়া ভাইয়ের কথা শুনে। উনিই আমার সঙ্গে লতার পরিচয় করে দিয়েছিলেন তার এই বাসাতেই। লতা জিয়া ভাইয়ের এক বন্ধুর ছোট বোন। সেই সূত্রে একদিন এক ঘরোয়া অনুষ্ঠানে আলাপ-পরিচয় হয়েছিল এখানে। ধানমণ্ডির ২৭ নাম্বার রোডে একটা অফিসে কাজ সেরে রাত্তায় গাড়ি নিয়ে নামতেই লতার কথা মনে পড়ে যায়। ওর সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে কথা হয় না। গাড়িটা রাত্তার পাশে থামিয়ে মোবাইলে লতাকে কল দিতেই মেজাজটা বিগড়ে যায়। ওর মোবাইলটা বন্ধ। তাহলে এখন সে ব্যস্ত রেডিওতে প্রোগ্রাম নিয়ে। গাড়িতে রেডিওটা অন করতেই ওর কণ্ঠ শোনা যায়। 'হ্যালো, আমি লতা নাজনীন, আপনাদের অনেক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি, আপনাদের

জন্য অনেক মজার মজার বিষয় নিয়ে রোজকার মতো উপস্থিত হয়েছি। প্রিয় শ্রোতা, আপনারা রেডি হয়ে যান আপনাদের ফেভারিট গানগুলো শোনার জন্য, আমিও প্রস্তুত আপনাদের মন ভরিয়ে দেয়ার জন্য ...'

লতার কথাগুলো শুনে আমার মনটা ভালো হয়ে যায়। আমিও ওর রেডিও প্রোগ্রামের শ্রোতা হয়ে শুনতে থাকি, উপভোগ করতে থাকি কথাগুলো। আরজে হিসেবে অল্প কিছুদিনের মধ্যে সে অনেক রেডিও শ্রোতার মনে ঠাই করে নিয়েছে। আসলে ওর কথায় এক ধরনের জাদু আছে, অনুভব করি। পথেই ভার্টিসিটিতে একসঙ্গে একই সাবজেক্টে পড়া বন্ধু জগলুর দেখা পাই। গাড়িতে তুলে নেই ওকে। জগলু গাড়ির রেডিওতে লতার কথা শুনতে শুনতে বলে, 'দোস্ত, ভালো একটা গার্লফ্রেন্ড জুটিয়েছিস, হেভি সুন্দর প্রেজেন্টেশন মেয়েটার। আরজে হিসেবে সুপারস্টার হইয়া গেছে মাত্র অল্প কিছুদিনের মধ্যে। এ লাইনে অন্য যারা আছে তারা কেউই এতোটা জমাইতে পারে না। লতা নাজনীনের ভয়েস শুনলেই এখন অনেকেই কান খাড়া করে ওর প্রেজেন্টেশন শুনে আবিষ্ট হয়।'

জগলুর মুখে লতার এতো প্রশংসা শুনে মনটা আরও ভরে যায়।

হঠাৎ জগলু প্রশ্ন করে, 'তোর সঙ্গ মেয়েটার সম্পর্ক নাকি অনেক গভীরে পৌঁছাইছে?'

আমি ওর প্রশ্নের কোনো জবাব দেই না। চুপচাপ গাড়ি চালাই।

'দোস্ত লতার নাকি আগে একবার বিয়া হইছিল, হাসবেশের লগে দেড় বছর ঘর-সংসার করেছে আমেরিকায়। তুই কি এসব জানস?' জগলুর কথার জবাবে এবার আমি মাথা নাড়ি। তারপরও শুধু বলি, 'জানি'।

'সব জানিয়া শুনিয়াও এমন একটা মেয়ের সঙ্গে এত ক্লোজলি জড়ানোটা উচিত হয়নি তোর। অনেকেই বিষয়টা নিয়া আজবাজে কথা বলতেছে। আমার ভান্নাগে না এসব শুনতে। ওদেরকে বলছি লতা তোর শ্রেফ একজন গার্লফ্রেন্ড, জীবনসঙ্গী তো আর না। এরকম গার্লফ্রেন্ড আজকাল অনেকেরই থাকে। কিছুদিন মজাটজা করে সরে যায় যে যার দিকে। ইশতি, যা করার করছস এবার সুযোগ মতো সহরা আয় মাইয়াটার কাছ থেকে।' জগলুর অযাচিত উপদেশগুলো আমার কাছে অসহ্য মনে হয়। ইচ্ছে করে গাড়ি থেকে নামিয়ে দিই।

পাশের বাথরুমে শাওয়ারের অবিরাম পানি ঝরার শব্দ শোনা যায়। সাথে লতার গানের গুন গুন সুরও ভেসে আসছে। শাওয়ারের নিচে দাঁড়িয়ে লতা ভিজছে আর গুন গুন গাইছে, 'বলছি তোমার কানে কানে আমার তুমি, বলছি আমার গানে গানে আমার তুমি।'

বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভাবতে থাকি এভাবে তো পুরো জীবন কাটানো যাবে না। কতোদিন আর সুজনদের এই বাড়িতে লুকিয়ে লুকিয়ে লতার সঙ্গে ডেটিং করবো?

সুজন আমার ক্লোজড ফ্রেন্ড। ওরা অনেক বড়লোক। ঢাকা শহরে বেশ কয়েকটা বাড়ি আছে ওদের। লালমাটিয়ার এই বাড়িটা ভাড়া দেয় না ওরা। এমনভাবে তেমন কেউ থাকে না। খালি পড়ে

থাকে সবসময়। মাঝেমাঝে সৃজন ওর বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে মজমা বসায় এখানে। তাস খেলে, মদের আসর জমায়, মেয়ে মানুষ এনে ফুর্তি-আমোদ করে। আমাকে অনেক দিন জোরাজুরিও করেছে ওদের আসরে যোগ দিতে। কিন্তু আমি ওদের মজমায় কোনোদিনই যোগ দিইনি। এজন্য ওরা কিছুটা ক্ষেপে থাকলেও আমাকে কিছুটা অন্যরকম বলে সম্মানও করে। ভালো, ভদ্র এবং ডিসিপ্লিন্ড লাইফের ছেলে হিসেবে বন্ধুমহলে আমার আলাদা সুনাম রয়েছে।

একদিন লজ্জা, সংকোচ আর দ্বিধার দেয়াল পেরিয়ে সৃজনকে লতার কথা বলেছি। লতার সঙ্গে ডেটিং করার একটা নিরিবিলা জায়গা ম্যানেজ করে দেয়ার জন্য অনুরোধ করেছি। তারপরেই সে লতার সঙ্গে একান্ত-নিভূতে সময় কাটানোর জন্য ওদের এই বাড়িটা ম্যানেজ করে দিয়েছে।

হঠাৎ আমার কেন জানি মনে হয় লতাকে নিয়ে এখানে সৃজনদের বাড়িতে একান্ত-নিভূতে যা করছি তা কোনোভাবেই ঠিক হচ্ছে না। সারাটা জীবন তো আর এভাবে কাটানো যাবে না, আর কাটানো উচিতও নয়। সমাজ, সভ্যতা বলে একটা কথা আছে। আজকাল এই ঢাকা শহরে অনেকেই বিয়ে-টিয়ে না করে লিভ টুগেদার করছে। আমি কোনোভাবেই ব্যাপারটা সাপোর্ট করতে পারি না। আমার কাছে বিষয়টা অসুস্থ এবং অস্বস্তিকর মনে হয়।

মুহূর্তেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলি, এখনই লতাকে বিয়ের কথা বলবো, ওর যদি প্রবেলম না থাকে আগামীকালই বিয়েটা সেরে ফেলবো আমরা। আর কোনোভাবেই দেরি করতে চাই না আমি। কিছুক্ষণ পর বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসে লতা। জামাকাপড় পরে নিয়ে ঘরের এককোণে রাখা ছোট ড্রেসিং টেবিলটার সামনে বসে। ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে লিপস্টিক নিয়ে ঠোটে লাগায়, ছোট্ট একটা পারফিউমের বোতল বের করে স্প্রে করে বুকের কাছে। লতার পারফিউম ব্যবহার করার কোনো প্রয়োজন নেই, এমনিতেই ওর শরীরের গন্ধটা দারুণ, কেমন একটা নেশা ধরিয়ে দেয়। লতা বিছানার ধারঘেঁষে আমার পাশে বসে। আমার চোখের দিকে তাকায় সরাসরি, কী যেনো বলতে চায় সে। আমি তার চোখের ভাষা বুঝতে পারি। লতাকে কোনোরকম সুযোগ না দিয়ে আমি সরাসরি বিয়ের কথাটা বলি। 'লতা, চলো কালই বিয়েটা সেরে ফেলি আমরা, আর দেরি করে কী লাভ? এভাবে লুকিয়ে লুকিয়ে তোমার সঙ্গে ডেটিং করতে আর ভাল্লাগছে না। আর এ নিয়ে নানাভাবে কথা বলছে, আমি সবার মুখ বন্ধ করে দিতে চাই।'

আমার কথা শুনে কেমন যেনো চমকে যায় লতা। আমার কথাটা সে মেনে নিতে পারছে না, বুঝতে পারি ওর চোখমুখ দেখেই।

এমন তো হওয়ার কথা নয়। আমার কথায় বরং খুশিতে বলমলে উজ্জ্বল হয়ে ওঠার কথা লতার। ব্যাপারটা আমার কাছে অস্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে। তাহলে বিয়েতে রাজি নয় সে। জীবনসঙ্গী হিসেবে আমাকে ওর পছন্দ নয় তাহলে? পছন্দ না হলে আমার সঙ্গে এতো গভীর সম্পর্কে জড়ালো কেন? স্রেফ মজা করতেই তাহলে সে আমার সঙ্গে সম্পর্কটাকে খুব কম সময়ের মধ্যে এতোটা গভীর

করেছিল। অথচ আমার সঙ্গে ওর সম্পর্কটা নিয়ে অনেকেই বাজে কमेंটস করেছে। আমি সে সব গায়ে মাখিনি। লতাকে আমি মনেপ্রাণে ভালোবেসেছি, আমার ভালোলাগা, ভালোবাসায় কোনো সংশয় সন্দেহ, ছলনা কিংবা দ্বিধা নেই। আমি সত্যি সত্যি ওকে ভালোবাসি। লতা কি এসব বুঝতে পারেনি এখনো। মনটা আমার অসীম বেদনায় ভারি হয়ে ওঠে।

'লতা জীবনসঙ্গী হিসেবে আমি কি তোমার যোগ্য নই, আমাকে তোমার পছন্দ নয় বুঝতে পারছি, কিন্তু কেন? আমাকে যদি পছন্দ না হয় তাহলে কেন আমাদের সম্পর্কটাকে এতো গভীরে নিয়ে গেলে?'

আমার কথায় লতার চোখ দুটো অশ্রুসজল হয়ে ওঠে। কান্নাজড়ানো গলায় বলতে থাকে সে— 'ইশতি, তোমাকে আমি ভীষণ ভালোবাসি, এই জীবনে অন্য কাউকে এতোটা ভালোবাসতে পারিনি আমি, তোমাকে এতো বেশি ভালোবেসে ফেলেছি বলেই তোমাকে আমি বিয়ে করতে পারবো না। তুমি আমার সব কথা জানো না। সব কথা জানলে তুমি আমাকে জীবনসঙ্গী করার কথা ভাবতে পারবে না। আমি তোমাকে ঠকাতে চাই না। তোমার সঙ্গে প্রতারণা করতে চাই না—।' আর বলতে পারে না সে।

ডুকরে ডুকরে কাঁদতে থাকে লতা বাচ্চা মেয়ের মতো। ওর কান্না আমাকে কেমন এলোমেলো করে দেয়। লতাকে বুকের মধ্যে টেনে আনি। তারপর ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলি, 'জানি, আমি সব জানি, তোমার সব কথা জেশুনেই বলছি তোমাকে বিয়ে করবো। কারণ আমি তোমাকে অনেক ভালোবাসি।'

'না, ইশতি, তুমি সব জানো না, আমার সম্পর্কে এসব কথা বাবা-মা ছাড়া অন্য কেউ জানে না।' 'কী এমন কথা, এতো সিরিয়াস, যা এতোদিন কাউকে বলোনি, নিজের মধ্যে চেপে রেখেছো?' 'আমার বিয়ের কয়েক মাসের মধ্যে স্বামীর কাছে আমেরিকা চলে গিয়েছিলাম। নিউজার্সিতে থাকতাম আমরা। তখন আমার মারাত্মক একটা অসুখ হয়েছিল। আমার রোগটা যখন ধরা পড়লো তখন বেশ জটিল হয়ে পড়েছে। জরায়ুতে টিউমার হয়েছিল আমার। টিউমার অপারেশন করতে গিয়ে ডাক্তাররা দেখলেন জরায়ুতে ক্যান্সারের লক্ষণ ছড়িয়ে পড়েছে। ক্রমেই তা বেড়ে গিয়ে মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। তেমন আশঙ্কায় ডাক্তাররা পুরো জরায়ু কেটে ফেলে দেন তখন। আমি চিরদিনের জন্য সন্তানের মা হওয়ার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছি। তখনই নারীজন্মের সার্থকতা মাতৃত্বে। আমি কোনোদিনই আর সন্তানের মা হতে পারবো না। নিষ্ফল এক নারী আমি—এ অজুহাতে ওই লোকটা মানে আমার স্বামী ভীষণ খারাপ ব্যবহার করতে শুরু করে। কম্পিউটার সায়েন্সে পিএইচডি করা উচ্চশিক্ষিত মানুষটা ক্রমেই বদলে যায়। পশুর মতো ব্যবহার করতে শুরু করে আমার সঙ্গে। তার মানসিক শারীরিক নির্যাতনে আমার জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। বিয়ের দেড় বছরের মাথায় আমাকে দেশে বাবা মায়ের কাছে পাঠিয়ে দেয়। দুমাস পর ডিভোর্স লেটার পাই আমি তার কাছ থেকে। আমি কপাল পোড়া একটা মেয়ে।

আমার দুর্ভাগ্য, দুঃখ আর যন্ত্রণা একান্ত নিজের। এর মধ্যে তুমি কেন মিছেমিছি নিজেকে জড়াতে চাইছো। তার চেয়ে তুমি অন্য কোনো মেয়েকে বিয়ে করে সুখী দাম্পত্য জীবন গড়ে তোল, ছেলেমেয়ের বাবা হও— তোমার খুব ভালো একজন বন্ধু হিসেবে আমি এটাই চাই। তুমি সুখী হলে আমি দূর থেকে তা দেখে মনে শান্তি পাবো, সুখ অনুভব করবো।'

অনেকক্ষণ ধরে কথাগুলো বলতে গিয়ে লতার গলাটা বুঁজে আসে। ওর দুচোখ বেয়ে অঝোর ধারায় অশ্রু ঝরছে দেখতে পাই। এক সময়ে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে লতা। এই প্রথম কাঁদতে দেখি ওকে। আমার বুকের মধ্যে কেমন তোলপাড় করে ওঠে। আমি কোনোভাবেই সহ্য করতে পারছি না ওর কান্না। মুহূর্তেই মনে মনে সিদ্ধান্ত নেই, 'লতাকে আজই বিয়ে করবো'।

'লতা, তুমি এখনো আমাকে পুরোপুরি চিনতে পারোনি, পৃথিবীর সব পুরুষকে তুমি একরকম ভাবলে কীভাবে, আমি তোমাকে ভালোবাসি, প্রচণ্ড ভালোবাসি, তোমার আমার ভালোবাসার মাঝে কোনো কিছুই বাধার দেয়াল হয়ে দাঁড়াতে পারে না। তোমার সব কিছু জেনেও আমি তোমাকে আগের মতো ভালোবাসি। তোমার কোনো সীমাবদ্ধতা আমার ভালোবাসাকে ঠেকাতে পারবে না, আমি তোমাকে আজই বিয়ে করতে চাই—।' আমার কথা শুনে বেশ চমকে ওঠে লতা আবারও। অনেকক্ষণ নির্বাক হয়ে তাকিয়ে থাকে আমার দিকে। আমি শূন্য বলি, 'কি দেখছো এভাবে?' 'আমাকে আরও কয়েকটা দিন সময় দাও ইশতি। গ্লিভ, আমাকে ভুল বোঝো না', আমার হাতটা কোলে তুলে নিয়ে বলে লতা।

এরপর বেশ ক'টা দিন নানা ব্যস্ততায় কিভাবে যে কেটে যায় বুঝতেই পারি না। রংপুরে আমার এক ফুফু মারা যাওয়ায় সেখানে যেতে হয়। কয়েকটা দিন ওখানে থাকতে হয়। হাজার ব্যস্ততা আর ঝামেলার মধ্যে লতার সঙ্গে কোনোভাবেই যোগাযোগ করা হয়ে ওঠেনি। উৎকণ্ঠায় ভরে ওঠে আমার মন। তাহলে ওর অসুখ-বিসুখ হয়নি তো? অসুস্থ হলেও তো মোবাইলটা খোলা রাখবে সে? লতাদের উত্তরার বাড়িটা আমি চিনি। শুধুমাত্র একদিন গিয়েছিলাম। ওখানে যাবো কিনা ভাবছি, তখনই শম্পার ফোন পাই। 'ইশতি, লতার খবর কিছু জানিস?' 'কেন, কী হয়েছে ওর, কোনো রিপদ-আপদ?' 'নাহ, এতো ভগিতা করছিস কেন, লতার কী হয়েছে বল না?'

'আজই অস্ট্রেলিয়া চলে যাচ্ছে মেয়েটা, ওখানে ওর বড় মামা থাকে, সেখানেই চলে যাচ্ছে, আর নাকি ফিরবে না দেশে, ওখানেই থাকবে। তুই কিছুই জানিস না, আশ্চর্য ব্যাপার তো! তোর সঙ্গে কোনো ঝগড়াঝাটি হয়নি তো—।' বলেই মুচকি হাসে শম্পা। ওর হাসি শুনেই উপলব্ধি করি, বেশ খুশি হয়েছে। ওরা সবাই তো এটাই চেয়েছিল। আমার জীবন থেকে চিরদিনের জন্য সরে যাক লতা এটাই চেয়েছিল শম্পাসহ আরো অনেকেই। ওদের চাওয়াটাই শেষ পর্যন্ত বাস্তবায়িত হচ্ছে। শম্পার কাছে লতার হঠাৎ অস্ট্রেলিয়া চলে যাবার

খবর শুনে আমার মাথায যেন আকাশ ভেঙে পড়ে। হঠাৎ করে কী করবো বুঝে উঠতে পারছি না। গত কয়েকদিন ঢাকার বাইরে থাকলেও মোবাইলে নিয়মিত যোগাযোগ ছিল লতার সঙ্গে। ওর কথাবার্তায় তেমন কেন আভাসও পাইনি। অস্বাভাবিক আচরণও করেনি। শুধুমাত্র একটা বিশেষ কাজে ব্যস্ত রয়েছে জানিয়েছিল। রেডিও অফিসেও যাচ্ছে না গত বেশ কয়েকদিন ধরে। ওখানে খোজ নিতে গিয়েছিলাম। ওদের সঙ্গেও লতার কোনো যোগাযোগ নেই। সাথের কয়েক জনকে নাকি বলেছেও, রেডিও জকির কাজটা নাকি আর করবে না সে।

আমাকে কিছু না বলে হঠাৎ করে অস্ট্রেলিয়ায় ওর বড় মামার কাছে চলে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললো সে। অথচ সেদিন আমাদের বিয়ের ব্যাপারে জোরাজুরি করায় কয়েকটা দিন সময় নিয়েছিল লতা। তারপর থেকেই সে আমার সঙ্গে কোনো যোগাযোগ করছে না বেশ কয়েক দিন ধরে। ব্যাপারটা আমাকে অস্থির করে তোলে। কী করবো, কোথায় খুঁজবো লতাকে, অথচ আজই ওর ফ্লাইট, কখন কে জানে— ইত্যাদি বিষয়গুলো নিয়ে দ্রুত ভাবতে থাকি। তখনই মোবাইলে একটা এসএমএস পাই। অপরিচিতি নাম্বার থেকে এসেছে।

এসএমএসটি পড়তে গিয়ে অবাক হয়ে যাই। লতার এসএমএস। আমাকে লিখেছে—

প্রিয় ইশতি,
তোমার মুখোমুখি হতে পারলাম না। আমি তোমাকে কোনোভাবেই ঠকাতো পারবো না। তাই তোমার জীবন থেকে সরে গেলাম। তোমাকে এতো বেশি ভালোবাসি বলেই হয়তো এমনটি হয়েছে। আমি ভীষণ আনলাকি একটা মেয়ে। নিজে সুখী হতে পারিনি, তোমাকেও সুখী করতে পারবো না। আমাকে বিয়ে করলে সারাটা জীবন ব্যর্থ হয়ে যাবে তোমার। তোমাকে সবাই থিক্কার দেবে। তুমি চরমভাবে ঠকবে। অনেক কষ্ট পাবে তুমি জানি। কয়েকদিন গেলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। আমার কথা ভুলে যাও। আমাকে মনে রেখে তুমি কষ্ট পাও, এটা চাই না আমি। আজ সন্ধ্যে ৬টায় আমার ফ্লাইট। আমি বড় মামার কাছে অস্ট্রেলিয়া চলে যাচ্ছি। আর হয়তো ফিরবো না। তুমি একটা সুন্দরী টুকটুকো বউ ঘরে আনো। সুখী হও— আমি দূর থেকে কামনা করে যাবো আজীবন। তোমার জীবনসঙ্গী হতে পারলাম না, এ জন্য আমারও খুব কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু এটাই নিয়তির লিখন। আমাকে ক্ষমা করে দিও প্রিজ, লক্ষ্মীটি।

লতা

এসএমএসটি বেশ কয়েকবার পড়ি। আমার চোখের সামনে সবকিছু এলোমেলো হয়ে গেছে দেখতে পাই। লতা আমাকে এভাবে ছেড়ে চলে যেতে পারে না। যে নম্বর থেকে এসএমএস করেছে লতা তাতে কল দিতেই বন্ধ পাওয়া যায়। অনেকবার চেষ্টা করেও একই অবস্থা দেখা যায়। হঠাৎ খেয়াল হয় এখন বিকাল ৫টা বাজে। সন্ধ্যে ৬টায় লতার ফ্লাইট। তার মানে হাতে আছে মাত্র ষাট মিনিট মানে এক ঘণ্টা। নিজেকে এই মুহূর্তে ভীষণ অসহায় মনে হয়। এক ঘণ্টার মধ্যে এয়ারপোর্ট যাবো কীভাবে? তারপরও সিদ্ধান্ত নেই দ্রুত। শেষ চেষ্টা করবো, যেভাবেই হোক এয়ারপোর্টে আমাকে পৌঁছাতে হবে।

এই বিকালে আমার নিজের গাড়ি নিয়ে বেরোলে কয়েক ঘণ্টায়ও পৌঁছতে পারবো না এয়ারপোর্টে। এ সময়টাতে মহাখালী থেকে গাড়ির মিছিল থাকে এয়ারপোর্ট পেরিয়ে টঙ্গী ব্রিজ পর্যন্ত। ট্রাফিক জ্যামের কারণে বারবার থামতে হবে। এতো কম সময়ে কোনোভাবেই এয়ারপোর্ট পৌঁছতে পারবো না।

পার্কিংলটে চেনাজানা পরিচিত একজনকে পেয়ে যাই। মোটরবাইকটা নিয়ে এইমাত্র বাইরে থেকে ফিরেছে লোকটা। কিছু সময়ের জন্য তার মোটরবাইকটি আমার প্রয়োজন— বলতেই কেমন অবাক হয়ে তাকায় লোকটা আমার দিকে। আমি আমার লেটেস্ট মডেলের টয়োটা গাড়ি ফেলে তার মোটরবাইকটা ধার চাইছি। ব্যাপারটা অদ্ভুত লাগে তার কাছে। তারপর একগাল হেসে বলে, নো প্রবলেম ইশতি ভাই, খুব দূরে কোথাও যাবেন, নাকি আশপাশে?



আমি তার কোনো কথার জবাব না দিয়ে মোটরবাইকটা স্টার্ট দিয়ে দ্রুত রাস্তায় নামি।

মগবাজার ক্রসিং পেরিয়ে তেজগাঁও সাত রাস্তার মোড়ে ট্রাফিক জ্যামে পড়ে যাই। এরপর অনেকটা বেপরোয়া ভঙ্গিতে বিভিন্ন অলিগলি পেরিয়ে অবিশ্বাস্য দ্রুত গতিতে ছুটে চলতে থাকি। মোটরবাইকে ফুয়েল কতো পরিমাণে আছে কে জানে। এখন মাঝপথে বিগড়ে না গেলেই হলো। বেশ অনেকবার মারাত্মক ব্লক ট্রাফিক সিগন্যাল এড়িয়ে এয়ারপোর্টের খুব কাছাকাছি পৌঁছে যাই। ঘড়িতে সময় দেখার কথা খেয়ালই ছিল না। হঠাৎ সময়ের কথা মনে হতেই ঘড়ি দেখি ছয়টা বেজেছে আরও চল্লিশ মিনিট আগে। তার মানে এতক্ষণে লতাকে নিয়ে প্লেনটা আকাশে উড়াল দিয়েছে। এয়ারপোর্টে পৌঁছে মোটরবাইকটা একপাশে রেখেই ছুটে যাই লাউঞ্জের দিকে।

আমি এদিক-ওদিক অনেক নর-নারীর ভিড়ে লতাকে খুঁজতে থাকি। এখন তো ওর এখানে থাকার কথা নয়। কারণ ছয়টায় ওর ফ্লাইট। আমাকে ছেড়ে এখন সে আকাশে কয়েক হাজার ফুট ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে। ইনকোয়ারিতে পরিচিত একজনকে পেয়ে যাই। সন্ধ্যে ছয়টায় থাই এয়ারওয়েজের ফ্লাইট ছিল। ওটা ঠিকমতো, যথাসময়ে উড়ে গেছে, লোকটা জানায়। আমার কাছে এই পৃথিবীকে অর্থহীন মনে হয় এই মুহূর্তে। অসীম শূন্যতা আমাকে গ্রাস করেছে যেন, অনুভব করি। হাঁটতে কষ্ট হয়, পা দুটো অনেক ভারি মনে হয়। চলতে পারি না। নীরব জায়গা দেখে বসে পড়ি। বেশ কিছুক্ষণ চোখ বুঁজে থাকি। লতার সঙ্গে কাটানো মুহূর্তগুলোর কথা মনে পড়তে থাকে। সিনেমা নাটকে ফ্লান্সবাক্য দৃশ্যের মতো প্লো মোশনে দৃশ্যগুলো মনের পর্দায় ভাসতে থাকে। এভাবে কতোক্ষণ বসেছিলাম খেয়াল নেই। হঠাৎ পরিচিত কারো হাতের ছোঁয়া পেয়ে চোখ মেলে তাকাই। দেখি, আমার সামনে লতা দাঁড়িয়ে আছে। কাঁধে একটা মাঝারি সাইজের ব্যাগ ঝোলানো। বিষণ্ণ মুখে হাসির বিলিক। এয়ারপোর্টের হালকা স্নান আলোতে লতাকে অপকুপা লাগে। হঠাৎ মনে হয়, আমি স্বপ্ন দেখছি হয়তো? এক্ষুণি স্বপ্নটা ভেঙে যাবে, লতা হারিয়ে যাবে আমার সামনে থেকে। স্বপ্নটা অটুট থাকুক — মনে মনে চাইলেও হঠাৎ একটা প্লেন টেক অফ করার গর্জনে আমার সম্মিত ফিরে আসে।

এবার লতাকে সত্যি সত্যি আমার সামনে দেখতে পাই। সে আমার সামনে দাঁড়িয়ে। লতা কাঁদছে, আর বলছে, 'ইশতি, তোমাকে ছেড়ে যেতে পারলাম না, মনের সঙ্গে অনেক যুদ্ধ করেছি। তোমাকে ছেড়ে আমি থাকতে পারবো না কিছুতেই। তাই প্লেনে চড়েও নেমে এসেছি, আমি জানতাম, তুমি আমাকে ফিরিয়ে নিতে আসবে।' আর বলতে পারে না সে। আমার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে দু'হাতে আঁকড়ে জড়িয়ে ধরে ঝরঝর করে কাঁদতে থাকে লতা।

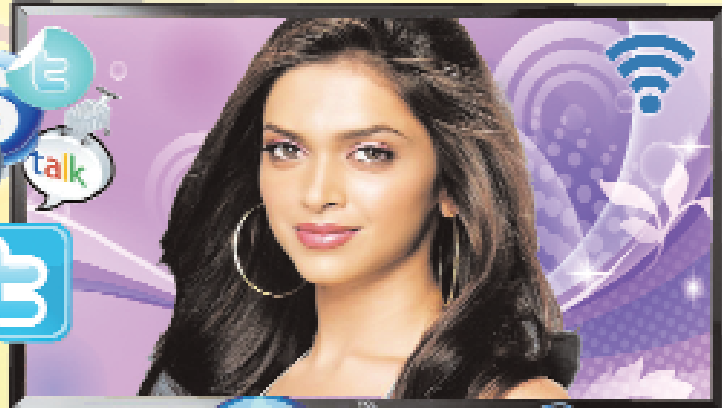
সিনেমায় দেখা অনেক দৃশ্যের মতো মনে হতে থাকে পুরো ব্যাপারটা। লতা আমাকে ছেড়ে যেতে পারেনি। ফিরে এসেছে ভাবতেই নিজেকে পৃথিবীর সবচাইতে সুখী মানুষ মনে হতে থাকে আমার।

TCL®

SMART LED TV



- Eye Protector
- Full HD 1920x1020 Resolution
- Over 16.7 Million Colours.
- Record Live TV,
- USB, VGA, & AV Inputs
- Built In Wi-Fi / Internet Browsing.
- Access Amazing Applications Such as Youtube, Facebook & Twitter.
- HD Media Player In HD Via USB/SD Card.
- Gaming Console & Speakers
- Computer & Laptop Connect Function
- Recordable Function



SMART LED TV : 32"

- Eye Protector
- HD 1366x768 Resolution
- DVD Player
- Blu-Ray Player
- Gaming Console & Speakers
- USB Port
- Coaxial Digital Audio Output
- Component In (Y/Pb/Pr) & Composite In (AV)
- 2 HDMI Port
- Computer & Laptop Connected Function
- Recordable Function

Shahnoor Electronics, 69, Dilikusha C/A (1st Floor), Dhaka-1000.
Tel : 88-02-9551531, 9557360, 7125864, 01919000007-8
E-mail : shahnoor@bol-online.com



সঙ্গীত

রাগ সঙ্গীতের শ্রেষ্ঠ দশজন সঙ্গীতজ্ঞ

মোবারক হোসেন খান

আমার এই লেখায় মূলত উপমহাদেশের রাগ সঙ্গীতে যে সঙ্গীতজ্ঞরা বিরাট অবদান রেখে গেছেন তাদের কথা বলব।

রাগ সঙ্গীতে দুটো ধারা প্রচলিত। এক ধারায় রয়েছেন সঙ্গীত শাস্ত্রকাররা। তারা সঙ্গীতের 'ঔপপত্তিক' বা শাস্ত্রীয় দিক নিয়ে গবেষণা, আলোচনা ও সৃষ্টিসম্ভারে রাগ সঙ্গীতকে সমৃদ্ধ করেছেন। অন্য ধারায় রয়েছেন 'ব্যবহারিক' সঙ্গীত সাধনায় সেরা বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ যারা তাদের বাদন আর গায়ন দিয়ে সঙ্গীত জগতে অমর হয়ে আছেন। এ দুই ধারার কথা বলতে গেলেও ভিন্ন

ভিন্নভাবে লিখতে হয়। তাই আজকে শুধু তাদের কথাই লিখছি যারা তাদের বাদন ও গান দিয়ে বিখ্যাত হয়ে সঙ্গীতের ইতিহাসে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে অধিষ্ঠিত হয়ে আছেন।

তার আগে প্রসঙ্গক্রমে সঙ্গীত শাস্ত্রকারদের নাম উল্লেখ করে রাখতে চাই পাঠকসমাজের অবগতির জন্য। সঙ্গীত শাস্ত্রকারদের মধ্যে যারা অমর হয়ে আছেন তারা হলেন— ভরত, মতঙ্গ, শার্দদেব, রামমাঅ, সোমনাথ, ব্যঙ্কেটমখী, পার্শ্বদেব, অহোবল, লোচন, পুণ্ডরিক বিটঠল, হৃদয় নারায়ণ দেব, মুহাম্মদ রজব, রাজা নবাব আলী, স্বামী

Intelligent Inverter Compressor

10
Years
Guarantee

১০ বছর
গ্যারান্টি

Buy Refrigerator with Intelligent Inverter
Save Electricity, Be Intelligent



WALTON

আমাদের পণ্য



Intelligent
INVERTER
Technology

- Save huge electricity
- Increase compressor lifetime
- Reduce noise

eeozen

Advanced Inverter Technology

২০০% কপার কন্ডেন্সার
নিশ্চিত হয়ে পাবেন



MANO
HEALTHCARE

- আমর ইনভেন্টার প্রিন্সিপাল গ্যারান্টি ১০ বছর গ্যারান্টি দেওয়া হবে, যার-
- ওলিফ্যান্টের কপার কন্ডেন্সার গ্যারান্টি দেওয়া হবে।
 - ওলিফ্যান্টের কপার কন্ডেন্সার গ্যারান্টি দেওয়া হবে।
 - ওলিফ্যান্টের কপার কন্ডেন্সার গ্যারান্টি দেওয়া হবে।
 - ওলিফ্যান্টের কপার কন্ডেন্সার গ্যারান্টি দেওয়া হবে।



ISO 9001 : 2008, ISO 14001 : 2004 &
OHSAS 18001 : 2007 Certified Company

16267
SUPPORT CENTER

waltonbd.com



প্রজ্ঞানানন্দ প্রমুখ।

রাগ সঙ্গীতে অবদান রেখে সমৃদ্ধ করে যারা অমর হয়ে রয়েছেন তাদের মধ্যে রয়েছেন— আমির খসরু, সুলতান হুসেন শাহ- শর্কি, রাজা মানসিংহ তোমর, মিয়া তানসেন, সদারঙ্গ, ওস্তাদ ওয়াজিত খাঁ, ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ, ওস্তাদ আয়েত আলী খাঁ, ওস্তাদ বিসমিল্লাহ খাঁ, পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে প্রমুখ সঙ্গীতজ্ঞ।

আমির খসরু : রাগ সঙ্গীতের স্রষ্টা আমির খসরু। সনাতন পদ্ধতির গানকে তিনি নতুনরূপে রূপায়িত করেন। ১২৫৩ সালে তিনি যুক্তপ্রদেশের এটাহ রাজ্যের মোমিনপুর (পাতিয়ালা) গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১১-১২ বছর বয়সে তার মধ্যে কবিপ্রতিভার স্ফূর্তি ঘটে। অল্প বয়সেই তিনি ফারসি, তুর্কি, আরবি ভাষায় পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। তিনি দিল্লির সুলতান আলাউদ্দিন খিলজি, সুলতান কায়কোবাদ, জালালউদ্দিন খিলজি, কুতুবউদ্দিন মোবারক, গিয়াসউদ্দিন তুঘলকের দরবার অলঙ্কৃত করেন। তিনি একাধারে বিদ্বান, বুদ্ধিমান, কবি, ইতিহাসবিদ, দার্শনিক, সঙ্গীতজ্ঞ হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। আমির খসরু ছিলেন এক অনন্য প্রতিভার ব্যক্তি। তিনি সুকণ্ঠ গায়ক ছিলেন। সঙ্গীতের দ্বাদশ সুর-সপ্তক বা মোকাম পদ্ধতি প্রচলন করে তিনি নতুন রাগ ও তান উদ্ভাবন করেন। ছোট খেয়াল, ফওল, গুলনকশ, তারানা, ত্রিঘট, গজল ইত্যাদি গীতিরীতির উদ্ভাবক আমির খসরু। তিনি সাজগিরি, কাফি, গারা, জিলফ, সরপরদা, শাহানা, ইমন রাগ এবং সওয়ারি, জং, ফরোদস্ত, আড়া চৌতাল, সুরফাক্তা, জুমরা তাল সৃষ্টি করেন। সেতার, তবলডব্বায়া, ঢোল বাদ্যযন্ত্র তার আবিষ্কার। তিনি সঙ্গীতে পারসিক সঙ্গীতের মিশ্রণ ঘটিয়ে নতুন নতুন গীতিরীতির প্রবর্তন করেন। সঙ্গীতের রাগ-পদ্ধতিতে যে নতুন ধারার সংযোজন করেন তারই ফলে রাগ সঙ্গীত এক নতুন রূপ লাভ করেছিল। তার রচিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে তুঘলকনামা, নুসিপীর, আসিক, মিকতা-উল-ফাতু, ইজাজ-ই-খুশরবি, খাজিন-উল-ফাতু, আফজল-ই-ফওয়াদ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের ইতিহাসে আমির খসরু এক অসামান্য ব্যক্তিত্ব। ভাষা, কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও সঙ্গীতের সঙ্গে আমির খসরুর নাম অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পৃক্ত।

সুলতান হুসেন শাহ শর্কি : হুসেন শাহ শর্কি বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। তিনি ছিলেন জৌনপুরের শাসনকর্তা। তিনি ১৪৫৮ সালে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি নতুন নতুন রাগ সৃষ্টি করে রাগ সঙ্গীতের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করেন। তিনি পারসিক-আরবীয় রাগ ‘জুগলা’র অনুসরণে ‘জুগলা’ নামে রাগ সৃষ্টি করেন। তিনি প্রেম ও বিরহের একপ্রকার গানের স্রষ্টা। এ গানের নাম ‘চুটকলা’। আমির খসরু প্রবর্তিত খেয়াল গানকে আরো উন্নত করে তিনি ‘বড় খেয়াল’ গীতিরীতি প্রবর্তন করেন। একজন অপ্রতিদ্বন্দ্বী সঙ্গীতজ্ঞ হিসেবে তার খ্যাতি উপমহাদেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। তিনি সঙ্গীত বিশেষজ্ঞরূপে ‘গন্ধর্ব’ অভিধায় অভিহিত হয়েছিলেন। তিনি জৌনপুরী, হুসেনি, কানাড়া, টোড়ি, ভৈরবী, সিন্ধুরা এবং চৌদ প্রকার ‘শ্যাম’ রাগ যেমন— গোড় শ্যাম, মল্লার শ্যাম, ভূপাল শ্যাম প্রভৃতি রাগ উদ্ভাবন করেন। গীত রচয়িতা

হিসেবেও তিনি পারদর্শী ছিলেন। হুসেন শাহ শর্কি নিজেকে গীত রচয়িতা হিসেবে ‘শাহ হুসেন ফকির’রূপে আখ্যায়িত করতেন।

রাজা মনসিংহ তোমর : গোয়ালিয়রের শাসনকর্তা রাজা মনসিংহ তোমর একজন শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। তিনি ‘ধ্রুপদ’ গান আবিষ্কার করেন। তার রচিত ধ্রুপদ গান আজো প্রচলিত। তিনি ১৪৮৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সঙ্গীতজ্ঞদের এক আলোচনা সভার আহ্বান করে সঙ্গীতের তাত্ত্বিক আলোচনার সারাংশ ‘মানকুতুহল’ নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন। তিনি একজন সঙ্গীতশাস্ত্রী হিসেবেও প্রচুর সুনাম অর্জন করেন। তার রানী মুগয়নী সঙ্গীতে পারদর্শিনী ছিলেন এবং ‘গুজরী টোড়ী’ নামে রাগ সৃষ্টি করেন। রাজা মনসিংহ সঙ্গীত ক্ষেত্রে সঙ্গীতধারার প্রাচীন ও সনাতন ভিন্নধর্মী শিল্প-পদ্ধতি থেকে আনিত উপাদানগুলোর সমন্বয় সাধন করেছিলেন। ফলে রাগ সঙ্গীতে এক নবতর গতি সঞ্চারিত হয়েছিল।

মিয়া তানসেন : রাগ সঙ্গীত মোগল সম্রাট আকবরের আমলে চরম উৎকর্ষতা লাভ করে। তার মূলে ছিলেন আকবরের সভার নবরত্নের শ্রেষ্ঠ রত্ন সঙ্গীতবিশারদ মিয়া তানসেন। বর্তমান যুগে তানসেনের প্রবর্তিত সঙ্গীতেরই প্রচলন অব্যাহত রয়েছে। আনুমানিক ১৫১৬ সালে বেহার নামক স্থানে তানসেনের জন্ম। তার বাবা নাম রামতনু তান্না। রামতনু পরে তানসেনরূপে পরিচিত হন। তিনি বৃন্দাবনের স্বামী হরিদাসের তাহে সঙ্গীতে তালিম নেন। তানসেন সর্বপ্রথম ধ্রুপদ গানের সার্থক রূপ দান করেন। তিনি গান রচনাও পারদর্শী ছিলেন। তিনি রাগ সঙ্গীত স্থায়ী, অন্তরা-সঞ্চারী এবং আভোগ— এ চার ভাগে ভাগ করেন। তিনি বহু রাগ-রাগিনী সৃষ্টি করেন। তার সৃষ্ট রাগগুলো মিয়া কি রাগ নামে চিহ্নিত। মিয়া কি মল্লার, মিয়া কি সাং, মিয়া কি টোড়ী, মিয়া কি কানাড়া, মিয়া কি কল্যাণ ইত্যাদি নামে তার সৃষ্ট রাগগুলো পরিচিত। তিনি রবাব নামে একটি বাদ্যযন্ত্রে পারদর্শী ছিলেন। শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে তার অগাধ পাণ্ডিত্যের জন্য ইতিহাসে তিনি গন্ধর্ব বলে পরিচিত।

সদারঙ্গ : সদারঙ্গের আসল নাম নিয়ামত খাঁ। তিনি মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে আনুমানিক ১৬৭০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। বংশপরম্পরায় তিনি সঙ্গীতজ্ঞ। খেয়াল গানে তিনি শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেন। দিল্লির মোগল সম্রাট মুহম্মদ শাহর রাজত্বকাল পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন কুশলী বীণকার, গায়ক ও গীতিকার। তিনি অজস্র খেয়াল, ধ্রুপদ ও ধামার গান রচনা করেন। তিনি খেয়াল গান রচয়িতা ও গায়ক হিসেবেই সমধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন। সম্রাট তার অভূতপূর্ব সঙ্গীতপ্রতিভার স্বীকৃতিস্বরূপ তাকে সদারঙ্গ উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। সদারঙ্গ খেয়াল গানে এক যুগান্তর এনেছিলেন। সদারঙ্গের খেয়ালের ভাষা, খেয়াল-আঙ্গিকের বিশিষ্ট ফর্মরূপে ব্যবহৃত। পরবর্তী খেয়াল রচয়িতারা এ ফর্মেই গান রচনা করেছেন। সদারঙ্গ ধ্রুপদ, ধামার ও খেয়াল গান রচনা ছাড়াও বীণাবাদ্যের প্রভূত উন্নতি সাধন করেছিলেন এবং এতে কণ্ঠসঙ্গীতের অনুরূপ আলাপচারীর প্রবর্তন তার অন্যতম কীর্তি। খেয়াল গান জনপ্রিয় করার ক্ষেত্রে সদারঙ্গের অবদান

অসামান্য।

ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ : ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ বাংলাদেশের সন্তান। ভারতবর্ষের অবাঙালি সঙ্গীতজ্ঞদের মধ্যে বিচরণ করেও একমাত্র বাঙালি আলাউদ্দিন খাস বাংলা ভাষায় কথা বলে সঙ্গীত জগতের একেবারে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করতে পেরেছিলেন সঙ্গীতে তার অভূতপূর্ব ব্যুৎপত্তির জন্য। তিনি বাংলাদেশের ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগর উপজেলার শিবপুর গ্রামে ১৮৬২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। বালক বয়সে তিনি বাড়ি থেকে সঙ্গীতের অনুসন্ধান পালিয়ে যান। কলকাতার বিখ্যাত সঙ্গীতবিশারদ নুলা গোপালের কাছে সঙ্গীতে তালিম নেন। পরে ওস্তাদ আহমেদ আলী খাঁ এবং সর্বশেষ ভারতবিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ ওস্তাদ ওয়াজির খাঁর কাছে সঙ্গীতে তালিম নিয়ে সঙ্গীতের সর্বোচ্চ শিখরে অধিষ্ঠিত হতে পেরেছিলেন। এর পেছনে ছিল তার অপরিসীম আত্মত্যাগ। সংকল্পনিষ্ঠা, ধৈর্য, সংযম, ত্যাগ-তিতিক্ষা তার জীবনে প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

তিনি মাইহার রাজ্যে সভাসঙ্গীতজ্ঞের পদ অলঙ্কৃত করেন। সেখানে তিনি সঙ্গীতের এক স্কুল খোলেন। সেই স্কুল থেকেই বের হয়ে এসেছেন আজকের সব বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ পণ্ডিত তিমির বরগু, ওস্তাদ আলী আকবর খান, পণ্ডিত রবিশঙ্কর, অন্নপূর্ণা, ওস্তাদ বাহাদুর খান, পণ্ডিত যতীন ভট্টাচার্য, পণ্ডিত নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো আরো অনেক নামকরা শিল্পী। তিনি ‘চন্দ্রসারং’ নামে বাদ্যযন্ত্র উদ্ভাবন করেন। হেমন্ত, মেঘবাহার, প্রভাতকেশী, হেম-বেহাগ, মদন-মঞ্জরীসহ বহু রাগ সৃষ্টি করেছেন। সেনী ঘরানার সঙ্গীতে নতুন মাত্রা সংযোজন করে সেনী মাইহার সঙ্গীত ঘরানা সৃষ্টি করেন। উপমহাদেশে এই ঘরানার সঙ্গীতই বর্তমানে প্রচলিত। তিনি ছিলেন যুগের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতবিশারদ।

ওস্তাদ ওয়াজির খাঁ : ভারতবর্ষবিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর সঙ্গীতগুরু ওস্তাদ ওয়াজির খাঁ। তিনি আনুমানিক ১৮৬০ সালে রামপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন তানসেনের কন্যাবংশীয় সঙ্গীতজ্ঞ আমির খাঁর পুত্র।

পরবর্তীকালে তিনি রামপুরের নবাবের সঙ্গীতগুরু এবং দরবারের সভাসঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। অসাধারণ মেধা ও প্রতিভাগুণে তিনি সঙ্গীতে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। ১২ বছরকাল একটানা কঠোর সাধনা দ্বারা তিনি বীণায়ন্ত্রে সিদ্ধহস্ত হন। তারপর সুরশৃঙ্গার যন্ত্রে পারদর্শিতা অর্জন করেন। কণ্ঠসঙ্গীতেও তিনি দক্ষ ছিলেন। তার কণ্ঠস্বর যেমন মধুর ছিল তার যন্ত্রবাদন পদ্ধতিও তেমন ছিল আকর্ষণীয়। ওয়াজির খাঁ ধ্রুপদ, ধ্রুপদী হোরি, খেয়াল, টপ্পা, ঠুমরি প্রভৃতি গানের সব বিভাগেই শ্রেষ্ঠ নায়ক ছিলেন। বীণা ও সুরশৃঙ্গার বাদনে অদ্বিতীয় প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। প্রচলিত ও অপ্রচলিত সব রাগ-রাগিনীতেই তিনি অসাধারণ সৃষ্টি প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছিলেন। তার প্রতিভা ছিল সর্বতোমুখী। তাই তিনি ছিলেন এক কৃতী-প্রতিভাবান কলাসিদ্ধ সঙ্গীত পুরুষ।

ওস্তাদ আয়েত আলী খাঁ : ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও সঙ্গীতশিষ্য ওস্তাদ আয়েত আলী খাঁ। ১৮৮৪ সালে তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগর উপজেলার শিবপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১০



AB GROUP OF COMPANIES

SINCE 1983



AB ELECTRONICS

AB TELECOM

SIDDIQUE & CO.

Corporate Office:
 46/1, Sobhan Mansion
 (7th floor), Purana Paltan,
 Dhaka-1000, Bangladesh
 Phone: +88-02-9556047,
 9563479, 9565694

Our Showroom:
 1. 52/528, B.B. Khatun Stadium Market, Dhaka
 2. House-07, Road-04, Motomax
 Plaza, Dharmamandi, Dhaka
 3. 64-66, Motallib Plaza, Sonargaon road, Jhatirpool, Dhaka
 4. Khawal Poinr, Joydespur Chowrasta, Gaddpur
 5. Multijeddah Complex, Chowhatta, Sylhet
 6. Moor Complex, Ground Floor 487/A, Selkh Mujib
 Road, Agrabad, Chittagong
 7. Agrabad Centre, 1st Floor, 2470/A, Selkh Mujib Road,
 Agrabad
 8. Teal Raja Miah Market, Muradpur, Chittagong

Find Us:
Websites:
www.abgroupbd.com
www.abelectronicsbd.com
www.abtelecombd.com

Your Priority Our 1st Choice

বছর বয়সে তার সঙ্গীত শিক্ষা শুরু হয়। প্রথম গুরু বড় ভাই ফকির আফতাবউদ্দিন খাঁ। তারপর মাইহারে মেজ ভাই আলাউদ্দিন খাঁর কাছে দীর্ঘদিন সুরবাহার বাদ্যযন্ত্রে তালিম নেন। আলাউদ্দিনের পরামর্শে তিনি রামপুর রাজ্যে ওস্তাদ ওয়াজির খাঁর কাছে সঙ্গীতে তালিম নিতে যান। অনেক ত্যাগ-তিতিক্ষা, ধৈর্য-সংযম আর সহনশীলতার পরিচয় দিয়ে তিনি ওস্তাদ ওয়াজির খাঁর শাগরিদ হন। দীর্ঘ ১৩ বছর একটানা গুরু ওয়াজির খাঁর কাছেই তালিম নেন। সাধনার অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি কর্মজীবনে প্রবেশ করেন। প্রথমে রামপুর ও পরে মাইহার রাজ্যে সভাসঙ্গীতজ্ঞ হিসেবে যোগদান করেন। পরে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুরোধে বিশভারতীর বাদ্যযন্ত্র সঙ্গীত বিভাগের প্রধান হিসেবে শান্তিনিকেতনে শিক্ষকতায় নিয়োজিত ছিলেন। তিনি পরবর্তী পর্যায়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় এসে বাদ্যযন্ত্র নির্মাণে গবেষণা শুরু করেন। ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর উপদেশ ও পরামর্শে ‘চন্দ্রসার’ যন্ত্রটি তৈরি করেন এবং ‘সরোদ’ যন্ত্রের আধুনিক রূপ দান করেন। তা ছাড়া তিনি ‘মনোহরা’ ও ‘মন্দ্রনাদ’ নামে দুটো বাদ্যযন্ত্র উদ্ভাবন করেন। তিনি বারিষ, হেমন্তিকা, ওমর সোহাগ, বসন্ত ভৈরো, আওল বসন্ত প্রভৃতি রাগ সৃষ্টি করে অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দেন। সঙ্গীত সাধনায় ব্যুৎপত্তি লাভের পর সঙ্গীতের বিকাশ, প্রসার ও প্রচারে তিনি নিজেকে নিবেদন করেন। আলাউদ্দিন সঙ্গীত কলেজ স্থাপন করেন

ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও কুমিল্লা শহরে। অসংখ্য সঙ্গীত শিক্ষার্থী তৈরি করে সঙ্গীত জগতে অবিস্মরণীয় হয়ে আছেন। সঙ্গীতের শীর্ষতম সোপানে আরোহণ করেও তিনি ছিলেন সঙ্গীতের একজন শিক্ষানবিস। ওস্তাদ বিসমিল্লাহ খাঁ : ওস্তাদ বিসমিল্লাহ খাঁ অপ্রতিদ্বন্দ্বী এক সানাই বাদক। তিনি সানাইকে সঙ্গীতের ভুবনে অসংখ্য যন্ত্রের মেলায় স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তার এ অবদান সঙ্গীতের ইতিহাসে স্বর্ণক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকবে। তিনি বিহারের সাহাবাদ জেলার দুমরাও গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন ১৯১৬ সালে। মামাবাড়ি বারানসীতে তার সঙ্গীত জীবন বিকশিত হয়। একনাগাড়ে সঙ্গীতে তালিম নিয়ে ১৯৩০ সালে তিনি শিল্পী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। প্রথম অনুষ্ঠানেই তিনি সানাই বাজিয়ে মাত করে দেন এবং অবহেলিত সানাই যন্ত্রটিকে সঙ্গীতভুবনে প্রতিষ্ঠিত করেন। বিসমিল্লাহ খাঁর জীবনে পরবর্তী অধ্যায় সাফল্য, যশ আর খ্যাতির ইতিহাসে ভরপুর। বিসমিল্লাহ খাঁ এক অসাধারণ সঙ্গীতজ্ঞ হয়েও শিল্পী স্বভাব ও জীবনযাত্রায় কোনো দিন কোনো তারতম্য ঘটেনি। বিসমিল্লাহ খাঁ সানাই বাদনে এক কিংবদন্তি শিল্পী। পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে : রাগ সঙ্গীতকে সমাজে প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে তার সমগ্র জীবন নিবেদন করেছিলেন। মুম্বাইয়ের বালকেশ্বর গ্রামে ১৮৬০ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবেই লেখাপড়ার পাশাপাশি সঙ্গীতে তালিম নেন। ১৮৯০ সালে আইনশাস্ত্রে

উত্তীর্ণ হয়েও শেষ পর্যন্ত আইন পেশায় তিনি নিজেকে নিয়োজিত রাখেননি। তিনি শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের বিভিন্ন গীতিশৈলী অর্থাৎ ধ্রুপদ, খেয়াল ইত্যাদি গানের প্রামাণিক ও পরম্পরাগত ইতিহাস সংগ্রহে মনোনিবেশ করেন। তার প্রচেষ্টায় রাগ সঙ্গীতের বিজ্ঞানসম্মত তথ্যসমৃদ্ধ গ্রন্থাদি রচনার ভিত্তি স্থাপিত হয়। পরবর্তীকালে তিনি তার সুবিশাল সংগ্রহাদি সুবিন্যস্ত করে সঙ্গীতগ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হন। তার রচিত সঙ্গীতগ্রন্থগুলো প্রামাণ্য দলিল হিসেবে স্বীকৃত। তিনি একাধারে সঙ্গীতশিল্পী ও সঙ্গীত রচয়িতা ছিলেন। ‘চতুর পণ্ডিত’ নামে তিনি প্রচুর বন্দিশ রচনা করেন। ভাতখণ্ডে সঙ্গীত প্রচারের লক্ষ্যে সঙ্গীত সম্মেলনের আয়োজন করেন। বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে রাগ সঙ্গীত শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে বরোদায় রাষ্ট্রীয় সঙ্গীত বিদ্যালয় ও লখনৌতে মরিস কলেজ অব হিন্দুস্তানি মিউজিক নামে সঙ্গীত প্রতিষ্ঠান স্থাপনে বিশেষ অবদান রাখেন। তিনি ভাতখণ্ডে স্বরলিপি পদ্ধতির উদ্ভাবক। এ স্বরলিপি আজ বহুল প্রচলিত। তা ছাড়া রাগ সঙ্গীতে তার প্রবর্তিত শাস্ত্রই বর্তমানে প্রচলিত। অগণিত সেরা সঙ্গীতজ্ঞের মধ্য থেকে মাত্র ১০ জন গুণী সঙ্গীতজ্ঞের জীবনকথা বলা হলো। তা ছাড়াও বহু গুণী সঙ্গীতজ্ঞ নিজেদের অবদানে সঙ্গীত ভুবনকে সমৃদ্ধ করেছেন।





কনে দেখা আলো

হাজেরা নজরুল

কলেজে যাবার জন্য তৈরি হচ্ছিল হুসনা। ঝি এসে জানাল দু'জন ভদ্রলোক দেখা করতে চান। কেমন ধরনের? ভদ্রলোকই। হুসনার ট্রেইন্ড ঝি জোর দিয়ে বলে। গলায় একটু মিশিয়ে নিয়ে জানতে চাইল। আর বলল বসতে দাও। আর দু'কাপ চা, নাশতা দাও। হুসনা নিশ্চিত হয় ভর্তিসংক্রান্ত ব্যাপার। কিন্তু যে কারণে আসুক চা না খাইয়ে কাউকে ও খালিমুখে বিদায় করে না। সময় সংক্ষেপ বলে দেখা করবার আগে চায়ের নির্দেশ দিয়ে খোঁপাটা বাঁধা শেষ করে ডাইনরমে এলো। ওকে দেখে উঠে দাঁড়াল দু'জনই। স্বপ্ন-চেনা মানুষটি হেঁচকি করে ওঠে— আপা আমি মোস্তফা ঢাকা কলেজে আছি। বসুন— বলে নিজেও বসে। কী মনে করে? আমি কলেজ যাচ্ছিলাম। আপনাকে দেরি করাব না। এটি আমার ভাইয়ের মত। এর জন্য একটি মেয়ে দেখে দিতে হবে। আপনার কলেজ যে সুন্দরী মেয়ের জন্য বিখ্যাত আপনিও যে

শুনলাম দু'একটি বিয়ে দিয়েছেন। ভর্তি নয় জেনে স্বস্তির শ্বাস ছাড়ে ও। পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে নতুন পাত্রটিকে পর্যবেক্ষণ করে। ক্ষুদ্রাকৃতি গড়নের। শ্যামল বর্ণ। ভদ্র চেহারা। চোখে চোখ পড়তে হুসনাকে সালাম জানায়।

—কী পেশায় রয়েছেন?

—আমি ইঞ্জিনিয়ার রোডস অ্যান্ড হাইওয়েজে আছি।

—দেশ?

—টাইপাইল। আঞ্চলিকতার ছাপ সুস্পষ্ট।

—আচ্ছা আমি দেখব। একটি বায়োডাটা দেবেন। কিছু মনে করবেন না আমাকে উঠতে হবে, আপনারা কিছু চা না খেয়ে যাবেন না। হুসনা উঠে দাঁড়ায়।

—আপা আমরাও উঠব। আমাদেরও তাড়া রয়েছে।

ভেবেছিল পরিত্রাণ পাবে কিন্তু পেল না। কয়েক দিন পর পাত্রটি স্বয়ং এসে হাজির। কলেজে যাবে বলে রিকশার জন্য অপেক্ষা করছিল। গাড়িটা এসে কাছে দাঁড়ায়— কলেজে যাবেন, চলুন পৌঁছে দিই।

সম্পদ আপনার - ঝুঁকি আমাদের!



আপনার সম্পদের অগ্নি, নৌ, মটর
বিবিধ ঝুঁকি বহন করে থাকে রাষ্ট্রীয়
খাতে সাধারণ বীমা'র একমাত্র
প্রতিষ্ঠান 'সাধারণ বীমা কর্পোরেশন'।
পাশাপাশি ইঞ্জিনিয়ারিং, বিমান,
তেল-গ্যাস উত্তোলন, ওভারসীস
মেডিক্লেইম, ব্যক্তিগত দুর্ঘটনা
বীমাসহ এক্সপোর্ট ক্রেডিট গ্যারান্টি
বীমার ঝুঁকিও বহন করে থাকে।

দেশের একমাত্র রাষ্ট্রীয় বীমাকারী ও পুনঃবীমাকারী প্রতিষ্ঠান 'সাধারণ বীমা কর্পোরেশন'।



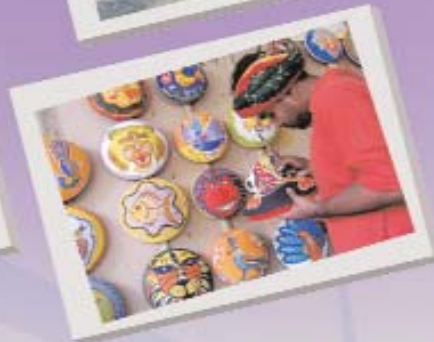
রাষ্ট্রীয় খাতে সাধারণ বীমা'র একমাত্র প্রতিষ্ঠান
সাধারণ বীমা কর্পোরেশন

৩৩, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা, বাংলাদেশ।

(অর্থনৈতিক নিরাপত্তার প্রতীক)

SME BANKING

রূপালী ব্যাংকের এসএমই ঋণ
ব্যবসায় আনবে শুভদিন



২০ কোটি টাকা পর্যন্ত এসএমই ঋণ দেয়া হয়



রূপালী ব্যাংক লিমিটেড

উত্তম সেবার নিশ্চয়তা

www.rupalibank.org

হুসনা ইতস্তত করে। গাড়ি থেকে নেমে অনুরোধ জানায়, ভয় পাবেন না আপা, পাকা ড্রাইভার। ছয় বছরের এক্সপেরিয়েন্স। কথার মধ্যে একটা ছেলেমানুষী ভাব রয়েছে। হুসনা আর আপত্তি করে না। পথে নানা কথা হয়। এক সময় বলে, আপনার কিন্তু আমার নাম জানা হয়নি।

—সরি, কী যেন আপনার নাম? নামতে নামতে হুসনা বলে।

—গোলাম হোসেন। তারপর কঠোর একটু নিচু করে বলে, আমার জন্য একটা মেয়ে দেবেন আপা। গাড়িটা কলেজের ভেতরে। চারদিকে জুঁই ফুলের মত ইউনিফর্ম পরে মেয়েরা ছড়িয়ে আছে। হুসনা খেয়াল করে গোলাম হোসেন নেমে কার্টিস দেখাবার ছলে ইতিউতি তাকিয়ে মেয়ে দেখছে। নিজের অবস্থানটা দৃঢ় করবার জন্য হুসনা বলে, ঠিক আছে আপনি আসুন।

সন্ধ্যার দিকে বাসায় আসবেন। গোলাম হোসেন এখন প্রাথমিক ব্যাপার। ঠিক গোলাম হোসেন নয় তার সেবা। গাড়ির দরকার গোলাম হোসেন। শূচির জন্মদিন মৌলভীবাজার থেকে বাজার করে আসে গোলাম হোসেন। টঙ্গীর জমিতে ধান হয়েছে খোকনকে নিয়ে কেটে নিয়ে আসে গোলাম হোসেন। আকবর ব্যবসায়ী মতিবিল আর ব্যাংকক, লন্ডন, দুবাই ওর গতিপথ। বাসায় রাতে যেন ঘুমাতেই আসে। ওরও নজর পড়ে—তোমার এ বাহন ভজ্জি কে হে। সব কাজে এমন—বলি ব্যাপারটা কী বল তো?

হুসনা রাতে ঘুমাবার আগে কিছুক্ষণ পরীক্ষার খাতা দেখে। চশমাটা খুলে টেবিলে রাখে। ছেলোট একটা বিয়ের কনে চায়। কিন্তু পাঞ্জির খুব পছন্দ উঁচুদের।

—মানুষটা নিজের মূল্যায়ন জানে না।

—মূল্যায়ন ওর মাপকাঠিতে খারাপ কী। ইঞ্জিনিয়ার—গাড়ি রয়েছে অফিসের। একটা কোয়ার্টার পাবে।

বিয়ের বাজারে একজন পাত্র হিসেবে ওর বেশ দাম রয়েছে।

—তবে বিয়ে হচ্ছে না কেন?

—কয়েকটি মেয়ে দেখিয়েছি। কারো চেহারা সুন্দর নয়, কারো বাবা বড় অফিসার নয়, এমন নানা রকম ত্রুটি বের করে নাকচ করে দেয়।

—তবে ছাঁটাই করে দিতে পার। তোমার ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়িয়ে লাভ কী?

—আমার তো কোনো সমস্যা হচ্ছে না। বরং মেয়ে দেখানোর ফাঁকে ফাঁকে ও আমার অনেক কাজ করে দেয়।

—ঘুষ নিচ্ছ?

হুসনা আহত হয়। —শোনো তুমি ভালো করেই জানো বিয়ে দেয়াটা আমার একসময় একটা শখ ছিল, এখন নেশায় দাঁড়িয়েছে। এই কতগুলো বিয়ে দিতে পারলে যেন বেহেশত পাব এ জন্য করি। এখন যে ব্যক্তিটির জন্য সময় দেব, সঙ্গ দেব এবং অনেক কথা খরচ করব, সে যদি আমার দু'একটি কাজ করে দেয় সেটা কি ঘুষ হবে?

আকবর কথা বাড়ায় না। সরি, তোমার বিজনেস তোমার। আমি ইন্টারফেয়ার করবার জন্য দৃষ্টিত। আকবর ঘুমাতে যায়। কিন্তু কথাগুলো হুসনাকে আন্দোলিত করে। এ পর্যন্ত বিশটি বিয়ে দিয়েছে ও। শুরুরটা কবে হয়েছিল মনে নেই, কিন্তু যেহেতু ও কলেজে আছে ও বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত, কী ছেলে, কী মেয়ে, পিতা-মাতারা ওকে সব সময় বিয়ের ব্যাপারে চাপ দেয়। হুসনা বিরক্ত হয় না।

‘আপা, আমার ভাগিটা এমএ পাস করে বসে আছে। একটা ছেলে দেখে দিন না।’

—‘খালান্না-আমার মেয়েটা পড়াশোনা করতে চায় না একটা ছেলে দেখে দেন’ নানাজনের নানা অনুরোধ। হুসনা দু’পক্ষকে একত্রিত করে দেয়। এর বেশি নয়। ওরা যদি সমঝোতায় পৌঁছায়, হুসনা দু’পক্ষের কাছ থেকে বিয়ের দাওয়াত পায়, কখনো কখনো উপহারও পায়।

গোলাম হোসেনকে বারণ করে দেব। কারণ প্রায় দশটি মেয়েকে কায়দা করে দেখানো হয়েছে। গোলাম হোসেনের পছন্দ হয়নি।

দু’দিন গোলাম হোসেন এলো না। নিশ্চিত হলো হুসনা যে ও কোথাও নিশ্চয়ই বিয়েসংক্রান্ত ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছে। তৃতীয় দিন এলো। মুখ খুব বেজার।

—কী ব্যাপার? বিয়ের কিছু হলো?

—না আপা, এ মেয়েটা সুন্দর ছিল, কিন্তু বাবাটা খুব গরিব সামান্য স্কুলমাস্টার। হুসনা বিরক্ত। গোলাম হোসেনের সঙ্গে পরিচয় গভীর হবার আগে একটা অপত্য স্নেহবোধ ছিল। ছাপোষা ঘরের ছেলে। লেখাপড়া করে ইঞ্জিনিয়ার হয়েছে, চাকরি পেয়েছে। একটা ভালো ঘরের মেয়ে পেলে হয়তো সম্পূর্ণতা খুঁজে পাবে। কিন্তু যত দিন যাচ্ছে তত হোসেনের চেহারা খুলে যাচ্ছে। ওর খুঁতখুঁতে ভাবটার জন্য হুসনার নিজের পছন্দ করা একটি মেয়েকেও নাকচ করতে হয়েছে। লোকটা নিজের সম্বন্ধে সুপেরিয়ারটি কমপ্লেক্সে ভুগছে। ছোট অবস্থা থেকে রাতারাতি গাড়ি, চাকরি এবং বাড়ির মালিক হয়ে ভেবেছে, ওর জন্য বাংলাদেশের মেয়েরা সব হলো হয়ে আছে। কিন্তু গোলাম হোসেনের পরিচয় বনেদি কোনো পরিবারের পক্ষে গ্রহণ করবার মত নয়। সে কারণে সুন্দরী কনে এবং সম্পন্ন ঘরে হুসনা ওর প্রস্তাব পাঠাতে পারছে না। মেয়ের বাবা সরাসরি জানতে চান পাত্রের পিতা কী করেন, বংশপরিচয়। গোলাম হোসেনের পিতা কৃষক। দেশে বাড়ি আছে শুনেছে হুসনা, নিশ্চিত নয়। এবং সে বাড়িটি চালা, না পাকা তাও বোঝা যায় না। বাড়িঘরের কথা উঠলে গোলাম হোসেন অন্যমনস্ক হয়, অন্য কথায় চলে যায়। খুব চাপাচাপি করলে বলে, আমি হাভাতে ঘরের ছেলে নই আপা। ঘরেবরে খারাপ নই। সবার ওপর আমি একজন সক্ষম উপার্জনক্ষম পুরুষ মানুষ।

ওকে বোঝানো যায় না যে, ও যে অর্থ পুরুষ হয়ে ভ্রাম্য মানসিকতায় ভাবছে যে কনের পিতারা ওকে দুর্বল ভাবে লাইন দেবে সে যুগ নেই। এখন মেয়েদেরও মর্যাদাবোধ জন্মেছে এবং মা-বাবারাও তাদের সন্তানদের মতামতের মর্যাদা দেন। শেষ চেষ্টা হিসেবে আর একবার দেখেন আপা। অনুরোধ জানায় গোলাম হোসেন। ছয় মাস কেটে গেছে। গোলাম হোসেন আর আসেনি। হুসনা নিশ্চিত হলো যে ওর বিয়ে হয়ে গেছে। মাঝে কয়েকজনের সঙ্গে দেখা হয়েছে যারা গোলাম হোসেনের বিয়ের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছেন। একজন বলেই ফেললেন—ওর বামুন হয়ে চাঁদ ধরার শখ। মেয়ে সুন্দরী হবে, অনার্স পড়া চাই, ধনী বাবা চাই... ইত্যাদি। যখন সব পেয়ে যায়, তখন বাড়িঘর ছাড়িয়ে দেশের অবস্থা কেমন খুঁটিয়ে দেখতে চায়। আসলে ওর কপালে বিয়ে নেই।

হঠাৎ একদিন গোলাম হোসেনের সঙ্গে দেখা। সেটা হুসনার মাধ্যমে ঘটিত একটি বিয়েতে—বৌভাত হাছিল অফিসার্স ক্লাবে। গোলাম হোসেনকে হুসনা দেখেনি ও

নিজেই এগিয়ে এলো—আপা কেমন আছেন। আকবর তাকিয়ে দেখে হাসল—হিজ হাইনেস গোলাম হোসেন। তা স্ক্রীট কোথায়? লাজুক হাসে গোলাম হোসেন, দিলেন কই জুটিয়ে। আপা তো চেষ্টাই করলেন না।

—আজ কোন পক্ষ আপনি?

—বরপক্ষ। কেন?

—এ বিয়েটাও হুসনা দিয়ে দিয়েছে। মেয়ে দেখেছে।

কেমন?

—ইউনিক। এরকম একটা মেয়ে তো আমাকে দেখাননি আপা।

হুসনা এবং আকবর দুজনই জোরে হেসে দেয়, গোলাম হোসেন চমকে ওঠে। হাসি থামিয়ে হুসনা বলে, এ মেয়েটিকে পার্কে কনে দেখা আলাতে আপনি দেখেছিলেন। মনে আছে বলেছিলেন যদিও বাবা জয়েন্ট সেক্রেটারি, মেয়ে এম এ পাস, ঢাকায় বাড়ি আছে, কিন্তু মেয়ের গালে মেছতা আছে। আজকে মেছতা দেখেননি নাকি বর ধোঁকা খেয়েছে?

গোলাম হোসেন লাজুক হাসে, বর আমার অফিসের সিনিয়র। খুব ভালো ছেলে। বিয়ের দিন আমি দেশে ছিলাম। আজ অফিসে বৌভাতের কার্ড দেয়ার সময় দেখলাম খুশিতে বাগবাগ করছে।

আকবর হাসে তাহলেই বুঝুন। আপনার ভাই কপালে বিয়ে নেই। এখন মাথায় টাক পড়বে পাত্রী আর পাবেন না।

গোলাম হোসেনের আসা-যাওয়া আবার বেড়ে যায়।

হুসনা এবং আকবরকে খুশি করার নানা প্রয়াস চালায়। দুর্বল টিকিট জোগাড় করে আনে, দাওয়াত করে এক আত্মীয়ের বাড়ি চালের রুটি মুরগি ভুনা খাওয়ানোর জন্য।

আকবর একসময় হেসে দেয়—‘কী গো, বেচারাকে একটা মেয়ে দিতে পারলে না? হুসনা চেষ্টা করছে, কিন্তু হচ্ছে না।

একদিন গোলাম হোসেন খুব খুশি খুশি চেহারা নিয়ে এসে হাজিরা। আপা, দারুণ খবর আছে।

উৎসুক হুসনা বলে, কী খবর?

মেয়ে পেয়ে গেছি। আপনাকে আর খুঁজতে হবে না। ঠিক যেমন মেয়ে চাই, ঠিক তেমন।

তাই নাকি! কোথায়? সোফায় নিশ্চিন্তে বসে হুসনা। গোলাম হোসেন বিপরীত সোফায় বসে ক্রত কণ্ঠে বর্ণনা দেয় ভার্টিটির মেয়ে। বাড়ি ফিরছিল। পথে মিছিল, ও কিনারে দাঁড়িয়েছিল, কাছেই ছিল আমার গাড়ি। হঠাৎ মিছিলে মারামারি, হুড়াহুড়ি, আমি গাড়ি স্টার্ট দিচ্ছি মেয়েটি দৌড়ে এসে বলে—আপনার

গাড়িতে একটু সামনে এগিয়ে দেন। আমি দু’মিনিট চিন্তা করলাম মেয়েটিকে তুললে যদি ঝামেলা হয় কিন্তু মনে হলো মেয়েটি মিছিলে আরো ঝামেলায় পড়তে পারে। ওকে তুলে নিলাম এবং বাড়ি পৌঁছে দিলাম।

—দারুণ রোমান্টিক। তারপর? কখন যেন আকবর এসে বসেছে। মন্তব্যটি ওর। গোলাম হোসেন উৎসাহ বোধ করে—হ্যাঁ দুলাভাই, দারুণ ব্যাপার।

—মেয়েটি যদি বিবাহিত হয়। ওদের উৎসাহে পানি ঢালে হুসনা।

—মেয়েটি কুমারী। সেটা আমি জেনে নিয়েছি। বাসার ঠিকানা দিচ্ছি। আপা হয় আমি পৌঁছে দেব আপনি একটু নিগাসিয়েট করুন প্লিজ।

বাসাটা মোহাম্মদপুর। ছোট ফ্ল্যাট। হুসনা এবং গোলাম হোসেন গেল। দরজার বেল বাজতেই মেয়েটি বেরিয়ে এলো। সত্যি সুন্দরী। হুসনা স্বীকার করল।

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কৃষি ও গ্রামীণ কর্মকাণ্ডে ঋণদানকারী সর্ববৃহৎ প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের কৃষিভিত্তিক প্রকল্পে অর্থায়ন

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক কৃষিপণ্য উৎপাদন, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও বিপণনের মাধ্যমে কৃষিভিত্তিক শিল্পে অর্থায়ন করে আসছে। পাশাপাশি এসএমই ঋণ কর্মসূচীর আওতায় ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প/ব্যবসা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালন কার্যক্রমের জন্য ঋণ সহায়তা দিয়ে থাকে।



কৃষিপণ্য কৃষি ভিত্তিক শিল্প/ব্যবসায়ের অনুমোদিত খাতসমূহ :

- ধাঁস-মুরগীর খামার ■ দুগ্ধ খামার ■ মৎস্য খামার
- হ্যাচারী (মৎস্য পোনা উৎপাদন ও সংরক্ষণ)
- গরু মোটাতাড়াকরণ ■ কোল্ড ষ্টোরেজ ■ ফিস প্রসেসিং
- কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ■ ব্রেড ও বিস্কুট ফ্যাক্টরী
- অরফ্রিস চাউল কল ■ ডেইরী এন্ড ফিস ফিল্ড তৈরী
- কৃষি যন্ত্রপাতি তৈরী ও বিপণন

এছাড়াও আমদানী-রপ্তানীসহ সকল প্রকার বৈদেশিক বাণিজ্য কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।



বিস্তারিত তথ্য ও সেবা গ্রহণের জন্য নিকটস্থ ব্যাংক শাখায় যোগাযোগ করুন
অথবা ব্যাংকের ওয়েবসাইট ভিজিট করুন।



বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

গ্রামবাংলার গণমানুষের ব্যাংক

www.krishibank.org.bd

adbkbprd.16

গোলাম হোসেন পরিচয় করালো আমার বোন।
হুসনা একটু অভিনয় করল— ভাই পৌছে দিল পরে
কোনো ঝামেলা হলো কি না, খবর নিতে এলাম। এই
পথ দিয়ে যাচ্ছিলাম কি না।

মেয়ের মা যত্ন করে বসালেন। গোলাম হোসেনের
প্রশংসায় পঞ্চমুখ। বললেন, না আপা একটা মেয়ে
কলেজে যে পর্যন্ত থাকে, চিন্তায় থাকি। এক ফাঁকে
হুসনা বলেই ফেলল, বিয়ে দেবেন নাকি। আমার
হাতে ভালো ছেলে আছে।

বিয়ে তো দিতেই হবে— মেয়ে মানুষ বিয়ে না দিয়ে
পারব? এক মেয়ে আমার।

—ওর বাবা কোথায়?

—উনি এজি অফিসে আছেন। সন্ধ্যাবেলা ছাত্র পড়ান।
সংপথে থাকলে যা হয়। খুব খাটুনি। মেয়েটার ভালো
বিয়ে দিলে আমরা নিস্তার পাই। তা ছেলে কী করে?

—সেটা পরে বলব। আপনি বিয়ে দেবেন কি না ওর
বাবার সঙ্গে আলাপ করে জানাবেন।

—ওর বাবা শুধু নয় আমার দুই ছেলে রয়েছে, একজন
ঘোড়াশাল সার কারখানায় ওভারশিয়ার, অন্যজন
একটা গার্মেন্টে রয়েছে। ওদের মতামত দরকার।
একমাত্র বোন তো, বড় আদরের।

হুসনা এবার স্পষ্ট হলো— আপনার সঙ্গে স্পষ্ট বলাই
ভালো। যে ছেলেটি আমার সঙ্গে এসেছে, সে-ই পাত্র।
আপনার পছন্দ হয়?

মেয়েটির মা পর্দা সরিয়ে ডাইনিরমের দিকে তাকিয়ে।
মেয়েটি আলাপ করছে গোলাম হোসেনের সঙ্গে। যা
ছোট কাজের মেয়েটিকে বলে যা তোর আপাকে ডেকে
আন ভেতরে।

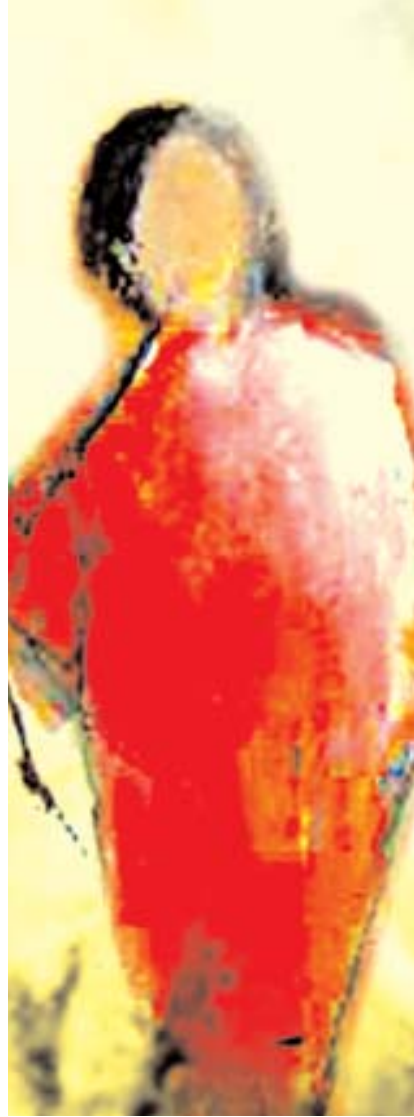
মেয়ে এলে বলে, কথা বললেই চলবে যাও নাশতা
দাও। মেয়েটি ভেতরে চলে যায়।

মেয়েটির মা বুদ্ধিমতী, এবার ফিসফিস করে বলে,
ছেলেটি তো ভালোই তবে ওর বাপ-ভাইকে তো দেখা
দরকার। আপনি ওকে নিয়ে শুরুর আসুন— সবাই
বাসায় থাকবে আপনার ভাই যখন, আর কী জিজ্ঞেস
করবে। বর্ণার কপাল তো আমি কিনতে পারব না।
যথাসময়ে শুরুর গোলাম হোসেনসহ বর্ণাদের বাড়ি
গেল হুসনা। বাড়িটা গোছানো হয়েছে। ওরা যাওয়ার
পর ধোপদুরন্ত কাপড় পরে ওর বাবা এবং দুই ভাই
এসে সামনে বসল। নানা আলাপ-পরিচয় হলো।
একসময় সাজানো অবস্থায় বর্ণাকে সামনে আনা
হলো। এরকমটি ও আশা করেনি। মেয়ে তো দেখাই
এখন তো ছেলে দেখার কথা।

গোলাম হোসেন ইশারায় ওকে বারান্দায় নিয়ে এলো—
আপা মেয়ে তো দেখালেন। কিছু যে দিতে হয়, আমি
আংটি কিনে আনি। হুসনা বাধা দেয়— না এখন
কোথায় আংটি আনতে যাবেন। বরং নগদ টাকা দেন।
গোলাম হোসেন এসে পাঁচশ টাকার দুটো নোট
মেয়েটির হাতে দেয়। লাজুক মেয়েটি বিনম্র হাসে।
ফেরার পথে গোলাম হোসেন গাড়ির স্পিড বাড়িয়ে
দেয়। মুখে অজ্ঞপ্র কথা যাক এতদিনে আমার বিয়ের
কপাল খুলল আপা। আচ্ছা ইন্ডিয়া চলে যাবে বিয়ের
মার্কেটিং কী বলেন? চলেন আপনাকেও নিয়ে যাব
যাবেন তো? বৌ-ভাতের জন্য অফিসার্স ক্লাব আমি
কালই বুক করব।

—আপ্তে চালান। অ্যান্ড্রিডেন্ট হবে— হুসনা একটু যতি
টানে ওর উৎসাহে। কিন্তু গোলাম হোসেন আজ
বেপরোয়া। চলেন, আজ আপনাদের জন্য মিষ্টি কিনে
নেব। একটা শুভ ব্যাপার, দুলাভাইকে খালি হাতে কী
করে খবরটা দিই।

দুদিন পর হুসনার কাছে লোক মারফত একটি চিঠি
এলো। বর্ণার বাবা-ভাইয়েরা মেয়েকে এখন বিয়ে
দেবে না। মেয়ে ছোট, আরো পড়াশোনা করবে।
খামের ভেতর দুটি কড়কড়ে পাঁচশ টাকার নোট।
হুসনা বুঝতে পারে এটা গোলাম হোসেনকে
প্রত্যাখ্যান করা। যেহেতু হুসনার ভাই বলে পরিচয়
দেয়া হয়েছে তাই অস্বীকারের ভাবটা নম্র।
রাত্রে আকবরকে চিঠিটা দেখালো হুসনা। আকবর
পড়ে হা হা করে হেসে উঠল। আমি আগেই জানতাম।
যুগ পাল্টে গেছে। এখন মেয়েদের বিয়ে দেয়ার
ব্যাপারে বাবা-মায়েরা খুবই সচেতন। মেয়েদের
পছন্দের বেশি মূল্য দেয়া হয়। যে হারে প্রতিদিন
পত্রিকায় স্ত্রী-হত্যার খবর উঠছে তোমার গোলাম
হোসেনের এ কথাটা বোঝা উচিত ছিল।
—দেখ, এ পর্যন্ত ও কোনো মেয়ে পছন্দ করতে
পারেনি। এই একটা মেয়ে দেখলাম যাকে ওর মনে
ধরেছে। মেয়েটি এমন কোনো বড় ঘরের নয়, ধরতে
গেলে গোলাম হোসেনের সমমানের ঘর। ওদের
এভাবে প্রত্যাখ্যান করাটা আমি বলব খুব বেশি
অহমিকা দেখানো হয়েছে।



বিকালে প্রত্যাশাভরা মন নিয়ে গোলাম হোসেন ঘরে
চুকল— আপা ওদের তরফ থেকে কোনো খবর
এসেছে?

হুসনা ওকে সরাসরি কষ্ট দিতে পারল না। —না
পাইনি। আপনি এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? ওদের একটু
চিন্তাভাবনা করবার সুযোগ দেবেন তো? ওদের
একমাত্র মেয়ে— ভাইদেরও একমাত্র বোন।
গোলাম হোসেন লাজুক হাসে— মেয়েটি খুব সুন্দর,
তাই না আপা। হুসনা ওকে সহিয়ে নিতে চায়, বলে,
আমার কাছে কিন্তু খুব সুন্দর মনে হয়নি। এর চেয়ে
অনেক সুন্দর মেয়ে আপনাকে দেখিয়েছি।
—তারা এত সুন্দর ছিল না। গোলাম হোসেন জোর
দিয়ে বলে।

মেয়ের বাবাও কিন্তু বড় অফিসার নয়। বাড়িঘরের
অবস্থাও...

—গোলাম হোসেন এসব শুনতে চায় না। বলে, যাক
এতদিনে খোদা মুখ ভুলে তাকালেন। কত মেয়ে যে
দেখলাম— বর্ণার মত নিখুঁত মেয়ে আমি আর দেখিনি।
—বর্ণা কিন্তু একটু বেটে, অনার্স ও পড়ে না।

—বাঙালি মেয়েদের হাইট এরকমই হয়। আর বিএসসি
পড়ে যখন অনার্স না হলেও চলেবে। আমি বাসার জন্য
খুব উঠেপড়ে লেগেছি। দু'এক দিনের মধ্যে পেয়ে
যাব।

বাসা?

এতদিন বাসাবোয় একটা ভাড়া বাসায় ছিলাম। বৌ
নিয়ে ওখানে ওঠা যায় না। কোয়ার্টার অ্যালটমেন্ট
হয়েছে কিন্তু পজিশন পাইনি। আমি এখনই আবার
বাসার ব্যাপারে যাচ্ছি— ইনশা আল্লাহ দু'এক দিনের
মধ্যে পেয়ে যাব।

গোলাম হোসেন কলকল করে, হুসনার মনে হয় যেন
ময়ূর পেখম মেলেছে। আপা আমার নতুন বাসা
সাজানোর সময় আপনাকে কিন্তু বাজার করে দিতে
হবে— ঘরের বারান্দায় দৃষ্টি বুলিয়ে বলে, আপনার
রুচি খুব উন্নতমানের।

ঝি চা দিয়ে যায় হুসনাকে। হুসনা চা খেতে ভুলে যায়
কিন্তু গোলাম হোসেন কাপটা টেনে চাটা খেয়ে ফেলে।
হুসনা চা খায় না।

—আপা, ঘরের পর্দা, সোফার রং হবে লাল। আমার
লাল রংটা খুব পছন্দ। কেমন হবে আপা, বলেন না।
উদাস কণ্ঠে হুসনা বলে, ভালো।

গোলাম হোসেন এবার বাকবাকুম পায়রার মত শব্দ
তোলে— বর্ণাকে আমি হীরের আংটি দেব আপা। ওর
আঙুলের মাপটা পেলেই কিনে ফেলব।

—ওকে এত ভালো লেগেছে?

—খুউব। কনে দেখা আলোটা সুন্দর ছিল। তাই তো
দু'জনার দু'জনা পছন্দ হলো।

হুসনা চুপ করে বসে থাকে। আলমারিতে রাখা চিঠিটা
চোখে ভাসে। ভাসে পাঁচশ টাকার দুটি নোট,
কড়কড়ে। কিন্তু বলা যায় না।

‘আপা, আমরা গরিব মানুষ। আমাদের আবার পছন্দ।
ছেলেটাকে আমরা স্বামী-স্ত্রী পছন্দ করেছিলাম। কিন্তু
বর্ণার পছন্দ হয়নি। বর্ণার ভাইদের না। মাফ করে
দেবেন।’ বর্ণার মায়ের চিঠির শব্দগুলি মার্জিত, ভদ্র।

গোলাম হোসেন ওর ঘর সাজানোর নানা রকম বর্ণনা
দিয়ে চলে। হুসনা চুপ করে বসে থাকে। দশ বছর
ধরে কনে দেখাছে গোলাম হোসেন— বহু কনের
প্রত্যাশাকে ও নাকচ করেছে। আর তাই হয়তো ওর
পরম পছন্দের কনের দেয়া চরম প্রত্যাখ্যান ওর কাছে
সেই প্রতিশোধ হয়ে ফিরে এসেছে।



ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।

Phone-0371-62149, Fax-0371-62610

www.knsikhagrachari.org

প্রতিষ্ঠার পর হতে খাগড়াছড়ি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট-এর প্রকাশনাসমূহ নিম্নরূপ

ক্রঃ নং	বইয়ের নাম	লেখক	মূল্য
১.	চাকমা সাহিত্য সমাজ ও সংস্কৃতি	ড. জাফার আহমেদ হানারী	৩৫০/-
২.	সান্দবীর বারমাসী	ড. আফসার আহমদ	২৫০/-
৩.	ককবরোক (ত্রিপুরা শব্দকোষ)	মথুরা বিকাশ ত্রিপুরা	১০০/-
৪.	মারমা শব্দকোষ	অংক্যজাই মারমা	৭০/-
৫.	চাকমা শব্দ ভান্ডাল	আর্য মিত্র চাকমা	২৪০/-
৬.	ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সামাজিক প্রথা ও রীতিনীতি	সুগত চাকমা	১২০/-
৭.	The Hill Tracts of Chittagong and the Dwellers therein	Capt. T.H. Lewin	২৫০/-
৮.	ত্রিপুরা আয়ুর্বেদিক শাস্ত্র	প্রভাংশু ত্রিপুরা	৬০/-
৯.	Chittagong Pattern of The Chakma Society in the Chittagong Hill Tracts	Dr. Sudhin Kumar Chakma	২৪০/-
১০.	ত্রিপুরা তন্ত্র মন্ত্র সার	প্রভাংশু ত্রিপুরা	১৩০/-
১১.	A History of Chittagong Hill Tracts	Suniti Bhushan Qanungo	২৮০/-
১২.	কবরক (বিশেষ সংকলন)	সম্পাদক-সুসময় চাকমা	১০০/-
১৩.	পার্বত্য রাজলহরী	নোয়ারাম চাকমা	৮০/-

সকল বই ২০% কমিশনে বিক্রয় করা হয়।

সুসময় চাকমা
উপ-পরিচালক
ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট
খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।



উপন্যাস

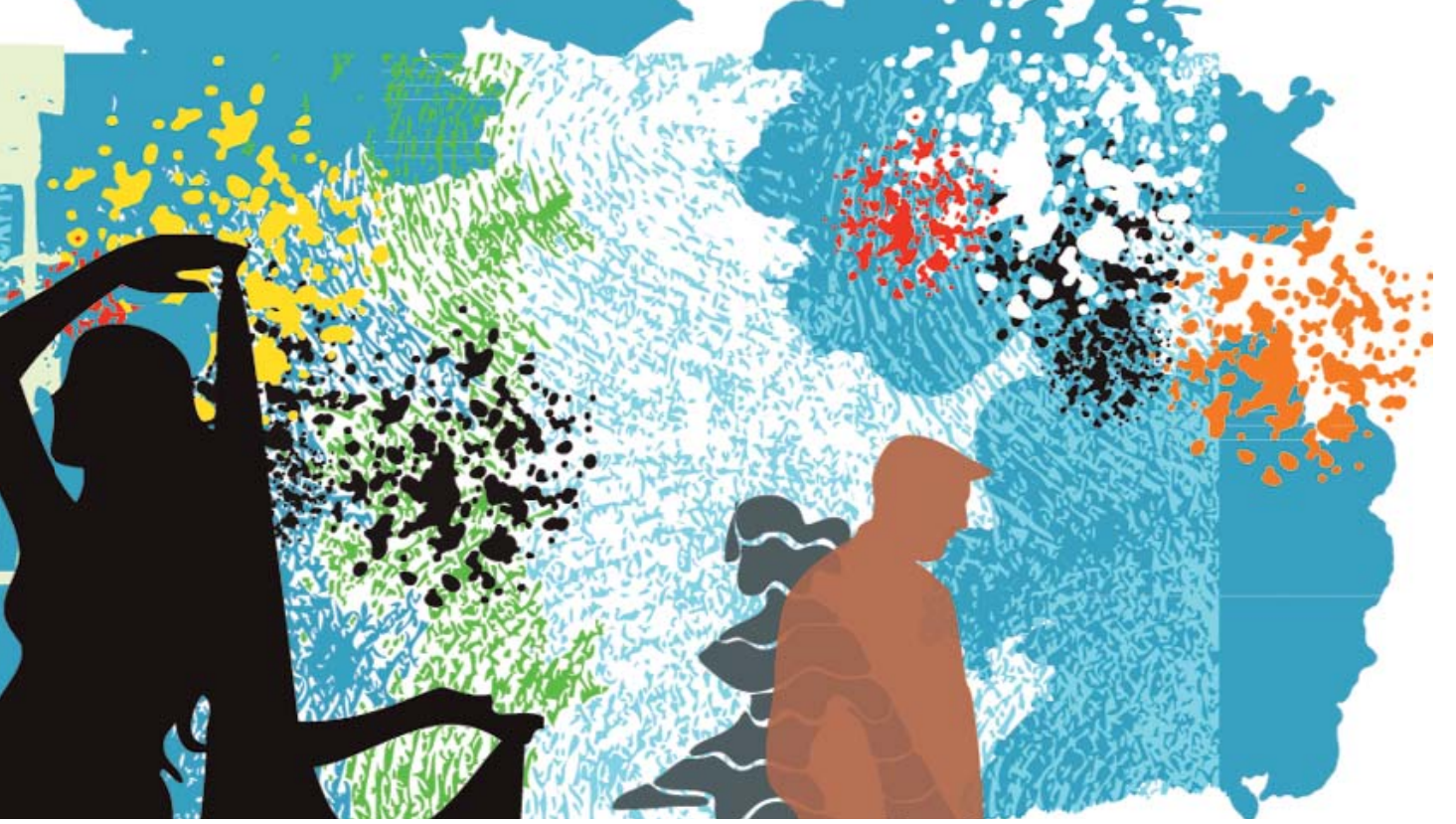
স্বপ্নময় কিংবা প্রত্যাখ্যানের পটভূমি

নুরুল করিম নাসিম

॥ এক ॥

বিদেশ যাওয়ার স্বপ্ন কোনোদিন দেখিনি।
তেমন কোনো উচ্চাকাঙ্ক্ষাও ছিল না। খুব
ছেলেবেলাতেই জেনে গিয়েছিলাম মধ্যবিত্ত
পরিবারে জন্মালে কোনো স্বপ্নই সার্থক হয় না,
কোনো উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণ হয় না। তবুও বড়
হওয়ার একটা ক্ষীণ আশা মনের ভেতর পুষতাম।
সব সময় ভাবতাম লেখাপড়া করে একদিন বড়
হবো। কিন্তু বয়স যত বাড়তে লাগলো তত আমার
ভুল ভাঙতে লাগলো। লেখাপড়া করলেই বড়

হওয়া যায় না। আরো বাড়তি যোগ্যতা থাকা
দরকার। শেষ পর্যন্ত এসব আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে
মাথা ঘামাতাম না। ভবিষ্যতের হাতে সব কিছু
ছেড়ে দিয়েছিলাম। যা হবার তাই হবে। জীবন
যেমন চলছে তেমনি চলুক।
আমার এক স্কুল-বন্ধু ছিল হায়দার। ওর চিত্তাধারা
সম্পূর্ণ আলাদা। সামান্য একজন কেরানির ছেলে
হওয়া সত্ত্বেও ওর বড় হওয়ার স্বপ্ন ছিল প্রবল।
আর ছিল উচ্চাকাঙ্ক্ষা। ও সৈন্য বাহিনীতে যাওয়ার
স্বপ্ন দেখতো। এক সময় শর্ট-সার্ভিস কমিশনে



পরীক্ষাও দিয়েছিল। পাকিস্তান আমলে বৈষম্যনীতির কারণে এবং বাঙালির আকৃতিগত সীমাবদ্ধতার জন্য ওর চাকরি হয়নি। অতঃপর বিদেশে পাড়ি জমানোর জন্য উঠে পড়ে লাগলো। বাবা মারা যাওয়ার পর জমি বিক্রির চল্লিশ হাজার টাকা দিয়ে কোনো চোরা পথে পশ্চিম-জার্মানি হয়ে গ্রিসে চলে গেল। যাওয়ার আগে আমাকে প্রায়ই বলতো ইন্টারন্যাশনাল পাসপোর্টটা করে ফেল, কাজে লাগবে। আমি তেমন একটা গা করতাম না। তাছাড়া দু'তিনশ টাকাও আমার সেই সময় ছিল

না। শেষের দিকে হায়দার আমাকে নিয়ে ঠাট্টা করতো। আমাকে সে 'নন্দলাল' কবিতার নন্দলালের সঙ্গে তুলনা করতে লাগলো। হায়দারের স্বপ্ন দেখার কোনো বাধা ছিল না। কিন্তু আমার ছিল। আমি কোনো দিন স্বপ্নাহত হতে চাইনি। ব্যর্থতা আমি সহ্য করতে পারতাম না। মানুষের কাছে সরাসরি মুখ ফুটে কিছু চাইতেও পারতাম না। তিন ভাই, এক বোন আর বিধবা মাকে ফেলে হায়দার ভাগ্যস্বেষণে দেশ ছেড়ে চলে যেতে পারে, কিন্তু আমি পারি না। তাছাড়া



খাগড়াছড়ি পৌরসভা

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।

খাগড়াছড়ি পৌরসভার পক্ষ থেকে সবাইকে জানাই পবিত্র ঈদুল ফিতেরের প্রাণঢালা শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। দেশ ও জাতির কল্যাণে দৈনিক যায়যায়দিন পত্রিকা অগ্রণী ভূমিকা রাখবে এবং বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ প্রচার করবে— এ আশাবাদ ব্যক্ত করি। দৈনিক যায়যায়দিন গণমানুষের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং দেশের উন্নয়ন, অগ্রগতি, সমৃদ্ধি ও প্রশান্তির লক্ষ্যে কাজ করবে এই প্রত্যাশা করি এবং এই পত্রিকার উত্তরোত্তর সফলতা কামনা করি।

পৌরবাসীর প্রতি আন্তরিক আহ্বান

- ❑ আপনার শহর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখুন, নির্ধারিত ডাস্টবিনে ময়লা-আবর্জনা ফেলুন।
- ❑ নিয়মিত পৌরকর পরিশোধ করুন, আপনার শহর উন্নয়নে শরিক হউন।
- ❑ জন্ম-মৃত্যুর সংবাদ পৌরসভায় লিপিবদ্ধ করুন।
- ❑ পৌর শহরে শান্তি-সম্প্রীতি বজায় রাখুন, আইন-শৃঙ্খলা মেনে চলুন।
- ❑ মা ও শিশুকে নিয়মিত টিকা দিন, আপনার সন্তানকে স্কুলে পাঠান।
- ❑ লাইসেন্স নিয়ে রিক্সা ও অন্যান্য যানবাহন ব্যবহার করুন।
- ❑ পৌরসভার অনুমোদন নিয়ে সকল প্রকার উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করুন।
- ❑ নিরাপদ পানি পান করুন ও স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার করুন।
- ❑ মাদকমুক্ত সমাজ গঠনে এগিয়ে আসুন।
- ❑ বিদ্যুৎ ও পানির অপচয় রোধ করুন। গাছ লাগান পরিবেশ বাঁচান।
- ❑ রাস্তা ও ড্রেনের উপর অবৈধ স্থাপনা নির্মাণ থেকে বিরত থাকুন।
- ❑ বাল্যবিবাহ পরিহার করুন এবং ইভটিজিংকারীদের বিরুদ্ধে সামাজিকভাবে প্রতিরোধ করুন।
- ❑ লাইসেন্স নিয়ে বৈধভাবে ব্যবসা পরিচালনা করুন।



রফিকুল আলম

মেয়র

খাগড়াছড়ি পৌরসভা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ ডিগ্রি আমাকে নিতেই হবে। হায়দার তেমন একটা লেখাপড়ায় মনযোগী ছিল না। কলেজে পড়ার সময়ই কি রকম বদলে যেতে থাকে। ঠিকমতো ক্লাস করতো না, আর ধানমন্ডির রংবাজ ছেলেপেলেদের সঙ্গে হুদাতা বাড়তে থাকে। ক্রমেই আমাদের সঙ্গেই ওর বন্ধুত্ব ফিকে হয়ে এলো। পুরনো শহরের এক গরিব কেরানির ছেলে ঢালকানগরের আড্ডা ছেড়ে, ছেলেবেলার বন্ধু-বান্ধব ছেড়ে, প্রতিদিন ধানমন্ডির বত্রিশ নম্বর সড়কে যাতায়াত শুরু করলো। উদ্দেশ্য একটাই বিদেশ যাত্রা। এই সময়ই সম্ভবত হায়দার কয়েকটি অভ্যাস আয়ত্ত্ব করে ফেলো। জুয়া এবং মদ্যপান। এসব গল্প আবার হায়দার আমার কাছে এসে বলতো। আমি বিষয়ে অভিভূত হয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতাম। আর ভাবতাম সৃষ্টিকর্তার কী অপূর্ব লীলা খেলা। একজন আদর্শ ও গরিব কেরানির ছেলে বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে কী রকম চরিত্রহীন হয়ে যাচ্ছেজ্ঞ না কি সময়টাই তখন খারাপ ছিল?

হায়দারের কিন্তু এতটুকুও অনুশোচনা ছিল না। ও বরং আমাকে নিয়ে, এসব বিষয়ে আমার অজ্ঞতাকে নিয়ে, হাসি-তামাসা করতো। বলতো, তুমি আর স্মার্ট হতে পারলে না। সারাটা জীবন লেখাপড়াই শুধু করে গেলো।

স্মার্ট হায়দার চমৎকার সব কাপড়-চোপড়ও পড়তে লাগলো। আর বলতো, একবার দেশের বাইরে যেতে পারলে আর কোনোদিনও ফিরে আসবো না। একটা বিরাট সংসারের দায়িত্ব থাকা সত্ত্বেও সেদিকে হায়দারের বিন্দুমাত্র ভ্রক্ষেপ ছিল না। সংসারের সুখ-দুঃখ নিয়ে মাথা ঘামাতো না, হায়দার চেয়েছিল নিজে প্রতিষ্ঠিত হতে। সম্ভবত এরকম দায়িত্বহীন লোকরাই পৃথিবীতে সুখে থাকে। হায়দার কি সুখী?

হায়দার গ্রিসে চলে গেল জাহাজের চাকরি নিয়ে। অনেকদিন পর একটা চিঠি লিখেছিলো আমাকে। আর ওদের ঢালকানগরের বাসায় ভাইবোনের কাছে ওর একটা রঙিন ছবি পাঠিয়েছিল। তখন আমাদের বন্ধু-বান্ধবদের সবার মুখে একটাই প্রশঙ্গ, হায়দারের বিদেশ যাত্রা। বেকার মানুষদের এই এক স্বভাব, পরচর্চা কিংবা কে কবে বিদেশ গেল, কে কত বড় চাকরি করছে, ইত্যাদি বিষয়ে চায়ের পেয়ালায় ঝড় তোলা।

বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে দেখা হলেই জিজ্ঞেস করতো, হায়দার তো চলে গেল, তুমি কবে যাচ্ছে? আমি বিনম্র হাসতাম। হা কিংবা না কিছু না বলে প্রশ্নকর্তার কৌতূহলকে আরো বেশি প্রশ্রয় দিতাম। একটা রহস্যের আবহ সৃষ্টি হতো। কিন্তু আমি তো জানি, আমার পক্ষে কোনোদিন আমার এই প্রিয় শহর ছেড়ে একদিনের জন্য কোথাও যাওয়া সম্ভব হবে না।

কোনো ট্র্যাভেল এজেন্সি অফিসে আমি কোনোদিন ধরনা দেইনি। আমার কোনো পাসপোর্ট নেই, আমার কোনো উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই, বিদেশ যাওয়ার আমি কোনোদিন স্বপ্নও দেখিনি। কোনো জ্যোতিষের কাছে হাত বাড়িয়ে দিয়ে আমি বলিনি, দেখুন তো আমার বিদেশ যাত্রা আছে কি-না। আমি শুধু নমিতাকে চেয়েছিলাম।

॥ দুই ॥

অনার্স পাস করে বেকার বসে আছি। পরীক্ষা

তেমন একটা ভালো হয়নি। ড্রপ দিলেই পারতাম, কিন্তু এক বছরের পড়াশোনার খরচের কথা চিন্তা করে পিছিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিলাম। হাতে কাজ নেই। এখানে-সেখানে যাই, বিকেলে বাংলাবাজারের বিউটি বোর্ডিংয়ে আড্ডামারি ময়মনসিং থেকে সদ্য আগত একজন তরুণ লেখক এসেছে এই শহরে চাকরির ধান্দা। সে ময়মন-সিংহের আঞ্চলিক ভাষায় চমৎকার কথা বলে। তার গালগল্প শুনে সময় সুন্দর কেটে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে মনটা কি রকম যেন শূন্যতায় খা খা করে। মনে হয় কী যেন আমার করার কথা ছিল, কী যেন আমার করা হয়নি। এক রকমের অস্থিরতা আমাকে তাড়া করে ফেরে।

পকেটে পয়সা নেই। প্রচুর টাকা না থাকলে শরীরে জ্বর এসে যায় আমার। ইচ্ছে মতো খরচ করতে না পারলে কার ভালো লাগে এই পৃথিবীতে বাঁচতে? একটা কোনো চাকরি পেলে করা যেত। শাহতাবকে অনেকদিন আগে একদিন কথা প্রসঙ্গে চাকরির কথা বলেছিলাম। কিন্তু এখনও তো রেজাল্ট বের হয়নি, এ সময় কে আমাকে চাকরি দেবে?

শাহতাব শেষ পর্যন্ত একটা কলেজে পার্টটাইম চাকরির খবর দিল। শাহতাবের এমএ ফাইনাল। তিন মাসের লিভ-ভ্যাকেন্সিতে আমাকে শাহতাবের জায়গায় কাজ করতে হবে। অন্তত কিছু পয়সাতো পাবো। হাতে যেন চাঁদ পেলাম।

ইতোমধ্যে রেজাল্ট বেরিয়ে গেছে। শাহতাবেরও ফাইনাল পরীক্ষা শেষ হয়ে গেল। আমার তিন মাসের মেয়াদও শেষ। আমি বাড়ি ফিরে এলাম। তিন মাসেই কী রকম একটা মায়া পড়ে গিয়েছিল চাকরিটার ওপর। কিন্তু কোনো উপায় নেই। এ রকম চুক্তিতেই আমি প্রথমে রাজি হয়েছিলাম। এতদিনে একটা অভ্যাস গড়ে উঠেছিল। এখন হঠাৎ করে ছেদ পড়াতে মনে হলো আমার কী যেন ছিল হারিয়ে ফেলেছি।

হঠাৎ কদিন পর অই কলেজ থেকে একটা চিঠি হাতে বেয়ারা এসে হাজির। ইচ্ছে করলে আমি আবার চাকরি করতে পারি। শাহতাবের চক মোগলটুলীর বাসায় গিয়ে দেখা করলাম। শাহতাব বললো, আমি তোমার কথা বলেছি। ওদের একজন লেকচারার দরকার ছিল। তাছাড়া তুমি তো তিন মাস কাজ করেছো।

আমি বললাম, আমার এমএ ফাইনাল ইয়ারের ক্লাসগুলো কিভাবে করবো?

শাহতাব হো হো হেসে ময়লা মশারিটা টেনে খুলে ফেললো। উপর থেকে ধপ করে বিছানায় পড়লো ইট সুরকির ভগ্নাবশেষ। বালিশের কাছে একটা ফ্রেমে একটা মেয়ের চবি। আমি অবাক হয়ে দেখলাম রিনার ছবি নিয়ে সারারাত শাহতাব শুষেছিলো। আমি ছবির রিনাকে ভালো করে দেখলাম। কি আছে খুব সাধারণ সাদামাটা এই মেয়েটির? এই মেয়ের জন্য শাহতাব স্পিপিং পিল খেয়েছিল কেন?

শাহতাব বললো, ক্লাসের কোনো অসুবিধা হবে না। অ্যাডজাস্ট করে দেবে ওরা।

শাহতাব ছিল ইউনিভার্সিটিতে আমার এক বছরের সিনিয়র। ভালো নজরুল গীতি গাইতো। ইংরেজি বিভাগের এক অনুষ্টানে একবার খুব দরদ দিয়ে একটি গান গেয়েছিল, সেই অনুষ্টানে রিনা ছিল।

সিলেবাস বুঝিয়ে দিয়ে শাহতাব বললো, তেমন একটা প্রিপারেশনের দরকার হবে না, তুমি শুধু শুধু ঘাবড়ে যাচ্ছে। আসলেই খুব ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। এরপর কোনোদিন আমার আর প্রিপারেশন নিতে হয়নি।

প্রতিদিন সকালে থাকতো আমার ক্লাস। সকালে ঘুম থেকে উঠে সাত-তাড়াটাড়ি কিছু পেটে দিয়ে দৌড়োতাম ক্লাস নিতে। দু'তিনটা ক্লাস শেষ করেই আবার ইউনিভার্সিটিতে যেতে হতো। দুপুরে মধুর ক্যান্টিনে আড্ডা। ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে যেত। হঠাৎ জীবনে ব্যস্ততা নেমে এলো। ভালোই লাগলো নতুন চাকরি। শাহতাব বলতো, এই অভিজ্ঞতা পরে অন্য চাকরিতে কাজ দিবে।

ইতোমধ্যে বাবা রিটার্ডার্ড করলেন। এতদিন সংসারের যাবতীয় দায়িত্ব ছিল বাবার কাছে। সংসারের সমস্ত ভূমিকা ছিল বাবার।

এতদিন সংসারে টাকা পয়সা কিছুই আমি দিতাম না। কোনোদিন কানাকড়ি নিতামও না বাবা-মায়ের কাছ থেকে। এদিক-ওদিক লেখালেখি, রেডিও প্রোগ্রাম করে চলে যেত। কিন্তু সংসারে এখন কিছু দেয়া দরকার। যে ঘরটায় আমি থাকি, বাইরে এরকম একটি ঘর ভাড়া করে থাকতে গেলে কমপক্ষে পাঁচশ টাকা লাগবে। আমি কিছু কিছু টাকা মায়ের হাতে তুলে দিলাম প্রতি মাসে। মা বললেন, তোর বাবার ডাক্তার দেখানো দরকার। ডাক্তার পরীক্ষা করে বললেন, ব্লাড-ইউরিন-স্ট্রুল পরীক্ষা করতে হবে। এমনিতেই বাবার ব্লাড-প্রেশার ও ডায়েবেটিস আছে।

বাবা ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়লেন।

বাইরে কোথায়ও বড় বেশি একটা বের হন না। সারাদিন মায়ের সঙ্গে খিটিমিটি করেন। অকারণে রাগাণুগি করেন। আমার সঙ্গে বিনাকারণে অভিমান করেন। তার ধারণা সবাই তাকে অবহেলা করছে। রিটার্ডার্ড করার পর কি মানুষ এরকম হয়ে উঠে? আমি তাকে বললাম, বিকেলে আপনি বেড়াতে যেতে পারেন না?

বাবা রাগত কণ্ঠে বললেন, বেড়াতে যেতে পয়সা লাগে। আমি তাকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম। বললাম, কাছাকাছি যেসব আত্মীয়স্বজন আছে তাদের বাসায় গেলে ভালো লাগবে।

বিকেলে বারান্দায় ইজি চেয়ারে বসে বাবা কী যেন তন্ময় হয়ে ভাবেন। হাতে নেয়ামূল কোরআনের বাংলা অনুবাদ বইটা অবহেলায় পড়ে থাকে। আমি অনেকদিন ভেবেছি বাবা কি তাহলে পরকালের মৃত্যুভয়ে চিন্তিত। বাবার জন্য আমার কষ্ট হয়।

বাবাকে যেন আমি চিনতে পারি না। অথচ ছেলেবেলায় তাকে কত দৃঢ় ও আত্মবিশ্বাসী দেখেছি।

দুপুরে অফিস থেকে ফিরে বাবা নজরুল আর রবীন্দ্রনাথ থেকে আবৃত্তি করে শোনাতে। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে মায়ের খোঁপায় বেলিফুলের মালা দেখেছি কতদিন। বয়স বেড়েছে মায়ের। তিনিও কেমন যেন হয়ে গেছেন। তবে কি বয়স বাড়লে আমিও একদিন এমন হয়ে যাবো। হঠাৎ বার্ষিক্যের ভীতি আমাকে পেয়ে বসলো। বাবা ধীরে ধীরে শিশুর মতো হয়ে গেলেন। আর আমি যেন তার সংসারে কখন কিভাবে কার ভূমিকা বদলায় কেউ বলতে পারে না। সমস্ত

সংসারের দায়িত্ব অনেকটা আমাকে দেখতে হলো। ভাইবোনদেরও দেখাশোনা করার ভার পড়লো আমার উপর। এই দায়িত্ব বাবা কিংবা মা ঘোষণা করে ডেকে বলে দেননি। এমনিতাই কিভাবে যেন জড়িয়ে গেলাম। হয়তো পরিবারের বড় ছেলে হিসেবেই আমার কাছে দায়িত্ব এসে গিয়েছিল। মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মালে এরকমটি সবারই হয়। এই দায়িত্ব কেউ এড়াতে পারে না, কেউ কেউ পারে। হায়দার পেরেছিল। আমি পারিনি। হায়দারের বিদেশ যাওয়ার স্বপ্ন ছিল, হায়দারের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল। হায়দার সংসার পিছনে ফেলে, তার শৈশবের শহর ত্যাগ করে গ্রিসে চলে গেল। সে জীবনকে কতদিন উপভোগ করে। প্রতিদিন বৈচিত্র্যের স্বাদ পাচ্ছে। হায়দার হয়তো আর কোনোদিন দেশে ফিরবে না। কিংবা ছুটিতে দু'এক মাসের জন্য এসে আবার ফিরে যাবে। আমি রয়ে গেলাম একটা বৃত্তের ভেতর। এই বৃত্ত থেকে খুব সহজে কি বের হওয়া যায়?

৥ তিন ৥

বাবা এক বিকেলে ডেকে বললেন, বিসিএস পরীক্ষার জন্য অ্যাপ্লাই করেছো? আমি মিথ্যে করে বললাম, হ্যাঁ? বাবার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। এদিকে শাহতাবও বিসিএস পরীক্ষার জন্য তৈরি হচ্ছে। শাহতাব আসলে এই পৃথিবীর জন্য যোগ্যতম ব্যক্তি। রিনার সঙ্গে চুটিয়ে প্রেম করছে, একটা কলেজে অধ্যাপনা করছে, এদিকে আবার বিসিএস পরীক্ষার জন্য তৈরিও হচ্ছে। শাহতাব জীবনে কি হতে চায়? বিসিএ পরীক্ষা দিয়ে অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে যাবে, নাকি ফরেনসার্ভিস নিয়ে বিদেশে দূতাবাসে চাকরি করবে? শাহতাবেরও উচ্চাকাঙ্ক্ষা আছে। সবাই ধাপে ধাপে উঠতে চায়। আমার কেন উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই? একদিন কলেজের ভাইস-প্রিন্সিপাল বললেন, কি হে আফজাল, তুমি অন্য কোথাও চাকরি-বাকরির চেষ্টা করছো না?

আমি চমকে উঠেছিলাম। আমার কাজে কি কলেজ-কর্তৃপক্ষ সন্তুষ্ট নয়? আমি কাচুমাচু হয়ে বললাম, কেন বলুন তো স্যার।

পান-খাওয়া গালে ভাইস-প্রিন্সিপাল মেকি হাসি দিয়ে বললেন, না এমনিতাই। তুমি তো ব্যাচেলর মানুষ, তোমার তো ভবিষ্যৎ আছে। তুমি ভালো একটা চাকরি ধরো না কেন?

চাকরি কি এতই সুলভ। কত এমএ পাস বেকার রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছে। আমার বলতে ইচ্ছে হলো, আপনি কেন এখানে পড়ে আছেন? যোগ্যতা তো আপনারও ছিল। অন্য চাকরি করলে এত সহজে আপনি এত টাকা আয় করতে পারতেন না, আপনাকে অন্য পথে টাকা উপার্জন করতে হতো। তাহলে আর নাখালপাড়ায় এক বিঘা জায়গার উপর আপনার সুবিশাল অট্টালিকা উঠতো না। কিন্তু এসব কিছু আমি বললাম না। বলতে পারলাম না। আমি আত্মমগ্ন হয়ে রইলাম।

বাবা প্রতিদিন একই প্রশ্ন করতে শুরু করলেন। যেন মৃত্যুর আগে এইটাই তার একমাত্র পবিত্র কাজ।

দেরি করে বাসায় ফিরলে বলতেন, এভাবে বিসিএস হওয়া যায় না। বুরোক্র্যাট হতে হলে নিয়মিত নিউজ উইক-টাইম পড়তে হয়। বাবা আমার বিসিএস বানানোর জন্য উঠে পড়ে

লাগলেন। মৃত্যুর আগে এইটাই তার শেষ কাজ। একদিন বাবা একটা ঘটনা বলেই ফেললেন। তার বন্ধু নাকি তাকে জিজ্ঞেস করেছেন, আপনার ছেলে কি করেন? বাবা বলেছিলেন, লেকচারার। বাবার বন্ধুটি নাকি কটাক্ষ করে বলেছিলেন, ওটা কোনো চাকরি হলো না-কি?

অই কথায় বাবা বড় আঘাত পেয়েছেন। বাবা আমাকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বানাতে চান। আমাকে যে করে হোক বিসিএস পরীক্ষা দিয়ে বুরোক্র্যাট হতে হবে। সমাজে বুরোক্র্যাটদের দাম অনেক বেশি। বুরোক্র্যাটরাই তো দেশ চালাচ্ছে। এখন আমি কি করি? আমিতো বিসিএ-এর জন্য অ্যাপ্লাই করিনি। জনকের সঙ্গে এভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করা কি ঠিক হবে? কিন্তু শেষ তারিখ পার হয়ে গেছে। এখন কোনো ফর্ম আর জমা হবে না। এই একমাত্র চাকরি ছিল যেখানে মেধা যাচাই করার কিছুটা সুযোগ ছিল। একটি মূল্যবান সুযোগ আমি হেলায় হারালাম। বাবাকে আমি এখন কি বলি?

দুঃস্বস্তির ভেতর দিনরাত কাটতে লাগলো। পারতপক্ষে বাবার মুখোমুখি হই না। মাকে বলে দিয়েছি আমি বিসিএস পরীক্ষার প্রস্তুতি নিয়ে ব্যস্ত। আমাকে কেউ বিরক্ত করতে সাহস পায় না। আমার ঘরের নিভৃত পৃথিবীতে আমি একা একা ভবিষ্যতের ছবি আঁকতে থাকি। আর ভাবি বাবা মারা যাওয়ার পর কি হবে। হায়দারের মতো সবকিছু ছেড়ে বিদেশে পাড়ি জমানো অনেক বুদ্ধিমানের কাজ। আমি আসলে একটা আস্ত ইডিয়ট। সংসারের ভেতর নিজেকে জড়িয়ে ফেললাম। এখনও সময় আছে। বাবার শরীর এখন একটু ভালো। এখনই পালানো ভালো। এটাই শ্রেষ্ঠ সময়। এরকম সময় আর পাবো না। যে সময় যায়, সেই সময় আর ফিরে আসে না।

কিন্তু বিদেশে যাওয়ার মতো আমার টাকা নেই। কলেজে চাকরি করে যে টাকা টাকা পেয়েছি তা দিয়ে বাবার সময় কাটানোর জন্য একটা টেলিভিশন কিনে দিয়েছিলাম। আর কিছু বইপত্র কিনেছি। বেকার বন্ধু-বান্ধবদের কিছু ধার দিয়েছি। এই যৎসামান্য পুঁজি দিয়ে রাস্তার মোড়ে একটি পানের দোকানও করা যায় না। তাছাড়া বিদেশে কোথায় যাবো, কি করবোজ্ঞ এসব কিছুই জানা নেই। হায়দার বলেছিল, আমার জন্য চাকরি ঠিক করবে। কিন্তু অইশালা আমাকে বেমালাম ভুলে গেছে। বিদেশ গিয়ে ভিনদেশি মেয়েদের নিয়ে মেতে উঠেছে। আমাকে আর চিঠি লিখবে কখন? দেশে থাকতে অনেক দিন আমাকে ইন্টারন্যাশনাল পাসপোর্ট করতে বলেছে; আমি অবহেলায় উড়িয়ে দিয়েছি কথাটা। সমস্ত দোষ আমার, হায়দারের আর কি করার আছে? আমার মাঝে উৎসাহ না দেখতে পেয়ে হায়দার নিরাশ হয়েছে। প্রয়োজনটা আমার। যোগাযোগ রাখা আমারই দরকার ছিল। আমি পাসপোর্ট করিনি, আমি শুধু নমিতাকে চেয়েছিলাম।

৥ চার ৥
একদিন বাসায় ফিরে দেখি খয়েরি রংয়ের ইনভেলপে একটি চিঠি এসেছে। সরকারি চাকরির ইন্টারভিউ কার্ড। বহুদিন আগে হয়তো কোনোদিন আবেদন পাঠিয়েছিলাম। আজ এতদিন পর কর্তৃপক্ষ, সাড়া দিয়েছে। বাবাকে ইন্টারভিউ কার্ড দেখালাম। বাবাতো ভীষণ খুশী। তিনি ভাবলেন এতদিন আমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হচ্ছে। আসলে ব্রিটিশের অধীনে চাকরি করে আমার বাবা সরকারি চাকরিকেই একমাত্র আরাধ্য ভেবে নিয়েছেন। তার ধারণা এসব চাকরিতে সুযোগ-সুবিধা আছে প্রচুর। বাবাকে খুশী করার জন্য যথারীতি ইন্টারভিউ দিলাম সেক্রেটারিয়েটে গিয়ে। ফলাফলও বের হলো।
যা যা চেয়েছিল কর্তৃপক্ষ, সব যোগ্যতাই আমার মাঝে পেয়েছে। তাছাড়া আমার ইন্টারভিউ হয়েছে অত্যন্ত ভালো।
পরদিন চাকরিতে জয়েন করলাম।
বাবাকে এমন খুশী হতে কোনোদিন দেখিনি। তিনি সরকারি চাকরির নিয়মকানুন সম্পর্কে একটা নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন। এক ফাঁকে একটু স্বৃতিচারণও করে নিলেন। আমি একটা বিষয় লক্ষ্য করেছি, আমার বাবার বয়েসী লোকেরা একটু চাস পেলেই স্মৃতিতে ফিরে যায়। বাবার ধারণা তাদের সময়টা ছিল ব্রিটিশ আমলের সবচেয়ে সুবর্ণ সময়। আমি বাবার কথায় মনে মনে হাসি। মানুষ অনেকদিন সাম্রাজ্যবাদী সরকারের অধীনে থাকলে এরকম মেরুদণ্ডহীন হয়ে যায়। ব্রিটিশরাজ যতই ভালো হোক, আমরা ছিলাম তাদের কলোনি। সাদা চামড়া সাহেবদের দৃষ্টিতে আমরা নেটিভ বইতো আর কিছু নই। এ নিয়ে গর্ব করার এত কি আছে আমি বুঝি না। তবুও বাবার সঙ্গে অহেতুক বিতর্কে যাই না। তিনি বলে যান অনর্গল। তিনি বলে আনন্দ পান। আমি নীরব ও একনিষ্ঠ শ্রোতার ভূমিকা পালন করে যাই।
সরকারি চাকরি পাওয়ায় আমিও কম খুশী হইনি। ক্লাস ওয়ান সার্ভিস। প্রতিদিন সাতটা দুটো অফিস। টেবিলে টেলিফোন থাকবে, অফিসের গাড়িতে আসা-যাওয়া করতে পারবো।
কলেজের সবাইকে খবরটা দিতেই তাদের কেউ কেউ খুব খুশী হলেন, কিন্তু সবার চেহারা একটা ঈর্ষাজনিত মানছায়া লক্ষ্য করলাম।
শুধু অঙ্কের এক অধ্যাপক আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানালেন। তিনি এই কলেজে জয়েন করার দিন বলেছিলেন, আপনি ইয়াংম্যান, এখানে কেন এসেছেন, এখানে থেকে পালান। পরে আর এখান থেকে বের হতে পারবেন না। দেখেন না আমরা বের হতে পারছি না।
পেছনে পড়ে রইলো আমার চার বছরের স্মৃতি বিজড়িত অধ্যাপনা জীবন। আমি নতুন চাকরিতে, নতুন এক জগতে পা রাখলাম।
কলেজে আয় ছিল প্রচুর। ক্লাসের পর কয়েকটি ব্যাচ পড়াভাত। এটা ছিল অতিরিক্ত পরিশ্রম এবং অতিরিক্ত উপার্জন।
এখন সরকারি চাকরিতে অন্য কিছু করা বারণ আছে। সীমাবদ্ধ আয়ে চলতে হবে।
প্রতিদিন নতুন নতুন মানুষ দেখছি। এক একটি মানুষ এক একটি চরিত্র। আমার চোখের সামনে খুলে যাচ্ছে এক একটি অধ্যায়। প্রতিদিন আমি অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করছি।
আমার বস একজন ধুরন্তর লোক। এমন বুদ্ধিমান আর কাজের লোক আমি দেখিনি। অফিসের সবাই তার ভয়ে তটস্থ। হ্যাংলাপাতলা শরীরের গঠন, সিএসপি পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করেছিলেন। পাঁচ-ওয়াত নামাজ পড়েন, একটু আধটু কবিতা

লেখেন, তার স্বভাবে এবং আচরণে বুরোক্র্যাটের পরিচয় পরিষ্কার হয়ে ফুটে উঠে। প্রতিটি কাজে এবং কথায় তিনি বুঝিয়ে দেন তার আর আমার পার্থক্যটুকু। তিনি মোসাহেবি পছন্দ করেন। কিন্তু আমি এমনই একটা আস্ত ইডিয়ট, আমি লেজ নাড়তে পারি না। অথচ আমার এক সহকর্মী, এক মফস্বল কলেজ থেকে প্রিলিমিনারিতে এমএ করেছে বাংলায়, তিনি চমৎকার লেজ নাড়েন। হাত জোড় করে বিনীত ভূতের মতো মাটির দিকে চোখ রেখে দাঁড়িয়ে থাকেন। তখন ব্রিটিশভক্ত আমার বাবার নির্দেশগুলো মনে পড়ে। তিনি বলেছিলেন, বসকে খুশী না রাখলে তোমার চাকরি থাকবে না।

কিন্তু একটা মজার ব্যাপার লক্ষ্য করেছি এক বছরে, বসরা প্রায় সময়ই মূর্খ হন। ক্ষমতার দন্ডে এতবেশি তৃপ্ত থাকেন, ইনফিরিওরিটি কমপ্লেক্স বড় হয়ে দাঁড়ায়। আমি বসের সামনে গিয়ে আপ্রাণ চেষ্টা করি লেজ নাড়তে, কিন্তু পারি না। তখন নিজের প্রতি নিজের করুণা হয়। অথচ আমার সহকর্মী কি স্বার্থকভাবে লেজ নাড়ে, বসের সামনে নতজানু হয়ে যায়, বসও তাকে দারুণ ভালোবাসে। আমার সহকর্মীর তেমন একটা লেখাপড়া নেই, এলএমজি গাজেট, এমএ করেছে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরবর্তী এলোমেলো সময়ে নিজের দেশের কলেজ থেকে। সাহিত্য পড়েছে ঠিকই, কিন্তু এতটুকু অনুভূতি নেই, এতটুকু আত্মসম্মানবোধও নেই। বস একশোটা অপমানজনক কথা বলেলেও প্রতিবাদ করে না। প্রায় সময়ই দৈনন্দিন জীবনের দরকারি অথচ দুর্লভ জিনিসপত্র কিনে বসের বাড়িতে দিয়ে আসে। বসের বউকে ভাবি ভাবি বলে প্রাণ বিসর্জন দিতে দ্বিধা করেন না। আর আমি প্রতিদিন সালাম দিতেও বসের রুমে যাই না। একটা ঠাণ্ডা যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। আমার সহকর্মীটি আমার বিরুদ্ধে কিছু কান কথাও বসের কাছে বলেন। এ জাতীয় বসরা এতই দুর্বল চিত্ত যে, কোনো কিছু নিরপেক্ষভাবে বিচার না করেই কান কথায় কান দেন।

অহেতুক ডিউটি আওয়ার আমার বাড়তে থাকে। আমার লেখা নোটে ভুল খুঁজে পান বস। আমার সবকিছুতেই অসন্তুষ্ট হতে থাকেন তিনি। অধৈর্য হয়ে বাবাকে একদিন সবকিছু বলি।

বাবা প্রচণ্ড আঘাত পান।

তিনি ভেবে শিউরে ওঠেন, হতয় তো আমার চাকরিটা থাকবে না। তার ব্লাড প্রেশার বেড়ে যায়। আমি ড্যাম কেয়ার। আমি জানি আমি বেকার বসে থাকবো না। যে অভিজ্ঞতা সরকারি চাকরি আর অধ্যাপনা করতে গিয়ে অর্জন করেছে, তা নিয়ে উপন্যাস আর টেলিভিশন নাটক লিখলেও দুটো পয়সা হাতে আসবে।

বেশ কদিন নিশ্চিন্তে ভালোভাবে কেটে যাবে।

একা মানুষ, কেউ আমার জন্য কি অপেক্ষা করে আছে?

আমি বিশাল অট্টালিকার কোনোদিন স্বপ্ন দেখিনি। ঝকঝকে নিউ মডেলের গাড়ির স্বপ্নও আমার ছিল না কোনোদিন।

শুধু একটি স্বপ্ন আমি দেখেছিলাম।

আমি নমিতাকে চেয়েছিলাম।

॥ পাঁচ ॥

একদিন হঠাৎ বাবা মারা গেলেন।

সেদিন শনিবার, সকাল সাড়ে সাতটা। আমি শেভ করে অফিসে যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছি। পাশের ঘরে মা চিৎকার করে ডাকলেন। বাবা বিছানায় ছটফট করছেন। মুখ দিয়ে গোঙানির শব্দ হচ্ছে। আপ্রাণ চেষ্টা করছেন কিছু বলতে, কিন্তু পারছেন না। বাবার এই রকম অসহায় অবস্থা আমি কোনোদিন দেখিনি। আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। আমার ভাইবোনরাও অশ্রুসিক্ত চোখে দাঁড়িয়ে বইলো। মা ডুকরে কেঁদে উঠলেন। কথা ছিল বাবাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হবে। কদিন ধরেই অবস্থা ভাল যাচ্ছিল না। যেদিন প্রথম আমি সরকারি চাকরির বিরুদ্ধে আমার সমস্ত অভিযোগ তাকে জানালাম, সেদিন থেকেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। হয়তো আমার ব্যবহারে তিনি প্রচণ্ড আঘাত পেয়ে থাকবেন।

আগে জানলে বাবাকে আমি আঘাত দিতাম না। নিজেকে আমার অপরাধী মনে হলো। মনে হলো, আমার বাবার মৃত্যুর জন্য আমি দায়ী। অনুশোচনায় মন ভরে উঠলো, আর নিজেকে আমার অনেক ছোটো মনে হলো।

বাবা কি মৃত্যুর আগে আমার প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে উঠেছিলেন? তা-না হলে এত তাড়াতাড়ি তড়িঘড়ি করে এই পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলেন কেন? তিনি এত তাড়াতাড়ি না চলে গেলেও পারতেন। অফিসে চাকরিটা আমার ঠিকঠাক ছিল। সরকারি চাকরি পেতে যেমন কষ্টকর, চলে যেতোও ততবেশি কঠিন। বসের সঙ্গে আমার সম্পর্ক আগের মতো। আগে যেমন উৎসাহের সঙ্গে কাজ করতাম, এখন ততটা করি না। আমার সহকর্মীটি দ্বিগুণ উৎসাহে কাজ করে। অনেক বেশি জোরে হাসে। নিয়মিত



বাজার করে এবং মলমূত্র ত্যাগ করে। সর্বদা তার চেহারা একটা সুখী সুখী ভাব বিরাজ করে। বাবার মৃত্যুতে সারাবাড়িতে একটা শোকের ছায়া পড়েছে। ভাইগুলো এখন আর দেরি করে বাড়ি ফেরে না। মা লতাপাতা আঁকা রঙিন শাড়ির বদলে সাদা শাড়ি পরে। আমি সন্ধ্যার আগে বাড়ি ফিরে আসি। বাবা যে জায়গাটায় প্রতিদিন ইজিচেয়ার পেতে বসতেন, সেখানে আমি বসি। যেন একদিনে আমার বয়েস অনেক বেড়ে গেছে। বাগানের গাছপালার ওপর চাঁদের আলো জ্বলজ্বল করে। আকাশে সহস্র তারা চেয়ে থাকে। আমার চোখ কি এক অজানা ব্যথায় ভরে ওঠে। আমি মনে মনে বলি— বাবা, তুমি আমায় ক্ষমা করো। চিরদিন অনুগত ভূতের মতো সরকারি চাকরির প্রতি নিবেদিত থাকবো।

ভেতরে ঘরে মা করুণ সুরতুলে কোরআন পড়েন। ভাইবোনরা বিছানায় শুয়ে পড়ে রাতের খাবার না খেয়ে। আমি সবাইকে বাবার স্নেহ দিয়ে ডেকে ডেকে তুলি। ওরা এই প্রথম অসম্ভব অনুতপ্ত হয়ে খাবার টেবিলে চলে যায়। এই দৃশ্য আমার ভালো লাগে। এভাবে যদি ওরা সারাজীবন শৃঙ্খলভাবে চলে।

বাবার মৃত্যুতে আমি শিশুর মতো কাঁদতে চেয়েছিলাম, কিন্তু পারিনি। এতো দায়িত্ব, এত কাজ ছিল সেই মুহূর্তে। অশ্রুমুখে ফেলে আমাকে দৌড়াতে হয়েছে। মৃত্যুর পরও অনেক কাজ বাকি থেকে যায়। শেষকৃত্যের যাবতীয় ব্যবস্থার জন্য আমি তখন ব্যস্ত হয়ে পড়ি।

বাড়িটা কদিন বেশ শূন্য লাগে। তারপর আবার যথারীতি সংসারের চাকা ঘুরতে থাকে। একজনের মৃত্যুতে কিছুদিনের জন্য হয়তো থেমে ছিল, তখন শোক ছিল, কিন্তু চিরদিনের জন্য কিছু থেমে থাকে না। ছোটো ভাইগুলো আবার দেরি করে বাড়ি ফিরতে থাকে। আমিও সন্ধ্যায় বারান্দায় বসে বাবার স্মৃতিচারণ করি না। আমি চাকরির প্রতি বেশি মনযোগী হয়ে উঠি। যে আমি একদিন সরকারি চাকরির প্রতি বিতর্কিত ছিলাম, সেই আমি এখন পাগলের মতো অফিস নিয়ে মেতে উঠি। সবাই অবাক হয়, আমি শুধু অবাক হই না। বস আমাকে কিছু কিছু কাজে নির্ভর করতে শুরু করেন। বাইরের অ্যাসাইনমেন্টগুলো আমি করতে থাকি।

একদিন বাংলা একাডেমিতে কী এক কাজে গেছি। মহাপরিচালকের সঙ্গে কাজের কথা সেয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামছি, কবি বাহুলুল চিৎকার করে ডেকে ওঠেন। হাত বাড়িয়ে দিইজ্ঞ কতকাল পরে দেখা। একই শহরে থাকি, অথচ দেখা নেই। খবরটা কবি বাহুলুলই সর্বপ্রথম দিলেন। প্রথম আমি বিশ্বাস করিনি। সব সময় প্রাণখোলা হাসি হাসছেন, আমি ভেবেছিলাম তিনি মস্করা করছেন।

কবি বাহুলুল বললেন, লিবিয়া যাবে?

আমি হো হো করে হেসে উঠলাম। আজ কাল এই এক ফ্যাশন হয়েছে। ঢাকার সবাই জমিজমা বিক্রি করে পাড়ি জমাচ্ছে বিদেশে। সেখানে গিয়ে অধিকাংশই গতর খাটাচ্ছে। আর পেট্রোডলার উপার্জন করছে।

কবি বাহুলুল কি আমাকে সেই দলে ফেলতে চাইছেন?

আমি বললাম, এসব কী বলছেন আপনি?

কবি বাহুল্য একটু গভীর হলেন, আরো বেশি সিরিয়াস হলেন, তারপর খুব কাছে এসে বললেন, মিরপুর রোডে ইন্টারভিউ হচ্ছে। তুমি ইন্টারস্টেড হলে এমএ সার্টিফিকেট আর মার্কসিট নিয়ে আজই সেখানে গিয়ে দেখা করো। আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। কবে লিবিয়া থেকে ইন্টারভিউ টিম এলো ঢাকায়। পত্রিকায় তো দেখিনি এ খবরটা। কবি বাহুল্যকে বললাম, কবে কোন পত্রিকায় খবরটা ছাপা হয়েছে?

কবি বাহুল্য বললো, গত সপ্তাহের বাংলাদেশ অবজারভারের শেষ পৃষ্ঠায় বিজ্ঞাপন বেড়িয়েছে। অফিসে এসে পিয়ন রুদ্দুসকে গত সপ্তাহের পুর ফাইলটা দিতে বললাম। শেষ পৃষ্ঠায় বন্ধ করে একটা বিজ্ঞাপন ছাপা হয়েছে। ইন্টারভিউয়ের শেষ তারিখ আগামীকাল। আজ আর সময় নেই। আর কিছুক্ষণ পর অফিস ছুটি হয়ে যাবে যা যা যোগ্যতা চেয়েছে সবই আমার আছে।

বিদেশ যাওয়া কি আমার হবে? ইন্টারভিউতে সিলেক্ট হওয়া কি চাটখানি ব্যাপার! নিশ্চয়ই ভালো ব্যাকিং না থাকলে চাকরি হবে না। তাছাড়া আমার চেয়ে যোগ্য কত লোক আছে। দ্বিধা আর দ্বন্দ্ব দিখাও হতে থাকল।

তাছাড়া আমার তেমন একটা ভালো ড্রেস নেই। একটা কমপ্লিট সুটও নেই। এক বন্ধুর কাছে কিছু টাকা ধার করে শাহবাগ থেকে একটা টাই ও পুলওভার কিনলাম। একবার শেষ চেষ্টা করে দেখা যাক ভাগ্যে কি আছে।

আমি এর আগে কোনোদিন বিদেশ যাওয়ার স্বপ্ন দেখিনি।

কিন্তু নমিতাকে আমি যে পেতে চাই!

॥ ছয় ॥

চুল বেয়াড়া বাতাসে এলোমেলা উড়ছে।

নমিতা দাঁড়িয়ে আছে ছাদের শেষ প্রান্তে। নিচে রাস্তায় লাল হোণ্ডার উপর লাল গোলাপ হাতে বসে আছে এক যুবক। যুবকটির এক মাথায় লম্বা চুল। চোখে নীল রোদ-চশমা।

সম্ভবত যুবকটি নমিতার দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করছে।

নমিতার দৃষ্টি দূরের আকাশে। সেখানে রূপালি মেঘ। আর চক্রাকারে ঘুরছে মতো কয়েকটি পাখি। নমিতাদের এই এলাকাটি শহরের এমন এক প্রান্তে, যেখানে ভিড় ও গাড়ি-ফোড়ার বড় একটা ব্যস্ততা নেই।

পাশেরটা হায়দারদের বাসা। নমিতা হায়দারদের প্রতিবেশী।

হায়দারও বিকেলে ছাদে ওঠে। আমি একদিন গেছি হায়দারের কাছে। ওর ভাই এসে খবর দিল হায়দার ছাদের উপরে আছেজ্ঞ আমাকে সেখানে ডেকেছে। আমি ওদের সরু সিঁড়ি বেয়ে সরাসরি ছাদে উঠে আসি।

সেই প্রথম নমিতাকে দেখলাম। হায়দারই পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল প্রথম দিন আমার সঙ্গে তেমন একটা কথা হয়নি। প্রথম পরিচয়ে নারীর সঙ্গে অনেক যুবক যেমন প্রগলভ হতে পারে, আমি আবার তেমনটি পারি না। আমি নীরব শ্রোতা হয়ে নীরবে মানুষটিকে বুঝতে চেষ্টা করি। যদি ভালো লাগে, তাহলে দ্বিতীয় সাক্ষাতে উদীপ্ত হই, মুখর

হই। তা না হলে দূরে সরিয়ে নেই নিজেকে আলগোছে।

হায়দার নমিতার সঙ্গে খুব ঠাট্টা করছিল।

নারী প্রসঙ্গে কিছু বিদ্রূপ করছিল হায়দার। প্রচণ্ড যুক্তিতর্কে খণ্ডাতে চেষ্টা করছিল নমিতা।

আমি কথার মাঝখানে ঢুকে পড়ে বললাম, আপনি ভালো ডিবেট করতে পারেন।

নমিতা নিশ্চুপ। সম্ভবত আমার কথাটি ওর মনঃপুত হয়নি। হায়দার দ্রুত উত্তর দিল, কলেজে ডিবেটে প্রাইজ পায় নমিতা।

নমিতার দাঁতগুলো সাদা ও ঝকঝকে। চোখ দুটো খুব টানাটানা ও ধারালো। পড়েছে সালোয়ার কামিজ। শরীর বড় টানে।

সেদিন রাতে ঠিকমতো ঘুম এলো না। নমিতার কথা ভাবলাম। হায়দারের সঙ্গে নমিতার নিশ্চয়ই ঘনিষ্ঠতা আছে। তাছাড়া বেশ ফ্রি আর ফ্রাংক দেখলাম দুজনে।

হায়দারের কাছেই প্রথম শুনি নমিতা কবিতা ভালোবাসে। কিন্তু এরপর হায়দার বিদেশ যাওয়ার ব্যাপারে ব্যস্ত হয়ে ওঠে। আমি একদিনও বিকেলে গিয়ে হায়দারকে বাসায় পাই না। নমিতার সঙ্গে দেখা হয় না একদিনও।

অথচ নমিতার সঙ্গে আমার দেখা হওয়া দরকার।

নমিতা অবশ্য ওদের বাসায় যেতে বলেছে আমাকে। কিন্তু ছুট করে কি করে নমিতাদের বাসায় যাই। হায়দার কি ভাবে? হায়দারের সঙ্গে যদি নমিতার গভীর গোপন কোনো সম্পর্ক থেকে থাকে? আগে হায়দারের সঙ্গে আমার মীমাংসা করতে হবে।

হায়দারকে একদিন শাহবাগের একটি রেস্তোরাঁয় পেয়ে গেলাম। সঙ্গে ফুটফুটে সুন্দর একটি মেয়ে। মেয়েটি মাথা নিচু করে টেবিলে কী যেন আঁকছে। আমি কোনো কথা বললাম না; হায়দারকে ডাকলাম না। যে ভাবে সিঁড়ি বেয়ে উঠেছিলাম, ঠিক সেই ভাবে নেমে এলাম।

আমি আমার প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেছি।

নমিতার সঙ্গে আমি এখন নিঃশব্দে দেখা করতে পারি। তবুও মনের ভেতর একটা দ্বিধা থেকে যায়।

মনের এক অংশে সংকোচ কাজ করে। একদিকে নমিতার টান, অন্যদিকে হায়দারের বন্ধুত্বজ্ঞ আমি একটা দ্বন্দ্ব দিখাও হতে থাকি।

হায়দারের সঙ্গে সরাসরি কথা বলা দরকার।

এসব ব্যাপারে রহস্য রাখতে নেই। তাতে বন্ধুত্ব নষ্ট হয়; হায়দারও আমাকে ভুল বুঝবে।

এক সন্ধ্যায় টিকাটুলীর নির্জন এক রাস্তা দিয়ে হাঁটছি। ফুটপাথের অপর পাশে শাড়ি পড়া একটা মেয়েকে দেখতে পেলাম। হাতে খাতা। মেয়েটি হাসছে। দূর থেকে আমি ঠিক চিনতে পারছিলাম না। কাজে আসতেই নমিতা ফুটপাথ বদল করে এপাশে এলো।

আমি বিনম্র হেসে বললাম, কেমন আছেন?

নমিতা স্নান হাসলো। চোখের নিচে কালো দাগ।

বিষণ্ণ কর্তে বললো, ভালো না। বাবার অসুখ।

জ্ঞকোথেকে ফিরলেন?

জ্ঞগানের ক্লাস থেকে?

জ্ঞগান শেখেন বুঝি? বাঃ অনেকগুণ আপনার?

জ্ঞকি যে বলেন। কই আপনি তো আর এলেন না?

জ্ঞআসবো হায়দারের সঙ্গে একদিন।

জ্ঞহায়দার ভাইকে ছাড়া একা আসা যায় না?

জ্ঞনা মানে... আপনি কখন অবসর থাকেন?

জ্ঞসকালের দিকে। এখন তো কলেজ বন্ধ।

জ্ঞআমার তো আবার সকালে অফিস থাকে।

জ্ঞতাহলে বিকেলেই বরং আসুন। কবে আসবেন বলুন?

জ্ঞআসবো একদিন।

জ্ঞনা বলুন কবে আসবেন?

জ্ঞযে কোনোদিন। ছুট করে চলে আসবো।

নমিতার সঙ্গে সেদিন এভাবে দেখা হবে কে

ভেবেছিল? সেই সন্ধ্যা, সেই নমিতা। তারপর কী করে কি যেন হয়ে গেল। একদিন বিকেলে

নমিতাদের বাসায় গিয়ে হাজির হলাম। দরজার মুখেই নমিতার ছোট বোনকে পেলাম। নৌড়ে

নমিতাকে ডেকে আনলো। নমিতা হেসে ড্রইংরুমে নিয়ে বসলো। বললে, তাহলে আপনি এলেন?

নমিতার বাবা হাসপাতালে, মা গেছেন সেখানে।

সারা বাড়ি খালি। বোনা ছাদে বেড়াচ্ছে। নমিতা

মুখোমুখি একটা সোফায় বসলো। আমি কি একটু ঘামছিলাম?

তাহলে সংকোচ আমাকে পেয়ে বসেছে কেন?

এই নমিতাকেই তো আমি চেয়েছিলাম। এই

নমিতাই তো আমার মুখোমুখি বসে আছে এখন।

প্রথম পরিচয়ের দিন যে নমিতা আমার অস্তিত্বকে অবহেলা করেছিল, সে এখন আমার খুব কাছে। সে

আমাকে আহ্বান করেছে, আমি এসেছি। আমি ভিথিরির মতো নমিতাকে বিরক্ত করতে আসিনি।

নমিতা ডেকেছে বলছি এ সে।

নমিতার সঙ্গে আমার কি কথা আছে? আমাকে কি নমিতা কিছু বলতে চায়? কেন আমি এখানে এসেছি?

নমিতা খিলখিল করে হেসে গড়িয়ে পড়লো।

বললো, সেই কখন থেকে আপনি কি যেন

ভাবছেন?

আমি কি খুব আত্মমগ্ন হয়ে পড়েছিলাম! এই আমার এক স্বভাব। মানুষের সান্নিধ্যে থেকেও মানুষের কাছ থেকে আমি বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারি।

হায়দারকে কথাটা বললাম। নমিতার সঙ্গে দেখা হওয়ার ব্যাপারটা যেন হায়দারের কাছে কিছুই

না জ্ঞ এরকম একটা ভাব করলো সে। তারপর নমিতাদের সব কথা বললো। নমিতারা হলেন দুই

ভাই। বাবা সরকারি চাকুরে। এখন পঙ্গু হয়ে হাসপাতালে আছেন। নমিতা বোনদের মাঝে

দ্বিতীয়। বড় এক বোন বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে ম্যাট্রিক পাস এক বিজ্ঞানসন্মত ছেলেকে স্নেহায়

বরণ করে নিয়েছে। এ নিয়ে বাবার সঙ্গে বড় বোনের মনোমালিন্য চলছে। কেউ কারো মুখ দেখে

না। অন্যান্য বোনগুলোরও একাধিক পার্টিটাইম প্রেমিক আছে। কিন্তু নমিতার কেউ আছে কি-না এ

সম্পর্কে হায়দার নির্ভরযোগ্য তেমন কিছু একটা বলতে পারলো না। শুধু বললো, হয়তো নমিতা

কাউকে ভালোবাসে। আমার ছুট করে একটা দৃশ্যের কথা মনে পড়লো।

নমিতাকে প্রথম যেদিন দেখি, ওদের গেটের কাছে লাল হোণ্ডায় লাল গোলাপ হাতে এক যুবককে

দেখেছিলাম। হায়দার একথা শুনে হো হো করে হেসে ওঠে। আরে বুদ্ধি যে বাড়িতে মেয়ে আছে,

তার সামনে এরকম ছেলোপেলো ভিড় করেই থাকে। এরা হচ্ছে মহল্লার মস্তান। এরা নমিতার

কেউ নয়।

॥ সাত ॥

সৃষ্টিকর্তা আমার দিকে মুখ তুলে তাকালেন। ইন্টারভিউ খুব ভালো হলো। লিখিত এবং মৌখিক দুটোতেই আমার স্কোর ভালো হয়েছিল। লিবিয়ান ভদ্রলোক চোস্ত ইংরেজিতে বললেন আমি গুলশানের লিবিয়ান অ্যামবাসি চিনি কিনা। এক সময়, যখন বেকার ছিলাম, ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলন করতাম। সেই সুবাদে অ্যামবাসিপাড়া চেনা হয়ে গিয়েছিল। মাথা নেড়ে বললাম, হ্যাঁ চিনি। তিনি বললেন, সাতদিন পরে অ্যামবাসিতে নাম টাঙিয়ে দেয়া হবে।

আমার সার্টিফিকেট ও দুই কপি ছবি রেখে দেয়া হলো। বাসায় ফিরে একথা কাউকে বললাম না। সাতটা দিন পার হোক। তারপর ধীরে সুস্থে সবকিছু বলা যাবে। মনের ভেতর একটা অস্বস্তি নিয়ে চলাফেরা করতে লাগলাম। অপেক্ষার যন্ত্রণা বড় কষ্টকর। বন্ধুরা বলতে লাগলো, তোমার হয়ে গেছে। তুমি সুটকেস গোছানো শুরু করো। আমি মনে মনে বললাম, তোমাদের মুখে ফুল চন্দন পড়ুক। তোমাদের কথাই যেন ঠিক হয়। সাতদিন পর লিবিয়ান অ্যামবাসিতে গিয়ে দেখি আমার নাম উঠেছে তালিকায়। পনেরো দিনের মাঝে মেডিকেল টেস্ট, পাসপোর্ট ইত্যাদি করে সেই কাগজপত্র জমা দিতে হবে টিকিটের জন্য অ্যামবাসিতে। আমার হাতে এক পয়সাও নেই। কাপড়-চোপড়ও তো কিছু বানাতে হবে। ফরাশগঞ্জের এক ব্যবসায়ী বন্ধু আছে। স্বাধীনতার পর লুটপাট করে টু-পাইস করেছে। ওর দু'তিনটা ববসা। ছেলে বেলায় এক সঙ্গে আমরা একই স্কুলে পড়েছি। ওর কাছে হাত পাতলাম। খুব খাওয়ালো আমাকে।

এতদিন পর আমাকে পেয়ে খুব খুশী। অনেকক্ষণ আড্ডা হলো। তারপর এক সময় কথাটা বললাম। সে বললো, আমার একটা বিল পাওনের কথা তিন-চাইরদিন পর। বিলটা পাইলে ট্যাকাটা দিমু তোমারে।

তিনদিন পর এক দুপুরে আবার গেলাম। গিয়ে দেখি সে জুয়ায় মগ্ন। আমাকে দেখেই বুঝতে পারলো কেন এসেছি। বললো, অখনো বিলটা আহোঁনিক।

আমার হাতে আর মাত্র কটা দিন। অবশ্য ওর কাছে চাওয়া আমার ঠিক হয়নি। অভিজ্ঞতা থেকে জেনেছি, ব্যবসায়ী বন্ধুরা কখনো ধার-টার দেয় না। যাদের অজস্র টাকা আছে, তারাই বরং টাকা ব্যয় করতে কুণ্ঠা করে। মনটা কেমন যেন চুপসে গেল। এই কয়েকশ টাকার জন্য আমার বিদেশ যাওয়া হবে না।

একদিন আমারও টাকা হবে। আমি তখন এইসবের প্রতিশোধ নেবো। এখন বরং মার কাছে ব্যাপারটা খুলে বলা যাক। মাকে বললাম। মা সমস্ত ঘটনা শুনে তার নিজের গয়না বের করে দিলেন আমাকে। মায়ের গয়না বিক্রি করে সেই টাকা দিয়ে জামা-কাপড়, বড় একটা সুটকেস আর অন্যান্য দরকারি জিনিসপত্র কিনলাম।

যাওয়ার দিন এসে গেল। সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তৈরি হলাম। আমার প্রিয় শহর ছেড়ে চলে যাচ্ছি। দুবছরের কন্ট্রাক্ট। ফিরে এসে দেখবো আমার শৈশবের শহর কত বদলে গেছে। কথাটা ভাবতেই বুকের ভেতরটা

শিউরে উঠলো।

মা বললো, তোকে যেতে দেব না। তুই গেলে আর ফিরবি না। আমি গান্ধিজির মতো মায়ের পা ছুঁয়ে বললাম, তুমি যদি বারণ করো তাহলে আমি যাব না। সামনে দাঁড়িয়ে থাকা ভাইবোনরা একটু বিব্রতবোধ করলো। মাকে ওরা কপট ধমক দিয়ে বললো আমাদের জন্যই তো ভাইয়াকে যেতে হচ্ছে। হ্যাঁ, আসলেই তো তাই। বিদেশে যাচ্ছি কি নিজের সুখের জন্য? সংসারের চেহারা পাল্টানোর জন্য আমার বিদেশ যাওয়া। মায়ের মুখে, ভাইবোনগুলোর মুখে হাসি ফোটানোর জন্য আমাকে সাড়ে সাত হাজার মাইল দূরে পাড়ি জমাতে হচ্ছে। আমারও কি একটু খারাপ লাগছে না। সবকিছু ছেড়ে সম্পূর্ণ এক অচেনা দেশের ভিন্ন পরিবেশে আমাকে যেতে হচ্ছে। হয়তো ওখানে গিয়ে দেখবো জীবন অন্য রকম। বন্ধু-বান্ধবহীন আত্মীয়হীন প্রবাসে দীর্ঘ দু'বছর কি করে কাটবে?

তাড়াছড়োর মাঝে নমিতার কথা আমি বেমানাম ভুলে বসেছি। একবার শুধু মনে পড়েছিল। নমিতাকে খবরটা জানানো হয়নি। একবার ওদের বাসায় যাওয়া দরকার ছিল। এখন আর সময় নেই। আসলে রুচ বাস্তবের মুখে এইসব আবেগের কোনো মূল্য নেই। একবারও নমিতার কাছে যাওয়ার ইচ্ছা প্রবল হয়ে উঠলো না।

আমার নিজের কাছেই অবাক লাগলো। অফিসে খবরটা কাউকে জানলাম না। সরকারি চাকরি, রিজাইন না-ও গ্রহণ করতে পারে। বিদেশে গিয়ে রিজিগনেশন দিয়ে দিলেই হবে। খুব খুশী লাগছিল।

বসের রুমে অকারণে দেখা করতে গেলাম। বসও খুশী হলো, কিন্তু জানলো না কেন এসেছি। মনে মনে বললাম, বিদায় মাননীয় বস, কাল থেকে আর দেখা হচ্ছে না।

পিয়নের সঙ্গে খুব ভালো ব্যবহার করলাম। আমার সহকর্মীটির সঙ্গেও হেসে হেসে কথা বললাম। এই অফিস ঘর, এই চার দেয়াল, আমাকে বন্দি করে রাখার ষড়যন্ত্র করেছিল। আমি বেরিয়ে এলাম বৃত্তের বাইরে। সেক্রেটারিয়েটের এই বিশাল বিল্ডিং আমাকে গ্রাস করতে পারলো না।

আমি যদি এখানে থেকে যেতাম, তাহলে আমি কি হতাম? এক ধরনের মেকি ডাট থাকতো। একটা মুখোশ পড়তে হতো আমাকে। আর ভনিতা করতে হতো। প্রোটোকল প্রোটোকল করে সারা জীবন যেতো। আমাকে কেহানিরা দাবার চাল হিসেবে ব্যবহার করতো। আসলে দেশ চালাচ্ছে কারা? এইসব বানু বুড়ো কেহানিরা।

সেক্রেটারিয়েটে শতকরা ষাটজন ডেপুটি সেক্রেটারি প্রথম জীবনে ছিলেন কেহানি। তারা যেকোনো সিদ্ধান্ত নিতে দ্বিধা করেন। আর অপরদিকে আছে সিএসপি। এরা ভিন্ন জাত, ভিন্ন শ্রেণি। এরা বয়সে তরুণ সিদ্ধান্ত নিতে পারে দ্রুত। কিন্তু নিজের উপর আত্মবিশ্বাস অসম্ভব বেশি। নিজেকে শ্রেষ্ঠ ভাবতে এরা ভালোবাসেন।

এই রহস্যময় জগত থেকে ঠিক সময়ে আমি বেরিয়ে এসেছি। আরো কিছুদিন থাকলে ফ্রাঞ্জ কাফকার 'মেটামরফসিস' গল্পের নায়কের মতো

উদ্ভট এক প্রাণীতে রূপান্তরিত হয়ে যেতাম। ঈশ্বর আমার সহায়, তিনি আমাকে বাঁচিয়েছেন।

॥ আট ॥

রাত বারোটায় ফ্লাইট।

সবার কাছ থেকে যথারীতি বিদায় নিয়ে তেঁজগাও বিমানবন্দরে পৌঁছলাম রাত নটায়। বিমানবন্দরের বিভিন্ন কর্তব্য শেষ করে বিশাল বিমানের উদরে চুকে পড়লাম। একজন রূপসী বিমানবালা চমৎকার হেসে সম্ভাষণ জানালো।

আমার সিট জানালার কাছে। লাল লাইট জ্বলে উঠলো। এতক্ষণ যে মৃদু মিউজিক চলছিল তা থেমে গেল। কী রকম একটা গুরু গম্ভীর পরিবেশ। একজন বিমানবালা হাত নেড়ে মুকাভিনেতাদের মতো কয়েকটি কলাকৌশল দেখাচ্ছে। দূর্যটনা ঘটলে কী কী করতে হবে তার নির্দেশ। কোমরে বেল্ট বেঁধেছি। বিকট শব্দ করে বিমান উড়লো আকাশে। নিচে মুখ খুঁবড়ে পড়ে থাকলো আমার শহরজ্ঞ আমার দেশ। শেষবারের মতো জানালা দিয়ে দেখলাম।

এতক্ষণ যে আনন্দ মনকে উল্লেগ করে রেখেছিল, তা নিমেষে উবে গেল। হঠাৎ বুকাটা শূন্য মনে হলো।

ঢাকা শহর মুছে গেল ছায়া ছবির দৃশ্যের মতো এক নিমিষে। শেষ পর্যন্ত আমি প্রবাসী হচ্ছি। কত কথা মনে পড়ছে। যা পিছনে ফেলে এসেছি, যা ছিল বর্তমান, তা এখন অতীত হয়ে গেল। দীর্ঘ দু'বছর। দু'বছর কম সময় নয়। এই দু'বছরে কত কিছু বদলে যাবে। আমি ফিরে এসে কি আমার শহরকে ঠিক আগের মতো পাবো? বিমানবালা ট্রে হাতে সামনে এসে দাঁড়ালো। হাত বাড়িয়ে প্লাস্টিকের গেলাসটা নিলাম। তারপর এলো পোলাও, আপেল এবং চা।

পৃথিবীর বিখ্যাত শহরগুলোর উপর দিয়ে যাবার সময় ইংরেজি আর বাংলাতে অ্যানাউন্স করা হচ্ছিল। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখতে পাচ্ছিলাম শুধু আলোর মালা। আর অন্ধকার। অন্ধকার যেন আলোর মালা গলায় দিয়ে হাসছে। একটু তন্দ্রামতন এসেছিল। হঠাৎ বিমানের ঝাঁকিতে ঘোর কেটে যেতেই দেখি রোদ আর মেঘের ভেতর দিয়ে বিমান এগোচ্ছে। জানালার পাশে সাদা ঝোঁপা উড়ছে। যেন হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যাবে। ছেলেবেলার প্রজাপতি ধরার মতো খুব ছুঁতে ইচ্ছে করলো।

সবকিছু স্বপ্নের মতো লাগছিল। গতকাল ছিলাম কোথায়, আর আজ কোথায়! কী বিচিত্র মানুষের জীবন। আমি কি কোনোদিন ভেবেছিলাম? দেশ ছেড়ে সাড়ে সাত হাজার মাইল দূরে আসবো! সে দিনের স্বপ্ন, আজকের বাস্তব। বারবার ফিরে যাচ্ছিলাম অতীতেজ্ঞ পিছনের দিনগুলোতে। কী ছিল সেইসব দিন।

হঠাৎ মনে হলো আমার বয়স বেড়ে গেছে। আমি হারিয়ে ফেলেছি আমার উচ্ছ্বাস, আমার সমস্ত উচ্ছলতা। আমার মনে হলো একটা বিরাট বোঝা আমার কাঁধে। অনেক কাজ আমার বাকি পড়ে আছে।

বিমানবালা একটা আরবি লেখা কার্ড, সঙ্গে ইংরেজি লেখা আলাদা আরেকটা কার্ড এনে দিলো। ফিলআপ করার জন্য। ত্রিপলী এসে গেছে। অল্প কিছুক্ষণের মাঝেই পৌঁছে যাবো উত্তর আফ্রিকার

তেল সমৃদ্ধ এই দেশটিতে। তবে কি আমার গন্তব্য শেষ? একটু শিউরে উঠলাম। হাত ঘড়িতে সকাল ৬টা। তার সঙ্গে যোগ করতে হবে আরো পাঁচ ঘণ্টা। তারপর হবে স্থানীয় সময়। নির্দিষ্ট সময়ে এয়ারপোর্টে বিমান ল্যান্ড করলো। চমৎকার মার্বেল পাথর আর কাচের তৈরি এয়ারপোর্ট। মানুষজনের ভিড় তেমন একটা নেই। অ্যানাউন্সমেন্ট হচ্ছে আরবিতে। কোথাও কোনো ইংরেজির চিহ্নমাত্র নেই। এয়ারপোর্টে কর্মরত লোকগুলো ফর্সা ও দীর্ঘকায়। চুলগুলো উন্মোখো। চেহারা রক্ষতা বিরাজ করছে। দাঁতগুলো হলদে। প্রায় সবাই প্যান্ট-সার্ট পরা। আলখাল্লা পরা দু-একজন অবশ্য এদিক ওদিক চোখে পড়ে। প্রায় দেড় ঘণ্টা ঠায় দাঁড়িয়ে থাকার পর পাসপোর্টে সিল পড়লো। তারপর সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে এলাম। সুটকেস ইতোমধ্যে এসে গেছে। কাস্টমসে এসে মনটা খারাপ হয়ে গেল। ব্যবহার বড় খারাপ। সবকিছু তন্নতন্ন করে দেখলো। আমার সঙ্গে বই পুস্তক ছিল। ছুঁড়ে ফেলে দিল। বাইরের দেশের ছাপানো জিনিসপত্র এদেশে আসা নিষেধ। অজানা আরবিতে কাস্টমসের লোক কথাবার্তা বলছে। একটা ইংরেজি অক্ষর বলেও না, বোঝেও না, মনে হলো ইংরেজি বললে বিরক্ত হয়। মুখের মতো ভাষাহীন হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম। এক সময় কাস্টমসের লোকটি বললো, “বাররা”। কথাটির ভঙ্গি এবং চেহারার অভিব্যক্তি দেখে মনে হলো হয়তো বের হয়ে যেতে বলছে। বাইরে এসে দেখি সবুজ রংয়ের বাস অপেক্ষা করছে। একজন ডাইভার ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে আহ্বান জানাচ্ছে। এয়ারপোর্টের বাইরে এসে দেখি লাউজে প্রচুর গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। বিভিন্ন রংয়ের গাড়ি। আর অদূরে দেখা যাচ্ছে বিল্ডিং, সবুজ গাছপালা। তাহলে দেশটা মরুভূমির নয়? এ কথাটা ভাবতেই ভালো লাগলো।

দেশে থাকতে এদেশ সম্পর্কে যে বিরূপ ধারণা দেয়া হয়েছিল এবং যে ছবি আমার মনে ছিল, তার সঙ্গে কিছুই মেলে না। বাস তখন দ্রুত ছুটে চলেছে। রাস্তাঘাট জনহীন। বিল্ডিংগুলো অনেকটা কলোনি টাইপের। কিন্তু ব্যালকনিতে কেউ নেই। পথের দুধারে গাছপালা। একটু একটু ঠাণ্ডা লাগছে। এদেশে এখন কি শীতকাল? এটা ফেব্রুয়ারি মাস। বাস প্রায় পানোরো মিনিট পর প্রায় পঁচিশ কিলোমিটার পাড় হয়ে একটা হোস্টেলের সামনে এসে থামলো। দোতলা বাড়ি। একটি কক্ষে আমাদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। অতিকষ্টে নিজ হাতে ভারী সুটকেস দোতলার সিঁড়ি দিয়ে টেনে তুলতে গিয়ে হাত খেতলে গেল। সিঁড়ির মুখে হোস্টেলের কিশোর ছেলেপেলেরা তালি বাজিয়ে হৈ হৈ করে উঠলো— বাংলাদেশ, বাংলাদেশ।

॥ নয় ॥

সারারাত ঘুম হয়েছিলো খুব। ভোরবেলা ঘুম ভাঙতে দেখি মাথার কাছে বিশাল বন্ধ জালার ফাঁক দিয়ে যে ভিনদেশি ভিন্ন বাতাসটুকু হু হু করে ভেতরে ঢুকছে, তা বড় তীব্র ও অসহনীয়। হাত জমে গেছে ঠাণ্ডায়। যে কক্ষ

দুটো দেয়া হয়েছিল তা অপ্রতুল। ভূমধ্যসাগরের এই তীক্ষ্ণ ঠাণ্ডার বিরুদ্ধে এই সামান্য শীত বস্ত্র দিয়ে লড়াই করা সহজ ব্যাপার নয়। মাথার কাছে রাখা হাত ঘড়িতে সময় দেখলাম। আটটা দশ। নটায় বাংলাদেশ দূতাবাস থেকে ফাস্টসেক্রেটারি লেবার আসবেন। তিনি আমাদের লিবিয়া সরকারের শিক্ষা বিভাগে নিয়ে যাবেন। কাল রাতে তেমন কিছু পেটে পড়েনি। এদেশের উদ্ভট আকারের এক রুটি, ডিম ও পনির দেয়া হয়েছিল। আমি খেতে পারিনি। শরীর ছিল ক্লান্ত, মন অবসন্ন। বিছানায় শরীর রাখতে রাখতে ঘুমের রাজ্যে হারিয়ে গিয়েছিলাম। বাথরুমে বিরাট লাইন। আমাদের থাকতে দেয়া হয়েছে যে দোতলা বিল্ডিংটায়, তার এক তলায় স্কুল। কিশোর ছেলেপেলেরা তৈরি হয়ে নিচ্ছে। মাইকে আরবিতে গান হচ্ছে, আটটা বাজে অখচ সূর্য ওঠেনি কেন? এদেশে কি সূর্য দেবের ঘুম দেরি করে ভাঙে? বাইরে তাকিয়ে দেখি আকাশ মুখভার করে আছে, আর ঝির ঝির করে বৃষ্টি পড়ছে। হঠাৎ মনটা খারাপ হয়ে গেল। ভেতরটা কেন যেন হাহাকার করে উঠলো। গতকাল ছিলাম দেশেজ্ঞ আর আজ সাড়ে সাত হাজার মাইল দূরে উত্তর আফ্রিকার একটি অচেনা দেশে। দেশের কথা মনে পড়লো। চলচ্চিত্রের মতো মনের পর্দায় ভেসে উঠলো পিছনে ফেলে আসা প্রিয়মুখগুলো। সময় মত তৈরি হয়ে নিচে গেটের কাছে এসো দাঁড়ালাম। ক্লাস শুরু হয়ে গেছে। ছাত্ররা গাড়ি দিয়ে এসে নামছে। সার্টফিকেটের ব্যাগটা আবার দেখলাম।



ফাস্ট সেক্রেটারি এলেন। শিক্ষামন্ত্রণালয়ের বিশাল পাঁচতলা বিল্ডিংটি ভূমধ্যসাগরের তীরে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। বাকল্যান্ডে রেলিং দেয়া। হু হু করে তীব্র হাঁড় কাপানো বাতাস আসছে। বিল্ডিং-এর সামনে বেশ ক’টা খেজুরগাছ। সার্টফিকেটগুলো দেখে একটা কাগজে আমার পোস্টিংয়ের জায়গাটি লিখে দিলেন একজন পৌচ লোক। কাগজটি আদ্যপান্ত আরবিতে লেখা। পৌচ ভদ্রলোকটিও আরবি বলেন। এক অক্ষর ইংরেজি কেউ বলে না, বোঝেও না, বরং ইংরেজি শুনলে বিরক্ত হয়। আমার বিস্ময় আরো বেড়ে গেল। অবশ্য এদেশে পা রাখার পর থেকেই প্রতিমুহূর্তে আশ্চর্য হচ্ছিলাম। কী এক দেশে এলাম। সভ্য জগতের ভাব বিনিময়ের একমাত্র ভাষা ইংরেজি এরা বোঝে না এবং বিন্দুমাত্র কদর করে না। দেশে আমরা ইংরেজি বলা বিদেশি পোলে কী সম্মানই না করি। রাজধানী ত্রিপলীতে শেষ পর্যন্ত পোস্টিং হলো। ফিরে এলাম হোস্টেলে। জায়গাটার নাম দাহারা। বৃষ্টি থেমে গেছে। এখন ঝরঝরে টাটকা রোদ উঠেছে। অদ্ভুত নীলে ঢেকে গেছে আকাশ। কিন্তু শীতের দাপট একটুও কমেনি। এখন অনেকটা হাল্কা লাগছে। পোস্টিং নিয়ে একটা দৃষ্টিভঙ্গি ছিল গতকাল থেকে। যদি রাজধানীর বাইরে অন্য কোথাও হয়, তাহলে আবার যাত্রা করতে হবে। দুটো কাজ এখন করার আছে। পকেটে যে যৎসামান্য ডলার আছে তা লিবিয়ান দিনারে রূপান্তরিত করা এবং পোস্টফিসে গিয়ে দেশে একটা টেলিগ্রাম করা। পেটেও সকাল থেকে কিছু পড়েনি, এই ফাঁকে দু’একটি অতিপ্রয়োজনীয় আরবি শব্দ শিখে নিতে হবে। অবস্থা যা দেখা যাচ্ছে, আরবী শব্দ না জানলে এক কদমও এগোনো যাবে না। কিন্তু তার আগে এই পোস্টিং-এর ব্যাপারটা পাকাপোক্ত করা প্রয়োজন। কর্তৃপক্ষের নির্দেশ রয়েছে যে, আরবি লেখা কাগজটি নিয়ে জোনাল অফিসে প্রথমে আমাদের যেতে হবে। তারপর সেখান থেকে তারা আমাদের নির্দিষ্ট ইনস্টিটিউটে পাঠাবে। রেসিডেন্ট ভিসার জন্য কাগজপত্র তৈরি করে পাসপোর্ট জমা দিতে হবে ইমিগ্রেশন অফিসে। প্রথম দরকার পাসপোর্টে পুলিশ সিল। কত কাজ! কিন্তু ভাষা না জানলে কীভাবে করবো। পকেটেও তেমন একটা পয়সা নেই। বন্ধু-বান্ধবরা বলেছিল, এয়ারপোর্টে নামার সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশের টাকায় দশ হাজার মূল্যমানের দিনার দেয়া হবে। সে রকম কোনো লক্ষণই দেখলাম না। যে হোস্টেলে উঠেছি, সেখানে অসংখ্য ঈজিপশিয়ান আছে। এদের দু’একজন ইংরেজি বলতে পারে। এদের কাউকে গাইড হিসেবে নিতে হবে। ভাষার প্রতিবন্ধকতা যে কী তা এই কয়েক ঘণ্টায় হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছি। তাছাড়া এদের ব্যবহারে তেমন পরিশিলীত ব্যাপার নেই। আর বড় অধৈর্য। সবকিছুতে একটা অসহনশীলতা। মনটাই খারাপ হয়ে গেল। কী দেশে এলাম।

পৃথিবীতে এরকম দেশও তাহলে আছে! এখনতো ফিরে যাওয়ার কোনো উপায় নেই। তাছাড়া দেশের সবাই ভাববে কী! এতো তাড়াতাড়ি ব্যর্থ হলে চলবে নাকি? শেষটা দেখতে হবে না! এখন তো শুরুই হয়নি। বাইরে থেকে একটা জাতিকে চেনা যায় না। হয়তো বাইরে থেকে যা দেখেছি, সেটা ভুল। এদের কারো সঙ্গেই এখনও ঘনিষ্ঠ আলাপ পরিচয় হয়নি। অফিস-আদালতে যে ব্যবহার পেয়েছি তা দিয়ে একটা দেশ ও জাতিকে কতটুকু বোঝা যায়। আগে জয়েন করি। তারপর দেখা যাক কী হয়! ঈজিপশিয়ান যুবকটি আমারই মতো গতকাল এসেছে। তাকে একটা একটা করে আমার সমস্যা বললাম। সে বেশ মার্জিত এবং পরিশীলিত। আমার অসহায় অবস্থা দেখে বললো, চলো ঘুরে আসি। যুবকটি ইংরেজি জানে। ভাষা কোনো প্রতিবন্ধক হতো না। কিন্তু তার আগে আমার সামান্য দশটি ডলার দিনারের রূপান্তরিত করা দরকার। ঈজিপশিয়ান বন্ধুটি বেশ সপ্রতিভ। হাসতে হাসতে বললো, নো প্রবলেম। আমি তোমার ডলার নিয়ে নিচ্ছি। দশ ডলারের নোটটি তাকে দিলাম সে আমাকে তিনটি লিবিয়ান দিনারের নিল নোট দিল এবং লিবিয়ান মুদ্রা ব্যবস্থা সংক্ষেপে বুঝিয়ে দিল। ঈজিপশিয়ান যুবকটির নাম মুহাম্মদ আবদুল ফাহিম। পড়াশোনা করেছে মিশরের আলহামরা ইউনিভার্সিটিতে। জন্মস্থান আলেকজান্দ্রিয়া। আরবী সাহিত্য ছিল তার বিষয়। একজন সাহিত্যের ছাত্র পেয়ে অনেকটা নিঃসঙ্গতা কেটে গেল। হয়তো ভিন্ন বিষয়, তবুও তো সাহিত্য। বোধ এবং অনুভূতি সাহিত্যের ছাত্রদের হয়তো এক ও অভিন্ন। মুহাম্মদ ফাহিম আমাকে নিয়ে এলো শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাছে একটি রেস্টোরাঁয়। ছোটো একটি কক্ষ, অনেকটা স্টেশনের টিকিট ঘরের মতো, একজন লোক ভেতরে চা বানাচ্ছে। হাতে হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে খেতে হয়। যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম সব আধুনিক। ফাহিম আমার জন্য কফি আর এক টুকরা কেক নিল। পয়সা আগেই জমা দিতে হয়। যেই আমি পয়সা দিতে যাবো, মুহাম্মদ ফাহিম হাত ধরে ফেললো, না তা হবে না। তুমি আমার অতিথি। সেই ছেলেবেলায় পড়া আরব জাতির অতিথি পরায়নতার কথা মনে পড়লো। সে কথা মুহাম্মদ ফাহিমকে বলতেই হেসে বললো, আমি আরব নই, আমি ঈজিপশিয়ান। আমার তখন নীল নদের কথা মনে পড়ছে। চোখের সামনে ভেসে উঠছে মিসরের পিরামিড আর উজ্জ্বল যৌবনময়ী ক্রিউপেট্রার ছবি। সেই নাইল-সভ্যতার দেশের ছেলে মুহাম্মদ ফাহিম। শরীরের রঙ ফর্সা-উজ্জ্বল। চোখগুলো টানাটানা, নাক উন্নত, দীর্ঘ শরীর, অসম্ভব আত্মবিশ্বাস নিয়ে মুহাম্মদ ফাহিম কথা বলে। সেন্ট্রাল পোস্ট অফিসের কাছে এসে দেখলাম থাইল্যান্ড, কোরিয়া, ইন্ডিয়া এবং পাকিস্তানের লোকজন ভির করে আছে। বিশাল চত্বরে সম্ভবত সবাই অপেক্ষা করছে। ভালোই হলো, যখন দেশের জন্য মন খারাপ লাগবে, এখানে এলে অন্তত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াকে পাওয়া যাবে। টেলিগ্রামের ফর্ম তা-তেও আরবি লেখা। পোস্ট অফিসে যে লোকের কাজ করছে তারাও এক অক্ষর ইংরেজি বোঝে না। মুহাম্মদ ফাহিম থাকায়

সব কাজ দ্রুত হয়ে যাচ্ছিল। আমাকে ইংরেজিতে ফাহিম টেলিগ্রামের ফর্ম অনুবাদ করে দিল। কিছু স্ট্যাম্প কিনলাম। ডাকেও কিছু চিঠিপত্র লিখতে হবে। ফাহিম বললো, ডাক ব্যবস্থা ভালো না। ঈজিপটে চিঠি পৌঁছেতে এক-দেড় মাস লেগে যায়, কখনো আবার পৌঁছেই না। তোমার দেশে ক'মাস লাগবে কে জানে? আমার আরেকবার চমকে ওঠার পালা। ফাহিমকে বললাম, কিন্তু পোস্ট অফিসটি দেখে তো বেশ আধুনিক মনে হলো। ফাহিমের সমস্ত মুখে ঘৃণা ভেসে উঠলো। বললো, বিল্ডিং-ই আধুনিক। কিন্তু পোশাকের আড়ালে যে মানুষগুলো রয়েছে তারা অন্যরকম। দেশে থাকতেই খবরের কাগজে পড়েছি ঈজিপটের সঙ্গে লিবিয়ার সম্পর্ক ভালো না। ঈজিপশিয়ান ফাহিম হয়তো নিজের দেশকে একটু বেশি ভালোবাসে। খুব স্বাভাবিক কারণেই এ দেশের অনেক কিছুরই সে স্বীকৃতি দেবে না। তাছাড়া ঈজিপশিয়ান ফাহিমের জাত্যাভিমান অনেক বেশি। দেশপ্রেম হয়তো তাকে অন্ধ করে দিয়েছে। ফাহিমের চোখ দিয়ে এদেশকে দেখলে চলবে না। প্রতিদিনের অভিজ্ঞতা দিয়ে আমাকে এদেশের সবকিছু দেখতে হবে। উত্তর আফ্রিকার এই দেশটির সব কিছু একটু একটু করে খুঁজে নিতে হবে আমাকে।

॥ দশ ॥

শেষ পর্যন্ত অনেক ঘোরাঘোরির পর ইনস্টিটিউটের খোঁজ পাওয়া গেল। তখন সকাল সাড়ে নটা। সবুজ লোহার গেট বন্ধ। খাঁকি সৈনিকের পোশাক পরে একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। ঠিক সেই সময় ব্রিফকেস হাতে একজন লোক সেখানে এলো। দেখে মনে হলো হয়তো এই ইনস্টিটিউটেরই শিক্ষক। কাছে গিয়ে ইংরেজিতে প্রশ্ন করতে তিনি হেসে হাত বাড়িয়ে দিলেন। তারপর ভেতরে নিয়ে গেলেন। ইনস্টিটিউটের প্রধানকে মুদির বলা হয়, এ কথাটা গতকাল জেনেছিলাম। মুদিরের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে ভদ্রলোক সম্ভবত ক্লাস নিতে চলে গেলেন। আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার মুদিরের কাছে এগিয়ে দিলাম। কোট-প্যান্ট এবং চমৎকার টাই পড়েছেন মুদির ভদ্রলোক! চেহারাটিও সুদর্শন। বেশ প্রাণখোলা প্রাণবন্ত মনে হলো। একজন কাউকে ডাকলেন। আরবিতে কী যেন বললেন। যুবকটি সম্ভবত অফিস অ্যাসিস্টেন্ট। যুবকটি ইংরেজিতে আমাকে বললো ক্লাসের সময়সূচি লিখে নিতে। প্রতিদিন সাড়ে সাতটায় ক্লাস। মিনিট পনেরো মিনিট আগে ইনস্টিটিউটে এসে উপস্থিত থাকতে হবে। যুবকটি মোটামোটি ইংরেজি বোঝে এবং বলতে পারে। কিন্তু মুদির এক অক্ষরও ইংরেজি বোঝেন না। যুবকটি আরো বললো যে আধঘণ্টা পর একটা ক্লাস নিতে হবে! হঠাৎ করে কীভাবে ক্লাস নেবো ঠিক ভেবে উঠতে পারলাম না। মনে পড়লো জীবনের প্রথম অধ্যাপনার দিনটির কথা। সে দিনও ঠিক এমনি হঠাৎ করে কোনো প্রস্তুতি ছাড়াই ক্লাস নিতে হয়েছিল। আজ ভিন্নদেশের ভিন্নপরিবেশে ক্লাস নিতে হচ্ছে। মুদির নিজের নির্দিষ্ট ক্লাসে নিয়ে আমাকে আরবিতে

পরিচয় করিয়ে দিলেন। কিছুক্ষণ আবারিতে বক্তৃতা দিলেন। তিনি ঝাঁকড়াচুল, খাঁকি পোশাক পরা, বিশালদেহী এক একটা যুবক। আমি যেই মাত্র ইংরেজিতে একটি অক্ষর উচ্চারণ করেছি, সবাই সমস্ত চিন্তা করে উঠলো, আরাবি, আরাবি। নেতা গোছের একটি ছেলে আরবিতে কী যেন বললো। সবাই একসঙ্গে তালি বাজাতে লাগলো। আর অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো সমস্ত ক্লাস। সবাই টেবিলকে তবলার মতো বাজাতে লাগলো। হাত তুলে সবাইকে থামতে বললাম। চিন্তার করে বললাম, স্টপ। কে কার কথা শোনে। কেউ কেউ অনুমতি ছাড়া আমার সামনে দিয়ে ক্লাস রুম ছেড়ে চলে গেল। আমার ক্ষীণ কণ্ঠ বর্বর ছাত্রদের তেজী কণ্ঠের আড়ালে হারিয়ে গেল। উপায়ান্তর না দেখে ক্লাসবোর্ডের আশ্রয় নিলাম। চক দিয়ে বড় বড় করে লিখলাম, প্লিজ স্টপ টকিং। আবার হৈ চৈ। আমার মনে হলো এরা একটা শব্দও বুঝতে পারছে না। ক্লাসবোর্ডে লিখলাম, বাংলাদেশ এবং কণ্ঠের সমস্ত শক্তি দিয়ে চিন্তার করে বললাম, আই অ্যাম ফ্রম বাংলাদেশ। মুসলিম। তারপর আমার নিজের নাম লিখলাম ইংরেজিতে ও আরবিতে। সবাই আবার হাত তালি দিয়ে উঠলো। 'বাংলাদেশ' 'বাংলাদেশ' শ্লোগানে সমস্ত ক্লাস ভরে উঠলো। আমার মনে হলো আমি যেন জনসভার প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছি। বিভ্রান্ত জনতা আমাকে ঠিক সহজভাবে গ্রহণ করতে পারছে না। একজন রুক্ষ চেহারার যুবক লাশ্বেবন্ধ থেকে দৌড়ে এসে আমার হাত তুলে ধরলো। এই বেয়াদপি সহ্য করতে পারলাম না। বললাম, ডেন্ট ডু দ্যাট। ছেলেটি বুঝতে পেরেছে আমি রেগে গেছি। সে পাল্টা চোখ লাল করলো। এরকম পরিস্থিতির মুখোমুখি হইনি জীবনে কোনোদিন। আরব দেশ সম্পর্কে ছোটবেলা ইতিহাসে পড়েছি। অন্ধকার মহাদেশ আফ্রিকা সম্পর্কে ছেলেবেলায় পড়েছি ভূগোলে। সেই উত্তর আফ্রিকা কি এই বিংশ শতাব্দীর উজ্জ্বল প্রহরে পা রেখেও আলোর মুখ দেখেনি? পেট্রোডলার পেয়েছে, বদলে গেছে এদের জীবন যাত্রা। কিন্তু স্বভাব-চরিত্র বুঝি একটুও পাল্টায়নি। সভ্যতা ও সংস্কৃতি একটা জাতি এত দ্রুত আয়ত্ব করতে পারে না। ঢাকায় থাকতেও দেখেছি অনেকেরই প্রচুর টাকা-পয়সা আছে, কিন্তু সভ্যতা ও সংস্কৃতি নেই। এই ব্যাপারটা এত সহজ নয়। এ ব্যাপারটা এত দ্রুত হয় না। কমপক্ষে একটা যুগ চলে যায়। বড় করুণ অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরে এলাম প্রথম দিন। দুই কিলোমিটার হেঁটে দাহারা হোস্টেলে পৌঁছলাম। পথে একটা দোকান থেকে কিংস্তুতকিমাকার আকৃতির একটা রঙি আর ফল কিনলাম। এভাবে কোনো রকমে দুপুরের খাওয়া হয়ে যাবে। বিছানায় শরীর ছেড়ে দিতে ঘুমের রাজ্যে চলে গেলাম। এমনিতেই খুব ক্লান্ত ছিলাম। স্বপ্নে দেখলাম চাকরি ছেড়ে আমি ঢাকা চলে গেছি। ঢাকায় একটা বিরাট চাকরি হয়েছে আমার। চমৎকার ডাটসান গাড়ি। টেলিফোন, সুন্দরী রিসেপশনিষ্ট। কিন্তু কী আশ্চর্য সুন্দরী রিসেপশনিষ্ট মহিলাটিকে চেনা চেনা লাগছে। নমিতার চেহারার সঙ্গে কোথায় যেন মিল আছে; আরে না না, মহিলাটি আসলে নমিতা-ই।

নমিতা আমার রিসেপশনিস্ট। আমি হুইল চেয়ারে বসে চোখব বুজে ডিকটেশন দিচ্ছি। নমিতা লিখে নিচ্ছে। শাড়ি নয়, নমিতা পড়েছে স্কার্ট।

এয়ার কন্ডিশন রুম। টেলিফোন বেজে উঠলো। তুলে নিলাম রিসিভার। অপর প্রান্ত থেকে দুর্নীতিবাজ একজন মন্ত্রী কথা বলছে। রাতের জলশার আমন্ত্রণ। নমিতা চোখ তুলে গভীর মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ্য করছে সবকিছু। আমি নমিতাকে বলছি আমার পুরনো দিনের গল্প। আমি বলছি একটি অসহায় যুবকের আত্মপ্রতিষ্ঠার গল্প। নমিতার চোখ ভিজে উঠেছে। নমিতা বলছে, আমার বাবা মারা যাওয়ার পর সংসারের অবস্থা করুণ হয়ে উঠলো, বাধ্য হয়ে আমাকে চাকরি নিতে হলো। আমার আর ইউনিভার্সিটি পড়া হলো না। একটা যুবককে আমি ভালোবাসতাম। সেও চলে গেল। আমার আর ঘর বাঁধা হলো না।

নমিতা ডুকরে কেঁদে উঠলো। ঠিক তখন আমার ঘুম ভেঙে গেল। সারাঘর শূন্য। মাথার কাছের জানালার কাঁক-ফোকর দিয়ে ঠাণ্ডা বাতাস আসছে। সারা ঘরে-রাত নেমেছে। একটা কম পাওয়ারের বাতি অনেক কষ্টে বিশাল অন্ধকার তাড়াতে ব্যর্থ চেষ্টা করছে।

আমার চোখও ভিজে গেছে। তবে কি আমিও কাঁদছিলাম।

॥ এগার ॥

প্রতিদিন কাক ভোরে উঠতে হয়। সকালটা প্রচণ্ড শীতের। ঘন কুয়াশার মতো আবরণে চারদিক ধোঁয়াটে হয়ে থাকে। ভূমধ্যসাগর থেকে সরাসরি উঠে আসে তীব্র বাতাস। আগের দিনের কেনা বিস্কিট মুখে পুরে দ্রুত রাস্তায় নেমে ক্লাস ধরার জন্য ছুটতে থাকি।

এদেশে শীতকালে বৃষ্টি হয়। কিন্তু এই বৃষ্টি বাংলাদেশের অবিশ্রুত শ্রাবণ নয়, এদেশের আকাশ সারাদিন নাকি কান্নাও কাঁদে না। বৃষ্টি ভেজা শীত, রাস্তায় নেমেই দৌড়। বাস রুটগুলো এখনও সঠিক চিনে নিতে পারিনি। দেড় কিলোমিটার পথ হেঁটেই যাই প্রতিদিন।

ক্লাস থাকে চারটা কি পাঁচটা রোজ। এক একটি ক্লাস নেয়ার পর মনে হয় এক একটি ক্লাস্তিময় যুগ পার হয়ে এলাম। ভাষা বিরাট প্রতিবন্ধক হয়ে আছে। এ রকম বর্বর ও অভদ্র ছাত্র আমি এ জীবনে দেখিনি কোথাও। ছেলেরা পিজো এবং মার্সিডিস করে ইনস্টিটিউটে আসে। শিক্ষাকে এদেশে জাতীয়করণ করা হয়েছে। শিক্ষা সবার জন্য বাধ্যতামূলক। লেখাপড়ার প্রতি অধিকাংশ ছাত্রের কোনো আগ্রহ নেই। অন্যান্য ইনস্টিটিউটের মতো আমাদেরটারও শৃঙ্খলা রাখার দায়িত্বে আছেন একজন কর্নেল ও গুটিকতক আর্মি অফিসার। এদের প্রধানতম কাজ হলো সকাল সাড়ে সাতটার মধ্যে গেটটি তালাবদ্ধ করে দেয়া। নিয়ম ভাঙার জন্য সৈনিকদের যে কঠিন শাস্তি দেয়া হয়, আইন ও শিক্ষাপ্রদানের শৃঙ্খলা নষ্ট করা জন্য সেই রকম নিষ্ঠুরতম শাস্তি দেয়া হয় ছাত্রদের। প্রতিদিন ক্লাস শুরু হওয়ার আধ ঘণ্টা আগে সমগ্র ইনস্টিটিউটের ছাত্রদের জমায়েত হতে হয় ইনস্টিটিউট প্রাঙ্গণে। তাছাড়া প্রতিটি ক্লাসের জন্য রয়েছে দেড় ঘণ্টাব্যাপী সৈনিক ক্লাস। এটা একটা বাধ্যতামূলক অন্যতম প্রধান পাঠ্য বিষয়ও। এই

বিষয়ে পাস না করলে প্রমোশন দেয়া হয় না। জলপাই রংয়ের ড্রেস, বুট, সবুজ ক্যাপ ইনস্টিউট কর্তৃপক্ষ বিনামূল্যে ছাত্রদের দিয়ে থাকে। এই ড্রেস পরে আসা বাধ্যতামূলক। কোনো কারণে এই পোশাক না পরে ইনস্টিটিউটে এলে ফাইন হয়, কখনও কখনও কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হয়। ইনস্টিটিউটের ভেতর ঢুকলে মনে হয় কোনো শিক্ষাপ্রদান নয়, যেন একটা আর্মি ব্যারাকে ঢুকলাম। রাস্তায় ছেলেমেয়েরাও জলপাই রংয়ের সৈনিক পোশাক পরে চলাফেরা করছে। আমি অবাক হয়ে দেখি। বিস্মিত হই, কখনও মুগ্ধ হই এ জাতির উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা ভেবে, কখনও এদের উগ্র জাতীয়তাবাদের অহেতুক বাড়াবাড়ি দেখে শিউরে উঠি। এ রকম অন্ধ জাত্যাভিমান হিটলারের জার্মানিতেও ছিল। তাহলে কি আমরা বিশ শতকের শেষ প্রহরে দুটো মহাযুদ্ধের অভিশপ্ত স্মৃতি পিছনে ফেলে এসেও, যুদ্ধভীতি মন থেকে সরাতে পারছি না।

লক্ষ্য করে দেখছি, এ জাতি শাসন ভালোবাসে। জাতি হিসেবে এরা ভীষণ অলস ও কর্ম-লাজুক। প্রচণ্ড আড্ডা দিতে ভালোবাসে, জীবনের কোনো গভীর বিষয় এদের প্রিয় প্রসঙ্গ নয়। ঘরে ঘরে রয়েছে এদের ভিসিআর। টাকা আছে, কিন্তু টাকাই তো একটা দেশের সভ্যতার মাপকাঠি নয়। পার্শ্ববর্তী দেশগুলো এদের তুলনায় হাজারগুণ গরিব। প্রতিবেশী সিজিওর ও একটা পুরনো ও গর্ব করার মতো সভ্যতা আছে, নিজস্ব সাহিত্য-সংস্কৃতি আছে, আর আছে বিশৃঙ্খল দেশকে প্রতিনিধিত্ব করার মতো ভালো চলচ্চিত্র।

এদেশে ক্লাব কিংবা রেস্তোরাঁর আড্ডাও কেন মনে মনে মান। যুবক-জমায়েত ও প্রাপ্তবয়স্ক আড্ডা এদেশের কোথাও আমি দেখিনি। প্রায় প্রতিটি হোটেলই বিদেশিদের ভিড়। হোটেলগুলোর সময়সূচিও বড় অদ্ভুত। যে সময়টায় মানুষের অবকাশ সেই সময়ে সন্ধ্যার আজান মাইকে ধ্বনিত হওয়ার সংগে সংগে দোকান পাট সব বন্ধ হয়ে যায়। আটটা না বাজতেই রাস্তা চারদিক শূন্যতায় হাহাকার করে, রাত দশটা-এগারোটা পর্যন্ত শুধু বাস-ট্যাক্সি চলে। সারা শহরটাকে তখন মনে হয় মৃত্যু ভয়ে জর্জরিত ছেলেবেলার রূপকথায় পড়া এক পাশাণপুরী।

ভাষার দেয়াল আমাকে এদেশের সবকিছু থেকে নিঃসঙ্গ করে রেখেছে। সব কিছুই আমার সামনে ঘটেছে, সবদৃশ্য একজন বোবার মতো আমি দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু কোনো কিছুতেই আমার অংশ নেই। সব কিছুতে আমি থেকেও, কোনো কিছুতে নেই। এটা যে কী নিদারুণ কষ্টের তা ঠিক বোঝানো যাবে না। ভাষার কারণেই একজন উদ্বাস্তর মতো আমি শেকড়হীন হয়ে পড়েছি। এরা এক অক্ষর ইংরেজি বলে না, বোঝেও না। আমার ঠিক জানা নেই, পৃথিবীর আর কোথাও এরকম ইংরেজি বিদ্রোহী দেশ আছে কিনা।

প্রতিদিন একই রকম বিরক্তিকর ক্লাস। লগনের লংম্যান্স প্রকাশনী থেকে ছাপা বিনামূল্যে দেয়া বই পুস্তক এরা চরম বিরক্তিতে পা দিয়ে দলা মোচড়া করছে। শিক্ষা ও শিক্ষকের প্রতি নেই বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধাবোধ।

রোজ সকালে একটা করুণ অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হওয়ার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে নেই। কোনো দিন কি ঘটবে বোঝা মুশকিল। যে ছেলেটি আজ

সকালে সুবোধ ও শান্ত, আগামীকাল সে কী এক অজানা কারণে সব চেয়ে বিরক্তিকর ভূমিকা নেবে। তবে এরা প্রচণ্ড সাহসী ও লজ্জাহীন। হঠাৎ লাস্ট বেঞ্চ থেকে একটি ছাত্র সগর্বে উঠে দাঁড়িয়ে ভুল বাক্যে একটি উদ্ভট প্রশ্ন করে বসলো, টিচার তুমি কি হুইস্কি খাও?

এরা বড় রসিক। কিন্তু অধিকাংশ ছাত্রের চেহারার মাঝে লুকিয়ে আছে অজানা এক বেদনা। চুল উস্কাখুস্কা, দাঁত হলো হলদেজ্ব যেন পৃথিবীতে আসার পর কোনো দিন দাঁত মাজেনি, দৃষ্টি রুক্ষ ও বিভ্রান্ত। আমি প্রায় সময়েই এদের দিকে গভীরভাবে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমাদের দেশের ছাত্রছাত্রীদের কথা ভাবি। আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা গরিব, কিন্তু হাজারগুণ সহনশীল, জীবনের প্রয়োজনে শিক্ষাকে গ্রহণ করেছে। কিন্তু পেন্সিওনারের এই দেশে শিক্ষাটা অনেকটা ফুটবল খেলার মতো। তাই এরা যত খারাপ ছাত্রই হোক, পরীক্ষায় যত খোলামেলা গণটোকাটোকা চলুক, লেখাপড়ায় পরীক্ষার খাতায় যতই অমনোযোগী হোক, তবুও এইসব অর্বাচিন ছাত্রদের পরীক্ষায় পাস নম্বর দেয়ার এক অলিখিত নির্দেশ রয়েছে কর্তৃপক্ষের।

প্রথম প্রথম খারাপ লাগতো, প্রতিবাদ করতাম, মাসিক পরীক্ষাগুলোতে অধিকাংশকে ফেল করতাম। তখন দেখতাম আমার কল্লিত অযোগ্যতার বিরুদ্ধে অ্যাপিলেশন লিখে সমস্ত ক্লাস ইনস্টিটিউট প্রধানের কাছে ভেঙে পড়ছে। মুদির আমাকে ডাকতেন। ছাত্রদের কল্লিত অযোগ্যতাগুলো সত্যি ভেবে তিনি তার সারাজীবনের যাবতীয় মুখতার সমস্ত অভিশাপ আমার ওপর ঝারতেন। আমি প্রতিবাদ করতাম। কিন্তু সেই মৃদু প্রতিবাদ লিবিয়ান ইনস্টিটিউট প্রধানের বাচালতার কাছে ধোপে টিকতো না। নিজের কাছে প্রশ্ন করতাম আমি আর কত অপমান সহ্য করবো?

আমার ভেতর থেকে অন্য এক আমি বলে উঠতো— অজস্র ডলার কামাচ্ছো, এই অপমানটুকু হজম করবে না?

আমি বলতাম, আর কতদিন।

আমার ভেতরের অন্য এক আমি বলতো, আধুনিক ক্রীতদাসের মতো নিজেকে টাকার কাছে বিক্রি করে যত দিন এই ডলার কামাবে ততদিন।

ঢাকায় আমার এক কবির বাবা বলেছিলেন, অজস্র টাকা আয় করতে গেলে জীবনের অনেক কিছু বিসর্জন দিতে হয়। সেদিন সেই কথার মর্ম আমি বুঝিনি। আজ বুঝতে পারছি। আমি সামান্য কটা ডলারের জন্য এদেশে নিজেকে নিয়ে জুয়ো খেলছি। কোথায় যেন পড়েছিলাম, আফ্রিকার কোনো এক অসভ্য সম্প্রদায়ের বিশ্বাস, ‘নরবলি না দিলে জনগোষ্ঠীর মঙ্গল হয় না, দেবতা রুষ্ট হন।’ আমাদের দশকের একমাত্র আরাধ্য দেবতা হচ্ছে ঐশ্বর্যজ্ঞ অর্থনীতির ভাষায় ডলার। ডলার দেবতাকে খুশী করার জন্য আমি প্রতিমুহূর্তে আত্মাহুতি দিচ্ছি। হে আমার কবি বন্ধুর পিতা, আপনাকে হাজার সালাম। দেশে থাকতে আপনার অভিজ্ঞতাকে সিগারেটের ধোঁয়ার মতো উড়িয়ে দিয়েছি, আপনাকে নিয়ে ঠাট্টা করেছি, আজ এদিন পর এই প্রবাসে আপনার চিন্তা ধারা যে কত বাস্তব তা বুঝতে পারছি। আপনিই আমার কার্ল মাক্স।

আর ডলার হচ্ছে আমার ঈশ্বর।

৥ বার ৥

অনেকদিন পর একদিন দেশ থেকে চিঠি পেলাম। প্রবাস জীবনে চিঠি আশীর্বাদের মতোজ্ঞ নিঃসঙ্গ নির্বাক স্বজনহীন বিদেশে চিঠি মনের সমস্ত গুমোট মুছে ফেলে নিমেষে। কতদিন অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেছি। প্রতিদিন দু'বার করে পোস্টবক্স খুলে নিরাশ হয়েছি। কিন্তু দেশের মানুষ বিনা প্রয়োজনে চিঠি লেখে না। আর লিখবেই বা কেন? এক একটি চিঠি লিখতে পাঁচ-ছয় টাকা ব্যয় হয়। একসের চালের দাম খরচ করবে কোন উদ্দেশ্যে! দেশ থেকে মা লিখেছেন। একই ইনভেলপে ভাইবোনদেরও লেখা আছে। সবাই হাজারো রকম আশ্বাস। যে ভাইটি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তো সে পাস করে একটা চাকরিতে জয়েন করেছে ঢাকার বাইরে। অন্য একটি ভাই, যে প্রতিবছর স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা দেয় এবং যথারীতি অকৃতকার্য হয়, তার একটি চাকরি হয়েছে ছোট খাটো। সবাই ছোটোটি, যে ছিল আমাদের মাঝে সবচেয়ে ভালো ছাত্র, সে পরীক্ষায় ড্রপ দিয়েছে। রাত করে বাড়ি ফেরে।

মা আরো লিখেছেন, এখন দূরের অনেক আত্মীয়স্বজনরা প্রায়ই বেড়াতে আসেন। আমার খোঁজখবর নেন, আমার কথা জিজ্ঞেস করেন। মায়ের একটা ছোটো স্বপ্নের কথাও চিঠিতে তিনি জানিয়েছেন। আমাদের পুরনো বাড়িটা তিনি দোতলা করতে চান। পুরনো বাড়ির জীর্ণ আবরণ মুছে ফেলে রঙ করে বদলাতে চান। চিঠির এই জয়গায় এসে আমি আনমনে হাসলাম। আমার মাজ্জ তিনিও রাতারাতি পরিবর্তন চাইছেন। আমাদের পুরনো বাড়ির পুরনো কাঠামো বদলে ফেলতে তিনি বদ্ধ পরিকর। কিন্তু ভেতরের কাঠামো? বাইরেটা বদলালেই কি ভেতরটা বদলানো হয়?

আমি এ ব্যাপারে মায়ের সঙ্গে একমত নই। আমি ভাবছি অন্যরকম। আমাদের পুরনো বাড়ি এই রকমই থাকবে। যে রকম দুই তরকারি-ভাত ছিল আমাদের দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় সেই রকমটি থাকবে।

আমি দেশে ফিরে এলে দেখা যাবে।

মাকে চিঠির উত্তর দিয়ে দিলাম। জানি তিনি কষ্ট পাবেন, নিরাশ হবেন, কিন্তু এ মুহূর্তে আমার কি করার আছে? প্রতিটি রক্ত বিন্দু দিয়ে এই সামান্য উপার্জন আমার এই বাড়ি তৈরির জন্য ব্যয় করতে পারি না। আমার নিজস্ব কিছু স্বপ্ন আছে।

চিঠি পেয়ে মনটা খারাপ হয়ে গেল। ভাইগুলো আমার অনুপস্থিতিতে কী রকম বখাটে হয়ে যাচ্ছে। বাবা বেঁচে থাকতে আমাদের নিয়ে তিনি গর্ব করতেন। প্রতিবেশীরাও আমাদের অন্য রকম চোখে দেখতেন। বাবা আজ নেই, আমরা বড় হয়েছি, কিন্তু আজকে আমাদের গর্ব করার মতো কি কোনো পারিবারিক ঐতিহ্য থাকবে না? আমরা যদি বাবার যোগ্য উত্তরাধিকারী না হতে পারি, তবে বাবার আত্মা কিছুতেই শান্তি পাবে না। পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে বাবাকে কি এতটুকু শান্তি দিতে পেরেছিলাম? এখন মৃত্যুর পরেও যদি শান্তি না দিতে পারি তবে আমি নিজের কাছে অনেক ছোটো হয়ে যাবো।

যে ভাইটি ইঞ্জিনিয়ার, আমার পিঠেপিঠি, তাকে

একটি ক্ষুদ্র চিঠি লিখলাম। যে দুইটি ভাই পারিবারিক ঐতিহ্য ও মানমর্যাদাকে ম্লান করে দিচ্ছে বলে মা চিঠিতে অভিযোগ করেছেন, তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বললাম। কিন্তু লেখা যতটা সহজ, নির্দেশ দেয়া যতটা সহজ, সংসারে সবকিছু কার্যকরী করা ততটা বুঝি সহজ নয়। যে ঢাকা শহর আমি রেখে এসেছিলাম তা কি ঠিক হুবহু আগের মতই আছে? দু'বছর পর দেশে ফিরে গিয়ে আমার প্রিয় শহরকে কি ঠিক আগের মতই পাবো?

আমাদের সংসারের চেহারাও ঠিক আগের মতো নেই। সময় দ্রুত বদলে যাচ্ছে। সময়ের এই পালাবদলের ছাপ সব কিছুতে চিহ্ন রেখে যায়। আমার ভাইগুলো বড় হয়েছে। আগের মতো আর শাসন শুনবে কেন? কিন্তু এইভাবে ওরা নিজেদের কেন ধ্বংস করছে? কী এক অভিমান, কিসের উপর এই অভিমান, এই পুঞ্জীভূত অভিমানকে ধ্বংসাত্মক কাজে না লাগিয়ে কি সৃষ্টিশীল কাজে লাগানো যায় না? এই জেনারেশনকে আমি হয়তো ঠিকঠাক বুঝতে পারছি না। হয়তো ওদের জেনুইন কোনো অভিযোগ আছে। এই ঘুনে ধরা সমাজের পুরনো ব্যবস্থাকে ওরা আমাদের মতো সহজভাবে মেনে নিতে পারছে না। কিন্তু এই ভাবে কি এত সহজে সবকিছু বদলানো যায়?

আমাদের পুরনো বাড়িটার জীর্ণ কাঠামো আমি বদলাতে পারিনি। প্রবাস-জীবন মোটেই সুখের নয়। কিন্তু তবুও এ জীবনকে আমি কেন বেছে নিলাম? ঠিক আমার জন্য নয়। মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মালে এরকমই হয়। ইচ্ছে করলেই আমি শেকল ছিড়ে বের হতে পারি



না। কিন্তু এরকম শেকল জন্মের সময় কি আমার ছিল? ঢাকায় আমার অভাব আর সুখ-দুঃখের যে জীবন ছিল, তাতে এক ধরনের প্রশান্তি ছিল, কিন্তু প্রতিযোগিতায় জড়িয়ে পড়েছি। আর অর্জন করেছি উচ্চাকাঙ্ক্ষা। এ রকম উচ্চাকাঙ্ক্ষা আমার কোনোদিন ছিল না।

উচ্চাকাঙ্ক্ষা আর প্রতিযোগিতাজ্ঞ এই দুই ভিন্ন মেরুর যাতাকলে আমার নাভিশ্বাস ওঠার জোগাড় হয়েছে। একটা বৃত্তের ভেতর আমি মাথা কুটে মরছি।

আমি কি এরকম জীবন চেয়েছিলাম? হয়তো আমি এরকম জীবন চাইনি। কিন্তু আমার পরিপার্শ্ব, হায়দারের যোগ্যতা না থেকেও বিদেশ গমন, হঠাৎ রাতারাতি বন্ধ মহলে হায়দারের জনপ্রিয়তা, সবকিছু মিলিয়ে আমার অবচেতন মনে এক ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিল। মুখে মুখে আমি অস্বীকার করতাম। কিন্তু ভেতরে ভেতরে গোপনে স্বপ্নকে লালন করতাম। এক আমার ভেতর অন্য আমি। আমার অনেকগুলো চেহারা। আমাদের অনেকগুলো মুখোশ। এই আমি, এই আমার জীবন। হয়তো নমিতা এই আমাকে জানতে পারেনি।

যেদিন আমার ভেতর উচ্চাকাঙ্ক্ষা জন্ম নিলো, যেদিন আমি ডলার উপার্জনের প্রতিযোগিতায় জড়িয়ে পড়লাম, সেদিন থেকে নমিতা আমার জীবন থেকে মুছে গেল। নমিতা চায়নি আমি বিদেশে আসি। কিন্তু আমাকে সে বারণও করেনি, কোনো নিষেধাজ্ঞাও জারি করেনি। আসলে নমিতার মনের অন্য এক অংশ চেয়েছিল, বিদেশে গিয়ে আমি অনেক টাকা উপায় করি, আমার বাকবাক বাড়ি হোক, চমৎকার গাড়ি হোক। সব মেয়েরাই উচ্চাকাঙ্ক্ষী আর কটর বাস্তববাদী। ভালোবাসা থাকে, কিন্তু নিছক ভালোবাসার জন্য একটি মেয়ে একটি ছেলেকে কি ভালোবাসে?

দেশে ফিরে নমিতাকে আমি একথাটা জিজ্ঞেস করবো।

একটি যুবক যখন ভালোবাসে তখন অন্ধের মতো ভালোবাসে নারীকে, কিন্তু নারীর ভালোবাসা সবটাই কি ভালোবাসা? একটি নারীর ভেতর সব-সময় প্রেম নয়, অন্য এক বোধ কাজ করে। নমিতাকে একটা চিঠি লিখলে কেমন হয়! কিন্তু শেষ চিঠিতে লিখেছিলাম সে হাসপাতালে। তারপর আমি পর পর দুটো চিঠি দিয়েছি, কোনো উত্তর নেই।

নমিতার প্রায়ই বুকের কাছে একটা ব্যথা হয়।

ঢাকায় ডাক্তারকে দেখানো হয়েছিল।

সাইকিয়াট্রিস্টকেও দেখানো হয়েছে। কেউ কিছু বলতে পারে না।

সুস্থ হওয়ার পর নিশ্চয়ই নমিতা লিখবে। আমাকে নমিতা অনেক কিছু বলতে চেয়েছিল। আমি বিদেশে আসার আগে নমিতার চোখের সেই নীরব ভাষা দেখে এসেছি।

নমিতাকেও আমি কিছু বলতে চেয়েছিলাম।

মাঝে মাঝে কোনো কোনো বিকেলে খুব নিঃসঙ্গতায় পেয়ে বসে। তখন মনে হয় কেন আমি স্বজনহীন এই প্রবাসে পড়ে আছি? নমিতার চিঠি নেই, মন খারাপ হয়ে আছে, বুকের ভেতরটা কী রকম হাহাকার করে ওঠে। তখন নিজের কাছেই

নিজে প্রশ্ন করি, আমি কি এই রকম জীবন চেয়েছিলাম?

॥ তের ॥

সময় কত দ্রুত চলে যায়।

প্রায় দু'বছর হতে চললো। দেশে ফেরার সময় হয়ে এসেছে। নিজের কাছেই ভাবতে অবাক লাগে, কী করে এই দীর্ঘ প্রবাস জীবন কেটে গেল। নিজ হাতে রান্না করে খাওয়া, সন্ধ্যায় এদেশের সিনেমা হলগুলোতে ধুমধাড়া ক্লাক মার্কা হিন্দি ছবি দেখা, রাতে ফিরে এসে ক্লাস্ত শরীর বিছানায় এলিয়ে দেয়াজ্জ ছকেবাঁধা জীবন ছিল আমার।

একবার ইনস্টিটিউট ফর ইসলামিক কলেজে ভর্তি হয়েছিলাম আরবি ভাষা শিখতে। উদ্দেশ্য ছিল মহং। এদেশের ভাষা শিখে এদের গল্প কবিতা বাংলায় অনুবাদ করবো। প্রায় এক মাস ক্লাস করলাম। কিন্তু তারপর আর শরীর কুলোল না। দুটোয় ক্লাস শেষ করে নিজ হাতে রান্না-বান্না শেষ করতে করতে বিকেল চারটা হয়ে যায়। এদিকে আরবি ক্লাস ঠিক চারটায়। সময়ের সঙ্গে সফল সমঝোতা হয়ে উঠলো না। তাছাড়া আরো একটি অসুবিধা ছিল। যে মন্তর গতিতে আরবি ভাষা আমাদের শেখানো হচ্ছিল, তাতে করে দীর্ঘ দু'তিন বছরেরও অনুবাদ করার মতো ভাষা-শক্তি অর্জন করা যেত না। এদেশের কথা ভাষা এক রকম, বই পুস্তকের ভাষা অন্য রকমজু দুটোর মাঝে এক বিরাট ব্যবধান।

এদেশের মানুষজনের ব্যবহার বড় বেশি রুক্ষ। পথে ঘাটে প্রায়ই আমাদের নাস্তানাবুদ হতে হতো। এভাবে এদেশের মানুষের প্রতি কোনো সহানুভূতি গড়ে ওঠেনি, বরং এক ধরনের ঘৃণা মনে মনে আমরা পোষণ করতাম। এদেশের সংস্কৃতিবান ও রুচিশীল ভালো মানুষের দেখা যে আমরা পাইনি, তা-নয়। কিন্তু এরকম মানুষের সংখ্যা ছিল অত্যন্ত বিরল।

রোদওয়ান শোকবেশা ছিলেন এই ব্যতিক্রমীদের একজন। বয়সে তরুণ, ভদ্রলোক একজন গল্পকার, তার সঙ্গে হঠাৎ করে পরিচয়। ইংরেজি গল্প লেখেন, বিয়ে করেছেন একজন আইরিশ মহিলাকে, থাকেন আয়ারল্যান্ডে। বছরে একবার করে আসেন বাবার কবর জিয়ারত করতে। ভদ্রলোক তার গল্পগ্রন্থ 'দ্য কিং অব ডেথ'-এর একটা কপি এগিয়ে দিলেন। চমৎকার কভার, চমৎকার বাঁধাই, গল্পগুলোও মন্দনা।

বেনগাজী যাওয়ার পথে একজন লিবিয়ান মহিলার সঙ্গে আলাপ পরিচয় হয়েছিল। আসমাহান মাখলুখ, ত্রিপলী আলফাতাহ ইউনিভার্সিটির বায়োলজি বিভাগের অধ্যাপিকা, তাঁর ব্যবহারেও মুগ্ধ হয়েছিলাম। তিনি আমাকে ঠিকানাও দিয়ে ছিলেন। ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে খোঁজ নিয়ে জানলাম তিনি পশ্চিম জার্মানিতে চলে গেছেন।

তবুও অধিকাংশ জনগোষ্ঠীকে সেদিনের সেই গৃহবাসী মানুষ মনে হয়েছে। এই মাত্র সেদিন ১৯৬৯ সালেও এরা গৃহায় বসবাস করতো, উট ছিল এদের বাহন। এখন এরা বিএম ডব্লিউ গাড়ি চালাচ্ছে, সুরম্য অট্টালিকায় বসবাস করছে। হঠাৎ করে একটা পরিবর্তনজ্ঞ এদের ভেতর কাঠামো ঠিক যা ছিল তা-ই রয়ে গেছে, বাইরের কাঠামোতে এসেছে এক আরোপিত পরিবর্তন। এসব কারণে এদের ভাষার প্রতি এতটুকু

মমত্ববোধ আমার জাগলো না। ভাষা শেখা আর হয়ে উঠলো না। দু'বছরের কন্ট্রাস্ট শেষ হবে আগস্টের একত্রিশে। তারপর ইচ্ছে করলে আবার কন্ট্রাস্ট বাড়ানো যায়। আসলে যত বছর ইচ্ছে থাকে যায় এদেশে। ওদের পক্ষ থেকে কোনো বাঁধা নেই। কেউ যদি না থাকতে চায় তাহলে তিন মাস আগে নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানাতে হবে। আমি ঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারছি না। কিন্তু এভাবেও থাকা যায় না। এরকম একঘেয়ে জীবনের কোনোমানে নেই। বরং দেশেই ফিরে যাই। রিজাইন দেয়ার সময় চলে গেছে। এখন ছুটিতে দেশে গিয়ে আর না ফিরলেই হবে। ঈজিপশিয়ানরাও তাই করে। আমার দু'বছরের গ্রাচুইটির সামান্য কিছু টাকা ফেলে যেতে হবে। কর্তৃপক্ষকে কোনোকিছু না জানালেই হয়। এরকম নিস্তরঙ্গ জীবনে আমি ভীষণ হাঁপিয়ে উঠেছি। সমাজের ভেতর থেকেও সমাজ থেকে যেন আলাদা। যেন একটা নিঃসঙ্গ দ্বীপে আছি। চারদিকে ভাষার দেয়াল সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। বাংলাদেশি যে শেকড়হীন সম্ভ্রদায় এদেশে আছে, তাদের জীবন পদ্ধতির সঙ্গে আমি আমার জীবন মেলাতে পারিনি। আমার ফেলে আসা শৈশবের শহর আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। আমি দেশে ফিরে যেতে চাই। দেশ দেখার ইচ্ছে আমার পূরণ হয়েছে। উত্তর আফ্রিকার এই দেশটিতে আমি দীর্ঘ দু'বছর কাটিয়ে দিয়েছি। দুটো বছর কম নয়। আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় আমি দূরপ্রবাসে কাটিয়ে গেলাম। যে সংসারে আমি জন্মেছি, সেই সংসারের চাহিদা পূরণের জন্য



সংসারের সবার মুখে এক টুকরো হাসি ফোটানোর জন্য আমাকে তিলে তিলে হত্যা করছে। যে সময়ে মানুষের জীবনে সৃষ্টিশীল কিছু করার থাকে, সেই সময় আমি ডলার উপার্জনে ব্যস্ত থেকেছি। এখন আমার ভাইটি ইঞ্জিনিয়ার হয়ে বেরিয়ে গেছে। অন্য দুটোও নিজের পায়ে দাঁড়ানোর উপযুক্ত হয়েছে। এখন আমার ছুটি। এখন আমি একজন মুক্ত-কিশোরের মতো ঘরে ফিরে যেতে পারি। আবার আমি আমার একান্ত বিকেল ফিরে পাবো। আবার সেই চায়ের টেবিলে সাহিত্য নিয়ে তুমুল তর্ক, রোদ মাথায় নিয়ে মাইলের পর মাইল হেঁটে বেড়ানো, প্রেসক্লাব, বাংলা একাডেমি এসব কিছু ফেলে আমি কোন্ প্রবাসে পড়ে আছি?

॥ চৌদ্দ ॥

মুদিরের সঙ্গে সম্পর্ক ক্রমেই অবনতির দিকে যেতে লাগলো। প্রতিটি অফিসের প্রত্যেকটি বিভাগের প্রধানতম ব্যক্তি হচ্ছে মুদির। প্রায় সময়ই একজন অযোগ্য ও নিকৃষ্টতম লোক এই সম্মানজনক আসনটি দখল করে থাকে। প্রতিবছর ভোট প্রথমে ৬ কিংবা ৭ সদস্যবিশিষ্ট প্রশাসনিক কমিটি গঠন করা হয়, এই কমিটি অতঃপর নিজেদের পছন্দমতো একজনকে বেছে নেন মুদির হিসেবে। একটা অলিখিত আইন আছে। মুদিরকে অবশ্যই এদেশবাসী হতে হবে। কিন্তু যে দেশে মোট জনসংখ্যার তিনভাগের দুইভাগ বহিরাগত সে দেশে যোগ্যতম ব্যক্তির সংকট সব সময়ই থাকবে। কিন্তু সব মুদিরই যে অযোগ্য এবং নিকৃষ্টতম এমন কথা বলা যায় না। গত বছর আমাদের মুদিরটা ছিল একজন সহানুভূতিশীল মানুষ, যদিও এক অক্ষর ইংরেজি জানতেন না। আমি ছিলাম অত্যন্ত ফ্রি তার সঙ্গে।

এখনকার মুদির ছিলেন এক সময় আমার সহকর্মী। বেটে খাটো শীর্ণকায় মানুষ, চেহারা রুক্ষ, সম্পূর্ণ আনইমপ্রেসিভ, ছিলেন ভূগোল টিচার। কী এক অজানা রহস্যময় কারণে, হয়তো বা রাজনৈতিক, পূর্বতন মুদিরকে প্রমোশন দিয়ে সরিয়ে দেয়া হয়। সেই জায়গায় বসানো হয় এই অদ্ভুত প্রাণীটিকে, যে দৃঢ়তার সঙ্গে বলে লিবিয়া ছাড়া পৃথিবীর আর কোথাও এত সবুজ-শ্যামলিমা নেই, কোথাও বৃষ্টিপাতও হয় না।

আমার মুদির মোটামোটি ইংরেজি বলতে পারে, কিন্তু আমার বিরুদ্ধে তার প্রধানতম অভিযোগ আমি কেন দু'বছরে ভালো আরবি শিখিনি। এমনকি যারা এদেশবাসী, তারাও শান্তিতে ক্লাস শেষ করতে পারে না। নিজেকে খুব অসফল মনে হয়, খুব ব্যর্থ মনে হয়, কিন্তু আরবি জানা ঈজিপশিয়ান কিংবা প্যালেস্টাইনি সহকর্মীদের পাশে যখন আমার চেয়ে করুণ দৃশ্য দেখি, তখন আবার একটা ক্ষীণ আশা মনের ভেতর জ্বলে ওঠে। কিন্তু এ চাকরিতে কোনো জবস্যাটিস-ফ্যাকশন নেই। প্রতিদিন একঘেয়েমি বাড়ছে। প্রতিদিন নিজের কাছে নিজেকে ভারবাহী মনে হয়। মুদিরকে অধিকাংশ সময় এড়িয়ে চলি। ছাত্ররা খুব নগন্য কারণে শিক্ষকদের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ করতে এতটুকু স্বীকা করে না। দেশে থাকতে ছাত্রদের অনেক রকম দৌরাডোর সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটেছে, কিন্তু এতটা আধিপত্য আমরা দেখিনি। বিএমডব্লিউ চড়ে যেসব ছাত্ররা অত্যন্ত অনুগ্রহ করে ক্লাস করতে আসে, তারা নীরহ

শিক্ষকদের খোঁরাই কেয়ার করে। সরকার যতই শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করুক, যেহেতু কোনো কিছুর এদের অভাব নেই, এরা লেখাপড়া না শিখলে তো আর বার্থ মানুষ হয়ে যাচ্ছে না, কিংবা চাকরির অভাবে বেকার থাকতে হচ্ছে না।

নিশ্চয়ই অন্য সংস্থানের অন্য উপায় আছে। ইতোমধ্যে বার্ষিক পরীক্ষা হয়ে গেছে। এদেশে ফাইনাল পরীক্ষার খাতা বাসায় নিয়ে যাওয়া যায় না। ইনস্টিটিউটে বাসে একটি নির্দিষ্ট সময়ে সব শিক্ষকরা মিলে দেখে ফেলে। প্রশ্নপত্রের এক একটি প্রশ্নোত্তর এক একজন দেখার দায়িত্ব নিয়ে থাকেন।

এই রকম একটি দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে মুদিরের সঙ্গে আমার বাক-যুদ্ধ শুরু হয়। একটি অত্যন্ত কম নম্বর পেয়ে ফেল করা ছাত্রের নম্বর বাড়িয়ে দেয়ার জন্য মুদির আমাকে নির্দেশ দিলে আমি প্রত্যাখ্যান করি।

আমি অত্যন্ত সশ্রদ্ধ বিনীত ভঙ্গিতে বলি আমার পক্ষে বৃদ্ধি করা সম্ভব নয়, আপনি নিজ হাতে করুন।

মুদির ভীষণ ক্ষেপে উঠে।

কেউ কোনোদিন তাকে এভাবে প্রত্যাখ্যান করেনি।

ঈজিপশিয়ান টিচারদের দেখেছি মুদিরের কাছে ভিথিরির মতো করুণা পাওয়ার জন্য সর্বদা ব্যস্ত, সদা সম্মত। প্যালেস্টাইনিরা অনেক বেশি বুদ্ধিমান ও চতুর। সব কুল রক্ষা করে মুদিরের সঙ্গে একটা শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান গড়ে তুলেছে।

আমি অবাক হয়ে এই জাতিগুলোকে দেখি।

প্যালেস্টাইনিরা দুচক্ষু দেখতে পারে না ঈজিপশিয়ানদের। যে রাজনৈতিক কারণে আজও মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি গড়ে ওঠেনি, যে দ্বন্দ্ব আরব বিশ্বের এই জাতিগুলোকে আলাদা করে রেখেছে, তার বহিঃপ্রকাশ মাঝে মাঝে টিচার রুমের আমরা প্রত্যক্ষ দেখতে পাই।

ঈজিপশিয়ানরা বাইরে থেকে পরিশীলিত, কিন্তু ভেতরে ভেতরে এরা অত্যন্ত রূঢ় ও স্বার্থান্ধ।

আমাদের সঙ্গে এদের রয়েছে এক ধরনের পেশাগত ঈর্ষা। এদেশের শিক্ষা মন্ত্রণালয় পার্শ্ববর্তী দেশে ঈজিপ্টে না গিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত বাংলাদেশ থেকে কেন একশ' জন টিচার রিক্রুট করতে গেল, তা এরা সহজভাবে নিতে পারছে না।

ঈজিপ্টের সঙ্গে এদেশের রাজনৈতিক সম্পর্ক সুখকর নয়, কিন্তু এদেশের প্রতিটি অফিসের প্রতিটি কার্যালয়ে ঈজিপশিয়ানরা কর্মরত। এদেশের প্রবীণরা প্রো-ঈজিপ্ট, কিন্তু তরুণরা অ্যান্টি-ঈজিপ্ট, দারুণভাবে ঈজিপ্টের প্রতি বিমুখ।

মাঝে মাঝে ভাবি, এদেশের নতুন রাষ্ট্রপ্রধান মুয়াম্মের গান্দাফি যতই 'আফ্রিকা আফ্রিকাবাসীর' স্লোগান দিক সভ্যতার শুরু থেকে মানুষ মানুষে বিভেদ রয়ে গেছে। পৃথিবীর কোথাও সাদা-কালোর লড়াই, কোথাও ঈজিমের দ্বন্দ্ব, কোথাও ধর্মের যুদ্ধ। এই আমিজ্ঞ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার একটি ছোট্টা ও স্বাধীন দেশের ক্ষুদ্র একজন মানব সন্তান, উত্তর আফ্রিকার এই দেশেই যে করুণ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে নিয়ে গেলাম, তা আজীবন আমাকে মানুষ সম্পর্কে নতুনভাবে ভাবতে সাহায্য করবে। একথা আমি জেনে গেছি, মানুষের সঙ্গে মানুষের বিভেদ মানুষই তৈরি করেছে।

পৃথিবীর যে প্রান্তেই আমি যাই, যতো সভ্য ও সমৃদ্ধ দেশেই পাড়ি জমাই, বারবার আমাকে আমার উৎসের কাছে ফিরে আসতে হবে। হঠাৎ করে অন্য দেশের অন্য সংস্কৃতির সঙ্গে অদম্য ইচ্ছা নিয়েও আমি মিশে যেতে পারবো না। আলবেনিয়ার কামুর 'আউটসাইডার' উপন্যাসের নায়কের মতো এই শোকরহীনতা যে কী কষ্টের, তা আমি এই দীর্ঘ দুই বছরে তিলে তিলে অনুভব করেছি।

মুদির আমার চাকরি শেষ করে দিতে পারে নাজ্ঞ সেই ক্ষমতা তার নেই; বড় জোর সে আমাকে দক্ষিণাঞ্চলের জনহীন কোনো মরুভূমিতে বদলি করতে পারে। কিন্তু এইটুকুই বা কেন তাকে আমি করার সুযোগ দেব? তারচেয়ে পদত্যাগপত্র তার মুখের ওপর ছুড়ে দিয়ে দেশের ছেলে দেশে ফিরে যাবো।

এদেশে আসার পর থেকে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি কিন্তু পারিনি। পর মুহূর্তে ভেসে উঠেছে একটি বিরাট অভাবের ছবিজ্ঞ বিশাল হা করা এক সংসার, আমার কিছুই করার নেই।

ফিরে আসার কথা জানিয়ে দেশেও চিঠি লিখেছি অসংখ্য। যে মা দেশ ত্যাগ করার আগে কেঁদে বুক ভাসিয়ে দিয়েছেন, ডলার ড্রাফট পাওয়ার পর সেই মা এখন অনেক পরিতৃপ্ত। আমার জনককে হারিয়ে আমার মা বৈধবোর করুণ শেতশূত্র সাদা শাড়ি পড়েছিলেন, চোখমুখে ছিল ঝোঁকটে বিষণ্ণতা। এখন ডলার পাওয়ার পর আমার মাকে স্থির ও সন্তুষ্ট মনে হয়। কিন্তু তার ছেলেমেয়েরা তাদের নিজেদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করেছে।

ডলার এসেছেজ্ঞ দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছে ভাইয়ে ভাইয়ে। মা দেশে ফিরতে বারণ করেছেন। পুরনো বাড়ির জীর্ণ কাঠামো বদলাতে হবে। তার জন্য প্রয়োজন অনেক ডলার।

নিঃসঙ্গ বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভেবেছি, মায়ের সঙ্গে সন্তানের সম্পর্কের সবটাই কি স্বার্থের? মানুষের সবকিছু কি টাকাকে কেন্দ্র করে ঘুরছে? ডলারই তাহলে দ্বিতীয় ঈশ্বর।

শুভাকাঙ্ক্ষী এক বন্ধু বললেন, রিজাইন দেয়ার দরকার কি? ছুটিতে দেশ থেকে ঘুরে আসুন ভালো লাগবে।

যদি ফিরে আসতে ইচ্ছে না করে আসবেন না। শুধু গ্রাচুইটি আপনার মারা যাবে আবার এরকমও হতে পারে, দেশের সমস্যা আপনাকে আসতে বাধ্য করলো।

তিনি তার ছয় বছরের অভিজ্ঞতা-সমৃদ্ধ বিচক্ষণ চোখ দুটোতে আশা ও উজ্জ্বলতা এনে বললেন, ফেরার পথ বন্ধ করবেন কেন, তাছাড়া এদেশের সরকার আপনাকে রিটার্ন টিকিট দিচ্ছে যখন।

শেষ পর্যন্ত তাই হলো।

ছুটিতে দেশে যাওয়ার সময় হয়ে এসেছিল। এদেশ থেকে মন উঠে গেলেও শত চেষ্টাতেও রিজাইন দিতে পারলাম না। যদি দেশে যুৎসই চাকরি না পাই, যদি দেশে সমস্যা আমাকে বিব্রত করে, যদি আবার ফিরে আসতে হয়। মধ্যবিত্ত সুলভ সচেতনতা আমাকে শিখিয়েছিল, হয়তো আমাদের সবাইকে শেখায়জ্ঞ রিক্স নয়, বিকল্প রেখা। আমি তাই বিকল্প রেখেজ্ঞ ফিরে আসার সকল সম্ভাবনার দরজা খোলা রেখে দেশে ছুটিতে যাওয়ার জন্য কাগজ পত্র তৈরি করতে লাগলাম।

আমার নিজস্ব পোস্টবক্স নেই, তবুও সেন্ট্রাল

পোস্ট অফিস থেকে আমাকে ক্লিয়ারেন্স নিতে হয়েছে। তারপর রয়েছে পানি ও বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয় থেকে ক্লিয়ারেন্সের কাগজ সংগ্রহ। শিক্ষা-ডাইরেক্টরেট, আরবিতে যাকে বলে মুরাকাবায়ো তালিম, সেখান থেকে অনুমতিপত্র, ইমিগ্রেশনে ভিসার জন্য আবেদন, ব্যাংক থেকে সম্পূর্ণ আয়ের ষাট শতাংশ হিসেব করে নেয়া, ট্র্যাভেলার্স চেক সংগ্রহজ্ঞ সে কীয়ে বন্ধিব্বামেলা। এদেশ থেকে বের হওয়া চাক্তিখানি কথা নয়।

ক্রমাগত পনেরোটি দিন আমার এ অফিস থেকে সেই অফিসে দৌড়াডৌড়ি করতে হলো। এদেশে কোনো কাজ সহজে সোজাপথে হবার নয়। মন খারাপ হয়, নিজেকে পরাজিত মনে হয়ত কিন্তু প্রতিবাদের ভাষা আমি হারিয়ে ফেলেছি। ব্যাংকে ট্র্যাভেলার চেক বিভাগে যিনি বসে আছেন, তিনি হয়তো কাজ ফেলে চা খাচ্ছেন আর গল্প করছেন। আমার ফ্লাইট চারদিন পর, তিনি আমাকে আসতে বলছেন পাঁচদিন পর। টিকিট বের করে ফ্লাইটের ডেইট দেখানোর জন্য বলছে, ওয়াল্লাহে, মানে, সত্যিই নাকি?

এরকম এক খামখেয়ালিপনার ভেতর এদেশে জীবনযাপন করতে হয়। অনেক সময় ছেলেবেলায় পড়া গালিভারস ট্র্যাভেলের সেই ল্যান্ড অভ ইয়াছ' অধ্যায়ের উদ্ভট সেই অঞ্চলের অদ্ভুত মানুষদের কথা মনে পড়েছে। কোথায় যেন এদেশের মানুষদের সঙ্গে এক অবিচ্ছেদ্য মিল রয়েছে সেই গল্পের।

এই জায়গাটাই কি গালিভারস ট্র্যাভেলের লেখক কল্পনা করেছিলেন?

॥ পনের ॥

তখন মধ্যরাত।

বাংলাদেশ সময় রাত বারোটা দশ। আমাদের বিমান ঢাকা বিমান বন্দরে ল্যান্ড করলো। কী এক আবেগে ও আনন্দে ভরে উঠলো মনপ্রাণ। যেন এখন নিজেকে মনে হলো জেলমুক্ত একজন স্বাধীন মানুষ। আমি এক মুক্ত পাখি, যদিকে খুশী যেতে পারবো, আমাকে হিসেব করে কথা বলতে হবে না, ভাষার দেয়াল নেই, কোনো ভয় ও অনিশ্চয়তা আমাকে বিব্রত করছে না।

কাস্টমস শেষ করে বিশাল কাচ ঘেরা ঘরের বাইরে এসে আমার দেশের মুক্ত আকাশের নিচে দাঁড়ালাম। এদিক-ওদিক তাকিয়ে চেনা মুখ খুঁজতে লাগলাম। না কেউ আসিনি।

ডাক বিভাগ আমার গুরুত্বপূর্ণ চিঠিটি ঠিকমতো বিলি করেনি। একজন অতি চেনা লোকের হাতে বাংলাদেশের স্ট্যাম্প লাগিয়ে একটি চিঠি দিয়েছিলাম। সেই চিঠিটিও কি তাহলে ঠিকমতো তিনি পোস্ট করেননি? নমিতার কাছে লেখা আমার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চিঠি, সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ চিঠি, নিয়তির শিকার হলো না-কি এটা মানুষের যড়যন্ত্র? যার হাতে দিয়েছিলাম, সে নারীর নাম দেখে নীল-ইনডেলপের কুমারিত্ব হরণ করেছিল, হয়তো দশ পৃষ্ঠার চিঠিতে সে উপন্যাসের স্বাদ খুঁজতে চেয়েছিলো।

এক মুহূর্তে আমার মাথার উপরের চেনা আকাশকে অচেনা মনে হলো। নিজেকে মনে হলো অসহায় ও বার্থ। আবার এক রকম ভয় আমাকে ঘিরে ধরলো। আবার অনিশ্চয়তার অন্ধকারে আমি আক্রান্ত হলাম। কয়েকটি ছোকরা ডাইভার জিজ্ঞেস করলো, স্যার

কই যাইবেন? বিমানের বাস ছাড়তে ঘণ্টাখানেক দেরি হবে। রাত এখন প্রায় দুটো। আমার সঙ্গে অজস্র ডলার। বাংলাদেশের টাকায় লাখ টাকার কিছু বেশি।

আবার নিরাপত্তাহীনতার ভয়, আবার অনিশ্চয়তা। যে টাকা না থাকায় একদিন নিরাপত্তাহীন মনে হতো, ভবিষ্যৎ মনে হতো অনিশ্চিতজ্ঞ এখন সেই টাকাই নিরাপত্তার প্রধান শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে, এখন। এই টাকাই আমার সমস্ত অনিশ্চয়তা। অনেকক্ষণ বিশ্বালের মতো দাঁড়িয়ে রইলাম।

হঠাৎ দ্রুতপায়ে কোথেকে হায়দার এসে হাজির। গ্রিক জাহাজ চড়ে কি হায়দার বঙ্গোপসাগরে এসেছে? চলচ্চিত্রের মতো জীবনের পটভূমিও কি দ্রুত বদলে যায়? কোথেকে এলো এই হায়দার, আমি যে আসছি এ খবরই বা পেলো কি করে? তবে কি আমার বাসায় লেখা চিঠি ঠিকমতো পৌঁছেছে? কিন্তু নমিতার কাছে লেখা আমার চিঠি? ধূসর রংয়ের রিকভার্ড ডাটসানে স্টার্ট দিয়ে হায়দার বললো, শেষ পর্যন্ত তুইও শালা দুবাইঅলা হলি?

আমি কথার উত্তর না দিয়ে ওর উরুতে থাপ্পর মেরে বললাম, কিরে শালা গ্রিসে লাইফ এনজয় করলি কেমন?

তারপর সারা পথ গল্প হলো।

হায়দার এ বছরের ডিসেম্বরে গিস থেকে চিরকালের জন্য ফিরে এসেছে। মাঝখানে কিছুদিন সে পশ্চিম জার্মানিতেও ছিল। বেশ কিছু টাকা হয়েছে এখন। প্রথমে একটা গম ভাঙানোর মেশিন কিনেছে। ব্যবসা ভালো যাচ্ছিল। এখন একটি চাইনিজ রেস্তোরাঁ খুলেছে। শিগগিরই একটি ইলেকট্রনিক্সের দোকান খুলবে নিউ এলিফ্যান্ট রোডে।

আমার মা হায়দারকে খবর পাঠিয়েছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম আমার ছোট ভাইরা এয়ারপোর্টে কেন এলো না?

হায়দার আবার বিদেশের গল্পে মত্ত হয়ে উঠলো। হাক্সা হাসি-ঠাট্টায় ভরে উঠলো মুহূর্ত। পুরনো শহরে এসে গাড়ি থামলো। সারা এলাকা নিরুমা। কল থেকে বেওয়ারিশ পানি গড়িয়ে পড়ছে। অ্যাডভোকেট মান্নানের বাসার বারান্দায় একটা পাগলী অর্ধউলঙ্গ অবস্থায় আজকের সভ্যতাকে ব্যঙ্গ করছে।

এই আমার এলাকা, ওই হলুদ একতলা বাড়িটায় আমি জন্মেছিলাম, দুই বছর পর সবকিছু ঠিকঠাক আছে তো?

দরজায় কড়া নাড়তে একটি সারামুখে বসন্তের দাগ অতি ফর্সা ঝি দরজা খুলে দিল। হায়দার নিজ হাতে আমার জিনিস পত্তর ঘরের বারান্দায় তুলে দিয়ে বললো, তুই যা, আমি চললাম। কাল সকালে কথা হবে।

ঘরে ঢুকে দেখি মা বিছানায় শুয়ে আছে। আমার আওয়াজ পেয়ে উঠে বসেছে। আমি তাকে দুই বাহুতে আলিঙ্গন করে উজ্জ্বলিত হয়ে বলতে লাগলাম, মা আমি এসেছি।

আমার ছোট দুই ভাইয়ের নাম ধরে ডাকলাম। আমার বোনটিকে না দেখতে পেয়ে চিৎকার করে ডাকলাম। কেউ কোনো সাড়া দিল না। আমার কণ্ঠ রাত্রি শেষের নিস্তব্ধ দেয়ালে প্রতিহত হয়ে ফিরে এলো।

মায়ের চোখ দিয়ে অশ্রুর বন্যা নেমে এলো। মাকে বললাম, মা তুমি কাঁদছো কেন?

অপরাধীর মতো মা মাথা নিচু করে রেখেছে।

আমার কোনো কিছু আর বুঝতে বাকি রইলো না। এতক্ষণে বুঝতে পারলাম কেন হায়দার আমার ভাইবোনের কথা জানতে চাইলে প্রসঙ্গ এড়িয়ে গেছে।

এই দীর্ঘ দু'বছরের অনেক কথা আমার কাছ থেকে গোপন করা হয়েছে। আমার যে ভাইটি ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করে ঢাকার বাইরে জয়েন করেছে, সে আমাকে নিয়মিত সবকথা লেখেনি।

আমার একভাই আন্ডারগ্রাউন্ড রাজনীতিতে যোগ দিয়ে দেশদ্রোহীতার অপরাধে এখন জেলে। অন্যটি বাড়ি থেকে পালিয়ে গেছে।

বোনটি একজন সুদর্শন ব্যবসায়ী যুবককে বিয়ে করে এখন আলাদা থাকে।

বোনটিকে আমি ভীষণ ভালোবাসতাম। ও ছিল নমিতার সঙ্গে আমার যোগাযোগের মাধ্যম। ও ভালো ছবি আঁকতো। কিন্তু নিজের জীবনের ছবিটি ঠিকমতো আঁকতে পারলো না। ব্যবসায়ী ছেলের না আছে শিক্ষা, না আছে রুচি-সংস্কৃতি। টাকা ছাড়া আমার বোন ইরাকে ওর দেবার মতো কিছুই নেই। কিন্তু মন শুধুমাত্র দামি দামি জিনিসপত্র দিয়ে ভরে না। তারপরেও কিছু থেকে যায়। রূপ-যৌবনও চিরদিন থাকে না। একদিন ইরা ঠিক বুঝতে পারবে ওর ভুল। ইরাকে আমি নিজ হাতে গড়ে তুলতে চেয়েছিলাম, নমিতাকেও এক চিঠিতে সেকথা আমি লিখেছি। কিন্তু আমার চাওয়া-পাওয়া কোনোদিন একই সরলরেখা ধরে এগোল না। মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মালে এরকমই হয়। এই দীর্ঘ দুই বছরে প্রবাসে আমি যতটুকু পেয়েছি, তার চেয়ে বেশি হারিয়েছি।

ডলার এসেছে পর্যাপ্ত, কিন্তু একটি ছোটো সুখময় পরিবার ধ্বংসের দিকে এগিয়ে গেছে। ভাইবোনগুলো আলাদা হয়ে গেল। জনক নেই। মায়ের গভীর গভীরতর অসুখ। যে কোনো উপায়ে আমার জননীকে সুস্থ করে তুলতে হবে। অনেক ঝড়-ঝাপটার ভেতর দিয়ে তিনি আমাদের রক্ষা করেছেন। বারবার তিনি একাধিক দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছেন। জনকের মৃত্যু তার করুণতম শোক। এমন করে হঠাৎ তিনি বিধবা হবেন ভাবতেই পারেননি। তবুও যা অনিবার্য তা ঘটে ছিল। অমোঘকে কেউ রুখতে পারে না। আমার মা সেদিন কী যে শোকাহত; মাকে এরকম বিষণ্ণ কোনো দিন দেখিনি। মা সব কিছু নীরবে মাথা পেতে নিয়েছেন। কোনো প্রতিবাদ নেই, কোনো প্রতিক্রিয়া নেই। সেদিন বঙ্গোপসাগরও কি একটু উত্তোলিত হয়নি? আমরা, তার সন্তানরা, শোকাহত মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে নীরবে শপথ নিয়েছি— আমরা

নিজদের মাঝে কোনো বিভেদ করবো না। মাকে সুখী করবো, মায়ের মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলবো। জনক যা সম্পূর্ণ করে যেতে পারেননি, তার স্বপ্নের ভগ্নাবশেষের উপর আমরা সুন্দর এক প্রাসাদ নির্মাণ করবো। কিন্তু ডলারের আস্থানে আমি সাড়া না দিয়ে পারি-নি। তিন নম্বর ভাইটি আন্ডারগ্রাউন্ড রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে। সমাজ ভেঙে নতুন করে গড়ার স্বপ্ন ওকে ঘর ছাড়া করেছে। চার নম্বর

ভাইটি এই সংসার থেকে পালিয়ে গেছে। হয়তো ওরও কোনো গোপন স্বপ্ন আছে। আমারও ছিল।

বিদেশ যাওয়ার স্বপ্ন আমাকে পেয়ে বসেছিল। ইরা একটি আলাদা সংসার গড়ার স্বপ্ন দেখেছে। সবার স্বপ্ন থাকে, আমাদের সবার স্বপ্ন ছিল। কিন্তু আমার জননীর চোখ দুটো স্বপ্নহীন। সাদা দেয়ালের দিকে নির্নিমেষ তাকিয়ে আছেন, আর বলে যাচ্ছেন সব কথা, এই দুই বছরের সব ঘটনা।

আমার জনক নেই। আমি হয়েছিলাম প্রবাসী। আমার অনুপস্থিতিতে এত কিছু ঘটে গেছে। হয়তো একটার পর একটা আঘাত পেয়ে আমার জননী শেষ হয়ে যেতে পারতেন। কিন্তু তার প্রতিরোধের শক্তি অপর্যাপ্ত। কোনো কিছুতেই তিনি বিচলিত হন না। কোনো কিছু খুব সহজে তাঁকে পৃথুদস্ত করতে পারে না। এক অমিত শক্তি তিনি ধারণ করেন। কিন্তু তাঁর চোখ দুটো বড় বিষণ্ণ। জনকের শোক তিনি আজও ভুলতে পারেননি।

জনকের শোক আমরাও ভুলতে পারিনি। জনকের স্বপ্নকেও আমরা স্বার্থক করতে পারিনি। জনক চেয়েছিলেন আমাদের পুরনো বাড়ির পুরনো কাঠামো বদলাতে।

আমার চার নম্বর ভাইও একই স্বপ্ন দেখতো। হয়তো তার সেই স্বপ্ন সফল হয়নি বলেই সে এই বাড়ি ছেড়ে, আমার জননীকে ত্যাগ করে, চলে গেছে অন্য কোথাও।

তিন নম্বর ভাইয়ের ধারণা, পুরনো বাড়ির কাঠামো নয়, আগে সমাজের কাঠামো বদলাতে হবে। মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে আমি রাত্রিশেষে শেষ প্রশ্ন রাখলাম, মা তুমি কি চাও?

দেয়ালে টাঙানো আমার মৃত বাবার ছবি স্থির ও অনড়। একবার মায়ের চোখ একটু জ্বলে উঠলো, পরক্ষণেই আবার ধূসর বিষণ্ণতায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়লো। মায়ের ক্ষীণ কণ্ঠে একটু শব্দ এলো। প্রচণ্ড ভালোবাসা ও বিশ্বাস নিয়ে মায়ের হাত ধরলাম— মা, এখন আমার হাতে অনেক ডলার, তোমার সব স্বাদ-আহ্লাদ আমি পূর্ণ করবো। মা হু হু করে শিশুর মতো কঁদে ফেললেন। বললেন, তুমি ওদের ফিরিয়ে আনো।

পরদিন সকাল দশটায় সূর্য যখন তার ভালোবাসার সোনালি স্পর্শ আমাদের পুরনো বাড়ির উপর ছড়িয়ে দিচ্ছিল; তখন হায়দার এলো। ওকে সব কথা বললাম। মায়ের বাসনার কথা শুনে হায়দার বললো, ইটস কোয়াইট ইম্পসিবল। আমি বললাম, আই হ্যাভ টু মেক মাই মাদারস ড্রিম পসিবল। আমাকে পারতেই হবে।

কিন্তু তার আগে নমিতার সঙ্গে আমার দেখা হওয়া ভীষণ প্রয়োজন। নমিতা নিশ্চয়ই আমাকে ভুল বুঝে আছে। হয়তো আমার জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ও শ্রেষ্ঠতম চিঠিটি সে পায়নি।

হায়দারও নমিতার কথা জানতো। সে কিছু বললো না, কিন্তু অনমনে হাসলো। ওর হাসিতে অনেক অব্যক্ত কথা লুকিয়ে আছে।

একসময় গাড়ি এসে থামলো নমিতাদের বাসায়। সেই লতাপাতাছাওয়া গেট, সেই সুরকি-বাঁধানো পথ। সবকিছু ঠিক আগের মতো আছে তো?

কলিংবেল বাজাতে দরজা খুলে দিল নমিতা। হলুদ শাড়ি, সারা মুখে লাবণ্য ঝরে পড়ছে, দীর্ঘাঙ্গী, আমার চেনা নমিতাকে অচেনা লাগছে!

ভেতরে সোফায় গিয়ে বসতে নমিতা পাশের সোফায় মুখোমুখি বসলো।

এতদিন পর আমি এসেছি, কিন্তু নমিতার কোনো ভাবান্তর নেই। আমাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে হায়দারের সঙ্গে মুখের হয়ে উঠলো। যেন আমি বাইরের কেউ।

আমি অনন্যোপায় হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, নমিতা তুমি কেমন আছো?

নমিতা এই প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করলো, কবে এলেন?

গতকাল। কেন তুমি আমার চিঠি পাওনি?

মিথ্যুক। বিদেশে থেকে এরকম হয়ে গেছেন?

আসলে আমার একটা ভুল ধারণা ছিল। আমি ভেবেছিলাম, যেদিন থেকে ডলার উপার্জন শুরু করলাম, সেদিন থেকে নমিতা বোধ হয় আমায় ত্যাগ করে চলে গেছে। আসলে ডাক বিভাগ ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছিল, আমাদের চিঠি নিয়ে রহস্যময় খেলা খেলতো। নমিতা আমার অধিকাংশ চিঠি পায়নি। আমি ধরে নিয়েছিলাম নমিতা আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। আর এদিকে নমিতা ভেবে নিয়েছে আমি তাকে ত্যাগ করেছি। রহস্যময় ডাক বিভাগ আমাদের দু'জনের মাঝে ভুল বোঝাবোঝি সৃষ্টি করেছে।

আমি প্রার্থনার মতো কণ্ঠে বললাম, নমিতা তুমি আমাকে ভুল বুঝো না।

নমিতার চোখ জ্বলে উঠলো।

জ্ঞাপনি ভেবেছেন বিদেশে গিয়ে আপনার দাম বেড়ে গেছে? কেন আপনি আমার সব চিঠির উত্তর ঠিকমতো দেননি?

জীবিশ্বেস করো নমিতা, আমি তোমার সব চিঠির উত্তর ঠিকমতো দিয়েছি। তুমি এবার তৈরি হয়ে নাও। তুমিতো আমারই।

জ্ঞান, তা কি করে হয়? আমাদের ডিপার্টমেন্ট থেকে আমাকে আমেরিকায় পাঠাবে। আমি এখন আর অন্য কিছু ভাবছি না।

জীবনে কেউ কোনো দিন আমাকে এইভাবে প্রত্যাখ্যান করেনি। আমি ও জীবনে কখনো কোনোদিন কোনো নারীকে এইভাবে আকাঙ্ক্ষা করিনি।

নমিতা কি আসলেই আমাকে প্রত্যাখ্যান করলো, না কি এটা তার অভিমান?

আমি আবেগময় কণ্ঠে আরেকবার আমাকে সমর্পিত করলাম, নমিতা, তুমি আরেকবার ভেবে দেখো।

আমি অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে চিন্তে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আপনি আমাকে ভুল বুঝলে কষ্ট পাবো।

আমার ভেতর এ ধরনের অভিমান দীর্ঘ হতে লাগলো। একটি কিশোরী মেয়ের কাছে আমি হেরে যাবো? আমার পকেটে আছে রিটার্ন টিকিট। আমিও ইচ্ছে করলে আমেরিকা গিয়ে আমার সাবজেক্টের উপর আরো পড়া শোনা করতে পারি। কিন্তু একথা আমি নমিতাকে বলতে চাই না। নমিতাকে আমি কোনো মোহের ভেতর নিয়ে যেতে চাই না। মোহ খুব তাড়াতাড়ি ভেঙে যায়।

কোনো মোহ নয়, কোনো রহস্য নয়, খুব সাদা মাটা সহজ-সরল একটি প্রশ্ন আমি নমিতাকে করলাম।

নমিতা, এটাই কি তোমার শেষ কথা?

মাথা নিচু করে আছে নমিতা। নীরবতাই কি সম্মতির লক্ষণ নয়? এই নমিতার শেষ কথা।

আমাকে এখন ফিরে যেতে হবে। আমার এখন

অনেক কাজ বাকি পড়ে আছে। আমার মায়ের স্বপ্ন সফল করতে হবে। জানি না, আর কত বার আমাকে হেরে যেতে হবে। জীবনে কখনো কোনো দিন কারো কাছে আমি হেরে যাইনি। আমার উপর একটা দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, সেই বিশ্বাসের ভিত্তি কিছুটা নড়ে উঠলো কি?

আমি কোনো নাটকের চরিত্র নই, জীবনের এইসব চূড়ান্ত মুহূর্তে নাটক মানায় না। তাছাড়া আমার অধিকার আমি কখনো জোর করে আদায় করে নিতে পারি না।

নমিতার যেখানে সুখ সেখানে যাক। হয়তো একদিন আমাকে তার মনে পড়বে। আমার সঙ্গে তার যে সামান্য মুহূর্তটুকু কেটেছে তা ছিল সোনালি সময়। সুযোগ ছিল, কিন্তু আমি আমাকে ফাঁকি দেইনি।

আমার বিরুদ্ধে নমিতার অভিযোগ আছে, আমার সঙ্গে তার অভিমানও আছে। নমিতা কি সবকিছুর প্রতিশোধ নিল?

হায়দারকে ইশারায় উঠতে বললাম।

হায়দার স্তম্ভিতজ্ঞ যেন একটা ঘোরের ভেতর চলে গেছে। হয়তো বা সে একটা নাটক দেখছিল।

নমিতার কাছ থেকে শেষ বিদায় নেয়ার আগে মনে মনে বললাম, ভালো থাকো।

নমিতা কিছু বললো না।

আমি চেয়েছিলাম নমিতার সঙ্গে চিরদিনের জন্য একটা সুন্দর সম্পর্ক। আমাদের দু'জনের মাঝে অধিকাংশ বিষয়ে অভিন্ন মিল ছিল। সবকিছুর জন্য দায়ী ষড়যন্ত্রকারী ডাক বিভাগ।

আমি ভেবে পেলাম না হঠাৎ কেন নমিতা

আমেরিকার প্রতি ঝুঁক পড়েছে?

আমারও তো সুযোগ ছিল, সম্ভাবনা ছিল। আমিতো আমেরিকার প্রতি উৎসাহিত হইনি।

শেষ পর্যন্ত নমিতাকে ডলারের মোহ পেয়ে বসলো। আমি জানি, করুণ অভিজ্ঞতা থেকে আমি জেনেছি,

নমিতার হাতে অপরিণত ডলার এলে তার সুখ নষ্ট হবে। যেমনটি আমার হয়েছে, আমাদের পরিবারের হয়েছে।

নমিতা আমাকে ভুল বুঝলো।

অথচ একটা সুন্দর সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারতো।

আমাদের দুজনের মাঝে।

নমিতা একদিন ঠিক তার ভুল বুঝতে পারবে।

কিন্তু সেদিন কি ফেরার পথ থাকবে?

ফেরা এত সহজ নয়। কেউ পারে, কেউ পারে না। এর জন্য অনেক মূল্য দিতে হয়।

গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে হায়দার বললো, এবার কোথায় যাবে? আমি গাড়ির কাচের ভেতর দিয়ে দেখলাম দুই দেশের সীমান্তের পতাকার মতো লাল পর্দার আড়ালে নমিতা শরীর ঢেকে দাঁড়িয়ে আছে।

কে জানে, হয়তো নমিতার সঙ্গে আবার কোনোদিন আমার দেখা হবে। নমিতার প্রতি আমার কোনো বিরাগ নেই, আমি নমিতার সুখ চাই।

আমার অনেক কাজ এখন। হায়দারকে বললাম, আমার ভাইবোনদের খোঁজ নিতে হবে।

হায়দার বিদেশি সিগারেট একটা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে এবং নিজেরটা মুখাণ্ডি করে বললো, খুব কঠিন কাজ, দোস্ত।

গাড়ি তখন দ্রুত এগিয়ে চলছে।

আমার চোখের সামনে তখন ভেসে উঠছে আমার রুগ্ন মায়ের স্বপ্নহীন দুটো চোখ।





গল্প

কৃষ্ণপক্ষের জোছনা

শহীদ খান

তার বুক খুকখুক করে। বিষয়টি কোনোভাবেই মেনে নিতে পারছে না। তার স্বামী আকাশের সঙ্গেও শেয়ার করতে পারছে না। কথাটা বললেই আকাশ খোঁটা দেবে। বলবে আমি তো আগেই বলেছিলাম চাকরি বাদ দাও। মেয়ের দিকে নজর দাও। গত কয়েক রাত ধরে ঘুম আসছে না। নাসরিন কেনো, কোনো নারীই বিষয়টি স্বাভাবিকভাবে নিতে পারবে না। নাসরিন অফিসেও যাচ্ছে না। অসুস্থ বলে একটা অ্যাপ্লিকেশন পাঠিয়ে দিয়েছে। নাসরিন কী হয়েছে তোমার? কয়েক দিন ধরে লক্ষ্য করছি তুমি খুব টেনশনে আছ। রাতে ঘুমাতে পার না। আমি লক্ষ্য করেছি তুমি প্রতিরাতেই ঘুমের ওষুধ খাও। কিন্তু তাতেও তোমার ঘুম আসে না। কী জন্য তোমার এতো টেনশন আমাকে বলবে না। আকাশ নাসরিনের

দিকে তাকিয়ে বলে।
কয়েক দিন আগের কথা। অনেক রাত। চারপাশ নিরব। পাশের রুমে থাকে একমাত্র মেয়ে সাকি। এবার এ লেভেল পরীক্ষা দিবে। পড়াশোনায় ভালো। নাসরিনের পরিকল্পনা সাকিকে দেশের বাইরে পাঠাবে পড়াশোনার জন্য। আকাশ নাসরিনের বুক হাত রাখছে। আমার ভালো লাগছে না। আজ বাদ দাও। সব কিছুতেই বিরক্তি এসে গেছে। আমার আর বাঁচতে ইচ্ছা করছে না। এসব কী বলছে? আমি ঠিক...। তুমি বুঝতে পারবেও না। আমার কোনো সমস্যা কোনোদিন তুমি বোঝার চেষ্টা করেছ? নাসরিন ঘুমায় না। কখনও বারান্দায়, কখনও বেডরুমে হাঁটাইটি করে। তারা বিয়ে করেছে প্রায় আঠারো বছর। তার আগে পাঁচ বছর চুটিয়ে

প্রেম করেছে। নাসরিন বারান্দায় পায়চারি করে। কোনো একটা শব্দে আকাশের ঘুম ভাঙে। সে বারান্দায় যায়। বারান্দায় দুটো চেয়ার। মাঝেমধ্যে তারা দুজন বসে গল্প করে। এক সময় নাসরিন একটা চেয়ারে বসে। শাড়ির আঁচল মুঠো করে দু'চোখে চেপে ধরে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে। আকাশ শুকনো হয়ে যায়। নাসরিন কাঁদছে? কেন?

নাসরিন কী করবে ভাবতে পারছে না। সেদিনের ঘটনাটা সে ভুলতে পারছে না। সাকি তার টিচারের কাছে প্রাইভেট পড়ছে। বুয়েটে পড়া ছেলেটা সাকিকে পড়ায়। আর একজন ইংরেজির টিচার আছে। সে ইংরেজি পড়ায়। নাসরিন সাকির রুমে ঢুকে। সাকির স্কুল ব্যাগটা হাতে নেয়। মেয়ের ব্যাগে হাত দেয়ার অভ্যাসটা তার ছিল না। তার বন্ধু লিজা কয়েক দিন বলেছিল, নাসরিন মাঝেমধ্যে মেয়ের স্কুলব্যাগ চেক করিস। সে কথা মনে হতেই নাসরিন মেয়ের ব্যাগটা খুলে। বই, খাতা, কাগজ, কলম থেকে শুরু করে অনেক কিছ আছে। ব্যাগের ভেতরে বেশ কয়েকটি ছোট পকেট। চেন লাগানো। নাসরিন একটা পকেটের চেন খুলে। লিপস্টিক, আই লাইনার, কাঠপেন্সিল, সার্পানার, একটা একশ টাকার নোট, ছোট একটা আয়না। পকেটের ভেতর আরও পকেট। বাইরে থেকে দেখা যায় না। হাতে লাগে পকেটের চেনটা। সেটার ভেতর হাত ঢুকায় নাসরিন। এবার উঠে আসে দুটো কনডম, একটা জন্মনিরোধক ট্যাবলেট আর একটা মোবাইল ফোনের সিম। নাসরিন সাকিকে একটা মোবাইল ফোন দিয়েছে। সেটা অন্য। এই সিমটার কথা সাকি তাকে জানায়নি। তার শরীর কাঁপতে থাকে। মাথা চক্কর মারে। ডান হাত টেবিলের ওপর রেখে দাঁড়িয়ে থাকার চেষ্টা করে। পারে না। বসে পড়ে। চোখে অন্ধকার। তার মেয়ে এমন কাজ করতে পারে? এগুলো ব্যাগে রাখার মানে তো একটাই যকন তখন...। কিছুটা সময় ঝিম মেরে বসে থাকে। কী করবে সে? এসব কথা সে কারো কাছে বলতে পারবে না। আঁচলে চোখ মুছে। তাকে শক্ত হতে হবে। পাগলামি করলে চলবে না। বাবার আশকারা পেয়ে মেয়ে তার এমন হয়েছে। দ্রুত সব গুছিয়ে রাখে। বন্ধ করে ব্যাগের চেইন লাগায়। সাকিকে আগেই এসব কথা জানতে দেয়া যাবে না।

তারপর দিন থেকে সে অফিসের কাজে মনযোগ দিতে পারে না। কাজ করতে গেলেই ভুল হয়। ছুটি নেয়। আকাশ চলে গেছে তার অফিসে। সাকি নয়টার দিকে স্কুলে গেছে। আকাশ সাকিকে নামিয়ে দিয়ে গেছে। ছুটির পর ড্রাইভার সাকিকে স্কুল থেকে বাসায় নিয়ে আসে।

আরে ভাবি! কেমন আছেন? এতো দিন পরে এলেন। রানি ভাবি বলে। আপনাকে কিছু আজ খুব মিস্তি লাগছে। ভাইয়ের আদর...। রানির কথা শুনে সকলেই হাসে। রানির স্বভাবটাই এমন। কথাই প্রচণ্ড রসবোধ। তার বেশিরভাগ কথাই যৌন সুরসুরি-বিষয়ক। তার কথা শুনে কেউ মুখে হাত দেয়। হাসতে গিয়ে কেউ শাড়ির আঁচল

টেনে মুখ ঢাকে।

ভাবি আপনার শরীরটা কিন্তু বেশ ভরাট হয়েছে। ওই দুটি তো...। হি. হি. হেসে বলে নূরজাহান ভাবি। তবে যাই বলুন ভাই, আমি রেবার বাবার সঙ্গে...। বোরিং হয়ে গেছে। প্রবাদ আছে একটা সময় পর স্বামী-স্ত্রী হয়ে যায় ভাইবোন। স্কুলের সামনের খালি জায়গায় বাচ্চাদের অভিভাবকরা চাদর পেতে বসে। নাসরিন চাকুরিজীবী হওয়ায় আসতে পারে না। মেয়েদের অভিভাবকদের গ্রুপ আছে। আছে পুরুষ অভিভাবকদের গ্রুপ। তারা একটু দূরে দূরে থাকে। স্কুলের ভেতর বাচ্চা পাঠিয়ে অভিভাবকরা অপেক্ষা করে। সেখানেও ঘটে নারী-পুরুষের হৃদয় দেয়া নেয়ার ঘটনা।

নাসরিনের ভালো লাগছে না। মন খারাপ। রানি ভাবি চলেন একটু লেকের পাড় ধরে হেঁটে আসি। ধানমন্ডি লেকের পাড়টা বেশ সুন্দর। রানি আর নাসরিন হাঁটে। লেকের পাড়ে গাছের আড়ালে জোড়ায় জোড়ায় ছেলেমেয়েরা বসা। কেউ গল্প করছে। কেউ প্রেমিকাকে জড়িয়ে ধরে বসে আছে। এ দৃশ্য নাসরিন আগেও অনেক দেখেছে। একটা মেয়ের মুখ দুহাতে চেপে ধরেছে একটি ছেলে। একে অপরকে জড়িয়ে ধরে চুমু খাচ্ছে। আশপাশের দিকে কারও কোনো নজর নেই। অল্প দূরে একটি মেয়ের ফ্রকের ভেতর হাত ঢুকিয়ে দিয়েছে একটি ছেলে। একটা গাছের আড়ালে বসে আছে দুটি ছেলেমেয়ে। মেয়েটির সালেয়ারের গিট খুলে ছেলের...। কী অসভ্যের বাবা। ভাবি ওই যে দেখছেন? দেখেন তো ভালো করে। ওই রেনট্রি গাছ আর দেয়ালের আড়ালে। দেখতে পাচ্ছেন? দুজনেরই পরনে জিন্সের প্যান্ট। চেইন খুলে...।

নাসরিনের দৃষ্টি মেয়েটির ওপর ঝুঁকে পড়ে। দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে যায়। মেয়েটির মুখ তার চোখে বুজের মতো ঘুরতে থাকে। নাসরিনের মাথা চক্কর খায়। রানির শরীরে হাত রেখে নিজের পতন ঠেকায়। আর একটু হলে পড়ে যেত। কী হলো ভাবি। শরীর খারাপ লাগছে? চলেন ওখানটায় গিয়ে বসি। রানি নাসরিনকে টেনে নেয়। দুটো চেয়ারে তারা বসে। নাসরিন রানির দিকে তাকিয়ে থাকে। তার কেবল একটাই ভাবনা সাকি এমন কাজ করতে পারে? ট্যালেন্ট মেয়ে। ক্লাসে সে প্রথম। ক্লাসে কোনোদিন সে সেকেন্ড হয়নি। এখানে আসাটা তার ঠিক হয়নি। কেন সে আসতে গেল? নাসরিন তো এমন একটি দৃশ্য দেখবে বলে কল্পনাও করেনি। কিন্তু এ সময় তো তার ক্লাসে থাকার কথা। স্কুলের গেটে বসে যে লোকটি পাহারায় আছে তাকে নাসরিন জিজ্ঞেস করে জেনেছিল সাকি ক্লাস করছে। সে কি ভুল দেখল? নিজের মেয়েকে চিনতে...।

ভাবি আপনি একটু বসুন। আমি আসছি। নাসরিন উঠে যায়। যেখানে জিন্স পরা দুটি ছেলেমেয়ে দেয়াল আর গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে...।

স্কুলে ফিরে নাসরিন সরাসরি হেড মিসের কাছে যায়। হেড মিসের চেয়ারে এখন অন্য কেউ নেই। বসুন আপা। অনেক দিন পর এলেন। আমি বুঝতে পারি চাকরি করে আপনার সময় হয় না।





তারপরও তো মাঝেমধ্যে আসতে হয়।
আমি ভাবছিলাম আপনাকে একটু আসার
জন্য বলব।
ম্যাডাম আমি...।
বলতে হবে না। আপনি সাকির মা। আমি
জানি।
ওকে কি একটু ডেকে আনা যাবে? কথাটা
বলার পর নাসরিনের শরীর কাঁপতে থাকে।
হেড মিস তাকে ডাকার কথা ভাবছিলেন।
হেড মিস ডাকার মানেই তো...।
আনা যাবে না কেন? অবশ্যই আনা যাবে।
রহিমা তুমি আপাকে এক কাপ চা দাও।
এখন তো ক্লাস চলছে। ঠিক আছে আমি
দেখছি। আপনি বসুন।
হেড মিস কলবেল টিপেন। একজন আয়া
আসে। যাও সাকিকে ডেকে নিয়ে আস।
বলবে বিশেষ দরকার আছে। আমার কথা
বলো। তুমি সঙ্গে করে নিয়ে আসবে। পাঁচ
মিনিটের জন্য।
এসি রুমে বসেও নাসরিন ঘামছে। তার
মনে হচ্ছে সে ফাঁসির আসামি। একটু
পরেই আয়া এসে যখন বলবে ও ক্লাসে
নেই তখন...। সময় দীর্ঘ মনে হয়। চায়ের
কাপটা টেবিলে। চুমুক দিতে ইচ্ছা করছে
না।
কী হলো আপা চা খান।
খ্যাংক ইউ মেম বলে একবার চুমুক দেয়।
আয়ার সঙ্গে সাকি। এটা কী করে সম্ভব।
তাহলে লেকের পাড়ে সে সাকির মতো
কাকে দেখল? সব ভুল নাকি। নাসরিন কি
জেগে আছে? না ঘুমের ভেতর স্বপ্ন
দেখছে? নিজের হাতে নিজেই চিমটি
কাটে। সে সচেতন আছে তো?
মা তুমি! কিছু হয়েছে? তোমার কি শরীর
খারাপ? বলতে বলতে সাকি নাসরিনের
কপালে হাত রাখে।
কিছু না। আমি এদিক দিয়েই তো
যাচ্ছিলাম ভাবলাম তোমাকে একটু দেখে
যাই।
মা আমি ক্লাসে যাই।
যাও। বলে নাসরিন।
আপা আমার মনে হয় আপনি কোনো
ব্যাপারে আপসেট আছেন। আসলেই আপনি
একজন লাকি মানুষ। এবার যুক্তরাজ্যের
একটি ইউনিভার্সিটি থেকে সাকির নামে
স্কলারশিপ এসেছে। সেখানে চার বছর
পড়তে পারবে সরকারের খরচে। আপনার
মেয়ে রেকর্ডবল মার্কস পেয়েছে। গত পাঁচ
বছরে বাংলাদেশের ইংরেজি স্কুলগুলোর
মধ্যে সে বেস্ট স্টুডেন্ট হয়েছে। তাই তারা
তাকে অফারটা দিয়েছে। তার কৃতিত্বে
আমরা গর্বিত।
নাসরিন একটা সত্য কথা বলো তো।
আকাশ বড় বাতিটা নিভিয়ে ডিম লাইট
জ্বালিয়ে দেয়। বিছানায় শুতে শুতে বলে।
এ সময়টাই তাদের ঘনিষ্ঠ হওয়ার সময়।
নাসরিন কথা বলে না। চোখ বন্ধ করে
শুয়ে আছে।

কী ঘুমিয়ে গেলে নাকি?
না ঘুমাইনি। বলো শুনতে পাচ্ছি।
তুমি কি সাকিকে নিয়ে টেনশন করছ?
নাকি অন্য কিছু। বলতে বলতে আকাশ
স্ট্রীর একটা হাত ধরে।
নাসরিন কেঁদে ফেলে। জানো তোমার
মেয়ের কাহিনি।
কী করেছে সাকি।
গত কয়েক দিন আগে ওর ব্যাগের ভেতর
কনডম আর জন্মনিরোধক পিল পেয়েছি।
আরও ভয়ানক খবর হলো...। এটুকু বলে
থেমে যায় নাসরিন।
থামলে কেন বলো।
একটা ছেলের সঙ্গে প্রেম করছে।
আকাশ হেসে বলে, এ বয়সে তো প্রেম
করবেই।
এখানেই শেষ না। আরও খবর আছে।
ছেলেটির সঙ্গে তার ফিজিক্যাল রিলেশনও
হয়েছে।
নাসরিন তুমি কি ভুলে গেছ বিয়ের আগে
আমরাও...। তোমার বান্ধবী মোনার
বাসায়...। তুমিই তো আমাকে নিয়ে
গিয়েছিলে। মোনা ছাড়া বাসায় আর কেউ
ছিল না। সেটাই ছিল আমাদের দুজনের
একান্ত হওয়ার প্রথম সুযোগ। মোনা
আমাদের সুযোগ করে দেয়। বাইরে থেকে
দরজা লাগিয়ে দিয়েছিল। আমরা দুজন
ভীষণ উত্তেজিত ছিলাম। সেদিন আমরা
দুজন দুজনকে নতুন করে চিনলাম।
তারপর...। জীবনে প্রথম বাস্তবের নগ্ন
নারী দেহ দেখলাম। তার আগে আমরা
একে অপরকে খণ্ডিতভাবে দেখেছিলাম।
তুমি তো প্রায়ই বলতে আকাশ আমি
তোমার পুরোটা দেখতে চাই। মোনার
বাসায় তুমিই প্রথম...। আমারও ভীষণ
ইচ্ছা...।
প্লিজ আর খোটা দিও না। আমাদের সম্পর্ক
ওদের সঙ্গে মিলাচ্ছ কেন? আমরা তো
তখন মাস্টার্সের স্টুডেন্ট ছিলাম। অ্যাডাল্ট
ছিলাম।
শোন নাসরিন এখন ডিজিটাল যুগ।
কিছুদিন পর মেয়ে পড়তে যাবে বিদেশে
তখন কী করবে। আর অ্যাডাল্টের কথা
বলছ? তোমার মেয়ের বয়স আঠারো হয়ে
গেছে। সে এখন অ্যাডাল্ট। ভুলে গেছ?
নাসরিন মনে মনে বলে সত্যিই তো তার
মেয়ে অ্যাডাল্ট হয়ে গেছে। সে বিছানা
ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। পায়ে পায়ে সাকির
ঘরে যায়। ডিম লাইটের আলোয় সাকির
শরীরটা দেখা যাচ্ছে। সাকির স্তন। সাকির
নিতম্ব। সাকির উরু। মুখে যুবতী মেয়ের
লাবণ্য। কৃষ্ণপক্ষের জোছনায় উজাসিত
সাকির শরীর। সব কিছুতেই অ্যাডাল্টের
চিহ্ন। কল্পনায় সাকির শরীরটাকে
নাসরিনের নিজের বলে মনে হয়। সে
নিঃশব্দে কাঁদে। চোখ মুছে। টুপ করে
মেয়ের পাশে শুয়ে পড়ে।



গল্প

মহাপ্রাণের আহ্বান

অনুপ সাহা

ঢাকার রাজপথ যেন শ্মশানপুরী। মানুষ রাজধানী ছেড়ে চলে যাচ্ছে। ঢাকা বলতে প্রায় বিরাগ নগরী। রাস্তাঘাট সব ফাঁকা, জনশূন্য। মাঝেমাঝে কুকুররা অজানা বিপদের শঙ্কায় বারবার ডেকে উঠছে। ঘে..উ..উ, ঘে..উ..উ। আশপাশের মানুষ যারা সে শব্দ শুনছে তারা আতঙ্কিত হয়ে উঠছে বারবার। গালমন্দ করছে। শাপ-শাপন্তি করছে ওই জন্তুর। কেউ কেউ ছাদের ওপর থেকে ঢিল মেরে বন্ধ করতে চাইছে সে ডাক। সে ডাকের মধ্যে যেন মৃত্যুর আশঙ্কা। মানুষ পালাচ্ছে। যে যার মতো করে, যেখানে-সেখানে। মৃত্যুর আশঙ্কা জেগে উঠেছে সবার মনে। একটা কথাই বারবার করে রণিত হচ্ছে ‘বাঙালি পালাও’। ‘বাঁচতে চাও তো পালাও’। ‘জীবন রক্ষা করতে চাও তো পালাও’। তোমার যম আসছে। তোমাকে শেষ করতে, নিঃশেষ করতে।

চুষে খেতে। বাঙালি পালাও। যেখানে পার যাও, তা না হলে তোমার নিস্তার নেই। তোমার ধ্বংস অনিবার্য, অবধারিত। বাঙালি পালিয়েছে, পালাতে গিয়ে হাঁচট খেয়ে পড়েছে। উঠে পড়ে আবার রক্তাক্ত পা নিয়ে। সন্তান আর স্ত্রীর হাত ধরে। রাজধানী ছেড়ে যেমন করে পারে তেমন করে। কিন্তু সব পালানোতে তো আর পালানো যায় না। সব পালানো ঠিকমতো হয়ও না। খরশুনা মাছের মতো। জলের তলে নিজের দেহকে লুকাতে চায় কিন্তু পারে না। চোখ দুটো সবসময় জলের ওপর ভেসে থাকে। স্রোতস্রী জলের ওপর দিয়ে সে যখন তীরবেগে ছুটে চলে তখন তার চোখ দুটো মনে হয় সার্চ লাইট। জলের ওপর ভেসে আছে। সবকিছু নজর করছে। শত চেষ্টাতেও সে তার দেহকে জলের তলায় লুকাতে পারে না।

লুকাতে হয়তো চায় কিছু পারে না। তার দৈহিক গঠন এমনই যে তার দেহ জলের নিচে নিতে চাইলেও নিতে পারে না। জলের ওপর ভেসে থাকে। বাঙালি পালাতে গিয়ে পালাতে পারল না। পালাবে কোথায়? যেখানে পালাবে সেখানেই তো মৃত্যুভয়, বিদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা। সেখানেই জলের ওপর খরশুনা মাছের মতো ভেসে ওঠার সম্ভাবনা। তাই মানুষ আর পালাতে চায় না। হারাতে চায় না সবকিছু। কিছু রক্ষার আশায় প্রতিরোধী হয়ে ওঠে। হয়ে ওঠে প্রতিবাদী। বাঙালি প্রতিবাদী হয়েছে, প্রতিরোধী করেছে নিজেকে শত্রুর হাত থেকে বাঁচানোর জন্য। একটা জাতিকে রক্ষা করার জন্য— নিজের স্বকীয়তা আর বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করার জন্য। এ যেন বিধবার একমাত্র সন্তান। নিজের জীবন দিয়ে হলেও রক্ষা করতে হবে, বাঁচাতে হবে। দেশ মাতৃকাকে রক্ষা করতে হবে।

আগে একটা কুকুর ছিল। এখন অনেকগুলো কুকুর একসঙ্গে জড়ো হয়েছে। কুকুরগুলো আগে একটার সঙ্গে আর একটা ঝগড়া করত, মারামারি করত। একটা আর একটাকে তাড়িয়ে দিত। এখন তারা মারামারি করছে না। আনন্দও করছে না। একসঙ্গে রাস্তার মধ্যে দাঁড়িয়ে মুখটা শূন্যে তুলে আওয়াজ করছে ‘ঘেউ..উ..উ’, ‘ঘেউ..উ..উ’। ডাকটা শুনলেই প্রাণটা কেঁপে ওঠে। মনে হয় ডাকের সঙ্গে ভয়াল কিছু আছে, বিপদ আসছে। ছেলে তার মাকে বলে, ‘মা, দেখ কুকুরগুলো কিভাবে ডাকছে? ডাকগুলো ভয়াল যেন মৃত্যুর বিভীষিকা! শুনলেই গাটা হুমছম করে ওঠে। ওগুলোকে তাড়ানোর কত চেষ্টা করলাম কিন্তু গেল না।’

‘আগে একটা কুকুর ছিল। এখন কোথা থেকে একদল এসেছে। ওগুলোকে তুই তাড়াবি কী করে। ওগুলো তো যাঁতাকল হয়ে বসেছে। রাস্তা ফাঁকা আর বিরান দেখে। নিশ্চয়ই আমাদের প্রাণসংহার করে ছাড়বে!’ মা তার উদ্বেগ নিয়ে ছেলেকে বলে।

‘পশুদের এ রকম ভয়াল ডাক কী মা, আগাম কোনো কিছু স্মরণ করিয়ে দিতে পারে?’

‘ওদের ডাকের মধ্যে কেমন যেন একটা ভয়। একটা আতঙ্ক। যেন যমদূত স্বয়ং সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, মৃত্যুটা নিশ্চিত করবে।’

‘আগাম বিপদ জন্তুরা কী আঁচ করতে পারে?’

‘এক-এক প্রাণীর এক-এক গুণ রয়েছে। মানুষের অনেক গুণ আছে আবার প্রাণীদেরও অনেক গুণ আছে। মানুষ কিছু কিছু বিষয়ে জন্তুদের থেকে অগ্রগামী। আবার জন্তুরাও কিছু কিছু বিষয়ে মানুষের থেকে এগিয়ে। বিশেষ করে অনাগত বিষয়ে আঁচ করার ক্ষমতা অত্যন্ত প্রখর।’

কুকুরগুলো আবারো ডেকে ওঠে। প্রথমে একটা, তারপর অনেকগুলো একসঙ্গে। ‘ঘেউ..উ..উ’। যেন একটা কান্নার সুকরুণ সুর। হৃদয়বিদারি। মনে হয় কেউ এসে হৃৎপিণ্ড উপরে ফেলবে, সেটাকে চাকুদিয়ে ফালিফালি করবে তারপর। সে-ডাকে আশপাশের সবার কেমন যেন ভয় হয় একটা, সঁদিয়ে যায় সবাই। আশঙ্কা করে নতুন কোনো বিপদের। যুবকটা বলে, ‘এগুলোকে এখান থেকে তাড়ানো দরকার। এগুলোর ডাকের সঙ্গে কেমন যেন একটা ভয় কাজ করে। বুকটা

কেঁপে ওঠে।’

যুবকের কথার মধ্যে একটা ঘটনা ঘটে। দড়াম করে রাস্তার মধ্যে একটা আওয়াজ হয়। যুবক যার নাম কামাল আর তার মা রাবেয়া খাতুন ঝুল বারান্দা থেকে রাস্তার দিকে তাকায়। দেখে একটা ইট গড়িয়ে গড়িয়ে কুকুরদের কাছে যাচ্ছে। কুকুরদের গায়ে লাগেনি। পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেছে। ইট পড়া দেখে যুবকটা তার মাকে বলে, ‘মা, দেখ সামনের বাড়ির ছাদ থেকে কুকুরগুলোকে তাড়ানোর জন্য ইট ছুড়ে মেরেছে। ওরাও আমাদের মতো কুকুরগুলোকে সহ্য করতে পারছে না।’

যুবক ও তার মা ওপরের দিকে তাকাতাই কয়েকটা ছেলেকে সামনের ছাদের ওপর দেখতে পায়। সবার মনে একটা আতঙ্ক, সামনে বিপদ আসছে। কুকুরগুলোর আত্ননাদ যেন সেই বিপদের অনুরণন। যেন মুহূর্তধনি!

‘আমাদের আশপাশের অনেক লোক তাদের বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে, এলাকাটা খালি হয়ে যাচ্ছে। আমরাও কী ঢাকা ছেড়ে গ্রামের বাড়িতে গিয়ে উটব, মা?’

ছেলের জিজ্ঞাসায় মা যেন কেমন হয়ে যায়। কখনো এমন বিপদের মধ্যে পড়েনি। ভয়ের আশঙ্কায় জড়ের মতো হয়ে আছে। শঙ্কচিত হয়ে যায় মনের সাহস।

‘কোথায় যাব আমরা আর? তোর বাবা তো এই বাড়িতেই মারা গেল। তাকে তো আমরা আজিমপুরে কবর দিলাম। কোথায় যাব তাকে ফেলে? এই শহরেই আমরা থাকব।’

‘তা হলে মানুষ পালাচ্ছে কেন? আমাদের মহান্না ছেড়ে, ঢাকা ছেড়ে? পাকিস্তানি মিলিটারিরা নাকি, আমাদের বন্ধুদের কাছ থেকে শুনতে পেলাম, তারাও তাদের বাবা-মায়েরদের কাছ থেকে শুনছে, আক্রমণ করবে।’

‘বাঙালিরা স্বাধীনতা চেয়েছে, স্বাধিকারের জন্য প্রকাশ্যে ভাষণ দিয়েছে। আক্রমণ তো করতেই পারে।’

‘আমাদের এই বাড়ি যদি আক্রমণ করে? আগুন লাগিয়ে দেয়?’

‘দিতোই পারে, অসম্ভব কিছু না।’

‘আমরা তো ঝুঁকির মধ্যে আছি মা। যে কোনো বিপদ হতে পারে।’

‘সেই ঝুঁকি সামলানোর জন্য আমাদের প্রত্নতি নিতে হবে। অনেকেই তার জন্য প্রত্নতি নিচ্ছে। আমাদেরও প্রত্নত হতে হবে। অশনি শক্তিকে মোকাবেলা করার জন্য। ভয়াল শক্তিকে ভয়ালভাবে প্রতিরোধ করার জন্য।’

‘শুনছি যুবকদের বেছে বেছে ধরে নিয়ে যাবে। তারপর গুলি করে মারবে। কোথায় নিয়ে গুলি করবে মা?’

‘বাড়িতেও মারতে পারে। রাস্তায়ও পারে। আবার ধরে নিয়ে গিয়ে ওদের সুবিধামতো জায়গাতেও মারতে পারে। এখন সবকিছুই সম্ভব। অসম্ভব বলে কিছু নেই। নয় এটা তাদের কাছে কোনো অপরাধ। মানুষ মারার জন্য হয়তো প্রশাসন তাদের পুরস্কৃত করবে। কেউ কেউ হয়তো পেয়ে যাবে তাদের চির আকাজক্ষিত পদোন্নতি।’

‘কী করব তাহলে আমরা?’

‘মনের বলটাই আসল। মনের বলেই বলীয়ান

হতে হবে। যে কোনো পরিস্থিতি মোকাবেলা করার মতো সাহস থাকতে হবে। মনের সাহসটা যদি থাকে তাহলে আমরা যে কোনো পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে পারব।’

‘আমাদের তো কোনো অস্ত্র নেই। একটা ছোরা বা হাতিয়ারও নেই। আমরা সৈন্যদের সামলাব কীভাবে? প্রতিরোধ করব কীভাবে?’

‘সময়টাই আসল। সময়ই বলে দেবে কি করতে হবে আর কি করতে হবে না। সময়ের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। তারপর সিদ্ধান্ত নিতে হবে কি করব বা কোথায় যাব।’

‘বাঙালিদের তো কিছু নেই। কোথাও কোনো সাহায্য পাবে বলেও তো মনে হয় না।’

‘সাহায্য করার মতো অনেকেই আছেন। সেটাকে ভালো করে চাইতে হবে, বুঝতে হবে।’

দুই.

২৫ মার্চের রাত এক ভয়াল রাত। ঘোরতর অমাবস্যা নেমে আসে এই বাংলায়। রাতের নিশাচর পাখিরা বিপদের গন্ধ পেয়ে ডেকে ওঠে বারবার। শিয়াল আর কুকুর আগাম বারুদের গন্ধে শিউরে উঠছে। বর্গী আর বিদেশিদের হামলা এদেশে হয়েছে কিন্তু মানুষ এতটা বিচলিত হয়নি। ভয় পায়নি কিংবা মরতে হয়নি মানুষকে এতটা। আর সেই সব হামলার প্রকৃতি ছিল ভিন্ন। সম্পূর্ণ আলাদা। রাজার সঙ্গে রাজার। প্রজা কখনো সেই যুদ্ধে জড়ায়নি। স্বার্থসংশ্লিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী আত্মত্যাগ করতে হয়নি। প্রজা সব সময়ই নিরাপদ থেকেছে আর জানমাল রক্ষা করেছে। কিন্তু এবার শুধু রাজার সঙ্গে রাজার যুদ্ধ নয়, এই যুদ্ধের সঙ্গে গণমানুষ জড়িত। এক সময় মনে হয়েছে এই যুদ্ধ চালাচ্ছে কারা? যারা চালানোর কথা তাদের তো কাউকেই দেখা যাচ্ছে না। তাহলে যুদ্ধ চলছে কীভাবে? নেতৃত্বই বা দিচ্ছে কে? কোন রাজা বা সেই পদমর্যাদার মানুষ গণমানুষের নেতৃত্ব কাঁধে তুলে বলেন তোমারা যুদ্ধ কর। এই নাও অস্ত্র। শত্রু খতম কর। যুদ্ধের ফলে যে লাভ হবে তার ভাগ পাবে। দিন কাটাতে পারবে আরামেই লুপ্তিত দ্রব্য দিয়ে। আর ভোগ করতে পারবে পরাজিতের নারীদের। সারা বার আর খানাপিনায় কেটে যাবে তোমার জীবন।

রাস্তায় বেরিয়ে আসা মানুষের ওপর মেশিনগান আর ট্যাংক থেকে গুলি করে। দিশাহারা বাঙালি আগুনের লেলিহানে ঘরে থাকতে পারে না। রাস্তায় বেরিয়ে এসেছে নিরাপদ জায়গা হিসেবে। কিন্তু তাদের পরিকল্পনা যে ভিন্ন তা বাঙালি বুঝবে কী করে? নিরাপত্তার সন্ধানে বাইরে বেরিয়ে আসা বাঙালি নিরাপত্তার পরিবর্তে লাভ করেছে হত্যা আর বেঁওনেট। শান্তির পরিবর্তে হত্যার হোলিখেলা। বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক, ডাক্তার, শ্রমজীবী যাকে যেখানে পেয়েছে সেখানে গুলি করে মেরেছে। স্বাধীনতা চাইবার ফল হাতেনাতে বুঝিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছে নিরস্তর। রাজারবাগ পুলিশলাইন ও লালবাগ বাদ যায় না। সেখানে চলে নির্মম আক্রমণ। বাঙালি পুলিশরা যাতে কোনো রকম প্রতিরোধ করতে না পারে সেজন্য রাজারবাগ পুলিশলাইনকে লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করে। হামলা চালায় পরিকল্পনামাফিক। প্রথম দিকে প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করে পুলিশ

বাহিনী। কিন্তু প্রতিরোধ করতে বিফল হয়। দুর্মদ পাকিস্তানি বাহিনীর সঙ্গে পেরে উঠতে না পেরে ছত্রস্থান হয়ে যায়। জানবাজি রেখে আক্রমণ প্রতিহত করার সর্বাত্মক চেষ্টা করে কিন্তু দখল করে নেয় পাকিস্তানিরা পুলিশ ব্যারাক। বাঙালির শেষ আশ্রয়স্থল চলে যায় পাকিস্তানিদের দখলে। একই অবস্থা হয় লালবাগের। বাঙালিদের নির্বিচারে গুলি করে মারে। দিশাহারা হয়ে পড়ে বাঙালি। বুঝতে পারে না কি করবে। হাজার হাজার মানুষকে মেরে ফেলেছে। বুদ্ধিজীবী বা পাকিস্তানি সমগ্রতার পক্ষে রায় দেয়নি যারা বা যাদের পাকিস্তানি শাসকরা বিশৃঙ্খল বলে নিজেদের আনুকুল্যে নেয়নি, তাদের মেরে ফেলে। সারাদেশে নিধনযজ্ঞ চলছে। ২৬ মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণা দেয়া হয়। কিন্তু বাঙালি একত্রিত হতে পারেনি তখনো। যুদ্ধ শুরু হয়েছে একতরফা এবং একসঙ্গে। যুদ্ধের মাধ্যমে পাকিস্তানের অখণ্ডতা বজায় রাখতে চায় তারা। কিন্তু শুধু নির্যাতন, হত্যা, লুট আর গুম করে কী কাউকে দাবিয়ে রাখা যায়, না কাউকে রাখা গেছে? বাড়ি থেকে পালিয়ে এক পরিত্যক্ত বাড়িতে আশ্রয় নেয় কামাল। পাকিস্তানিরা বাঙালিদের খুঁজে বার করার চেষ্টায় বকশিবাজার আর বেগম বাজারের দিকে হল্যা করে ফেরে। বেঁওনেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে অসংখ্য মানুষকে মেরে রাস্তার ওপর ফেলে রাখে। রক্তে ভেসে যায় রাস্তাঘাট। কুকুরে চাটছে সেই রক্ত। বীভৎস এক নগরীতে পরিণত হয়েছে ঢাকা। জগন্নাথহলের ভেতর ঘটে গেছে নারকীয় হত্যাকাণ্ড একটু আগে। চোখ বেঁধে ছাত্র আর শিক্ষকদের এক লাইনে দাঁড় করিয়ে হত্যা করেছে। নিম্নশ্রেণির কর্মচারীরাও রেহাই পায়নি। তাদেরও হত্যা করেছে নির্বিচারে। দাউদাউ করে জ্বলছে রমনা। আকাশে গনগনে আগুন। সেই আগুন উচুতে এতটাই উঠেছে যে মনে হচ্ছে আকাশ ফুটো হয়ে যাবে। ধোঁয়ায় ঢেকে গেছে চারদিক। পাকিস্তানিরা আগুন দিয়েছে রমনা কালীবাড়িতে। সারারাত ধরে চলল সেই আগুন। কোনো ফায়ার ব্রিগেড নেই, উদ্ধারের কেউ নেই। পুড়িয়ে ছাড়খার করে দিল রমনার কালীবাড়ি। আগুনের শিখা বেরলছে অবশিষ্ট ধ্বংসাবশেষ থেকে। আগুনের বিশাল লেলিহান আকাশের মাঝজুড়ে। বিরাণ হয়ে যায় এলাকাটা। ইতিহাস আর স্থাপনা ধ্বংসের খেলায় মেতে ওঠে তারা। রাস্তায় নামিয়ে দেয় ট্যাংক আর মেশিনগান, তাই দিয়ে গুলি করে মারে বাঙালিদের। হাজার হাজার মানুষ মরে পড়ে থাকে এখানে সেখানে।

যে ছিল সব থেকে আদরের মানুষ, স্বামী, পুত্র বা বোন বা স্ত্রী তাদের দেহ এখন পড়ে আছে রাস্তার ওপর অনাদরে, মূল্যহীন। গাড়িয়ে পড়ছে রক্ত। দেখার কেউ নেই যে মৃতের সৎকার করে বা আতের মুখে একটু জল তুলে দেয় বা চিকিৎসা করে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে। শাহবাগের মোড়ে তখন অসংখ্য ট্যাংক আর মিলিটারিদের গাড়িতে সয়লাব হয়ে আছে। কর্ডন করে হত্যাকাণ্ডের হোলিখেলা চলছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। কামাল প্রাণে বাঁচার জন্য পরিত্যক্ত এক বাড়িতে আশ্রয় নেয়। সেখানে তার মতো আরো অনেকে আশ্রয় নিয়েছে। হিমশীতল নীরবতা। মৃত্যু এখানে

জমে আছে বরফের ভেতর। বরফ হয়ে আছে জীবন্ত প্রাণ। একজন আর একজনের ওপর পড়ছে হাত-পা খেঁতলে যাচ্ছে তবু মুখে কোনো বড় রকমের শব্দ নেই। সবাই স্বপ্নস্বরে উঃ-আঃ আতনাদ করে মুখ বন্ধ করে ফেলেছে। তারা জানে সামান্য একটু অসাবধানতায় শেষ হয়ে যেতে পারে আশ্রিত কয়েকটা মানুষের জীবন। একটা শব্দ হয়। ভু-করে রাস্তা দিয়ে মিলিটারিদের গাড়ি চলে যায়। সবাই নিশ্চুপ হয়ে পড়ে মরা মানুষের মতো। তারা জানে, যদি বুঝতে পারে এখানে মানুষ লুকিয়ে আছে তাহলে ব্রাশফায়ার করে মারবে। যেমনভাবে কিছুক্ষণ আগে এই গাড়ি থেকে মিলিটারিরা গুলি করে মেরেছে কয়েকটা মানুষকে। তাদের রক্ত এখনো পড়ছে। সেই সময় থেকে প্রায় একঘণ্টা পার হয়ে গেছে। কেউ একটা টু শব্দ পর্যন্ত করেনি। কামাল অনুসন্ধিৎসু হয়ে ওঠে। বড় রাস্তার ওপর কি হচ্ছে তা দেখার জন্য। কিন্তু কী ভাবে দেখবে! কোথাও তো একটু আলো নেই! সর্বত্র অন্ধকার যেন মৃত্যুস্বয়ং নেমে এসেছে ধরাতে। কামাল সাহস সঞ্চয় করে, পড়ে থাকলে চলবে না। দেখতে হবে কী হচ্ছে আর কী হচ্ছে না। সে হামাগুড়ি দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতেই পুরনো বাড়ির চুন বালির পলেস্তরা খসে পড়ে যায়। সেও প্রায় পড়ে যাচ্ছিল। কোনোমতে সিঁড়ির রেলিংটা ধরে বসে। চুন বালি খসে পড়তেই নিচ থেকে শব্দ ওঠে চাপা কণ্ঠে:

‘কোন বাঙ্গের পুত উপরে উঠতাহে। অই শূয়ারের বাচ্চা নিচে নাইহালায়। জানোয়ারটা কী আমাগো হগলরে মারবার চায়?’

কথাটা কামালের কানে যায়। সে মরিয়া যে কাজে সে নেমেছে তা থেকে সে কোনোভাবেই বিরত হবে না। আস্তে আস্তে করে রেলিং ধরে একধাপ এগিয়ে যায়। মাকড়শার জাল ঘন হয়ে রেলিংটা ঘিরে আছে। কোনোমতে সেই জাল হাত দিয়ে সরিয়ে দেয়। জাল সরাতাই তিন-চারটা চামচিকা মাথার ওপর দিয়ে বেরিয়ে যায়। মনে হয় নিশাচর পাখিরাও সেখানে আস্তানা নিয়েছিল। তাদের নখর তার মাথায় গিয়ে লাগে। কামাল কোনোমতে পিছপা হয় না। আস্তে আস্তে করে চিলে কোঁঠায় গিয়ে ওঠে। চিলে কোঁঠার অনেকটা ধসে গেছে। তবু সে অন্ধকারের মধ্যে একটা দাঁড়ানোর জায়গা খুঁজে নেয়। একটা ঘুলঘুলিও খুঁজে পায়। ঘুলঘুলিটা তার থেকে বেশ উঁচুতে। কিছু একটা দরকার সেই ঘুলঘুলিতে উঠতে। অন্ধকারের মধ্যে সে কিছু একটা হাতড়াতে থাকে। হাতে গিয়ে বাধে কিছু একটা। জিনিসটাকে নরম বলে মনে হয়। চুন-সুড়কির মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দেয়। হ্যাঁচকা টানে খুলে নেয় জিনিসটা। দেখতে পায় একটা ইট। পুরনো ইটটাকে খুলে নিয়ে ঘুলঘুলিটার নিচে পেতে দেয়। ইটটা বিছিয়ে দিয়ে তার ওপর দাঁড়িয়ে পড়ে। দাঁড়িয়ে পড়তেই পায়ের নিচের ইটটা খসে যায়। ঘুলঘুলিটা ধরে ঝুলতে থাকে কোনোমতে। দেয়ালের মধ্যে কুলুঙ্গির মতো কিছু একটা পেয়ে যায়। তার মধ্যে পা ঢুকিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। নিজের অবস্থানকে দৃঢ় করতে পারে বলে নিজের কাছে কিছুটা সন্তু বোধ করে। ইট খসে পড়তেই নিচ থেকে আওয়াজ ওঠে,

‘কুত্তার বাচ্চার কী মরগের সাধ হইচে! খালি খালি উপরে উঠতাচে। নিজেও মরব আমাগোরেও মারব। ওই বাঙ্গের পুত নিচে নামইয়া আয়।’

‘চোপ! একদম চোপ! তা না হলে নিচে নেমে এসে পুতে ফেলব!’ কামাল জবরদস্ত উত্তর দেয়।

বাইরে ফট ফট, ফট ফট করে শব্দ হয় কোথাও। গুড়ম করে আওয়াজ হয় একটু পরেই। মনে হয় মটার বা কামান দাগা হলো। ছড়মুড় করে একটা বাড়ি ভেঙে পড়ে। কান্নাকাটির রোল পড়ে যায়। মেয়েদেরও গলার আওয়াজ ভেসে আসে। ফট ফট করে গুলির আওয়াজ আবার। তারপর সব চুপচাপ, শূনশূন। কোথাও কোনো আওয়াজ নেই। শুধু গাড়ির গো-গো আওয়াজ, ইঞ্জিনের শো-শো শব্দ।

মৃতের মতো পড়ে আছে কামাল এতক্ষণ। একটাও শব্দ করেনি, নড়েনি একটুও। কোনোমতে কুলুঙ্গির ভেতর পা দিয়ে মরার মতো পড়ে ছিল। শব্দটা খিতিয়ে গেলে আবাবো ওপরে ওঠার চেষ্টা করে। ঘুলঘুলি দিয়ে সদর রাস্তার দিকে তাকায়। প্রথমে নজরে আসে না কিছুই। শুধু অন্ধকার। চোখটা কচলিয়ে কুলুঙ্গির ভেতর ঠেসে ধরে আবাব। ডানদিকে তাকায়। চোখে ধরা পড়ে এবার। দেখতে পায় পাকিস্তানি সেনারা রাস্তার মাঝে দাঁড়িয়ে আছে রাইফেল হাতে। একটা জলপাই রঙের গাড়ি তাদের পাশে। গাড়ির আলো আধো করা। ব্লাকআউট করে আছে প্রায়। কয়েকটা মানুষের দেহ রাস্তার মধ্যে জমা করেছে। মরা লাশগুলোকে একতর জায়গায় গাদা করছে একটা সৈনিক। বীভৎস চেহারায় পরিণত হয়েছে তারা। মনে হচ্ছে মানুষ নয়, যান কবচকারী কোনো আজরাইল বা দেও। বাঁশিতে ফুঁ দিতে থাকে হার্মাদরা বারবার। বাঁ-দিকের একটা বাড়িতে আগুন দিয়েছে, এটা ডা. রাব্বানীর বাড়ি কামাল চিনতে পারে। তিনি একজন রাজনীতিক। মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে তার অভিযোগ অজ্ঞানকাল থেকেই। ব্রিটিশ আমল থেকে মুসলিম লীগের রাজনীতিতে তার বিশ্বাস ছিল না। আর এখন তার জানকসম তবু পাকিস্তানের সমর্থক হবে না। বাঙালির অধিকারের ব্যাপারে কোনো ছাড় দেয়নি আর দেবেও না কখনো।

তার পাশের বাড়ি ললিত মোহন বোসের। এক সময় কংগ্রেস করত। কলকাতার সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিল। কলকাতার কংগ্রেসী নেতারা প্রায়ই তার বাড়িতে এসে থাকত। খাওয়া-দাওয়া করত। ললিত মোহন ভারতে চলে গেলে বাড়িটা পরিত্যক্ত থাকে। কেউ বাস করে না এখানে। এমনি এমনি বাড়িটি পড়ে আছে। সরকার ‘এনিমি প্রপার্টি’ করায় এখন সরকারি অধিগৃহীত বাড়ি হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে।

কামাল বাড়িটার দিকে তাকিয়ে চিনতে পারে। মনে মনে ভাবে তাদের বাড়ির কী অবস্থা? তার মা কেমন আছে? একটা অজানা শঙ্কা তার ভেতর বেজে ওঠে, তার মা বেঁচে আছে তো? নাকি পাকিস্তানিরা তার মাকে মেরে ফেলেছে! রাত কটা বাজে বুঝতে পারে না। সারারাত ধরে শঙ্কায় কাটিয়েছে। কোনো দানাপানি পেটে পড়েনি। পাকিস্তানিরা আক্রমণ করবে এই ভয়ে

বাড়ি থেকে পালিয়েছিল। যাওয়ার সময় মাকে বলে যায়,
'আমি চললাম মা। কোথায় যাব জানি না। বেঁচে থাকলে আবার দেখা হবে।'

আঁচল দিয়ে চোখের জল মোছে মা তার। একমাত্র সন্তান তাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে। সে নিজেও জানে না তার কপালে কি আছে। তার স্বামীও পাকিস্তানি শাসকদের কোনোদিন পছন্দ করেনি। তাদের অপশাসনের বিরুদ্ধে সক্রিয় ছিল সর্বদা। সর্বদা ছিল উচ্চকণ্ঠ। সেই থেকে তারাও পাকিস্তানকে সমর্থন করতে পারেনি।

ভালোবাসতে পারেনি তাদের ক্রিয়াকলাপ। তাদের বাড়ি ছিল পাড়ার মধ্যে চিহ্নিত। আওয়ামী লীগের সমর্থক বলে জানত। কামাল রাত শুরুর আগে বাড়ি থেকে বের হয়ে যায়। বুঝতে পারে তাদের বিরুদ্ধে নালিশ করে হত্যার লিষ্টে আনবে।

রাত ১২টার দিকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর একটা গাড়ি হু-হু করতে করতে তাদের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ায়। গাড়ি থেকে সেনারা দ্রুত নামতে থাকে। নেমেই তাদের বাড়ির দরজায় কড়া নাড়ে।

'ম্যাকানসে কয়ী হ্যায়?' পাকিস্তানি সেনাদের জবরদস্তি।

কোনো শব্দ নেই। মৃত্যু নীরবতা। রাবেয়া খাতুন গাড়ি আর কড়া নাড়ার শব্দ থেকে বুঝতে পারে যমদূতরা সদর দরজায়। দ্রুত দোতারা থেকে নিচে নেমে আসে। তারপর বাড়ির পিছন দিকের গেট খুলে বেরিয়ে যায়। পিছনের দিকে একটা খাটা পায়খানা আছে। বিষ্ঠা ধরার জন্য পায়খানার তলায় একটা চাঁড়ি আছে। বকশিবাজারের অনেকেই সেই পায়খানায় যায়। পায়খানার চারদিক ঘেরা আর আবর্জনায় ভর্তি। কারা বানিয়েছিল এই পায়খানা তার হিসাব কেউ জানে না। অতি পুরনো ছাদ আর গা থেকে পলস্তুরা খসে পড়েছে।

সেই পায়খানায় আশ্রয় নেয় রাবেয়া। পায়খানার চাঁড়ির কাছে পালিয়ে থাকে। দোয়া পড়ে বারবার করে, আল্লার নাম স্মরণ করে। কড়া নাড়ার শব্দ হয় আরো জোরে। কোনো উত্তর না পেয়ে বুট জুতো দিয়ে লাথি মারতে থাকে। সেই সঙ্গে চলে রাইফেলের বাঁটের আঘাত। দরজা ভেঙে পড়ে কিছুক্ষণের মধ্যে। ভাঙা দরজার মাঝ দিয়ে পাকিস্তানিরা আবারো বলে ওঠে,

'ম্যাকানসে কয়ী হ্যায়? কয়ী ইনসান হ্যায়?

আওয়ামী লীগার হ্যায়? বাহারমে আযাও।

তোমারা যান কবচ করেন কে লিয়ে হাম খাঁড়া হ্যায়। হিম্মতওয়ালা হো তে বাহার আ যাও।' জবাব আসে না। দ্বিতল বাড়িতে মরুর নিশ্চকতা।

যে ছিল সে পালিয়ে প্রাণ রক্ষার চেষ্টা করে।

মিলিটারিরা দ্রুত বাড়ির ভেতর প্রবেশ করে

ঘরগুলো অনুসন্ধান করতে থাকে কেউ আছে কিনা। কাউকে না পেয়ে দোতালয় উঠে যায়।

কিন্তু কাউকে খুঁজে পায় না। সারা বাড়ি তহনছ করে ফেলে। সমস্ত কিছু উলট-পালট করে দেয়।

ক্ষণিকের মাঝে বাড়িটা ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়।

কাউকে না পেয়ে পিছনের দিকে চলে যায়। দেখে

একটা দরজা পেছনের দিকে হাট করে খোলা।

খোলা দরজা দেখতে পেয়ে পাকিস্তানিরা বলে,

'দুশমন ভাগ গ্যোয়া।'

আর একজন সেনা বলে, 'হাম উসকো ছাড়েগা নেহি।' বলে পিছনের দরজা দিয়ে পার হয়ে যায়।

পায়খানার সামনে এসে দাঁড়ায় কিন্তু আর পেছনে যেতে পারে না। একটা দুর্গন্ধ নাকে এসে লাগে। তাড়াতাড়ি সে জায়গা ত্যাগ করে চলে আসে।

রাবেয়া নিঃশ্বাস ফেলে। আর একটু পিছিয়ে এলেই তো জীবন দিতে হতো। আল্লাহ সহায়, তিনিই তার জীবন রক্ষা করেছেন।

একজন সেনার মুখ থেকে শিসার লেলিহান

বেরিয়ে আসে, 'আগ লাগা দো।'

গানপাউন্ডার দিয়ে বকশিবাজারের দ্বিতল বাড়িতে

আগুন লাগিয়ে দেয় সেনারা। দ্রুত সে আগুন

ছাড়িয়ে পড়ে সারাবাড়িতে। দাউদাউ করে জ্বলে

ওঠে। পুড়তে থাকে বাড়ি। মুহূর্তের মধ্যে পুড়ে

ছাড়খার হয়ে যায় বাড়ির জিনিস। বলতে গেলে

কিছুই থাকে না। আগুনের লেলিহান যখন

চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে তখন পাকিস্তানি সেনারা

দ্রুত গাড়িতে গিয়ে ওঠে। ড্রাইভার গাড়ি চালিয়ে

দেয়। সৈনিকরা আগুনের শিখার দিকে তাকিয়ে

দেখে শিখাটা কত উপরে উঠেছে। আগুনের

লেলিহানে তাদের হাসি আরো কুৎসিত হয়।

ভাবে এই হত্যাজ্ঞা বাঙালির স্বাধীনতাকে নস্যাৎ

করে দেবে— কোনোদিন স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখবে

না।

রাত ভোর হয়ে এলে রাবেয়া খাতুন পায়খানার

ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে। বাড়ির ভেতর গিয়ে

দেখে সমস্ত কিছু পুড়ে শেষ। বলতে গেলে কিছুই

অবশিষ্ট নেই। ধ্বংসস্তুপের মধ্যে দেখতে পায়

তাদের বিবাহের সময়কার ছবি যে ছবিতে সে

আর তার নববিবাহিত স্বামী পাশাপাশি বসে

আছে। সেই ছবিটাই আধপোড়া অবস্থায়

ধ্বংসস্তুপের মাঝে রক্ষা পেয়েছে। আস্তে আস্তে

করে রাবেয়া সেই ছবিটিকে টেনে বার করে

আঁচল বোলায়। টপটপ করে পড়তে থাকে

চোখের জল। এক ফোঁটা গিয়ে পড়ে সেই ছবির

ওপর।

সিক্ত ছবি হাতে দাঁড়িয়ে আছে রাবেয়া খাতুন।

এখনো দু-এক জায়গা থেকে আগুনের শিখা

উঠছে। সেখান থেকে একটা পোড়া গন্ধ আসছে।

রাবেয়া খাতুন বিষন্ন মনে সবকিছু দেখতে

থাকে। চারদিকে শুধু ধ্বংস আর বিভীষিকা। ক্ষুদ্র

ক্ষুদ্র চিন্তা আর ভয় মিশ্রিত উদ্বেগ

ক্রমশঃ বৃহৎ হয়ে বটবৃক্ষের আকার ধারণ করে।

যে চিন্তা আর বিহ্বলতা তার কাছে ছিল

কূহেলিকা তা এখন বাস্তব হয়ে ধরা দিয়েছে।

ছবিটা হাতে নিয়ে চিন্তা করতে থাকে। এক সময়

চিন্তারা বহুধা হয়ে ঘুরতে ঘুরতে একটা জায়গায়

গিয়ে স্থির হয়। সেই স্থির হয়ে থাকা চিন্তা

সন্তানের ওপর ভর করে। সন্তানের চিন্তায় দেহের

ভেতর কাঁপন তোলে। যে হত্যা, সন্তান আর

অগ্নিসংযোগ দেখেছে তাতে তার চিন্তা ভালো

পথে যায় না। ভাবে বেঁচে আছে তো? নাকি সেও

অন্যদের মতো মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে? চলে

গেছে প্রকৃতির কোলে চিরতরে? হারিয়ে গেছে

পৃথিবীর স্থায়ী সুরক্ষার গর্ভে? আস্তে আস্তে করে

কামাল এক সময় মায়ের পেছনে গিয়ে দাঁড়ায়।

দেখতে পায় মা তার দক্ষ বাড়ির মধ্যে নির্জনে

একা ধ্বংসস্তুপের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। চুল

বিস্তৃত, আঁচল খসে আছে। মনে হচ্ছে মৃত্যু এই বাড়িতে হানা দিয়েছিল। জানালা দরজা থেকে পোড়া কাঠের গন্ধ আসছে। মেঝেতে ছড়িয়ে আছে পোড়া কাগজাদি। এই পরিবেশের মধ্যে মা তার দাঁড়িয়ে আছে একটা অর্ধদক্ষ ছবি নিয়ে।

ছবিটার দিকে তাকাতাই দেখতে পায় তার বাপ-মায়ের ছবি। যে ছবিটা টাঙানো ছিল দেয়ালে। তার বাপ-মায়ের বিবাহের সময়ের। জনের পর থেকে সে দেখে আসছে এই ছবিটা টাঙানো দেয়ালে। কতবার পুলকিত হয়েছে এই ছবি দেখে। আনন্দিত হয়েছে বারবার। বাপ-মায়ের তারুণ্যের ছবি। পারিবারিক জীবনের মিলনের ছবি। সেই ছবি হাতে নিয়ে মা তার দাঁড়িয়ে আছে। দেখতে পায় ছবিটা সিক্ত। বুঝতে পারে মায়ের চোখের জল পড়েছে সেই ছবির ওপর।

ছবি থেকে মুখ তুলে রাবেয়া খাতুন পেছনের দিকে মুখ ফেরায়। দেখতে পায় আআজকে, নিজের সন্তানকে। ছবিটা হাতে নিয়েই রাবেয়া খাতুন জড়িয়ে ধরে নিজের সন্তানকে। সন্তানও মাকে জড়িয়ে ধরে পরম আস্থায় এবং বিশ্বাসে।

যে চরম বিপদের ভেতর থেকে তারা নিজেদের রক্ষা করেছে সে কথা ভাবতেই তাদের শঙ্কায় বুকটা কঁপে ওঠে, মুহূর্তেই তারা হয়ে পড়ে আচ্ছন্ন। দুজনেরই চোখে জল। সেই জল টপটপ করে পড়তে থাকে, ভিজিয়ে দেয় একে অপরকে।

নিজের সন্তানকে কাছে পেয়ে রাবেয়া খাতুন তার স্বস্তি ফিরে পায়। এই সন্তান ছাড়া তার আর কেউ নেই। যে ছিল সে তো চলে গেছে। দেখতে পায় পৃথিবীর সমস্ত দায় ছিল।

কোনো শঙ্কা নেই, কোনো আনন্দ নেই, কোনো মৃত্যু চিন্তা নেই, কোনো সংগ্রাম নেই। সে এসবের উর্ধ্বে, দায়িত্বের বাইরে। তাকেই এখন সমস্ত কিছুর দায় ও দায়িত্ব বয়ে নিয়ে বেড়াতে হচ্ছে। তার একমাত্র সন্তানের নিরাপত্তা বিধানের কোনো ব্যবস্থা নেই এমনকি সে নিজেও তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে ব্যর্থ হয়েছে।

মা হয়ে সে সন্তানের কী নিরাপত্তা দিয়েছে? পরেছে কী তাকে বুকের মধ্যে আগলে রাখতে? যদি গতকাল রাতে পাকমিলিটারিরা তাকে মেরে ফেলত তাহলে তার কী করার ছিল? কিছুই করতে পারত না।

জানতেও পারত না তার সন্তান মারা গেছে। হারিয়ে গেছে চিরতরে এই পৃথিবীর বুক থেকে। সন্তান হারানোর বেদনা নিয়ে তাকে এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে হতো চিরকাল।

বা নিজেও হয়তো টিকে থাকতে পারত কিনা তারও ছিল না কোনো নিশ্চয়তা। স্বামী নেই, সন্তান নেই তাহলে কিসের লোভে সে বেঁচে থাকত এই পৃথিবীতে? শুধু স্মৃতি নিয়ে বেঁচে থাকা কী যায় চিরকাল? চলে কী জীবন একাকী মৃতের মতো? যে জীবনে কোনো সুখ নেই, আনন্দ নেই, বেদনা নেই, সংগ্রাম করার মতো সাহস নেই। সেই জীবন চলে কী করে, না চালানো যায়? সেই জীবন সে কোনো মতেই

চালতে পারত না। সন্তানকে পেয়ে তার সাহস ফিরে আসে। মাতৃত্ব জাগ্রত হয়। এই বোধ তার ভেতর ক্রিয়াশীল হয়, না তার সন্তান তার কাছে আছে। সে একা নয়, তার কেউ না কেউ আছে নিজের। কামাল তার মাকে ফিরে পেয়ে তার সবকিছু আছে এই সন্তান্নয় ভরে ওঠে। প্রাণপূর্ণ

হয় হৃদয়। অস্তিত্ব ফিরে পায় নিজের। আত্মবান হয়ে ওঠে নিজের প্রতি। সেও ছাড়তে চায় না নিজের মাকে। বাড়ি পুড়েছে পুড়ুক, সম্পদ হারিয়ে গেছে যাক, কিন্তু মা হারালে সে বাঁচত কি নিয়ে! তার সবকিছু হারিয়ে যেত। কিছুই তার থাকত না। সে হয়ে পড়ত নিঃশ্ব, রিক্ত। মায়ের কাছ থেকে বাপ-মায়ের ছবিটা নিয়ে সেদিকে তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ। দেখে সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা পেয়েছে ছবিটা। ‘সবকিছু শেষ-রে কামাল,’ রাবেয়া খাতুন জড়িয়ে থাকতেই সন্তানের উদ্দেশ্যে হতাশা নিয়ে বলে। ‘তুই চলে যাওয়ার পর পাকিস্তানিরা আমাদের বাড়ির সামনে এসে হাজির হয়। পাকিস্তানিরা গাড়ি থেকে নেমে দরজায় লাথি মারতে থাকে। আমি তাদের দেখে ভয়ে পিছনের দরজা খুলে বেরিয়ে যাই। আশপাশে কোথাও জায়গা না পেয়ে বকশিবাজারের যে পায়খানাটায় সবাই যায় সে পায়খানার পিছনে চাড়ির কাছে গিয়ে পালাই। দুর্গন্ধে বমি উঠে আসে। শ্বাস শূন্যে গিয়ে ওঠে। কিন্তু কিছু করার নেই। আস্তে করে নাকটা আঁচল চাপা দেই। দরজার ভেতর দিয়ে পাকিস্তানিরা চলে আসে, অস্ত্র উচিয়ে নিয়ে। এদিক-ওদিক তাকায়, কাউকে না পেয়ে পিছনের দরজা খোলা দেখে দরজার চৌকাঠ মাড়ায় কিন্তু পায়খানা দেখে আর পিছনে এগিয়ে আসে না। কাউকে দেখতে না পেয়ে চলে যায়।’

‘পুড়ল কী করে?’ কামাল তার মায়ের কাছে জানতে চায়।

‘বাড়িতে কাউকে দেখতে পায় না সৈনিকরা। কাউকে না পেয়ে একজন সৈনিক বলে ওঠে, ‘আগ লাগা দো।’ কথাটা আমার কানে আসে। ভয়ে শিউরে উঠি আমি। ডুকরে কেঁদে উঠি আগুন দেয়ার কথা শুনে। ধৈর্য মানতে চায় না। মৃত্যুর ভয়ে নিঃসার হয়ে পড়ে থাকি। মুখ দিয়ে কোনো কথা বের হয় না। জিস্কাটা যেন খেজুরের কাঁটা দিয়ে টাগরার সঙ্গে আটকানো। এরপর সেনারা জেরিকেন থেকে পেট্রল ঘরের মেঝেতে ঢালতে থাকে। পেট্রল ঢালার শব্দ শুনতে পাই। ছলাং ছলাং। ছলাং ছলাং মেঝে আর দরজা জানালায়। দরজা জানালায় ঢেলে দেয় তারপর গানপাউডার দিয়ে তাতে আগুন লাগিয়ে দেয়। মুহূর্তের মধ্যে দাঁউ দাঁউ করে আগুন জ্বলে ওঠে। পুড়তে থাকে আমাদের সবকিছু। সারাজীবনের সংগৃহীত জিনিস আর মালামাল। ভোর হওয়ার আগেই বাড়ি পুড়ে ভস্মীভূত হয়ে যায়। বাড়ির সবকিছু পুড়ে শেষ হয়ে যায়। কিছুই রেহাই পায় না।’

‘জানলা দরজাও রেহাই পায়নি। আধ-পোড়া অবস্থায় আছে।’

‘তোমার বাবার বইপত্র আর পুরনো জিনিস যা আমরা সযত্নে রেখে দিয়েছিলাম তা সব পুড়ে গেছে। কিছুই নেই। দুশমনদের সহিংসতায় এবং আগ্রাসনে আমাদের সঞ্চিত এবং লালিত সবকিছুই হারিয়ে গেছে। আমাদের স্মৃতি ছাড়া আর কোনো সম্পদ রইল না। হারিয়ে গেল সমস্ত সঞ্চয় আর সম্পদ।’

‘তবু তুমি মা বেঁচে আছ এই আমার সম্পদ। এই আমার পরিচয়, এই আমার সঞ্চয়।’

‘তোকে হারালে আমিও আর বাঁচতাম না রে

কামাল! কি নিয়ে আমি বাঁচতাম বল? তুই ছাড়া আমার কী আর কেউ আছে? তোমার চিন্তায় সারারাত পার করেছি। তুই কোথায় আছিস কেমন করে আছিস।’

ছেলে কামাল অসহায় হয়ে পড়ে ঝরা পাখির মতো। পাখি যেমন ঝড়ের প্রগলভতায় ডানা ভেঙে আছড়ে পড়ে মাটিতে- ভীত ভাব নিয়ে পৃথিবীর কোল ছুঁয়ে সবকিছুকে দেখে... যে দেখার ভেতর তার অসহায়ত্বের ভাবটা বেশি তেমনি করে সে তার অসহায়ত্বের মাত্রাকে কিছুতেই নিজের অধিকারে নিতে পারে না...তার হাতের মুঠি খিলানের মতো আলগা হয়ে যায় ... সে কিছুতেই তাদের মানাতে পারছে না। কামাল অত্যন্ত ভীত হয়ে বলে,

‘আমি এক হিন্দু পরিত্যক্ত বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নেই। বাড়িটা বড় রাস্তা থেকে বেশ খানিকটা ভেতরে। বহুদিন হয় বাড়ির ভেতরে কেউ থাকে না। বাড়িটা পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে ছিল। অনেক মানুষ গিয়ে সেই বাড়িতে আশ্রয় নেয়। মিলিটারিরা এই বাড়ির সামনে দিয়ে ঘুরে যায় কিন্তু পরিত্যক্ত আর বন জঙ্গলে ঢেকে গেছে বলে বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করে না। ভয়ে আমরা কাঠ হয়ে যাই। যদি ওই বাড়িতে মিলিটারিরা ঢুকত তাহলে কমপক্ষে পনের জনকে হত্যা করতে পারত। আমাদের কপাল ভালো যে তারা আমাদের সন্ধান পায়নি। আমি ওই পুরনো বাড়ির চিলেকোঠায় উঠে ঘুলঘুলি দিয়ে দেখার চেষ্টা করি পাকিস্তানিরা কোথায় আছে। দেখি বড় রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে। ভয়ে আমার প্রাণটা বেরিয়ে যায়। কিন্তু সাহস নিয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকলাম। সকাল হলে আমরা সবাই ওই বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছি।’

‘তোকে পেয়ে আমার সবকিছু হারানোর ব্যথা ভুলে গেছি। সবকিছু হারিয়ে তোকে পেয়েছি, এই আমার ষোলোআনা, এই আমার রক্ষিত ধন।’

মা আর ছেলে পুড়ে যাওয়া বাড়ির ধ্বংসস্তূপ পরিষ্কার করতে লেগে যায়। কয়েক যুগের মালামাল পুড়ে ছাই। সেই ছাই ফেলা কী মুহূর্তের কাজ। একতলা আর দোতলার জিনিস। একতলায় পাঁচটি ঘর আর দোতলায় চারটি ঘর। মোট নয়টি ঘর আর তাদের জিনিসপত্র। কত যে ক্ষতি হয়েছে তা হিসাব মেলার নয়। সে হিসাব কখনো মিলবে না। রফিক সাহেব, কামালের বাবা বহু দেশ-বিদেশ ঘুরেছেন চাকরি করেছেন। দেশ-বিদেশ থেকে সংগৃহীত মালামাল এনে বাড়ি সাজিয়েছেন। তিলে তিলে গড়ে তুলেছেন তার নিজের বাড়ি পছন্দমতো এবং পছন্দনীয় মালামাল দিয়ে। জানালা দরজা বানিয়েছেন সব দামি কাঠ দিয়ে। সেই সমস্ত কাঠ পুড়ে গিয়ে ছাই হয়েছে। কিছু কিছু জায়গায় আগুন এখনো জ্বলছে, তার থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে।

‘কিছুই তো খুঁজে পাচ্ছি না আগুন নেভানোর জন্য।’

‘পেছনের দিকে গিয়ে দেখত কিছু পাস কিনা। আগুনটা নেভাতে না পারলে যা আছে তাও থাকবে না। সবটা পুড়ে যাবে। আর আমরা থাকব কোথায়?’

‘আচ্ছা দেখছি।’

‘ভালো করে খুঁজে দেখ।’

‘পেছনটায় খুঁজে দেখ। কিছু পাস কিনা।’

কামাল পেছনের বাগানের দিকে ফিরে যায়। দেখতে পায় মাটির কলসি জাতীয় কিছু। ফেলে দিয়েছিল সংসারের আবর্জনা হিসেবে। কাজে লাগবে না বলে।

‘মা, ভাঙা একটা কলসি পেয়েছি। কুড়িয়ে নিয়ে আসব?’

‘আয়।’

খুঁজে পাওয়া কলসিটা মাকে এনে দেখায় কামাল। রাবেয়া ভাঙা কলসিটা দেখে।

‘এ দিয়েই চলবে।’

‘এখন কি করব?’

‘পাশের বাড়ির কল থেকে পানি নিয়ে আয়।’

‘পানি পাব কোথায়। কোনো ট্যাপ আর বেসিন নেই। আগুনে সব পুড়ে গেছে। আর ওয়াসা পানি বন্ধ করে দিয়েছে। মহল্লায় কোনো পানি নেই।’

‘দেখত পাশের বাড়িতে কোনো কল আছে কিনা।’

কামাল কলসিটা নিয়ে পাশের বাড়িতে যায়। মাটির পাত্র করে পানি সংগ্রহ করে।

উদগিরণরত আগুনে পানি ঢেলে দেয়। আস্তে আস্তে করে অক্লান্ত পরিশ্রমের পর এক সময় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। বাড়ির আগুন স্তিমিত হয়। বাড়ির আগুন স্তিমিত হলেও মনের আগুন স্তিমিত হয় না। বারবার করে উঁকি দিয়ে ওঠে পাকিস্তানিরা কী আবারো আসবে! আবারো কী ধ্বংস করবে বাড়িঘর? আগেরবার তো আগুন দিয়ে পুড়িয়েছে। এবার কী জীবন সংহার করবে? ছিন্নভিন্ন করে ফেলে দেবে তাদের দেহ রাস্তার ওপর। আর সেই দেহ থেকে রেরুনা রক্ত চটে চটে খাবে শ্রাপদ! বারবার করে সেই ভয় উঁকি দিয়ে ওঠে তাদের মনের ভেতর। সারারাত তারা একদানা খাবার গ্রহণ করতে পারেনি। অভুক্ত ছিল সারারাত। পানি পর্যন্ত পায়নি। ঘুমাতে পারেনি পুরোরাতে। ঘুমবে কী করে, পাকিস্তানিদের ভয়ে দুটোখ একত্রে করতে পারেনি।

‘মা, খিদের জ্বালায় তো পেট পুড়ে যাচ্ছে। প্রায় দুই দিন খাই না।’

‘খাবার মতো কোনো জিনিস ঘরে নেই। এক কৌটা চালও নেই যে তা দিয়ে ভাত ফুটিয়ে নেব। সবকিছু পুড়ে ভস্মীভূত হয়ে গেছে।’

‘দেখত বাইরে কোনো দোকান পাস কিনা?’

‘সমস্ত দোকানপাট বন্ধ। কারফিউ চলছে।’

মাটির পাত্র করে আনা জল দুজনে ভাগ করে খায় অবশেষে। পেটের ক্ষুধা নিবৃত্ত করে। তারপর বেরিয়ে পড়ে খাদ্য সংগ্রহের জন্য। কিন্তু খাবার কোথায় পাবে। কোনো দোকান খোলা নেই। খাবার কোথাও মেলে না। কারফিউ চলছে। সমস্ত দোকানপাট বন্ধ। মহল্লার মধ্যে ধ্বংস আর আগুন। কোন কোন বাড়ি এখনো জ্বলছে। মৃতদেহ সব রাস্তার মধ্যে পড়ে আছে। সংকার করার কেউ নেই। যারা নিজ আত্মীয়দের চিনতে পারছে তারা মৃত লাশ নিয়ে গিয়ে যে রকম পারছে সেভাবে সংকার করছে।

কামাল ঘুরতে ঘুরতে পেয়ে যায় খাবারের দোকান এক। কোনো মতে ঝাঁপটা নিচু করে আছে। ভূতের মতো দ্রুত দোকানের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। দ্রুত দোকানিকে বলে। সবার চোখে মুখে শুধু ভয়ের চিহ্ন।

‘ভাই ভাত আছে?’ দোকানিকে জিজ্ঞাসা করে কামাল।
‘শুধু পরোটা আর ডিম। এ ছাড়া আর কোনো খাবার নেই। যদি নিতে চান দ্রুত বলতে হবে। এখনই দোকান বন্ধ করে দেব। মহল্লায় কোনো দোকান নেই। শুধু মানুষকে বাঁচানোর জন্য দোকান খুলেছি।’

‘দেন।’ কোনো কিছু পাবে না বিধায় দোকানির প্রস্তাবে রাজি হয়ে যায়।

যে যার মতো পারছে কিনি নিয়ে চলে যাচ্ছে। একটা ভয় সব সময় কাজ করছে পাকিস্তানি মিলিটারি আবার কখন এসে হানা দেয়! ধরে নিয়ে মেরে ফেলে। কামাল খাবার কিনে নিয়ে বাড়িতে আসে।

‘খাবার কিনে নিয়ে তো এলাম কিন্তু খাব কিসে করে?’

‘খালা-বাসন তো তেমন নেই। দেখি কিছু আছে কিনা।’

একটা টিনের খালা আধোপোড়া অবস্থায় বেঁচে গেছে। সেই খালাটা ধুয়ে তাতে খেতে দেয় কামালকে।

‘এতে করেই খা।’ কামাল খেতে থাকলে, রাবেয়া খাতুন তার ছেলে কামালের উদ্দেশ্যে বলে,

‘তোকে না ২৫ মার্চের আগের রাতে বলেছিলাম পাকিস্তানিরা ছাড়বে না। শেষ শক্তি দিয়ে তারা পাকিস্তান রক্ষা করার চেষ্টা করবে। কেউ চায় না তার দেশ ভেঙে যাক, যে জমি বা অংশ থেকে আয় আসে বা শোষণ করতে পারে তা কখনো মানুষ ছাড়তে চায় না। আয় আর কর্তৃত্ব পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত। উৎপাদনের সঙ্গে মানুষের রাজনৈতিক সম্পর্ক নিগূড়ভাবে যুক্ত।

উৎপাদনের ওপর নির্ভর করে মানুষের সম্পদ আহরণের বিষয়টি। এই আহরণ থেকেই সৃষ্টি হয় শোষণ। পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ বুঝতে পেরেছে পূর্ব বাংলা একটি উৎপাদননির্ভর অঞ্চল যেখান থেকে আয় নিশ্চিত করা যাবে। সেই আয় থেকে করা যাবে পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নয়ন। ব্যক্তি পর্যায়ে চলবে লুট। তাই তারা পূর্ব পাকিস্তানকে ছাড়বে না। মানুষ মারা যায় যাক কিন্তু দেশ বা জমি কিছুতেই ছাড়বে না। ছাড়তে দেবে না।’

কামাল নিশ্চুপ হয়ে থাকে। মায়ের কথা শুনতে থাকে। মা তার ভালো ছাত্রী ছিল। কলেজে পড়েছে। অর্থনীতি আর সমাজবিজ্ঞানের বিষয়গুলো ভালো করে বুঝে। রাজনৈতিক বিষয়গুলোও তার পরিষ্কার। স্বামীর কাছ থেকেও রাজনীতির এই বিষয়গুলো সে বুঝেছে। কি করে একটি রাষ্ট্র একটি কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্রে পরিণত হয়, কিভাবে সম্পদের সৃষ্টি হয়, কিভাবে সম্পদ মানুষকে প্রোতপ্রধান বা সামন্তপ্রধান বা ভূস্বামীতে পরিণত করে। কীভাবে শোষক আর শোষিতের সৃষ্টি হয়। কিভাবে মানুষ বা এক শ্রেণির মানুষ তাদের কায়মি স্বার্থ রক্ষা করার জন্য ধর্মকে বা সামাজিক ইস্যুগুলোকে কাজে লাগায়। গরিবের ঘরে বা দেশে ধর্ম একটি বিষয়। ধর্মকে নিজ স্বার্থ হাসিলের জন্য এই নেতারা গরিব মানুষের ভেতর ইহলৌকিক আর পারলৌকিক বিষয়গুলোকে এমন স্পর্শকাতর করে তোলে যাতে মানুষ তাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়। পরিবর্তনকে বা মঙ্গলের বিষয়কে মনে করে ধর্মের বিনাশ বা ধর্মহীন

মানুষের বিধান। সেই বিধানকে তারা কিছুতেই মানতে চায় না, কোনোভাবে বুঝতে চায় না। জীবন যাবে তো কোনো পরিবর্তন হবে না। পরিবর্তন করতে দেবে না।

পাকিস্তানের অখণ্ডতার জন্য জীবনকে সর্বস্ব বলে মনে করে অপরপক্ষের জীবন নিতে লাগল পাটকাঠির মতো। ভাঙতে লাগল পাটপট করে। নিজেদের ইচ্ছামতো। অখণ্ডতার নামে। দেশকে রক্ষার কবচ হিসেবে। কিন্তু মানুষ শুধু ধর্মকে আকড়ে থাকে না সে সমাজকে বোঝে, নিজ স্বার্থের বিষয়টি তুল্যমূল্য বিচার করে তার স্বার্থ নির্ধারণ করে। সেই স্বার্থ এমন যে যেখানে বৃহত্তর মানুষের স্বার্থ সংরক্ষিত হয়। সেই বৃহৎ জনগোষ্ঠীর মধ্যে মানুষ আবার হিসাব করে দেখে তার ব্যক্তিক পর্যায়ে স্বার্থ কতখানি রক্ষিত হচ্ছে। সে কী পাবে আর পাবে না। বা তার লাভ-ক্ষতির বিষয়টি। শুধু লাভ-ক্ষতি নয় সে যে-সমাজে বাস করে তার যে জাতিসত্তার বিষয়গুলো রয়েছে তা কতখানি পূরণ হতে পারছে বা কতখানি সংরক্ষিত থাকছে। যদি না থাকে তাহলে কিভাবে থাকবে তার বিষয়টি নিয়ে ভাবতে থাকে। আর সেই ভাবনা থেকেই সে তার প্রত্নতি নেয় কিভাবে রক্ষা করতে হবে। এই রক্ষা করার বিষয় থেকেই হয়ে ওঠে প্রতিবাদী আর সেই সঙ্গে প্রতিরোধী। প্রতিরোধ করার জন্য জীবনকে তখন মনে হয় তুচ্ছ, মূল্যহীন। সমাজের স্বার্থকেই তখন মনে হয় বড়, সমাজের পারস্পরিক সম্পর্কগুলো তখন হয়ে দাঁড়ায় প্রধান আর অগ্রগণ্য।

তিন, রাবেয়া খাতুন আর কামাল পোড়া বাড়ি পরিষ্কার করে সেখানেই থাকার ব্যবস্থা করে। রাতটুকু কাটায়। সিদ্ধান্ত নিতে পারে না কি করবে বা কোথায় যাবে।

কামাল তার মা রাবেয়া খাতুনকে জিজ্ঞাসা করে, ‘কি করব মা এখন? কোনো সিদ্ধান্ত তো নিতে পারছি না।’

‘তাই তো ভাবছি কি করা যায়। তোকে যে কোনো সিদ্ধান্ত দেব তাও তো আমি দিতে পারছি না। আমার হাতে সেই ক্ষমতাও এখন আর নেই।’

‘একবার পাকিস্তানি মিলিটারিরা আমাদের বাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছে। প্রাণ নিয়ে পালিয়ে গিয়ে কোনো মতে বেঁচে গেছি। আবার হলে বেঁচে থাকতে পারব কিনা জানি না।’ বুঝতে পারছি না কী করব বা কোথায় যাব। আর তোকেই বা কী পরামর্শ দেব।’

‘আবারো যে পাকিস্তানিরা আসবে না বা আশপাশের বাড়ি পাকিস্তানি অনুসারীরা যে আমাদের ধরিয়ে দেবে না বা প্রাণ কেড়ে নেবে না তার কোনো নিশ্চয়তা আছে, না আমাদের তা প্রতিরোধ করার মতো কোনো ক্ষমতা আছে?’

‘প্রতিরোধ করা একান্ত দরকার। কিন্তু কীভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলব তা তো বুঝতে পারছি না। এমন কোনো উপায় বা কৌশল দেখছি না যা দিয়ে আমরা স্থানীয়ভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারি। কেউ এ পর্যন্ত জানে না কোথায় গিয়ে এক হতে হবে বা কিভাবে যুদ্ধ পরিচালনা করতে

হবে। যে নির্দেশনা আমরা পেয়েছি তা কোনো কাজে লাগবে না। পাকিস্তানিরা এখন যে প্রত্নতি নিয়ে বাঙালি খতমের পরিকল্পনায় নেমেছে তাকে সামলানো ভীষণ কঠিন।’

‘আমি তো এ মুহূর্তে কোনো পথ দেখছি না। তাতে মনে হচ্ছে পাকিস্তানিদের সামলানো ভীষণ কঠিন ব্যাপার। তারা যে শক্তি নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে নেমেছে তা এই মুহূর্তে অপ্রতিরোধ্য। এই ভয়াল শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর পরিকল্পনা যে আমাদের কখনো ছিল না এমন নয় কিন্তু সেটাকে সম্মিলিতভাবে প্রতিরোধ গড়ে তোলা আমাদের একান্ত দরকার। কিন্তু সমন্বেয়র তো কোনো বিষয় দেখতে পচ্ছি না। আর এখনো পর্যন্ত তা আছে বোধ হয়নি।’

‘কিন্তু আমাদের প্রথম যা দরকার তা হলো নিরাপদ জায়গা, মাথা গোঁজার একটা ঠাই। তারপর একটা সামগ্রিক যুদ্ধের পরিকল্পনা।’ ‘সামগ্রিক পরিকল্পনা নেয়া সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। যারা সমরবিদ বা সমর পরিকল্পনাকারী তারা এই সমস্ত পরিকল্পনা করতে পারে বা সামগ্রিক যুদ্ধের প্রত্নতি নিতে পারে।’

‘কিন্তু বাঙালিদের তো কোনো গুরুত্বপূর্ণ পদে বসতে দেয়নি। যুদ্ধের জন্য দরকার জেনারেল পদমর্যাদার সমর নায়ক বা ওয়ারলর্ডস। তারাই প্রকৃত যুদ্ধের কৌশল বানাতে জানে বা কী করে প্রত্নতি নিতে হয় তার খবর রাখো।’

‘সেটা বুঝেই তো ওরা বাঙালিদের ওই পদমর্যাদায় বসায়নি বা সিদ্ধান্তে থাকতে দেয়নি। যা থাকলে আমাদের এখন কাজে লাগত। আমরা নিজেই নিজেদের পরিকল্পনা করতে পারতাম।’ ‘নিরাপত্তা তো পুরো জাতির দরকার। আমার দরকার তোর দরকার আরো অনেক মানুষের দরকার। কিন্তু এখনো পর্যন্ত আমাদের সে রকম কিছু একটা করতে পেরেছি বলে তো বোধ হয় না।’

‘সেটা ই তো ভাবছি। কি করা যায়। নিরাপত্তা কিভাবে নেয়া যায়। সবাই বলছে ভারতে যাওয়া ছাড়া আর আমাদের উপায় নেই। হিন্দু সম্প্রদায়ের লাখ লাখ মানুষ ভারতে গিয়ে ঠাই নিচ্ছে। শুধু হিন্দুরাই নয়, যারা স্বাধীনতা আনতে চায় সেই সমস্ত মুসলমান ছেলেরাও ভারতে গিয়ে ঠাই নিচ্ছে।’

‘আওয়ামী লীগ ও অন্যান্য দলের বহু নেতা আর মানুষ ইতোমধ্যে পশ্চিম বাংলা, ত্রিপুরা, মেঘালয় বা আসামসহ বহু জায়গায় স্থান নিয়েছে।

সেখানে শিবির গড়ে তুলেছে। বহু মানুষ সেই শিবিরে ঠাই নিয়েছে। তারা সেখানে খাবার পাচ্ছে, চিকিৎসা পাচ্ছে, প্রশিক্ষণও পাচ্ছে।’ বিভিন্ন জায়গায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে, ত্রিপুরা আর আসামেও দিচ্ছে আবার সব থেকে দামি প্রশিক্ষণ দিচ্ছে দেবাদুন থেকে। যারা দেবাদুন থেকে প্রশিক্ষণ পাচ্ছে তারা সব থেকে দামি ট্রেনিংটা পাচ্ছে এবং শ্রেষ্ঠ প্রশিক্ষিত বাহিনী ‘মুজিব বাহিনী’ হিসেবে পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তানি বাহিনীর সঙ্গে মোকাবেলা করছে ভারতীয় বাহিনীর অগ্রবর্তী দল হিসেবে।

‘কিন্তু আমরা এখন কী করব? আমরা যে

সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছি। সেই হামলেটের মহান উক্তির মতো ‘কী হবে আর কী হবে না’ (টু বি অ্যান্ড নট টু বি) তার দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বই হয়তো আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করবে। এই সিদ্ধান্তই আমাদের সঠিক জায়গায় পৌঁছে দেবে। আর দ্বন্দ্বের ভেতর দিয়েই যে সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় সেটাই সঠিক সিদ্ধান্ত— সেটাই শ্রেষ্ঠতম অনুসারিত পথ বা পন্থা। সেই পন্থাই আমাদের জন্য একমাত্র অনুসারিত পথ হবে। সেই পথই আমাদের মুক্তির মন্ত্র— সেই পথই আমাদের অতীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর একমাত্র উপায় আর সহায়।

‘সেই দ্বন্দ্বটা কী?’

‘আমরা কোথাও যাব না।’

‘তাহলে কোথায় হবে আমাদের আস্তানা?’

‘আমরা যেখানে আছি, সেটাই হবে আমাদের আস্তানা।’

‘যদি মৃত্যু আসে।’

‘মৃত্যু জীবনের একটা পরিণতি। সেটা যদি আগে আসে তাকে শ্রদ্ধায় বরণ করে নেব। ভালোবেসে এগিয়ে দেব। তবে এই অবস্থান থেকে একচুলও নড়ব না। এখানে আমরা বসলাম ‘ঠিকানা’ হয়ে। বাঙালি জাতির ‘ঠিকানা’। যে ‘ঠিকানা’ কেউ নিশ্চিহ্ন করার ক্ষমতা রাখে না। আর তা কেউ কখনো পারেনি। আমরা তো হাজার বছরের বাঙালির উত্তরাধিকার। সেই বাঙালিকে কেউ ধ্বংস করতে পারে না। হয়তো অনেকেই সেই সত্যকে নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা নেবে। এই বাঙালির সঙ্গে কত শক ছন গ্রিক আরব ইংরেজ মিশেছে আর মিশবে— এখানেই লীন হয়ে যাবে। এই ‘ঠিকানা’ হবে বাঙালি জাতির ঠিকানা।’ কিন্তু এবার কী জন্য যেন তার মনটা নেচে উঠছে না। বারবার করে কালো হয়ে উঠছে। একটা কুণ্ঠিত রেখা তার কপালের মাঝে ভাঁজ হয়ে আছে। যতই ভাবনাটাকে সে দূরে সরাতে চাইছে— কিছুতেই তা সরাতে পারছে না। তাকে কুরে কুরে খাচ্ছে। অন্ধকারের মাঝে কালো চায়ের দানাগুলো যেমন আরো ঘন-কালো হয়ে দেখা দেয়, তেমনি করে তাকে কুণ্ঠিত করছে। ‘আমরা তাহলে কোথাও নড়ব না। একই জায়গায় বিশেষ করে যে—বাড়িতে বড় হয়েছি সেই বাড়িতেই থেকে যাব। নিজেদের জায়গায় নিজেরা যদি হিমালয় হয়ে না বসি তাহলে আমাদের অস্তিত্বও স্থির হবে না—নিরাপদ হবে না।’

‘তাই আমাদের অস্তিত্বকে নিরাপদ করতে আমাদের এই জায়গায় হিমালয় হয়ে বসতে হবে। যারা স্বাধীনতা চায় আর মহা মুক্তির স্বাদ প্রাণভরে আশ্বাদ নিতে চায় তাদের সাহায্য করতে হবে। তাদের অভয়ের বাণী শোনাতে হবে।’

‘সবাই যদি আমরা আস্তানা ছেড়ে চলে যাই তবে যারা থেকে গেল তাদের কে সাহস দেবে— কে শোনাতে অভয়ের বাণী?’

‘তাই তাদের রক্ষা আর অভয়ের বাণী শোনানোর জন্য আমাদের থেকে যেতে হবে।’

‘আমরা ভারতে অথবা অন্য কোথাও যাব না।

মুক্তিসেনার অভয় আশ্রম হিসেবে আমাদের বাড়ি পরিচিত হবে আর সর্ব ধরনের সাহায্যের জায়গা

হয়ে উঠবে।’

‘আমরা এই স্থানে থেকে তাদের সহায়তা দেব। পরামর্শ দেব, আর দরকার হলে আহা আর বাসস্থানের ব্যবস্থা করব। আমরা যদি তা করতে না পারি তাহলে মুক্তি বাহিনীর জন্য কী করতে পারব? আর আমাদের দরকারটাই বা কী?’ রাবেয়া খাতুন আর কামাল কোথাও পালিয়ে না গিয়ে নিজেদের ধ্বংস হয়ে যাওয়া বাড়িতেই বাস করতে থাকে। কোথায় যাবে আর যেখানে যাবে

সেখানেই তো একই পরিস্থিতি আর একই অবস্থা।

তার থেকে নিজের অবস্থানে পাকা হয়ে বসা এবং সেই অবস্থা থেকে আগামীর প্রত্নতি নেয়া। তাদের মনের মধ্যে যদিও একটা আশঙ্কা থেকে যায় তবু একটা আশার আলো এক চিলতে আগুনের মতো তাদের অন্তরে ভেসে ওঠে। হয়তো একদিন এই চিলতে আগুন আলোকবর্তিকা হয়ে দেখা দেবে। বাঙালি জাতির স্বপ্নের সোপান হয়ে আবির্ভূত হবে।





গল্প

একটি সুইসাইডাল নোট ও কয়েকটি ঘটনা

রুমা মোদক

‘আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়’ প্রচলিত এই কথাটি লিখে সুইসাইডাল নোটটা নিজের লেখা ‘যে জীবনযাপনের’ বইটির ভিতর খুব যত্ন করে রেখে দেয় অনিতা। বেডরুমের আনুষঙ্গিক আসবাবের সঙ্গে একেবারে বেমানান এই রিডিং টেবিলটা প্রায় জোর করেই বেডরুমে রেখে দিয়েছে অনিতা। ওর নিঃসঙ্গ একাকী জীবনের বিশৃঙ্খল সঙ্গী এই টেবিলটা। আকবর চেয়েছিল, রিডিং টেবিলটা রিডিংরুমেই থাকুক। অনিতা বলেছিল, শোনো, আমি মাস্টার বাবার মেয়ে, শোবার ঘরই পড়ার ঘর, পড়ার ঘরই শোবার ঘর। আলাদা করে পড়ার ঘরে গিয়ে ফ্যাশন করে পড়তে আমি পারব না। আকবর কথা বাড়ায়নি— আচ্ছা, আচ্ছা, পড়ুয়া বাবার পড়ুয়া মেয়ে, তাই হবে। এখন টেবিলটা প্রায় খালি, কেবল নিজের লেখা আট-দশটা বই, এরই একটার মধ্যে সুইসাইডাল নোটটা রেখে, পুরো বাসাটা ঘুরে ঘুরে

শেষবারের মতো দেখে নেয় অনিতা। কত অস্মান মধুর স্মৃতি চারপাশে। নিজেদের ফ্ল্যাট হলো, একটা একটা করে সব আসবাব এলো... কোথায় কোনটা থাকবে, ছবিটা এখানে, ওয়ারড্রোবটা ওখানে, দুজনে কত খুনসুটি, ধ্যাৎ এখন এসব সুখস্মৃতি মনে আসছে কেন? বেডরুমে ফিরে নোট রাখা বইটা আবার হাতে নেয় অনিতা। টেবিলে রাখা একই রকম আট-দশটা বইয়ের ভিতরে সুইসাইডাল নোটটা চোখে পড়বে তো কারো? আকবর কিংবা পুলিশ কিংবা অন্য কেউ, যে প্রথম আবিষ্কার করবে, অনিতা মৃত। নিজের বইগুলো রেখে বাকি সব ধীরে ধীরে টেবিল থেকে সরিয়ে ফেলেছে অনিতা গত কদিনে। বইগুলো রিডিংরুমে, বুকশেলফে। নিজের পাণ্ডুলিপিগুলো হতাশ হয়ে, যেগুলো প্রকাশ করার কথা ভাবেইনি অনিতা, সেগুলো আলমিরার তাকে রেখে তালো দিয়েছে। নিজের সৃষ্টিগুলো নিজ হাতে ধ্বংস

করতে পারিনি। ওর মৃত্যুর পর ওরা যা খুশি তাই করল। ‘সুইসাইডাল নোট’ রাখা বইটা পাশে নিয়ে ওষুধগুলো খাওয়ার কথা ভাবে অনিতা। এই বইটা ওর অনেক পরিশ্রমের ফসল। কৈশোর থেকে এই পর্যন্ত জীবনের অভিজ্ঞান দিয়ে সন্তানহীন একাকী নিঃসঙ্গ সময়ে খুব শ্রম দিয়ে লিখেছে সে বইটা। অথচ কোনো প্রকাশক বইটি প্রকাশ করতে রাজি হয়নি। নিজের পয়সায় প্রকাশ করলেও প্রকাশক প্রায়ই ফোন করে তাড়া দেয়— বই কেউ কেনে না। তার গোড়াউনে জায়গা নেই, নিয়ে যাওয়ার জন্য। নিজের সন্তানসম সৃষ্টিকে নিয়ে অপমানটা গিয়ে নয়, হৃদয়ে বিধে শেল হয়ে। আজ অনিতার মৃত্যু হলে কাল হয়তো পত্রিকায় নিউজ হবে। তারপর হয়তো পাঠকরা তার বই সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়বে কিনতে! মনে মনে হাসি পায় অনিতার। যে মেয়ে একটু পরে আত্মহত্যা করবে, তার মনেও ভবিষ্যৎ নিয়ে আশা জাগছে। মরে গেলে ওর বই বিক্রি হলেই কী আর না হলেই কী!

বইটা বিছানার পাশে রাখে অনিতা, ঘড়ির কাঁটা দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। আকবর এখন বেশ রাত করে ফেরে। এই সময়ই সবচেয়ে নিরাপদ। বাক্স খুলে ওষুধগুলো হাতে নেয় অনিতা। আকবর অফিসে চলে গেলে প্রতিদিন দুপুরবেলা বের হয়ে রিস্ক নিয়ে এ দোকান ও দোকান ঘুরে ওষুধের পাতাগুলো জোগাড় করেছে অনিতা। ভাগ্যিস ডাক্তারের একটা প্রেসক্রিপশন ছিল। প্রেসার বেড়ে যাওয়ায় ৬ মাস আগে ডাক্তার এই ঘুমের ওষুধটা লিখে দিয়েছিল। দোকানিরা কি আর ওপরের তারিখ দেখে? কেউ সন্দেহের চোখে তাকায়নি। সপ্তাহজুড়ে ওষুধগুলো সংগ্রহ করেছে অনিতা, সেদিনের পর থেকে যৌদিন চূড়ান্ত সিদ্ধান্তটা নিয়ে সে। মনে হয়েছিল জীবনে কী পেল সে? না সন্তান, না সাহিত্য প্রতিভার মূল্যায়ন, শেষপর্যন্ত আকবর তাকে এভাবে বলল? রাগে, দ্রুত, ক্ষোভে, অভিমানে অনিতার সেই রাতেই গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে পড়তে ইচ্ছা করছিল। তবু সে তা করেনি। ভেবেছিল এ সাময়িক উত্তেজনা। ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু গত সপ্তাহজুড়ে আকবরের ক্রমাগত ঠাণ্ডা ব্যবহার, মেঘ গভীর মুখ, কোনো কথা না বলা, ঘরের গুমোট হাওয়া ওর সব বন্ধনা, হতাশা, অপ্রাপ্তি নিয়ে ওকে আরো জাপটে ধরেছে। ও সিদ্ধান্তে স্থিত হয়েছে। না, এ জীবন আর নয়। ঘটনাটা মনে পড়ে অনিতার। কদিন ধরেই লক্ষ্য করে গভীর রাতে রিডিংরুমে ল্যাপটপের সামনে বসে থাকে আকবর। ওর অফিসের কাজকর্ম, ফেসবুক, ভাইভার, হোয়াটস অ্যাপ, কয়েকটি মেয়ে বন্ধু, সব বন্ধুর মতোই শেয়ার করে আকবর। ভুলেও সন্দেহ হয়নি কোনোদিন। ঘুমাতে আসার পরামর্শ দিতেই ও আকবরকে খোঁজ করছিল এ ঘর ও ঘর। ড্রয়িংরুম ঢুকে হঠাৎ শুনতে পায় আকবর বারান্দার রকিং চেয়ারে বসে ফিসফিসিয়ে কারো সঙ্গে আলাপ করছে। সব কথা বোঝা যায় না। কেবল একটা শব্দ কানে আসে অনিতার ... জান... জান...। পায়ের নিচে পুরো ভিতটা কেঁপে ওঠে তার মুহুর্তে। কী বিশ্রাসই না সে করে আকবরকে। বুকের ভিতরটা খালি হয়ে যায়। বেদরুমে ফিরে আসে অনিতা। একটু পর ঘরে ঢোকে আকবর। কোনো ভিনতা না করে অনিতা জানতে চায়— কার সঙ্গে কথা বলছিলে? আকবরের ভাবলেশহীন মুখ। যেন কিছুই হয়নি— তুমি চিনবে না। বাকবিতণ্ডা বেধে যায়।

—আমি চিনব না, এমন কারো সঙ্গে গভীর রাতে কিসের আলাপ?

— আমি যাদের সঙ্গে কথা বলি সবাইকে তুমি চেন? চিনতে হবে এমন কোনো কথা আছে?

— এক সময় তো চিনতাম।

—এখন সময় বদলেছে।

— কেন বদলেছে? আমি বুড়ো হয়ে গেছি? এখন ফেসবুকের কচি মেয়েগুলোর সময় না? যাদের গল্প করে সারাদিন।

— বাজে বকো না তো। এমনতেই মন-মেজাজ খারাপ। ব্যবসা ছেড়ে দেব।

— ব্যবসার ওপর ঝাড়ছ কেন? বলো আমাকে ছেড়ে দেবে। আমাকে আর ভাললাগছে না?

— কী বলছ আজ-বাজে...।

— আমি খুব বোকা, খুব বোকা আমি... কথা বাড়তে বাড়তে এমন পর্যায়ে যায়, হাড়িচর্যসমেত বেরিয়ে পড়ে পুরো অতীত। বেকার আকবরকে ভালোবেসে বিয়ে করে নিজে চাকরি করে সংসার চালিয়েছে অনেক দিন। চাকরির ওপর লোন নিয়ে আকবরকে ব্যবসা করতে সাহায্য করেছে। আকবরের মায়ের অসুস্থতার সময় চাকরি ছেড়ে বিছানায় পড়ে থাকা শাশুড়ির সেবা করেছে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত। একমাত্র বোনটিকে বিয়ে দিয়েছে। পাড়াজুড়ে ভালো বউয়ের উদাহরণ ছিল অনিতা। আর সবচেয়ে বড় যে আত্মত্যাগ করেছে যেটা করেছে আকবরের স্পার্মে শুক্রাণু নেই, তাই দশ বছর ধরে সন্তান হচ্ছে না ওদের, বিষগ্রন্থে ডাক্তার জানানোর পর অনিতা খুব সহজ স্বাভাবিকভাবেই বিষয়টি গ্রহণ করে। রাতের পর রাত আকবর চোখের পানি ফেলেছে।

বলেছে— তোমার জীবনটা আমি নষ্ট করে দিয়েছি। তুমি আরেকটা বিয়ে করো অনিতা। অনিতাও ঠোট ফুলিয়ে বলেছে— ও সমস্যাটা আমার হলে তুমিও তা করতে বুঝি? সেই আকবর গভীর রাতে অন্য মেয়ের সঙ্গে প্রেমোলাপ করে। বাগড়ার একপর্যায়ে উত্তেজিত হয়ে বলে— এত সন্দেহ থাকলে চলা যাও না। থাকছ কেন আমার সঙ্গে? আর একটাও কথা বলে না অনিতা। এটা বলতে পারল শেষ পর্যন্ত আকবর? এটাই প্রাণ্য ছিল! ভাবতে ভাবতে চোখ দুটো জলে টলমল করে অনিতার। না, আর ভাবনা নয়, অনেক হয়েছে। ওষুধগুলো মোড়ক থেকে খুলতে যাবে এমন সময় কলিং বেলটা বেজে ওঠে। এই অসময়ে কে এলো? কিং... কিং... উপযুপরি বাজতেই থাকে। দরজাটা খুলতে বাধ্য হয় অনিতা। কান্দতে কান্দতে অনিতার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে নিশি। আকবরের বোন।

— ভাবী তুমি তো আমার মা, ভাবী। আমার সন্তানকে বাঁচাও। মাত্র কয়েক মাস হয়েছে নিশির ছেলের।

— কী হয়েছে তোর ছেলের?

— হাসপাতালে ভর্তি করেছি ভাবী। কাল থেকে পায়খানা প্রস্রাব সব বন্ধ। ডাক্তার বলেছে, ইমিডিয়েট অপারেশন লাগবে। আজই ভাবী। নইলে ওকে বাঁচানো যাবে না।

— বলিস কী? আগে বলিসনি কেন আমাকে? চল এফুনি চল।

— অনেক টাকার ব্যাপার ভাবী।

— টাকা নিয়ে ভাবিস না। চল আগে ডাক্তারের সঙ্গে আলাপ করে বিষয়টা বুঝি। কান্দিস না, সব ঠিকঠাক হয়ে যাবে।

শুধু ভ্যানিটি ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে বের হয়ে যায় অনিতা নিশির সঙ্গে, মনেই থাকে না বিছানায় পড়ে থাকা ঘুমের ওষুধগুলো আর ‘সুইসাইডাল নোট’র কথা। সিএনজিতে উঠে আকবরকে ফোন দিতে গিয়ে ওর মনে পড়ে, আজ না ওর আত্মহত্যা করার কথা? পাশে বসা নিশির আকৃতি নয়নে কান্নারত চোখ-দুটোর দিকে তাকিয়ে চিন্তাটাকে আপাতত বেড়ে ফেলে অনিতা। ওর সাতদিন পর মরলেও চলবে, নিশির বাচ্চাটা তো আগে বাঁচুক।

হাসপাতালে ডাক্তার জানায় রোগটার নাম ‘হার্ভস স্ট্র্যাং’ অপারেশন ছাড়া কোনো চিকিৎসা নেই। আর এই বাচ্চাটির যে কমপ্লিকেশন, আজই অপারেশন না করলে বাঁচানো যাবে না।

ফোনের অন্যপ্রান্ত থেকে আকবর জানায়— টাকার জন্য ভেবো না। চিকিৎসার যেন ত্রুটি না হয়। আমি আসছি। বাচ্চাটিকে অপারেশন থিয়েটার থেকে বের করে ডাক্তার জানায়— কোনো চিন্তা নেই। বাচ্চা খুব ভালো আছে। দু-তিনদিন পর বাসায় নিয়ে যেতে পারবেন। তখন নিশি আর নিশির বরের চোখে আনন্দশ্রু দেখে অনিতার মনে হয় এই অশ্রুটুকুর জন্য নিশির এই স্বস্তিটুকু দেখার জন্য হাজার বছর বেঁচে থাকা যায়। ঠিক তখনই বেজে ওঠে অনিতার ফোনটা। ওপ্রান্ত থেকে কেউ একজন জানতে চায়—আপনি অনিতা রহমান বলছেন?

— জি বলছি।

— আপনাকে অভিনন্দন। আপনার ‘যে জীবনযাপন’-এর উপন্যাসটি প্রত্যাশা সাহিত্য পুরস্কার পেয়েছে। যার আর্থিক মূল্যমান ১ লাখ টাকা।

আগামী শুরুর সন্ধ্যা ৭টায় পাবলিক লাইব্রেরি মিলনায়তনে দেশবরেণ্য সাহিত্যিকদের উপস্থিতিতে পুরস্কারটি আপনার হাতে তুলে দেয়া হবে। আনন্দে লাফাতে ইচ্ছা করছিল অনিতার। কিন্তু হাসপাতালের বারান্দায় ব্যাপারটা খুবই বেমানান। পিছন ফিরে আকবরকে সুখবরটা দিতে যাবে, দেখে আকবর ডাক্তারের সঙ্গে আলাপ করতে করতে অনেক দূরে চলে গেছে।

রাতে বাসায় ফিরে খুব ক্লান্ত লাগে, আকবর ওর আগে ফিরে যথারীতি ল্যাপটপ নিয়ে বসে গেছে। এমন একটা খবর ওকে জানানোর আগ্রহটা একেবারেই মরে যায়। কখন চোখ লেগে যায় খেয়াল থাকে না অনিতার। যখন ঘুম ভাঙে তখন গভীর রাত। আকবর তখনো ল্যাপটপ সামনে নিয়ে বসা। অনিতা বুঝতে পারে ওর ইনভলভমেন্টটা এত বেশি যে ওর সঙ্গে আর থাকা সম্ভব নয়। তবু সুখবরটা দেয়ার জন্য টেবিলের পাশে দাঁড়ায়, বলে— আমার বইটা প্রত্যাশা সাহিত্য পুরস্কার পেয়েছে। কোনো উত্তর দেয় না আকবর। একটা কনট্রাক্টেশন পর্যন্ত না। অপমানিত হয়ে চলে আসে অনিতা, তখন আকবর ডাকে— আমার জানকে দেখে যাও। হাত ধরে ল্যাপটপের সামনে দাঁড় করায়। একজন ভদ্রলোক ওপাশ থেকে জানতে চান— কে, ভাবী? আসসালামু আলাইকুম। আমি জানে আলম, আমেরিকা থেকে। সেই ছাত্রজীবন থেকে ওরা আমাকে ‘জান, জান’ বলে ডাকে। সরি ভাবী। আজই আমাদের শিপমেন্টটা ফাইনাল হলো। আমি আর ও নইলে বিরাট লসে পড়ে যেতাম। বেশ কটা রাত আপনার কাছ থেকে নিয়ে নিলাম ওকে।

— ওকে দোস্ত। পরে কথা হবে। ল্যাপটপটা অফ করে দেয় আকবর। অনিতা হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। আকবর অনিতার বই থেকে ‘সুইসাইডাল নোট’টা বের করে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে। ভীষণ বিরত বোধ করে অনিতা। ঘুমের ওষুধের খালি মোড়কগুলো জানালা দিয়ে ছুড়ে ফেলে। অনিতা বুঝতে পারে ওষুধগুলো আগেই সরিয়ে ফেলেছে। তারপর বিছানার ওপর রাখা বিশাল ফুলের তোড়টা, ঘর অন্ধকার থাকার কারণে যা এতক্ষণ চোখেই পড়েনি অনিতার, সেটি এনে তুলে দেয় অনিতার হাতে। বিখ্যাত লেখিকার অখ্যাত স্বামী ... কদিন পরে চিনবে তো আমাকে? অনিতা জল ছলছল চোখে কাঁপিয়ে পড়ে আকবরের বুকে। আকবর শুধু একবার বলে— তুমি আসলেই খুব বোকা মেয়ে।



গল্প

রমণীদের গল্প

মাহবুব আলম

শীতের পড়ন্ত বিকেলে ভাবী আর ননদিনীদের আড্ডায় শিখা মুখ ফসকে বলে ফেলল— ‘জানেন ভাবী, রুম্মার ছোট বোনটা না একটা ছেলের সাথে ভেগে গেছে।’ শিখার কথা শেষ হতে না হতেই একসঙ্গে একগাদা প্রশ্ন। কখন গেছে, কার সঙ্গে গেছে, কোথায় গেছে, কোনো খবর পাওয়া গেছে? প্রশ্নবাণে জর্জরিত শিখা রীতিমতো বিব্রত। কারণ ও আর কিছুই জানে না। গত রাতে শিখা শুধু এতটুকুই শুনেছে, রুম্মার ছোট বোন সোমা একটা ছেলের সঙ্গে ভেগে গেছে। এই নিয়ে ওদের বাড়িতে হলস্থল কাণ্ড হচ্ছে।
‘হলস্থল কি হচ্ছে?’
‘তা জানি না।’
‘তাহলে কি জানিস?’
‘আর কিছু জানি না’
‘ধ্যাৎ তুই একটা গাধা, জিজ্ঞেস করবি না কার

সঙ্গে গেছে? রুম্মার সঙ্গে তোর তো ভালো খাতির, বলতে গেলে বান্ধবী, রুম্মাকে জিজ্ঞেস করবি না। এক কাজ কর— তুই রুম্মাদের বাড়িতে গিয়ে খোঁজ-খবর নিয়ে আয়। আর গিয়ে রুম্মাকে একটু সাহায্য দে, বিপদে মানুষের পাশে দাঁড়াইতে হয়। কথায় বলে বিপদে বন্ধু চেনা যায়।’ এক নিঃশ্বাসে এই কথাগুলো বলে শাকিলা ভাবী উপস্থিত সবার সমর্থন প্রত্যাশা করে সবার দিকে চাইল। ভাবী আর ননদিনারা সবাই শাকিলা ভাবীকে সমর্থন করল। তারপর একে একে সবাই শিখাকে পরামর্শ দিল— রুম্মাকে কি বলতে হবে, কীভাবে সাহায্য দিতে হবে।

শিখা একেবারে সাদাসিধে মেয়ে, মাত্র কলেজের ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে। বেচারী মহাফাঁপরে পড়ল। কারণ ইচ্ছা করলেও শিখা রুম্মাদের বাড়ি যেতে পারবে না। নিষেধ আছে।

আমেনা ভাবী এতক্ষণ নীরবে চুপচাপ সব শূনে যাচ্ছিল। কারণ তিনি ব্যস্ত তার সদ্য বিবাহিতা ননদের চুলের যত্ন ও পরিচর্যা নিয়ে। চুলে তেল দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে ননদের মাথায় উকুন অনুসন্ধান এতই ব্যস্ত ছিল যে এদিকে মনোযোগ দিতে পারেনি। কিন্তু কথায় বলে মেয়ে মানুষ, এ রকম একটা খবর পেয়ে কোনো মেয়ে চুপ থাকতে পারে? তাও আবার আমেনা ভাবীর মতো মহিলা, যে কিনা নিজেকে সবসময় আসরের মধ্যমণি মনে করে। তাই বাধ্য হয়ে তেলের বাটি সরিয়ে দিয়ে বলল— ‘হা হইছে আর দরকার নেই। এবার ঘরে গিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজে নিজে চুলটা আঁচড়ে নে।’

ননদ নিনা উঠে যেতেই আমেনা ভাবী বসার পিড়িটা ঠিকঠাক করে দেয়ালে হেলান দিয়ে আপদমস্তক সবাইকে এক নজর দেখে নিয়ে ধীরস্থিরভাবে বলল— ‘ওর মা-ই তো একটা খানকি। মেয়ে ভালো হবে কী করে? হের মেয়ে ভাগবো নাতো কি হইবো।’

সবার দৃষ্টি এবার আমেনা ভাবীর প্রতি। কারো মুখে কোনো রা নেই। একেবারে পিনপতন নিস্তব্ধতা। এই নিস্তব্ধতা ভেঙে আসরের সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ মতির মা আমেনাকে উদ্দেশ্য করে বলল— ‘কি করে তুই কি কছ। আগে তো কিছু শুনিনি।’

‘শুনবি কেমনে, ওই মাগি খুব সেয়ানা। বহুত সেয়ানা, সুযোগ পাইলেই ভাড়াটে বেটার লগে ফস্টিনস্টি করে। আর পাশের বাড়ির বেয়াই না কে আছে, হের লগে পারলে তো শূয়ে থাকে।’

‘সত্যি’

‘সত্যি না তো কী, আমি একদিন নিজে চোখে দেখছি ওই বেটা খাটের ওপর শূয়ে ঠ্যাং দুলাইতেছে আর ওই মাগি বুকের কাপড় ফালাইয়া সে কী হাসি-তামাশা।’

‘তারপর...’

‘তারপর আর কী? আমারে দেখখা একেবারে চুপ মাইরা গেল। আমি আর কী কমু, দু-চার কথা কইয়া মানে মানে আইসা পড়লাম। তারপর থেকে আমার লগে কত খাতির। দেখা হইলেই যাইতে কয়। কিন্তু এসব আমার একেবারে অপছন্দ। ঘেরা লাগে।’

‘ভাবী আর কি দেখছ?’

‘আর কী দেখুম। কদিন আগে ওদের ভাড়াটের বউটা আইছিল। কইল বাড়ি খুঁজতাকে। ওই বাড়িতে আর থাকব না।’

‘কেন?’

‘কেন আবার কি, বুঝস না। আর ক’দিন থাকলে তো ওই বউটার কপাল পুড়ব।’

‘ভাবী আর যাই কছ। ব্যাটাটা কিন্তু ভারী সুন্দর, হ্যান্ডসাম, একেবারে জোয়ান— তাগড়া’

‘হইছে, হইছে, আমাগো আশপাশে কি জোয়ান তাগড়া কম আছে? না আমাগো রূপ-যৌবন কম। শাকিলা তুই-ই ক ব্যাটাগো সামনে বুকের কাপড় ফালাইয়া দিলে ব্যাটার দেখব, না চোখ বুজা থাকব?’

‘ঠিক কইছ ভাবী, দেখাইলে তো ব্যাটার দেখবই, দেখার জিনিস কেউ না দেইখা পারে?’

এর মধ্যে হঠাৎ করে মতির মা শাকিলাকে জিজ্ঞেস করল— ‘এই তোদের সামনের বাড়িতে একটা নতুন ভাড়াটে আইছে, দেখচস?’

‘দেখুম না ক্যান, দেখছি, কথাও কইছি। বউটা খুব সুন্দর, শিক্ষিত, ফর্সা, লাল টকটকে। একেবারে বোম্বাইয়াদের মতোনা।’

‘আর কী দেখচস?’

‘আর কী দেখুম। একদিন কইল ওর স্বামী চাকরি করে। মতিঝিলে অফিস।’

‘হ বুঝবি। তোর কোনো চোখ নাই। চোখ না থাকলে দেখবি কেমনে?’

ভাবী, শাকিলার কথা বাদ দাও, তুমি কি দেখছ তাই কও, বলল— আমেনা ভাবী।

আমেনা ভাবীর কথায় মতির মা মনে মনে খুব খুশি হলো। বলল— ‘আমার বাপের জন্যে এত বড় দুখ দেখিনি। বলে দুই হাত তুলে হাতের পাঁচ আঙুল ফাঁক করে দেখাল এত বড় দুখ। সবাই থ মেরে গেল।’

‘এত বড় দুখ?’

‘তাইলে আর কইছি কী? এত বড়’ বলে আবারো দু’হাত তুলে অঙ্গভঙ্গি করে হাতের পাঁচ আঙুল ফাঁক করে দেখাল মতির মা।

মতির মা আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু বাদ সাধল একটা কাক। কোথেকে একটা কাক উড়ে এসে দেয়ালের ওপর বসে কা কা শুরুর করল। এই



ঢাকা শহরে এইটা একটা মহা উৎপাত। কাক তাড়াতে আমেনা ভাবী তেড়ে গেল, ভয় পেয়ে কাকটা উড়ে গেল। এ সময় দেয়ালের পাশে পৈপে গাছটার দিকে দৃষ্টি পড়ল আমেনা ভাবীর। দেখল দুটো পৈপেই পাক ধরেছে। গলার দিকে রংটা কী সুন্দর হলুদ হলুদ। ভাবী তার ননদ নিনার নাম ধরে জোরে জোরে ডাকল। নিনা আসতেই বলল— ‘দেখ তোর গাছের পৈপে পাকতাকে। খেয়াল রাখবি কেউ যেন গাছে হাত না দেয়।’ নিনাকে এ নির্দেশ দিয়ে আমেনা ভাবী তার আগের জায়গায় পিড়িতে বসে দেয়ালে হেলান দিয়ে বলল— ‘বড় দুখ নিয়ে এত কথার কী আছে, আমার ভাইয়ের বউটার দুখও বড়। আমার তো ভান্নাগে। জানিস আমি মাঝে মাঝে ভাবীরে বলি— তোর দুখ দেখে হিংসা হয়।’ ও কি বলে জানিস? বলে ‘এই দুখ আছে বলেই তো তোর ভাইকে ঠিক রাখতে পারি। ওর ব্রার সাইজ কত জানিস, ৩৮। তাও টাইট হয়।’

আমেনা ভাবীর কথায় উৎসাহিত হয়ে শাকিলা ভাবী অনেকটা গর্বের সঙ্গে বলল— ‘আমাদের শিখার দুখও কম নয়, দেখ না কত বড় হইছে।’ শিখা লজ্জায় লাল হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে গেল। কিন্তু শাকিলা ভাবী ওর হাত ধরে টেনে বসিয়ে দিয়ে বলল— ‘এতে লজ্জার কী আছে। মেয়েদের বুক দুখ হইব না তো কী হইব। আচ্ছা ঠিক আছে আর বলুম না, তুই বহ।’

এভাবেই মেয়েদের বক্ষ নিয়ে আলোচনার সমাপ্তি ঘটল। ঠিক এ সময় নিনা আসরে যোগ দিল। শীতের বিকালে মিষ্টি রোদে নিজেই একটা চেয়ার নিয়ে যেখানে রোদ পড়ছে সেখানে গিয়ে বসল। নিনার প্রবেশে আসরের সাময়িক ছন্দপতন হলো। নিনা সদ্য বিবাহিতা যুবতী। মাস খানেক হলো বিয়ে হয়েছে। বিয়ের পর গতকাল দ্বিতীয়বারের মতো বাপেরবাড়িতে এসেছে। একা নয়, স্বামীও সঙ্গে এসেছে। স্বামী দুপুরে ভূরিভোজ করে দিবানিন্দ্রায় গেছে। এই সুযোগে নিনা ভাবীদের সঙ্গে আড্ডায় মত্ত হবে— এটাই তো স্বাভাবিক।

নিনা চেয়ার নিয়ে বসতেই সবার দৃষ্টি ওর প্রতি। কারণ অনেক দিন পর এই আসরে ওর উপস্থিতি। তারপর নবরূপে নতুনভাবে উপস্থিতি। এর আগে নিনার উপস্থিতি ছিল একজন শিক্ষিত কুমারী ভরঙ্গী হিসেবে। আর আজ ওর উপস্থিতি বিবাহিতা যুবতী হিসেবে। নিনার চোখে-মুখে, শরীরে, পোশাকে সদ্য বিয়ের চিহ্ন স্পষ্ট। হাতে-পায়ে মেহেন্দি, গলায় নতুন চকচকে স্বর্ণের চেন, হাতে স্বর্ণ ও কাচের চুড়ি, অনামিকায় বাকানো চেউ খেলানো আংটি। কানে লম্বা দুল, পরনের শাড়ি-ব্লাউজও নতুন। এমনকি পায়ের চটি জোড়াও সদ্য কেনা। সব মিলিয়ে আজকের নিনা অন্য এক নিনা। নিনা চেয়ারে বসতেই ওর বড় ভাইয়ের স্ত্রী আমেনা ভাবী, নিনাকে জিজ্ঞেস করল— ‘কিরে তোর চান্দু মিয়া’ ঘুম দিচ্ছে? নিনা ভাবীর দিকে তাকিয়ে মৃদু প্রতিবাদ করে বলল, ভাবী এসব বলো না তো ও শুনলে খুব মাইন্ড করবে।

‘মাইন্ড করবে কেন? চান্দু মিয়া নামটা কি খারাপ? এই শাকিলা তুই ক তো, চান্দু মিয়া নামটা খারাপ?’

শাকিলা কোনো উত্তর না দিয়ে চুপ রইল। শুধু শাকিলা নয়, সবাই চুপ। কারণ সবাই জানে ভাবী

আদর করে এ নামে ডাকে। কিছু বললে হইচই শুরু করে দেবে। অন্য দিকে ভাবীকে সমর্থন দিলে নিনার মনটা খারাপ হয়ে যাবে। শত হলোও নতুন বিয়ে। স্বামীকে নিয়ে ঠাট্টা কার ভালো লাগে? নিনার কথার পর সবাই হঠাৎ করে নীরব হয়ে গেল। আর শাকিলা ভাবী এক দৃষ্টিতে নিনার মুখের দিকে চেয়ে রইল। তারপর বেশ উজ্জ্বলিত কণ্ঠে বলল ‘তোরে খুব সুন্দর লাগতাকে। তুই অনেক সুন্দর হইচস।’ শাকিলা ভাবীর সঙ্গে সবাই একমত হলো। সবাই নিনার সুন্দর হওয়ার প্রশংসা করল। একমাত্র শিখা বাদে। শিখা মুখে কিছু না বললেও ভাব-ভঙ্গিতে বুঝিয়ে দিল ও একমত। এর মধ্যে আমেনা ভাবী শাকিলার কাছে জানতে চাইল শুনলাম শিখার বিয়ের কথা-বার্তা হইতাকে। দেখবি বিয়ে হইলে শিখাও খুব সুন্দর হইব। ওরে খুব সুন্দর লাগব। শিখা কিছু না বলে মাথা নিচু করে রইল। শিখার হাবভাব দেখে মনে হলো দু-একদিনের মধ্যেই বুঝি ওর বিয়ে হয়ে যাবে। আসলে শিখা খুব লাজুক মেয়ে। ও এবার বুদ্ধি করে বলল— ‘কোনো খাওন-দাওন নাই, চা-টাও নাই, খালি মুখে আর কত থাকুম? আমি যাই’ বলে হাঁটা দিল। আমেনা ভাবী বাধা দিয়ে বলল, ‘তুই ঠিকই কইচস। যা ঘরে গিয়ে চুলায় চায়ের পানি চড়া, আমি আইতেছি, আয়া চা বানামু।’ চায়ের প্রসঙ্গ উঠলেও এদিকে কারো মন নেই। সবাই নিনাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে। দেখে মতির মা বলল— ‘নিনা তোর কানের দুলাটা খুব সুন্দর হইছে। এটা কে দিয়েছে রে?’ ‘শাশুড়ি দিয়েছে, কানের দুলা আর গলার চেন’, বলে নিনা হাত দিয়ে উঁচু করে চেনটা দেখাল। ‘বা! খুব সুন্দর, লকেটটা তো সুপার। এত সুন্দর লকেট আমি আগে দেখিনি’ বলল শাকিলা ভাবী। নিনার খুব খুশি খুশি ভাব, ‘বলল সবই শাশুড়ির পছন্দ।’ ‘তোর শাশুড়ির পছন্দ আছে বলতে হবে।’ মতির মা আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল; কিন্তু শাকিলা ভাবী থামিয়ে দিয়ে বলল— ‘নিনা তোরে কেমন আদর করে তা তো কইলি না, ক না কেমনে আদর করে।’ ‘কেমনে আবার? সবাই যেমন করে...’ ‘ধ্যাৎ সবাই কী একরকম? এক একজন এক একরকম করে। উল্টায়ে-পাল্টায়ে কতরকম। আমাদের ভাড়াটিয়ার বড় পোলাটা বিয়ে করছে। বউটারে জিগাইছিলাম কেমন আদর করে। জানিস কি কইছে। কইছে সারারাইত আদর করে। এক্কেবারে ঘুমাইতে দেয় না। চোখে-মুখে, বুকে পাগলের মতো চুমু খায়, পারলে এক্কেবারে চেটে-পুইটা খাইয়া ফালায়। আমারে বউটা কয় কন তো ভাবী সব সময় কি ভাল্লাগে? আমি কী কমু কইছি নতুন নতুন এমন করবই, বাধা দিস না। তয় এইবার তুই ক নিনা তোরে কেমন আদর করে?’ ‘ধ্যাৎ আমি কইতে পারুম না।’ আমেনা ভাবী এবার ফ্লোর নিয়ে বলল ‘না কয়, না কউক। আইজ তো আমাগো বাড়িতেই আছে। ঘেমনেই হোক দেখুম। দেইখা কাল তোরে কমু।’ ‘তুই তো আগের তনই ফাঁস কইরা দিলি। নিনা তো পর্দাপূর্বা ভাল করে দিয়া দেব।’ বলল

শাকিলা ভাবী। ‘তা দিক, কেমনে দেখন লাগে আমি জানি। এই কামে আমি উস্তাদ, তুই দেখতে চাইলে আমার লগে থাকিস। কেন তোর মনে নাই আমরা একবার জানালা দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখছিলাম।’ ‘কি দেখছিলাইরে’ জিজ্ঞেস করল মতির মা। ‘সব দেখছি। আমি তখন বংশালে বাপেরবাড়িতে। আমার লগে শাকিলাও ছিল। হঠাৎ মাঝরাইতে ঘুম ভাঙার পর দেখি পাশের বাড়ির নিচ তলায় কি সুন্দর এক্কেবারে ব্রু ফ্লিমা।’ নিনা এসব শুনে অভ্যস্ত। তাই ভাবীর কথা এক ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে বলল ‘এত সোজা না।’ ‘সোজা কিনা ওইটা পরে দেখুম। এখন ক মানুষটা কেমন?’ ‘খুব ভালো মানুষ। ভালো মানুষ না হইলে কি আমি রাজি হইতাম।’ ‘তা তো ঠিকই, তোর লগে তো আগে থেকেই খাতির ছিল। তয় এইবার ক’ যখন আদর করে তখন কেমন লাগে?’ নিনা এবার লজ্জা পেল, লজ্জায় লাল হয়ে গেল। এমনিতে ওর লাল টকটকে ফর্সা মুখ। তারপর লজ্জা পেলে ও আরো লাল হয়ে যায়। ‘দারুণ না’ ‘হ’ ‘হ’ করস কেন? ক’ না কেমন লাগে?’ ‘কমু পরে কমু’ ‘পরে কেন? এখন ক’, কানে কানে ক’, কেউ হনব না।’ ‘না, এখন কওন যাইব না।’ নিনার অনড় অবস্থা দেখে আমেনা ভাবী স্নেহমাখা কণ্ঠে আদুরে সুরে অনুরোধ করল ‘ভাবীরা শুনতে চায় শুনাইয়া দেনা। শুনাই আফসোস করুক।’ কিন্তু তারপরও নিনা অনড় অটল। নিনা বলল— ‘আইজ না আর একদিন কমু।’ ‘আচ্ছা ঠিক আছে, তোর যখন মন চায় তখন কইস। কিন্তু তোর চান্দুরে দেইখা তো মনে হয় ভাজা মাছটা উল্টাইয়া খাইতে জানে না। কি জানি তোর লগে কি করে। দেইখা তো খুব সেক্সিও মনে হয় না। কী কছ শাকিলা?’ এ কথা শুনে নিনার খুব রাগ হলো। বলল— ‘দেখতে যত গো বেচারাই হোক ও অনেক সেক্সি।’ ‘সত্যি?’ ‘বিশ্বাস না হলে একদিন ভাগ নিয়ে দেখ।’ ‘নিনা, আমারে কিছু ঘাঁটাস না, সত্যি সত্যি একদিন ভাগ নিয়ে নেব। তখন তো মুখ কালা করবি।’ ‘কিছু করুম না, তোর ইচ্ছা হইলে ভাগ নিবি, আমার কী? নন্দের জামাইরে তো অনেক ভাবীই ভাগ নেয়, এ আর নতুন কী!’ ‘হইছে, হইছে, আর বেশি চ্যালেঞ্জ করিস না।’ নন্দ ভাবীর এই কথার মধ্যে মতির মা ঢুকে গেল। ‘মতির মা নিনা কে সাবধান করে দিয়ে বলল— ‘দেখ এসব বলিস না, পুরুষ মানুষেরে বিশ্বাস নেই। তবে এইটা ঠিক তোর পছন্দ আছে। বেশি চালাক-চতুর ভালো না। ওই দেখস না শিউলির কি অবস্থা? কথায় কথায় কী প্রশংসা। ওর স্বামী হেভি হ্যান্ডসাম, হাজারে একটা। এ পাড়ায় নাকি ওর মতো একজনও নেই। শেষে শালির পেট বাজাইয়া দিল। হইল তো কামটা, ওই হ্যান্ডসামে কাম নাই। সাদাসিধে হাবাগোবাই ভাল। ওরা এদিক-ওদিক

তাকায় না, আর সত্যি কথা কী অনেক কামেরও হয়। সাত বছর হইল আমার বিয়ে হইছে। এখানো পাগল কইরা দেয়। সকালে ঘুম থেকে উঠেও শান্তি নেই। পোলাটারে স্কুলে দিয়া আহনের পর আর তর সয় না। মতির মা হয়তো আরো কিছু বলত। কিন্তু বাড়ির মেইন গেটে কড়া নাড়ার শব্দে থেমে গেল। সবার সঙ্গে ওর দৃষ্টিও মেইন গেটের দিকে। নিনা উঠে গিয়ে গেট খুলে দিল। গেট খুলতেই দেখে পাশের বাড়ির সাদামের মা। সাদামের মা গেট দিয়ে বাড়ির ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে জিজ্ঞেস করে— ‘কিরে তোরা দিনের বেলা গেট বন্ধ করে রাখচস কেন?’ নিনা উত্তর দিল ‘ভাবী মহল্লায় কুকুরের উৎপাত বেড়ে গেছে। গেইট খোলা পাইলে ভেতরে ঢুকে যায়।’ ‘হ, এইটা ঠিক কইচস। দে ভালো করে গেইটটা দিয়ে দে’ সাদামের মাকে দেখে আমেনা ভাবীর অনুযোগ এতক্ষণে তোর আহনের সময় হইল? ‘কী করুম ক’, আমার তো আর তোদের মতন ছোট সংসার না। সবার খাওন-দাওন শেষ হইলে বাসন-পোয়ালা ধুয়ে পরিষ্কার করে আইতে হয়।’ ‘কেন তোর শাশুড়ি নাই?’ ‘শাশুড়ির কথা কইস না। ওনি এখন ছোট পোলার বিয়ে দেওনের জন্য মাইয়া দেখা নিয়ে ব্যস্ত। কথা নেই বার্তা নেই খবর পাইলেই ছোটো। কিন্তু কোনো মেয়েই ওনার পছন্দ না।’ ‘আচ্ছা হইছে ভাবী, তুই বহা।’ ‘সাদামের মা একটা জলটোকি নিয়ে আমেনা ভাবীর পাশে গিয়ে বসল। তারপর সবাইকে একনজর দেখে নিয়ে বলল— ‘আইজ আইতেই চাইনি। আবার চিত্তা করলাম, নিনা আইছে মেয়েটারে একটু দেইখা আসি।’ ‘ভালো করছ ভাবী, তয় এই দুপুরে কই মেয়ে দেখতে গেছে?’ ‘দুপুরে কী কছ! নাশতা কইরা শাড়ি পাল্টাইতে যে সময়। এক মিনিটও দেরি করেনি। লক্ষ্মীবাজারে ওনার এক বোন থাকে। হেই বোন খবর দিছে। আর খবর পাইয়া শাশুড়ি ছুট। কিন্তু কোনো লাভ হইব না।’ ‘কেন?’ ‘কেমন লাভ হইব। ওনি লাল টকটকে ফর্সা, সুন্দরী এক্কেরে সিনেমার নায়িকাদের মতো বউ চায়। আবার লগে টাকাও। দুই লাখ টাকা। আমারে কইছে শশুরবাড়িন টাকা নিয়া পোলারে সৌদি আরব পাঠাইব।’ ‘যে না পোলা তারে আবার লাখ টাকা।’ অনেকটা স্বগতোক্তি করল শাকিলা। শাকিলার সঙ্গে আমেনা ভাবী যুক্ত করল— পোলা তো ডাইল (ফেসিডিল) খায়। কাজ-কাম করে না এক্কেরে ভাদাইমা, ওরে কেডা মেয়ে দিব। খুঁজুক, খুঁজি দেখুক। আবার টাকাও চায়! এই কথা বলে আমেনা ভাবী সাদামের মার মুখের দিকে চেয়ে চোখে চোখ রেখে বলল— আসলে তোর শাশুড়িটা একটা লোভী চসমখোর। টাকা ছাড়া কিছু বোঝে না। মাইজা পোলাটার বিয়েতেও টাকা নিছে। তোর কাছেই তো শুনছি, কথা পাকা-পাকির দিন মাছের বাজারের মতন দামাদামি করছে।’

‘হ ভাবী মাইজাটা কেন? আমার বিয়েতেও আমার বাপেরতন ৫০ হাজার টাকা নিচ্ছে।’
 আমেনা ভাবী আর সাদামের মার কথা শুনে মতির মা মন্তব্য করল— ‘ভাবী আমার শাশুড়ি খালি পেঁচাল পাড়ে কিন্তুক এদিক দিয়ে খুব ভালো, চোখের সামনে তো দেখলাম দুই দুইটা পোলের বিয়ে দিল। কোনো টাকা-পয়সা চায়নি। এক পয়সাও নেয়নি। এমন কি খাট-পালঙ্ক, গয়না-গাটি কিছুই চায়নি। শুধু এক কথা কইছে, আপনাগো মেয়েরে আপনারা খুশি হয়ে যা দেবেন দিয়েন। এ নিয়ে আমাদের কোনো কথা নেই।’
 মতির মার কথা শেষ হলে আমেনা ভাবী বলল তুই ঠিক কইচস। ‘তোর শাশুড়ি আসলে ভালো মানুষ, ওর মতন মানুষ হয় না। একটু পেঁচাল পাড়ে, তা পাড়ুক না’ এই কথা বলে সাদামের মারে জিজ্ঞেস করল— তা ভাবী তোমাগো মাইজা বউর খবর কী? হেরে তো একদম দেখি না।
 ওরে কী দেখবা! রূপের দেমাকে হের তো মাটিতে পা পড়ে না। আর সারাক্ষণ হাচা-মিছা মিলাইয়ে বাপেরবাড়ির গল্প। শুনলে মনে হয় নবাববাড়ির মেয়ে। একদিন বাজার না করলে গাল ফুলাইয়া থাকে। কয় এই দিয়ে খাওন যায়? মনে হয় ওর বাপের বাড়িতে সব সময় গোসত-পোলাও হয়। তবে ক’দিন ধরে বেচারির মনটা খারাপ, কথাবার্তা কম কয়। শুনলাম হের ছোট ভাইয়ের বউটা ধরা খাইছে।
 ‘কেমন’ জিজ্ঞেস করল আমেনা ভাবী।
 ‘তুই তো জানস ওর দুই ভাই সৌদি আরবে থাকে। ওইখানতন টাকা পাঠায় আর ওই টাকা দিয়া ওরা ফুটানি করে। চাইনিজ খায়। ঘুইরা বেড়ায়। শুনছি হের ছোট ভাইয়ের বউটা পাড়ার এক পোলের লগে খাতির জমাইছে, কই কই যায়, কদিন আগে হেরা কল্লবাজার গেছিল। ওই পোলাও নাকি ওগো লগে গেছিল।’
 ‘তাতে যাইবই’
 ‘মানে’
 ‘মানে বুঝস না, জোয়ান বউ ফালাইয়া বছরের পর বছর বিদেশ থাকলে...
 বউটার একটা চাহিদা আছে না।’
 এই আলোচনার মাঝে চা-বিস্কুট এলো। শিখা সবার হাতে চায়ের কাপ তুলে দিতেই মহা আয়েশে চুমুক দিয়ে শাকিলা ভাবী বলল— ‘খুব ভালো হইছে। কে বানাইছে, তুই না ভাবী?’
 ‘ভাবী’
 চা খেয়ে মতির মা বলল— ‘আর দেরিকরণ যাইব না। বেলা পড়ে গেছে।’
 ‘কেন এত তাড়াতাড়ি যাওনের কি আছে? ঘরে গিয়ে কী করবি?’
 মতির মার জবাব, ‘রান্দন লাগব। সারাদিন পর খেটে-খেটে আসে। গরম গরম ভাত-তরকারি না দিলে দুদিন পর তো মুখ ফিরাইয়া নিব। ব্যাটাগো কোনো বিশ্বাস নাই।’
 ‘তা কী রাদবি, যে এত তাড়াহুড়া করতচস? আমরাও তো রান্দম। ঘরে নতুন জামাই, আমার তো অনেক কিছু করতে হইব।’
 ‘আচ্ছা ঠিক আছে, আর একটু বইয়া যাই।’ বলে আবার বসে পড়ল মতির মা। এরপর আমেনা ভাবী নানান কথা বলে মতির মারে জিজ্ঞেস করল— ‘তা ভাবী কি রাদবা তা তো কইলা না?’

‘সকালে গরুর মাংস আনাইছিলাম। কসায়ে রাখছি। ওই মাংস ভুনা করমু। আর শূটকি ভর্তা, বেগুন ভাজি করমু। দুপুরের ডাইল আছে। রান্দন লাগব না। গরম করলেই হইব। ওনার আবার গোসত হইলে আর কিছু লাগে না।’
 ‘হ বুঝছি, তয় তুই যা, বলে আমেনা ভাবী শাকিলার দিকে তাকাল, জিজ্ঞেস করল তুইও যাবি?’
 ‘আমি একটু পরে যামু। আমারও রান্দন লাগব। তোরে কইছি না মালার বাপে চিল্লায় গেছে। মেয়েটাও বাড়িত নাই, নানির বাড়িত গেছে। তাই দুপুরে কিছু রান্দিনি। বাসি ভাত-তরকারি যা ছিল ওই দিয়াই খাইছি। রাইতে না রাদলে খামু কী।’
 ‘নিনা তো রাইতে শিখারে দাওয়াত দিছে। ও তো ওর নতুন দুলাভাইয়ের সঙ্গে খাইব। তুই একা মানুষ আবার কি রাদবি, তুই থাক গল্প করি। রাইতে তোরা খাবার পাঠাইয়া দিমুনি।’
 ‘তয় তো ভালাই হয়, ভাবী তোরা হাতের রান্দনের স্বাদই আলাদা। আমি বহুত চেষ্টা করছি ভালো করে রাদতে। কিন্তু তোরা মতন স্বাদ হয় না। ক’ তো তুই কেমনে রান্দস।’
 ‘ইচ্ছা করলেই ভালো রান্দন যায়। আইজ আমার লগে লগে থাক। দেখবি আমি কেমনে কী করি। আমি তো দেইখা দেইখাই-ই শিখছি।’
 ‘আইজ কি করবা ভাবী?’
 ‘বাড়িতে নতুন জামাই, গোসত-পোলাও করমু। সাদা পোলাও আর গরুর মাংসের রেজালা। দুপুরে মুরগির রোস্ট করছিলাম। ওই রোস্ট আছে, গরম কইরা দিমু।’ এ কথা বলে হঠাৎ আমেনা ভাবীর কি মনে হলো শাকিলাকে জিজ্ঞেস করল— তোরা জামাই যে কদিন পর পর চিল্লায় যায় তুই কিছু কস না?’
 ‘কি কসু ভাবী, তুই ক’ কোন কথা শোনে, এক্সারে কথা শোনে না। এবার গেছে, কয়ে গেছে চল্লিশ দিন থাকব। ক’ তো এইটা সহ্য হয়?’
 ‘কি আর করবি সহ্যকরণ লাগব? দেখ এইবার আইলে একটু ভালো করে বোঝা, বুঝব না কেন? ঘরে একটা মেয়ে আছে না, এই ভাবে চিল্লায় গেলে তো ব্যবসা-বাণিজ্য লাটে উঠব। তখন তোরই কি হইব, আর মেয়েটারেই বা কে দেখব? তোরা জন্য খুব দুঃখ হয়।’
 ‘জানস ভাবী শিখারে কি কইছে মালার বাপে? কইছে আর পড়ন লাগব না। ওরে কলেজ যাইতে না করছে। কইছে মেয়ে মানষের আবার এত পড়ালেখার কী আছে। পড়ালেখা কইরা কী করব! হের পর থেইকা আমার মনটা খুব খারাপ, এ জনাই তো একটা ভালো পোলা খুঁজতাই। তাড়াতাড়ি বিয়েশাদি হইলে ও বাঁচা যাইব। নইলে ব্যাটাটা ওরে খুব জ্বালাইব।’
 ‘মন খারাপ করিস না। আল্লাহ আছে না, আল্লাহ-ই একটা ব্যবস্থা করব। একটা কথা আছে— যার কেউ নাই তার আল্লাহ আছে। চল ঘরে যাই। আর একবার চা খেয়ে রান্দন চড়াযু। শত হইলেও ঘরে নতুন জামাই। সময় মতো তো খাওন দিতে হইব। নাইলে মানষে খারাপ কইব। এই বলে আমেনা ভাবী বিকেলের আসর ভেঙে ঘরে গেল। ভাবীর সঙ্গে সঙ্গে শাকিলাও। আর ওদের অনুসরণ করল নিনা আর শিখা।





গল্প

আগামীর প্রতিভু

হোসনে আরা মণি

এবারের শীতটা বড্ড তড়িঘড়ি এসে গেল। এখনো জাঁকিয়ে পড়েনি বটে কিন্তু শিরশির করে বয়ে চলা উত্তরে হাওয়ার তীক্ষ্ণধার স্নায়ুতে এ সংকেতই সরবরাহ করছে যে, ‘জাড় ইবার হবি জব্বর’। সকালবেলা গ্যারেজে রিকশা নিতে যাওয়ার আগে বছিরদি গামছাটা কোমর থেকে খুলে পিঠে মেলে দেয়। গায়ে তার একটা টেটনের শার্ট আছে বটে কিন্তু ঢাকা শহরের চিকন গলি-ঘুপসিতে এখন যে শিরশিরে হাওয়া বইছে তা তার ছেঁড়াফাড়া শার্ট ফুঁড়ে গায়ের কুঁচকানো রুখো চামড়া ভেদ করে হাড়ে গিয়ে ঠেকছে। এই অদ্বানাই এই দশা, পোষ-মাঘে না জানি কী দেখায়! আশঙ্কায় বছিরদির গায়ে শীত আরো বেশি তীব্রতার সঙ্গে অনুভূত হয়। বছিরদির একমাত্র পুত্রের বউ আয়শা পিছু ডেকে বলে, আকা কি না খায়ই বারান্ধুন? হয় গো মা! তুমার পাক-সাক অতি মেলা দেরি

হবি। মালিকে তো আমার জন্য রিশকা বসায় থুবিনে। আমি না গেলি আর কাউরে দিয়ে দিবেনে। বছিরদির কথা ঠিক। সময়মতো অর্থাৎ সকাল ছয়টা-সাতটা ছয়টায় হাজির না হলে রিকশা পাওয়া শক্ত। গ্যারেজে রিকশার চেয়ে উমেদারের সংখ্যা ঢের বেশি। এজন্য জমার হারও প্রায় মাসে মাসে বাড়ছে। অন্য যুবকরা যে জমায় রিকশা নিতে সহজেই রাজি হয় তা বছিরদির পক্ষে স্বীকার হওয়া শক্ত। তবু যে বছিরদি রিকশা পায় তার কারণ তার দীর্ঘদিনের প্রমাণিত সচ্চরিত্র। মালিকের রিকশা নিয়ে ভেগে যাওয়ার সম্ভাবনা দূরে থাক, কোনো দিন জমা বাকি রাখার ইতিহাসও তার জীবনে নেই। কিন্তু যত পরিচ্ছন্ন ক্যারিয়ারের অধিকারীই সে হোক না কেন, নির্ধারিত সময়ে হাজির না হলে তার জন্য আন্ত একখানা রিকশা বসিয়ে রাখার মতো আহাম্মক তো বুল্লু মণ্ডল নয়।

আয়শা এসব বোঝে। অন্যদিন শশুর এ সময় একপেট পাত্তা কিংবা কড়কড়া খেয়ে তবেই ঘর থেকে বের হয়। কিন্তু গত রাতে তাদের সঙ্গে একজন অনাহুত মেহমানের পাত পড়াতে আজ হাঁড়িতে বাসি ভাত ছিল না। তাই সে 'খাড়ান' বলে ঘরে ঢুকে পলিথিনে কী একটা বেঁধে পুঁটলি বানিয়ে নিয়ে এসে শশুরের হাতে ধরিয়ে দেয়। খুশিতে বছিরদির চোখে প্রায় পানি চলে আসে। মাইয়েডার পরানটা খুব ভালো। অন্তর ভরা খালি দয়া-মায়া, ঠিক জয়নালের মার মতোন। বছিরদি মনে মনে ভাবে।

হ্যাঁ, বছিরদির ভাবনাটা খুবই ঠিক। আয়শা মেয়েটার অন্তর সতিই বড্ড ভালো। শশুরকে সে আপনার বাপের মতোই শ্রদ্ধা করে, ভালোবাসে। আধবড়ো শশুরের রিকশা চালনা সে মোটেই পছন্দ করে না। এ কাজ করতে সে বহুবার শশুরকে বারণ করেছে : আপনার পুলা যা কামুই-রজ্জগার করে তা দিয়া আপনার দুবেলার ব্যবস্থা ঠিকই অয় আব্বা; কিয়ের লাই এই বয়সে অত খাটবার যান? কার লাগি?

কত ভালো মেয়ে! একবারো নিজের রোজগারের উল্লেখ করে না। কিন্তু সে উল্লেখ না করলেও বছিরদির মনে তো আর তা না জেগে পারে না। ছেলে জয়নালের কামাইয়ে চার সদস্যের পরিবার মাসে বিশ দিনের বেশি চলতে পারে না। বাকি দশ দিন ছেলের বউর রোজগারের ভাত পেটপূরে ভক্ষণ করে টেকুর তোলার মতো অপদার্থ কিছিমের পুরষ বছিরদি নয়। তা ছাড়া বলা কি যায়— আজ সে উপার্জন করে সংসারে টাকা দিচ্ছে বলে তার আদর-সম্মান আছে, এ উপার্জনটা না করলে কাল কেমন ব্যবহার পেতে হয় কে জানে! যতই হোক, পরের মেয়ে বলে কথা।

আসলে আয়শাকে বছিরদি যত না স্নেহ করে তার চেয়ে বেশি করে সমীহ। আট ক্লাস লেখাপড়া জানা শিক্ষিত মেয়ে, দেখতেও মন্দ নয়। গার্মেন্টে জয়নালের চেয়ে সে ভালো কাজ করে। তার রোজগারও জয়নালের চেয়ে বেশি। মেয়েটার বেশ বুদ্ধিসুদ্ধিও আছে। সাংসারিক উন্নতির ভাবনা সে জয়নালের চেয়ে ঢের বেশি ভাবে। কোথায় কোন ব্যাংকে সে ছেলে ঝন্টুর নামে মাসে মাসে কিছু কিছু টাকাও জমা রাখে। এমন একটা মেয়ে জয়নালের ভাগ্যে জুটেছে এতে বছিরদি বহুৎ খুশি। যদিও প্রথম দিকে নিজ এলাকার মেয়ে নয় বলে এ বিয়েতে তার ঘোর আপত্তি ছিল কিন্তু মেয়েটার আচার-ব্যবহার দেখে-শুনে তার সে বিরাগ কবেই ধুয়ে-মুছে গেছে।

পলিথিনের পুঁটলিটা কোঁচড়ে গুঁজে রেখে বছিরদি দ্রুত পা চালায়। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখন তাকে গুলিস্তানে বুল্ল মণ্ডলের গ্যারেজে পৌঁছাতে হবে। দিনটা আজ ভালোই গেল বছিরদির। সকালবেলা রিকশা নিয়ে বেলা দুটো পর্যন্ত চালিয়ে তার যা উপার্জন হয়েছে তা অন্য যে কোনো দিনের তুলনায় বেশি। কোনো যাত্রীর সঙ্গে কোনো বচসা হয়নি। যাত্রী পেয়েছে চটপট, প্যাডেল ঘুরিয়েছে ছন্দময় ঝটপট। দু-চার বার যা ট্রাফিক জ্যামের কবলে পড়তে হয়েছে তাও ছিল ক্ষণস্থায়ী, কাজেই সহনীয়। এমনকি প্রতিদিনের বাঁধা-বরাদ্দ পুলিশের রুলের দুয়েক ঘাও তাকে আজ খেতে হয়নি। সব মিলিয়ে আজ তার মন ছিল দিব্যি ফুরফুরে। ঘরে ফেরার

পথে তাই নাতির জন্য লজ্জেস কিনতে আজ আর সে ভুল করে না।

নাতি ঝন্টু বস্তির ব্র্যাক স্কুলে শিশু ওয়ানের ছাত্র। ওর মা সকাল আটটার মাঝে গার্হস্থ্য কাজকর্ম সেরে খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকিয়ে ছেলে-শশুরের দুপুরের খাবার গুছিয়ে রেখে স্বামীর হাতে একটা লাঞ্চবক্স ধরিয়ে দিয়ে নিজেরটা হাতে নিয়ে ঘরে তালা দিয়ে বেরিয়ে পড়ে। পথে ঝন্টুকে স্কুলে দিয়ে যায়। এরপর স্বামী-স্ত্রী দ্রুত পায়ে হেঁটে নয়টার মধ্যে ঠিকঠাক পৌঁছে যায় গার্মেন্টের মূল ফটকে। এরপর শত শত ইলেকট্রিক বাল্বের আলোর বন্যায় এক ঠায় বসে বা দাঁড়িয়ে গোটা দিন ও রাতের একাংশ কাটিয়ে আয়শা-জয়নাল তাদের ক্ষীণ আলোর ঘরে ফেরে। ঘরে ফিরে জয়নাল তবু একটু গড়িয়ে নিতে পারে কিন্তু আয়শাকে লাগতে হয় সংসারে। রাতের রান্না সেরে স্বামী-ছেলে-শশুরকে খাইয়ে, এটো বাসন ধুয়ে সব গুছিয়ে তুলতে তার সেই রাত এগারোটো।

বছিরদি আজ ঘরে ফিরে প্রথমেই নাতির হাতে লজ্জেস তুলে দেয়। নাতিটার মুখে চওড়া হাসি দেখে তার বড্ড ভালো লাগে। পাশাপাশি দুখানা থালায় ভাত-তরকারি বাড়ে সে। তেলাপিয়া মাছের মাখাটা নাতির পাতে দিয়ে লেজটা নিজে নেয়। আহা! নাতিটা মাছের মাখা খেতে বড্ড ভালোবাসে। খাওয়া-দাওয়া সেরে একটা ভাতঘুমের বিলাসিতা আজ বছিরদিকে পেয়ে বসে। অন্যদিন নাতিটাকে এ সময় আগলে রাখতে সাধ্যমতো চেষ্টা করে। ছেলে যেন বস্তির আর সব টোকাই পোলাপাইনের সঙ্গে মিশে বখে না যায় এ ব্যাপারে আয়শার কড়া হুশিয়ারি। বছিরদিকে একবেলার বেশি রিকশা চালাতে দিতে এ কারণেই আয়শা ঘোরতর নারাজ। কিন্তু দিনের বেলা নাতির চোখে ঘুম আসে না। তাকে পাহারার দায়ে বছিরদিও জুতমতো ঘুমাতে পারে না। কিন্তু আজ তার কী হয়! বেগুন দিয়ে মাছের ঝোলের অমৃতবৎ ছালুন দিয়ে ভাত খেয়ে তার দেহ-মনে যে শান্তি শান্তি ভাব আসে তা তাকে দ্রুতই ঘুমের অতলে নিয়ে যায়।

বছিরদির ঘুম ভাঙে বহু মানুষের চোঁচামচিতে। কে বা কারা যেন তাকে প্রবলভাবে ডাকতে থাকে। কে ডাকছে? জয়নাল না? তাই তো! জয়নাল অমন জোরে জোরে ভারী লোহার কলাপিসিবল গেট ধরে ঝাঁকচ্ছে কেন? না, জয়নাল তো একা নয়, আরো বহু মানুষই তো আছে। আয়শাকে দেখা যাচ্ছে না, আয়শা কোথায়? আর অত ধোঁয়া কেন ওখানে? জয়নাল দু'হাতের সমস্ত শক্তিতে কলাপিসিবল গেট ধরে ঝাঁকতে ঝাঁকতে কাশছে। ওর কি শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে? কিন্তু গেটে অত বড় তালা কেন? চাবি কার কাছে? কেউ কি নেই যে তালাটা খুলে দেয়! ধড়মড়িয়ে উঠে বসে বছিরদি। এখন দিন কি রাত তাও তার চোখে ঠিকমতো ঠাণ্ড হয় না। বিস্মিত চোখে সে দেখতে থাকে দাউ দাউ আগুন।

২.

শীত শেষ হয়েছে। ঢাকাবাসীর গা থেকে ব্রেজার-সোয়েটার নেমে গেছে প্রায়। বস্তি ও ফুটপাথের হাড় জিরজিরে উদ্যম শরীরগুলো এখন রং টান করে ছুটতে শুরু করেছে। প্রকৃতির উপহাস সয়ে টিকে থাকা দেহগুলো এখন প্রকৃতির আশীর্বাদ মিঠে রোদুরকে তাচ্ছিল্যে দেখতে শুরু করেছে। প্রথর

হিমে নবজাতকের মৃত্যুর আশঙ্কা কমে যাওয়ায় পোয়াতিরার স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে শুরু করেছে। এক কথায় গণমানুষের জীবনে দ্রবমূল্যের উর্ধ্বগতি, বিদ্যুতের মূল্য বৃদ্ধি, বিচ্ছিন্ন কিছু খুন-ধর্ষণ-গুম-ডাকাতি-মুক্তিপণ সত্ত্বেও যখন কিছুটা শান্তি শান্তি ভাব বিরাজ করছে তখনই ঘটল এ ঘটনা— বেশ কিছু তরুণ-তরুণী হঠাৎই শাহবাগ মোড়ে একত্রিত হয়ে খালি গলায় 'ফাঁসি চাই, ফাঁসি চাই' বলে চিৎকার করতে শুরু করলে পথচারীদের অনেকেই থমকে দাঁড়াল। তাদের কেউ কেউ তরুণদের সঙ্গে গলা মেলাল। এভাবে ক্রমান্বয়ে সংখ্যাটা বাড়তে থাকলে একসময় কারো কারো হাতে এলো হ্যান্ডফোন। অবিরত চিৎকাররত তরুণদের গলা বসে পুরোপুরি বুজে যাওয়ার আগেই এলো মাইক্রোফোন। এরপর আধুনিক সাউন্ড সিস্টেমে গণসঙ্গীত বাজতে শুরু করলে দেশাত্মবোধের প্রবল আবেগ শাহবাগে গণপ্লাবন বইয়ে দিল। এ প্লাবন ক্রমবর্ধমান হয়ে এমন করে ফুঁসতে শুরু করল যে দলে দলে নেতারা এসে তাদের একাত্মতা জাহির করতে চাইল। কিন্তু তরুণরা তাদের অভিসন্ধিমূলক উপাচ্যকতার সঙ্গে পূর্বপরিচিত। তাদের মিথ্যাচার ও অভিনয় কৌশল বিষয়ে বিশেষভাবে অবগত। তাই তারা নেতাদের একদম প্রস্তাবনার পর্যায়েই হটিয়ে দিল। তাদের এক দাবি : কাদের মোস্তারার ফাঁসি চাই, সব রাজাকারের ফাঁসি চাই।

জাতীয় সংসদে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল সংশোধনী প্রস্তাব গৃহীত হলো। তরুণদের অবিরাম দ্রোহ চলছেই। ফেসবুক, ব্লগ, টুইটারে নিভৃত যে আন্দোলনের ডাক দেয়া হয়েছিল, তাকে এখন পরিবর্তনকামী মানুষ আশার আলোর সূতিকাগার বলে ভাবছে। কিছু প্রবীণ তরুণ টকশোগুলোতে এ আকাঙ্ক্ষাও ব্যক্ত করছে যে, এ আন্দোলনের চূড়ান্ত পরিণতি যেন রাষ্ট্র চালনার পদগুলোতে তারুণ্যের অভিষেকের মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হয়।

এমনই উন্মাতাল টানটান সময়ে বছিরদি একদিন নাতি ঝন্টুর হাত ধরে শাহবাগ এসে দাঁড়ায়। কয়েক দিন আগে কিছু তরুণ ছেলেমেয়ে একজন রাজাকারের ফাঁসির দাবিতে এখানে জমায়েত হয়ে আন্দোলন শুরু করেছিল। এখন প্রতিনিয়ত কত বিখ্যাত মানুষ নাকি একাত্মতা জানাতে এই শাহবাগ আসছে। ওরা এর নাম দিয়েছে স্বাধীনতা প্রজন্ম চত্বর। নামটা বছিরদির মনে খুব ধরেছে, যদিও প্রজন্ম শব্দটার অর্থ তার কাছে তেমন স্পষ্ট নয়।

টিকাটুলির বস্তির মোড়ের যে দোকানটার বাইরে দাঁড়িয়ে বছিরদি এখন টিভি দেখে সেই দোকানি মনজু মিঞা এ আন্দোলনকে বড় ভালো চোখে দেখছে না। তার যুক্তি— এটা আওয়ামী লীগের আরেক টার্ম ক্ষমতায় থাকার, তত্ত্বাবধায়ক সরকার ইস্যু জাতিকে ভুলিয়ে রাখার অপকৌশল মাত্র। কিন্তু আন্দোলন পছন্দ না করলেও, এর কারণ ও তাৎপর্য বিষয়ে অপব্যাখ্যা করলেও সারা দিন টিভিতে এ-সংক্রান্ত সংবাদ, সর্বশেষ আপডেট ও সরাসরি সম্প্রচারিত অনুষ্ঠানমালা এমনকি টকশো নামের প্যানপনে আলোচনাও তাকে দেখতে হয় কারণ তার খরিদাররা ইদানীং 'পেয়ার কা কাহানি' কিংবা 'শিলা কা জওয়ানি' ছেড়ে এই গরম ব্যাপারে মেতে উঠেছে।

সেদিন দুপুরবেলা দোকানের ভিড়ভাড়া কমে গেলে মনজু মিঞা বছিরদিকে ডেকে বলে, আবে ও বশির্যা, ছাছবাগ গ্যাছোচ নি? কত্ত! আগে তো আমি উহানেই রিশকা চালাইতাম। আবে হালার পো হাল, আমি ছে আগেকার কতা কইনিক্যা। আমি কই এই হালার আবাল পুলাপাইন আইছ্যা চান্দি গরমকরণের পরেকার কতা। তুমি তো হালা রিছকা চালায়া ছারা ঢাহার ছহর ফিল্ডিং মারবার পার, মাগার আমার তো এই এক দুকানে বয়া থাইকতে থাইকতে অগুকাছে আমঢাগাশ গজাইবার লাগশে। যাও না হালায় একদিন, চক্ষু ছার্থক কর্যা দেহা আও। তুমি তো আবার হালায় মুক্তি আছিল।

এ-জাতীয় কথা বস্তির কেউ বললে বছিরদি নিশ্চিত অপমানবোধ করত, কিন্তু মনজু মিঞার কথা সে গিয়ে মাখে না। লোকটা মুখে যাই বলুক অন্তরটা কিন্তু দিব্যি সাফ। অন্য কেউ না জানুক বছিরদি তা বেশ জানে। বিউটি ফ্যাশনের অগ্নিকাণ্ডে জয়নাল আর আয়শার মৃত্যুর পর বিধ্বস্ত বিউটিতে তাদের লাশ খুঁজে পেতে এই লোকটা যা করেছে তা ভুলবার নয়। তার সহযোগিতা না পেলে বছিরদির পক্ষে সম্ভব ছিল না আপন সন্তানের পোড়া বিকৃত দেহের অংশবিশেষ অগ্নিদাহের ধ্বংসস্তুপ থেকে উদ্ধার করে সেই হরিণাকুণ্ডুর অজপাড়াগায়ে নিয়ে দাফন করে। টিভিতে আর সবার মতো সেও বিউটি ফ্যাশনে অগ্নিকাণ্ডের ভিডিও ফুটেজ বিভিন্ন সময় দেখেছে। সেই দুর্ঘটনার পর কদিন ধরে ওটাই নাকি ছিল খবরের হেডলাইন। পরে আরো অনেক দুর্ঘটনার খবরের তলায় ও খবর চাপা পড়ে গেছে ঠিকই তবু নানা কারণে মাঝে মাঝে খবরের কাগজের এককোণে কিছু জায়গা পেয়ে যায়। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে কিছু ক্ষতিপূরণ দেয়ার প্রসঙ্গ যখন ওঠে কিংবা মালিকের শাস্তির দাবিতে যখন কোনো প্রতিষ্ঠান সোচ্চার হয় তখন পুরনো খবরও ভুস করে একটু মাথা জাগিয়ে ওঠে আর কি। আর সেই সুবাদে দেখা মেলে সেই লোমহর্ষক দৃশ্যের। কিন্তু অন্যরা যা দেখেনি, শুধু শুনেছে, যা ভিজিও ফুটেজে কখনো আসেনি সে যে তাও দেখেছিল। নাতি বান্টু সেদিন ঘুমন্ত দাদার পাশ থেকে কখন উঠে গিয়ে পাশের ঘরের রবিনার সঙ্গে গুটি খেলছিল। এমন সময় কোথা থেকে কী খবর এলো, পুরো বস্তির মেয়ে-মরদ যারা ঘরে ছিল তারা সব হায় হায় করতে করতে গিয়ে ভিড় জমাল বিউটির সামনে। প্রায় প্রতি ঘরের কেউ না কেউ যে ওই বিউটি ফ্যাশনে কাজ করে। যাদের কেউ ওখানে কাজ করে না, তারাও কি আর ঘরে বসে থাকতে পারে? ঘরে-বাইরে ছোট্ট ছুটি করে, শোরগোল তুলে আর আহাজারি করে তারাও হতভাগ্য পরিবারগুলোর সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে। আশ্চর্য! এত শোরগোলেও সেদিন বছিরদির ঘুম ভাঙেনি, ভেঙেছিল জয়নালের এক বিকট চিৎকারে। ‘বাঁচাও...!’ না, বছিরদি কীভাবে বাঁচাবে জয়নালকে? সে শুধু চেয়ে চেয়ে দেখেছিল কীভাবে তার জয়নাল ধোয়ার আঁধারে হাঁসফাঁস করতে করতে আর মুক্তির চেষ্টায় লড়তে লড়তে পাহাড়ধসের মতোই বসে গিয়েছিল। তারপর হয়তো সে হাত-পা ছেড়ে শুয়েই পড়েছিল। তবে সে কিন্তু ততটা পুড়েঝুড়ে নাম-পরিচয় শনাক্তের অযোগ্য কয়লা বনে যায়নি, যতটা গিয়েছিল আয়শা।

জয়নালের মায়ের সেই গিনিসোনার নাকছবিটা যদি আয়শার নাকে না থাকত তবে হয়তো বছিরদি তাকে কোনোভাবেই শনাক্ত করতে পারত না। আর দেখ কাণ্ড! অত তীব্র তাপে মেয়েটার পুরো দেহ কয়লা হয়ে গেল কিন্তু নাকের মাংস জ্বলে-খসে গেল না। লাশের অবস্থা দেখে অন্যরা পরে ব্যাখ্যা দিয়েছিল : ছয় তলা থেকে ছড়োছড়ি করে নামতে গিয়ে মেয়েটা হয়তো উপড় হয়ে পড়ে গিয়েছিল। তারপর কত জনার পায়ের তলায় সে চ্যাপটা হয়ে পরে আগুনের গ্রাসে গিয়েছিল। উপড় হয়ে থাকায় নাকটা বেঁচেছিল কিন্তু শরীরের কাপড় পুড়ে ছাই হয়ে শরীরেই লেগে ছিল আর মাথার অত ঘন চুলগুলো পুড়ে গুটি গুটি হয়ে পোড়া চামড়ার রসে লেপ্টে ছিল।

মনজু মিঞার কথার জবাবে বছিরদি কিছুই বলছে না দেখে মনজু মিঞা এবার কণ্ঠটাকে নরম করে বলে, বশির্যা, মাইন্ড খাইলানি? আবে মুক্তি তুমি তো হালায় একলা না, আমিও আছিলাম। শাবমেছিনগান দিয়া দুমাদুম গুলি হয়তো ছুড়ি নাই, গেরিলা হয়্যা গ্রিনেড চার্জও করি নাই, মাগার রছনের ঝুড়ির তলায় মাল লুকায়্যা বুড়িগঙ্গা পার করি নাই? মুক্তিগো লাই ভাত রাইস্কা মাঝ রাত্তিরে দোলাইখালে লয়া যাই নাই? হুন্ছি তখন যারা এসব কাম করছে তারাও নিহি মুক্তি। মাগার আমি তো হালায় মুক্তি বইলে কুনোদিন নিজেরে জাহির করি নাই। কুনো ছম্বুন্ধীর কাছে গিয়া ছাতিফিকিটির লাগি দরবারও করি নাইক্যা। দ্যাশের অছময়ে যা করা উচিত বইলা মনে হইশিল তাই করসি। আবার যদি তেমন দিন আহে যদি মনে অয় আমার হালায় কিছু করণ দরকার, মানে ওই একাত্তরের মতোন দ্যায়ালে পিঠ ঠেইক্যা গ্যাশে তালি তো বুক ঠুইক্যা দাঁড়াইতেই অয়। কী কও?

বছিরদি আর কী বলবে? কী আর তার বলার আছে? দিন কতক আগে জোয়ানমন্দ ছেলে-ছেলের বউ হারিয়ে তার এখন পাথরদশা। ছেলোটা যে পাঁচবছরী নাতিটাকে দুনিয়ায় রেখে গেল তার প্রতি জাগতিক কর্তব্যবোধে তাকে এখনো নড়তে চড়তে হচ্ছে, রিকশার প্যাডেল ঘোরাতে হচ্ছে, দিনে একবার হলেও হাঁড়িতে কিছু ফুটতে হচ্ছে। হ্যাঁ, সে একজন মুক্তিযোদ্ধা। মুক্তিযুদ্ধের সময় সে অস্ত্রহাতে সম্মুখযুদ্ধই করেছিল। কিন্তু তাতে কী? তার ভরা যৌবনের উত্তাল দিনগুলোতে দেশের জন্য সে কী করেছিল আজ তার কোনো প্রমাণই যে তার হাতে নেই। মুজিবের আমলের সার্টিফিকেট যখন দিনের পর দিন তোরঙ্গে আটকা ছিল তখন কোনো দিন ভাবেনি যে ওটা কোনো জাগতিক কাজে আসবে। ওসব সনদ-টনদ কাজে লাগাবার মতো বিদ্যা তার পেটে ছিল না, মগজের বুদ্ধিতেও ছিল খামতি। সে সোজা মানুষ— মনজু মিঞার আজকের বক্তব্যের মতোই সোজা-সাপটা ছিল তার চিন্তা। সে সময় দেশ-দেশের বিপদ দেখে তার তরুণ রক্ত টগবগিয়ে উঠেছিল। খানিকটা উদ্ভ্রান্দ, খানিকটা কর্তব্যবোধ এবং অনেকখানি অনিশ্চয়তা, অনিরাপত্তাবোধে তাড়িত হয়েই সে একদিন কয়েকজন ইয়ার-দোস্তের সঙ্গে মিলে বর্ডার পার হয়েছিল। ফিরেছিল একটা ‘থ্রি নট থ্রি’ হাতে। তারপর বেশ কয়েকটা অপারেশনে সফলভাবে অংশ নেয়া বছিরদি গায়ে এতটুকু আঁচড় ছাড়াই যখন স্বাধীন দেশের মুখ দেখল তখন দিনকতক অস্ত্র হাতে গ্রামময় খুব

হুম্বিতম্বি করে ফিরল। একদিন ডাক এলো অস্ত্র জমা দেয়ার। সুবোধ বালকের মতো অস্ত্র জমা দিতেও হলো। বছিরদি ফিরে গেল তার বাপের দেড় বিঘা ক্ষেতের কোলে।

এরপর তো কত কী ঘটে গেল। সব কি আর বছিরদি গুছিয়ে ভাবতে পারে! শুধু মনে পড়ে সাধারণ ক্ষমা, রক্ষীবাহিনী, বাকশাল, বঙ্গবন্ধুর মৃত্যু— ইতিহাসের এমনই কিছু টুকরো-টাকরা অংশের কানে শোনা স্মৃতি। দেশজুড়ে কখনো অরাজকতা, কখনো গণতন্ত্র, এই নির্বাচন তো ফের সরকার পতনের আন্দোলন। এর মধ্যেই কোনো আকালে দেনার দায়ে বছিরদির বাপের শেষ সম্বল দেড় বিঘা উড়ে গেল, কৃষক বছিরদি দিনমজুরে পরিণত হলো। একসময় জীবন সংগ্রামের দুঃসহ দাবির মুখে অগণনসংখ্যক পূর্বপুরুষের স্মৃতিসংবলিত খোড়ো চালাঘরের মায়্যা কাটিয়ে আলো বলমলে মহানগরী ঢাকার বাসিন্দায় পরিণত হলো। এসবের মধ্যে সেই অমূল্য সনদখানা মূল্যহীনতার প্রায়শ্চিত্ত করতে কবে কোথায় যে অদৃশ্য হলো তার হৃদয় আর মেলে না। এরপর নাকি কতবার কত সরকার নতুন করে সনদ দিয়েছে, বছিরদির পক্ষে তার খোঁজ রাখা সম্ভব ছিল না। এই তো কিছুদিন আগের কথা— কে একজন বলছিল আবার নাকি মুক্তিযোদ্ধার তালিকা করে সনদ দেয়া হচ্ছে এবং এখন নাকি মুক্তিযোদ্ধাদের ভাতাসহ তাদের সন্তান এমনকি নাতিদেরও নানা সুবিধা দেয়া হচ্ছে। বক্তা ছিল ঢাকাইয়া— রসিকতা করে বলছিল, ‘হালার বাপ কিংবা দাদায়ও যদি মুক্তি হইত তাহিলে আজ আমারে পায় কুন হালায়! মুস্তী-মেনিস্টার না হবার পারি কুনো না কুনো ছরকারি আপিসের পিওনছাব ভি হইতে পাভাম।’

অচেনা বক্তার মুখের এই নয়া খবর বছিরদিকে এতটাই উজ্জীবিত করে যে একদিন সে সত্যিই সনদ জোগাড়ের চেষ্টায় মাঠে নামে। কিন্তু এখানেও বড্ড হেঁচট খেতে হয় তাকে। হাজার দশেক নগদ হাতে ধরিয়ে না দিলে কমান্ডার থেকে শুরু করে কর্মকর্তা পর্যন্ত কেউ যে কোনো দলিলে তার নামই খুঁজে পায় না। সেই কোন চল্লিশ বছর আগেকার কথা— বলতে গেলে আদিকালের বদীবুড়োর গল্প। কার এত দায় পড়েছে যে কোথাকার কোন মুক্তি বছিরের দুঃসাহসিকতার কাহিনী তথ্য-উপাত্তসহ মুখস্থ করে বসে আছে!

এখন এই শাহবাগের স্কুলিঙ্গ দেশের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে পড়েছে বলে টিভির খবরে প্রকাশ। এ স্কুলিঙ্গ কতটা আগুন জ্বালাতে পারবে, একাত্তরের মতো আগুন হয়ে ছড়িয়ে পড়বে কিনা তা বছিরদি বুঝতে পারে না। তবে যেভাবে আন্দোলন এগিয়ে চলেছে, যেভাবে সর্বস্তরের মানুষের অকুণ্ঠ সমর্থন ও অংশগ্রহণ বাড়ছে তাতে সময়ই বলে দেবে যে শেষ পর্যন্ত কী ঘটে।

অত মানুষের ভিড়ে বান্টু হারিয়ে যেতে পারে ভেবে বছিরদি তাকে কাঁধে তুলতে চায় কিন্তু পাঁচবছরী নাতির আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যদাবোধ দুই-ই বড় প্রবল। দাদার কাঁধে চড়ার প্রস্তাবকে অবহেলাভরে উড়িয়ে দিয়ে সেও স্লোগান দেয়, ‘জয় বাংলা!’ তারপর দাদার হাত ছেড়ে একছুটে মিশে যায় প্রজন্ম চতুরের দ্রোহিত এ প্রজন্মের মাঝে আগামী প্রজন্মের প্রতিভা হয়ে।



বিসিএসআইআর (সাইন্স ল্যাবরেটরী) উদ্ভাবিত স্বল্প মূল্যের সনাক্তকরণ কিটস দিয়ে এখন ঘরে বসেই পরীক্ষা করে নিতে পারেন খাদ্য দ্রব্যে মেশালো ফরমালিন

মাছে ফরমালিন সনাক্তকরণ দ্রবন

ব্যবহার পদ্ধতিঃ

মাছে ফরমালিন সনাক্তকরণ কিট বক্সের ভিতরে পরীক্ষার জন্য তিনটি দ্রবন, একটি ড্রপার, তিনটি গ্রাস টিউব এবং একটি ব্যবহারবিধি সরবরাহ করা হয়েছে। ফরমালিন পরীক্ষার জন্য মাহটিকে অল্প পানি দিয়ে ভালো করে ধুয়ে নিতে হবে। ড্রপারের সাহায্যে ২ ড্রপার (২.৫মি.লি.) মাছ ধোয়া পানি একটি টিউবে নিয়ে পর্যায়ক্রমে ৩০ সেকেন্ড অন্তর দ্রবন-১, দ্রবন-২ এবং দ্রবন-৩ থেকে ১৫ ফোঁটা করে দিতে হবে। তৃতীয় দ্রবন দেওয়ার পরে যদি টিউবের পানির রং পরিবর্তিত হয়ে গোলাপী অথবা লাল রং হয় তাহলে বুঝতে হবে মাছে ফরমালিন আছে। আর যদি রং অপরিবর্তিত থাকে তাহলে বুঝতে হবে মাছে ফরমালিন নেই। একটি কিট বক্স দ্বারা প্রায় ৩০ টি নমুনা পরীক্ষা করা যায় এবং নির্ণয় মাত্রা ৫ পিপিএম।



মূল্যঃ ২৫০ টাকা

প্রাপ্তিস্থানঃ পরিচালকের দপ্তর,
আইএফএসটি,
বিসিএসআইআর, ঢাকা।

দুধে ফরমালিন সনাক্তকরণ কিটঃ

ব্যবহার পদ্ধতিঃ

দুধে ফরমালিন সনাক্তকরণ দ্রবন বক্সের ভিতরে পরীক্ষার জন্য একটি দ্রবন ও একটি চামচ এবং বক্সের গায়ে ব্যবহারবিধি সরবরাহ করা হয়েছে। ফরমালিন পরীক্ষার জন্য এক চামচ দুধ নিয়ে ৪-৫ ফোঁটা দ্রবন দিয়ে কিছুক্ষণ (৪-৫) মিনিট অপেক্ষার পর যদি দুধের রং পরিবর্তিত হয়ে বক্সের গায়ের চিহ্নিত বেগুনী রং ধারণ করে তাহলে বুঝতে হবে দুধে ফরমালিন আছে। আর যদি রং বেগুনী না হয় তাহলে বুঝতে হবে দুধে ফরমালিন নেই। একটি কিট বক্স দ্বারা প্রায় ৫০ টি নমুনা পরীক্ষা করা যায় এবং নির্ণয় মাত্রা ৫ পিপিএম।



মূল্যঃ ১০০ টাকা

প্রাপ্তিস্থানঃ পরিচালকের দপ্তর,
আইএফএসটি,
বিসিএসআইআর, ঢাকা।



বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (বিসিএসআইআর)

তঃ কুদরত-এ-খান সড়ক, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ। visit www.bcsir.gov.bd for details

প্রচারেঃ বিসিএসআইআর কর্তৃপক্ষ

হন্যে হয়ে ফেরা

মোস্তফা মীর

যখনই বলি ‘তুমি সুন্দর’
বুঝতে হবে বলতে চাই ‘ভালোবাসা’।
আমরা সবাই জানি ওসব ভগিতা করে বলা।
বরং আরো সোজা করে বলা যায় ‘তোমাকেই চাই’।
কিংবা সরাসরি বলতে যে পারে
‘তোমার সর্বস্ব নিংড়ে নিতে চাই’।
যার মূলত কোনো আকার নেই
যার জন্য মানুষের হন্যে হয়ে ফেরা
সেই আচরণ
মানুষ বলছে যাকে ‘সুখ’

সভ্যতার দশা দৃশ্যত

শাহাজাদা বসুনিয়া

পৃথিবীর আদিযুগ কেমন ছিল?
শুধুই জানেন আমাদের আদি পিতা-মাতা।
অনেক দেরি হলো, বেশ দেরি হয়ে গেছে—
তখন বাক্সটার ডালা খুলে গেছে,
বেরিয়ে এলো রোগ-ব্যাদি, আপদ-বিপদ,
দুঃখ-কষ্ট মানুষের জন্য যতসব অনিষ্টকর।
একটি ভালো জিনিসও সেখানে ছিল
তার নাম আশা, নিরাশার মাঝে আশা,
দুঃখের মধ্যেও সে-ই একমাত্র সান্ত্বনা।
ব্যটা বেজায় খারাপ, গ্যান্ডোবা
নারীদের মতোই লোভী, ঘুরে-ফিরে লালসায়।
বাক্স খুলে নিয়ে এলো অশুভ তাবৎ।
জিউসকে টেকা দেয়া, প্রতারণার ফানুস
একটি কঠিন কাজ, পরে বুঝল মরণশীল মানুষ।
শক্তি ও সম্ভ্রাস ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র,
কে ঠেকায় এবার, পরাশক্তির উত্তরণ?
জালে আটকে গেলেন প্রমিথিউস,
আটকে গেলেন হেরিক প্রস্তরের শেকলে।
চলতে থাকল আগ্রাসন, কে কাকে মারে
এখন, আশা ও সান্ত্বনা একে অপরের ঘাড়ে।

এ রকম কেন তুমি

জাহিদুল হক

সেই দিনটিতে দেখেছিলাম তোমাকে
তাকে খুঁজি মেঘে মেঘে,
আকাশটা নীল মার্বেলের চাতাল
হয়েছিল স্বর্গের।
তুমি নেমেছিলে পরীদের মতো ঘরে
পূর্ণিমা ছিল আরো,
অকথ্য ছিল তোমার সুরভিগুলো
এসব হয় না কারোর।
তুমি ঘরে এলে স্বাগত করেছে কেন
ভাঙন বিষাদতারা?
তুমি দেখেছিলে আমার বুকের কাছে
রক্তাপ্ত ধারা,
ফিনকি দিচ্ছে; নৃশংসতায় আর
আঁধারের সংঘাতে!
তুমি বলেছিলে এ রকম কেন তুমি
হাতে দাও এই হাত :

জীবনটা যেন অলীক ইশটিশন
ফাঁকা প্লাটফর্মের,
তবু তো সে রাতে পেয়েছিলাম তোমাকে
প্রিয় গান মর্মের।

পাপ

খালেদ রাহী

নয়নে পাপ এলে ঘরে বাইরে শুদ্ধতা উবে যায়।
শিক্ষকের জ্ঞান ছাত্রীর ধ্যান এ বাক্য অচল
হয়ে পড়ে মাদ্রাসা স্কুলে।
আমাদের স্কুলে শিক্ষক কানাই; ছাত্রীকে দেয় প্রণয় পাঠ
আমার মনে ফ্রেড নেই; জেগে আছে প্লেটো
ফলে কাম্বকের কাছে আমি নপুংসক।

সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে

ICU, NICU ও ৩টি OT ডায়াগনোস্টিক, ফার্মেসী ও ফিজিওথেরাপী

ঃ আমাদের সেবাসমূহ :

- ৬০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল
- আউটডোর বিশেষজ্ঞ ডাক্তার
- অত্যাধুনিক ডায়াগনোস্টিক সেন্টার
- ২টি অপারেশন থিয়েটার
- মেডিসিন কর্ণার (২৪ ঘণ্টা খোলা)
- এম্বুলেন্স সার্ভিস
- ইনার্জেসী সার্ভিস
- ICU এবং NICU
- হোলিস্টিক সেন্টার
- ডায়ালাইসিস সেন্টার

Improve the possibilities...



ঃ আউটডোর বিভাগসমূহ :

- মেডিসিন
- গাইনী ও শিশু
- নবজাতক ও শিশু রোগ
- নাক, কান, গলা
- অর্থোপেডিকস
- নিউরোলজী
- কার্ডিয়াক (হৃদরোগ)
- কিডনী ইউরোলজী
- সার্জারী
- দন্ত চিকিৎসা
- ফিজিওথেরাপী
- চর্চ, যৌন ও স্তন্য

ডাঃ মারুফ বিন হাবিব

এমবিবিএস, সিসিডি (ডায়াবেটিস) একসিপিএস (মেডিসিন) এপিএলএআর
সহযোগী অধ্যাপক মেডিসিন বিভাগ
উত্তরা আধুনিক মেডিকেল কলেজ

দুপুর ২-০০ টা বিকাল ৩-০০টা
সপ্তাহে ৬ দিন

ডাঃ লেঃ কর্নেল কালিপদ অধিকারী (অবঃ)

এমবিবিএস, একসিপিএস (মেডিসিন) এজি ইন মেডিসিন (এ এম এম আই) পি.সি.টি. মেডিসিন (সিঙ্গাপুর)
সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান মেডিসিন বিভাগ

মেডিসিন বিভাগ

সময় : রাত ৭ টা - রাত ৯ টা
শনি থেকে বৃহস্পতি সপ্তাহে ছয় দিন

ডাঃ আবু কাওছার সরকার

এমবিবিএস, একসিপিএস (সার্জারী) এমএস (সার্জিকাল অনকোলজী)
সিসিডি (বারডেম), স্পেসাল ট্রেনিং ইন কান্ট্রোল সার্জারী
সহযোগী অধ্যাপক, সার্জারী বিভাগ
ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ

জেনারেল, পেলোরোস্কপিক ও কলোরেটাল সার্জন

বিকাল ৪ টা-৫ টা, রাত ৯ টা-১০ টা
শনি থেকে বৃহস্পতি সপ্তাহে ছয় দিন

ডাঃ মোঃ আবুল হোসেন

এমবিবিএস, একসিপিএস (ইএনটি)
সহঃ অধ্যাপক উত্তরা আধুনিক মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
নাক, কান, গলা রোগ বিশেষজ্ঞ ও সার্জন

শনি থেকে বৃহস্পতি সপ্তাহে ছয় দিন



জাপান ও বাংলাদেশের কয়েকজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার ও প্রকৌশলীর যৌথ উদ্যোগে আধুনিক মানসম্পন্ন ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের সর্বশেষ প্রযুক্তি নিয়ে অক্লান্ত প্রচেষ্টা চালিয়ে প্রতিষ্ঠা করেছেন শিন-শিন জাপান হাসপাতাল। সুতরাং বিদেশে কেন? আমাদের সেবা গ্রহণ করুন। শিন-শিন জাপান হাসপাতাল এখন উত্তরায়। সেবা দিন, সুস্থ থাকুন। ধন্যবাদ।

শিন-শিন জাপান হাসপাতাল লিঃ

১৭, গরীব-ই-নওয়াজ এভিনিউ, সেক্টর-১১, উত্তরা, ঢাকা, বাংলাদেশ

☎ ০১৯১৬২৬৫০৫৬, (০২)৫৮৯৫৩৪২৯, www.shinshin-medical.com



SHIN-SHIN

দেখা হতো যদি

দুলাল সরকার

শেষবার যখন কবির সাথে দেখা
জানতে চাইলেন, মানুষ কি তার
সনাতনী সীমাবদ্ধতার মধ্যেই আজো আশ্রিত,
নাকি গতিশীল চাকার চক্রে নিজেকে
সমর্পণে প্রস্তুত?

বললেন, মানুষ কি জানতে পেরেছে
কী কী উপাদানে তৈরি মানুষ
আর বৃক্ষের স্বর, মহত্তম অনুবাদে
ঈশ্বরের অনুকৃতি এরা?

জেনেছে কি কোথায়, কোথায় এরা ঈশ্বরের
চেয়েও বড়, অতিকায় সমুদ্রের মতো,
অতিক্রান্ত সত্য ও সুন্দর—
পথিকের পথের স্বভাবে
অতিক্রম করেছে কি গার্হস্থ্য বিধান
গিয়ে অশ্বখের বটমূলে
কখনো কি জীবন জিজ্ঞাসু মুক্তির উপায়?

অশ্বারোহী

সমর চক্রবর্তী

রক্তের নিরুন্ম স্বীপে মানুষ কখনো হয় না একা

গোপন সুখ, দহনে নির্বেদ সে বর্ণ শব্দ হয়,
ভাষার আকাশে কখনো বিষণ্ণ করবী,
কখনো শোণিত গোলাপ!

অবিচ্ছিন্ন সম্পর্কের যমজ জোছনায় বায়বীয় সে প্রজাপতি
উজ্জ্বল তারার অন্ধকারে কালো জলের ওপর
গভীর ছায়া ফেলে লিখে যায় শুধু নিজের নাম

একরৈখিক স্বপ্নডানায় মৃত চোখ শুয়ে থাকে

ছক কেটে জন্ম নেয় আগুনের পাখি,
নিদ্রার ভেতর ঘুমের পালক খসে যায়
ঘুমিয়ে পড়ে মনোভূমির উদ্বাস্তু ছায়া!

পাখিময় মনবৃত্তের ফুল উড়ে যায়— উড়ে যায়—
অশ্রুবিন্দুর রেখা ধরে— স্বপ্ন রেখার ওপর
গড়িয়ে গড়িয়ে কোথায় যায়?

বাদল পর্ব

ফাহিম ফিরোজ

হাসুর মা, খুঁউব সুন্দর করে
এই সকালে উঠোন ঝাড়ু দেয়
দেখতে রূপোর মুদ্রা; চকচকে—
যে সকল যাযাবর পাতা
এতকাল স্তূপ হয়েছিল

দেখ দেখ
মা-মণি এসব
কিছু নেই আজ
সত্য হচ্ছে, ওই নারী নয়
আষাঢ়ই নারী সেজে
শুদ্ধভাবে পরিষ্কার করে সব।

উষা নিপীড়ন

মনসুর হেলাল

ফিরিয়ে নিয়েছি মুখ
কোনো বাক্য ব্যয় নয়; বিনিময় হয়েছে রহিত।
পিঁপড়ার সরণির মতো এখন শুধুই
একলব্য চলা।

বিনষ্টের চিৎকার শুনছি অনেক
অনেক দেখেছি আর উল্লস চাতুরী;
বৈভাবিক স্মারকের মতো এখনো এ বুক তার
রক্তছাপ লেগে আছে।

উষর ভূমিতে লাঙলের ক্ষতের মতন
তোমার চাদরে ঢাকা কান্ত কামিনীর ছায়া,
বিবর্ণ কীটের মতো রক্ষ বনস্পতি ছুঁয়ে যায় মৌনতার দীঘল প্রহর।
কুঞ্চিত ভ্রুর তোয়ালে নির্গত কষ্টের প্রলেপ
যতই ঢাকতে চাও তুমি
তবুও আমার নিবিষ্ট আঙুল
মূর্ছিত হবে না কোনো নিমগ্ন সরোদে।

পউষের হিম ক্লান্ত রোদেলা দুপুরে
দু'পায়ে মাড়িয়ে যাই অনিষ্টের খড়কুটো
উষা নিপীড়ন।

তবু কোনো বাক্য ব্যয় নয়,
পিঁপড়ার সরণির মতো এখন শুধুই
একলব্য চলা।



উত্তরা মিনি কার হাট (প্রাঃ) লিঃ

বিশাল গাড়ীত সম্ভার

স্বপ্ন টাকায় আপনার স্বপ্ন পূরণ করতে চান?
আজই আসুন আমাদের কার হাটে

প্রতিদিন নতুন/পুরাতন গাড়ী
ক্রয়-বিক্রয় করা হয়।

সততাই আমাদের মূলধন



স্থান : ২১৭, ২১৮, সোনারগাঁও জনপথ রোড, সেক্টর-১২
(চন্দালভোগ, তুরাগ), উত্তরা, ঢাকা-১২৩০।

ফোন : 01942778142, 01942778143
01942778144, 01942778145



গল্প

প্রেমিক

হারুন হাবীব

হিমছড়ি থেকে অনেকটা দূর পর্যন্ত টানা মসৃণ পথ, পাশেই অপার সমুদ্র— বঙ্গোপসাগর। ইচ্ছা করলে, যদুর চোখ যায়, সাগরপাড়ের ঢেউ গুনতে গুনতে হেঁটে যাওয়া যায় বহুদূর, হারিয়ে যাওয়া যায় অসীমের পথে— সৈকত এমনিই দীর্ঘ এখানটায়। বিস্ময়কর লোকটিকে দ্বিতীয় দিনের মতো হিমছড়ির সৈকতে দেখতে পেল আফরোজা। আজো হাতে ওর অসংখ্য বিনুকের মালা। পৌষের সকালেও খালি পা, প্যান্ট ও শার্টের ওপর চরানো বেগুনি রঙের সোয়েটার। আফরোজা লক্ষ্য করে দেখল, হাতভরা মালা ওর। গতকালও ছিল এ রকমই। কিন্তু সে একা। সঙ্গে কেউ আছে মনে হলো না। শুধুই অপলক তাকিয়ে আছে সমুদ্রের দিকে। কখনো পাহাড়ের গায়ে আছড়ে পড়া ঢেউ গোনো। সামুদ্রিক পাখিদের চঞ্চল চলাফেরা দেখে অপলক চোখে।

ঢেউয়ের শরীর ছুঁয়ে জেলেদের ট্রলার, দূরের জাহাজ, নোনা পানি ভেজা বালিতে মানুষের পায়ের ছাপ, অথই জলরাশি— এসবই যেন ওর সঙ্গী, আকর্ষণ। গতকালও দূর থেকে লোকটাকে অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ্য করেছে আফরোজা। সমুদ্রমুখী স্থির দাঁড়িয়ে ছিল সে কঠিন শিলার মতো। আজো ওভাবেই আছে। তবে কেবল এক জায়গায় দেখা গেল না আজ। কখনো দেখা গেল সৈকত ধরে হাঁটতে, কখনো ছন্দ তোলা বালিরাশির ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে। ওর সঙ্গী যে কেউ নেই তা নির্ধাৎ বলা যায়। কক্সবাজারের সমুদ্রসৈকতে কেউ একা বেড়াতে আসে না— যে বয়সেরই হোক। বেশির ভাগ আসে সদ্য বিবাহিতরা— হানিমুন করতে। প্রেমিক—



- ★ পূর্বাচল নতুন শহরের কাছে আরেক আধুনিক শহর
বসুকুঞ্জ হোক আপনার নতুন শহর।
- ★ বসুকুঞ্জ আবাসিক প্রকল্প দিচ্ছে বিশেষ মূল্যছাড়ে
এখনই রেজিস্ট্রেশনযোগ্য কিছু প্লট।
- ★ সরকারী ও মধ্য আয়ের চাকুরীজীবীদের জন্য বিশেষ মূল্য ছাড়।



BASUKUNJA GROUP

বসুকুঞ্জ ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট লিঃ (BLDL)

কর্পোরেট অফিস: বাড়ি # ৪৫, ফ্ল্যাট # ই-১ (৬ষ্ঠ তলা),
রোড # ২৭, ব্লক # এ, বনানী, ঢাকা।

মোবাইল: ০১৯১৫-৭০০২১১, ০১১৯৭-৪৩৪২৫০,
০১৬৩১-৩৩৩৩৯৯, ০১৭১১-১৫৯৪৩৭

Member: REHAB Member: BLDA



প্রেমিকারা আসে শরীর ও মনের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে। বয়স্ক ধনীরা আসে ‘চেঞ্জে’- শরীর-মন চাঙা হবে বলে। কেউ আসে রোদ পোহাতে। কেউ বা নতুন ব্যবসা ফাঁদতে। স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা দূরদূরান্ত থেকে বাস বোঝাই করে আসে আনন্দ-উল্লাস করতে। আর আসে দূরদূরান্ত থেকে মধ্যবিত্ত পরিবার। আফরোজা অবাক হয় এই ভেবে যে, নির্বাক এ লোকটির সঙ্গে কেউ নেই! থাকলে গেল দুই দিনে অন্তত একবার দেখা যেত। এসব ভাবতে ভাবতে আফরোজা ধীরে ধীরে বালির ওপর দিয়ে হাঁটতে থাকে। এক-দুটি বিনুক স্যান্ডেলের আগা দিয়ে ছুড়ে মারে। দূরে কয়েকজনকে রোদ পোহাতে দেখা যাচ্ছে। যুবকরা, বেশির ভাগই ছেলেমেয়েরা ঢেউয়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সাতার কাটছে। মেয়েরা হাঁটু পর্যন্ত শাড়ি ও পায়জামা তুলে পানিতে নেমেছে। ঠিক সে সময়টায় শব্দ ভুলে দ্রুত চলে গেল কয়েকটা স্পিডবোট। আফরোজা তাকিয়ে দেখল, তার স্বামী পার্টনারদের সঙ্গে নিয়ে সৈকতের বালিতে টাঙানো তিন রঙা ছাতার নিচে বসে নতুন ব্যবসার দেনদরবার করছে। এখানে আসার পরই ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়েছে ওর স্বামী। এসব ব্যবসায় ব্যাপার আফরোজা বোঝে না। তাই সে বালিতে ছেঁটে, বসে, দোকানে দোকানে ঘুরে সময় কাটায়। হিমছড়ির শেষ প্রান্তের দিকে আনমনে আরো খানিকটা এগিয়ে যায় আফরোজা। অচেনা লোকটার আচরণ তার কাছে খুব স্বাভাবিক মনে হয় না। সে দেখে, একসময় পানিতে নেমেছে লোকটা। কোনো দিকে তাকাচ্ছে না। ক্রমেই গভীর সমুদ্রের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ভয় নেই, অক্ষিপ নেই। জোয়ারের সময় বলে ঢেউয়ের পর ঢেউ ছুটে আসছে তীরের দিকে। ঢেউগুলো লোকটার শরীরে আছড়ে পড়ছে। কিন্তু সে নির্বিকার, অক্ষিপ নেই ওর। আফরোজা এমন মানুষ দেখেনি, যে তার নিজের বিপন্নতাকে উপেক্ষা করে আপন পথে নির্বিধায় চলতে পারে! থমকে দাঁড়ায় আফরোজা- লোকটা কি অপ্রকৃতিস্থ? এও মনে হয়, ওকি আত্মহত্যা করবে? এ রকম ঘটনা নাকি কল্লবাজারে সমুদ্রসৈকতে হামেশাই ঘটে থাকে। কিন্তু সঠিক সিদ্ধান্তে আসতে পারে না। একটু দ্রুতই সে পা ফেলে এগিয়ে যায় সামনের দিকে। লোকটার আচরণ যতই অস্বাভাবিক মনে হোক না কেন, আফরোজা বুঝতে দিতে চায় না সে ওকে লক্ষ্য করছে। ওকে দেখলে মনে হবে, আপন মনে সে হাঁটছে। এরই মধ্যে ঢেউয়ের প্রতিরোধ ডিঙিয়ে লোকটা প্রায় গলা পর্যন্ত ডুব গেছে। ঢেউগুলো কখনো অদৃশ্য করে তুলছে ওকে, কখনো দৃশ্যমান। কিন্তু বিনুকসুন্দ্র হাত দুটো সে উঁচিয়ে রেখেছে মাথার ওপর- সমুদ্র যেন ওর হাত থেকে মালাগুলো ছিনিয়ে নিতে না পারে। অন্তহীন চেষ্টায় রক্ষা করছে সে মালাগুলো। অসংখ্য মানুষ ভিড় করে সে দৃশ্য দেখছে। কেউ মজা দেখছে, কেউ উৎকণ্ঠার সঙ্গে অপেক্ষা করছে- শেষ পর্যন্ত কী হয়। খানিকক্ষণ পর দেখা গেল, হাতের মালাগুলো সে সমুদ্রের পানিতে সমর্পণ করছে এক এক করে। বেদিতে যেমন ফুল রাখে ভক্ত, ভালোবাসার মানুষকে যেভাবে মালা পরায় প্রেমিক। কিছু

সামুদ্রিক পাখিকে তখন উড়তে দেখা যায় বার বার। উড়ে উড়ে ওরা পরখ করে নিচ্ছিল, কী ফেলছে লোকটা অথই সমুদ্রে। এমন এক বিস্ময়কর দৃশ্য দেখার পর আফরোজা নিজের অজান্তেই আরো খানিকটা এগিয়ে যায়। একেবারে পানির কাছে চলে আসে। ঢেউ এসে ওর শাড়ি, পেটিকোট ভিজিয়ে দেয়। সমুদ্রের ঢেউ ভাঙছে একের পর এক। পানির জিব ডাঙার স্বাদ পাওয়ার চেষ্টা করছে। শাড়িটা দুই হাতে উঁচিয়ে ধরে এক পা-দুই পা করে, অচিন লোকটার কাছ থেকে বেশ খানিকটা দূরত্ব রেখে, আফরোজা নিজেই এবার পানিতে নামে। তার ইচ্ছা, বিস্ময়কর লোকটি কী করে শেষ পর্যন্ত- সে দেখবে। এরই মধ্যে একটি একটি করে বিনুকের সবকটি মালা সমুদ্রের পানিতে সমর্পণ করা হয়েছে লোকটির। ঢেউয়ের আঘাত তাকে আরো কাজ থেকে টলাতে ব্যর্থ হচ্ছে। এ পরিস্থিতিতে বড় বিপদ এমনকি জীবনহানির আশঙ্কা উড়িয়ে দেয়া যায় না। কিন্তু সব ভয়ভীতি সে জয় করেছে, যা তার কাজ তা সে সম্পাদন করেছে। খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে শ্বাসরুদ্ধকর দৃশ্যটি দেখতে দেখতে আফরোজা তন্ময় হয়ে পড়ে! এ কি সম্ভব! এ এক অসাধারণ কর্মযজ্ঞ, যা অসাধারণরই কেবল পারে। বেশি হলে পঁয়ত্রিশ-চল্লিশের মতো বয়স। ওর স্বামীর চেয়েও কম হলেও হতে পারে। জাঁদরেল গোছেরও নয়, অতি সাধারণ। লোকটা যে কোনো শিল্পী বা সাধক গোছের কেউ হবে না, তাও সে প্রায় নিশ্চিত। কিন্তু সব ভয় উপেক্ষা করার এই শক্তিরূপকে অজান্তেই ভালো লাগে আফরোজার। সে বোঝে, এ কাজ কোনো সাধারণের নয়। নিজেকে উজাড় না করলে ভালোবাসাই পূর্ণ হয় না। কিছু মানুষই তা পারে, যারা পারে তারাই প্রেমিক। লোকটা একসময় ধীরে ধীরে তীরের দিকে ফিরতে থাকে। ওর শার্ট ও সোয়েটার ভিজে শরীরের সঙ্গে লেপ্টে গেছে। পুরুষ শরীরের প্রতিটি ভাঁজ, দেহের উত্থান-পতন সব দেখা যায়। বিকালের রোদ পশ্চিমের সমুদ্রমুখী। সূর্য একটু পরই ডুববে। সূর্যের লালচে আলোয় ওকে অপূর্ণ, বিস্ময়কর মনে হতে থাকে আফরোজার। এমন মানুষও পৃথিবীতে থাকে! কিন্তু অচেনা লোকটি কোনো দিকে তাকায় না। আফরোজা কিংবা অন্য কাউকেই সে দেখতে পায় না। ধ্যানমগ্ন সন্ন্যাসীর মতো প্রিয়তমার গলায় মালা পরিয়ে তার আশ্রমের পথে পা বাড়ায়। বিচ থেকে ফিরে কল্ললটা গায়ে চাপিয়ে অনেকক্ষণ বিছানায় শুয়ে থাকে আফরোজা। স্বামীর মতো জীবন-জীবিকার ব্যস্ততায় ওকে পেয়ে বসেনি। ও রকম জীবন সে চায় না। জীবন তার কাছে গতানুগতিক নয়। পেশা বা নেশার যতই ফারাক থাক না কেন, জীবন তার কাছে প্রতিদিনের ভোর আর সন্ধ্যার মতো। আশা ও নিরাশার। সকালে আশার হলে বিকালে তা অন্তত চলে যাত্রা করে। ভোরবেলায় আশাগুলো আবার ছুটে আসে। কল্লবাজারের সাগরসৈকতে বড় একটা ব্যবসা জাঁকিয়ে বসতে চায় ওর স্বামী। ইদানীং ‘ফ্রি মার্কেট ইকনোমি’র প্রভাব পড়েছে দেশে। দৈদার বিদেশি পুঁজি আসছে। তাই ট্রেডিং ছেড়ে সে শিল্পের মালিক হতে চায়। কল্লবাজারে এসেই দেশি-বিদেশি পার্টনারদের নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। হিলটপের দামি গেস্টহাউসটায় কয়েকজন সাদা সাহেবও

গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

এলোঙ্গা পৌরসভা

কালিহাতী, টাঙ্গাইল।

একটি আধুনিক মডেল পৌরসভার মান অক্ষুণ্ণ রাখতে এলোঙ্গা পৌরবাসীর প্রতি আমার বিনীত অনুরোধ:-

- ১। সময় মতো পৌরকর পরিশোধ করে পৌরসভার উন্নয়নে সহায়তা করুন।
- ২। শিশু জন্মের সঙ্গে সঙ্গে পৌরসভায় নিবন্ধন করুন এবং প্রয়োজনীয় টিকা গ্রহণ নিশ্চিত করুন।
- ৩। ট্রেড লাইসেন্স ছাড়া ব্যবসা পরিচালনা বে-আইনী, ট্রেড লাইসেন্স নিয়ে ব্যবসা পরিচালনা করুন।
- ৪। পৌরসভার অনুমোদন ব্যতীত সকল প্রকার নির্মাণ কাজ থেকে বিরত থাকুন।
- ৫। যত্রতত্র মলমূত্র ত্যাগ করবেন না।
- ৬। আপনার সন্তানকে স্কুলে পাঠান।
- ৭। গাছ লাগান, পরিবেশ বাঁচান।

পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে পৌরবাসীকে জানাই-**অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা****মো. শাফি খান**

মেয়র

এলোঙ্গা পৌরসভা

কালিহাতী, টাঙ্গাইল।

আল্লাহ সর্ব শক্তিমান

জয় বাংলা

জয় বঙ্গবন্ধু

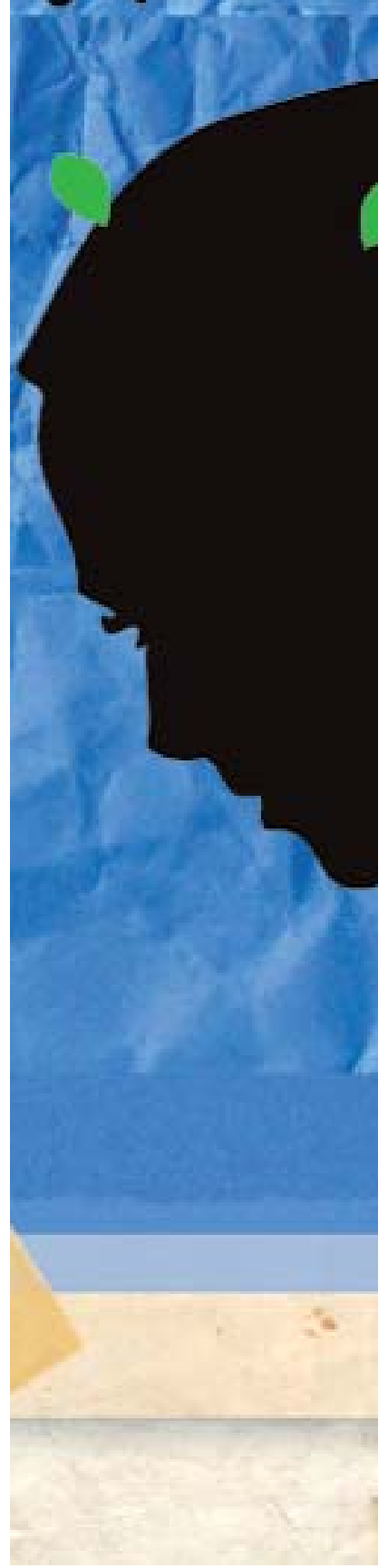
**পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে****বিপুল ভোটে পুনরায় চেয়ারম্যান
নির্বাচিত করায় ৯ নং বহা ইউনিয়নের****সর্বস্তরের জনসাধারণকে জানাই-****প্রাণঢালা****শুভেচ্ছা****ঈদ****মোবারক****আলহাজ টান মাহমুদ পাকির**

চেয়ারম্যান

**বহা ইউনিয়ন পরিষদ
কালিহাতী, টাঙ্গাইল।**

এসে উঠেছেন। ওদের সঙ্গে দফায় দফায় বৈঠক চলেছে, চলছে ‘প্ল্যানিং’ ও ‘ফিজিবিলিটি স্টাডি’। সকালে বোরোবার আগে আফরোজাকে বলে গেছে, “আল্লাহ আল্লাহ কর, এগ্রিমেন্টটা সাইন হয়ে যাক। টোয়েন্টি পার্সেন্ট শেয়ার আমারই। বিরাট প্রজেক্ট! টুরিস্টরা যা চায় তার সবকিছু দেব আমরা। বুঝলে, কক্সবাজার হচ্ছে পৃথিবীর ‘লংগেস্ট ন্যাচারাল সি বিচ’। কিন্তু ‘ফরেন টুরিস্ট’ আসে না। কারণ একটাই, ওই ‘হাফ-মেড’র মতো, আরে ওই যে পাগলাটে লোকটা যার কথা তুমি বলছিলে, ওর মতো কিছু লোক ছাড়া খালি খালি এখানে ঘুরতে আসবে কোন পাগল? বল, কী ‘এনজয়মেন্ট’ আছে এখানে? স্ফূর্তি করার কী ব্যবস্থা আছে? মেয়েমানুষ পর্যন্ত নেই! আমরা সব ব্যবস্থা করব।” স্বামীর এ ধরনের বক্তব্যের বিরুদ্ধে আফরোজার অনেক কিছুই বলার আছে। কিন্তু সে পারে না। তবে একজন অপরিচিত লোককে ‘হাফ মেড’ বলায় সে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে, ‘তোমার কাজ তুমি কর, শুধু শুধু একজন অপরিচিত লোককে হাফ মেড বলছ কেন? শুনলাম, কক্সবাজারে হানিমুন করতে এসে ভদ্রলোক স্ত্রীকে হারিয়েছেন, অনেক বছর আগে। প্রতি বছরই নাকি আসেন।’ স্ত্রীর এসব কথা শোনার সময় ও আবেগ দুটোই নেই আফরোজার স্বামীর। বাইরে গাড়ি স্টার্ট দিয়ে রেখেছে। দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে যায় সে। কথা বাড়ায় না। তবে পুরুষ টুরিস্টদের মনোরঞ্জন ব্যাপারে স্বামীর মন্তব্যে শরীরটা যিন যিন করে ওঠে। কিছু বলার সুযোগ হয় না। ভেতরের প্রতিবাদ বাইরে প্রকাশ ঘটে না। পুরুষের কাছে মেয়েদের শরীরটাই কি একমাত্র? যদি তাই হয়— প্রেম, ভালোবাসা কী? যদি স্বামীর যুক্তিই মানতে হয় তাহলে যে অগণিত মেয়ে টুরিস্ট সমুদ্রসৈকতে আসে, তাদের জন্যও তো সুঠামদেহী পুরুষ পতিতের জোগান রাখতে হয়। স্বামী বা ওর বাবসায়ী পার্টনার কি সে ব্যবস্থা করবে? সন্ধ্যারও বেশ পর আফরোজা গায়ে একটা চাদর চড়িয়ে দরজা ঠেলে হোটেলের বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। টানা বারান্দা। একটার পর একটা সাজানো কামরা। কয়েকটায় মাত্র আলো দেখা যাচ্ছে। বেশির ভাগই অন্ধকার। বোর্ডার সন্ধ্যার পরও সমুদ্রের তীরে বসে আকাশ ও সাগর দেখছে। সাগর ও আকাশ দুটোই অনন্ত। দুই অনন্তের অন্তরপানে মন ও চোখের মগি ফেলে নতুন আনন্দ আবিষ্কার করার চেষ্টা চলে মানুষের। চাঁদের আলোয় ঝিলিক দেয়া অথই জলরাশি। কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস। তিন তলা হোটেলগুলোয় টুরিস্টরা গিজগিজ করছে। শীতের সময়টা এখানকার হোটেল আর মোটেল ব্যবসায়ীদের ‘পিক সিজন’। লোকে লোকারণ্য হয়ে যায় কক্সবাজার। আফরোজারা যে হোটেলটায় উঠেছে তার দক্ষিণ গেটের সামনে বোগেনভেলিয়ার ঝোপে শত শত রঙিন পাপড়ি বাতাসে ওঠানমা করছে। হঠাৎ আফরোজা দেখল, একটি যুগল জড়া জড়ি করে রিকশা থেকে নামছে। ভাড়া মিটিয়ে একজন আরেকজনকে জড়িয়ে ধরে সিঁড়ি বেয়ে নিজেদের কামরার পথ ধরল ওরা। মেয়েটির পায়ে আলতা। খোঁপায় ফুল। স্বামী-স্ত্রী নাকি নিছক বন্ধু— কিছুই বোঝা গেল না। ওদের কাছে পৃথিবীটা এক স্বর্গ— যেভাবে ইচ্ছা ঘুরবে, দুলবে, নাচবে, গাইবে— যার

বাসিন্দা ওরাই দুজনে, আর কেউ নেই। সিঁড়ি বেয়ে উঠে, কোনো দিকে না তাকিয়ে, ওরা আফরোজার পাশ দিয়ে হেলেদুলে হেঁটে ওরই পাশের কামরার তালা খুলে ভেতরে প্রবেশ করল। ঢুকেই ওরা খিল লাগিয়ে দিল। বেশ শব্দ করে। আফরোজা একবার তাকিয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিল। সেটিই সংগত মনে হলো। এর পরও নিজের অজান্তে কান দুটো খাড়া হয়ে উঠল। বারান্দা থেকে সে নিজের কামরায় প্রবেশ করল। পাশের রুম বলে যুগলটির কথাবার্তা তেমন স্পষ্ট না হলেও— কান পাতলে বেশ খানিকটাই শোনা যায়। আফরোজা বেশ বুঝতে পারল, খিল লাগানো কামরায় ঢুকেই ছেলেকে মেয়েটিকে জাপটে ধরে চুমো খেতে শুরু করেছে। কিংবা চেপে ধরেছে শক্ত হাতে। মেয়েটি ছেলেকে ছাড়াতে চেষ্টা করছে। ‘দম বন্ধ হয়ে আসছে, ছাড়ো ছাড়ো’। এক-দুবার এ ধরনের কিছু কথাও কানে এলো। একটু বাদে, মেয়েটি খিল খিল করে হেসে উঠল। আফরোজার শরীর কেঁপে উঠল অদ্ভুত শিহরণে। সম্ভবত ছেলের বাহুবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে সুইচ টিপে আলো জ্বালিয়ে দিল মেয়েটি। ছেলেকে ছুটে গিয়ে আলোটি নিভিয়ে দিতে গিয়ে থামল। বলতে শোনা গেল, ‘না, আলো নিভবে না। আলো আজ লজ্জার নয়। সমুদ্র আমাদের বদলে দিয়েছে। পৃথিবীর সব আনন্দ আলোতে। আমি জানি অন্ধকারের রূপ আছে, সবাই তা দেখতে পায় না। আমি অতি-সাধারণ আমার কাছে আলোই চিরন্তন। চল, এ আলোতে তুমি আমি দুজনে স্বাধীন হই, মুক্ত হই। সমুদ্রের অঙ্গরীরা যেমন, উর্বশী, মেনকা, তিলোত্তমা, ঘৃতাচী, সুকেশী, সুবাহ ও সুপ্রিয়ারা যেমন— তেমনি স্বাধীন হই আমরা।’ ‘আমি যদি অঙ্গরী হই তোমাকে কামদেব হতে হবে— তা জানো?’ ‘জানি। সাগরপাড়ে যেদিনই দাঁড়িয়েছি সেদিনই আমি ওর গান শুনছি। ও গানের অতুলনীয়। স্বাধীন নিরাভরণ ওই সমুদ্রচারীদের নৃত্য কখনো দেখা হয়নি আমার। আজ তুমি সে নৃত্য দেখাবে। বিশুমিত্রার তপোভঙ্গ মেনকার গর্ভে শকুন্তলার জন্ম হয়েছিল, আজ আমার ধ্যানভঙ্গে জন্ম হোক আরেক শকুন্তলার।’ তরুণ জুটির প্রেমবাক্যগুলো সবটুকু শোনা হয়নি আফরোজার। দরজার পাশ থেকে সরে গিয়ে দ্রুত সে বাথরুম ঢুকল। চোখেমুখে পানির ঝাপটা দিল। টেপ থেকে জোরে পানি নির্গত হওয়ায় পাশের কামরার কথাবার্তা অস্পষ্ট মনে হতে থাকল। মাঝেমধ্যে শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ ছাড়া বিশেষ কিছু শোনা গেল না। আফরোজা এটুকু বুঝল, বিশুমিত্রার তপোভঙ্গ হয়েছে। একটু পর সে ঘরে আলো জ্বালাল। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চলে চিরুনি লাগাল। মুখে ক্রিম মাখল। শাড়িটাকে ঠিকঠাক করে নিল। তারপর দরজা ঠেলে বারান্দায় এসে দাঁড়াল। লক্ষ্য করে দেখল, পাশের ঘরটায় তখনো আলো জ্বালানো। ঠিক যেন গৃহস্থবাড়ির দুপুরের ক্লাস্ত আঙিনা। প্রায় মিনিট পনের দাঁড়াল। না, আর কোনো শব্দ নেই। ভেতরের ছবিটা একবার আফরোজা মনে করার চেষ্টা করল। নিশ্চয়ই ওরা ঘুমিয়ে পড়েছে। এ সময়ও স্বামীর কথা মনে পড়ল না আফরোজার। কেবলই মনে পড়ল সেই অদ্ভুত



আল্লাহ সর্বশক্তিমান

জয় বাংলা

জয় বঙ্গবন্ধু

পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে রাজশাহী মহানগরবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা

ঈদ সকলের মনে বয়ে
আনুক সুখ, শান্তি
ও অনাবিল
আনন্দ

আজিজুল আলম বেটু
সাংগঠনিক সম্পাদক
মহানগর আওয়ামী লীগ, রাজশাহী।



রাফা পরৌ

একটি স্বাভাবিক গোল্ড মেহেন্দী

No.1
Beauty
Guarantee

দারুল হুজুয়্যাহাদিন গার্ড ও দীর্ঘস্থায়ী
কব্জার জন্য বা-আব মরো মরো

ISO
9001:2008

Moslim Cosmetics & Herbal Care
Visit us: www.rafta.com

অচিন লোকটির মুখ, চোখ ও শরীর। দুই দিনে বার-কয়েক সে দেখেছে ওকে। এ হোটেলেরই কোনো কামরায় উঠেছে লোকটা। দূর থেকে চেয়ে চেয়ে দেখেছে। কোনো কথা হয়নি।

হঠাৎ ফোন বাজল। দ্রুত ঘরে ঢুকে রিসিভার কানে তুলল আফরোজা। স্বামী জানাল, ফিরতে আজো বেশ রাত হবে। এগ্রিমেন্টটা এখনো চূড়ান্ত হয়নি। তবে হবে। খেয়েদেয়ে সে যেন শুষে পড়ে। ‘ঠিক আছে, তুমি তোমার কাজ কর, আমি ঠিক আছি’— বলেই রিসিভার রাখে আফরোজা।

সংক্ষিপ্ত উত্তরটার মাঝ দিয়ে জীবনের যে অর্থটা দীর্ঘকাল সূত্ত রেখেছিল, যা কোনো দিন প্রকাশ করেনি, করতেও পারেনি, তাই হয়তো আজ প্রকাশ করতে চাইল আফরোজা। হোটেলের চৌহদ্দি থেকে সে ছুটে বেরিয়ে যেতে চাইল। কিন্তু কোথায়, কোন দিকে, কোন পথে? ভেতরে ঢুকে কামরার আলো দ্রুত নিভিয়ে দিল সে। পাশের কামরার যুগলের মতো আলো ভালো লাগে না তার। এ সমুদ্র দর্শন তার কাছে অর্থহীন।

অন্ধকারের অব্যাহত রূপ পান করতে চায় সে আকণ্ঠ। নতুন কোনো সমুদ্রে স্নান করতে ছুটে বেরিয়ে যেতে চায়, সে অস্থির হয়ে ওঠে।

এরপর আফরোজা বারান্দায় বেরিয়ে আসে। সুমুদ্রের উদ্ভূত চিলগুলোর মতো অস্থির মনে হয়। স্বামীর কাছে তার অনেক কিছুই পাওয়া হয়েছে। এর আগেও বার-কয়েক স্বামী কক্সবাজারে বেড়াতে এনেছে তাকে। কিন্তু এবারের মতো সর্বগ্রাসী অতৃপ্তি আগে কখনো আঁকড়ে ধরেনি। পাঁচ বছর বিয়ের বয়স। এখনো কোনো ছেলেমেয়ে নেয়নি। স্বামী যথেষ্ট স্বাধীনতা দিয়েছে। যখন-তখন গাড়িতে চেপে যেখানে-সেখানে যেতে পারে। এর পরও সে অস্থির। একবার ভাবে, হোটেল থেকে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে একা সমুদ্রের তীরে চলে যায়। রাতের সমুদ্রের মোহময়ী ডাক আছে— সে ডাকে সীমানা ছাড়িয়ে অন্য কোনো আশ্রয়ে যাওয়ার সুযোগ থাকে। দুপুরের সেই অচেনা লোকটিকে দেখবার পর থেকে সে ডাক শুনতে অস্থির হয়ে ওঠে আফরোজা।

আফরোজার জন্য ঠিক তখনই যে এমন এক বিশ্বয় অপেক্ষা করছিল, তা মুহূর্ত আগেও সে জানতে পারেনি। এমন ঘটনা কদাচিৎ ঘটে। রাত তখন বেশি নয়, দশটার কাছাকাছি কিংবা আরো কিছু বেশি। শেষবারের মতো কামরার আলো নিভিয়ে দরজা খুলে বাইরে এসে দাঁড়াতেই সে দেখল, একটি কামরার দরজা খুলে অদ্ভুত সেই লোকটি নিঃশব্দে বেরিয়ে আসছে। লোকটি যে তার এত কাছে উঠেছে একবারো সে জানতে পারেনি। আফরোজা দেখে, হাতে ওর থোকায থোকায বিনুকের মালা। পরনে একটা সাধারণ প্যান্ট, গায়ে সোয়েটার। হয়তো বা সমুদ্রের দিকে যাচ্ছে— এই রাতের।

চাবিটা লাগাতে লাগাতে একবার তাকিয়েই লোকটা থমকে দাঁড়াল। রুমের চাবি হাতে ধরে অপলক সে আফরোজার দিকে তাকিয়ে থাকল। এক পা, দুই পা করে এগিয়ে আসতে লাগল। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে শরীর ওর কাঁপছে। ঠিকমতো ধরে রাখতে পারছে না পা দুটো।

আফরোজা বেশ খানিকটা বিব্রত বোধ করতে থাকে। ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। এক পা, দুই পা

করে লোকটা ওর কাছে চলে আসে। কী যেন সে খুঁজে পেয়েছে। হঠাৎ কাঁপা কণ্ঠে লোকটা বলে ওঠে, ‘তুমি, মিলি তুমি, এখানে!’

চোখ দিয়ে ওর পানি গড়িয়ে পড়ছে। হাত দুটো বাড়িয়ে কাছে টানে সে আফরোজাকে। কাঁপা গলায় বার বার বলে ওঠে, ‘তুমি, মিলি তুমি, এখানে!’

কিছু বুঝে ওঠার আগেই লোকটি আফরোজাকে জড়িয়ে ধরল। ঠোঁটে, মুখে, ঘাড়— চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দিতে থাকল। বিপন্ন আফরোজা শুধু বলতে পারল, ‘ছেড়ে দিন, ছি ছি, এসব কী করছেন! আমি আপনাকে চিনি না।’

অচিন লোকটা, সম্ভবত, তার হারানো মিলিকে খুঁজে পেয়েছে। সে বিশ্বাস করছে, যে মিলিকে সমুদ্রসৈকতে হারিয়েছিল সে— সে মিলিই ফিরে এসেছে। আবেগে, আগের চেয়েও অনেক বেশি শক্তিতে, মুহূর্তে সে আফরোজাকে কোলে তুলে কামরায় নিয়ে গেল। চোখ দিয়ে অবিরল ধারায় পানি গড়িয়ে পড়ছে।

‘আমি জানতাম মিলি, তুমি আসবে। একদিন না একদিন আসবেই। প্রতি বছর আমি আসি এই সমুদ্রের কাছে। আমি জানি, সমুদ্র তোমাকে ফিরিয়ে দেবেই।’

উল্লেখ্যের মতো এসব বলতে বলতে পর্যুদস্ত আফরোজাকে সে বিছানায় শুষিয়ে দেয়। কামরায় আলো নেই। অচিন লোকটি নিজেই সুইচ টিপে আলো জ্বালিয়ে দেয়। পা থেকে মাথা পর্যন্ত, আকাশ থেকে মর্ত্য পর্যন্ত, আলো থেকে অন্ধকার পর্যন্ত— দেখে নেয় সে তার মিলিকে। এরপর আফরোজার চুল থেকে পা পর্যন্ত চুমো দিতে থাকে।

‘আমি জানতাম মিলি, তুমি আসবে। কেউ নিতে পারে না তোমাকে, কেউ নিতে পারে না আমার মিলিকে।’

কী করবে বুঝতে পারে না আফরোজা। অদ্ভুত লোকটাকে অব্যাহত, দুর্দমনীয় ভয়ঙ্কর এক প্রেমিক মনে হয়। ওকে সে কামনা করছিল, আরো একটবার দেখতে চেয়েছিল। কিন্তু সে যখন এসে তাকে আঁকড়ে ধরল তখন সিদ্ধান্ত নিতে সে অসহায়। দরজা ঠেলে যে কোনো সময় হোটেলের বয়-বেয়ারা এসে পড়তে পারে। আশপাশের যে কেউ উপস্থিত হতে পারে।

কিন্তু পরিস্থিতির কাছে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া আফরোজার কিছুই করার থাকল না।

শাড়ির বাঁধনটা তার আলগা হয়েছে। স্তন, বুক, গলা, কোমর, নিতম্ব, পা— সব জায়গায় হাত



বসিয়ে অচিন লোকটা তাকে পিষে মারছে। মুখের লাল দ্বিগুণে শরীর ভিজিয়ে দিচ্ছে। এ রকম নির্বাক একজনও এমন ভয়ঙ্কর হতে পারে— কোনো দিনও কি ভাবতে পেরেছিল আফরোজা। কী আশ্চর্য, তন্দ্রার, লুটেরা এ লোকটিকে তবু সে ঘৃণা করতে পারছে না! চিৎকার করে উদ্ধারের ডাক দিতে পারছে না!

একসময় আফরোজাকে আদর করে বিছানায় শুষিয়ে দিল লোকটা। বিনুকের মালাগুলো একটি একটি করে ওর উন্মুক্ত শরীরে পরাতে থাকল। মাথা থেকে পা পর্যন্ত। বাধা দিতে পারল না আফরোজা। সময়ের কাছে নিজেকে সঁপে নিঃশব্দে, চোখ বন্ধ করে গভীর অচিন এক ভালোবাসার কাছে আত্মসমর্পণ করল সে। শরীর তখন শরীরের মোহে কেঁপে উঠেছে। আফরোজা একবার চোখ খুলল, আবার বন্ধ করল।

‘সমুদ্র তোমাকে ছিনিয়ে নিয়েছিল, সমুদ্রই তোমাকে ফিরিয়ে দিয়েছে, মিলি। সাগর হেরে গেছে। দেখ, তোমাকে কত ভালোবাসি আমি।’ কিছুই যেন করার নেই তখন। আফরোজা তার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে। হাত বাড়িয়ে অচিন লোকটিকে সে বুক টেনে নেয়। আজ যেন নিজেকে আবিষ্কার করতে পারছে সে। যেন সে স্বাধীন— উর্বশীর মতো, মেনকার মতো, সুপ্রিয়া ও সরসার মতো। স্বামী, সংসার— এসব নিয়ে ভাবতে চেষ্টা করে না সে। হোটেলের কক্ষটিতে সমুদ্রের সঙ্গীত আছড়ে পড়ে। সেই সঙ্গীতের তালে নৃত্য করতে থাকে দুর্বীর প্রেমিক এক নারী ও পুরুষ। পরদিন অনেকটা বেলা করে ঘুম ভাঙে আফরোজার। রাতে স্বামী হোটেল ফিরতে পারেনি। সম্ভব হয়নি। অনেক রাত ধরে পানাহারে সে ক্লান্ত। দুপুরের দিকে হাসতে হাসতে রুমের ঢুকেই বলল, ‘দারুণ খবর আছে আফরোজা, রাতেই এগ্রিমেন্টটা সই হয়েছে। দেখবে কক্সবাজার ‘সি সোরে’ কী বিশাল বাণিজ্য গড়ে তুলি আমরা।’

জুতো খুলতে খুলতে আরেকটি খবর দেয় সে স্ত্রীকে। ‘এই শুনো, আজ আর সি সোরে যেও না। ওই যে পাগল গোছের মানুষটা এ হোটেলেরই ছিল না, ও আত্মহত্যা করেছে। সমুদ্রে ওর লাশ। কী অবাক কাণ্ড জানো, সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে বালিতে বড় অক্ষরে একটি নাম লিখে গেছে— মিলি।’

হঠাৎ বুকফাটা কান্নায় ভেঙে পড়ে আফরোজা। অব্যাহত কান্নার স্বর লুকাতে কন্ঠ দিয়ে মুখ চেপে ধরে। দৃষ্টিগ্রস্ত স্বামী কাছে এসে জিজ্ঞেস করে, ‘কী হয়েছে, কাঁদছ কেন!’

আফরোজা কিছুই বলতে পারে না। কান্না একটু পর থামে। সে উঠে দাঁড়ায়। না, আর নয়। আর এভাবে নয়। শাড়িটা ঠিক করে দ্রুত কামরা থেকে বেরিয়ে যেতে থাকে সে। হতবিস্মল স্বামী প্রশ্ন করে, ‘ব্যাপার কী— কোথায় যাচ্ছে?’

‘ওই পাগল মানুষটার কাছে।’

‘তুমিও পাগল হলে নাকি!’

আফরোজা উত্তর দেয় না। দরজা ঠেলে বেরিয়ে যায়। যাওয়ার আগে একবার দেখে নেয়— বিছানা, টেবিল, ঘরের মেঝেতে ছড়ানো-ছিটানো অচিন প্রেমিকের শেষ চিহ্ন।

আশ্চর্য আবিষ্কার স্বাস্থ্য ঠাণ্ডা ভে দুর্লিহিয়া ঠাণ্ডা

মাথা ঠাণ্ডা রাখবে
স্থূল হয় ভাণ

কাগোকেশী
কেশ ভেল
দুগন্ধযুক্ত একটি আদর্শ হেয়ার টনিক



চুলকে দ্রুত ঘন, ঘনো, লম্বা ও মসৃণ।
চুলের যত্ন সব বয়সে ১২ মাস প্রতিদিন...

ব্যবহারের পূর্বে বোতলটি ভালভাবে ঝাঁকিয়ে নিন এবং
দয়া করে লেবেলের গায়ের লেখা ঠিকো পড়ে নিন।





উপন্যাস

বাঁ-হাতি তানিয়া

আবু সাইদ কামাল

অনেকবার মানা করা সত্ত্বেও ডানপিটে তানিয়া গাছে ওঠে। কখনো সবার অলক্ষে ওঠে। মা-বাবা, বড় ভাইয়েরা এতবার বারণ করেছে, তবু খেলার সাথীদের সঙ্গে সে গাছে উঠবেই। তার এ দুরন্তপনা পরিবারের সদস্যদের উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। গারো পাহাড়ের পাদদেশ এলাকার একটি গ্রাম। গ্রামের চারদিকে ফসলিমাঠ, নদী-খাল। দিঘল গ্রামের পরে আবার মাঠ। মাঠের পর আবার গ্রাম। এমনই প্রাকৃতিক পরিবেশ পাদদেশ এলাকার। বর্ষাকালে যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম নৌকা। বর্ষায় যখন প্রবল ঢল নামে, তখন কখনো মনে হয় জলের ওপর ভাসমান গ্রামগুলো। এসব এলাকায় প্রধান ফসল একটি। তাও আবার কান্দা জমিতে আমন। আবার বিলের জমিতে ইরি-বোরো। এমন একটি গ্রামের নাম হাট গোবিন্দপুর। এ

গ্রামেই তানিয়াদের বাড়ি। বাবা লেখাপড়া না জানা একজন গরিব চাষি। স্বাক্ষরও করতে পারে না। তার মাকেও অশিক্ষিতই বলা চলে। তবে কোনো রকমে কষ্ট করে স্বাক্ষর করতে পারেন। অশিক্ষিত এ কৃষক পরিবারের নয়টি সন্তান। অর্থাৎ তানিয়ারা নয় ভাইবোন। তার অবস্থান সাত। বলা যায়, অনেক সন্তানের মাঝে বেশ অযত্ন আর অবহেলায় ওরা প্রকৃতির সন্তানের মতোই বেড়ে উঠছে। গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ে তানিয়া। গরিব চাষি পরিবারে মেয়েদের শিক্ষা-দীক্ষায় মা-বাবার আগ্রহ কমই থাকে। এ পরিবেশে তানিয়া পড়াশোনা করে অনেকটা নিজের আগ্রহেই। ক্লাসে তার অবস্থান ভালো। এজন্য শিক্ষকরাও তাকে অন্যদের চেয়ে বেশি কদর করেন। ছোটবেলা থেকেই বেশ ডানপিটে সে। বলা যায়,



দুরন্তপনা তার স্বভাব। পাশের বিলের জলে
শাপলা-শালুক কুড়ানো, আবার নদী-খালে সাঁতার
কেটে অনায়াসে এপার থেকে ওপারে যাওয়া-
আসা, এসব কাজে ছেলেদের চেয়ে সে কম দক্ষ
নয়। বরং সমান সমান প্রতিযোগিতার নামে।
তেমনি ডাঙায় আবার গাছে গাছেও চম্বে বেড়ায়।
মাঠে তাদের সীমিত জমি। চাষাবাদই পরিবারটির
আয়-উপার্জনের একমাত্র পথ। কিন্তু পাহাড়ি
এলাকা বলে এক ফসলি জমির আমন ফসলেও
দেখা যায় নানা রকম ঝুঁকি। কখনো পাহাড়ি ঢল
ফসল তলিয়ে ক্ষেতে ক্ষেতে বালু ফেলে।
পাদদেশ এলাকার বিলগুলোতে ইরি-বোরো ফসল
পাকার মুহূর্তে শেষ চৈত্র বা বৈশাখের প্রথমে
বৃষ্টিপাতের ফলে পাহাড় থেকে নেমে আসে ঢল।
আর ওই ঢলের পানিতে তলিয়ে যায় অনেক
আশার উঠতি ফসল। কখনো বা শিলাবৃষ্টির কবলে

পড়ে বিনষ্ট হয়ে যায় মাঠের পাকা ধান। এভাবে
প্রাকৃতিক নানা বিপর্যয়ে যদি বছরের একটি ফসল
নষ্ট হয়ে যায়, তখন কৃষক পরিবারের পরিণতি কী
হতে পারে তা তো আর বলার অপেক্ষা রাখে না।
তানিয়ার জন্মের পর থেকেই এরূপ নানা প্রাকৃতিক
বিপর্যয় মোকাবিলা করে আসছে তাদের পরিবার।
দেখতে দেখতে বিশাল হয়ে ওঠা এ পরিবারের
হাল ধরতে এক সময় বাবা হিমশিম খেতে
থাকেন। পরিবার পরিপালনে বড় টালমাল হয়ে
যান বাবা। অর্থকষ্ট দেখা দিলে কখনো অর্ধাহারেও
কাটাতে হয় তাদের দিন। এমন দৈন্য-দশায় অষ্টম
শ্রেণিতে পাঠরত অবস্থায় বড়ভাই পড়ালেখার পাঠ
চুকে দিয়ে পরিবারের হাল ধরে। চাষাবাদের
পাশাপাশি ক্ষুদে আকারের ব্যবসায় মনোযোগী হয়
বড় ভাই। অভাবের তাড়নায় পাশের বিল-খাল,
নদী থেকে মাছ ধরে একপর্যায়ে বিক্রি করে চলে।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

খোশ আমদে মাহে রমযান

পদ্মা ইসলামী লাইফ ইনসিওরেন্স লিমিটেড এর বীমার পরিকল্পনামূহ

আব্রাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন, আর সুদকে করেছেন হারাম।
খাল কোরআন- সুন্না বাস্তবায়ন-২৭৫

পবিত্র রমজান মাস মুসলমানদের সিয়াম সাধনার মাস। এ মাসে মানুষ মানুষে সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরন লেহ
মায়্যা-মমতা, সহযোগিতা সহমর্মিতা, আন্তরিকতা ও ভালবাসা বৃদ্ধি পায়। রমজান শেষে মুসলমানদের
মাঝে নেমে আসে ঈদ। তেমনি ঈদের এই আনন্দ উৎসবে পদ্মা ইসলামী লাইফ ইনসিওরেন্স লিঃ এর
সকল পরিচালকবৃন্দ, কর্মকর্তা-কর্মচারী, শেয়ারহোল্ডার, পলিসি হোল্ডারসহ দেশবাসীকে জানাই ঈদের
অগ্নিম শুভেচ্ছা।

www.padmamlife.com info@padmamlife.com

জাযনাহীল সিন্নাশদ জীবনের প্রতিশ্রুতি

পদ্মা ইসলামী লাইফ ইনসিওরেন্স লিঃ

ইসলামী শরীয়াহ মোতাবেক পরিচালিত

প্রধান কার্যালয় : পদ্মা লাইফ টাওয়ার, ১১৫ কার্জন সলরুল ইসলাম এভিনিউ, বাঙ্গালার, ঢাকা-১০০০।
ফোন : ৮৩১১৮০৯, ৮৩১৩৪৮৭, ৮৩১৬৫২৯, ৮৩১৫৪৫৩, ৮৩১৭৫৫৪, ফ্যাক্স : ৯৩৫৪৬৪৭

কখনো বা চালের ব্যবসা করে। এভাবে বাড়তি কিছু আয়ের মুখ দেখে। পরিবারের বড় ছেলে মারফত ভাই হাল ধরলে বাবা পরিবারের প্রতি প্রায় উদাসীন হয়ে যায়। বড়ভাই ব্যবসার পাশাপাশি ছোটভাইদের সহযোগিতায় চাষাবাদের কাজও করে। এভাবে পরিবারের মধ্যমি হয়ে উঠে বড়ভাই মারফত আলী। ফলে ছোট ভাইবোনরা সবাই বড়ভাই মারফতকে সমীহ করে। তানিয়া মারফত ভাইকে শুধু সমীহই করে না। ভীষণ ভয়ও পায়। আর ভয় পাওয়ার কারণ হলো, ছেলেদের মতো তার দুরন্তপনা। তানিয়াকে একদিন গাছের মগডালে দেখে বড় ভাই মারফত বেশ শাসিয়েছে। সেদিন সন্ধ্যা বেলায়ই বাড়িতে তানিয়াকে মায়ের সামনে বলে, এরপর আর কোনোদিন যেনো তোরে গাছে উঠতে না দেখি, কেমন?

তানিয়া তখন মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে বলে, আচ্ছা ভাইজান!

এ কথা বলেই একান্ত অনুগতের মতো সে পড়ার টেবিলে চলে যায়। তবে তার ছোট মনে প্রশ্ন জাগে, সমবয়সী ছেলেরা যদি গাছে উঠতে পারে, তাহলে মেয়ে বলেই কি তার বেলায় এতো বাধা...?

ছোট খুকি তানিয়া। এতো বিধিনিষেধের কথা কি তার মনে থাকে! খেলার সাথীদের ছেড়ে থাকতেও পারে না। স্কুল থেকে ফেরার পর পড়ন্ত বিকেলে ওরা খেলতে এসেছে। তানিয়াও তাদের সাথী হয়। বাড়ির আঙিনাতে বেশ কিছু আমের গাছ। ওরা যখন সেসব গাছে উঠতে থাকে, তখন কি তানিয়া পিছিয়ে থাকতে পারে? সেও একটা ছোট গাছে উঠতে শুরু করে। ছেলেরা যেমন তরতর করে গাছের ওপরে উঠে যায়, তেমনি তানিয়াও। সেসব গাছগুলোর পাশের পথে যখন মারফত আলী বাইরে যাচ্ছে, তখনই এ বড় ভাইয়ের ছোখে পড়ে। অমনি আর যায় কোথায়! রেগে-মেগে একশা হয়ে মারফত ভাই তানিয়াকে বলে, এই তোরে না দুইদিন আগেও বারণ কইরা কইলাম, গাছে উঠবি না। তারপরও তুই....! ভালো চাস তো শিগগির গাছেতো নাইমা আয়।

তখন দুরন্তদুরন্ত বুক তানিয়া গাছ থেকে নামে। আর তখন বড় ভাই রেগে দু'চোখ লাল করে বলে, ঐদিন তোরে এতো কইরা কইলাম, তারপরও কথা মনে থাকে না!

বলেই এক থাপ্পড় দেয়। মার খেয়ে তানিয়া কঁাদতে কঁাদতে বাড়ির পথে ছুটে যায় আর দু'হাতে চোখ রগড়ায়। তখন বড় ভাই ভীষণ রেগে পেছন থেকে চেষ্টাতে চেষ্টাতে বলতে থাকে, এরপর কোনোদিন যদি তুই গাছে উঠবি, তাহলে তোরে আমি ঠিক মাইরাই ফেলমু, এই কইরা রাখলাম।

বড় ভাইয়ের একথা শুনে তার কান্নার গতি আরও বাড়ে। ফুঁপিয়ে কঁাদতে কঁাদতে সে বাড়ি পৌঁছে মায়ের কাছে যায়। উদ্বেগের স্বরে মা বলে, কী হইছে, কান্দস কে রে!

-গাছে উঠছিলাম দেইখ্যা বড় ভাই থাপ্পড় মারছে।

এ্যা- এ্যা...

-উচিত কাম করছে।

-আমি গাছে উঠলে কার কী?

কঁাদতে কঁাদতে রাগের ঘোরে ওসব বলতে থাকে তানিয়া। জবাবে মা বলে, মেয়ে মানুষ তুই। অথচ

ছেলেদের মতো গাছে উডস। বলি, গাছেতো পইড়া যদি হাত-পা ভাইঙ্গা যায়, তাহলে কী দশা অইব তর!

-আমার মতো অনেক পোলাপানই তো গাছে উড়ে হেরার তো কোনো দোষ অয় না।

-ছেলেরা গাছে উঠলে তাদের তেমন দোষের কিছু নাই। ওরার তো গাছে উঠতে উঠতে অভ্যাস অইয়া গেছে। এছাড়া ছেলেদের কী। পইড়া কোনো খুঁত অইয়া গেলেও এই সমাজে হেগর কোনো অসুবিধা অয় না। কিন্তু গাছেতো পইড়া মেয়ে মাইনসের যদি কোনো খুঁত হয়, তাহলে ওই মেয়েরে কি সহজে বিয়া দেওন যাইব? তহন কী দশা অইব, কছন। ছেলেদের কী! কোনো খুঁত অইলে একটা কিছু কইরা চলতে পারবো। কিন্তু মেয়ে মানুষের তো এমনেই দোষের সীমা থাকে না। শত ভালো থাকলেও বিয়া দেওনের সময় লাগে পাঞ্জাভরা ট্যাহা।

মায়ের এসব কথা শুনে তানিয়া খানিকক্ষণ কেমন যেনো চূপ করে থাকে। কিছক্ষণ পর সরব হয়ে বলে, গাছেতো পড়তাম করে। তুমি যে কী কও মা!

-আমিও তরে বারণ কইরা কইতেছি, সাবধান!

আর গাছে উঠবি না। এমনে যে গাছে উডস, শেষে পইড়া গিয়া যদি হাত-পা ভাঙে তাহলে কী অইব তর, ক। তর বাপের তো আর জমিদারি নাই...

মায়ের এসব কথা শুনে তানিয়া আর কথা বাড়ায় না বটে। তবে কেমন যেনো একগুয়ে অভিব্যক্তি ফুটে উঠে তার চোখে-মুখে। মনে মনে সে বলে, আচ্ছা মা এবং বড় ভাই আমারে গাছে উঠতে এতো বারণ করে ক্যান!

দুই.

মা এবং বড় ভাই কঠোরভাবে নিষেধ করাতেই বোধ হয় গাছে ওঠার বিষয়ে তানিয়ার জেদটা আর বেশি বেঁকে ধরে। তখন অক্টোবর মাস। স্কুল ছুটির পর বিকেল বেলায় বাড়িতে ফেরার পর প্রায় সমবয়সী চাচাত ভাই আরিফ এবং প্রতিবেশী রোকেরার সঙ্গে প্রতিদিনের মতো খেলতে বের হয় তানিয়া। তাদের সঙ্গে দুরন্তপনায় মাতে প্রথমে। সেদিন তানিয়ার তিন-চার বছরের ছোট বোনও সঙ্গে আসে। তাদের বাড়ির আঙিনাতেই জঙ্গলের সঙ্গে কামরাঙা গাছ। টসটসে কামরাঙা বুলছে গাছে। লোভনীয় ওসব কামরাঙা দেখে জিভে কার না জল আসে। তানিয়ারও লোভ হয়। তাই সে মা এবং বড় ভাইয়ের নিষেধ অমান্য করেই গাছে ওঠার সিদ্ধান্ত নেয়। আর গাছে ওঠার আগে ছোটবোন ইতিকে বলে, আমি গাছে উঠিয়া কামরাঙা পারমু। তরেও খাইতে দিমু। কিন্তু সাবধান, এই কথা কেউরে কইয়া দিবি না কিন্তু। ঠিক আছে!

-আইছা, কেউরে কইতাম না। কিন্তু আমারে দুইভা কামরাঙা দেওন লাগব।

-আচ্ছা, দিমুনে...

এই বলে তানিয়া গাছে উঠতে থাকে।

কাণ্ড ছাড়িয়ে যে সময়ে সে শাখায় উঠতে শুরু করে, তখন অবোধ ছোটবোন ইতি বড়বোনকে দেয়া অঙ্গীকার ভুলে আধো আধো বোলে মাকে ডেকে জানায়, আম্মা! তানি আপা গাছে উঠতাকে।

মাকে ডেকে সংবাদটা দিয়ে আনন্দ পাবে বলে আশা করেছিল। কিন্তু তার ডাক সম্ভবত মায়ের

কান পর্যন্ত পৌঁছেনি। তাই মায়ের কাছ থেকে কোনো সাড়া পায়নি। আর সাড়া পায়নি বলে ততটা আনন্দ কুড়াতে পারেনি ইতি। তানিয়া অবশ্য মাকে তত ভয় পায় না। তবে যমের মতো যাকে ভয় পায়, সেই মারফত ভাই বাড়ি থেকে বেরিয়ে যখন কাজে যাচ্ছে, তখন তাকে দেখেই ইতি অতি আনন্দে চিল্লাতে চিল্লাতে বলে, এই যে বড় ভাই! দেইখ্যা যাও; তানি আপা গাছে উঠতাকে।

কনিষ্ঠ বোন ইতির ডাক মারফত ভাইয়ের কান পর্যন্ত গড়ায়। খবরটা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই রেগে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠে সে। মনে মনে বলে, এত মানা করার পরও মেয়েটা গাছে উঠলো। এই ভেবে সে অনেকটা মারমুখো হয়ে কামরাঙা গাছের দিকে এগোতে থাকে। আর দাঁত কটমট করে বলতে থাকে, এতো নিষেধ করলাম তরে, তারপরও গাছে উঠছস তুই! দেখিস- আইজ মাইরা তরে কী দশা করি।

আজরাইলের মতো যাকে ভয় পায়, সেই বড় ভাই কিনা রাগে ফুঁসে হাঁক-ডাক ঝাড়তে ঝাড়তে গাছের নিচে আসতেছে; একথা আঁচ করে দিশাহ-রার মতো তানিয়া ক্রমাগত গাছের উপরে উঠতে থাকে। বড় ভাইয়ের নাগাল ছেড়ে উঁচু থেকে আরও উঁচুতে ওঠায় তৎপর হয় সে। একের পর এক ডাল অতিক্রম করে সে যখন মগডালে, তখন বড় ভাই গাছের নিচে এসে হাঁক ছাড়ে, কইরে তানিয়া...! রাগে উন্মত্ত ভাইয়ের কর্কশ স্বর শুনে কামরাঙা গাছের চূড়ায় উঠে পলায়নপর তানিয়া আরও উঁচুতে আরোহণ করে বাঁচার পথ খুঁজে। সেই প্রয়াসে আকাশে উড্ডীন গাছের শীর্ষের ডালটা ধরার জন্য হাত বাড়িয়ে যেই না বড় ভাইয়ের অবস্থান দেখার জন্য নিচের দিকে তাকায়, অমনি হাত ফসকে আচম্বিৎ সরাং করে পড়ে যায়। তখন ছোটবোন ঠিক তার নিচে। বড় ভাই কনিষ্ঠবোন ইতিকে বাঁচাতে গিয়ে এক হাতে তাকে সরিয়ে পতনশীল তানিয়াকে ধরার জন্য ওপরে হাত তুলতে তুলতেই গগনবিদারী একটি আর্তিচিংকার আকাশে-বাতাসে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়। কিছু বুঝবার আগেই চোখের পলকে ঘটে যায় দুর্ঘটনাটি।

হায় তানিয়া! উপর হয়ে মাটিতে পড়ে প্রচণ্ড আঘাত পেয়ে অজ্ঞান হয়ে যায় তানিয়া। ডান বাহুর হাড় ভেঙে মাটিতে পুঁতে যায়। কজির কাছে ভাঙে বাম হাতও। চোখের সামনে ছোটবোনের এ সর্বনাশ দেখে চিংকার দিয়ে বোনকে উদ্ধার করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ে মারফত আলী। রক্তাক্ত এবং অচেতন বোনকে দু'হাতে পাজাকালো করে তুলে প্রথমে ভাঙা হাতটা সোজা করে স্বাভাবিক করার চেষ্টা করে। তারপর দ্রুত বাড়ির দিকে নিয়ে চলে। মুহূর্তে ভয়াবহ এ দুর্ঘটনার খবর চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ছুটে আসে বাবা-মা, ভাইবোন এবং পাড়া প্রতিবেশি। বাড়িতে একেবারে মরাকান্না শুরু হয়। বড় ভাই মারফত আলী ছোটবোন তানিয়াকে ঘরের বারান্দায় নিয়ে শোয়ায়।

উপর হয়ে পড়াতে দু'হাত যেভাবে ভেঙেছে সে অনুপাতে বুক আঘাত পেলে তো বেঁচে থাকার কথা না। এ অবস্থায় অভিজ্ঞরা পরখ করে দেখে তানিয়া আদৌ বেঁচে আছে কিনা। শ্বাস-প্রশ্বাস সচল থাকায় সবাই আশ্বস্ত হয়ে প্রয়োজনীয় চিকিৎসার

কথা ভেবে তাকে দ্রুত উপজেলা সদর হাসপাতালে নিয়ে যাবার জন্য সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু যোগাযোগ ব্যবস্থা যে সেকেন্দ্রে। চারপাশের বিল-নদীর পানি গেছে কমে। কাজেই নৌকার কথা না ভেবে বরং তক্তা দিয়ে চাঙারি বেঁধে রওয়ানা হয়। দুজন কাঁধে করে জোর কদমে হাঁটে। কিছুদূর গিয়ে আবার দুজন বদল হয়। এভাবে চারজন মানুষ কাঁধে করে বয়ে নিয়ে চলে প্রায় দশ কিলো পথ। রাস্তায় কিছুটা জ্ঞান ফিরে তানিয়ায়। প্রচণ্ড যন্ত্রণায় ক্ষিপ্ত হয়ে কাতরাতে থাকে সে। আহা কী করণ সে দৃশ্য! প্রায় দুই ঘণ্টায় ওরা হেঁটে এসে পৌঁছে হাসপাতালে। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়া হয়ে বটে। তবে রোগীর মারাত্মক অবস্থা বিবেচনা করে তাকে ময়মনসিংহ হাসপাতালে দ্রুত নিয়ে যাবার পরামর্শ দেয়া হয়। কিন্তু ওই মুহূর্তে ময়মনসিংহ হাসপাতালে নিয়ে চিকিৎসা করানোর মতো টাকা তাদের হাতে নেই। তখন তাদের সঙ্গে আসা তানিয়ার বাবার চাচাত ভাই পরামর্শ দিয়ে বলে, বাউশাম বাজারের কাছে আরজ আলী ফকির নামে হাড়ভাঙার একজন কবিরাজ আছে। এমন হাড়ভাঙার বহু রোগী নাকি তার চিকিৎসায় ভালো হয়েছে।

তিন, ময়মনসিংহ নেওয়ার কথা বলে হাসপাতাল থেকে ওরা ছাড়পত্র নেয় ঠিকই। কিন্তু ময়মনসিংহে না নিয়ে তাকে নিয়ে যাওয়া হয় বাড়িতে। ফেরার পথেই তো বাউশাম বাজার। তার দক্ষিণেই আরজ আলী ফকিরের বাড়ি। তাই রোগী নিয়ে বাড়ি যাওয়ার সময়েই আরজ আলী ফকিরের জন্য লোক পাঠিয়ে দেয়া হয়। তানিয়াকে নিয়ে বাড়ি ফেরার কিছুক্ষণের মাঝেই কবিরাজ হাজির হয় ওদের বাড়িতে। চলে কবিরাজি চিকিৎসা। ক্ষতস্থানে গাছের শিকড়-বাকড় লাগিয়ে বাঁশের চটি দিয়ে যখন হাত সোজা করে বাঁধে তখন আবার জ্ঞান হারায় তানিয়া। আহা! আত্মা বেরিয়ে যাবার মতো যন্ত্রণা। তবে স্বজনদের সেবায় কিছুক্ষণের মাঝেই আবার চেতনা ফিরে পায় সে। ডাক্তারের ব্যথা নাশক ওষুধ কিংবা ঘুমের ওষুধ দেয়া হলেও কিছুক্ষণ পরপর চিড়িক দিয়ে উঠে ব্যথা। অসহ্য যন্ত্রণায় ভেঙে যায় ঘুম। শয্যাপাশে মা জেগে। মা বলেন, সবুর কর তানিয়া। কবিরাজ ওষুধ দিয়া বাইস্কা দিচ্ছে। কয়েকদিনের মাঝেই ভালো অইয়া যাইব। ভোরে কবিরাজ চলে যায়। রাত যায়, দিন যায়। তানিয়ার যন্ত্রণা তো কমে না। তবু চলতেই থাকে কবিরাজি চিকিৎসা। কবিরাজ তানিয়ার ভাঙা হাত ভালো করার নিশ্চিত আশ্বাস দেয়। কিন্তু ততক্ষণে তানিয়ার ভাঙা বাহু আরও ফুলে উঠে। অসহ্য ব্যথায় বাড়ে তানিয়ার আত্মদানও। ভালো লাগা বা একটু আরাম লাগার কোনো লক্ষণই বুঝা যায় না। পরের রাতও কাটে কঠিন যন্ত্রণায়। কবিরাজি চিকিৎসায় যেন হিতে বিপরীত হতে থাকে। দুটি হাতই ফুলে মারাত্মক আকার ধারণ করে। পরিস্থিতি এমন দাঁড়ায়, রোগীর প্রাণ বাঁচানোই দায় হয়ে যায়। তানিয়ার হাতটা প্রথমে নীল হয়ে পরে কালো রঙ ধারণ করতে থাকে। এদিন সকালে কবিরাজ এসে যখন হাতের ব্যান্ডেজ খুলতে যায় তখন তার চিকিৎসার অসারতা ধরা পড়ে। ডান হাতের ভাঙা অংশের ত্বকে পঁচন ধরে বাহু থেকে নিচের অংশ বিচ্ছিন্ন

হয়ে কবিরাজ বুঝে ফেলে। এ অবস্থা দেখে কবিরাজ ব্যাণ্ডেজ পুরোপুরি না খুলেই ওষুধ আনার অজুহাতে বের হয়। যাবার সময় তানিয়ার বাবাকে বলে যায়, ব্যাণ্ডেজটা যেনো নিজেরা খুলে। যদি দেখে হাতের নিচের অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, তখন একটা কলাপাতা কেটে এনে সেটায় যেনো বিচ্ছিন্ন হাতটা রাখে। সে ওষুধের জন্য যাবে আর আর আসবে। যদি তার ফিরতে দেরি হয়, তাহলে বুঝতে হবে ওষুধ পায়নি। তখন রোগীকে নিয়ে যেনো ওরা ময়মনসিংহ হাসপাতালে চলে যায়। এই বলে সেই যে কবিরাজ যায়, আর তো ফিরে আসে না। কিছুক্ষণ পর তার বাবা এবং স্বজনরা ব্যাণ্ডেজটা যখন খুলে দেখতে পায় তানিয়ার নিচের হাতটা বিচ্ছিন্ন। বাবা তখন তার এক ছেলেকে একটা কচি কলাপাতা কেটে আনতে বলে। তানিয়ার ব্যান্ডেজ সম্পূর্ণ খুললে দেখতে পায় ভাঙা বাহুর নিচের অংশের সঙ্গে রক্তচলাচলকারী সব শিরা-উপশিরা পঁচে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। ওই বিচ্ছিন্ন হাতটা যখন কলাপাতায় রাখে, তখন আত্মদানরত তানিয়া এ দৃশ্য দেখে চমকে উঠে অস্তির স্বরে বলে, আমার হাত-আমার হাত খসে পড়লো ক্যান বাবা! আমার হাতের কী হবে? বাবা তখন কান্নারত মেয়েকে প্রবোধ দিয়ে বলে, এই তো কিছুক্ষণের মাঝেই তরে লইয়া আমরা ময়মনসিংহ হাসপাতালে যামু। হাসপাতালে নিয়া গেলে তর এই ওরা হাত লাগাইয়া দিব। কিছুক্ষণ কবিরাজের জন্য অপেক্ষার পর অবস্থা বেগতিক অনুভব করে তানিয়াকে নিয়ে শেষে হাসপাতালের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। ময়মনসিংহ হাসপাতালে নিয়ে ভর্তি করে তাকে। চলে চিকিৎসা। কিন্তু ততদিনে অনেক দেরি হয়ে গেছে। হাসপাতালে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ধরা পড়ে, বাহুর ভাঙা হাড়ে মাটি ঢুকছিল। সেখানে ইতোমধ্যে সেকেন্দারি ইনফেকশন হওয়ায় মারাত্মক পঁচন ধরে গেছে। দ্রুত সে ভাঙা বাহুর কিছু অংশ না কাটলে তার জীবনই সংশয় হয়ে পড়বে। শেষ পর্যন্ত তানিয়ার ডান বাহু আর জোড়া লাগেইনি। উপরন্তু ভাঙা অংশের কিছু অংশও কাটতে হয়। এভাবে তার ডান বাহুটা চিরতরে হারাতো হয়। আসলে গ্রামে কবিরাজি অপচিকিৎসা করতে গিয়ে মেয়েটাকে এমনই সর্বনাশের কবলে পড়তে হয়। অথচ গাছ থেকে পড়ে হাত ভাঙার পরপরই স্থানীয় হাসপাতালের পরামর্শ অনুযায়ী যদি আগেভাগে ময়মনসিংহ হাসপাতালে এনে সময়মতো চিকিৎসা দেয়া হতো, তাহলে হয়তো বা এমন করণ দশা হতো না। কাটতে হতো না তার ওই হাত। চিকিৎসা শেষে তানিয়াকে নিয়ে আসা হয় গ্রামের বাড়িতে। গাছ থেকে পড়ে ডান হাত খোয়ানোর পর যখন কিছুটা সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছে, তখন ডিসেম্বর মাস। স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষা তো শেষ হয়েছে নভেম্বর মাসেই। ততদিনে ফলাফল প্রকাশের সময় হয়ে গেছে। দুর্ঘটনার কবলে পড়ার জন্য তো সে পরীক্ষাই দিতে পারেনি। তাছাড়া যে হাতে সে লিখতো, সে হাতও তো আর নেই। তাহলে কী হবে তার? সে কি আর পড়ালেখা করতে পারবে না? এর মাঝেই সহপাঠীরা তাকে দেখতে এসেছিল। ওরা বলেছে, ভালোভাবে পরীক্ষা দিয়েছে। কিছুদিনের মাঝেই পরীক্ষার

ফলাফল বের হবে। অথচ, ভাগ্যের কী নির্মম পরিহাস! তানিয়া তখন বিছানার আশ্রয়ে। ডাক্তার তাকে কিছুদিন বিছানায় শুয়ে বিশ্রামে থাকার পরামর্শ দিয়েছে। ঘরের বিছানায় কতক্ষণ আর শুয়ে থাকা যায়। বাইরের পৃথিবী দেখার ইচ্ছে হয় তার। তানিয়া তার এ ইচ্ছের কথা মা-বাবাকে জানায়। তখন ঘরের খোলা বারান্দার এক পাশে কাঠের দুটি তক্তা দিয়ে চাঙা বেঁধে তানিয়ার শোয়ার ব্যবস্থা করা হয়। বারান্দায় শোয়া অবস্থায় নিজের পড়াশোনা নিয়ে রাজ্যের চিন্তায় পড়ে তানিয়া। ভাবে, যে হাত দিয়ে সে লিখতো, সেই হাতটাই তো এখন নেই তার। লিখতে না পারলে পড়ালেখা করবে কী করে? অনেক ভাবনা-চিন্তার পর মনে মনে সে সিদ্ধান্ত নেয়, যে করেই হোক পড়ালেখা তার করতেই হবে। কিন্তু কিভাবে? বাম হাতে লিখতে পারবে সে? মনে মনে ভাবে, চেষ্টা করে দেখা যাক না। যেই ভাবনা-সেই কাজ। সেই থেকে সে বারান্দার বিছানায় শুয়ে বাম হাতের আঙুলে তক্তার ওপর আঁচড় কেটে বর্ণমালা লিখার প্রয়াস চালায়। সে লিখে যায় অ আ ক খ গ ঘ। এভাবে লিখে যায় সবগুলো অক্ষর। তারপর অক্ষরের পর অক্ষরের মালা গাঁথে শব্দ লিখে। আর তার এ প্রয়াসে তক্তার ওপর কটকট শব্দ হয়। বারবার এরূপ শব্দ হলে মা জিজ্ঞেস করে, কী রে তানিয়া! কীয়ের শব্দ করস। -বামহাতে লেখার চেষ্টা করি মা। -বাম হাত তুই লেখতে পারবি! -আমার পড়ালেখা করতে অইব না মা! স্কুলে যাবো না আমি... বাবা তখন ঘরে। তানিয়ার এ কথা শুনে ঘর থেকে বের হয় বাবা। ডান হাত হারানো মেয়েকে নিয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত বাবা যেনো চরম হাতাশার সাগরে ভাসমান অবস্থায় একটা অবলম্বন পেয়ে যায়। অনেকদিন পর তার বিষণ্ণ মুখে আশার আলোর রোশনি ছড়ায়। তাই আবেগে মেয়ের শয্যাপাশে বসে বলে উঠে, তুই পারবি রে মা, লেহাপড়া করবার পারবি তুই! -হ্যাঁ আবু, আমি লেখাপড়া করব। এই যে আমি বাম হাতের আঙুলে লেখা শিখার চেষ্টা করতেছি। -হ্যাঁ মা, তুই চেষ্টা কর। চেষ্টা করলে তুই পারবি। আমি তোর অধম বাবা-পরাণ ভইরা দোয়া করি, তুই লেহাপড়া কইরা অনেক বড় অইবি, হ অনেক বড়... বাবা কথা শেষ করতে পারে না। হঠাৎ আবেগের ঝড় এসে তার দুচোখ ঝাপসা করে দেয়। মাও তখন তানিয়ার কাছে এসে অসুস্থ মেয়ের মাথায় স্নেহের হাত বুলিয়ে বলে, হ রে তানিয়া! চেষ্টা কইরা দেখ! বাম হাতে যদি লেখতে পারস, তাহলে তো লেহাপড়া করতেই পারবি। তা না অইলে একটামাত্র হাত লইয়া তুই কী করবি! তর ভবিষ্যৎ চিন্তায় রাইতে আমার ঘুম অয়নারে! কী মেয়ে আছিল আমার, আর কী অইয়া গেলো। এ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে মায়ের চোখেও পানি আসে। মা তখন আঁচলে দুচোখ মুছে। তানিয়া তখন বাম হাতে মা ও বাবাকে জড়িয়ে ধরে বলে, বাবা-মা, আপনারা আমার জন্য দোয়া করেন, আমি জান-প্রাণে চেষ্টা কইরা দেখি কী করণ যায়। চার,

ধীরে ধীরে তানিয়া সুস্থ হতে থাকে। বিছানার আশ্রয় ছেড়ে ক্রমে সে বাড়ির উঠানে বের হয়, আঙিনায় হাঁটাচাঁটা করতে পারে। কিন্তু তখন তার একটিই ধ্যান-জ্ঞান, বাম হাতে লেখা শেখার সাধনা। উঠানে বসে কখনো বাম হাতের আঙুলে মাটিতে আঁচড় কেটে লিখে, কখনো বা পাটশলা দিয়ে আবার কখনো বা ঝাড়ুর শলা ভেঙে মাটিতে লিখে চলে। মেয়েটির অদম্য আগ্রহ দেখে তাকে একাজে সহযোগিতা করে বাবা এবং মা। বাবা কলাগাছ থেকে মসৃণ পাতা কেটে এনে দেয়। বাঁশের কক্ষি কেটে বানিয়ে দেয় কলম। ওদিকে মা রান্নার পাতিলের তলা চোঁছে পানিতে মিশিয়ে কালি বানিয়ে একটা বাটিতে করে তা এনে দেয়। তানিয়া কালিতে বাঁশের কক্ষি চুবিয়ে চুবিয়ে বাম হাতে লিখার প্রয়াস চালায়। প্রতিদিনের অনুশীলনে ধীরে ধীরে দক্ষ হয়ে উঠে সে। কলা পাতার পর্ব শেষে শ্রেটে পেসিল দিয়ে দ্রুত লিখার অনুশীলন করে, যাতে শ্রেণিকক্ষে অন্যান্য ছেলেমেয়েদের সমতালে লিখে যেতে পারে। তারপর সে কলম দিয়ে খাতায় যখন লিখতে পারে তখনই একদিন বাবাকে নিয়ে স্কুলে যায়। তখন জানুয়ারি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ। স্কুলে বাবাকে নিয়ে সে সোজা প্রধান শিক্ষকের কক্ষে ঢুকে। প্রধান শিক্ষক জগদীশ চন্দ্র তালুকদার তানিয়াকে দেখে তো অবাক। প্রিয় ছাত্রীর সব খোঁজখবরই রাখেন তিনি। তাই সহানুভূতির স্বরে বলে, তানিয়া, তুই সুস্থ হইছস!

-জি স্যার! স্যার আমি পড়ালেখা করব স্যার।

-কিভাবে? তোর লেখার হাতটা... তো... লিখবি কেমনে?

জগদীবাবুর একথা শুনে তানিয়ার বাবা বলে উঠে, তানিয়া তো বাম হাতে লেখতে পারে স্যার। অসুস্থ থাকা অবস্থায়ই বিছানায় শুইয়া লেখার চেষ্টা শুরু করছে সে। তারপর একটু সুস্থ অইয়াই দিনে-রাইতে চেষ্টা কইরা অহন তো মাশাল্লাহ ভাইন হাতের মতো লেখতে পারে।

-তাই নাকি!

-হ্যাঁ সার। বাম হাতেই এখন আমি ডান হাতের মতো লিখতে পারি। কিন্তু স্যার...

-আবার কিন্তু কেনো...

-স্যার, আমি তো বার্ষিক পরীক্ষা দিতে পারি নাই। স্যার, দয়া করে আমারে চতুর্থ শ্রেণিতে প্রমোশন দেন স্যার!

তানিয়ার এ কথা শুনে প্রধান শিক্ষক কিছুক্ষণ থুম ধরে থাকেন। তারপর মুচকি হেসে বলেন, যা-তোকে অটো-প্রমোশন দিয়ে দিব। আমি জানি তুই পারবি, ওই মেধা তোর আছে। তাহলে আগামীকাল থেকেই স্কুলে আসতে শুরু কর।

প্রধান শিক্ষকের একথা শুনে তানিয়ার বাবা হঠাৎ করে আবেগাক্রান্ত হয়। আর সেই আবেগের বশে আচম্বিৎ সে জগদীশ বাবুর ডানহাত চেপে ধরে তার বুকের সঙ্গে মিশিয়ে ডুকরে কেঁদে ফেলে। কান্না-ভাঙা স্বরে সে বলে, আমার মেয়েডার কী অইয়া গেলো স্যার! ওর ভিষ্যৎ-ই বা কী অইব... এ পর্যন্ত বলার পরই কণ্ঠরুদ্ধ হয় তানিয়ার বাবার। সেই আবেগে সংক্রমিত হয় প্রধান শিক্ষক জগদীশ বাবুও। কারণ তার প্রিয় ছাত্রছাত্রীদের একজন এই তানিয়া। শুধু তাই নয়, তিনিও তো এমন সন্তানদের একজন পিতাও। তাই বাৎসল্যরসে তার আবেগও উথলে উঠতে চায়। ঝাপসাও হয়ে আসে

তার দুচোখ। কিন্তু কঠোর আত্মশাসনে নিজেকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে বলে, শান্ত হন তানিয়ার বাপ! দেখবেন, এই মেয়ে একদিন আপনার-আমার, সবার মুখই উজ্জ্বল করবে।

অন্তর্ভেদী কষ্টে তানিয়ার বাবা তখনো শান্ত হতে পারেনি। তাই জগদীশ বাবু তানিয়াকে বলে, বাবাকে নিয়ে বাড়ি যা। আগামীকাল থেকেই স্কুলে আসবি।

পরদিন থেকে বাঁ-হাতি তানিয়ার স্কুল জীবন শুরু হয় আবার। স্কুলের সহপাঠীদের সঙ্গে এতটাই আন্তরিক যে, ওই পরিবেশে অঙ্গহীনতার সে কথা ভুলেই থাকে। স্কুলের শ্রেণিকক্ষে দিনে দিনে তার অবস্থান আরও সুসংহত করে। খেলাধুলায় কিংবা চিত্রাঙ্কন, কবিতা আবৃত্তি, গান ইত্যাদি সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডেও সে বরাবরই তার যোগ্যতার প্রমাণ দেয়। স্কুল ছুটির পর বাড়ি ফিরে বিকেলটা কখনো কখনো তাকে বেদনাহত করে। গাছে ওঠা কিংবা নদী বা খালে অন্যদের মতো আর সে আর সাঁতার কাটতে যায় না। কারণ ওসব কাজে তো দুটি হাতই থাকতে হয়। সে সময়ে অতীতের খেলার সাথীদের সঙ্গে না গিয়ে সে বরং পড়ালেখায় মনোযোগী হয়। সে ভাবে তার এই অঙ্গহানীর অযোগ্যতা, তা পড়াশোনার মাধ্যমেই পূরণ করতে হবে। এজন্যই শ্রেণিকক্ষে সে আরও প্রাপ্ত হতে উঠে। বাড়িতে মাঝে-মাঝে পড়ালেখায় সহযোগিতা করে তার কলেজ পড়ুয়া মেঝোভাই। পরিবারের আর্থিক টানা পড়েনের জন্যই মেঝোভাইকে জেলা সদরের কলেজে স্নাতক পাস কোর্সে পড়তে হচ্ছে। ছাত্র হিসেবে সেও কম মেধাবী ছিল না। বছর শেষে স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষায় ফলাফলে তানিয়া চমক দেখায়। ক্লাসে অনেক নম্বরের ব্যবধানে সে হয় অপ্রতিদ্বন্দ্বী। পঞ্চম শ্রেণিতে তার রোল নম্বর হয় এক। শিক্ষকরা তাকে নিয়ে রীতিমতো স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। বৃত্তি পরীক্ষায় সে ভালো করবে বলে সবাই আশায় বুক বাঁধে।

পাঁচ

তানিয়ার ফুফুর বাড়ি পাশের ইউনিয়নের পশ্চিম-দক্ষিণ দিকে ভাটি এলাকায় সাউদপাড়া গ্রামে। তার ফুফাতো বোন মোমেনা খাতুন। তানিয়ার সমবয়সী। পড়ে একই ক্লাসে। বাবা ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বর। সাউদপাড়া তো বলতে গেলে নিচু এলাকা। বর্ষা এলে এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়িতে যেতে তাদের নৌকায় চলাচল করতে হয়। মোমেনাদের মাঠ ভরা ফসলের জমি। অনেক ধান পায় ওরা। প্রায় হাজার মণ। মোমেনা তখন আরও ছোট ছিল। সে সময়ে মোমেনাকে নিয়ে নানির বাড়ি এসেছিল তার মা। তখন মেঝে মামা মোমেনার মাকে বলেছিল, বুজান তোমার এই মেয়েরে কিছু আমার ছেলে আরিফুলের লগে বিয়া দেওন লাগবো। এই কথাটা আমি আগেই কইয়া রাখলাম। সেই থেকে এ কথাগুলো এ মুখ থেকে সে মুখ হয়ে পাড়ার অনেকের কানে গড়িয়েছে। জানে আরিফের প্রতিবেশী বন্ধু জয়নাল এবং আমজাদও। মোমেনা তখন চতুর্থ শ্রেণিতে পড়ে। গ্রীষ্মের ছুটিতে মোমেনা নানির বাড়ি এসেছে। তানিয়ার দাদিই হলো মোমেনার দাদি। মোমেনার চাচারা আলাদা হয়ে গেলেও দাদি থাকেন তানিয়াদের পরিবারেই। মোমেনার আগমনের খবর জানতে পারে আরিফের দুই ঘনিষ্ঠ বন্ধু আমজাদ এবং জয়নাল। দুরন্ত এই

তিন কিশোর বলতে গেলে পাড়াটাকে মাথায় তুলে রাখে। গোবিন্দপুর হাইস্কুলে ওরা ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ে।

দুরন্ত তিন কিশোর যুক্তি করে এমন একটি ঘটনা ঘটায়, প্রতিজ্ঞায় এক কিশোরীর মাথায় পড়ে বাজ। তিন কিশোরের মাঝে জয়নাল হঠাৎ প্রস্তাব দিয়ে বলে, আরিফুল যদি এ কাজটা করতে পারিস, তাহলে তোর গলায় বিজয়ে মালা পরাবো। জবাবে আরিফুল বলে, এমন কী কাজ রে! বলেই একবার দেখ না, করতে পারি কিনা!

জবাবে জয়নাল এবার কয়, বলতেছি; মনোযোগ দিয়া শোন তাইলে। বড় হইলে মোমেনার সঙ্গে তোকে নাকি বিয়ে দিবে, এমন একটা গল্প পাড়ার অনেকেই জানে। মোমেনা তো তোর ফুপাতো বোন। গ্রীষ্মের ছুটিতে নাকি নানির বাড়ি, তথা তানিয়াদের বাড়িতে আসছে।

জয়নালের কথার রেশ টেনে আমজাদ বলে, এমন একটা সুযোগ তো বন্ধু আমরা হাত ছাড়া করতে পারি না!

ওদের ওসব কথা শুনে আরিফুল বলে, কী করতে কস তোরা...!

আমজাদ তখন আরিফুলকে উদ্দেশ করে বলে, কেমন যে তোর বুকের পাটা, তা তো আমি জানি। জেদে তখন আরিফুল বলে, আগে বিষয়টা শুনো লই। তারপর দেখা যাক কী করা যায়।

জয়নাল ফোড়ন দিয়ে তখন আরিফুলকে বলে, কথা তো কস ন্যাকার মতো,

এই পরীক্ষায় দেখবো এবার বীর পুরুষের সাহস কেমন!

জবাবে আরিফুল বলে, আগে বলেই দেখনা, কাজটা কী করতে হবে।

জবাবে জয়নাল বলে, একা একা মোমেনার সামনে গিয়া চুপি চুপি কইবি,

প্রিয় মোমেনা! শপথ কইরা বলতেছি, বড় হয়ে আমি তোমাকে বিয়ে করব।

জবাবে আরিফ বলে, যা বিটলার দল। এসব কথা বাদ দে তো।

জয়নালের কথা শেষ না হতেই আমজাদ বলে, আগেই তো কইছিলাম, তোর মতো কাপুরুষের পক্ষে এই কাজ কোনোদিন সম্ভব না।

-দেখ আমজাদ, আমারে কাপুরুষ কইবি না।

-তাইলে পারলে কাজটা কইরা বীরত্ব দেখা।

-আচ্ছা, আগে শুন, বীরত্ব প্রমাণ করতে আর কী করতে হবে আমার...?

-এই কাজটা করতে তোকে ফাঁক বুঝে নিরিবিলি মোমেনার কাছে যেতে হবে, আমরা যদিও আড়াল থেকে ওসব আঁড়ি পেতে তোর কথা শুনব।

সফলভাবে বলতে যদি পারিস তবে বাজিতে তোর জেতা হবে। বিনিময়ে যত পারিস মিষ্টি খাবি।

বিফল হলে তুই উল্টো দাবি মিটাবি। সফল হলে একগুণ নিবি বিফলে তুই দ্বিগুণ দিবি। এমন শর্তে যদি রাজি থাকস, তবেই কেবল বাজি ধরতে পারস।

গোঁয়ার আরিফুল। হার মানা তার স্বভাবজাত না বটে। আবার মনে মনে বলে, এমন কাজেও কি বাজিতে যাওয়া যায়?

এ বিষয়ে কী করবে, তা নিয়ে কিছুক্ষণ সে চুপচাপ ভাবে। ওদিকে প্রতিপক্ষও দিতে থাকে এমন চাপ! শেষে আরিফুল ঘাড় বাঁকিয়ে থেকে ওদের প্রতি



অপলক তাকায়। তারপর দৃঢ় কর্তে বলে, আমি, তোদের প্রস্তাব গ্রহণ করলাম। তাতে কর্মফল যা আসে আসুক, দরকার পড়লে আজীবন তার ফল বহন করবো।

আরিফুল যখন এ পণ করে বসে, দুই বন্ধু তখন হুল্লোড় করে হাত তালি দেয় আর বলে, শাবাশ বন্ধু শাবাশ!

অতঃপর তার বাহু ধরে সামনের দিকে এগিয়ে যায়। চাচার বাড়ি একই তো পাড়ায়। তিন দুরন্তের দু'জন দৃঢ় পায়ে হাঁটে আর মুচকি হাসে। যেনো একটা রাজ্য জয় করতে বীরের বেশে যাচ্ছে ওরা। কিন্তু আরিফুল যতই এগোয়, প্রতি পদক্ষেপে পা দুটি যেনো তার গতি হারায়। এ অবস্থায় বন্ধু দুটি তাকে নিয়ে পথে দাঁড়ায়। জয়নাল বলে, সামনে আগানো কী দরকার হবে আর। হার মানাটাই খুব সহজ।

ওসব শুনে আরিফুল দৃঢ় চোখে ওদের প্রতি তাকায়। তারপরই সে বিমর্ষ মুখটা ওপরে তুলে সামনের দিকে হাঁটতে থাকে। চাচার বাড়ি, দাদির পুরান ঘরের প্রতি লক্ষ্য স্থির করে সে। মনে মনে ভাবে, তানিয়া যদি কাছে থাকে তাহলেই মুশকিল। যে মুখরা মেয়ে তানিয়া! ওর সামনে মোমেনাকে কিছুই বলা যাবে না।

বাড়ির আঙিনায় গিয়ে মনে মনে কী যেনো পরিকল্পনা আঁটে। তারপর একটা ছুতোয় বাড়িতে ঢুকে আরিফ। নানা অজুহাতে কথা বলে দাদি কিংবা চাচির সঙ্গে। তানিয়া তখন স্নান করতে গেছে। নিরিবিলি এ সুযোগটা নেয় আরিফ। ঝটপট মোমেনার সামনে যখন দাঁড়ায়, তার উপস্থিতিতে মোমেনাও কেমন জড়োসড়ো হয়ে যেতে থাকে। আর তাতে বাজি ধরার সাজানো সব কথামালা কোথায় যেনো উবে যায়। বিপদ বুঝে আরিফ মনে মনে বলে, কথা যদি মুখে না ফুটে তো নিশ্চিত হারতে হবে তাকে। তাহলে পরাজয়ের গ্লানিই কি তার সহিতে হবে?

এমন ভেবেই আরিফ তখন কেমন যেনো ঘেমে উঠে। তবু সে দমে যায় না। বরং হঠাৎ দু'চোখ বুঝে তড়িঘড়ি বাজি ধরার কথাগুলো সে ফুটায় ঠোটে।

মস্তের মতো কথাগুলো বলেই আরিফ ঘর থেকে দৌড়ে বেরিয়ে যায়। দৌড়ে পিছু ধাওয়া করে তার অপরাপর বন্ধু দুজন। তিন দুরন্তের এমন ছুটে চলা দেখে কোথায় ওরা কী ঘটিয়েছে, তা আঁচ করতে তৎপর হয় কেউ কেউ। ততক্ষণে বিজয়ী এ বীরকে নিয়ে বন্ধুদ্বয় গায়ের বাজারের দিকে ছুটে চলে। ওদিকে অভাবিত কথাগুলো শোনার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় মোমেনার মন ও দেহে। মুহূর্তের মাঝেই মোমেনার গায়ে কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসতে থাকে। দূর থেকে এসব কথার কিছুটা শুনে ঘটনা আঁচ করেই মোমেনার নানি কাছে আসে। মোমেনার জ্বর আসতে দেখে আরিফ এবং তার দু'বন্ধুকে গালাগাল করতে থাকে বৃদ্ধা। আর বলতে থাকে এর উচিত বিচার না করে ছাড়বে না।

তানিয়াও ততক্ষণে স্নান সেরে দাদির কাছে ঘটনা শুনে তো তাজ্জব বনে যায়। সেও বলে, এই ঘটনার উচিত বিচার না করে রেহাই দেয়া হবে না। এভাবে দাদি-নাতি এ ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে আরিফের বিচার করার পক্ষে একমত হয়। আর এদিকে তিন দুরন্ত উল্লাস করে বাজার থেকে

মিষ্টির প্যাকেট নিয়ে যখন বাড়ি ফিরছে তখন পথে আরিফকে তার ছোট ভাই শরীফ বলে, আজকে মিষ্টির প্যাকেট নিয়া বাড়িতে গেলে তোমার কিছু আর রেহাই নাই। এমন কী কথা কইছ, যে মারাত্মক কথার চোটে মোমেনা বুবুর গায়ে একেবারে কাঁপা জ্বর দেখা দিচ্ছে। এই জন্য দাদি আমগর বাড়ি গিয়া মায়েরে কইয়া আইছে। এই জন্য মা কইল, বাড়িতে তোমার জয়গা নাই আর। এমন কথা শুনে তিন দুরন্তের মুখে হাসি কি আর থাকে, মুহূর্তে বিষণ্ণতার কালো ছায়ায় ওদের চাঁদ মুখ ঢেকে যায়। ক'মিনিট ওরা শুধু একে অন্যের মুখের দিকে পরপর তাকাতে থাকে। অখচ কারো মুখে কোনো রা ফুটে না। কিছুক্ষণ পর জয়নাল তার তর্জনি আরিফের দিকে তুলে আমজানকে বলে, দেখ-দেখ কেমন ন্যাকা সে, ভয়ের চোটে আরিফের মুখ কেমন ফ্যাকাসে হয় গোছে, দেখ! এই বলে ওরা যখন আরিফকে নিয়ে হাসাহাসি করে, তখন আরিফ হঠাৎ চটে গিয়ে বলে, এই তোদের জন্যই তো আজকে আমার এই দশা। তার প্রতি তখন সহমর্মী হয়ে জয়নাল বলে, মিষ্টির প্যাকেট তোরা ছোট ভাইয়ের কাছে দিয়া চল আমরা আবার বাজারে চলে যাই।

-আমার আর মিষ্টির দরকার নাই। তোরাই লইয়া যা। আমি আর তোদের সঙ্গে নাই। মারুক-কাটুক যাই করুক, কিছুক্ষণ পর আমি বাড়িতেই যামু। এই বলে আরিফ পাশেই খালের পাড়ে একটা গাছ তলায় গিয়ে বসে। ওদিকে জয়নাল আর আমজাদ শুকনো মুখে স্ব স্ব বাড়ির উদ্দেশে রওয়ানা হয়। রাতেই অবশ্য মোমেনার জ্বর কমে আসে। সুস্থ হয়ে উঠে সে। পরদিন তানিয়াকে নিয়ে সকালেই মোমেনা তাদের গ্রামের বাড়ি চলে যায়।

হয়।

ডানপিটেপনা করে ডান হাত খোয়া গেলেও তানিয়ার দুরন্তপনা একেবারে কমে যায়নি। পাহাড়ি নদী মঙ্গলেশ্বরীতে একহাতে সে সাঁতার কাটাও রপ্ত করে ফেলে। পানিতে নেমে দু'পা অধিক সক্রিয় করে এক হাতের অভাব সে পূরণ করতে সচেষ্ট হয়। তাতে আশানুরূপ সফলতাও পায়। পাড়ার বান্ধবীদের সঙ্গে নদীর ডোবার জলে সাঁতার প্রতিযোগিতায় সে পিছপা হয় না। বরং এক হাতেই প্রতিপক্ষদের হারিয়ে দেয়।

কিন্তু তাদের পরিবারে একজন সাঁতার কাটতে পারে না। আর তিনি হলেন তানিয়ার বড় ভাই মারফত আলী। এই যে পরিবারের লোকেরা তাকে সাঁতার শিখার জন্য এতো বলাবলি করে, তারপরও সে কোনো রকমেই সাঁতার শিখবে না। নদীতে নেমে গোছল করে ঠিকই। তবে সঙ্গে মগ নিয়ে যায়। হাঁটু পানিতে নেমে মগ ভরে পানি মাথায় ঢালে। কিন্তু কখনো ডুব দিয়ে গোছল করে না। আর ডুব দিয়ে গোছল করলে নাকি তার কানে পানি ঢোকে, সমস্যার সৃষ্টি হয়। এ জন্য তাদের মারফত ভাই সাঁতার শিখে না।

এদিকে দুরন্তপনায় তানিয়া গাছে ওঠা থেকেও পিছপা হয় না। তার ভাবনা, গাছ থেকে পড়ে কবিরাজি চিকিৎসায় তার ডানহাত খোয়া গেছে। সময়মতো হাসপাতালে চিকিৎসা নিলে হয়তো তার এই করুণ পরিণতি হতো না। যা হোক, সে গাছে ওঠা ছাড়েনি। লোক চক্ষুর আড়ালে সে আম গাছে উঠে। নিজেই আম পাড়ে। নিজেই আবার এক

হাতে দাঁ দিয়ে আম ছিলে ভর্তা করে। ছোট ভাইবোনদের নিয়ে খায়। কিন্তু নিজে গাছে উঠে আমপাড়ার কথা কারো কাছে বলে না। এ প্রসঙ্গে কথা উঠলে প্রয়োজনে সে বলে, চৈর-কুটা দিয়ে সে আম পেড়েছে।

কিন্তু একদিন ঠিকই গাছে ওঠার বিষয়ে মায়ের চোখে ধরা পড়ে তানিয়া। তখন মা তাকে ধরে আত্মাখেদে শাসন করতি গিয়ে হালকা মার দেয়। মার খেয়ে তানিয়া কাঁদে। তনিয়ার কান্নার শব্দ শুনে তার একমাত্র চাচা বলে ভাবি, তোমরার লোলা ছেঁড়িডারে এমনে মারতাহ করে। মাইরালবা নাহি। মারবাই তো। নাইলে এই লোলা ছেঁড়িরে হারা জীবন ঘরে বুয়াইয়াই পালন লাগব। চাচার এমন কথা শুনে কান্নারত তনিয়ার মনে বেশ আঁচড় কাটে। মনে মনে বলে, আমার একটা হাত নাই। তাই বলে তো নোলো নই। তাহলে চাচা হয়ে কী করে তিনি আমাকে এভাবে উপহাস করেন!

দেবরের নিন্দাসূচক কথা শুনে তনিয়ার মায়ের মনেও লাগে। তাই প্রতিক্রিয়ায় তনিয়ার মা বলে, আরিফুলের বাপ। বরাবরই তুমি এমন নিন্দাই কইরা যাইবা। মানুষের ভাল দিকগুলি তোমার নজরে পড়ে না। আমার মেয়ে লোলা অইব কের লাগি। গাছেতো পইড়া হাত ভাইঙ্গা গেছে। আর বাকি সব তো আছে নাকি। মেয়েটা তো একেবারে পর না, তোমার আপন বাইন্তি। কই তারে উৎসাহ-উদ্দীপনা দিবা। তা না কইরা নিন্দার কথা কও। যা শুনলে যে কারো গায়ে আগুন ধইরা যায়। অহনও সময় আছে, নিজে আগে ভালো অও; আর মুখটা ভালো করে। জানো তো এই মুখেই ক্ষয়, আর এই মুখেই জয়।

ভাবির এসব কথা শুনে আরিফের বাবা আর টু-শপট না করে সোজা তাদের বাড়ি চলে যায়। দুরন্তপনা করলেও পড়াশোনায় তো তনিয়ার কোনো গাফিলতি নেই। সে একথা দিবি বুঝতে পেরেছে, ডানহাত খোয়া যাওয়ায় তার যে অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে, সেই ক্ষতি পূরণ করতে হবে লেখাপড়ায় সফলতা এনে। পঞ্চম শ্রেণিতে বৃত্তি না পেলেও ক্ষতি কী। গ্রামের হাইস্কুলে ভর্তি হয়ে স্বশ্রেণিতে তার শ্রেষ্ঠত্ব সে প্রমাণ করতে পারছে। পড়াশোনার পাশাপাশি সে স্কুলের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডেও সবার প্রশংসা কুড়াতে পারে। ক্রীড়া প্রতিযোগিতাতেও সে পিছিয়ে নেই। নৌড় প্রতিযোগিতায় তাকে পিছে ফেলে এমন সাধ্য স্কুলের কোনো মেয়ের নেই। স্কুলের সবাই তাকে বেশ সহযোগিতা করে। এ জন্যই বোধ হয় কখনো মনে হয়নি যে তার কোনো অঙ্গহানি আছে। কিছুটা সমস্যা হয়েছে সপ্তম শ্রেণিতে ওঠার পর। তখন তার বয়ঃসন্ধিকাল। শরীরে দেখা দিতে থাকে নানা পরিবর্তন। ওড়না পরতে হয় বাধ্যতামূলকভাবেই। কিন্তু একটিমাত্র হাতে ঠিক মতো ওড়না সামাল দেয়া সব সময় সম্ভব হয় না। বাড়িতে এসব নিয়ে এক সময় তার চাচা, তথা আরিফুলের বাবা নিন্দা বাক্য ছুঁড়ে তনিয়ার মায়ের কাছে এসে বলে, কেমন বেসরম মেয়ে রে বাবা। গা-গতর ঠিকমতো ঢাইক্যা রাখাও; সে খোয়ালও থাকে না। ভাবি, তোমার এই মেয়েরে এই ব্যাপারে একটু সাবধান কইরা দিও তো। আমি কই কি, মেয়ে বিয়ার লাইক অইয়া যাইতেছে। এমন খুঁত মেয়েরে পড়াশোনা

করাইয়া কী লাভ। তার বদলে গরিব-দরিব গিরস্থ ঘরে বিয়া দিয়া দেও ভাবি। আমার মনে অয়-এমনডা ভাবাই বুদ্ধিমানের কাম অইব। দেবরের কথায় তনিয়ার মা কোনো জবাব দেয় না। বরং বেশ বিরক্তই হয়। জবাব না পেয়ে তনিয়ার চাচা এ ধরনের ভয়ে চলে যায়। কারণ চটে গেলে তনিয়ার মা তাকে কটু কথাও বলতে পারে। দেবরের কথায় সতিই তনিয়ার মায়েরও রাগ ধরে যায়। আর সে রাগ ঢালে মেয়ের ওপর। তাই সে মেয়েকে ডেকে এনে বলে, কী রে তানিয়া! মাইনসের ওসব কতা হনতে কি ভালো লাগে?

-দেখো মা, পাড়ার কে কী কইল, তাতে আমার কিছু যায় আসে না। যারা এই সব কয়, তাদেরও বোঝা উচিত-আমার একটা মাত্র হাত। আর এক হাত দিয়া সব সময় নিজেরে গুছাইয়া রাখতে পারি না। আমার এমন সীমাবদ্ধতায় কই স্বজনরা একটু সহযোগিতা করবো। তার স্থলে করে উল্টা। মেয়ের কথা শুনে মা একেবারে চুপসে যায়। মেয়ের এমন দুঃখগলা কথায় কেমন যেনো কান্না আসে মায়ের। তখন নিজেকে সামলে নিয়ে মেয়ের মাথায় স্নেহের হাত বুলিয়ে মা বলে, ওরা গেরামের গণ্ড-মুখ মানুষ। সবার সব কথা ধরা যাইবো না। পাড়ার সবার সব রকমের কথা হজম কইরা তুই তোর পড়াশোনা কর মা! একদিন মানুষের মতো মানুষ অইয়া এই সব কথার জবাব দিস। মা-মেয়ে যখন এসব কথা বলাবলি করছে, তখন তাদের বাড়ি এসে হাজির হয় আরিফুলের আশ্মা। তনিয়ার আশ্মার কাছে গিয়ে পিড়ি টেনে বসে। তানিয়া তখন মায়ের কথায় প্রেরণা পেয়ে তার পড়ার টেবিলে যায়। আরিফুলের মা তখন তনিয়ার মায়ের কাছে সংশয়ের জড়তা ভেঙে নিচু স্বরে কথাগুলো বলতে থাকে। কিন্তু তানিয়া সেদিকে আঁড়ি পেতে থাকে। আরিফুলের মা বলে, তানিয়া আর আরিফুল তো ওই ছোড়াবাল্যে এক লগে খেলা-ধুলা কইরা ডাঙ্গর অইছে। অহন তো ওরা বড় অইতাছে। তানিয়া তো মাশাল্লা আমাদের আরিফুলের আগেই বিয়ার লাইক অইয়া যাইতাছে। আপনের দেওর কি কয় হনছেন?

-তুমি না কইলে হনবাম কেমনে?
-কয়, ওরা তো বড় অইতাছে। অহন আগের মতো হোরর চলাফেরা করতে দেওন ঠিক অইব না। আমাদের আরিফুলের তো একটা ভবিষ্যৎ আছে। তানিয়া তো মেয়ে মানুষ। তাছাড়া যেহেতু তার একটা হাতের খুঁত আছে, এর লাগিই তো অতদূর পড়ালেখা করানোও সম্ভব অইত না।
-এইডা কী কইলা আরিফুলের মা। ছেলে বইলা তোমার আরিফুলের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। অথচ আমার তনিয়ার ডাইন হাতে খুঁত আর মেয়ে বইলা ফেলাইন্যা অইয়া গেছে, তাই না। তোমার আরিফুল ছেলে বইলা অত বড়াই কইরো না, আমারটা একটা হাত নাই, আর মেয়ে দেইখ্যাও এত তনিয়ার চোখে দেইখ্যা না। আরে কয় কপালে কী আছে আগে-ভাগেই কিছুই কওন যায় না।

-না, মানে-
-অইছে-অইছে, তোমরা যে কী কইবার চাও হেইডা আমার বুঝবার বাকি নাই। আমার মেয়ের লগে মিশলে তোমার পোলা নষ্ট অইয়া যাইব-এইডাই তো কইবার আইছ। আর কওন লাগবো

না। একটা কতা জাইন্যা রাইখ্যা আরিফুলের মা, গাছেতো পইড়া আমার তনিয়ার হাত ভাঙলেও-মেয়ে কিন্তু আমার এতো অবহেলার না। ক্ষোভে তনিয়ার মা কথাগুলো বললে জবাবে আর কোনো কথা বলতে পারেনি আরিফুলের মা। খানিক পরেই নিজেদের বাড়ি চলে যায়। আঁড়ি পেতে ততক্ষণে সব কথা শুনছে তানিয়া। ওসব শুনে একপর্যায়ে তার চোখে পানি এসে যায়। সে বুঝতে পারে সমাজ-বাস্তবতা কখনো কখনো কত নির্মমভাবে মানসিক আঘাতের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। একই ক্লাসে আরিফুলকে সব সময় নিজের বড় ভাইয়ের মতোই দেখে আসছে সে। কারণ বয়সে তো সে বছর দুইয়ের বড়ই হবে। পড়ালেখায় দুর্বল বলে তানিয়া বড় ভাইকে অঙ্ক এবং ইংরেজিতে প্রায় সময়ই সহযোগিতা করে আসছে। অথচ তার মা-বাবা এমন সংকীর্ণ মানসিকতা পোষণ করে কেনো? তনিয়ার মনে প্রশ্ন জাগে। আর সেদিন থেকেই তানিয়া আরিফুলের সঙ্গে দূরত্ব বজায় রাখতে শুরু করে। আর চাচা-চাচিদের সব অবজ্ঞা আর নিন্দার জবাব সে মুখ ফুটে কাউকে বলে না সত্য। তবে সে সবার বলিষ্ঠ জবাব দেয় পড়ালেখার সাধনায় আরও নিষ্ঠাবান হয়ে। যতক্ষণ বাড়িতে থাকে, পড়ার টেবিলেই সময় কাটায় তানিয়া।

সাত.
তখন সে অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী। স্কুল ড্রেস পরে ছাত্রছাত্রীরা বিদ্যালয়ে যায়। অন্যদের মতো তানিয়াও স্কুল ড্রেস পরে। কিন্তু তনিয়ার ভাঙা ডান বাহুটা ঢেকে রাখার জন্য স্কুল ড্রেসের ওপরে আলাদা আর একটা ওড়না পরতে হয়। আর এ জন্যই স্কুলে তাকে সবার থেকে আলাদা মনে হয়। সঙ্গত কারণে আলাদা ভাবতে হয় তাকে। সারা স্কুলে সে-ই কেবল ব্যতিক্রম। এ জন্য একটা নেতিবাচক মনোভাব গড়ে থাকে তার মাঝে। তখন মনে হয়, স্কুলের সবাই যেনো অঙ্গহানীর জন্য তাকে উপহাস করছে। হ্যাঁ স্কুলের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা সবাই মিলে কেমন যেনো শব্দহীন শব্দে তাকে উপহাস করে। উপহাস করে স্কুলের আসবাবপত্র, স্থলঘর, আঙিনার গাছ-পালাও। সবার সম্মিলিত উপহাসের তীক্ষ্ণ শর কত আর ফিরাতে পারে সে! সব এসে যেনো বিদ্ধ হয় তার ভাঙা ডান বাহুর ওপর। আর এ অঙ্গহানীর জন্য ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত্যাজনিত আশঙ্কা, পরনিন্দা, তার কল্লিত উপহাস সব মিলিয়ে তার মাঝে একটা মানসিক সঙ্কট অঙ্কুরিত হতে থাকে যেনো। আর তাই পরিবারে বা স্কুলে খুব সামান্য বিষয় নিয়ে খুব ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে সে। তার মানসিক সঙ্কটটা মাঝে মাঝে এমন পর্যায়ে যখন যায়, সে সময়ে কল্পনায় মনে হয় একটা গল্পে ঢুকে যায় সে। আর সে কল্পনার গল্পটা এগিয়ে নিতে বা বাস্তবে রূপ দিতে সে কখনো বেপরোয়া আচরণ করে। এমন মানসিক সঙ্কটে পড়লে কার সঙ্গে কী আচরণ করতে হয়, সে বোধ বা হিসাব থাকে না। ফলে কাণ্ডগোলহীনের মতো আচরণ করে কখনো।

দিনদিন তনিয়ার মানসিক সঙ্কট বেড়েই চলে। ক্লাসের সেরা ছাত্রী। তাকে নিয়ে স্কুলের শিক্ষকরা ভবিষ্যৎ ভালো আশা করেন। অষ্টম শ্রেণির বৃত্তি পরীক্ষায় তানিয়া ভালো করবে বলে শিক্ষকগণের ধারণা। এর মাঝে যদি তার এই মানসিক সঙ্কট

মাথা চাড়া দিয়ে উঠে, তাহলে তাদের সব আশা-ভরসা গুড়েবালি হয়ে যাবে। এ অবস্থায় স্কুল কর্তৃপক্ষ তানিয়ার বাবাকে খবর করে নেয়। তানিয়াকে একজন মনোব্যাখির ডাক্তার দেখাতে বলে। তানিয়াদের পরিবারের সদস্যরাও তেমনটি ভাবছিল। কারণ তার মানসিক ব্যাধিটা দিনদিন বেশ খারাপের দিকে যাচ্ছে তখন। তানিয়ার মেঝেতাই শরাফতই তাদের পরিবারে চৌকস এবং শিক্ষিত ছেলে। ততদিনে সে স্নাতক পাস করে চাকরির খোঁজ করছে। জেলা শহরেরও তার বেশ জানাশোনা।

বড় বোন ছালেহা এবং শরাফত তানিয়াকে নিয়ে রওয়ানা হয় ময়মনসিংহ শহরের স্নানামন্য এক মনোচিকিৎসকের উদ্দেশ্যে। তানিয়া তখন ঘোর মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত। উপজেলা সদর থেকে বাসে বেশ ভিড়। কাজেই তখন তানিয়া কিছুটা চুপচাপ থেকেছে। কিন্তু নেত্রকোনায় এসে ময়মনসিংহের বাসে যখন উঠেছে, তখন সিটিং বাসে দাঁড়ানো কোনো যাত্রী নেই। জানালার পাশের সিটে তানিয়াকে বসিয়ে পাশে বসেছে বড় বোন। পিছনের সিটেই মেঝেতাই শরাফত। বাস ছাড়ার কিছুক্ষণ পর তানিয়ার পাগলামু শুরু হয়। বাসটা যখন হিরনপুর অতিক্রম করেছে, তখন তানিয়া সিট থেকে উঠে হঠাৎ গাইতে শুরু-

আমার সোনার বাংলা/আমি তোমায় ভালোবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ/তোমার বাতাস আমার
চাপে..

হঠাৎ বাসে মধুর সুরে জাতীয় সঙ্গীত শুনে তো বাস যাত্রীরা হতবাক। স্কুলে যেভাবে গায়, সেভাবে জাতীয় সঙ্গীতে সুর দিতে থাকলে প্রথমে বড়বোন তাকে খামতে বলে। কিন্তু তানিয়া তা অগ্রাহ্য করায় মেঝেতাই শরাফত তানিয়াকে টেনে বসায়। আর বড়বোন তাকে তখন জড়িয়ে ধরে রেখে বলে, এইডা তো ইস্কুল নারে তানি।

-তাইলে।

-এইডা বাস। বাসে আমরা ময়মনসিং যাইতাছি।
বাসে বইয়া গান গাইলে মাইনসে কী কইব। শরম না।

বড় বোনের এ কথা শুনে তানিয়া কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। বাস ছুটে তার নিজস্ব গতিভেই। কিছুক্ষণ পর আবার সে নজরুলের ‘সংকল্প’ কবিতা থেকে আবৃত্তি শুরু করে। নিখুঁত উচ্চারণে বলতে থাকে-

থাকব না কো বন্ধ ঘরে, দেখব এবার জগৎটাকে,
কেমন করে ঘুরছে মানুষ যুগান্তরের ঘূর্ণিপাকে।

দেশ হতে দেশ দেশান্তরে

ছুটেছে তারা কেমন করে,

কিসের নেশায় কেমন করে মরছে যে বীর লাখে
লাখে,

কিসের আশায় করছে তারা বরণ মরণ-যজ্ঞগাকে।

কেমন করে বীর ডুবুরি সিন্ধু সৈঁচে মুক্তা আনে,
কেমন করে দুঃসাহসী চলছে উড়ে স্বর্গপানে।

জাপটে ধরে ঢেউয়ের ঝাঁটি

যুদ্ধ-জাহাজ চলছে ছুটি,

কেমন করে আনছে মানিক বোঝাই করে সিন্ধু-
য়ানে,

কেমন জোরে টানলে সাগর উথলে ওঠে জোয়ার-
বানে।

এ রকম আবৃত্তি শুনে মেয়েটি যে মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত ততক্ষণে বাসের যাত্রীদের অনেকেই তা বুঝে গেছে। আর এ জন্যই যাত্রীদের কেউ কেউ নিচুসুরে বলতে থাকে, আহা! অল্প বয়সে মেয়েটা মানসিক রোগী হয়ে গেলো। এবারও তানিয়াকে বড়বোন সামাল দিতে না পারলে, বড়ভাই তার সিট থেকে উঠে এসে বামহাতে টান দিয়ে সিটে বসিয়ে দেয়। আবারো বড় বোন সালেহা তখন তানিয়াকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে রেখে বলে, আবারও কইতাছি, এইডা তো ইস্কুলও না, বাড়িও নারে তানি। বাসে বইয়া এমন করলে মানহীনসে কইব তুই একটা পাগলি। আর কতক্ষণ চুপ কইরা থাক বইন। এই তো আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ডাক্তারের চেম্বারে তরে লইয়া যাইয়াম। আর জ্বালাইস না রে বইন।

বলেই বড় বোন অন্তর্ভেদী দুঃখে কঁদে উঠে। আর বোনের কান্না দেখে তানিয়া চুপ করে থাকে। কিছুক্ষণের মাঝে ওরা গন্তব্যে পৌঁছে। শেষ বিকেলে মনোরোগ বিশেষজ্ঞের তানিয়ার চিকিৎসা নেয়। ওষুধের পাশাপাশি অন্যান্য করণীয় বিষয় সম্পর্কে বিশেষত, রোগীর সেবা-যত্ন এবং তার প্রতি পরিবারের সদস্যদের কী রকম আচরণ তরা উচিত সে সম্পর্কে পরামর্শ দেয়া হয়। ডাক্তারের চিকিৎসা ও পরামর্শ নিতে নিতে সন্ধ্যা হয়ে যায়। ফলে রাতে শহরে অবস্থান করে পরদিন সকালে ওরা আবার বাড়ি ফিরে আসে।

আট.

কৈশোরের দুরন্তপনায় আরিফুল তার সাথীদের চেয়ে একটু বেশি এগিয়ে। তখন সে গ্রামের স্কুলেই নবম শ্রেণিতে পড়ে। বাড়ির কাছেই গারো পাহাড়। অথচ কোনোদিন ওই পাহাড়ের গভীর অরণ্যে যাওয়া হয়নি। বেপরোয়া আরিফুলের অনেকদিনের সাধ, ওপারে সে পাহাড়ের পর পাহাড় অতিক্রম করে অনেক গভীরে প্রবেশ করবে। কিন্তু যাবে কিভাবে! সীমান্ত পাড়ি দিয়ে এতো গভীরে তো একাকি যেতে পারবে না। এ জন্য সে এ পাড়ারই হাসু মামুর সঙ্গে কথা বলে। হাসু আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর চোখে ফাঁকি দিয়ে কৌশলে ওপারে ঢুকে বিভিন্ন বনজ কাঁচামাল এপারে চোরাচালান করে আনে। বৈশাখ মাস। বাঁশের মৌসুম। ভাটি এলাকায় আর ক’দিন পরই বাঁশের চাহিদা দেখা দেবে। জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে যখন পানি আসতে শুরু করবে, তখন ভাটি এলাকার বাড়ি-ভিটা ঢেউয়ের কবল থেকে রক্ষার জন্য বাঁশের বেড়া দেয়া হয়। আর সে চাহিদার মেটানোর জন্যই সে ওপারে অনেক ভিতরে প্রবেশ করে বাঁশ কেনে। ওপারের অনুরূপ চোরাচালানীদের সঙ্গে যোগসাজশ করে সে প্রতিবছর এ মৌসুমে বাঁশের ব্যবসা করে। আরিফুল চোরাচালানি সেই হাসু মামুকে তার ইচ্ছের কথা জানিয়ে অনুরোধ করে। হাসু তখন পাড়াভ ভাগ্নের সেই অনুরোধ আর উপেক্ষা করতে পারেনি। আরিফুল তার মামাকে অনুরোধ করে বলে, বাড়ি কিংবা পাড়ার কাউকে না জানিয়ে আমি পাহাড় অভিযানে যেতে চাই। দয়া করে একথা কাউকে জানাইবেন না মামা। পরদিন সাপ্তাহিক ছুটিতে স্কুল ছিল বন্ধ। আরিফুল আগেরদিনই মাকে বলে রেখেছিল, পরদিন ভোরে সে পান্তাভাত খাবে। কিন্তু পান্তা খেয়ে যে সে কোথায় যাবে, সে মতলবের কথা তো কেউ জানে

না। ভোরে গ্রামের বাজার থেকে খাতা কিনার কথা বলে আরিফুল বাড়ি থেকে বের হয়। বাড়ির সামনের খাল পার হয়ে সীমান্ত সড়কে উঠে হাঁটে খানিকটা পথ। দক্ষিণ দিকের গ্রামের বাজার থেকে আসা যে রাস্তাটি পাহাড় ঘেঁষা গোবিন্দপুর হাইস্কুলের দিকে গেছে, মাঠের মাঝখানে সে রাস্তাটি সীমান্ত সড়ককে লম্বালম্বি অতিক্রম করেছে। ফলে স্বাভাবিকভাবে যে চার রাস্তার মোড়ের সৃষ্টি হয়েছে, সেখানে চায়ের স্টলে গিয়ে আরিফুল আগেরদিনের কথামতো হাসু মামুর দেখা পায়। আরিফুলকে নিয়ে হাসু মামু পাহাড় অভিযানে রওয়ানা হয়। মিনিট পাঁচেক এর মাঝেই গোবিন্দপুর হাইস্কুল মাঠে পৌঁছে ওরা। আরিফুল তো এই স্কুলেই পড়ে। পাহাড় পাদমূলে বিশাল একটা সুন্দর ফুটবলের মাঠ এই স্কুলের আড়িনাকে দিয়েছে সৌন্দর্যের বাড়তি মহিমা। আড়াআড়িভাবে পেরিয়ে মাঠের উত্তর-পশ্চিম কোণ বরাবর পাহাড়গামী পথে হাঁটে ওরা। দু’মিনিটের মধ্যেই পাহাড়ি নদী মঙ্গলেশুরীর দেখা পায়। যেনো পাহাড়ের উদর থেকে ভূমিষ্ঠ হয়ে এখানে পা মেলে ধরেছে নদীটা। আর খানিক পথ এগোলেই গারো পাহাড়। মঙ্গলেশুরী নদীর কিনারের পথ ধরে ওরা হাঁটে। আন্দাখালি নামের একটি খাল মঙ্গলেশুরী থেকে বের হয়ে সোজা পূবে পাহাড়ের সমান্তরাল হয়ে গেছে। কিন্তু এলাকার মানুষ মঙ্গলেশুরী নদী ও খালের সংযোগস্থলে বাঁধ দিয়ে ওদের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। এ খালের উত্তর এবং মঙ্গলেশুরী নদীর পূব পাড়ে এক চিলতে সমতল ভূমি। আন্দাখালির উত্তর কিনারে পাহাড়ি আবহে রয়েছে চোখে পড়ার মতো বেশ কিছু শেওড়া গাছের ঝোঁপ। এ জন্য এই একখণ্ড সমতল ভূমির নামকরণ হয়েছে শেওড়া বাড়ি। আর এ শেওড়া বাড়ি এলাকায় রয়েছে কয়েকঘর গারো বাড়ি। এখান থেকে সীমান্ত রেখা কোনো স্থানে ত্রিশ থেকে পঞ্চাশ গজ আবার কোনো স্থানে একশ গজের বেশি হবে না। ওপারের প্রতিবেশি এবং স্বজন গারোরা প্রতিদিন সীমান্তরক্ষীদের দৃষ্টির আগোচরে একপাড়ার প্রতিবেশির মতো আনাগোনা করে থাকে। সীমান্তরেখা তাদের সামাজিক যোগাযোগ একেবারে বন্ধ করতে পারেনি। হাসু মিয়া এই শেওড়া পাড়া থেকে তার আর একসহযোগীসহ আরিফুলকে নিয়ে এদিক-ওদিক তাকাতে দেখে কোথাও সীমান্ত রক্ষী আছে কিনা। ঝুঁকিমুক্ত মনে করেই ওরা সীমান্ত পার হয়। ওরা কিন্তু জানে অস্থায়ী চৌকিতে কখন বিএসএফ থাকে কিংবা কখন এ পাশের সীমান্ত রক্ষী টহল দেয়। তাছাড়া তাদের এসব কাজের জন্য অনৈতিক হলেও গোপনে একটা মাসোহারা ব্যবস্থা আছে। যাহোক অল্পক্ষণের মাঝেই ওপারে মঙ্গলেশুরী নদীর কিনারে বাগদাখালি বাজার দ্রুত পার হয়ে পাহাড়ের ঢালপথে হাঁটে ওরা। ক্রমেই উপড়ে উঠে। মঙ্গলেশুরী নদীই যেনো সরু রেখায় দুদিকের পাহাড়সমূহকে বিভক্ত করে রেখেছে। পাহাড়ে এ নদীর পাড় কেটেই তৈরি করেছে ওপারে ওঠার পথ। উঁচু পাহাড়ের প্রায় চূড়ার কাছে বলতে গেলে বন্ধদেশে এ পথটি গিয়ে মিশেছে পাহাড়পথে বাস-ট্রাক চলাচলকারী বড় রাস্তায়। আর ওই বড় রাস্তার পৌঁছার কিছুক্ষণ আগে মাথার উপর অনেকগুলো জন্তুর কলরব শুনতে পায়। অমনি আরিফ ওপরে

চোখ তুলে যেই তাকায়, বিস্ময়ে আরিফুল থ বনে যায়। পাহাড় চূড়ায় চার-পাঁচশ গজ লম্বা বিশাল একটা পাথরের দুপাশে গজিয়ে আছে নানা রকম বুনো গাছ। আর ওই গাছগুলোতে কোলাহল করছে কয়েকশত বানর। তাজ্জব বনে যখন ওসব দৃশ্য দেখেছে, তখন আরিফুল হাসু মামার ডাকে সংবিদ ফিরে পায়। আর সঙ্গে সঙ্গে হাঁটার গতি বাড়ায় সে। ঢালু পথে পাহাড়ের ওপরে ওঠা যে বেশ পরিশ্রমের, এ রকম অভিজ্ঞতা যাদের আছে; তাদের আর বুঝি বলার দরকার হয় না। কিছুক্ষণ হেঁটে আরিফুল হাঁপিয়ে উঠলেও বাকি দু'জন অনেকটা স্বাভাবিক। কারণ, ওরা এভাবে চলাচলে অভ্যস্ত। প্রধান সড়কে উঠেই হাসু মামু এবং তার সহযোগী আরও দ্রুত হাঁটতে শুরু করে। ওরা আরিফুলকে জানায়, প্রধান সড়কের এ অংশটুকু তাদের জন্য বেশি ঝুঁকিপূর্ণ। কারণ, এ রাস্তায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সদস্যের চোখে পড়লে সমস্যা হতে পারে। তবে আশার কথা হলো, প্রধান সড়কটা সামান্য উত্তরে গিয়েই পূর্বদিকে মঙ্গলেশ্বরী নদীর সেতুর দিকে মোড় নিয়েছে। আর সেই মোড় পর্যন্ত গিয়েই ওরা পাহাড়ি সরু পথে নামবে। আরিফুলও ওদের সঙ্গে জোর কদমে হাঁটে। এক ধরনের ভয়ে তখন তার বুক ধকধক করতে থাকে। যখন ওরা প্রায় মঙ্গলেশ্বরী নদীর ওপর যে পাহাড়ি সেতু, সে মোড়ে এসেছে, তখন ওপারে শুনতে পায় একটি গাড়ির ইঞ্জিনের তর্জন-গর্জন বা গোঙানির শব্দ। আর তখন ওদের তাড়াও বেড়ে যায়। প্রায় দৌড়ে ওরা ওই সেতুর মোড় পার হয়ে ওপারের অরণ্যের পথে হারিয়ে যায়। মিনিট দশ পরে শোনা যায়, গাড়িটি এপারে এসেছে। যা হোক ওরা ঝুঁকিমুক্তভাবেই তাদের গন্তব্যের দিকে এগোতে থাকে। আসলে ওই সেতুর মোড়ের উত্তরের পথেই গভীর পাহাড়ি অরণ্যের শুরু। এক পাহাড়ের পর আর এক পাহাড়। তবে ওরা এগোচ্ছে মূলত গভীর পাহাড়ি অভিমুখী মঙ্গলেশ্বরী নদীর পশ্চিম পাড়ের পথ ধরেই। সেই সেতুর মোড় থেকে আরও দেড়-দুই কিলো পাহাড়ি অরণ্য পথে হাঁটার পর ওরা একটি গারো অধ্যুষিত গ্রামে গিয়ে পৌঁছে। ওই গ্রামের গারো অধিবাসীরা আদৌ বাংলা জানে না। সন্দের গারো সদস্যটি ওদের সঙ্গে গারো ভাষায় কথা বলে। পরে বাংলা ভাষায় হাসুকে বলে। ওসব কথা বুঝে নেয় আরিফুলও। এ গ্রামেরই এক গারো মোড়লের বাঁশ কিনেছে হাসু। হাসু এবং সন্দের গারো সদস্যটি কিছুক্ষণ বাঁশ কাটে। তারপর যখন ক্লান্তি নামে, তখন বিশ্রামের সময় ওরা আরিফুলকে দেখানোর জন্য নির্জন অরণ্যের লক্ষ্যে রওয়ানা হয়। গারোপাড়াটির উত্তরেই মঙ্গলেশ্বরী নদী। অনেক গভীরে নদী। ওরা প্রথমে পাহাড়ি দু'পায়ে পথে নদীতে নামে। নদীতে তখন ক্ষীণ ধারা বইছে। সমতলে যেমন বালুর চটান আছে, সে তুলনায় পাহাড় অংশের নদীতে বালুর স্থলে রয়েছে ছোট ছোট পাথর। মাঝে মাঝে ঢেঁলের মতো পাথর। নদীর বেশিরভাগ অংশেই চটান। কিন্তু কোথাও কোথাও আবার রয়েছে বেশ গহিন ডোবা। আর সেসব ডোবায় রয়েছে অনেক বড় বড় পাথর। নদীর স্বচ্ছ জলে সেসব হাতের নাগালে বলে মনে হলেও পাথরগুলো পানির অনেক গভীরে। হাসু আর তার গারো সহযোগী আগে আগে যায়, আরিফুল তাদের অনুসরণ করে। নদীর

উত্তর পাড় ঘেঁষে ওরা কিছুটা পথ এগিয়েছে কেবল, অমন স্বল্প দূরের পাহাড়ের ঢালুতে গাছ নড়ে উঠে। গারো সদস্যটি তা আঁচ করেই থমকে দাঁড়ায়। পাশেই তাকিয়ে দেখে সদ্য ত্যাগ করা হাতির বিষ্টা। গারো সদস্যটি আঁচ করে নেয় অদূরেই হাতির উপস্থিতি রয়েছে। তাই সে হাসু এবং আরিফুলকে চুপি চুপি বলে, এই চলো-তাড়াতাড়ি ফিরে যাই। নাইলে কিন্তু বিপদ আসতে পারে। ওই যে গাছটা যে নড়ে উঠলো, নিশ্চয়ই ওখানে বন্য হাতি...। একথা শুনে তো ভয়ে আরিফুলের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যায়। বৃকে ড্রাম পেটাতে থাকে আর সে সহযোগীদের সঙ্গে দ্রুত পালাতে থাকে। যেনো দূলাফে ওরা নদী পার হয়ে এপারে এসে প্রাণে বাঁচে। বুনো হাতির কবলে পড়লে কি আর রক্ষা আছে! সেখান থেকে ফিরে ওরা আবার বাঁশ কাটায় লাগে। তখন মাথার ওপর থেকে সূর্য গড়িয়ে ভাট্টির দিকে হেলে পড়েছে। ততক্ষণে আরিফুলের ক্ষুধা অনুভূত হতে থাকে। কিন্তু এখানে, এই গভীর অরণ্যে তো খাবারের কোনো ব্যবস্থা নেই। সূর্য অনেকটা হেলে যখন বিকেলের আড়িনায় ঢুকে তখন ওরা কাজ শেষ করে। ততক্ষণে ক্ষুধার আগুনে পুড়ে আরিফুলের মুখ কালো ছাই হয়ে গেছে। হাসু এবং তার গারো সহযোগী এ পাড়ার এক গারোবাড়িতে ঢুকে গারো পানীয় খেয়ে এসেছে। ওসব ছাইপাশ তো আর আরিফুল খায় না। সে ওই যে ভোরে পাশ্চাত্য ভাত খেয়ে এসেছে তারপর তো দুপুর গড়িয়ে বিকেল। তখন ওদের ফেরার পালা। ওদিকে দুপুর অবধি যখন আরিফুল বাড়ি ফিরছে না, তখন তো তাকে নিয়ে দৃষ্টিস্তায় পড়ে তার পরিবার। তাকে খুঁজে চলে এখানে-সেখানে। তানিয়াদের বাড়ি এসে খোঁজ করে। জিজ্ঞেস করে তানিয়াকেও। কিন্তু তানিয়া তো আর আগের মতো আরিফুলের সঙ্গে খেলাধুলা করে না। বিশেষ করে সেদিন আরিফুলের মায়ের কথা শুনে তানিয়ার মনে দারুণ রেখাপাত করেছে। যে আরিফুলকে নিয়ে তার মায়ের এতো বড়াই, সেই আরিফুলই বরং দিনদিন পড়ালেখায় অমনোযোগী হয়, আর সেই তুলনায় অধিক মনোযোগী হয় তানিয়া। আরিফুল বাড়ি ফিরে আসে পড়ন্ত বিকেলে। বাড়ি ফিরে কারো কোনো প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বরং খাবারের জন্য পাগল হয়ে উঠে। মা তাকে খাবার দেয়। খাবার খেতে খেতে সে সত্য ঘটনা খুলে বলে। ছেলে সম্পর্কে এ তথ্য শুনে বাবা তার প্রতি ক্ষিপ্ত হয়ে বলে, শেষ পর্যন্ত আমার ছেলে অইয়া তুই কিনা চোরাচালানীদের সঙ্গে...ছিঃ ছিঃ। এই যে অবৈধভাবে ওপারে গেলি, এইডা তো জঘন্য অপরাধ। যদি ওপাড়ে ধরা পড়তি, তাহলে কী উপায় অইতো? আরিফুল কারো কথায় কোনো জবাব দেয় না। সে কেবল খেয়ে চলে।

রাত্রে তীব্র গরম আর দিনের বেলায় রোদের দাবদাহে মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে বৃষ্টির জন্য উন্মুখ হয়ে গেছে। সবারই প্রত্যাশা কোনদিন কখন নামবে স্বস্তির বৃষ্টি। আর সেই প্রত্যাশার বৃষ্টির দেখা মিলে গ্রীষ্মের শেষ দিকে। টানা বর্ষণ শুরু হয়েছে। প্রথম দিনের বৃষ্টিতে নদীতে ঢল নামেনি। দ্বিতীয় দিনের

বৃষ্টিতে মঙ্গলেশ্বরী নদীতে প্রথম ঢল নেমেছে। এ ঢলের জল নদী অর্ধেকও পূর্ণ হয়নি। তৃতীয় দিনের বৃষ্টিতে নদী বেশি অর্ধেক ভরেছে বলে কারো কারো ধারণা। চতুর্থ দিন সেই যে সন্ধ্যা থেকে বৃষ্টি নেমেছে, আর থামেনি। এমন প্রবল বর্ষণ বুঝি কয়েক বছরের মাঝে হয়নি। বৃষ্টির এমন ধারাপাত দেখে তানিয়ার মা বলেই ফেলে, এইডা খালি তো বৃষ্টি না, যেনো হাতি চেনাইতেছে। একথা শুনে মুখটিপে হেসে তানিয়া বলে, হাতি কেমনে পেশাব করে তা কি তুমি দেখছ মা! -এই কথা কইলি যে তানিয়া... -মুঘলধারে বৃষ্টি পড়ে দেইখ্যা এই যে তুমি কইলা, 'হাতি চেনাইতেছে'। -এইডা তো আমার কতা না। এমন বেশি বৃষ্টি অইলে মাইনসে কয় হুন্দি। এর লাইগাই তো আমি কইলাম। -ও আছা। -আইজ রাইতে বোধ আর বৃষ্টি থামবে না। আর এমনে যদি সারা রাইত বৃষ্টি অয়, তাইলে সহালেই দেখবি কেমন বড় একটা ঢল নামে। তানিয়ার আশ্রয় কথাই ফলে গেলো। সারা রাত আর বৃষ্টি থামেনি। অবিরাম বৃষ্টিতে ছিল নানা ছন্দ। কখনো মুঘলধারে, কখনো ঝড়ো-বৃষ্টি এবং কখনো সমিল ছন্দে অবিরাম। আর এজন্যই ভোর রাতে কারো কারো ঘুম ভাঙলে বাড়ির পাশেই শুনতে পায় পানির কল্লোলা। বাড়ির পাশের শুকনো ক্ষেতে-খলায় শুরু হয়েছে পানির কোলাহল। তাহলে যে কূল উপচানো ঢল নেমেছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু তার চেয়ে অধিক গুরু-গভীর শব্দ শোনা যায় উত্তরে গারো পাহাড়ি, নদীর উৎসস্থলে। যেনো পৃথিবীর সেরা কয়েকটি জলপ্রপাতের সম্মিলিত শব্দে পাহাড় ভেঙে নামছে ঢল। এ ঢল তো যেমন তেমন ঢল নয়। তানিয়া বাড়ির আড়িনায় এসে উত্তর দিকে তাকিয়েই অবাক...। পাহাড় থেকে নেমে আসা ঢলের পানি তখন আর নদীর পাড়ের শাসন মানছে না। পাড় উপচে ফসলি মাঠের উপর দিয়ে সোজা দক্ষিণ দিকে ধেয়ে নামছে বিশাল পানির স্রোত। প্রবল এ ঢলে মূল স্রোতের তীব্রতা দেখার জন্য বাড়ির দক্ষিণে মঙ্গলেশ্বরী নদীর দিকে পা বাড়ায়। খানিক এগিয়েই দেখতে পায় ভয়াল নদীর উত্তাল বৃকের মূল স্রোতে সারি বেঁধে যাচ্ছে ফেনার স্তূপ। আর ওই ফেনার সঙ্গে ভেসে যাচ্ছে বাঁশ-কাঠ এবং আস্ত গাছ। আর বনজ ওসব উপকরণ দেখে বাঁশের চৈর-কুটার আগায় কক্ষে বা ডালের আঙটা বেঁধে পাড়ার কেউ কেউ ছুটে যাচ্ছে পুবে খালের মোহ-নায় এ নদীর পাড়ে। নদীর ওই খাড়া পাড় ঘেঁষে তীর বেগে ছুটে চলে মূল স্রোত। পাড়ের কাছ দিয়ে যায় বলে চৈর-কুটার আঙটা দিয়ে বাঁশ-কাঠ কিংবা গাছও পাড়ে ভিড়িয়ে ধরা যায়। স্থানীয় ভাষায় এ প্রক্রিয়াকে খড়ি ধরা বা লাকড়ি ধরা বলে। আর এভাবে কেউ কেউ এমনি লাকড়ি ধরে, এ পরিবারের সারা বছরের বা ছয় মাসের জ্বালানি হয়ে যায়। আবার ভালো কাঠের খণ্ড ধরতে পারলে তা বিক্রি করে নগদ পয়সাও পায় কেউ কেউ। আর এ জন্যই মুহূর্তের মাঝে পাড়ার অনেক লোক ততক্ষণে গিয়ে লাকড়ি ধরতে শুরু করেছে। সে দৃশ্য দেখার জন্য ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাও ওখানে যায়। ওরা বড়দের সাহায্যও করে। তানিয়ার

বাবা-ভাইয়েরাও চৈর-কুটা নিয়ে লাকড়ি ধরতে গেছে সেখানে। তানিয়াও ততক্ষণে ছুটে চলে খালপাড়ে। গিয়ে দেখে ওরা বাবা এবং ভাইয়েরা ঢলের জল থেকে ক্রমাগত লাকড়ি ধরে পাড়ে তুলছে। তানিয়াও তার এক হাতে সেসব লাকড়ি জড়ো করে স্তুপ দেয়। সেই হিড়িকে বসে নেই আরিফুলও। সেও তার বাবার সঙ্গে লাকড়ি ধরে চলে। কিন্তু হঠাৎ করে সে এক অভাবনীয় কাণ্ড করে বসে। পাহাড়ি এ ঢলের ভয়াল ঘূর্ণি স্রোত দেখে কখনো ভয়ে আঁকে ওঠে পাড়ে থাকা মানুষ। আর ওই ঘূর্ণি স্রোতের গর্তে পড়ে এক রকম খাড়া হয়ে চরকির মতো ঘুরতে ঘুরতে ভাটির দিকে আসতেছিল একটি বড় কাঠের খণ্ড। আর তা দেখে কাউকে কিছু না বলে আরিফুল তা নিজ হাতে ধরার জন্য নদীতে দেয় হঠাৎ ঝাঁপ। তুমুল স্রোতে পড়ে বুঝতে পারে ঢলের ভয়াবহতার কাছে তার ক্ষুদ্র শক্তি কতটা অসহায়। আর তখন তাকে উদ্ধার করতে অনেকে চৈর-কুটা বাড়িয়ে দেয় তার হাতের নাগালে। অমনি সে খপ করে ধরে। আর তাতে সে অল্পের জন্য ঘূর্ণি স্রোতের কবল থেকে বেঁচে যায়। চৈর-কুটায় তার হাত আটকে যাওয়া তীব্র স্রোতই তাকে কিনারে নিক্ষেপ করে। তখন তার বাবা এবং তানিয়ার ভাইয়েরা তাকে টেনে তুলে। কিনারে নিরাপদ স্থানে এনেই তার বাবা এক চপটাঘাত বসায় আরিফুলের চোয়ালে। আর বলে, আইজ কী দশা অহিত রে তোর! এমন ভয়ানক ঢলের পানিতে কেউ ঝাঁপ দেয়। আমগর আর লাকড়ি ধরন লাগবো না। চল বাড়ি যাই। আর কোনোনদিন ভূই লাকড়ি ধরতে আইবি না। কী সর্বনাশ আইজ অইয়া যাইতো, হ্যাঁ! ঢলের এমন ঘূর্ণির মাঝে পড়লে কারো বাঁচার কি উপায় থাকে!

এই বলে চৈর-কুটা আর ছেলেকে নিয়ে আরিফুলের বাবা বাড়ির দিকে রওয়ানা হয়। আরিফুলের এমন কাণ্ডজ্ঞানহীন দৃশ্য দেখে বিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে থাকে তানিয়া। ওরা চলে যাওয়ার কিছুক্ষণ পর আবার তানিয়ারা তাদের কাজে সক্রিয় হয়। তবে তখনো ঢলের পানি শুধু বাড়তেই থাকে। পড়তে থাকে টিপটিপ বৃষ্টি। যতক্ষণ ঢলের পানি বাড়ে, ততক্ষণ লাকড়ি আসে। কিন্তু বেলা দশটার দিকে ঢলের প্রাবল্য কমেতে শুরু করে। আর তখন লাকড়ি আসাও বন্ধ হয়ে যায়। আর তাই লাকড়ি গুছিয়ে সবাই নিজে নিজে বাড়ির দিকে পা বাড়ায়।

দশ.
গোবিন্দপুর হাইস্কুলে নবম শ্রেণিতে ভর্তি হবার কিছুদিনের মাঝেই তানিয়ার মেঝেভাই উপজেলা সদরের একটা হাইস্কুলে শিক্ষকতায় নিয়োজিত হয়। আর তাতে সুবিধা হয় তানিয়ার। গারো পাহাড়ের পাদদেশে গোবিন্দপুর হাইস্কুলে পাঠরত থাকলেও বেশিরভাগ সময় উপজেলা সদরে অবস্থান করে মেঝেভাইয়ের সঙ্গে। ওখানে অবস্থান করে উপজেলা সদরের ভালো ভালো শিক্ষকের কাছে প্রাইভেট পড়ে। ফলে আরও গতিশীল হয় তার পড়াশোনা। তবে এ সময়ে তার মাঝে প্রবল একটি মানসিক সঙ্কট দেখা দেয়। হয়তো বা ডান হাত খোয়া যাওয়ায় তার ভবিষ্যৎ নিয়ে ক্রমাগত দূশ্চিন্তায় সম্ভবত এমনটি হয়। এ সমস্যায় তার মেঝে ভাই তাকে নিয়ে মানসিক ডাক্তারের কাছে নিয়ে যায়। চিকিৎসক তখন তানিয়ার এ সঙ্কটকে

ওসিডি (অবসেসিভ ইম্পালশন ডিসঅর্ডার) শপাঙ্ক করে তার চিকিৎসা দিতে থাকে। চিকিৎসায় ধীরে সুস্থ হতে থাকে তানিয়া।

স্কুলে নবম শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণিতে ওঠার বার্ষিক পরীক্ষায় এতটাই ভালো করে যে ফলাফলে তার ধারেকাছে কেউ ঘেঁষতে পারেনি। তানিয়া উপজেলা সদরে অবস্থান করায় চাচাত ভাই আরিফুল পড়ালেখায় আরও অমনোযোগী হয়ে উঠে। বাড়িতে অবস্থানকালে অনেক সময় তানিয়া তাকে স্কুলের পড়ায় সহযোগিতা করত। যদিও সে স্কুলের শিক্ষকদের কাছে প্রাইভেট পড়েছে। কিন্তু বার্ষিক পরীক্ষায় সে তুলনামূলকভাবে আরও খারাপ ফলাফল করে। পড়াশোনা না করে বরং সে দিনদিন বথে যেতে থাকে।

একই বংশের তানিয়া যেখানে নিষ্ঠার সঙ্গে পড়াশোনা করে স্বপ্ন রচনা করে চলেছে সেখানে আরিফুলের কর্মকাণ্ড তার সম্পূর্ণ বিপরীত। এ কথা সত্য, তাদের গ্রাম কিংবা স্কুলটি উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায়। আর উপজাতি সমবয়সী বা সহপাঠী ছেলেদের কেউ কেউ গারোদের পানীয় 'চু' গ্রহণ করে। উপজাতি সংস্কৃতিতে 'চু' পান করার সপক্ষে সামাজিক সমর্থন আছে। তবে বাস্তবে দেখা যায়, যেসব উপজাতি কিশোররা 'চু' বা গারো মদ পান করে, ওরা পড়াশোনা থেকে ঝরে পড়ে এবং অধিকাংশই বথে যায়। আরিফুলের সহপাঠীরা বলা যায় সেই শ্রেণির। কাজেই সঙ্গদোষে আরিফ গোপনে গোপনে সে অভ্যাসটিও রপ্ত করে ফেলে। যা চাচাত ভাই বলে তানিয়া কখনো ভালো চোখে দেখেনি। এ জন্য আরিফুলকে অনেকটা এড়িয়ে চলে তানিয়া। শুধু তাই না, আরিফ নাকি গারোমদ গ্রহণ করে উত্তর পাড়ার এক উপজাতি মেয়েকে অত্যন্ত আপত্তিকর প্রস্তাব দিয়েছে। এ নিয়ে স্কুল এবং গ্রামে যখন তোলপাড় শুরু হয়, চাচাতো ভাই বলে তানিয়ার আত্মসম্মানেও বেশ লাগে। আর তখনই তার মানসিক সমস্যটা আবার প্রকটভাবে দেখা দেয়। আবার তাকে ডাক্তারের কাছে নিতে হয়। বেশ কিছুদিনের চিকিৎসা নেয়ার পর সুস্থ হয় তানিয়া। যখন সে মানসিকব্যাধিতে আক্রান্ত হয় তখন সে আবোল-তাবোল কিছু লিখে। তবে এবারের বিষয়টি তানিয়ার মনে এতটাই আঁচড় কাটে যে, আরিফুলকে নিয়ে সে একটি পদ্যও লিখে ফেলে। পদ্যটি হলো—

পথ ও বিপথ

পথের পাশেই বিপথ থাকে
সাড়া দিও পথের ডাকে,
বিপথ যদি হাতছানি দেয়
জানো না সে কোন দিকে নেয়!
পথ-বিপথের দোলাচলে
থাকবে তুমি কোন্ পদে দলে?
থাকো যদি পথের পক্ষে,
নিয়ে যাবে কোনো লক্ষ্যে;
লক্ষ্যটাকে তাক করে নাও
তারপর সামনে এগিয়ে যাও।
সুস্থ হয়ে পড়ালেখায় আবার নিষ্ঠাবান হয়। এভাবে তানিয়া তার স্কুলে তো বটেই, উপজেলা সদরেও কোচিং ক্লাসে মেধাবী ছেলেমেয়েদের মাঝে সে আলোচিত হয়ে উঠে। সামনের এসএসসি পরীক্ষায়

যাদের ভালো ফলাফল আশা করা যায়, তাদের মাঝে প্রথম সারিতে তানিয়ার নামও বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়। এ খবরে তানিয়ার বড় ভাই খুব খুশি হয়। তার মারফত ভাই, যে কিনা ছোট ভাইবোনদের পড়াশোনা চালানোর জন্য নিজের পড়াশোনা ছেড়ে সংসারের হাল ধরেছে; তানিয়ার এমন সম্ভাবনার সংবাদে তার বুক ফুলে উঠে। সংসারের প্রতি এবং ছোট ভাইবোনের লেখাপড়ার প্রতি এতটা দায়িত্বশীল হতে এমন গ্রাম পরিবেশে কাউকে দেখা যায় না। মাত্র সাত-আট বছরের মাঝে কৃষিক্ষেত্রে দ্বিগুণীয় সাফল্য দেখিয়েছে এ মারফত ভাই। একটা সময়ে দেখা গেছে ওরা ছয়ভাই লেগে গেছে মাঠের কাছে। তাই বলে পড়ালেখায় ব্যাঘাত ঘটায় নয়। সময়কে এমন ভাবেই কাজে লাগিয়েছে মারফত ভাই, যাতে মাঠের কাজও সম্পন্ন হয়, আবার ভাইদের লেখাপড়াও হয়। চাষাবাদের কাজে তাদের কৃষি শ্রমিকের খুব বেশি প্রয়োজন হতো না। বাড়ির গৃহস্থালি কাজ ভাইবোনেরা মিলে করেছে। ফলে সাফল্যও এসেছে। প্রথমে নিজেদের জমির পাশাপাশি বর্গাচাষও করতো। এভাবে প্রতিবছর উদ্বৃত্ত ফসল বিক্রি করে ওরা নিজেরাই বন্ধক কিনে বা বছরভিত্তিক পত্তন নিয়ে চাষের জমি বাড়াতো থাকে। মাত্র সাত আট বছরের মাঝেই মারফত ভাইয়ের সাফল্য এমনই পর্যায়ে পৌঁছে, পাড়ায় ওরাই হয়ে উঠে সবচেয়ে বেশি ধান মাড়াই ঘর। মারফত ভাই সংসারের হাল ধরে ছোট ভাইবোনের লেখাপড়ার প্রতি নিষ্ঠাবান ছিল বলেই পিঠাপিঠি ছোট ভাইটি স্নাতক সম্পন্ন করে ততদিনে উপজেলা সদরের স্কুলেও শিক্ষকতার চাকরিতে নিয়োজিত হয়। অন্যান্য ছোট ভাইবোনেরা সবাই স্কুল-কলেজে পাঠরত।

মারফত ভাইয়ের এতটা সাফল্যে সমাজে বাড়ে তার কদর। মাঝে মাঝে সামাজিক কিছু দায়িত্বও দেয়া হয় তার ওপর। সে কেবল কর্মঠই নয়, বাবার মতোই সৎ। উপরন্তু বুদ্ধিমানও বটে। এগারো.

খারনে গ্রামের একমাত্র সরকারি প্রাথমিক স্কুলটি পাহাড়ি নদী মঙ্গলেশ্বরীর ঠিক পশ্চিম তীরে অবস্থিত। বলা হয়ে থাকে গারো পাহাড়ের পাদদেশে সীমান্তবর্তী উপজেলাগুলোর মাঝে এই স্কুলের ফুটবল খেলার মাঠ আকারে যেমন বড়, তেমনি আকর্ষণীয়ও বটে। মঙ্গলেশ্বরী নদীর তীরে মনোলাভা এ মাঠটির সুখ্যাতি আছে আশপাশের কয়েকটি উপজেলায়। প্রতিবছরই এ মাঠে ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন হয়। কখনো হয় এলাকাভিত্তিক প্রতিযোগিতা, আবার কখনো কখনো আন্তঃউপজেলা ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। আর এই ফুটবল খেলা ঘিরে এই প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষ একদিকে যেমন আমোদমুগ্ধ হয়ে ওঠে, অন্যদিকে এ মাঠের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ঘিরে গারো-হাজং অধ্যুষিত এই প্রান্তিক জনপদে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সব মানুষের মহামিলন ঘটে। আশপাশের গ্রামগুলোর ফুটবলপ্রেমী শিশু-কিশোর কিংবা তরুণরা তাদের খেলার অনুশীলন করে এখানেই। গ্রীষ্ম-বর্ষা-শরতে খেলা শেষে উচ্ছল ছেলেরা মঙ্গলেশ্বরী নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে স্নাতের গোঁহল করে বাড়ি ফেরে। গারো-হাজং উপজাতির সহাবস্থানে সৌহার্দ্যপূর্ণ

সম্প্রীতির এক অপূর্ব মিলনস্থল যেনো এ অঞ্চল। এলাকায় ফুটবল খেলায় গারোদেও নৈপুণ্যের আলাদা একটা সুনাম আছে। পিযুষ সাংমা, ধীরেন হাজং, জামাল ও মালেক এরা সবাই বয়সের দিক থেকে কিশোর। স্কুলের লেখাপড়ার চেয়েও ফুটবল খেলার মাঠে এদের কৃতিত্ব বেশি। এদের ফুটবল খেলার নামকরা একটা টিমও রয়েছে। হাট গোবিন্দপুর হাইস্কুলে পড়াশোনা করলেও মূলত এদের প্রায় সবাই খারনৈ প্রাইমারি স্কুলের সাবেক ছাত্র।

হঠাৎ করে খারনৈ সরকারি প্রাথমিক স্কুল ও স্কুল সংলগ্ন মাঠের ভূমি নিয়ে সেই গ্রামেরই স্বার্থান্বেষী মহল গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। ওই অপকর্মে প্রকাশ্যে নামে নাসির উদ্দিন নামের এক ব্যক্তি। স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যানের খাস চামচ। অত্যন্ত ধুরন্ধর প্রকৃতির লোক সে। এলাকার লোকজন বলাবলি করে, এই নাসির উদ্দিন সরকারই চেয়ারম্যানকে ডুবাবে। ইউনিয়ন পরিষদের সচিব পদে নিয়মিত লোকবল রয়েছে। অথচ তা সত্ত্বেও সচিবকে অনেকটা নিষ্ক্রিয় রেখে চেয়ারম্যানের প্রশ্রয়ে সেই কাজ দেখাশোনা করে নাসির উদ্দিন সরকার। আর এভাবে ইউনিয়ন পরিষদের কাজ দেখাশোনা করতে গিয়ে সে জানতে পারে, খারনৈ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সমস্ত ভূমি সরকারি খাস খতিয়ানের অন্তর্ভুক্ত হয়ে আছে। অথচ জনশ্রুতি আছে, সে এলাকার হাজং জোতদার বজ্রগিরি বা বজ্র মোড়ল টংক আন্দোলনকারী স্বগোষ্ঠীয় বিপ্লবীদের কবল থেকে বাঁচার জন্য তদানীন্তন পাকিস্তান সরকারের ‘খারনৈ ইপিআর ক্যাম্প’ স্থাপনের জন্য যে সময় ভূমি দান করেছিল, সে সময়েই নাকি খারনৈ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য মাঠসহ চার একর ভূমি দান করেছিল। বলা হয়ে থাকে শুধু মৌখিকভাবে সে জমি দান করেছিল। ব্রিটিশ আমল থেকেই দুর্গাপুরের জমিদারের কাছ থেকে বন্দোবস্ত নিয়ে বিশাল ভূমির মালিক ছিল হাজং বজ্রগিরি। ১৯৪৭ এ দেশ বিভাগের পর জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ হলেও এই বিশাল ভূমির মালিক থেকে যায় বজ্রগিরি। পাকিস্তান আমলে বজ্রগিরি তার বিশাল সম্পত্তি থেকে হাটগোবিন্দপুরের বাজারের জন্য প্রায় পাঁচ একর, খারনৈ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য চার একর এবং খারনৈ ক্যাম্পের জন্য তিন একর ভূমি দান করে। এ ছাড়াও খারনৈ ক্যাম্পের পূর্বাংশ থেকে পূবে খারনৈ প্রাথমিক স্কুলের উত্তরাংশ প্রায় বিশ একর জমিতে ছিল হাজংদের মরা খলা। পঞ্চাশের দশকের শেষ দিকে দানশীল হাজং বজ্র মোড়ল পরলোকে গমন করে। ষাটের দশকেও মরাখলায় একটা বনের আবহ ছিল। ছিল নানা রকম গাছ, গুল্ম এবং ঝোঁপঝাড়। ১৯৬৪ সনের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার গুজবে বজ্রগিরির পরিবারের সদস্যরা তাদের বিশাল ভূসম্পত্তি ও বাড়িঘর ফেলে রেখে পাশের দেশে পাড়ি জমায়। বজ্র মোড়লের পরিবারের সদস্যরা এদেশ ছাড়ার কিছুদিনের মাঝেই গ্রামের অন্যান্য হাজংরাও পর্যায়ক্রমে রাতের অন্ধকারে ওপারে পাড়ি জমায়। ফলে সেই মরাখলায় শব দাহের কাজ একেবারেই কমে যায়। ক্রমে সেই মরাখলা রিফিউজিদের দ্বারা বেদখল হতে থাকে। কেউ কেউ আবার বজ্রগিরির আত্মীয়ের কাজ থেকে কাগজ করে মরাখলার জমি

ভোগ দখল করতে থাকে। এক সময় সেখানে আর মরাখলার চিহ্ন থাকলো না। আস্তে আস্তে তা জনবসতিতে পরিণত হয়। অন্যদিকে সেই পরিবারের ভূসম্পত্তিরও কিছু অংশ তার আত্মীয়স্বজনদের কাছ থেকে বাঙালিরা কিনে নেয়, আর কিছু সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তিতে পরিণত হয়। আর এদিকে দীর্ঘদিন হাট গোবিন্দপুর বাজার ও খারনৈ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জমির খাজনা না দেয়ার ফলে তা খাস খতিয়ানের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। আর স্কুলের সেই খাস খতিয়ানের জমিটাই ধৃত নাসির উদ্দিন সরকার চেয়ারম্যানের সহায়তায় গোপনের নিজের নামে লিজ নেয়। অতঃপর চেয়ারম্যানের মৌন সম্মতিতে ধীরে ধীরে নাসির উদ্দিন সরকার এলাকার বিশাল এবং একমাত্র খেলার মাঠ নিজের দখলভুক্ত করার পায়তারা শুরু করে। এলাকার মানুষ যখন তাদের অপকর্মের কথা জানতে পারে, তখনই প্রতিবাদ দানা বাঁধতে থাকে। বিশেষত ফুটবলপ্রেমী কিশোর কামাল, মালেক, জামাল, পীযুষ, ধীরেন হাজং এ ঘটনা জানতে পেরে প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। ওরা সম্মিলিত প্রয়াসে এলাকার গণ্যমান্যদের গোচরে নেয় ব্যাপারটি। বিবেকবান মানুষরা তাদের আহ্বানে সাড়া দেয় বটে। কিন্তু ক্ষমতাবান চেয়ারম্যানের দাপটের মোকাবিলা করতে কেউ সামনে আসতে চায় না। যে তাদের আহ্বানে সঙ্কট মোকাবিলায় সাড়া দেয়, সে হলো সবার পরিচিত মারফত ভাই। এই মারফত আলী এক সময়ে খারনৈ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাড়াশোনা করেছে। ছিল স্কুলের একজন ভালো ফুটবল খেলোয়াড়ও। ছাত্র হিসেবেও মন্দ ছিল না। কিন্তু গ্রামের গরিব কৃষকের ছেলে বলে পড়াশোনায় বেশি দূর এগোতে পারেনি। বাধ্য হয়ে বাল্যকালেই বাবার পেশায় যোগ দিতে হয়েছে। অক্লান্ত শ্রম আর নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে অল্পদিনের মাঝেই কৃষিকাজে সফল পেতে শুরু করে মারফত আলী। অভূতপূর্ব উন্নতির সোপান বেয়ে মারফত ভাইয়ের পরিবার প্রতিবছর জমি কিনে কিনে গ্রামের উল্লেখযোগ্য জোতদার হয়ে উঠে। অল্পদিনের মাঝে কৃষিকাজে সফলতা পেলেও মারফত আলীর মনে ছিল অব্যক্ত একটা অতৃপ্তি। আর তার সেই পুঞ্জীভূত অতৃপ্তি বুক থেকে কখনো দীর্ঘ নিশ্বাস হয়ে বারে পড়ে। তার আক্ষেপ হয় এ জন্যই, যে দারিদ্র্যের জন্য তার পড়ালেখা হয়ে ওঠেনি, অল্প সময়ে সেই দারিদ্র্য ঘুচলো বটে; তবে বুকের ভেতর রয়ে গেলো পড়ালেখার দারুণ তৃষ্ণা। আর সে তৃষ্ণা মেটায় সে নিজের ভাইবোনসহ গ্রামের শিশু-কিশোরদের লেখাপড়া এবং খেলাধুলায় উৎসাহ-উদ্বীপনা দিয়ে। কখনো কখনো সে খেলাধুলায় সাধ্যমতো আর্থিক সহযোগিতাও করে। আর এভাবেই মারফত আলী দিনে দিনে শিশু-কিশোরদের কাছে প্রিয় ‘মারফত ভাই’ হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। ফলে সঙ্গত কারণেই মারফত আলী ধীরে ধীরে কিশোর মালেক, পীযুষ ও জামালদের বন্ধু এবং অসম বয়সী এক সাথী হয়ে উঠে। পশ্চাৎপদ ওই নিভৃত পল্লী এলাকায় শিশু-কিশোররা তাদের বিভিন্ন খেলাধুলা বিশেষত ফুটবল ও ভলিবল খেলায় মারফত ভাইকে ক্রীড়া সংগঠক হিসেবে পায়। তাকে সামনে রেখেই ফুটবল কিংবা ভলিবল প্রতিযোগিতার আয়োজন করে থাকে। কিন্তু যে জায়গায় শিশু-



কিশোরদের এই খেলাধুলা অনুষ্ঠিত হয়, সে মাঠটা যদি নাসির উদ্দিন সরকারদের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের কারণে বেহাত হয়ে যায়, সেখানে তো মারফত ভাইয়ের লোক আর হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পাও না। কিশোরদের সঙ্গে নিয়ে চক্রান্তকারীদের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় মারফত ভাই। এ ব্যাপারে সে কিশোরদের নিয়ে বিগত ইউপি চেয়ারম্যান নির্বাচনে নিকটতম প্রতদ্বন্দ্বী সবুজ মিয়ার কাছে যায়। সবুজ মিয়াও বয়সে নবীন। এই সবুজ মিয়ার নেতৃত্বেই ইউনিয়নব্যাপী নতুন প্রজন্মের মাঝে অভূতপূর্ব সাড়া জাগতে শুরু করে। গত নির্বাচনে স্বল্প ব্যবধানে হারলেও নব্য-তরুণরা সবুজ মিয়াকেই চেয়ারম্যান বলে সম্বোধন করে। আর এই নবীন প্রতিদ্বন্দ্বী সবুজ মিয়াকে শফিক চেয়ারম্যান মোটেই সহ্য করতে পাও না। খারনৈ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও এর বিশাল মাঠসহ সব ভূসম্পত্তি যখন শফিক চেয়ারম্যানের প্রশ্রয়ে নাসির উদ্দিন সরকার বেহাত করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, তখন সবুজ মিয়ার নেতৃত্বে ওরা রুখে দাঁড়ায়। তার নেতৃত্বেই এলাকার বিবেকবান মানুষরা প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠে। এভাবে গণচাপে শফিক চেয়ারম্যান এবং নাসির উদ্দিন সরকার কোণঠাসা হয়ে পড়ে। বাধ্য হয়ে তাদের দশ গ্রামের মানুষের সম্মিলনে অনুষ্ঠিত সালিশে বসতে হয়। সালিশে সিদ্ধান্ত হয়, নাসির উদ্দিন সরকার সাবরেজিস্ট্রি অফিসে গিয়ে ফের স্কুলের নামে ভূমি হস্তান্তর করে দেবে। দরবারে দিন-তারিখও ধার্য করে দেয়া হয়। বারো।

বৈশাখের শেষের দিকে প্রবল বৃষ্টিপাতের কারণে বিল-বিল, নদী-নালায় পানি বেড়ে গেছে। তারপর সপ্তাহকালব্যাপী প্রখর রোদ ও গরম। গ্রীষ্মের শেষের দিকে আবার আকাশ মেঘলা হয়ে উঠে। পূর্ব নির্ধারিত তারিখে মারফত ভাইসহ কিশোরদল এবং নবীন নেতা সবুজ মিয়া উপজেলা সদরে সাবরেজিস্ট্রি অফিসের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। সেদিন ভোর থেকেই আকাশে দেখা দেয় অস্ত্রির মেঘের ঘনঘটা। থেকে থেকে দমকা হাওয়ার দাপট বেড়ে চলে। খারাপ আবহাওয়া দেখে মারফত ভাই কিছুটা সংশয় প্রকাশ করলেও কর্তব্যবোধে তা পাত্তা পায়নি। পূর্ব নির্ধারিত তারিখ বলে অন্যথা করারও সুযোগ নেই। ইলশেগুড়ি বৃষ্টির কারণে সবাই ছাতা নিয়ে বের হয়। গ্রামের বাজার থেকে কাদাযুক্ত পিচ্ছিল পথ মাড়িয়ে তাদের হাঁটতে হয় পাঁচ কিলো পথ। মাঝে মধ্যে ধেয়ে আসা দমকা বাতাসের ঝাপটায় মাথার উপরের ছাতা দুমড়ে দলামোচা করে ফেলে যেনো। তবু এমন দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার মাঝেই পথ চলতে হয় তাদের। এভাবে পাঁচ কিলো পথ পায়ে হেঁটে ওরা তেলঙ্গা বিলের পাড়ে যায়। সেখান থেকে হস্তচালিত নৌকায় উত্তাল বিলে পাড়ি দেয়াসহ ছয় কিলো জলপথে গিয়ে উপজেলা সদরে পৌঁছে ওরা। পশ্চাৎপদ এলাকায় এ ছাড়া তো যোগাযোগের অন্যকোনো ব্যবস্থাও নেই। তখন বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ দেখা দিয়েছে। তার প্রভাবেই আকাশজুড়ে অস্ত্রির মেঘের দাপাদাপি। নিচে টিপ টিপ বৃষ্টি আর থেকে থেকে দমকা বাতাস। উপজেলা সদরে পৌঁছে প্রথমেই ওরা সাব রেজিস্ট্রি অফিসে ঢুকে। তারপর থেকেই নাসির উদ্দিন সরকারের জন্য অধীর অপেক্ষা। স্কুলের জমিটা দলিল মূলে হস্তান্তর

করার জন্য শেষ পর্যন্ত নাসির উদ্দিন সরকার আর আসেনি। এতো খারাপ আবহাওয়ার মাঝেও ওরা সদলবলে এসে সারাদিন অপেক্ষা করল, কিন্তু প্রতিপক্ষ তাদের সব প্রচেষ্টা বিফল প্রমাণিত করল। মারফত ভাইয়ের দল বুঝে নিল, ধূর্ত নাসির উদ্দিন সরকার চেয়ারম্যানের সহায়তায় হয়তো বা অন্য কোনো ফন্দি-ফিকির করছে। তাই বিকেল বেলায় সবুজ মিয়াসহ মারফত ভাইয়ের দল বাড়ির উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। তখন সময় যত গড়াচ্ছে, বৃষ্টি ও দমকা বাতাসের প্রাবল্য ততই বাড়ছে। সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকায় ততক্ষণে দশ নম্বর মহা বিপদ সঙ্কেত ঘোষিত হয়েছে। তার প্রভাবেই সারা আকাশজুড়ে দুর্ধর্ষ মেঘের কি ভয়ানক মহড়া। এই ভয়ঙ্কর আবহাওয়া মাথায় নিয়েই ওরা পথে নামে। এ ছাড়া তো অন্য কোনো উপায়ও নেই। বাড়িতে তো তাদের ফিরতেই হবে। কর্দমাক্ত পথে কিছুক্ষণ হেঁটে ওরা ফেরিঘাটে পৌঁছে। নেহায়েৎ দরকার ছাড়া এমন দিনে কেউ কি ঘর থেকে বের হয়! ফেরিঘাটে তখন একটা মাত্র ছোট্ট নৌকা। ওই নৌকাতে সবাই গাদাগাদি করে বসে ওরা। পালতোলা নাও ঘাট থেকে ভাসানো মাত্রই দুরন্ত দমকা বাতাসের কবলে পড়ে। তীর বেগে ছুটে চলে নৌকা। থেকে থেকে ধেয়ে আসা দমকা বাতাস একেকবার পালের ওপর আছড়ে পড়ে। আর বাতাসের তাড়ায় গতি বাড়ে নৌকার। একটানা দমকা বাতাস আর গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টির তোড়ে ততক্ষণে সবাই ভিজে জবুথবু। ততক্ষণে তিরতির শীতে বোঁকে ধরেছে নৌকার সব আরোহীকে। তবু তাদের উদ্যমে ভাটা নেই মোটে। দুটি বিলের মাঝের সংযোগ খালের পথে চলমান নৌকার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে হই-হুল্লাড়ে আনন্দ করে চলে কিশোরের দল। ততক্ষণে নৌকা গিয়ে চিকন মাটিয়ার খাল থেকে তেলঙ্গা বিলে গিয়ে নামে। তখন মালেক বলে উঠে, এতক্ষণ তো ভালোয় ভালোয় আসলাম। যে রকম উত্তাল বিল, মাঝখানের ওই হিজল গাছের কাছের জায়গাটায় যে ঢেউয়ের বহর দেখা যায়; তা পার হতে পারলেই বিপদমুক্ত হওয়া যাবে। জামাল বলে, ক্যান!

-বাবার কাছে শুনছি ওই জায়গাটা নাকি ভালো না। ওখানে নাকি 'আজর' থাকে।

-'আজর' কিরে?

-আরে বুঝস না, আজর মানে জলদৈত্য বা জলভূত।

ধীরেন হাজং জবাব দিয়ে বলে। তখন বেরোয়া পীযুষ সাংমা বলে, আরে রাখ তোর জলভূত-টুত। কিশোরদের কথা শুনে সবুজ চেয়ারম্যানের (পরাজিত) মুখে হাসি ফুটে। ঠিক তখনি মারফত ভাই উৎকর্ষার সঙ্গে বলে, আসলে এমন দিনে আমগর বাড়ির বাইরে আসা ঠিক হয় নাই। ভয়ানক বাতাসের মাঝে ছোট একটা নৌকা দিয়া এমন হাওড়ের মতো একটা বিল পার হওয়া তো বিপদের কারণ। আমি তো আবার সঁতার জানি না।

মারফত ভাইয়ের চোখে-মুখে আতঙ্কের ছায়াপাত দেখে 'ফেল চেয়ারম্যান' সবুজ মিয়া বলে, মারফত ভাই! উরাইতেছ নাকি ?

তাদের এসব আলোচনার মাঝেই বিলের খোলা প্রান্তরের দুরন্ত হাওয়া ঝাপটে ধরে নৌকার পাল। নৌকার তখন ক্ষিপ্ত গতি। ভীত মালেক তখন বলে

উঠে, বাবা বলেছিলেন, সন্ধ্যা বাতির সময় হিজল গাছের পশ্চিমের ডোবায় কোনো নৌকা পাইলেই হয়, অমনি জলভূতে নৌকাটা পানির মাঝে একেবারে 'গাইডা' ফেলায়।

-আরে রাখ তো ওসব ভূতের আলাপ। শুধু বাবা বলছে-বাবা বলছে করতেন। আরে সন্ধ্যা হওয়ার এখনো অনেক বাকি। ততক্ষণে আমরা বিল পার হয়ে যাব।

মালেককে ধমক দিয়ে পীযুষ সাংমা বলে। চিকন মাটিয়ার খালটা তেলঙ্গা বিলের দক্ষিণ প্রান্ত দিয়ে ভাটির দিকে প্রবাহিত হয়েছে। আঁকাবাঁকা খালটি উদ্দাখালি নদীতে গিয়ে আপন সত্তা হারিয়েছে। খালের দুপাড়ে দাঁড়িয়ে আছে সারি সারি হিজল-জাবুল গাছ। বর্ষাকালে এসব গাছের গোড়া থাকে পানির নিচে। পানি বেশি হলে কখনো আকণ্ঠ ডুবে যায় গাছগুলো। আশপাশে কোনো বাড়িঘর নেই। অন্ধকার নামলেই ঝাঁকড়া শাখায় দাঁড়িয়ে থাকা ওসব গাছে ওঁৎ পেতে থাকে ডাকাত দল। সন্ধ্যা হলেই ডাকাতরা নিরীহ নৌকারোহীদের সর্বস্ব লুটে নেয়। কাজেই ত্রিমুখী ভয় সঙ্কুল জলপথে তখন ছুটে চলেছে তাদের নৌকা। হিজল গাছের কাছাকাছি যেতেই দমকা বাতাসের হেঁচকা টানে হঠাৎ নৌকা কাত হয়ে গেলে আরোহীদের পিলে চমকে যায়। তখন বেসামাল বাতাসের তাড়া খেয়ে টালমাটাল হয়ে যায় পালটা। প্রতিক্রিয়ায় জলের ওপর উদ্ভস্ত যানের মতো বেরোয়া গতিতে চলে নৌকাটা মুহূর্তের মাঝেই বিলের মাঝখানে হিজল গাছের কাছে চলে আসে। বিলের মাঝে ডুবো চরের মতো একটা কান্দা জমির চালা চল গেছে অনেক দূর। তারই প্রান্তে পানিতে আকণ্ঠ ডুবে দাঁড়িয়ে আছে হিজল গাছটা। এর ঠিক পশ্চিমেই ওই ভয়ঙ্কর ডোবা। ওই গাছকে পুবে রেখে নৌকাটা দক্ষিণ থেকে উত্তর দিকে ছুটে যাচ্ছিল। হঠাৎ নৌকা হিজল গাছের আড়ালে পড়ে। আর আমনি দমকা বাতাসের অভাবিত ঘূর্ণনে নায়ের পালের দড়ি গেলো ছিড়ে। তাক সামলাতে না পেড়ে লোক বোঝাই নৌকাটা চোখের পলকে তলিয়ে যেতে থাকে। বিপদ আঁচ করে সবাই পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রাণপণে সঁতার কাটতে শুরু করে। সমস্যা হয়ে যায় মারফত ভাইয়ের। কারণ সে তো সঁতার জানে না বলে আগেই জানিয়েছিল। আসন্ন এ মহাবিপদে তার তো আর রক্ষা নেই। তাই সবাই যখন জীবন নিয়ে পালাচ্ছে, তখন মারফত ভাই প্রাণপণে শুধু এই কথাটুকু বলে। মারফত ভাই বলে, চেয়ারম্যান! ভূমি বুঝি আমারে আর বাঁচাইবার পারলে না।

শেষ বিকেলে তেলঙ্গা বিলের মাঝখানে নৌকাডুবির ঘটনা বিলের পুর্বের গাঁয়ের মানুষের নজরে এসেছে। তাই ডুবে যাওয়া নৌকার হতভাগ্য আরোহীদের বাঁচানোর জন্য ছুটে আসে একটা ছোট্ট নৌকা। অথৈ পানিতে সঁতার কেটে ঢেউয়ের দোলাচলে ভাসমান সব লোক নৌকায় ধরবে না। তাই কিছু লোক উদ্ধার করে কাছের কান্দা জমিতে রেখে আসে। তারপর ফের আসে বাকিদের উদ্ধার করতে। সবার শেষে নৌকায় উঠে জামাল। নৌকায় উঠেই সে বলে, মারফত ভাই কইরে মালেক?

-তাই তো, মারফত ভাই কই; আগের নৌকায় যায় নাই তো!

-আগেরবার নৌকায় উঠতে দেখি নাই তো।

জামালের কথায় শঙ্কর আভাস! তাই ডাঙ্গায় ওঠা লোকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সে সজোরে চিৎকার করে বলে, ওই চেয়ারম্যান! মারফত ভাই কই, মারফত ভাই কি তোমরার সঙ্গে ডাঙ্গায় গেছে? -না, এইখানে আগের নায়ে আসে নাই তো। জবাবে ডাঙ্গা থেকে চিৎকার করে চেয়ারম্যান সবুজ এ কথা বলে। এবার জামাল আতঙ্কে শিউরে উঠে এবং মরিয়া হয়ে ডাকে, মা-র-ফ-ত ভাই...! সঙ্গে সঙ্গে কান্নাজড়িত গলায় মালেক বলে, মা-র-ফ-ত ভাই...! ডাকে পীযুষ সাংমা। বলে, মা-র-ফ-ত ভাই...! ডাঙ্গা থেকে ধীরেন হাজং বলে, মা-র-ফ-ত ভাই...! ডাকে সবুজ মিয়া, মা-র-ফ-ত ভাই...! কাঁপা গলায় কখনো সবাই একযোগে ডাকে, মা-র-ফ-ত ভাই...! কিন্তু তাদের বিচ্ছিন্ন বা সম্মিলিত ডাক শাঁ শাঁ রবে ধাবমান বাতাসে লীন হয়ে যায়। কিন্তু কোথা থেকেও কোনো জবাব ফিরে আসে না। ধীরে সন্ধ্যার কালো অন্ধকার গ্রাস করে ফেলে উত্তাল সমুদ্রের মতো রান্ধুসী তেলঙ্গা বিলকে। সারারাত চলে যায় মারফত ভাইয়ের খোঁজাখুঁজি আর শোকের আহাজারিতে। রাতের পর আলোর ঝাঁপি নিয়ে হাজির হয় ভোর। সেই থেকে অনেকগুলো নৌকায় সারা বিলে তন্ন তন্ন করে খোঁজা হয় মারফত ভাইকে। সবার চোখে-মুখে উৎকণ্ঠা-অনাহার আর অনিদ্রার ছাপ। তবু বিপুল উদ্যমে খুঁজে চলে ওরা। গ্রাম থেকে আসে স্বজন আর শ্রুতাকাঙ্ক্ষীরা। প্রাণপণে সবাই খুঁজে ফিরে সারাদিন। শেষ বিকেলেও জানা যায়নি মারফত ভাই বেঁচে আছে, নাকি...! সন্ধ্যার আগ মুহূর্তে হতাশ হয়ে অনেকে ফিরতে শুরু করেছে। কিন্তু বেকে বসে জামাল। মারফত ভাইকে না নিয়ে সে বাড়ি ফিরবে না। তাই কেউ কেউ যখন ফিরে যাচ্ছিল, তখন থেকে থেকে তার বুক বেয়ে গলা পর্যন্ত ঠেলে উঠছিল ডুকরে ওঠা অদম্য কান্না। সন্ধ্যার অন্ধকার নামার আগে শেষবারের মতো সে নৌকা নিয়ে খুঁজে ফিরছিল। সবশেষে বিধ্বস্ত মনে তেলঙ্গা বিলের সঙ্গে চিকনমাটিয়া খালের সংযোগ স্থলের কাছে ঘন দামগুলোর কাছে যায় সে। সেখানে সে নির্বিশ্রমে লক্ষ করে দেখতে পায়, বিল থেকে ধীরে বয়ে যাওয়া পানির গহিন স্রোতের সঙ্গে ভেসে যাচ্ছে 'অচেনা' পথে চেনা সাথী' সবার প্রিয় মারফত ভাইয়ের লাশ। তেরো। হঠাৎ করে বড় ভাইয়ের এমন বিয়োগান্ত ঘটনা সমুদ্রের সোনামির মতো তানিয়াদের পরিবারে প্রচণ্ড এক আঘাত হানে। যে আঘাতের ক্ষত কোনোদিন পূরণ হবার নয়। তানিয়াদের পরিবারে তখনও শোকের আবহ। বাধ্য হয়ে মেঝেভাই তখন পরিবারে মারফত ভাইয়ের স্থলাভিষিক্ত হয়। কিন্তু সে তো বাড়িতে থাকতে পারে না। কর্মস্থলে থাকার কারণে আবার বাবাকে সক্রিয় করার চেষ্টা করে মেঝে ভাই। কিন্তু বড় ছেলের এমন অকাল মৃত্যু বাবার পঁজর ভেঙে দেয়। বাবা কেমন যেনো বোধশোধহীন হয়ে যায়। ফ্যাল ফ্যাল করে দূরে তাকিয়ে থাকে। বাবাকে এ অবস্থায় দেখে মেঝেভাই শরাফত বলে, বাবা! এখন আমাদের কঠিন সময়। এই সময়ে যদি আপনি ভাইস্কা পড়েন বা নির্বিকার থাকেন তাহলে সর্বনাশ তো আমাদের পিছু ছাড়বে

না। সামনে তানিয়ার এসএসসি পরীক্ষা। বাকিরাও স্কুল-কলেজে। এ অবস্থায় আপনি যদি সংসারের হালটা একটু না ধরেন, তাহলে আমি চাকরি করব না, চাষাবাদ দেখব। শরাফতের কথায় বাবার কিছুটা হলেও টনক নড়ে। আর তখনই বড় ছেলের কথা মনে করে অসহায়ের মতো কাঁদতে থাকেন। শরাফত তখন বলে, চলমান এই পৃথিবী কারো জন্য থাইমা থাকে না বাবা! আমাদেরও থামলে চলবে না। এই বলে পরিবারের এই সঙ্কটে তাদের কী করণীয়- এই নিয়ে রাতে মা-বাবা, ভাইবোনদের নিয়ে বসে। আলাপ-আলোচনা করে প্রত্যেক ভাইবোনকে স্ব স্ব দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে মেঝেভাই বুঝিয়ে বলেন। ওদিকে মারফত ভাইয়ের সলিল সমাধি প্রতিপক্ষের পোয়াবারো হয়ে দাঁড়ায়। কারণ, এমন একজন ভালো মানুষের অকাল মৃত্যুতে সবাই স্তম্ভিত হয়ে যায়। আর সেই দৃষ্টিনার সম্পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে ধূর্ত নাসির উদ্দিন সরকাররা। সরকারি নীতিমালার আওতায় স্কুলের নামে জমি থাকা বাস্তব। স্কুলের নামে কেউ তার রেকর্ডভুক্ত জমি না দিলে প্রতিষ্ঠানটি অন্যত্র স্থানান্তর হয়ে যাবে- এমন একটা রব তোলা হয় এলাকায়। ফলে গ্রামে স্কুল রাখার স্বার্থে একই গ্রামের ওয়াইজ উদ্দিন মোড়লের রেকর্ডভুক্ত জমি স্কুলের নামে দান করে। এভাবে স্কুল স্থানান্তর হয় মোড়লের দান করা মাঠহীন স্বল্প জমিতে। নাসির উদ্দিন সরকার চেয়ারম্যান এবং তার চাম্বাদের সহায়তায় স্কুলের জমিতে অস্থায়ীভাবে খড় ও বাঁশ দিয়ে নির্মাণ করে বাড়ি। চেয়ারম্যানের ক্ষমতা থাকা অবস্থায় সে ভূমি আবার হস্তান্তর করে হীন স্বার্থান্বেষী রমিজ উদ্দিন নামের এক কৃষকের কাছে। আর এভাবেই খারনৈ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সমস্ত জমি এলাকার মানুষরূপী কতিপয় অর্থ পিশাচের দ্বারা বেহাত হয়ে যায়। ফলে এ অঞ্চলের মানুষ হারায় এলাকার সবচেয়ে বড় খেলার মাঠটি। অকালে মরহুম মারফত ভাইয়ের সঙ্গে সেই মাঠটি বেহাত হওয়ার গল্পটিও তাই স্থায়ীত্ব পায়। চৌদ্দ। সাফল্যের সঙ্গে এসসি পাসের ফলাফল জেনে কান্নায় ভেঙে পড়ে তানিয়া। মুঠোফোনের কল্যাণে ফলাফল জেনে মাকে জড়িয়ে ধরে তানিয়া কেঁদে কেঁদে বলে, আইজ যদি মারফত ভাই জীবিত থাকতো, তাহলে সে-ই সবচেয়ে বেশি খুশি হইত। আমগর লেখাপড়ার পিছনে বড় ভাইয়ের যে, অবদান তো সারা জীবনেও ভোলা যাইব না। তানিয়ার ফলাফলে তাদের পরিবারের সবার চোখে আনন্দাশ্রুর ঢল বয়ে যায়। পরিবারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তানিয়া ভর্তি হয় নেত্রকোনা সরকারি মহিলা কলেজে। ছোট্ট একটি টিনশেড বাসা ভাড়া করে দুইবোনে থাকে। ওদের সবাই পড়াশোনা করে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছুটি হলে গ্রামের বাড়ি যায় ওরা। সেদিন একাকি বাড়ি ফিরছে তানিয়া। নেত্রকোনার শহরের রাজুর বাজার বাসস্ট্যান্ড থেকে কলমাকান্দার বাসে উঠেছে সে। টিকিট কেটে নিজের আসনে বসেই চমক লাগে তার। মনে হয় বাসটা একেবারে নতুন। দুর্গম ও অবহেলিত এলাকার এ সড়ক পথে সবসময়ই তো পুরাতন

কিংবা অন্যান্য পরিবহন সেক্টরের পরিত্যক্ত বা একেজো বাসগুলোই এ বাসলাইনে চালানো হয়। পুরানো, সেকলে কিংবা রুট পারমিশনবিহীন গাড়িগুলো এ পথে চালু রাখে বাস মালিকপক্ষ আর পরিবহন শ্রমিক সংগঠনের লোকরা। লক্কড়লক্কড় গাড়িগুলোর মাঝে হঠাৎ নতুন বাসটা দেখেই তাক লাগে তানিয়ার। সকালের লোকাল বাসে যাত্রী তেমন নেই। বিশ মিনিট পরপরই বাস। কাজেই যাত্রীদের তেমন ভিড় হয় না সকালে। কিছু আসন খালি নিয়ে বাস ছাড়ে। বাস হেলপার যখন ভাড়া তোলা শেষে পাশে এসে দাঁড়ায়, তখন তানিয়া বলে, বাসটা মনে হয় নতুন। -একেবারে নতুন না। ইঞ্জিন আর চেসিস পুরান। গাড়ির বডিভা নতুন তৈরি কইরা মালিক আর দেইখ্যা যাইতে পারলো না। -ক্যান? -গাড়ি রোডে নামানোর আগেই তো মালিক মারা গেলো। -ও আচ্ছা। -সুন্দর কইরা সাজাইলে কী অইব, যে বাস লাইন; কলমাকান্দা বাজারের দিন মেলা ভিড় অয়। এই যে সুন্দর সুন্দর ফ্যান লাগানো অইছে না, দেহা যাইব আবাদিরা ফ্যান ধইরা লটকি দিয়া খাড়াইব। -তাই। আবাদি শব্দটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে তানিয়ার মগজে সঁধে যায়। তানিয়ার বাড়িও তো এ উপজেলায়। জানালা পথে বাইরের দৃশ্যে মগ্ন হলেও আবাদি শব্দটি ভাবায় তাকে। নিজের মনেই প্রশ্ন জাগে এ 'আবাদি' আসলে কারা। বাস শ্রমিকদেরই কেনো এমন তাচ্ছিল্য তাদের প্রতি? এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে তৎপর হয় তানিয়া। নিজে নিজে তার উপজেলার অধিবাসীদের বিশেষগাত্মক উপাত্ত প্রণয়ন করে। সে ভাবে, উত্তর পাশে সীমান্ত সংলগ্ন তিনটি ইউনিয়নের জনসংখ্যার পঁচাত্তর ভাগ মানুষ সেটলার। পনেরো ভাগ গারো-হাজং উপজাতি এবং পাঁচভাগ আদিবাসী বঙালি এবং পাঁচভাগ আবাদি হতে পারে। কিন্তু 'আবাদি' অভিধায় অভিহিত বেশিরভাগ মানুষের বসবাস উপজেলা সদর ইউনিয়নেই হবে। তানিয়ার ধারণা, উপজেলা সদরের পশ্চিমের চান্দুয়াইল, শালজান, সাউদপাড়া, বিষ্ণুর প্রভৃতি এলাকার মানুষের আদি বসতি বৃহত্তর ঢাকা জেলায়। বিশেষত ঢাকা জেলার নিম্নাঞ্চলের মানুষই এ উপজেলার নিম্নাঞ্চলে এসে বসতি গড়ে তুলেছে। কিন্তু ওরা কি আবাদি নাকি সেটলার? তানিয়া সরেজমিনে এর সত্যতা যাচাইয়ের জন্য সাউদপাড়া যেতে আগ্রহী হয়। নিম্নাঞ্চলের জলজ জঙ্গল সাফ করে যারা পতিত জমি চাষের আওতায় এনেছে ওরাই প্রকৃতপক্ষে আবাদি। আবার যারা দক্ষিণাঞ্চল থেকে এ এলাকায় জমি কিনে স্থায়ীভাবে বসবাস করছে ওরা হলো সেটলার। তানিয়ার মেঝেভাই তো কলমাকান্দার একটি উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষক। বাড়িতে যাতায়াতের সুবিধার জন্য একটা পুরোনো মোটরবাইক কিনেছে মেঝেভাই। তানিয়া তার মেঝেভাইকে ফুফুর বাড়ি নিয়ে যাবার বায়না ধরে। কারণ, তানিয়া ফুফুতো বোন মোমেনার দাদার কাছ থেকে কিছু তথ্য জেনেছিল। মোমেনার দাদাই ছিলেন একজন খাঁটি আবাদি। এখনও সে এলাকার রাস্তা-ঘাট

সেকেলে। তার মনে প্রশ্ন জাগে, উপজেলা সদরের এতো কাছের জনপদে মানুষের চলাচলের জন্য এখনো ভালো রাস্তা নির্মিত হয়ে ওঠেনি।

গোরস্থানের কাছে নদীর উপর সেতু পার হয়ে আর সামান্যপথ ইটের সলিং। তারপর আর সামান্য পথ কাঁচা রাস্তায় ছুটে বাইক। এভাবে কিছুটা পথ এগিয়ে কাঁচা রাস্তা ছেড়ে একটি নদীর ঘাটে গিয়ে থামে বাইক। তানিয়া বলে, মেঝে ভাই! কোন নদী এইটা?

-উদ্দাখালী।

-তাই। কিন্তু এই দিক দিয়া তো নদীতে পানি নাই।

-হ্যাঁ। শুকাইয়া গেছে...

বলেই মেঝেভাই বাইক নিয়ে ঢালুপথে নদীতে নামে। তার পিছনে হেঁটে হেঁটে শুকনো নদী পার হতে থাকে তানিয়া। ততক্ষণে ভোঁ ভোঁ শব্দে বাইক চালিয়ে ওপাড়ে উঠে মেঝে ভাই। তানিয়া তখন দ্রুত পায়ে হেঁটে আবার বাইকে উঠে।

কিছুদূর এগোনোর পর পাওয়া যায় নদীর পাড় ঘেঁষা একটা ঈদগা মাঠ। মাঠের বিপরীত দিকেই নদীর ওপারে একটা পুরনো ভিটার মতো জায়গা দেখিয়ে মেঝেভাই বলে, এঁটাই নাকি ছিল এককালে কামরাঙা ঘাট।

-কামরাঙা ঘাট মানে!

-এই সম্পর্কে আমার ভালো ধারণা নাই। তবে মনে হয় এই এলাকার মুরবিদের কাছে এই ঘাট সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যেতে পারে।

এসব বলতে বলতে মেঝেভাই মনোযোগ দিয়ে বাইক চালিয়ে যায়। ক'মিনিটের মাঝেই ওরা সাউদপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আঙিনায় এসে থামে। তাদের গন্তব্য আর খানিক দূর। স্কুলের আঙিনার প্রান্তে রাস্তার পাশে একটা মুদির দোকান। এ দোকানেই আবার চা-ও বিক্রি করা হয়।

তানিয়াকে বহনকারী মেঝেভাই অল্পক্ষণের মাঝেই

মোমেনাদের বাড়ির আঙিনায় গিয়ে পৌঁছে।

তানিয়া দূর থেকে দেখতে পায় বয়োঃভারে ন্যূজ মোমেনার জবুথবু বৃদ্ধ দাদা বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছেন। লাঠিতে ভর করে করে সামনের দিকে ধীর পায়ে হাঁটছেন। বাড়ির আঙিনায় বাইক থামানো হয়েছে। তানিয়া বাইক থেকে নেমে বৃদ্ধের কাছাকাছি গিয়ে সালাম দিয়ে বলে, দাদা কেমন আছেন আপনি?

-ভালাই। তোমারে তো ঠিক চিনবার পারতেছি না।

-আমি মোমেনার মামাতো বোন। নাম তানিয়া...

-ও আচ্ছা। তুমি তানিয়া। মনে পড়ছে...

-দাদা আপনার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।

-তাইলে কও হনি।

-আপনি তো এক জায়গায় যাতেছেন মনে হয়।

-না হয় পরে যাসু, অহন যামু না। আগে তোমার লগেই আলাপটা সাইরা ফালাই। তার আগে চলো বাড়িতে গিয়া আমরা ঘরে বইসা নিই।

এ কথা বলে তানিয়াকে নিয়ে বৃদ্ধ আগ আগে

হাঁটে। তানিয়া তাকে অনুসরণ করে। ঘরে দাদার পাশে বসে তানিয়া বলে, দাদা আপনার বয়স অনুমান কত...?

-একশ বছরের উপরে তো অইবই।

-আচ্ছা দাদা, আপনার আগের বাড়ি কোথায় ছিল...!

-অহনে ঢাকার যে খিলগাঁও-বাসাবো, তার পূর্বে তেরমনি এলাকায় ছিল আমগর আদি বসতি।

-এই এলাকায় কি আপনার আমলে আসছেন নাকি আপনার পূর্ব পুরুষের আমলে।

-আমার বাপের আমলে আইছে। আমার জন্ম-কর্ম তো এইহানই।

-আপনার বাবা কি এখানে জমা-জমি কিনে নিছেন নাকি...

-না-না জমি কিনবো কেনে? ওই সময়ে তো

এইডা আছিল ভাসা এলাকা। কিছু কিছু টান জমিতে আছিল জঙ্গল। আর তার সঙ্গের নামা জমিতে আছিল নল-খাগড়ার জঙ্গল। আমার বাপে ওসব জঙ্গল পরিষ্কার কইরা চাষাবাদ করতে শুরু করে। তহন বৃটিশ আমল। দুর্গাপুরের জমিদারের নায়েবের অফিস আছিল আমগর গেরামের পূর্বে বামনি গেরামে। এইহান থাইক্যা এইসব জমির চেক কাইটা আনছে আমার বাপে। ওই নায়েবের অফিসেই খাজনা দিত। তহন তো আর অত বাড়িঘর আছিল না।

-তাই...।

-তহন তো দুর্গাপুরের জমিদার কৃষকগরে সাইধ্যা জমি দিতো। চাষিরাই বেশি জমি চাষের লাগি নিত না। কারণ জমি চাষ করলেই তো খাজনা দিতে অহিত।

-ও আচ্ছা। আপনারা এসব পতিত নামা জমির নল-খাগড়া সাফ করে চাষের আগুতায় আনছেন বলেই পাশের গ্রামের স্থানীয় লোকরা আপনারদের 'আবাদি' বলে, তাই না!

-হ হ, আমগরে পূর্বের গাঁ'র স্থানীয়রা তো 'আবাদি' বইলা হিংসা করতো। অনেকবার হেগর লগে আবাদিগর মারামারি লাগছে। কিন্তু আমগর লগে হেরা কুলাইতে পারে নাই।

-হ্যাঁ, আপনারা সংখ্যায় তো অনেক। অনেকগুলি গ্রামে আপনারদের বসবাস।

-হ, তা অবশ্য ঠিক কইছেন।

-কিন্তু আপনারা এ জায়গাটা চিনলেন কী করে কিংবা সেই ঢাকা ছেড়ে এমন দুর্গম এলাকায় আসলেন কী করে?

-হেইডা তো এক লম্বা কাহিনি। তাইলে হুনো কই। বলে লোকটা যে কাহিনিটা তা হলো এই- বৃদ্ধ লোকটির বাবা সম্ভবত ১৮৯০-১৮৯৫ সালের দিকে এই এলাকায় সপরিবারে এসে স্থায়ীভাবে



বসবাস করতে শুরু করে। তখন বৃষ্টিশ আমল। অবিভক্ত ভারত। আসামের ব্রহ্মপুত্র অববাহিকার উর্বর এলাকায় বাংলাদেশ থেকে লোক গমন করতে থাকে। সে এলাকায় জঙ্গল পরিষ্কার করে ওরা পতিত জমি চাষাবাদের আওতায় এনে কৃষিকাজে বেশ সাফল্য অর্জন করে। সেই জন প্রবাহের কিছু অংশ তখন গারো পাহাড়ের পাদদেশে এলাকায়ও এসে একইভাবে জঙ্গল সাফ করে পতিত জমি চাষাবাদের আওতায় এনে সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়। এই সাউদপাড়ার ঈদগা মাঠের বিপরীত দিকে নদীর ওপারে কামরাঙা ঘাট নামে ধান ব্যবসায়ের একটা বড় ঘাট ছিল। ঢাকা বা বৈরব এলাকা থেকে বড় বড় নৌকা আসতো এখানে ধান কেনার জন্য। অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে গারো-পাহাড়ের পাদদেশের উঁচু এলাকায় গারো-হাজংরা প্রচুর ধান উৎপাদন করতো। ওসব ধান গরুর গাড়ি দিয়ে কিংবা ঘোড়ার সাহায্যে বহন করে এ ঘাটে আনত। তখন উদ্দাখালি নদীতে ছিল নাব্যতা। হাজার মণ ধান বহনে সক্ষম এ রকম বড় বড় নৌকাও আসতো। ঢাকা কিংবা ভৈরবের বেপারিরা এসব ধান কিনে ঢাকায় নিয়ে যেতো। ওসব নৌকা নিয়ে যারা অসত, তারা এ এলাকার চাষযোগ্য পতিতজমি দেখে আকৃষ্ট হয়ে এ এলাকায় পাড়ি জমায়। পনেরো।

গ্রামের নিম্নুকরা তানিয়ার ডান হাত নেই বলে কখনো কখনো কটু মন্তব্য করে। পাশের বাড়ির চাচি, শরিফুলের মা বলে, পড়ালেহা করলে কী অইব। এই মেয়েরে বিয়া দিব কেনে! শুনিয়ে শুনিয়ে চাচি কথাগুলো বললে নীরবে সব হজম করে তানিয়া। মনে মনে বলে, গ্রামের অশিক্ষিত এসব মহিলাদের সে বোধ নেই। তাই ওরা একরূপ মন্তব্য করে। কাজেই ওদের এসব মন্তব্য শুনে মন খারাপ করার কোনো মানে হয় না। কখনো তানিয়া নিজেকে নিজে বলে, সত্যি যদি সে লেখাপড়া করে সুযোগ্য না হয়ে উঠে, তাহলে তো ওদের এসব কথার মতোই হতে হবে তাকে। রাতে পড়াশোনা শেষে এসব কথা ভাবতে ঘুমের ঘোরে পড়ে সে। স্বপ্নের রাজ্যে বিহার করে। স্বপ্নে ফিরে পায় তার ডানপিটে সে কৈশোর। স্বপ্নযোগে দেখে সমবয়সী চাচাত ভাইয়ের সঙ্গে গাছে উঠছে সে। তরতর করে সমতালে দু'জন দু'টি গাছে উঠে যাচ্ছে। গাছ থেকে আম পেরে বাড়িতে রেখেছে। তারপর আবার পুকুরে নেমেছে ওরা। সাঁতার কাটতে গিয়ে সে কী তুমুল প্রতিযোগিতা। দুহাতে সাঁতার কাটছে তানিয়া। না, কোনোভাবেই সে হার মানেনি। ভোরে ঘুম ভাঙলে রাতের স্বপ্নের কথা মনে করে নিজে নিজেই হাসে। কিন্তু মনটা খারাপ হয় এই ভেবে, স্বপ্নে দেখেছে তার দুটি হাতই আছে। কিন্তু বাস্তবে তো নেই। আর সেই চাচাত ভাইটিও পড়াশোনায় থেকে ঝরে পড়ার মতো। একবার এসএসসি ফেল করেছিল। প্রতিহিংসায় ওই চাচাত ভাইয়ের মা-ই তো কখনো কখনো তানিয়ার অঙ্গহানীর খুঁত ধরে নিন্দাবাক্য ছুড়ে। পরের রাতে আবার সে স্বপ্নের কবলে পড়ে। সে স্বপ্নে দেখে সে। বর্ষায় বাড়ির পাশের বিলে সে নৌকা নিয়ে নেমেছে। ডান হাতে কখনো বৈঠা চালিয়ে, কখনো লগি ঠেলে নৌকা নিয়ে সে বিলের ওই প্রান্তে চলে গেছে। সেখান থেকে ডাটাসহ

অনেকগুলো শাপলা ফুল কুড়িয়ে নৌকায় ভরেছে। চিংড়ি দিয়ে শাপলা ফুলের ডাটার তরকারি তাদের পরিবারের সবাই পছন্দ করে। শাপলা ফুল তুলতে তুলতে দক্ষিণাকাশটা হঠাৎ কালো মেঘে সেজে উঠে। যেনো ঝড়ো বৃষ্টি নামবে। তানিয়া তা আঁচ করে নৌকা নিয়ে বাড়ির দিকে রওয়ানা হয়। দ্রুত লগি বেয়ে প্রাণপণে চালায় নৌকা। ততক্ষণে আকাশ পথে ধেয়ে আসতে থাকে মেঘের দৈত্য। যেনো সামনে যা পায় গ্রাস করবে। তানিয়া ভরকে যাবার পাত্রী নয়। সেও দুহাতে চালায় লগি। মেয়ের আসন্ন বিপদ দেখে বাবা এগিয়ে যায় বিলপাড়ে। চিংকার করে হাঁক দেয়, তানিয়া জোরে নৌকা চালা। তাড়াতাড়ি চলে যায়। আমি পাড়ে আছি, ভয়ের কিছু নাই। আয় তানিয়া দুহাতে সজোরে লগি চালায়। তীর বেগে ছুটে আসুক নৌকা।

সত্যি, বাবার আহ্বানে ঝড়োবৃষ্টি আসার আগেই তানিয়া কিনারে পৌঁছে। বৃষ্টির আগে বাড়ি পৌঁছার জন্য দেয় ভোঁ দৌড়। আর তখনই চিকন আইলে হোট্ট খেয়ে পড়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে যায় তার ঘুম।

তখনো রাত পোহাবার অনেক বাকি। তানিয়া আবার ঘুমের রাজ্যে হারিয়ে যায়। স্বপ্নের রানি ফের খুলে দেয় দ্বার।

ওদিকে আরিফুল নাকি আবার এসএসি দিয়ে কোনো রকমে পাস করে স্থানীয় কলেজে ভর্তি হয়েছে। কিন্তু ঠিকমতো ক্লাসে যায় না। তার মতো প্রায় বখে যাওয়া কতগুলো ছেলের সঙ্গে ঘুরাফেরা করে। ওদের কেউ কেউ নাকি এলাকায় মারামারি কিংবা অনুরূপ ঘটনার সঙ্গেও জড়িত। সেদিন সন্ধ্যা বেলায় ঘটনাটা শুনতে পায়। আর ওই ঘটনাটা তো রীতিমতো উদ্বেগজনক। আরিফ নাকি এলাকায় অন্যান্য বন্ধুদের সঙ্গে মদ প্রস্তুতকারী গারো বাড়িতে যায়। মদ্যপ বন্ধুদের সঙ্গে মদ্যপান করে নাকি মাতলামিও করেছে। তাদের বংশে এই প্রথম কেউ মদ্যপানের মতো বদনেশায় জড়ালো। এ কথা শুনে মায়ের সঙ্গে তানিয়া বলে, ছিঃ ছিঃ। আরিফ ভাই শেষ পর্যন্ত এতটা নিচে নামলো! প্রতিক্রিয়ায় মা বলেন, যারা অপর মানুষের নিন্দা করে; একদিন ওরাই নিন্দিত অয়। তোর ডান হাত নাই দেইখ্যা পারলে অহনও আরিফের মা-বাবা খুঁটা দেয়। আরিফের লইয়া কত বড়াই করতো। আরিফের মন্দ আমরাও চাই না। কিন্তু না চাইলেই কি, যা সত্য- তা তো অস্বীকার করার জো নাই। -থাক না মা। আমরা আমাদের নিজেদের কথা ভাবি। যে যেমন কর্ম করবে, তার ফলও তেমনই হবে।

এই বলে মা-মেয়ে তাদের আলাপের প্রসঙ্গ পাল্টায়।

ষোল।

রাতে খাবারের সময় মা বলেন, তানি! বাড়িতে যখন আইছস; এইবার তোর বড় বইনের বাড়িতে বেড়ায়া আয়গা। তর বাপারে লইয়া যা। তানিয়ার বাবাও তাই চেয়েছিল। তানিয়ারও ইচ্ছে বড় বোনের ছোট বাচ্চাটা কতদিন দেখা হয় না। এতদিনে নিশ্চয়ই বড় হয়ে উঠেছে। হয়েছে বোধ হয় দুটুও। সকালের নাস্তা করেই বাপ-বেটি রওয়ানা হয়। রিকশায় এক ঘণ্টায় গিয়ে পৌঁছে বড় বোনজামাইয়ের বাড়ি। তানিয়া এবং বাবাকে দেখে

তো বড়বোন সাফিয়া আনন্দে আত্মহারা। তানিয়ার দুলাভাইও তখন বাড়িতে। তানিয়ার বোনজামাই মাদ্রাসার শিক্ষক। মাওলানা আবদুল আউয়াল। বেশ ভালো মানুষ। তানিয়া বড়বোনের সন্তানদের নিয়ে আনন্দে গুল্লোড় করে কাটিয়ে দেয় অনেকটা সময়। দুপুরের খাবারের শেষে তানিয়াকে দেখতে আসে বড় বোনের নন্দ এবং তার নন্দার জামাই। বড়বোন সাফিয়ার নন্দের জামাই আরবি শিক্ষিত। হাফেজ মাওলানা এফতেখারুল ইসলাম। তানিয়ার দুলাভাইয়ের সহকর্মী। একই মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করে। সে বাড়িতে এসেই বলতে থাকে ভাবি কই, ও ভাবি। শুনলাম আপনার ছোটবোন তানিয়া আইছে নাকি!

-হ, আইছে তো।

-হোড বেলায় দেখছিলাম তারে। অহন তো হুন্ছি

কলেছে পড়ে। একটু দেখতাম কত বড় অইছে।

তার নাহি একটা হাত নাই। ভাবি তানিয়া কই

তাইলে...?

কিন্তু লোকটার খোঁজাখুঁজিতে তানিয়ার কোনো আগ্রহ নেই। বরং লোকটার মুখোমুখি না হওয়াই তানিয়ার ইচ্ছে। তানিয়া চায় না লোকটার সামনে যেতে। কিন্তু বড়বোনের কাছে এতো আগ্রহ দেখাচ্ছে। না-ও তো করতে পাও না। লোকটার মাত্রাতিরিক্ত কৌতূহলে তানিয়ার বড়বোন সাফিয়াই লোকটাকে নিয়ে এসে বলে, এই তো তানিয়া। লোকটা বলে, তা তেমন আছো তানিয়া।

-ভালোই।

-মাশাআল্লাহ অনেক বড় অইয়া গেছো। তোমার একটা হাত নাকি ভাইঙ্গা গেছিল।

-হ্যাঁ।

-কোন হাত।

-ডান হাত।

-কই একটু দেখবার পারি।

ততক্ষণে তানিয়ার বড় বোন কী কাজে যেনো পাশের কক্ষে যায়। তখন লোকটা আবার বলে, দেখি তোমার ভাঙ্গা হাতটা একটু দেখাইবা। অনিচ্ছা সত্ত্বেও তানিয়া তার ডান বাহুল অবশিষ্টাংশ যেই মেলে দেয়, অমনি লোকটা সেখানে ধরে তার দুটু আঙুলে অশ্লীল দুটি কৌচা দেয়। অমনি তানিয়া এক বটকায় ঢাকন বাহ মুক্ত করেই সক্রোধে এই মুহূর্তে আপনি ঘর থেকে বেরিয়ে যান। যা- বদমাশ কোথাকার... সেই দিনের ঘটনা মনে নাই? লোকটা ভ্যাবাচেকা খেয়ে বের হয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঢুকে তার বড় বোন। তানিয়ার কণ্ঠ শুনছে সে। তাই জিজ্ঞেস করে, কী হইছে রে তানিয়া।

তানিয়ার রাগ তখনো পড়ে নাই। তার বড় বোন সাফিয়া আবার বলে, কসনা ক্যান তানিয়া। ক'না কী হইছে?

-শুনলা না এই বদমাইশটা আমার ভাঙা হাত দেখতে চাইল। আমি দেখাইলাম। অমনি ভাঙা বাহুল সে ধইরা তার হাতের আঙুলে একের পর এক দুইডা খোঁচা মারে। অশ্লীল খোঁচা।

-তার আগের কী ঘটনার কথা যেনো কইছিল...

-তহন আমি ক্লাস ফাইভে পড়ি। তহনও আমার শারীরিক কোনো পরিবর্তন আসে নাই। তখনও শিশু, হাফপেন আর গেঞ্জি পরি। ওই সময় ডুমি হেগরে লইয়া আমগর বাড়িতে বেড়াইতে গেছিলা। তহন ওরা নতুন দম্পতি। সেদিন আমাকে নিয়া

ওরা স্বামী-স্ত্রী নানা জায়গায় ঘুরাফেরা করল। লোকটা বাবারে কইল, আপনার এই মেয়ে লক্ষ্মী মেয়ে। বেশ মেধাবী। সেদিন পূর্ণিমার চাঁদ ছিল। লোকটা বলে, তানিয়া চলো ওদিকে যাই। বললাম, কোনদিকে? জবাবে সে বলল, ওই যে আমগাছটার দিকে। ওখানে খোলা বাতাসে। মেহমান মানুষ। তার কথা রাখতে হয়। আমি ঘর থেকে তিন ব্যাটারি টর্স লাইটটা হাতে নিয়ে তার সঙ্গে বের হলাম। -তারপর...? -আমাদের বাড়ির আঙিনার বড় আমগাছটার নিচে যেখানে চাঁদনি রাতে আধো আলো-আধো আঁধারি সেখানে গিয়ে লোকটা আমাকে জড়িয়ে ধরে তার বুকে নিয়ে আঁকা চাপ দেয়। আত্মরক্ষায় আমি হাতের টর্স দিয়া নিচে থেকে ওপরে জোরে তার মাথায় আঘাত করে বলি, ছাড় শয়তান! আর তা তার কপালে লেগে ফেটে যায়। সঙ্গে সঙ্গে কপাল থেকে রক্ত ঝরতে থাকে। তার কপাল থেকে রক্ত ঝরতে দেখে ভয়ে তো আমি ভেতরে ভেতরে জমে যাই। আমি দ্রুত বাড়ি ফিরে আসি। আমাকে তখন কেউ কোনো কিছু জিজ্ঞেস করলে কেবল হাঁ করে তাকিয়ে থাকি কোনো জবাব দিতে পারি নাই। রক্তাক্ত লোকটা কপারে হাত চেপে ধরে আমাদের বাড়ি ফিরে আসে। তখন তুমি জিজ্ঞেস করলে, কী হইছে। জবাবে সে বলেছিল, লাউঘুরির মানে লাউয়ের মাচানে যে চোখা বাঁশের ফালি লাগানো হয়েছে, সেটার খোঁচা লেগে কপালের ত্বক ফুটো হয়ে গেছে। এ পর্যায়ে এসে বড়বোন সাফিয়া বলে, হ-হ। আমারও তো দিবি মনে আছে। তাইলে বাইরের পোশাকে সে কোরআনে হাফেজ মাওলানা। আর ভেতরে ভেতরে সে আস্ত একটা শয়তান। -আচ্ছা আপা বলতে পারো, ডান হাতহীন এক প্রতিবন্ধী বলেই কি লোকটা আমার প্রতি এমন আচরণ করলো! তানিয়ার এ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে রাগে-ক্ষোভে-লজ্জায় সাফিয়া কেঁদে ফেলো। কেঁদে কেঁদে বলে, এই কথা আমি তর দুলাভাইরে জানানু। আর শয়তানডার বউয়েরও কইয়াম। কতবড় শয়তান সে, তারে উচিত শিক্ষা না দিয়া আমি ছাইড়া দিয়াম মনে করছস। প্রতিক্রিয়ায় তানিয়া বলে, শান্ত হও আপা। কাউকে কিছু বলা দরকার নাই। আমি তো আজই চলে যাব। তখন দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে। -কতদিনে আমগর বাড়িতে আইছস বইন। আর বদমাইশটা কিনা তরে এমন অপমান করল। আর আমি তা সহজে মাইন্য নিয়াম মনে করছস। ভাবির কান্নামিশ্রিত খেদোক্তি শুনে ততক্ষণে তার নন্দ ঘটে ওঠে। বলে, কী অইছে ভাবি। দুই বইনে বইয়া কী দুঃখের আলাপ করতেন? এনে অয় কানতেছেন বুঝ! -আমার কপাল যে খুব ভাল, এই কপালের কতা কইতাছি। তোমার জামাই কই গেছে! -জরুরি কামের কতা কইয়া তো চইলা গেলো বাড়ির দিকে। আমিও যামু ভাবি। তানিয়া থাকলে আর একবার আমুনো। ওরে খালি বাড়িতে বিশ্বাস নাই। সুযোগ পাইলেই কামের বেটির লগে টুরটুর

আলাপ করে। চরিত্র বালা না। -মুন্সি মানুষের চরিত্র... -হে তো আসল মুন্সি না। মুন্সি মানুষের বেশ ধইরা থাকে। হে অইল মুন্সিগর কলঙ্ক। আমার ভাইও তো মাওলানা। সারা এলাকা জুইড়া ভাইয়ের কত সুনাম। আর তার বেলায় কেবল দুর্নাম। মরছি পোলপানগুলিরে লইয়া। নাইলে বাঁঠ্যাং-এ লাখি দিয়া কোনদিন চাইলা আইতাম। যাই ভাবি... বলেই সাফিয়ার নন্দ চলে যায়। বিকেলে তানিয়াও তার বাবাকে নিয়ে বাড়ির উদ্দেশে রওয়ানা হয়। বড়বোন সাফিয়া তখন ছোটবোন তানিয়ার দুটি হাত চেপে ধরে বাবার অগাচরে নিচু স্বরে বলে, কতদিনে আইছিলি রে বইন। কিন্তু অপমানিত অইয়া গেলি। এই জন্য মনে কিছু রাখিস না। -ঠিক আছে আপা। মেয়েদের তো পদে পদে সমস্যায় পড়তে অয়। সেগুলির মাঝে মনে করব এইডাও একটা। বলেই বড় বোনের বাড়ি থেকে বাবাকে নিয়ে তানিয়া চলে আসে নিজেদের বাড়ি। পরদিনই সে আবার শহরে চলে যায়। সতেরো। পড়াশোনায় এগুঁয়েমি কাটানোর জন্য ছুটি পেলে কখনো কখনো শহরে অধ্যয়নরত তিন ভাইবোন এক সঙ্গে বাড়ি আসে। মা-বাবা-ভাইবোনের সঙ্গে আনন্দে সময় কাটায়। কিন্তু কখনো পড়ালেখায় গাফিলতি কওে না। কলেজ খোলা থাকা অবস্থায় দিনে-রাতে চলে একটানা পড়ালেখা। পড়াশোনাই যেনো তাদের একমাত্র সাধনা। পড়ালেখার কাছে রাতের ঘুম ব্যাহত হয়। সারা বিছানায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে বই। গভীর রাত পর্যন্ত জেগে মশারি না টানিয়ে পড়তে পড়তে কখন যে ঘুমিয়ে যায়, সেও জানে না। আর ভোর রাতে ঘুম ভাঙা মাত্র আবার উঠে পড়তে থাকে, পড়তেই থাকে। এভাবে পড়াশোনা করলে যে কেউ শিক্ষা জীবনে ভালো করবে- তা নিশ্চিত বলা যায়। সকাল বেলায় সময় হলে কলেজে যায়। অন্যান্য সহপাঠীদের মতো সারা বছর প্রাইভেট পড়ার সামর্থ্য তো তার নেই। তাই যে সব বিষয়ে তার দুর্বলতা অনুভব করে সে সব বিষয়ে সীমিতভাবে প্রাইভেট পড়ে। অনেক ক্ষেত্রে কোনো কোনো শিক্ষক তার কাছ থেকে প্রাইভেট পড়ার জন্য টাকাও নেয় না। এভাবে প্রায় দুবছর কঠোর শ্রম দিয়ে সে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দেয়। ফলাফলে তার শ্রমের মূল্য পায়। জিপিএ গোল্ডেন ফাইভ পায়। কিন্তু বিপত্তি দেখা দেয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিযুদ্ধে অংশ নেয়ার পূর্ব প্রস্তুতির বিষয় নিয়ে। সহপাঠীদের যারা ভালো ফলাফল করেছে তাদের কেউ কেউ ময়মনসিংহ গিয়ে কিংবা যাদের সুযোগ আছে ওরা ঢাকায় গিয়ে নামকরা কোচিং এ ভর্তি হয়। নেত্রকোনা সরকারি মহিলা কলেজ থেকে যে কজন ভালো ফলাফল করেছে, তাদের মাঝে তানিয়াও একজন। তার সহপাঠীদের কেউ কেউ ময়মনসিংহ গিয়ে, আবার কেউ কেউ বা ঢাকা গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কোচিংয়ে ভর্তি হয়ে পড়ালেখা করছে। ওসব কোচিংয়ে পড়ালেখা না করলে নাকি দেশের প্রধান প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিযুদ্ধে সুবিধা করা যাবে না। তানিয়া গ্রামের বাড়ি এসে মা-বাবা এবং বড় ভাইদের এ কথা জানিয়েছে। কিন্তু প্রান্তিক কৃষক পরিবার বলে কথা। বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি

কোচিংয়ে ভর্তি হওয়ার জন্য বারো থেকে পনের হাজার টাকা দরকার। এতটাকা দেয়ার সামর্থ্য সে পরিবারের নেই বলে তাকে সাফ জানিয়ে দেয়া হয়। এ অবস্থায় সে তার মেঝেভাইয়ের কর্মস্থলে গিয়ে দেখা করে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি কোচিংয়ে ভর্তির বিষয়ে আলোচনা করে। কিন্তু জবাবে মেঝেভাই বলে, আমিও তো এখানে প্রায় বিনা বেতনে চাকরি করতছি। এখনো সরকারি অনুদানের অন্তর্ভুক্ত হই নাই। স্কুল থেকে সামান্য বেতন পাই। তা দিয়াই কোনোমতে চলতেছি। এমপিওভুক্ত হবার বিষয়টি এখনো প্রক্রিয়াধীন। এ অবস্থায় এতো টাকা পাও কোথায়। যেহেতু আমাদের সামর্থ্য কুলায় না, তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিও জন্য নিজে নিজেই পেড়াশোনা করি। তারপর চেষ্টা করি কোথায় ভর্তি হওয়া যায়। আমাদের আর্থিক অবস্থা তো তোর অজানা না। বিশেষ করে বড় ভাই মারা যাওয়ার পর আমাদের পারিবারিক অবস্থা তো কেবল খারাপের দিকে... এভাবে তানিয়া সবার কাছ থেকে অনেকটা নিরাশ হয়ে আবার কলেজ হোস্টেলে ফিরে যায়। এ পরিস্থিতিতে কী করবে সে ভেবে পায় না। সহপাঠীদের যারা ভালো ছাত্রী তাদের মাঝে তানিয়া ছাড়া কেউ আর কোচিং করার বাকি নেই। কিন্তু শত সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও তানিয়া অদম্য। কোচিংয়ে ভর্তি হওয়ার সুযোগ খুঁজতে থাকে সে। তার ঘনিষ্ঠ বান্ধবী লায়লা আকতার সুইট ময়মন-সিংহের নাম করা কোচিং 'মেধা বিকাশ' এ ভর্তি হয়েছিল। সেই বান্ধবীর কাছ থেকে সে কোচিংয়ের যাবতীয় খোঁজখবর নেয়। ময়মনসিংহের স্বনামধন্য ভর্তি কোচিং 'মেধা বিকাশ'-এর স্বত্বাধিকারী যে, তার বাড়ি নেত্রকোনা জেলা শহরে। নিজের সঙ্গে অনেক বোঝাপড়া করে সে বেশ একটা সাহসী সিদ্ধান্ত নেয়। তার সহপাঠীদের সবাই ভর্তি কোচিং এ পড়াশোনা করবে, অথচ শুধুমাত্র দারিদ্র্যতার জন্য এ সুযোগ থেকে বঞ্চিত থাকবে, কোনোভাবেই সে তা মানতে রাজি নয়। তার সিদ্ধান্তের কথা কাউকে জানিয়ে গভীর রাতে বসে তার অভিভাবকদের উদ্দেশ্যে একটা চিঠি লিখে সে। তারপর বালিশের নিচে চিঠিটা রেখে কাউকে কিছু না বলে বাসা থেকে বেরিয়ে যায় সে। সকালের গেটলক বাসে চলে যায় ময়মনসিংহে। বাস থেকে নেমে একটা রিকশা নিয়ে যায় সিকে ঘোষ রোড। মেধা বিকাশের সাইনবোর্ড দেখে রিকশা থেকে নামে। দোতলায় বসে এ প্রতিষ্ঠানের মালিক সুমন। তার রুমের দরজার কাছে গিয়ে অনুমতি নিতে গিয়ে বলে, আসতে পারি ভাইয়া। -জি আস। -আমি নেত্রকোনা থেকে আসছি। আপনার সঙ্গে কিছু কথা ছিল আমার। -ঠিক আছে বলো। -জি ভাইয়া, আমার নাম তানিয়া। এবার জিপিএ গোল্ডেন ফাইভ পেয়ে পাশ করছি। -আচ্ছা, বেশ ভালো। -কয়েক মিনিট কথা বলতে চাই, শোনার ধৈর্য হবে আপনার? -হ্যাঁ, বলো... -কলমাকান্দার সীমান্ত এলাকায় আমাদের গ্রামের বাড়ি। আমার বাবা প্রান্তিক চাষি। পাহাড় পাদদেশে

এলাকা বলেই এক ফসলি জমি আমাদের। আমন মৌসুমে একটি মাত্র ফসল হয়। তাও আবার বেশ ঝুঁকিপূর্ণ। পাছাড়া চল কিংবা খরার মতো প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ফসলহানী হয়। আর এ জন্যই আমার পরিবারের আর্থিক অনটনের কারণে আমি কোনো ভর্তি কোচিংয়ে ভর্তি হতে পারিনি।

-তাই...।

-আমি আর একটু সময় নিতে চাই, যতি আপত্তি না থাকে...

-না বলো...

-আমি যখন তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ি তখন গাছ থেকে পড়ে আমার ডানহাত ভেঙে যায়। তারপর গ্রামের কবিরাজের অপচিকিৎসার কবলে পড়ে সে হাতটি আমার খোয়াতে হয়। তখন থেকে একটি সত্য উপলব্ধি করি- পড়ালেখা করে আত্মনির্ভরশীল হওয়া ছাড়া আমার দ্বিতীয় কোনো পথ খোলা নাই। তাই শত সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও আমি পড়ালেখায় এসএসসিতে যেমন ভালো করি, এইচএসিতেও। অথচ শুধু অর্থের অভাবে আমি ভর্তি কোচিংয়ে ভর্তি হতে পারতেছি না। আর সেজন্যই বোধ হয় দেশের সেরা পাবলিক ভার্টিগুলার ভর্তিযুদ্ধে আমাকে বিফল হওয়া লাগবে। এ জন্য দুর্ভাবনায় অস্থির হয়ে একটা ভয়ানক কাণ্ড করে আপনার কাছে আসছি।

-কী কাণ্ড...?

-নেত্রকোণায় তো আমরা তিন ভাইবোন একটা টিনশেড বাসা ভাড়া করে থাকি। গভীর রাতে চুপি চুপি আমার অভিভাবকদের উদ্দেশ্যে একটা চিঠি লিখেছি। চিঠিতে লিখেছি, আমি একটা উদ্দেশ্যে ভোরে এক জায়গায় যাচ্ছি। যদি আমার কাজে সফল না হতে পারি, তাহলে আর ফিরে আসবো না। এই চিঠি রেখে ভোরে কাউকে কিছু না বলে আপনার কাছে চলে আসছি।

প্রতিষ্ঠানের মালিক সুমনের পাশেই বসা ছিল মেয়েটি। তানিয়ার মুখ থেকে সব শুনে সুমনের মনটা মোমের মতো গলে যায়। তাই স্নেহের হাতটা তানিয়ার মাথায় বুলিয়ে দিয়ে বলে, তোর সাহস আছে; পারবি তুই। তাকে এই প্রতিষ্ঠান পড়ার সুযোগ দেবে। তুই আমার ছোটবোনের মতো। এখন বল, নিশ্চয়ই এতক্ষণে উদ্ভিগ্ন হয়ে স্বজনরা তোকে খোঁজখুঁজি করতেছে?

-হয়তো বা।

-তোর কাছে মোবাইল আছে?

-না।

-তোর স্বজনদের কারো মোবাইল ফোন নম্বর আছে?

-একটা নম্বর মুখস্থ আছে। আমার এক মামার...

-নম্বরটা বল, আমি এখনই জানিয়ে দিই।

তানিয়া মুঠোফোন নম্বর দেয়। মালিক সুমন তার মোবাইলফোনের বাটন টিপে ফোন করে। ওপাশ থেকে সাড়া দিলে সুমন তার পরিচয় দিয়ে বলে, আপনাদের তানিয়া আমার কাছেই আছে। আজ এখনি তাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। সে আমার প্রতিষ্ঠানে থেকে অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে কোচিং করবে। তার থাকা-খাওয়া এবং কোচিংয়ের জন্য কোনো টাকা লাগবে না। তার কোচিংয়ের যাবতীয় খরচ এ প্রতিষ্ঠান বহন করবে। আগামীকাল সকালেই তাকে বইপত্র এবং বিছানাপত্র দিয়ে পাঠিয়ে দিবেন, কেমন।

এই বলে সুমন মোবাইল রাখে।

আঠারো।

ব্যর্থ হলে বাড়ি না ফেরার প্রত্যয়ে চিঠি লিখে চলে এসে যে ঝুঁকি নিয়েছিল তানিয়া, তাতে আপাত সফলতা এসেছে। আর সেই আনন্দ নিয়ে বাঁ-হাতি তানিয়া কিছুক্ষণের মাঝেই নেত্রকোণার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। নেত্রকোণার ভাড়াটে বাড়িতে এলে তার ছোট বোন বলে, তুমি এমন একটা কাজ করল! আমরা জানাইয়া গেলেও তো পারত, নাকি।

-জানসই তো আমি একটু একরোখা। মন যা চায়, তাই করে ফেলি। যাক, আগামীকাল তো আবার যাওয়া লাগবে। সকালেই চইলা যামু। অহনতেই প্রত্নতি নিতে থাকি। পরদিন সকালেই তানিয়া বই-খাতা, বিছানাপত্র নিয়ে বাসে চাপে। ন'টার সময়ই কোচিং সেন্টারে গিয়ে উঠে। দেখা করে সুমনের সঙ্গে। সুমন তাকে পাঠিয়ে দেয় ছাত্রীদের আবাসিক হোস্টেলে। তানিয়া নিয়মিত কোচিংয়ের ক্লাসে উপস্থিত হয়। তার দিকে বিশেষভাবে নজর রাখে মালিক নিজে। এমন কি পড়ালেখা কেমন করছে সে খোঁজ করতে গিয়ে সুমন ভাইয়া বলে, তোর কাছে আমাদের একটা ই প্রত্যাশা। আর সেটা হলো ভালোভাবে পড়াশোনা করে ভালো একটা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবি।

যেহেতু বিনা খরছে থাকা-খাওয়া এবং কোচিং করার সুযোগ পেয়েছে, সেহেতু নিজের মঙ্গলের জন্যই সে আদাজল খেয়ে পড়াশোনা করে। যে তানিয়া কোচিং করারই সুযোগ পাচ্ছিল না, সে যখন কোচিং কর্তৃপক্ষের প্রিয় ছাত্রী হয়ে উঠেছে, তখন এলাকার কিছু ছাত্রী তার কাছে যায়। ওই কোচিং সেন্টারে কীভাবে সুযোগ-সুবিধা পেতে পারে, সে ব্যাপারে তানিয়ার সঙ্গে আলোচনা করে পরামর্শ নেয়। পড়াশোনা রেখে অন্য ছাত্রীদের সঙ্গে এতো মাখামাখি কোচিং কর্তৃপক্ষের পছন্দের নয়। তাই এ ব্যাপারে তাকে সতর্ক করে দেয় সুমন ভাইয়া। বলে, তোর কাজ শুধু পড়াশোনা করা। জনসেবার সময় এখন তোর নয়।

তানিয়া তাতে সতর্ক হয়। মনোযোগী হয় শুধু পড়াশোনাতেই। তানিয়া কোচিং করে কলা বিভাগে। কিন্তু একদিন সে খেয়ালের বসে বিজ্ঞান বিভাগের ছেলেমেয়েদের ক্লাসে বসে থাকে। ঢাকা থেকে এক জন মেধাবী শিক্ষক আসেন। তিনি সপ্তাহে দুটি ক্লাস নেন। সেই আফজাল স্যারের ক্লাসে বসে আছে তানিয়া। পড়াচ্ছেন জীববিজ্ঞান। পাঠদান শুরুর আগেই তিনি বলে রাখেন, যে বা যারা আমার আলোচনা বুঝবে না এবং যেখানে বুঝবে না, আমাকে বলবে। আমি আবার বিষয়টা বুঝিয়ে দেব। ক্লাশ শুরু হয়েছে, ওই শিক্ষক বারবার তানিয়ার দিকে তাকিয়ে বলেন বুঝতে পারছো? তানিয়া তো জীববিজ্ঞানের ছাত্রী না। কাজেই তার বোঝার কথা না। কাজেই জবাবে সে বলে, জি না স্যার! পরিক্ষার বুঝতে পারি নাই। জবাবে শিক্ষক বলেন, আমি তো এইটাই প্রত্যাশা করি, যেখানে তোমরা না বুঝবে, সেখানে আওয়াজ তুলবে।

কিন্তু শিক্ষক তো আদৌ জানেন না, তানিয়া ওই বিষয়ের ছাত্রী না। ক্লাস শেষে শিক্ষক চলে যায়

সুমন ভাইয়ার কক্ষে। ওদিকে তানিয়া স্বস্থানে বসেই আবার কলা বিভাগের ক্লাসে করতে থাকে। তখন তাকে বিজ্ঞান বিভাগের সেই আফজাল স্যার স্মরণ করেন। তানিয়াকে খবর দেয়া হয়।

তানিয়া এলে সুমন ভাইয়া বলে, ও তো মাঝে-মাঝে পড়ালেখায় ফাঁকিবাজি করে।

তখন তাকে বাধা দিয়ে আফজাল স্যার বলেন, না ওতো ভালো ছাত্রী। ক্লাসে ভালো পারফরম্যান্স তার।

-ভালো পারফরম্যান্স...

-হ্যাঁ, এই তো একটু আগে আমার ক্লাসে তার প্রমাণ রাখলো তো। ও ভালো করবে।

সুমন ভাইয়া বিষয়টা আঁচ করে আর গুমর ভাঙেনি। তানিয়াকে বিদায় দিয়ে বলে, ঠিক আছে; তুমি যাও।

এ সময়ে আফজাল স্যার তানিয়ার মোবাইল নম্বরটি চেয়ে নেয়। ঠিক তোমার মতোই আমার একটি ছোটবোন আছে। ওকে আমি দাদিমা বলে ডাকি। যদি কিছু মনে না করো তাহলে তোমাকেও আমি দাদিমা বলে ডাকবো, কেমন!

-আচ্ছা স্যার।

-আমাকে তুমি ভাইয়া বলবে, ঠিক আছে!

-জি ভাইয়া।

-ঠিক আছে এখন যাও।

-জি আচ্ছা।

এই বলে তানিয়া আবার তার ক্লাসে চলে যায়।

এরপর মাঝে-মাঝে আফজাল স্যার তাকে মুঠোফোনে ফোন করে তাকে ভালোভাবে পড়াশোনা করার জন্য অনুপ্রেরণা দেয়। তাতে চান্স হয় তানিয়া।

এভাবে কোচিং করে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য প্রত্নতি নেয়। যথারীতি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির আবেদন করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ স্বল্প দূরত্বের সম্ভাব্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ভর্তি পরীক্ষা দেয়। সাহসী মেয়ে তানিয়া। তাই একাকিই সে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে ভর্তি পরীক্ষা দেয়।

নেত্রকোণার আর একজন বান্ধবীও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা দিয়েছিল। মেধা তালিকায় ভালো অবস্থানে থাকে তানিয়া। কিন্তু বান্ধবীটির অবস্থান অপেক্ষমাণ তালিকায়। তবু একেবারেও পেছনের দিকে। তার ভর্তির সম্ভাবনা ক্ষীণ। এ বান্ধবীর বাসা নেত্রকোণা শহরে। ওদের বাসায় দৈনিক পত্রিকা যেমন রাখে, তেমনি আছে ইন্টারনেট সুবিধা। তাই সে বান্ধবীকে বলে রেখেছিল, যদি ভর্তির তারিখ ঘোষণা করা হয়, তাহলে যেনো তাকে জানায়। তানিয়া সেই অপেক্ষায় থাকে। বান্ধবী নিশ্চয়ই ভর্তির তারিখ জানাবে।

কদিন পর সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির পরীক্ষার তারিখ জানায়। তবে মাত্র একদিন বাকি। তানিয়া এ খবর শুনে সেদিনই বিকেলে রওয়ানা দেয়ার জন্য সিদ্ধান্ত নেয়। তখন সকাল এগারোটা। সে তখন আফজাল ভাইয়ার কাছে ফোন করে। এ বিষয়ে খোঁজখবর নেয়। ওপাশ থেকে বলা হয়, সেখানে ভর্তির শেষ তারিখ তো আজ। অর্থাৎ কোনো অবস্থায় এ সময়ে প্রায় চারশ কিলোমিটার অতিক্রম করে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া সম্ভব না। তাই হতাশায় একেবারে ভেঙে পড়ে তানিয়া। এ অবস্থায় সে কী করবে! কী-ই বা করার আছে

তার?

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার জন্য কোনো আবেদনও সে করেনি। শেষে বাধ্য হয়ে তাকে একটি বছর ভর্তির জন্য অপেক্ষা করতে হয়। বিষয়টা সে আফজাল ভাইয়াকে জানায়। ওপাশ থেকে আফজাল তাকে নিরাশ না হতে পরামর্শ দেয়। উনিশ.

গাছ থেকে পড়ে ডান হাত খোয়া যাবার পর থেকে তানিয়া তার পড়ালেখার ব্যাপারে অদম্য। বাস্তবতা উপলব্ধি করে সে বুঝতে পেরেছে, পুরুষ শাসিত এ সমাজে এমনিই তো নারীদের হয়ে করে দেখার প্রবণতা। তার ওপর যদি কোনো মেয়ের অঙ্গহানীর মতো খুঁত থাকে তাহলে তো উপায়ই নেই। তাই অজপাড়া গাঁয়ের মেয়ে হলেও তানিয়া পড়ালেখা করে, উচ্চশিক্ষিত হয়ে সম্মানজনকভাবে নিজের পায়ে দাঁড়াতে চায়। সেই প্রচেষ্টায় বাঁ-হাতি তানিয়া কিছুটা সফলতার স্বাক্ষরও রেখেছে।

এসএসসিতে ফলাফল যেমন আশানুরূপ করেছে, এইচএসসিতেও তেমনি। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পেয়েও সঠিক তথ্য না জানার কারণে সে সুযোগ থেকেও বঞ্চিত হয়। অথচ সহপাঠীদের অনেকেই বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে।

যেহেতু এবার সে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারেনি, সেহেতু একটি বছর তাকে বাড়িতে বসে বসে কাটাতে হবে। এ বছর তো আর তাকে বিনা খরচে কোচিং করার সুযোগ দেবে না। তা হলে কী করবে সে! বাড়ি চলে যাবে, নাকি নেত্রকোনায় ভাইবোনদের সঙ্গে অবস্থান করেই আগামীতে ভর্তির জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকবে।

ময়মনসিংহে হোস্টেলে অবস্থানকালেই তানিয়া জানতে পারে ‘মেধা বিকাশ’ কোচিং পরিচালিত হয় ঢাকা থেকে। তাদের মূল অফিস ঢাকার ফার্মগেটে। নিজের সঙ্গে অনেক বোঝাপড়া করে তানিয়া বেশ সাহসী একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে। আর সে সিদ্ধান্ত অনুযায়ী একদিন ভোর বেলায় নেত্রকোনা থেকে ঢাকার বাসে চোপে বসে। সে কোথায়, কী কাজে যাচ্ছে-এ কথা পরিবারের কাউকে জানায়নি।

সকাল দশটায় সে মহাখালি নামে। জীবনের প্রথম তার এই ঢাকায় আসা। মহাখালি থেকে আবার বাসযোগে ফার্মগেটে যায়। ‘মেধা বিকাশ’ কোচিং খুঁজে পেতে তার বেশি কষ্ট হয়নি। প্রতিষ্ঠানের মূল মালিক তখন অফিসে। বসে দোতলায়। সে মালিকের সঙ্গে দেখা করতে চায় বলে জানায়। প্রতিষ্ঠানের লোকজন মালিকের অনুমতি নিয়ে তানিয়াকে ঢুকতে দেয়। তানিয়া বলে, আমি নেত্রকোনা থেকে এসেছি। তখন তার পাশে আরও দুজন লোক। মালিক তানিয়ার দিকে তাকিয়ে বলে, বলেন, কী বলতে চান!

-আমি একান্তে আপনার সঙ্গে কিছু কথা বলতে চাই।

-ঠিক আছে বসুন।

এই বলে সে পাশের লোকদের বাইরে যেতে অনুরোধ করে। ওরা চলে যায়। তখন তানিয়া বলে, আমি কলমাকান্দা হাওড় এলাকার এক গরিব কৃষক পরিবারের মেয়ে। যখন তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ি, তখন গাছে উঠে নিচে পড়ে যাই। ওই দুর্ঘটনায় আমার ডানহাত খোয়াতে হয়। মেয়ে

হয়ে জন্ম নিছি বলে দিনে দিনে বুঝতে পারি, আমার এই অপূরণীয় ক্ষতি লেখাপড়া ছাড়া পূরণের আর অন্যকোনো পথ নাই। তাই প্রথমে বাঁ-হাতে লিখতে শিখি। তারপর শত সীমাবদ্ধতার মাঝেও আমি পড়ালেখায় নিজের যোগ্যতার স্বাক্ষর রাখি। গত ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় আমি গোল্ডেন ফাইভ পাই। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আর্থিক দৈন্যতার কারণে আমি কোচিংয়ে পড়তে পারতেছি না স্যার! আপনি তো মেধা কোচিংয়ের মালিক, এ জন্যই আপনার কাছে আসা। আমি আমার বাড়ির কাউকে কিছু না বলেই ঢাকায় আপনার কাছে আসছি। একটা প্রশ্ন, আমার মতো গারীবরা কী আপনার প্রতিষ্ঠানে ভর্তি কোচিংয়ে পড়াশোনা করার সুযোগ পাবে না? তানিয়ার আবেগপ্রণী কথামালার সব শুনেন মালিক ফয়সাল অবাক না হয়ে পারে না। মনে মনে বলে, পাড়াগাঁয়ের যে মেয়ে একটি হাত খোয়ানোর পরও দারিদ্রকে জয় করে পড়াশোনায় মেধার স্বাক্ষর রেখেছে, তার এমন আবেদন তো উপেক্ষিত হতে পারে না। এভাবে ফয়সালের মাঝে মানবতাবোধ জেগে ওঠে। তিনি বলেন, জানই তো, আমাদের এটা একটা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান। আমি না হয়, বিনা পরীক্ষায় তোমাকে পড়ার সুযোগ দিলাম, কিন্তু তোমার থাকা-খাওয়া...! ঢাকায় কি তোমার...?

-না, স্যার। আমার পরিচিত কেউ নেই।

-ঠিক আছে, এই প্রতিষ্ঠানের খরচেই থাকতে পারবে তুমি। আর একটি মেয়ের কক্ষে তোমার থাকার ব্যবস্থা করে দিব। তুমি বরং বিছানাপত্র নিয়ে আগামীকালই আসতে পারো। আমাদের এ প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধানে মেয়েদের একটি মেস আছে। ওই মেসে তাছমি নামে একটি মেয়ে থাকে। আমাদের এখানে ভর্তি হয়ে কোচিং করে আর একটা চাকরিও নাকি সে করে। তার সঙ্গে থাকবে তুমি, কেমন...!

-জি স্যার। তাহলে আজ আসি।

এই বলে তানিয়া বিদায় নেয়। মালিক ফয়সাল ভাবে, তানিয়াকে এ সুযোগ দেয়া যেমন একটি মানবিক কাজ, তেমনি এ ঘটনায় তার প্রতিষ্ঠানের সুনাম বয়ে আনবে। বিষয়টা তারা তাদের সব প্রতিষ্ঠানে প্রচারও করবে।

তানিয়া দুপুরের বাসে নেত্রকোনায় ফিরে যায়। পরিবারের লোকজনের কাছে পরদিন দুপুরেই সে ফার্মগেটের সেই মহিলা মেসে ওঠে। তৃতীয় দিন থেকে সে কোচিং করতে থাকে। মেসে থাকা-খাওয়ার যাবতীয় খরচ ওই প্রতিষ্ঠান বহন করার কথা। তানিয়া কোচিং করে সারাক্ষণ পড়াশোনায় ব্যস্ত থাকে। কিন্তু রুমমেট তাছমি সারাদিন ঘুমায়। রাতে কোথায় যেনো চলে যায়। পরদিন ভোরে যখন তাছমি আসে তখন তানিয়া জিজ্ঞেস করে, রাতে কোথায় থাকেন?

-রাতেই তো আমার চাকরি। এই জন্য দিনে ঘুমাই, আর রাতে ডিউটি করি। এতো ব্যস্ত থাকি, ঠিকমতে লেখাপড়া করার সময়ও পাই না।

বলেই তাছমি বিছানার আশ্রয় নেয়। দুপুর পর্যন্ত ঘুমায়। তানিয়া তো চলে যায় কোচিংয়ে। তাই বাকি সময় কিভাবে কাটায় তানিয়া সেদিকে খেয়াল করতে পারে না। সপ্তাহে তো কোচিং হয় মাত্র তিনদিন। শুক্রবার তানিয়া চলে আসে বাড়িতে। তবে বাকি তিনদিন নাকি তাছমি কোচিং করে। কিন্তু দুপুর পর্যন্ত ঘুমিয়ে সে কি বিকেলে

কোচিং করে? তানিয়ার মনে প্রশ্ন জাগে। অথচ সন্ধ্যা হলেই সে সেজেগুঁজে বেরিয়ে যায়। এভাবে তানিয়ার কেটে যায় প্রায় একমাস। আর এই একমাস সময়ে তানিয়া বুঝতে পারে, তাছমি পড়ালেখায় মোটেই মনোযোগী নয়। সে মনোযোগী অন্যকিছুতে। কিন্তু কীসে? রহস্য দানা বাঁধে তানিয়ার মনে। রাতে কী ডিউটি করে তাছমি? এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে বেশ আগ্রহী হয় তানিয়া। পড়ালেখায় অমনোযোগী একজন রুমমেটকে কখনো সে আশা করেনি। অথচ অনিচ্ছা সত্ত্বেও তার সঙ্গেই থাকতে হচ্ছে। তবে তাছমির রাতের ডিউটি সম্পর্কে তানিয়ার জানার আগ্রহ বেশ। কারণ আচার-আচরণে তাছমি বেশ রহস্যঘেরা। আর সে সুযোগটা তানিয়া পরদিন ভোর বেলায়ই পেয়ে যায়। তাছমি ভোর বেলায় এসে রুমমেটের ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। তাছমি পড়ালেখায় ব্যস্ত। কড়ানোড়ার শব্দ শুনাই সে দরজা খুলে দেয়। তাছমি ভিড়িভিড়ি ঘরে ঢুকে তার অগোছালো ব্যাগটা বিছানায় রেখেই টয়লেটে ঢুকে যায়। আর তখনই তাছমির ব্যাগের ভিতরে ভালোভাবে তাকিয়ে তানিয়া নিশ্চিত আবিষ্কার করে ফেলে। ব্যাগের যাবতীয় উপকরণ একজন কলগার্লের। আর তাছমিকে এমন ভেবেই সন্দেহ করে আসছিল তানিয়া। এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তানিয়ার ভিতর জগতে যেনো কেমন ভাঙুর শুরু হয়। নিজেকে সামলে নিতে ধপ করে সে নিজের বিছানায় বসে যায়। মনে মনে বলে, এতদিন তাহলে আমি একজন কলগার্লের সঙ্গে ছিলাম। শতধিকার যেনো ভেতর দিকটা ফেটে পড়তে চায়। চলে প্রবল মানসিক প্রতিক্রিয়া।

ততক্ষণে তার মাঝে পুরনো সেই মনোব্যথাটি মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। নবম শ্রেণিতে পাঠরত অবস্থায় বয়ঃসন্ধিকালে যখন তার শারীরিক পরিবর্তন আসতে শুরু করে, তখন দেখা দিয়েছিল মানসিক সঙ্কট। তখন মানসিক ডাক্তারের কাছে চিকিৎসা নিয়ে তবে স্বাভাবিক হয়েছিল। সেই সঙ্কটটি আবার চড়াও হয়। সঙ্গে তার দেহভাষায় আসে পরিবর্তন। চোখে-মুখে ফুটে উঠে তার সুস্পষ্ট অভিযুক্তি। কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকে তানিয়া। তার এ অবস্থা দেখে তাছমি বলে, কী ব্যাপার, কী হইছে তোমার?

তানিয়া জবাবে কোনো কথা বলে না। তাতে তাছমি ভ্রূক্ষণ করে না। অনিদ্রায় কেটেছে তার রাতের প্রহর। তাই সে বরং বিছানার আশ্রয়ে গিয়ে ঘুমিয়ে যায়। কিন্তু তানিয়া কোনোভাবে স্বাভাবিক হতে পারে না। উন্মত্ত উন্মাদের মতোই সে বেরিয়ে পড়ে মেস থেকে। নামে রাস্তায়। ফার্মগেট থেকে প্রধান রাস্তায় হেঁটে চলে তানিয়া। ছুটে চলা যান বাহনের প্রতি তার ভ্রূক্ষণ নেই। সে এগিয়ে চলে অজানার উদ্দেশ্যে। হাটতে হাটতে সে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় পেরিয়ে এগিয়ে যেতে থাকে মহাখালীর দিকে। ব্যস্ত রাস্তায় গাড়িগুলো তাকে দেখে বরং পাশ কেটে যায়। রাস্তায় ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় মেয়েটিকে এভাবে চলতে দেখে একজন শ্রৌত তার পিছু নেয়। মেয়েটি যেনো গাড়িচাপা না পড়ে সেভাবে কাছাকাছি থেকে তাকে আগলে রাখতে সচেষ্ট হয়। গাড়ি ছুটে এলেই লোকটি তাকিয়াকে বলে, ম্যাডাম, সাবধানে হাঁটেন, গাড়ির নিচে পড়বেন তো! তানিয়া তাকে লক্ষ্য করে। কিন্তু

লোকটাকে ঢাকা শহরের নোংরা মানুষ বলে সন্দেহ হয়। তাই উন্মাদের মতো হলেও যতটুকু বোধ আছে তা থেকে সে কিছুটা সতর্ক। তানিয়া হাঁটতে হাঁটতে যখন উড়াল সেতুর মুখোমুখি, তখন একটি চলন্ত বাসের কবল থেকে বাচানোর জন্য যখন লোকটি তানিয়াকে টান দিয়ে ডানদিকে সরিয়ে আনে, ঠিক তখনি তানিয়ার সচল বাঁ-হাতে লোকটিকে সজোরে ধাক্কা দেয়ার জন্য উদ্যত হয়। তখন লোকটি সে হাত ধরে ফেলে বলে, মারে! আমি কোনো খারাপ প্রকৃতির মানুষ না। আমার ঘরে স্ত্রী আছে, আছে তোর মতো মেয়েও। তবে আমার মেয়েটা প্রতিবন্ধী। তাইতো মানসিক রোগাক্রান্ত মনে করে তোর পিছনে পিছনে আসতেছি। এভাবে হাঁটলে তো তুই মারা পড়বি। কী তোর কষ্ট, আমাকে বল মা! আমি তোর বাবার মতো। আর তোর মতো সন্তানের বাবা হয়ে তো আমি তোকে আত্মঘাতী হতে দিতে পারি না। লোকটির কথায় তানিয়ার সংবীং ফিরে পায়। লোকটি তানিয়াকে বলে, কই যাবি তুই মা, কোথেকে আসছস, থাকস কোথায়? এতগুলো প্রশ্নের জবাবে তানিয়া প্রথমত বলে, ফার্মগেটে থাকি।

তারপর সব শোনার পর লোকটি তানিয়াকে বাড়ি যাবার পরামর্শ দেয়। তানিয়াও মেস থেকে সবকিছু নিয়ে রাতের ট্রেনেই বাড়ি ফেরার কথা বলে। ওই নষ্টা মেয়ের সঙ্গে আর এক মুহূর্তও না। লোকটি তানিয়াকে ফার্মগেটের বাসে তুলে দেয়। মেসে ফিরে স্বল্প সময়ে সব কিছু গুটিয়ে নেয় তানিয়া। বাড়িতে জরুরি দরকারের কথা বলে কোচিং সেন্টারে ম্যানেজারের কাছে বলে বিদায় নেয় সে। একটি ডাক ঠিকানা ম্যানেজারকে দিয়ে বলে, যদি ফিরতে দেরি হয়, তাহলে কোচিংয়ে স্যারদের দেয়া শিটগুলো আমার এই ঠিকানায় পাঠিয়ে দিবেন প্লিজ। সময় সময় ডাক খরচের টাকা মোবাইলে পাঠিয়ে দিব। আর মোবাইল ফোনে আপনার সঙ্গে আমার যোগাযোগ থাকবে। তারপর একটা রিকশা ডেকে কমলাপুর স্টেশনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয় তানিয়া। হাওড় এল্লপ্রেসে ভোর বেলায় সে নেত্রকোনা এসে পৌছে।

বিশ.
নেত্রকোনা অবস্থানরত তিন ভাইবোন ঈদের ছুটিতে বাড়ি যায়। এই ছুটিতে বাড়ি আসে তানিয়ার চাচাত ভাই আরিফুলও। ইন্টারমিডিয়েটে ভর্তি হলেও পড়াশোনায় মনোযোগী হতে পারেনি সে। শেষে পরীক্ষায়ও আর ভালো করতে পারেনি। তারপর চলে যায় ঢাকায়। একটি বস্ত্রকারখানায় চাকরি করে সে। আরিফ এবং তাদের পরিবার বুঝতে পেরেছে, তানিয়ার একটি হাত না থাকলেও তার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। এসএসসি এবং এইচএসসি দুটিতেই ভালো ফলাফল তার। ভর্তি হতে পারবে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে। এ ছড়াও প্রতিবন্ধী হিসেবে নানা প্রতিষ্ঠান থেকে নিয়মিত পাচ্ছে ভাতা। উচ্চশিক্ষা নেয়ার পর প্রতিবন্ধী কোটায় অনায়াসে হবে তার চাকরি। আর সেই বাস্তবতা বুঝেই আরিফ এবং তার পরিবারের সিদ্ধান্ত তানিয়াকে তাদের গৃহবধু করে ঘরে তুলবে। অথচ এই তানিয়াকে একদিন নোলা বলে অবজ্ঞা করতো আরিফের মা-বাবা। সেই তানিয়াই কিনা তাদের বংশে এখন আলো ছড়াচ্ছে। আরিফের মনোভাব

সম্পর্কে তার মামা-বাবা অবগত থাকলেও সে ব্যাপারে তানিয়াদের পরিবার কিছুই জানে না। সে লক্ষ্যেই ঈদের ছুটিতে বাড়ি এসে আরিফুল কেবল তানিয়ার চারপাশে ঘুর ঘুর করে। তানিয়া যেখানে থাকে কেবল তার কাছে গিয়ে বসে থাকে। তার এমন প্রবণতার কারণ বিশ্লেষণ করে তানিয়া। নিজের সঙ্গেই বোঝাপড়া করে আঁচ করে নেয়। যতই তার চারপাশে ঘুর ঘুর করুক, তানিয়া তাকে বড় ভাইয়ের অধিক কোনো প্রকার পাত্তা দেয় না। আরিফুল প্রথম প্রথম বিফল হয়েও আশাহত হয় না। যেকোনো অজুহাতে তানিয়ার কাছাকাছি যেতে চায়। রমজানের ঈদের ছুটি শেষ হলেও আড়াই মাস পরে ঈদুল আজহার ছুটির অপেক্ষায় থাকে আরিফুল। এদিকে তানিয়াদের গ্রামের বাড়িতেও তাদের পরিবারের সঙ্গে আরিফুলের পরিবার সুসম্পর্ক গড়ার প্রয়াস চালায়। ঈদুল আজহার ছুটিতে তানিারা বাড়ি এলে এবারও আরিফুলের প্রয়াস বেড়ে যায়। কখনো তা একটু বাড়াবাড়ির পর্যায়েও চলে যায়। এই উটকো ঝামেলা এড়ানোর জন্য তানিয়া কখনো কৌশলের আশ্রয় নেয়। বিষয়টা তানিয়ার মায়ের দৃষ্টিজালেও ধরা পড়ে। আর তখন নিচু স্বরে তানিয়ার সামনেই বলে ফেলে, এক সময় না আমার লোলা ছেড়ির নিন্দা করত। আর অহন হেই লোলা ছেড়ির পিছনে ঘুর ঘুর করো কের লাগি, আমি কি কিছুই বুঝি না মনে করছ। তানিয়া, তুই কিন্তু নিজের সম্পর্কে সজাগ থাকিস। হেরার ছলাকলায় গইল্লা গিয়া নিজের পায়ে আবার কুড়াল মারিস না।

-আমি যে কিছুই বুঝি না- এমন তো না মা। আমার বিষয়ে আমি যথেষ্ট সজাগ। আর আমাদের নিয়া তোমরা কোনো দুঃশিক্ষা কইরো না। শেষ পর্যন্ত মা-মেয়ের মাঝেই বিষয়টা সীমাবদ্ধ থাকেনি। আরিফুলের বাড়াবাড়িতে তানিয়াদের পরিবারের অনেকেই বিষয়টি বুঝতে পারে। এভাবে তাদের প্রয়াস বিফল হলে, একদিন আরিফুলের মা আসে তানিয়ার মায়ের কাছে। সরাসরি প্রস্তাবও দেয়। জবাবে তানিয়ার মা বলে, আমার তানিয়ার তো অহনও পড়ালেহাই শেষ অইছে না। এই তো সামনে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা দিব। তার বাপের ইচ্ছা তানিয়া এমএ পাস করলে পরে বিয়ার চিন্তা করব।

-বিয়ার পরেও তো পড়ালেহা করতে পারব। আরিফুলের মায়ের এ কথার জবাবে তানিয়ার মা বলে, অন্য জায়গায় তোমরার আরিফুলেরে বিয়া করাইতে মেয়ের কি অভাব পড়ছে, তানিয়া তো আমার লোলা ছেড়ি। হেরে লইয়া টানটানি করবার চাও করে! তানিয়ার মায়ের কথায় এক ধরনের খোঁচার আঁচ পেয়ে আরিফুলের মা আর টিকতে পারেনি। হতাশ মনে বাড়ি চলে যায়। তারপরও অনেকদিন তাদের এমন প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে। শেষে তানিয়ার মা একদিন মুখ খুলে বলেই ফেলে, দেখো আরিফুলের মা। আমার মেয়ে পড়ালেহা শেষ না করা পর্যন্ত বিয়ার কথা চিন্তা করত না তার বাপে। আর যদি তানিয়া এমএ পাস করে তাহলে তো তার মতো শিক্ষিত ছেলেই খোঁজা অইব, না কি! তোমার আরিফুলের মতো কম শিক্ষিত ছেলে কি তখন বিবেচনা করা অইব। তোমরা বরং অন্য জায়গায় আরিফুলের বিয়ার কইন্যা খোঁজ।

তানিয়ার মায়ের এমন চাঁছাছোলা কথা শোনার পর কোনোদিন আর ওরা সেসব কথা বলেনি কিংবা এমন চেষ্টাও করেনি। বরং কিছুদিনের মাঝেই বস্ত্রশিল্পে চাকরি করে এমন একটি মেয়ের সঙ্গে আরিফুল বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়।

একুশ.
মাঝে মাঝেই তানিয়ার মনোব্যাপি তাকে অধিকার করে বসে। সে অসুখ সেরে উঠতে একটু সময় লাগে। আর এভাবে মানসিকভাবে অসুস্থ হয়েই তানিয়া তখন তাদের গ্রামের বাড়িতে অবস্থান করছে। আফজাল স্যার সেদিন ভোরে হঠাৎ ফোন করে বলে, তানিয়া! তুমি না কবি নজরুল ভার্টিসিটিতে ভর্তির জন্য আবেদন করেছিলে।

-জি ভাইয়া।

-আমি জানি এখন তুমি মানসিকভাবে অসুস্থ। তবু তোমাকে ফোন করার দায় অনুভব করলাম। ভোরে নেটে ঢুকে প্রতিকায় দেখি, আজ নজরুল ভার্টিসিটিতে ভর্তি পরীক্ষা।

-তাই নাকি?

-ক্যান, তুমি জানো না।

-না ভাইয়া।

-তাহলে কী করবে?

-ভাইয়া, আমি পরীক্ষা দিব।

-কিন্তু কিভাবে? ত্রিশাল থেকে তোমাদের গ্রামের বাড়ি তো প্রায় একশ কিলো দূরে। তাহলে...

-তবু ভাইয়া চেষ্টা করে দেখি। এখন তো মাত্র সকাল সাড়ে ছয়টা বাজে।

বলেই তানিয়া মোবাইল রাখে। আর তড়িঘড়ি মায়ের কাছে গিয়ে বলে, মা আমার সর্বনাশ হয়ে যাবার আর বাকি নাই...!

-সর্বনাশ মানে...?

-আজকে সকাল দশটায় নজরুল ভার্টিসিটিতে ভর্তি পরীক্ষা। আমি এখনই রওয়ানা হইতেছি।

-কার লগে যাবি?

-আমি একাই যাইতে পারমু মা।

বলেই তানিয়া প্রস্তুতি নিতে শুরু করে। দশ মিনিটের মাঝে প্রস্তুতি নিয়ে সে দেয় দৌড়। একদৌড়ে এক কিলো পথ গিয়ে গোবিন্দপুর বাজারে পৌছে। তখন পাঁচ মিনিট কম সাতটা বাজে। গোবিন্দপুর বাজারে গিয়ে ভাড়ায় চালিত কোনো মোটরবাইক পায়নি। এত সকালে কোনো যান বাহন গ্রামের বাজারে আসেনি। কী করবে তখন সে। না সে হতাশ হয় না। সে সিদ্ধান্ত নেয়, আরও তিন কিলো দূরে বাউশাম বাজারে যাবে দৌড়ে। সেখানে নিশ্চয়ই কোনো না কোনো যান বাহনে কলমাকান্দায় যাবে। সেখান থেকে সরাসরি ময়মনসিংহে মোটরবাইক ভাড়া করবে। আর সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আবার ভোরে গ্রামের রাস্তায় দেয় দৌড়। দৌড়ে বিরামহীন ছুটে থাকে তানিয়া। প্রাণপণে দৌড়াতে দৌড়াতে শরীর ঘেমে ভিজে যায়। তবু বিরাম নেই। যে করেই হোক ভার্টিসিটি ভর্তি পরীক্ষায় তার অংশ নিতেই হবে। বাড়ি থেকে সব মিলিয়ে প্রায় এক ঘণ্টা দৌড়ে সে বাউশাম বাজারে পৌছায়। এ গ্রামের বাজারে তখন ভাড়ায় ছালিত একটি মোটরবাইক ছিল। বাইকচালককে তানিয়া বলে, আমাকে দশটার আগে ত্রিশাল কবি কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌছাতে হবে। যত টাকা লাগে নিনে। দক্ষ বাইকচালক আবদুল আজিজ। তানিয়াকে নিয়ে রওনা হয় আজিজ তীর

বেগে ছুটে চলে মোটরবাইক। লক্ষ অনেক দূর। যে করেই হোক নিরাপদে তানিয়াকে পৌঁছাতে হবে ত্রিশালে। কিন্তু আর একটি সমস্যা তখন মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। তানিয়ার এসএসসি এবং এইএসসি পরীক্ষার মূল সনদ তখন আফজাল ভাইয়ের কোচিং সেন্টারে। মোটরবাইকে বসেই তানিয়া সুমন ভাইয়াকে ফোন করে। বলে তার ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে সফটের কথা। সুমন ভাই তখন কী করবে, অন্য কাউকে পাঠাবে সার্টিফিকেট দিয়ে। কিন্তু মূল সার্টিফিকেট বলে কথা। এমন নির্ভরযোগ্য তখন তার প্রতিষ্ঠানে কেউ ছিলও না। কী আর করা। শেষ পর্যন্ত আফজাল ভাইয়া নিজেই তানিয়ার সার্টিফিকেট নিয়ে রওয়ানা হয়। জন ও যান মুক্ত গ্রামের ফাঁকা রাস্তা। ক্ষীপ্র গতিতে ছুটে চলে বাইক। যেনো বাতাসে ভেসে বিমানের মতো ছুটে যায়। তবুও নেত্রকোনা শহর পর্যন্ত পৌঁছতে তাদের এক ঘণ্টা লেগে যায়। সেখান থেকে ময়মনসিংহের পথে অবিরাম ছুটে চলে বাইক। এক ঘণ্টায় এসে পৌঁছে ময়মনসিংহ ব্রিজ। সেখান থেকে মহাসড়কে যান বাহনের আধিক্যে সতর্কতার সঙ্গে চালাতে হয় বাইক। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় পৌঁছতে পৌঁছতে পৌনে এগারোটা বেজে যায়। এগারোটায় হবে ইংরেজির ভর্তি পরীক্ষা।

ইংরেজি পরীক্ষা আরম্ভ হওয়ার মাত্র দশ মিনিট আগে ওরা গেটে গিয়ে পৌঁছে। ওখানে সার্টিফিকেট নিয়ে অপেক্ষায় ছিলেন আফজাল ভাইয়া। যদিও তানিয়ার একান্ত ইচ্ছে ছিল বাংলায় পড়বে। কিন্তু সকাল দশটা থেকে শুরু হয়ে বাংলা বিভাগের ভর্তি পরীক্ষা ততক্ষণে শেষ হয়ে যায়। পরীক্ষা দিয়ে তখন পরীক্ষার্থীরা বের হচ্ছে। তানিয়া শেষ পর্যন্ত ইংলিশে ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নেয়। অপেক্ষায় থাকে বাইক। একেবারেই হালকা নাগা করে ঢুকছিল পরীক্ষার হলে। মানসিক অসুস্থতা নিয়ে কি পড়ালেখা করা যায়। কোনো পরীক্ষায় অংশ নেয়ার জন্য পূর্ণ প্রতৃতি থাকাও তো প্রয়োজন। তেমন প্রতৃতি ছাড়াই তানিয়া চরম ঝুঁকি নিয়ে পরীক্ষা দিতে এসেছে। হলে ঢুকে সাধ্যমতো পরীক্ষা দিয়েছে। তারপর ফের একই বাইকে বাড়ি ফিরে যায় সে।

কদিন পর ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশ হয়। ইংলিশে অপেক্ষমাণ তালিকার প্রথম দিকে তানিয়ার অবস্থান। সবাই বলে ভর্তি হতে পারবে সে। শেষ পক্ষ তানিয়া ইংলিশে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়। বাইশ।

কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংলিশে ভর্তি হবার জন্য তানিয়া যার কাছে সবচেয়ে খণী, তিনি হলেন আফজাল ভাইয়া। ভর্তি হয়েই সে আফজাল ভাইয়াকে ফোন করে তার কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলে, ভাইয়া! আমার এই ভর্তির যে সাফল্য তার সম্পূর্ণ কৃতিত্ব কিন্তু আপনার। এ জন্য আমি আপনার কাছে চিরঋণী হয়ে গেলাম।

-না-না, খণী হবার কি আছে। আমি জানতাম, তুমি অসুস্থজনিত কারণে বাড়িতে অবস্থান করছ। যে অজপাড়াগাঁয়ে তোমাদের বাড়ি, সেখানে অবস্থান করে সব খবরাখবর রাখা তোমার সম্ভব না। এ জন্যই বিষয়টা আমার চোখে পড়লো, আর সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে জানালাম।

-ভাইয়া ঠিক ওই মুহূর্তে আপনি না জানাইলে আমার হয়তো এ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ

হতো না। যাক, এজন্য আবারও আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা।

পরদিন ভোরে তানিয়াকে আবার ফোন করে আফজাল। কিন্তু ফোন করার আগে বিশ টাকার ব্যালেন্স তানিয়ার ফোনে পাঠিয়ে নেয়। জবাবে তানিয়া বলে, ভাইয়া! আমার ফোনে টাকা পাঠালেন কেনো...

-তুমি এখনো ছাত্রী। আমিও অবশ্য এখনো চাকরি নেইনি। ছাত্রজীবন শেষে হয়েছে কেবল। বিসিএস দিচ্ছি। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে চাকরি হইছিল। যোগদান করিনি। আরও ভালো ক্যাডারে চাকরি চাই। এ জন্যই একের পর এক পরীক্ষা দিয়ে যাচ্ছি। এসবের পরও আমার উপার্জন আছে। তোমার নেই। এ জন্যই সামান্য ব্যালেন্স পাঠালাম। এ নিয়ে তোমার কোনো চিন্তার দরকার নেই। তুমি পড়াশোনা করে যাও।

এভাবে প্রায় প্রতিদিন সকালে আফজাল ভাইয়ার সঙ্গে কথা হয় তানিয়ার। আর তিনি ফোন করার আগে কিছু না কিছু ব্যালেন্স পাঠাবেনই। এই যে এত কথা হয়, কিন্তু আফজাল ভাইয়া দীর্ঘ সময়ের কথামালায় কখনো সীমালঙ্ঘন করেন না। কখনো কোনো প্রশ্ন নিবেদনও করেন না। কিংবা কোনো অশালীন কথাও বলেন না। এভাবে দীর্ঘদিনের আলাপে তানিয়া যেনো এক ধরনের প্রশ্নও পায়। মনের অজান্তে কখনো স্বপ্ন দেখে। আবার কখনো সেই স্বপ্নের ইতি টেনে বেশ আত্মসচেতন হয়ে উঠে সে। কারণ, আলাপে আলাপে তানিয়া জানতে পারে আফজাল ভাইয়ার বাড়ি টাঙ্গাইল শহরে। তার মা-বাবা সমাজে প্রতিষ্ঠিত। আফজাল ভাইয়া

পড়াশোনা করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। তার যে মেধা, নিশ্চিত একটা ভালো ক্যাডারে চাকরি পাবেন। শিক্ষা-দীক্ষায়, প্রভাব-প্রতিপত্তিতে তাদের যে উচ্চতা সে তুলনায় সে তো অঙ্গহীন। তার ওপর তার পরিবার একেবারে বারমর্দ। আর সেই পরিবারের এমন একজন মানুষকে নিয়ে অন্তত তানিয়ার অন্যকিছু ভাবা অশোভন। বরং আফজাল ভাইয়াকে শিক্ষকের যে মর্যাদায় স্থান দিয়েছে, সে আসনেই রাখে সে। আফজাল ভাইয়াও প্রতিদিন একবার সকালে ফোন করে যাবতীয় খোঁজখবর নেয়। বিশেষত তার একটি হাত না থাকায় কোনো রকম সমস্যা হচ্ছে কিনা, এ বিষয়ে নানা কৌশলে সব জেনে নেন। আর প্রতিদিনই সাহস জোগান যেনো বাঁ-হাতি তানিয়া আর্থিক টানাপড়েন আর শারীরিক প্রতিবন্ধীতার কারণে কোনো সময়ে হতাশ হয়ে না পড়ে। তানিয়ারও ধীরে ধীরে এমন অভ্যাস হয়ে যায়, সকালে যদি আফজাল ভাইয়ার ফোন না পায়; তাহলে কেমন যেনো উতলা হয়ে উঠে। কোনো কিছু ভালো লাগে না। এ রকম হলে তানিয়া নিজেই কখনো আফজালকে ফোন করে। জবাবে ওপাশ থেকে তানিয়ার ফোন কেটে সঙ্গে সঙ্গে আফজালই আবার ফোন করে। তানিয়া কি এভাবে দিন দিন আফজাল ভাইয়ার প্রতি দুর্বল হয়ে যাচ্ছে? উঠতি বয়সের একজন তরুণী হিসেবে আর একজন সুযোগ্য তরুণের প্রতি তো নিজের অজান্তেও দুর্বল হতে পারে। এটা ই তো স্বাভাবিক। কিন্তু এখনো বারবার বিবেচনা এসে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তানিয়া ভাবে, কোনোভাবেই তো আফজাল স্যারের যোগ্য পাত্রী সে হতে পারে না। মেধায় যেমন অসাধারণ, সামাজিকভাবেও তার

পরিবার সুপ্রতিষ্ঠিত। তুলনায় তানিয়া অজপাড়াগাঁয়ের একজন প্রান্তিক চাষির মেয়ে। তার ওপর দান হাত খোয়া যাওয়া এক শারীরিক প্রতিবন্ধী সে। এ অবস্থায় আফজালকে নিয়ে স্বপ্ন দেখা, বামন হয়ে চাঁদের দিকে হাত বাড়ানোর শামিল বই আর কিছু না। তাই এ ব্যাপারে তানিয়া আত্মশাসনে নিজেকে সব সময় নিজের ভিতর গুটিয়ে রাখে। আফজাল ভাইয়াকে নিয়ে নিজের দুর্বলতার কথা সে ছাড়া আর কেউ জানে না। তার মনোভাব কারো কাছে ব্যক্ত না করলে হয়তো বা সে খবর পৃথিবীর আর কেউ জানতেও পারতো না। কিন্তু আজব ব্যাপার হলো, এ খবরটি হয়তো বা আফজাল জেনে গেছে। আর তাই তো তিনি তানিয়ার এক ঘনিষ্ঠ বান্ধবীর মাধ্যমে প্রস্তাবটা দেন। একই কোচিংয়ে বিজ্ঞান বিভাগে স্যারের ক্লাস করতে লাগলো। হোস্টেলে পাশের কক্ষে থাকতে সে। কম্পিউটার সায়েন্সে একই ভার্শিটিতে ভর্তি হয়েছে। সেই লাগলো আকতারের মাধ্যমে দেয়া প্রস্তাবে বলা হয়, আফজাল তানিয়াকে পছন্দ করে। আর তাই তানিয়া রাজি থাকলে বিয়ের প্রস্তাব পাঠাবে।

প্রস্তাবটি শুনে তানিয়া যেনো খানিকক্ষণ একটা ঘোরে ডুবে থাকে। কিছুক্ষণ পর ভাবলেশহীন স্বরে বলে, করণা...?

-যদি তোর প্রতি তার করণাই হবে, তোকে নান-ভাবে সাহায্য করতেন। তাহলে কি বিয়ের প্রস্তাবের দিতেন?

-স্বীকার করি, আমার মতো একজন শারীরিক প্রতিবন্ধীর কাছে আফজাল ভাইয়ার প্রস্তাবের মানে..., আমি একজন সৌভাগ্যবতী। তাহলে তুই-ই বল এমন প্রস্তাবে আমার কী করা উচিত! জবাবে লাগলো কোনো কোনো কথা বলে না।

তানিয়াই তখন নির্বিকার চিত্রে বলে, আমার ধারণা ছিল, ভাইয়া এমন কোনো একটা পাগলামু করতে পারেন। আর তার মোকাবিলা করার জন্য বেশকিছুদিন নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করে সিদ্ধান্ত নিয়ে রাখছি।

-কী সিদ্ধান্ত?

-দেখ লাগলো, পূর্ণিমার চাঁদকে কে না ভালোবাসে। কিন্তু দূর থেকেই সেই চাঁদ ভালো লাগে। মর্তের পৃথিবীর কেউ যদি সেটা হাতের নাগালে পাওয়ার মতো উচ্চাভিলাষী হয়, তাহলে সেটা হবে ভুল এবং বোকামু।

-মানে।

-আফজাল ভাইয়ার যোগ্য আমি কোনোভাবেই নই। তার প্রস্তাবে যদি আমি রাজি হই, একটা হাত নাই বলে প্রথমে তার পরিবারের সদস্যরা মেনে নেবেন না। আর তিনি ভালো একটা চাকরি পাবেন। উত্তরোত্তর তিনি উপরের সিঁড়ি মাড়াবেন, এও সত্য। তবে এক সময়ে তার কিন্তু মোহ কেটে যাবে। তখন আমি হয়তো চরম অবহেলিত হবো। যা আমার জীবনটাকে দুর্বিসহ করে তুলতে পারে। -এমনটি তো নাও হতে পারে। তুই যা ভেবেছিস, তার উল্টোও তো হতে পারে।

-বাস্তব বড় কঠিনের লাগলো। তবে সত্যি কথা বলতে কি, ভাইয়াকে আমিও পছন্দ করি। এ জন্য আজীবন তার শুভ কামনা করে যাব। কাছে পাওয়ার পর বিড়ম্বনার চেয়ে, দূরে থাকুন তিনি। ত্যাগের মহিমায় এই ভালো লাগা আজীবন উজ্জ্বল

থেকে উজ্জ্বলতর হোক-তেমনি আমার আপাতত ইচ্ছা। তবে আমার সিদ্ধান্তের বিষয়টা অভিভাবক এবং শূভানুধ্যায়ী যারা আছেন, তাদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে আরও যাচাই করে দেখব। তারপর দেখা যাক কী হয়।

-সেই আশায় থাকলাম।

-বিয়ের ব্যাপারে আমার নিজস্ব একটা ভাবনা আছে।

-কী রকম।

-প্রথমত লেখাপড়া করে আগে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর ব্যবস্থা করব। তারপর আমার মতো শারীরিক ত্রুটিপূর্ণ কিন্তু আমার সমান্তরাল যোগ্যতা সম্পন্ন কাউকে বেছে নেয়ার ইচ্ছে আমার।

-আমার মনে হয় নানাদিক থেকে তোর সিদ্ধান্তই যুক্তিযুক্ত এবং গ্রহণযোগ্য।

অতপর উভয়ে এ পর্যন্ত ক্ষান্ত দেয়। প্রস্তাব

পাঠানোর পর থেকে আফজাল ভাইয়া আর ফোন করে না। প্রতিদিনের অভ্যাসানুসারে যদিও তিনিয়া উন্মুখ হয়ে থাকে ফোনের জন্য। কিন্তু ফোন তো আর আসে না। এ অবস্থা কী করবে তিনিয়া। সে-ই কি ফোন করবে? একটি বিশেষ ঘোরে পড়া মন তো চায় ফোন করতে। কিন্তু বিবেক বাধা দেয়।

সেই বিশেষ ধরনের অন্ধ আবেগ তখন ভীষণ কষ্ট দিতে চায় তাকে। মনের সে অবস্থাকে কঠোরভাবে আয়ত্তে নেয় সে। একদিন, দুদিন করে করে সময় গড়ায়। তিনিয়া ঘনিষ্ঠ বান্ধবীদের সঙ্গে এ ব্যাপারে আলোচনা করে। তাদের কেউ পক্ষ, কেউ বা বিপক্ষে মতামত দেয়। তবে বিপক্ষের মতামতই জোরালো হয়। বান্ধবীদের কেউ বলে, তোমার জীবনের সিদ্ধান্ত তোমাকেই নিতে হবে। তবে তার আগে সিদ্ধান্তটি যাচাই করে নেয়া ভালো। এক ফাঁকে তিনিয়া বাড়ি গিয়ে এ ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য অভিভাবকগণের সঙ্গেও কথা বলে। আলোচনায়, তার সিদ্ধান্তই বুদ্ধিদীপ্ত বলে প্রতীয়মান হয়। তিনিয়ার মনোভাব সম্পর্কে লাগাল ততদিনে আফজাল ভাইয়াকে কিছু জানিয়েছে কিনা সে খবর তিনিয়া জানে না।

প্রায় এক সপ্তাহ পর আবার আফজাল স্যারের ফোন আসে। বলে, দাদিমা তুমি কেমন আছো? আফজাল ভাইয়া তনিয়াকে তো সব সময় দাদিমা বলে ডাকতো। জবাবে তিনিয়া বলে, ভালো স্যার!

-এতোদিন তো একবারও ফোন করলে না।

-মন ভালো ছিলনা স্যার।

-এখন কি মন ভালো।

-হ্যাঁ, স্যার।

বলেই লম্বা করে একটা নিঃশ্বাস ছাড়ে। আর এ দীর্ঘনিঃশ্বাসের স্বর মোবাইল সেটের মাধ্যমে ওপাশের ব্যক্তিটির বুক গিয়ে বিদ্ধ করে। তারপর কিছুক্ষণ কারো কথা নেই। তিনিয়াই খানিক অপেক্ষা করে বলে, এখন রাখি ভাইয়া!

-আচ্ছা, ভালো থেকে। শুভা কামনা রইল।

-আপনার জন্যও শুভ কামনা।

বলেই তিনিয়া মোবাইল ফোন রাখে।

তেইশ.

প্রস্তাবে আশানুরূপ সাড়া পায়নি বলে আফজাল একবারে পিছপা হয়নি। তবে প্রায় প্রতিদিন আগের মতো তিনিয়ার কাছে ফোন করে। রোজ ফজরের নামাজের মিনিট দশ আগে তিনিয়াকে ফোন করে জাগায়। নামাজের জন্য তাগিদও দেয়। তবে

তিনিয়া অবশ্য আগে থেকেই নামাজ আদায় করে। আফজালের দৃঢ় বিশ্বাস দোনামোনা থাকলেও এক সময়ে তিনিয়া তার প্রস্তাবে রাজি হবেই। আর তেমন একটা বিশ্বাস থেকেই আফজাল ফোন করে।

তবে তিনিয়া আর চাইছে না আফজাল অহেতুক রোজ রোজ ভোরে তাকে এভাবে ফোন করুক। কারণ যা বাস্তবে সম্ভব নয় বলে তিনিয়া ভাবছে, সেই অধরা স্বপ্ন আর সে দেখতে কৌতূহলী নয়। অন্তত সারা জীবনের জন্য এমন একজন মেধাবী এবং চৌকস পুরুষের প্রতি আস্থাবান হতে পারছে না সে।

রাতে ভালো ঘুম হয়নি তিনিয়ার। তাই মেজাজটাও ফুরফুরে বলা যাবে না। ভোরে মোবাইল ফোন বাজার শব্দ শুনে ঘুম ভাঙে তার। মুঠোফোন সেটের সবুজ বোদাম টিমে ঘুম-জড়ানো গলায় বলে, হ্যালো!

-হ্যালো তিনিয়া, শুভ সকাল।

-শুভ সকাল।

-এখনো শয্যা ছেড়ে উঠো নাই।

-এই তো উঠতেছি।

-উঠো, উঠো আমার ফুটপদাফুল।

-আমাকে 'পদাফুল' বললেন যে!

-বারে, দুদিন পর আমার ঘরনি হবে। আজ আমার জন্মদিনে তোমাকে একটু আত্মদান করে পদাফুল না বললে তো মনের তৃপ্তি পাবো না।

-আপনার জন্মদিনে আমারও শুভেচ্ছা। কিন্তু পদাফুলের উপমায় আমার খুব আপত্তি ভাইয়া...

-আ-প-ত্তি...

-হ্যাঁ, ভীষণ আপত্তি...। আর কোনোনিন এভাবে বলবেন আমাকে।

-তিনিয়া আমার কথা...

-কী শুনব আপনার কথা। কী ভাবছেন আমাকে? ভাবছেন, এক শারীরিক প্রতিবেদী আমি। আর এই দুর্বলতার সুযোগে কিনা... আমাকে নিয়া খেলতে চান তাই না!

-আহা তিনিয়া...কী লজ্জা! আমার একটা কথা তুমি...

-না আপনার কোনো কথাই আমি শুনব না। এই আপনার সঙ্গে শেষ কথা আমার। এরপর আর কোনোনিন আমার সঙ্গে কথা বলতে আসবেন না।

-তুমি আমাকে ভুল বুঝতেছ তিনিয়া!

-আপনাকে ভুল বুঝি নাই। আসলে এইটাই আপনার প্রকৃত চেহারা। আগেরটা ছিল ভদ্র মানুষের ছদ্মবেশ।

এই বলে তিনিয়া বেসামাল উত্তেজনা বশে আফজালকে অশ্লীল গালাগাল করতে থাকে।

মুঠোফোনে তিনিয়ার এমন আক্রমণের মুখে টিকতে না পেরে আফজাল বলে, ঠিক আছে তিনিয়া, আমি তোমার সব অভিযোগ মাথা পেতে নিলাম। আর কোনোনিন তোমার সঙ্গে আমি কথা বলবনা। কথা দিলাম...

বলেই আফজাল ফোন কেটে দেয়। এদিকে তিনিয়ার কোলাহল শুনে তিনিয়ার হোস্টেলমেট দুই বান্ধবী এগিয়ে আসে। তাদের একজন সুহানা বলে, কার সঙ্গে কথা বললি রে, তোর আফজাল ভাইয়ার সঙ্গে?

জবাবে তিনিয়া কোনো কথা বলে না। তখন অপর সহপাঠী সাবিহা বলে, তিনিয়ার ফোনলাপে তো

তেমনই বোঝা গেলো।

জাবাবে ওদের দুজনকে বলে, তোদের অনুমান মিথ্যে নয়।

তাই বলে এতটা ক্ষেপে গেলি কেনো?

সাবিহার জবাবে তিনিয়া কোনো কথা বলেনা।

কেমন যেনো খুম ধরে থাকে। কারণ কী বলবে।

জীবন যন্ত্রণায় ইচ্ছে করেই এমনটি করেছে তিনিয়া।

আর সে জনাই বোধ হয় তার ভেতর দেশে

ক্রমাগত ভাঙচুর চলতে থাকে। তিনিয়া জানে

আফজালের নির্খাদ প্রণয় নিবেদন এবং আবেগের

নির্মল বাগানের ফুলগুলো স্বেচ্ছায় দুপায়ে মাড়িয়ে

দিয়েছে সে। এজন্যই তিনিয়াকে ঘিরে আফজালের

লালিত স্বপ্নসৌধ ভেঙেচুরে তচনচ করে দিয়েছে।

তাতে তিনিয়ার মাঝেও বেসামাল প্রতিক্রিয়া শুরু

হয়। আত্মদহনের অনিরুদ্ধ অগ্নিশিখা দাউ দাউ

করে যেনো উত্তরোত্তর বেড়েই চলে। আর এ

অন্তরদহন কোনোভাবেই সামাল দিতে পারেনা সে।

বরং সে দহনে ভর করে তার মানসিক সমস্যাটি

চাগাড় দিয়ে উঠে। একপর্যায়ে তাকে আত্মঘাতী

হওয়ার জন্য প্ররোচিত করে। যখন এমন মানসিক

সঙ্কট পর্বে চলে যায়, তখন সে যা মনে করবে; তা

বাস্তবায়ন না করা পর্যন্ত স্বস্তি পায় না। বরং সেটি

বাস্তবায়ন করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠে। তাহলে কি

মানসিক সঙ্কটের সে ঘোরে পড়ে তিনিয়া

অত্মহত্যাকেই বেছে নেবে! হ্যাঁ, তার বিশৃঙ্খল বা

অস্থির চিত্ত তো তেমনটাই সমর্থন করে। শুধু তাই

না, তাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সে কাজটি করার

জন্য চাপে ধরে। যেনো বলতে থাকে, কাজটি

করতেই হবে এবং এখনই করো-এই মুহূর্তে করো।

তার এমন মানসিক সঙ্কটের বৈশিষ্ট্য হলো- যখন

কোনো কিছু একটা করার ঘোরে পড়ে যায়, তখন

বেপরোয়াভাবে সে কাজটি করতে বাধ্য হয়।

তিনিয়াও তখন তেমন ঘোরে পড়ে সেদিকেই

এগোয়। কিন্তু কিভাবে তার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের

দিকে যাবে- তা যখন ভাবে, তখনও কিন্তু তার

সচেতন সত্তাটা একেবারে নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়নি। আর

সে সত্তাটিই তাকে বলে, তিনিয়া শিগগির তুমি

গোছলখানায় যাও। তখন তড়িঘড়ি করে তিনিয়া

বাথরুমে ঢুকে। তারপর দরজা বন্ধ করে শাওয়ার

ছেড়ে দেয়। থাকি বরনাধারার নিচে মাথা পেতে

দাঁড়িয়ে থাকি অনেকক্ষণ।

এমন মানসিক সঙ্কটে এর আগেও সে এমন

শাওয়ারের নিচে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে নিজেকে

শান্ত করেছে। আর এভাবে দীর্ঘ সময় তিনিয়া

বাথরুমে থাকলে তার সহপাঠীরা তার দিকে

বিশেষ নজর রাখে।

এভাবে দীর্ঘক্ষণ শাওয়ারের নিচে মাথা পেতে

কিছুটা শান্ত হয়ে তিনিয়া গোছলখানা থেকে

বেরিয়ে আসে। তারপর ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হতে

থাকে।

চব্বিশ.

সেদিনের সেই ঘটনার পর থেকে আফজাল

ভাইয়া আর ফোন করে না। একদিন, দুদিন, এক

সপ্তাহ চলে যায়। ততদিনে এক ধরনের

অপরাধবোধ জাগে তিনিয়ার মনে। সে ভাবে,

নির্দোষ সেই লোকটির প্রতি বড্ড বেশি দুর্ব্যবহার

করে ফেলেছে সে। তার প্রস্তাবে সাড়া না দিলেও

তো সে ব্যাপারে ভালোভাবেও বুঝিয়ে বলতে

পারত তিনিয়া। এ জন্য তো একটি শাদা মনে

আঘাত করা ঠিক হয়নি। আর সে জন্য আফজাল ভাইয়ার কাছে তার দুঃখ প্রকাশ করা উচিত বলে মনে করে। আর তা ভেবে এক সপ্তাহ অপেক্ষার পর ফোন করে তানিয়া। কিন্তু কী আশ্চর্য বিষয়! সেই মোবাইল ফোনটিতে বারবার ফোন করেও খোলা পাওয়া যায়নি। এভাবে সে কয়েকদিন ধরে চেষ্টা করে নিশ্চিত হয়, আফজাল ভাইয়া সেদিনের সে ঘটনায় এতটাই মানসিক আঘাত পেয়েছে যে, সেই মোবাইল সিমটি একেবারে বন্ধ করে দিয়েছে। তাতে চরম হতাশ হয় তানিয়া। একদিন পর রাতেই একটি অপরিচিত নম্বর থেকে ফোন আসে তানিয়ার মুঠোফোনে। তানিয়া সবুজ বাটমে চাপ দিয়ে, হ্যালো-হ্যালো করে, কিন্তু ওপাশ থেকে কোনো সাড়া মিলেনি। জবাবে সুদূর থেকে মুঠোফোনে কেবল একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাসের শব্দ ভেসে আসে কানে। হৃদয়ভেদী এমন দীর্ঘশ্বাস তো আফজাল ভাইয়া ছাড়া আর কারো হতে পারে না। এরপরই লাইন কেটে দেয়া হয়। ফলে এ যে, আফজাল ভাইয়া তা তানিয়ার বুঝতে আর সংশয় থাকে না।

প্রতিক্রিয়ায় তানিয়া আবার সেই অপরিচিত নম্বরে ফোন করে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ততক্ষণে সে নম্বরটিও বন্ধ পায়। আর সঙ্গে সঙ্গে তার এতটাই খারাপ লাগে, সেই কষ্টবোধে তার দুচোখ পানিতে ঝাপসা হয়ে যায়। ডান হাত খোয়া যাওয়ার পর থেকে মন খারাপ লাগলে তানিয়া কাগজে আবোলা-তাবোল কিছু লিখে। এ ঘটনার পরও সে অভ্যাসবশে লিখে। তবে আগের মতো একেবারে অর্থহীন হয় না। কিছুটা পদের আকারে লিখে সে। আর এ পদ্যটি হলো—

অমলিন এক ফুল

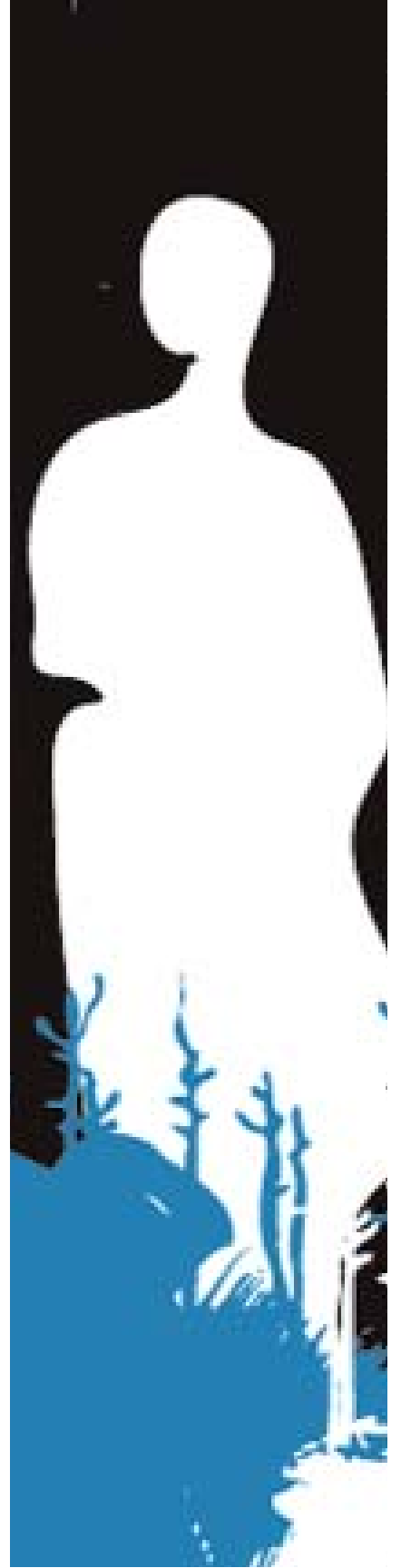
আমার উঠানে থেকে থেকে চিরদিন
অনাবিল পুষ্পবৃষ্টি হোক শুধু
কোনোদিন এ উঠানে কাদায় কাদায়
ভরে উঠুক, তা চাইনি কখনো আমি
এমন ভেবেই দু'ঘরের মাঝখানে
তুলি দূরত্বের দুর্ভেদ্য দেয়াল।
অথচ কী অবাক বিষয়, তুমি জানো-
হায়, তোমাকে বুঝি নাকি ঢের ভুল
আমি জানি সে তো এক অমলিন ফুল।
মাঝে-মাঝে সেই অপরিচিত নম্বর থেকে তানিয়ার
মুঠোফোনে ফোন আসে। তানিয়া সবুজ বাটমে চাপ
দিয়ে হ্যালো হ্যালো করে, কিন্তু ওপাশ থেকে
দীর্ঘশ্বাস ছাড়া আর কোনো জবাব আসে না।
খানিকক্ষণ পরে ওপাশ থেকে ফোন কেটে দেয়া
হয়। তানিয়া সেই অপরিচিত নম্বরে যদি ফোন
করে, খোলা পায় না সেই ফোন। হয়তো বা সিম
পাল্টানো হয়। এক ধরনের অপরাধবোধে কখনো
মানসিক উত্তেজনা দেখা দেয় তার। এভাবে সে
প্রায় দুয়েকদিন পর পর অপরিচিত সেই নম্বর থেকে
ফোন আসে। সেদিন রাত নটার পর ফোন এলে
তানিয়া সবুজ বাটমে চাপ দিয়ে কানে চেপে ধরে।
কিন্তু ফোনে কোনো কথা বলে না। ওপাশ থেকেও
আসে না কোনো কথা। তবে মুঠোফোনে শুনতে
পায় দীর্ঘ নিঃশ্বাসের হাহাকাহ। ওপাশের নিঃশ্বাসের
দহনে পুড়ে পুড়ে গলে যেনো তানিয়ারও নিঃশ্বাস।
দুর্বহ বেদনা সঞ্চারী এ নিঃশ্বাস যেনো তানিয়ার

বুকটাও পুড়ে ছারখার করতে চায়। উভয়েই দীর্ঘ
নিঃশ্বাসের ভাষায় কথা বলে কতক্ষণ। তানিয়া
জানে কথা বলে কোনো লাভ নেই। কারণ সে কথা
বলেও ওপাশ থেকে কোনো ধ্বনি উচ্চারণ হবে
না। তাই অনেকক্ষণ উভয়দিক থেকে নিঃশ্বাসের
ছড়াছড়ি হলেও কোনো কথা হয় না। এক সময়
ওপাশ থেকেই লাইন কাটা হয়। আবেগে উত্তেজিত
হয় তানিয়া। তবু নিজেকে সামলে নিয়ে স্বাভাবিক
থাকতে সচেষ্ট হয়। কিন্তু তবু কেনো যেনো তার
কেবল কান্না আসতে থাকে। আর তখন শাসিত
আবেগে আবার সে পদ্য লিখতে বসে—
কী যে কষ্ট বুকের মাঝে
আড়াল করে রাখো,
অনেক কথার জট খুলো না
দীঘশ্বাসেই ঢাকো।
আর কেনোনা ওগো নদী
দুঃখে কিংবা জিদে,
তোমার বুকের কষ্টের শিকই
আমার বুক বেঁধে।
এভাবে অনেকক্ষণ কাব্য ঘোর থাকে সে। তারপর
এক সময়ে তানিয়া নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করে
মনে মনে কখনো বলে, জীবনের সিদ্ধান্ত নিতে কি
ভুল করছি আমি! এখনো তো আফজাল ভাইয়ার
আবেদনে সাড়া দেয়ার পথ একেবারে শেষ হয়ে
যায়নি।
দেখা যাক, নিয়তি কোনদিকে, কতদূর নিয়ে যায়
আমাকে...!
পঁচিশ.
ওদিকে ভার্টিসিটে যে ছাত্র সংগঠনটিতে তানিয়া
জড়িত, সে সংগঠনের সভাপতি সাগর বেশ আড়াল
থেকে তার মন জয়ের প্রয়াস চালাচ্ছে। স্বাধীনতা
এসেছে যে দলের নেতৃত্বে সে দলেরই ছাত্র
সংগঠনের, একজন বলিষ্ঠ নেত্রী তানিয়া। এ ছাত্র
সংগঠনের নানা কর্মসূচিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ কিংবা
বক্তৃতায় নিজের অবস্থান তৈরি করে সে। এভাবে
কখনো পাশাপাশি অবস্থানের কারণে তানিয়ার প্রতি
দিনের পর দিন মুগ্ধ হতে থাকে সাগর। কিন্তু
তানিয়া বরাবরই নিজের সম্পর্কে সচেতন। প্রণয়-
প্রীতির বিষয়ে তানিয়া বরাবরই বেশ কঠিন মেয়ে।
তবু বিষয়টি নিয়ে সে একাকি ভাবে। তখন তার
মনে প্রশ্ন জাগে, ভার্টিসিটে এতো এতো মেয়ে
থাকতে তার মতো একটি অঙ্গহীন মেয়ের প্রতি
সাগরের এতো কৌতূহল কেনো। অনেকদিন তার
পিছনে ঘুর ঘুর করার একপর্যায়ে তানিয়া সাগরকে
বাজিয়ে দেখার জন্য একটু কৌশলের আশ্রয় নেয়।
তার ঘনিষ্ঠ বান্ধবীরাও এ ব্যাপারে অনুকূল মতামত
দিতে থাকে। বন্ধুদেরও কেউ কেউ বলতে থাকে,
তানিয়ার প্রতি সাগর বেশ দুর্বল। যেনো তানিয়া
সুযোগ দিলেই সাগর তার প্রণয় ডুরের জালে
ঝাঁপিয়ে পড়বে।
কিন্তু তানিয়া যখন তার ওই কৌশলের অংশ হিসেবে
এমনটি দেখায় যে, তার মন কিছুটা গলতে শুরু
করেছে। তার কদিনের মাঝেই সাগরের আসল
চেহারা উন্মোচিত হয়। তানিয়ার মনোভাব নমনীয়
হয়েছে জানতে পেরে সাগরের আগ্রহ যেখানে বাঁধ-
ভাঙা প্রোতের মতো হবে, সেখানে দৃশ্যমান
শিথিলতা ধরা পড়ে। আর তাতেই তানিয়া যা
বোঝার বোঝে নেয়। এ ঘটনার পর সব স্বাভাবিক
ছেলের প্রতি এক ধরনের বিতৃষ্ণা সৃষ্টি হয়। আর সে

স্থলে তানিয়ার নিজস্ব সিদ্ধান্ত আরও জোরালো হয়।
আত্মবিশ্লেষণ করে সে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে,
আফজালের প্রস্তাবের বিষয়ে তার ভূমিকাই সঠিক
ছিল। আর তাই জীবনের ব্যাপারে তার সুস্পষ্ট
মতামত হলো, শারীরিকভাবে কোনো না কোনো
খুঁত থাকে এমন কোনো সামর্থ্যবান পুরুষের সঙ্গেই
বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে সে।
ছাত্রিশ.
বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার স্থানীয় একটি ছেলে তানিয়া
সম্পর্কে বেশ আগ থেকেই খোঁজখবর নিচ্ছিল।
ছেলেটি সুপুরুষ। শিক্ষিত এক তরুণ। পড়াশোনা
করেছে ঢাকার বেসরকারি এক বিশ্ববিদ্যালয়ে। তার
শারীরিক সামান্য সমস্যা আছে। বাবা-মায়ের
একমাত্র ছেলে। বাবা সরকারি চাকরি করে।
সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কর্মরত। বছর দুইয়ের
মাঝে অবসরে যাবে। কিন্তু ছেলে চাকরি করবে না।
উপজেলা পর্যায়ে ব্যবসা করবে। ইতোমধ্যে ব্যবসা
কিছুটা গুছিয়েও নিয়েছে।
এক বান্ধবীর মাধ্যমে প্রথমে ছেলেটি সম্পর্কে
তানিয়ার সঙ্গে আলাপটা পাড়া হয়। সব শুনে
তানিয়া কিছুটা ইতিবাচক সাড়া দেয়। এরপরে
তানিয়ার সঙ্গে ছেলের এক নিকটাত্মীয় এসে সাক্ষাৎ
করতে চায়। একদিন বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের
আড়িনায় একটি ভালো স্টলে লোকটিকে
সাক্ষাৎকার দেয় তানিয়া। হজুর টাইপের লোকটি
তানিয়াকে বলে, ছেলেটি আমার আত্মীয়। কিন্তু
মানুষ হিসেবে ভালো।
জবাবে তানিয়া বলে, তাহলে অন্যের মাধ্যমে
যোগাযোগ করলে, তাহলে অন্যের মাধ্যমে
করতে আসেন না কেনো! কেনোই বা দূরে থেকে
কথা চালাচালি করতেছেন।
-তার একটা শারীরিক সমস্যা আছে তো। এই জন্য
আপনার সামনে আসতে সাহস করতেছে না। তাকে
বিয়া করানোর জন্য অভিভাবক মহল থেকে বেশ
চাপ দেয়া হইতেছে। কিন্তু তার একটা ভয়,
উচ্চশিক্ষিত এবং স্বাভাবিক কোনো মেয়ে তাকে
দেখলে পছন্দ করবে না।
-আমি তো স্বাভাবিক নই।
-এই জন্যই তো আপনার কাছে আসা।
-ঠিক আছে, ছেলেকে পাঠান আমার কাছে।
-কিন্তু, ছেলের ভয়, কাছে আসলে যদি তাকে পছন্দ
না করেন।
-কী সমস্যা তার।
-সমস্যা তার কোনো অঙ্গের না। তবে-
-তবে...।
-তার ত্বকে।
-কেমন?
-আঞ্চলিক ভাষায় এটাকে শ্বেতী বা ধলি রোগ কয়।
-আমার মতে এইটা তেমন কঠিন কোনো সমস্যা
নয়।
-তাই...।
-আমি তো তাই মনে করি।
-আপনার কথাগুলো আমার খুব ভালো লাগতেছে।
আমি মনে করি আপনার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ সফল
হইছে। খুব তাড়াতাড়িই ছেলে আপনার সঙ্গে
সাক্ষাৎ করবে। আমি সেই ব্যবস্থাই করব।
এই বলে লোকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের আড়িনার সেই
স্টল থেকে বিদায় নেয়। সামনের সাপ্তাহিক ছুটির
দিনে ছেলেটি তানিয়ার সঙ্গে উপজেলা সদরের

একমাত্র অভিজাত হোটেল বসার আমন্ত্রণ জানায়। তানিয়া তার এক ঘনিষ্ঠ বান্ধবীকে নিয়ে ভার্টিস্টার হোস্টেল থেকে বের হয়। তখন পড়ন্ত বিকেল। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস থেকে উপজেলা সদরের দূরত্ব প্রায় দুই কিলো দূরে। একটা রিকশা নিয়ে সময় মতো ওরা সেই রেস্টুরেন্টে যায়। নিরিবিলি এক কোণে গিয়ে বসে দুই বান্ধবী। সেই হুজুরকে সঙ্গে নিয়ে তাদের অপেক্ষায় ছিল ছেলোট। ওরা যাওয়া মাত্র ছেলেকে পরিচিত করে দিয়ে হুজুর চলে যায়। একই টেবিলে ওরা সামনা-সামনি বসে। বান্ধবী সাবিহা বলে, আপনারা কথা বলেন, আমি পাশের টেবিলে বসি। বলেই সাবিহা উঠে পাশের আর একটি টেবিলের সামনের একটি চেয়ারে গিয়ে বসে। তখন ছেলোট লজ্জায় কাচুমাচু হয়ে বলে, আপনার নাম তো তানিয়া-
-হ্যাঁ। কিন্তু, আপনি আমার নাম জানলেন কী করে...?
-আমি আগেভাগেই আপনার সম্পর্কে কিছু খোঁজখবর নিছি। কিন্তু কখনো আপনার মুখোমুখি হইবার সাহস করি নাই।
-কেনো?
-যে বাজে চেহারা, শেষে যদি আমাকে পছন্দ না করেন।
-আমি অপছন্দ করব কেনো, আমারও তো ডান হাত নাই।
-তবুও আপনি আমার চাইতে ভালো।
-কিন্তু আপনার সমস্যা যে কোথায়, আমি তো বুঝতেই পারতেছি না।
তানিয়ার এ কথা শুনে ছেলোট তার বাম হাত মেলে ধরে আঙুলগুলো দেখিয়ে বলে, এই দেখেন! আঙুলগুলোর দুইটা রঙ। সবগুলো আঙুলে শ্বেতী রোগ। জামার নিচেও পিঠে সামান্য আছে।
-শ্বেতী রোগ আসলে কি কোনো রোগ!
-বলেন কি? এইটা তো মারাত্মক সমস্যা। এই রোগ মুক্ত হওয়ার জন্য কত টাকা-পয়সা খরচ করলাম। কই নিরাময় হইল না তো। আমার আশপাশের মানুষে কয়, এইড়া কুষ্ঠ রোগের লক্ষণ। এই জন্য নাকি কেউ আমার কাছে মেয়ে বিয়া দেবে না। আসলেও তাই। আমার এই রোগের কথা শুনলে বিয়ার আলাপে ইতি দিয়া সবাই পিছাইয়া যায়।
-আমি মনে করি আপনার এই সমস্যা কোনো সমস্যা নাই। আমার এক নিকটাত্মীয়র এই রকম সমস্যা আছে। আর তখনই এই বিষয়টা নিয়া আমি ঘাঁটঘাঁটি করি। তখনই জানতে পারি, ত্বকের একটা নির্দিষ্ট উপাদান না থাকলে এমনটা হয়। এটা আসলে দেখতেই একটু খারাপ লাগে। তবে বাস্তবে কোনো সমস্যার সৃষ্টি করে না।
-তাইলে এই জন্য আপনার কোনো রকম আপত্তি নাই!
-না।
-তাইলে সরাসরি আমি একটা কথা বলি!
-বলুন শুন। আমার বায়োডাটা তো আপনাকে দেয়া হইছে। আপনি খোঁজখবর নিতে পারেন। আপনি রাজি থাকলে আমি তিনদিনের মাঝে বিয়ের ব্যবস্থা করব।
-ক্যান, এতো তাড়াহুড়া ক্যান করতে চান!
-আমার আপনাকে খুব পছন্দ। আর তাই এতো তাড়াহুড়া। বেশি সময় নিলে এইটা-সেইটা নিয়া

অভিভাবক মহলের আপত্তি উঠতে পারে। আমি সেই সুযোগ দিতে চাই না। আর এই তিনদিনের মাঝে আপনার পক্ষের অভিভাবকগণকে খোঁজখবর নিতে বলেন। তারপর আমার পক্ষের অভিভাবক মহল আপনাদের বাড়িঘর দেখতে যাইতে পারে। আমি জানি আপনাদের গ্রামের বাড়ি দুর্গম এলাকায়।
-শুধু দুর্গম এলাকাতেই নয়। আমরা গরিব। আমাদের বাড়িঘর আপনার পছন্দ হবে না।
-পছন্দ হবে।
-কীভাবে?
-সেইটা আমি বুঝবো। কারণ, আমি সম্পর্ক করতে চাই আপনার সঙ্গে, কোনো বাড়িঘরের সঙ্গে না। এখন আপনি বলেন, আমাকে আপনার পছন্দ কিনা কিংবা এই বিয়েতে আপনি রাজি কিনা।
তানিয়া মনে মনে বলে, এর চেয়ে বড় কোনো শারীরিক সমস্যা থাকলেও আমি রাজি হতাম। কিন্তু ততক্ষণে অধীর ছেলোট বলে, না-না, আপনার যদি আপত্তি থাকে, আমি জোর করব না। কারণ আপনি তো আমার চেয়ে মেধাবী। এই সত্যটা আমাকে স্বীকার করতেই হবে। কই, আমি তো কোনো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিও যোগ্য হই নাই। সেইদিক বিবেচনায় আমি আপনার অযোগ্যই বটে। তখন জবাবে তানিয়া বলে, আমি আগামীকাল আপনাকে জানাবো।
-তাহলে যদি কিছু মনে না করেন, আপনার মোবাইল ফোন নাম্বারটা কি দিবেন?
-অবশ্যই।
বলে মোবাইল ফোন নম্বর বলে তানিয়া। ছেলোট সঙ্গে সঙ্গে তার মোবাইলের বাটম টিপে। তানিয়ার সেটে রিংটোন হলে ছেলোট বলে, ইচ্ছে করলে নাম্বারটি আপনার সেটে সেইভ করতে পারেন। আমি আপনার নাম্বার সেইভ করে নিলাম। কাল কখন জানাবেন?
-বিকালে।
-আমি অপেক্ষায় থাকবো।
-আচ্ছা। আজকে আসি তাহলে।
বলে তানিয়া তার বান্ধবীকে নিয়ে বের হয়। রাতে হোস্টেল-বান্ধবীদের পরামর্শ করে। আলোচনায় ইতিবাচক সাড়া পায়। আর তাই পরদিনই গ্রামের বাড়ি চলে যায় তানিয়া। মায়ের সঙ্গে সব খুলে বলে। মা তখন তড়িঘড়ি করে তানিয়ার অভিভাবক মহলের সঙ্গে আলোচনা করে। কিন্তু মেয়েপক্ষের কেউ কেউ তাড়াহুড়ো নিয়ে প্রশ্ন তোলে। বিকেলে তানিয়াকে ফোন করে ছেলপক্ষ। মায়ের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে ইতোপূর্বে নেয়া সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তানিয়া ইতিবাচক সাড়া দেয়। বেশি তাড়াহুড়ো নিয়ে প্রশ্ন উঠে ছেলের পক্ষেও। কিন্তু বর-কনের রাজি থাকায় পরিণতির দিকে এগোতে থাকে ঘটনা। ছেলপক্ষের লোকরা সত্যি সত্যি মেয়েদের গ্রামের বাড়িঘর দেখতে এসে হতাশ হয়। একে তো দুর্গম গ্রাম, তার ওপর তাদের আর্থিক অবস্থাও আশানুরূপ নয়। এসব দেখে ছেলপক্ষ নেতিবাচক মনোভাব দেখাতে চায়। কিন্তু ছেলের প্রবল ইচ্ছের কাছে তাদের কোনো আপত্তিই টেকে না। শেষ পর্যন্ত অনাড়ম্বরভাবে এবং বেশ শাদামাটা পরিবেশে তাদের শুভ পরিণয়ের দিকে এগোতে থাকে।





গল্প

বস্তুত লোকটির সাথে তার কোনো শত্রুতা ছিল না

সমীর আহমেদ

লোকটির সাথে হাফিজের চিন-পরিচয় তো দূরের কথা, কোনোদিন কোথাও দেখা-সাক্ষাৎও হওয়ার কথা নয়। কারণ যে এলাকায় লোকটির বাস, তার থেকে হাফিজের বাড়ি অন্তত পাঁচটি জেলার পরে - শতিনেক মাইল দূরে। লোকটির নামও সে জানতো না। শুধু লোকটির একটি ছবি তার বুক পকেটে গুঁজে দিয়েছিল ওরা। অবশ্য তারও কোনো দরকার ছিল না। মূল কাজের দায়িত্ব ছিল জিহাদ আর আবদুল্লাহ আল মাসুদের ওপর। তাদের মূল সহযোগী মুহিতুল- যার বাড়ি লোকটির খুব কাছে, সে-ই তাকে অনেকদিন ধরে খুব কাছে থেকে চেনে-জানে। লোকটির সাথে তার কিছুটা খায়খাতিরও আছে। কাজেই কোনোরূপ ভুলচুক

হওয়ার কথা নয়। তারপরও লোকটির ছবি হাতে গুঁজে দিয়েছিল বড় ভাই। যাতে কাজটা ফাইনাল করার আগে লোকটির চেহারা সুরতের সাথে সে-ও একবার মিলিয়ে নিতে পারে। এ ক্ষেত্রে কোনোরূপ ভুলত্রুটি বরদাস্ত করতে চায় না সে। কঠিন জবাবদিহিতা করতে হয়। তখন সিদ্ধান্তটা ঘড়ির পেঙলামের মতো ঝুলে থাকে বড় ভাইর ওপর। কিংবা তার ওপরের কর্তা-ব্যক্তির ওপর, যাকে হাফিজ তো দূরের কথা, অনেকদিন ধরে দলে কাজ করে, অত্যন্ত বিশ্বস্ত হয়ে ওঠা জিহাদ আর মাসুদও দেখেছে কিনা সন্দেহ। তার সাথে তাদের সরাসরি কোনো যোগাযোগ নেই। স্বয়ং বড় ভাইও তাকে দেখেছে কি না সন্দেহ হাফিজের। তবে

তার সাথে যে সে মোবাইলে সব সময় যোগাযোগ রাখে, এ ব্যাপারে একেবারে নিশ্চিত হাফিজ। শুধু তা-ই নয়, তার আদেশ নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করার জন্য বড় ভাই একেবারে মরিয়া। হাফিজ লোকটির ছবি একনজর দেখেই পকেটে রেখে দিয়েছিল। মানুষের চেহারা একবার মগজে ঢুকে গেলে, সহজে, সেখান থেকে মুছে ফেলা যায় না। কেমন যেন মায়া তৈরি করে ফেলে। আর এ কাজে মায়া করতে নেই। তাহলে কাজ করা যায় না। নানারকম অসুবিধা সৃষ্টি হয়। পরের জন্য কবর খুঁড়তে গিয়ে, নিজেই সেই কবরের মধ্যে ঢুকে পড়তে হয়। তখন আর সেখান থেকে বেরিয়ে আসার কোনোরকম সম্ভাবনা থাকে না। কেউ কেউ নাকি অতীতে এরকম নজির রেখে গেছে। তাই, মায়া— দিল থেকে একেবারে মুছে ফেলতে হবে— বড় ভাইর নির্দেশ। লোকটাকে নিয়ে কোনো ভাবনা-চিন্তা করতেও নিষেধ করে দিয়েছেন তিনি। জিহাদ আর মাসুদ বলে, প্রথম প্রথম একটু আধটু মায়া হয়, এ জন্য বেহেশতের কথাটা মাথার মধ্যে সব সময় জিইয়ে রাখতে হবে। তারপর দু'একটা কাম হইয়া গ্যালাে দ্যাকবা, রক্তের মধ্যে খালি মুর্তাদ আর কাফের মারার নিশা আর নিশা। সেই নেশাটা জাগিয়ে তোলার জন্যই হাফিজ সঙ্গী হয় জিহাদ আর মাসুদের। স্বর্গে অনন্তকাল সুখের ভাবনায়ে সে বারবার আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। বারবার শিউরে ওঠে নরকের দুঃখ-কষ্টের কথা ভেবে। তারপর ভীষণ ক্ষুব্ধ হয় বিধবাদের ওপর; যারা ধর্মকে মানে না, ইসলাম নিয়ে নানা কটু কথা বলে, তাদের ওপর। যারা জেনেশুনে, সজ্ঞানে ধর্মের বারোটা বাজাচ্ছে। এদের দুনিয়া থেকে একে একে বিদায় করে দিতে পারলেই খুলে যাবে স্বর্গের দ্বার, অনন্তকালের জন্য— জিহাদ আর মাসুদ তার মধ্যে ধীরে ধীরে এ বিশ্বাসের শেকড় গাড়াতে সাহায্য করে।

ছোটবেলা থেকেই হাফিজ ধর্মভীরু। নিয়মিত ধর্মকর্ম করে। ধর্মীয় নিয়মকানুন মেনে চলার মধ্যেই সে শান্তি অনুভব করে। মানুষকে স্ব-ধর্মের দিকে ডেকে আনার জন্য কয়েকবার সে তাবলিগ জামাতের স্থানীয় এক আমিরের সাথে কয়েকটি জেলায় এক চিল্লা লাগিয়ে এসেছে। আরেক চিল্লা লাগানোর প্রস্তুতি নিচ্ছিল সে। তার আগেই, বছরখানেক তো হবেই, তাদের মহল্লায় মসজিদে নামাজ পড়াতে গিয়ে একদিন হঠাৎ পরিচয় হয় জিহাদ আর মাসুদের সাথে। দূরের জেলা থেকে তারা এখানে পড়াতে এসেছে। পরিচয়ের পর হাফিজ জানতে পারে, তারা আসলে তার ইয়ারমেট। যদিও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ভিন্ন। সাবজেক্ট ভিন্ন; তাতে কী? বন্ধু তো। খুব খোদাভক্ত মানুষ ওরা। আর বেশ নব্রহ্মদণ্ড— হাফিজ যেমনটা পছন্দ করে। ঘনিষ্ঠ হতে বেশি সময় লাগে না। মাঝে মাঝে ইসলামের দাওয়াত দিতে তাদের হোস্টেলেও চলে যায় সে। নিরিবিলি কোথাও বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধর্ম নিয়ে আলোচনায় মেতে ওঠে। বর্তমান জমানার হালহকিকত তো হাফিজের জানাই আছে। তাদের সাথে আলোচনা করে হাফিজের দৃষ্টি আরো খুলে যায়। তখন তার মাথা প্রায় পুরোটাই নষ্ট। এতদিন যাদের সাথে সে ঘুরে ঘুরে লোকজনকে ধর্মের পথে আনার আহ্বান জানিয়ে আসছে; বেহেশতের জন্য বারবার

ছওয়াবের বীজ বপন করে আসছে— আজ পুরোটাই বৃথা বলে মনে হয়। এভাবে ধর্মের পথে কোনোদিন মানুষ আসবে না। দুনিয়ার জমিনে খোদার স্বীকৃতি প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলে প্রয়োজন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল; আর তার জন্য প্রয়োজন সশস্ত্র বিপ্লব। তখন তারা হাফিজকে একদিন নিয়ে যায় বড় ভাইর কাছে। তাকে একনজর দেখেই সে খুব মুগ্ধ। কী তার জ্ঞানগরিমা, আর কী তার প্রতিটি বিষয়ে অকাটা যুক্তি! সে তাকে কাফের আর মুর্তাদদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে যুক্ত হওয়ার কথা বলে। সারাবিশ্বে তাদের যে গৌরবময় সশস্ত্র বিপ্লবের নেটওয়ার্ক রয়েছে, তা তুলে ধরে। অন্য ধর্মের লোকদের বিরুদ্ধে তাদের দুর্দান্ত সাহসী সংগ্রামের ভিডিও প্রদর্শন করে। বস্ত্রত যারা লড়াই করে জীবন দিচ্ছে আল্লাহর পথে। ফলে তার চোখ আরো খুলে যায়। সেও কাফেরদের নিধনের জন্য বদ্ধপরিকর। কঠোর পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর এবারই প্রথম সে কোনো কিলিংমিশনে। তাও সাহায্যকারী হিসাবে। আস্তে আস্তে দক্ষতা অর্জন করে আরো বেশি সাহসী ও আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠলে একদিন সেও জিহাদদের মতো নেতৃত্ব পাবে। আশ্রমের এক সেবায়তের ছবিটা তার হাতে দিয়ে বড় ভাই বলেছিলেন, ওপরের নির্দেশ, এই লোকটা কাফের। আমাদের ধর্মের মাল্লা ক্ষতিসাধন করছে। তাকে আর সময় দেয়া মোটেও উচিত হবে না। তাহলে খুব তাড়াতাড়িই আল্লাহপাকের গজব নাজেল হয়ে যাবে। আল্লাহপাক তার ওপর বড় নাখোশ হয়ে আছে। তাই আশ্রমের এই সেবায়তকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিতে হবে। যেতো তাড়াতাড়ি সম্ভব। এ যাত্রায় তাকে অবশ্য সরাসরি অংশ নিতে হবে না। শুধু পাঁচজনের কিলিং মিশনে থেকে সব কাজকর্ম বেশ সতর্কতার সাথে অবজার্ড করতে হবে। ধরা পড়ার সম্ভাবনা দেখা দিলে সে দূরে থেকে সতর্ক সংকেত দিবে, যাতে, কিলিংমিশনের অন্য সদস্যরা দ্রুত সেখান থেকে কেটে পড়তে পারে।

প্রায় পুরো একদিন বাসে জার্নি করে তারা রাতে তিনজন পৌছে কিলিংমিশনের স্থানীয় সদস্য মুহিতুলের বাড়ি। কিলিংমিশনে আরেকজনকে, তা হাফিজরা কেউই জানে না। জানে একমাত্র মুহিতুল। এ ব্যাপারে বেশি উৎসাহী হয়ে ওঠাও নিষেধ। সে যথা সময়ে গাড়ি নিয়ে উপস্থিত থাকবে কিলিং মাঠে। মুহিতুল তাদের বেশ আদরযত্ন করে। কী দিয়ে কী খাওয়াবে, তার জন্য সে বড় অস্থির। বাড়ির লোকজনের সামনে তারা বেশ হাসিখুশি। ভদ্র, নিরীহ। মাঝে মাঝে চাপাশব্দে এবং ইশারায় প্রয়োজনীয় কথা সারে। রাতে ঘুম। পরদিন সকালে তাদের তিনজনকে নিয়ে যাওয়া হয় সম্ভাব্য কিলিং স্পটে, যেখানে প্রায় বৃত্তাকার এক থেকে দেড় কিলোমিটার দীর্ঘ একটি পথে সেবায়ত প্রতিদিন প্রাতঃভ্রমণ করেন। পঞ্চমজান আজ থাকবে না। সে এই এলাকা আগেই কয়েকবার রিকি করে গেছে। গাড়ি নিয়ে কোথা দিয়ে বের হয়ে যাবে, তা নাকি সে বেশ ভালো করেই জানে। তারা তিনজন মুহিতুলের পাশাপাশি হাঁটে। আশ্রমসেবকের বয়স প্রায় ষাট। শরীরে ডায়াবেটিস বাসা বেঁচেছে। বেঁচে থাকার জন্য প্রতিদিন সকালে তাকে একই রাস্তা দিয়ে পাঁচ ছয়টা চক্র দিতে

হয়। সূর্য ওঠার আগেই সে হাঁটা শুরু করে। এ সময় এ রাস্তাটা বেশ নির্জন থাকে। মুহিতুলই লোকটিকে চিনিয়ে দেবে। তাদের কাজ শুধু চেহারাটা একবার মিলিয়ে নেয়া। সামনে, বেশ খানিকটা দূরে, সেবায়তকে দেখে মুহিতুল বলে, ওই যে আসছে। তোমরা আমার পিছে পিছে আস্তে আস্তে আসো। সে সামনের দিকে দ্রুত পা বাড়ায়। লোকটির মুখোমুখি হয়ে বলে, কেমন আছেন, ঠাকুর? শরীর কেমন? লোকটি খেমে বলেন, আর শরীর, বাবা। ভগবান রাখছে যেমন খুশি। তা তুমি এত সকালে? শুয়ে থাকতে আজ ভালো লাগছিল না, ঠাকুর। তাই ভাবলাম, দুটো পাক দিয়ে আসি। শুনিসকালের হাওয়া অনেক ভালো। হাঁ, ঠিকই বলেছো। কয়টা চক্র দিলেই বুঝবা, কতো ভালো লাগে। তাদের দুজনের পাশ দিয়ে তারা তিনজন হেঁটে যায়। হাফিজও লোকটাকে দেখে। এই মানুষটা কাল সকালে হাঁটতে আসবে। তারপর থেকে আর আসবে না। এই মাঠ, এই রাস্তা এমনই থাকবে। হাফিজের বুকের ভেতর হঠাৎ কেমন যেন করে ওঠে। না, এসব বিষয়ে তার মন দেয়া একেবারেই ঠিক না। জিহাদ আর মাসুদ কী ফুর্তিতেই না হেঁটে যাচ্ছে। একজন কাফের মেরে তারা ধর্মকে কায়ম করতে চায়। পাকাপোক্ত করতে চায় বেহেশতে যাওয়ার টিকিট। সে-ও কি তা চায় না! তাহলে? কেন এসেছে এই কিলিংমিশনে? একটু পিছে পড়ে যাচ্ছিল সে। আবার দ্রুত পা চালায় সামনে। যেতে যেতে সে শুনতে পায় মুহিতুলের গলা, এবার আসি, ঠাকুর। পুরোহিত বলেন, ঠিক আছে, যাও। আমাকে আরো কয়েকটা চক্র দিতে হবে। তারা বাসায় ফিরে আসে। পরিকল্পনার ছক কষে ফেলে জিহাদ। কার কী দায়িত্ব তা প্রত্যেককে ভাগ করে দেয়া হয়। মূল কাজ সারবে জিহাদ আর মাসুদ। বিকালে সূর্য ডোবার আগে তারা জায়গাটা আবার রিকি করে আসে। কাল সকালে কে কোথায় থাকবে? ঠাকুরের ওপর কোথা থেকে হামলা চালালে সবচেয়ে নিরাপদে পালিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে এবং কাজটা দ্রুত সম্পন্ন করা যাবে— এসব বিষয় মাথায় রাখে। অদূরে মাইক্রো নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে যে চালক, সে কাল ভোরেই স্পটে পৌছে যাবে। তাকে না দেখে কাজ শুরু করা যাবে না। ড্রাইভারের কাছাকাছি থাকবে হাফিজ। মুহিতুলই সংকেত আদান-প্রদানের মাধ্যমে তার সাথে পরিচয় করিয়ে দেবে। হত্যাকাণ্ডের সময় কিংবা আগে-পরে, চারপাশে সে এবং হাফিজ ভালোভাবে খেয়াল রাখবে। ড্রাইভার গাড়ি থেকে নামবে না। ইঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে বসে থাকবে সিটে। কোনো বিপদ দেখলে সাথে সাথে সংকেত দেবে। তারপর জিহাদ আর মাসুদের গাড়িতে উঠতে যেটুকু সময়। চালক গাড়ি নিয়ে ছুটে যাবে ব্যস্ত রাস্তায়। যাতে কেউ তাদের চিনে ফেলতে না পারে এবং বিন্দুমাত্র সন্দেহ না করে। মুহিতুল থেকে যাবে এখানে। চারপাশটা ভালোভাবে দেখে বাড়ি চলে যাবে। যদি লোকজনের উপস্থিতি টের পায়, তাহলে, সন্দেহ এড়াতে প্রয়োজনে একটা নাটক সে তৈরি করে নেবে। পরদিন সকালে পরিকল্পনা অনুযায়ী সব ঠিকঠাকই

ছিল। আবহাওয়া বেশ ঠাণ্ডা, কোমল। তবু হাফিজ বেশ ঘেমে উঠছিল। সে মনে মনে চাচ্ছিল, লোকটা আজ সকালে এদিকে যেন হাঁটতে না আসে। তাতে লাভ কী? পরদিন তো আসবে? কিংবা তার পরের দিন? জিহাদদের সাথে তাকে অপেক্ষা করতে হবে। এক, দুই, তিন...প্রয়োজনে এক সপ্তাহ। রাস্তার পাশে একটা বড় আমগাছের আড়ালে আবছা অন্ধকারে নীল রঙের মাইক্রোবাসটা। যাতে, সহজে কারো নজরে না পড়ে। আশ্রমসবক, ভোরের আলো ফুটার আগেই বেরিয়ে আসে রাস্তায়। আর কেউ নেই তার আশপাশে। হাফিজের একবার ইচ্ছে হয় লোকটিকে বলতে, আপনি চলে যান। এক্ষণি চলে যান। কিন্তু তা কি এখন আর সম্ভব? তাহলে সে-ই যে তাদের টার্গেটে পরিণত হয়ে যেতে পারে!

জিহাদ আর মাসুদ খুব স্বাভাবিক। বিড়ালের মতো সতর্ক পায়ে আঙুলে আঙুলে তারা পেছন থেকে এগিয়ে যায় লোকটির কাছে। লোকটি কিছু বুঝে উঠার আগেই, জিহাদ চাপাতি বসিয়ে দেয়। তারপর মাসুদ... হাফিজ, চোখ দুটো কিছুটা অ্যাস্কেলে অন্যদিকে সরিয়ে রাখে। চাপাতির কোপ খেয়ে লোকটির গোঙানি এবং মাটিতে পড়ে যাওয়ার ধপাত শব্দ শুনতে পায় হাফিজ। সব মিলিয়ে এক মিনিটও লাগে কিনা সন্দেহ। ভেতরটা কেন যেন ধড়ফড় করে ওঠে হাফিজের। তাকিয়ে দেখে জিহাদ ও মাসুদ দৌড়ে আসছে মাইক্রো বাসটার দিকে। কাজ শেষ। তবু কেমন যেন একটা দিশেহারা ভাব হাফিজকে বেঁধে ফেলতে চায়। নিরাপত্তার কথা ভেবে সে-ও তাড়াতাড়ি গাড়িতে ওঠে।

চাপাতি ওরা ফেলে এসেছে। জিহাদ ও মাসুদের হাতে রক্ত। মাইক্রোতে উঠে টিস্যু পেপারে তা মুছে মিনারেল ওয়াটার বোতলের ছিপি খুলে ধুতে ধুতে জিহাদ বলে, দিলাম একটা কাফেরকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে। মাসুদ বলে, শালা কোনো কিছু বুঝে ওঠার আগেই চাপাতিটা ঘাড়ে ঠিক জায়গায় বসিয়ে দিতে পেরেছিস তুই। ওই একটা কোপই এনাফ।

দুজনের শার্টপ্যান্টে ফোটা ফোটা রক্ত। সেসব খুলে একটা কালো কাপড়ের ব্যাগে রেখে চালককে বলে, নদী বা খালে যেখানে খুশি ফেলে দিও ভাই। অথবা মাটিতে পুঁতে ফেলো কোথাও। তারপর পরিষ্কার কালো প্যান্ট ও সাদা শার্ট পরে কেতাদুরস্ত ভদ্রলোক। ভোরের বাসে তাদের স্ব-নামে টিকিট কেটে রেখেছিল মুহিতুল। শহরে ঢুকে বাসস্ট্যান্ডে নেমে তারা বাসে ওঠে সিটে গিয়ে বসে। যেন কিছুই হয়নি। কিছুক্ষণ পরই ছেড়ে দেয় বাস। তারা দুজন সিটে গা এলিয়ে দিয়ে ঘুমায় কিংবা ঘুমের ভান করে পড়ে থাকে। কিন্তু হাফিজের ঘুম আসে না। সে সিটে গা এলিয়ে পড়ে থাকে চুপচাপ। এই প্রথম সে কিলিংমিশনে। খুব কাছ থেকে একজন মানুষ খুন হতে দেখলো। খুনিরা তার পরিচিতি, বস্তু। লোকটার চেহারা তার মগজে গেঁথে গেছে। মুখে হালকা চাপদাড়ি। চেহারা দেখে কে তাকে বুঝবে হিন্দু না মুসলমান। একটা মানুষকে তারা দুনিয়া থেকে বিদায় করে দিল। এর মধ্যে ধর্মের কী উন্নতি হলো, হিসাবটা ভালোমতো এখনো বুঝতে পারে না হাফিজ। তার মাথাটা বিমবিসম করে। খানিকটা যন্ত্রণাও হচ্ছে। বুকের

ভেতর খুব অস্থির লাগে। মাথাটা কেন যেন বিমবিসম করছে। কোনো অস্বাভাবিক আচরণ করে বসলে মানুষ কোনো না কোনো ব্যাপারে তাকে সন্দেহ করে বসতে পারে। তারপর? না, মাথাটা তাকে ঠিক রাখতে হবে। পকেটে ঘুমের বড়ি আছে। জিহাদ বলেছিল, প্রথম প্রথম এমন হয় দু'একজনের। তারপর সব ঠিক হয়ে যায়। যদি খারাপ লাগে একটা দুইটা ঘুমের বড়ি খাওয়া ঘুমায়। ঘুম থেকে উঠে দ্যাখবা সব ফকফকা। হাফিজ একটা ঘুমের বড়ি মুখে পুরে বোতলের ছিপি খুলে ঢকঢক করে পানি খায়। এ বাসে প্রত্যেক যাত্রীকে বোতলজাত মিনারেল ওয়াটার সাপ্লাই দেয়া হয়। বড়িটা খাওয়ার পর কিছুক্ষণের মধ্যেই তার শরীরটা অবশ হয়ে আসে। সে ঘুমিয়ে পড়ে।

একটা দীর্ঘ ঘুমের পর সে জেগে ওঠে। বাস তখন স্টেশনে। জিহাদ ও মাসুদ নামে। মাসুদ বলে, মনে হচ্ছে তোমার শরীর খারাপ? হাফিজ বলে, না, আমি ঠিক আছি। তবে মাথাটা খুব ব্যথা করছে। তুমি কি আমাদের সাথে যাবে না? যাবো। তবে...

জিহাদ বলে, ঠিক আছে, বাসায় চলে যাও। বুঝতে পারছি, তোমার শরীর খারাপ। সাবধানে থেকো। কাল কিংবা পরশু একবার এসো। প্রয়োজনে আমরা ফোন দেব। ঠিক আছে।

তাদের রাস্তা কিছুটা ভিন্ন। তারা বিদায় নিয়ে রিকশায় ওঠে। হাফিজও রিকশা নেয়। বাসায় পৌঁছে আবার ঘুমিয়ে পড়ে। বাড়ির সবাই জানে সে বন্ধুদের সাথে বেড়াতে গিয়েছিল। আসা-যাওয়া দীর্ঘ জার্নি। রুস্ত হওয়াই স্বাভাবিক। তারপরও রাতে খাওয়ার জন্য তাকে ঘুম থেকে তুলে মা। খাওয়ার টেবিলে বাবা বলেন, দেশটার কী যে হলো। খালি খুন। আজো সারাদেশে চারজন খুন হয়েছে।

বাবার দিকে চোখ তুলে তাকাতে সাহস পায় না হাফিজ। অথচ আগে তো কখনো এমন হয়নি। নিজেকে কেন যেন অপরাধী লাগে। তারপরও



বাবার দিকে আড়চোখে তাকায় হাফিজ। তার বাবার মুখেও চাপদাড়ি। তবে সেই লোকটির মতো নয়। খেতে বসেও সে ঠিকমতো খেতে পারে না। সবকিছু কেন এত বিষাদ লাগছে আজ! সে উঠে চলে যায় টিভি রুমে। গান-বাজনা, নাচ, নাটক-ফাটক, সিনেমা তো সে কবে থেকেই দেখা বাদ দিয়েছে। এসব দেখা একদম হারাম। কিন্তু খবর দেখতে তো তেমন দোষ নেই। সে একটার পর একটা চ্যানেল ঘুরিয়ে, সংবাদ খোঁজে। একটা চ্যানেলে সংবাদ পাঠ চলছে। আশ্রমের এই সেবায়োতের সঙ্গে কারো বিরোধ ছিল না। এলাকার লোকজনের সাথে কথা বলে জানা যায়, সে ছিল অত্যন্ত নিরীহ ও ভালো মানুষ। পরপোকারী। এত ভালো একজন মানুষকে কে বা কারা তাকে হত্যা করল, এটাই বিস্ময়কর। তবে পুলিশ সন্দেহ করছে, এটা কোনো ধর্মাত্মক জঙ্গি গোষ্ঠীর কাজ। হত্যাকাণ্ডের কারণ উদ্ঘাটন ও খুনিদের গ্রেপ্তার করতে সরকারের একাধিক গোয়েন্দা বাহিনী মাঠে নামছে। দেশের সর্বস্তরের মানুষ এই হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা জানিয়েছে। ময়নাতদন্ত শেষে সেবায়োতের লাশ আজ রাত্তাই গ্রামের বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়া হবে। সেখানে কাল তার শেষকৃত্য অনুষ্ঠিত হবে।

হাফিজ টিভির সামনে থেকে উঠে নিজের রুম চলে যায়। আলো নিভিয়ে শুষে পড়ে। ঘুম আসে না তার। চোখমুখ কেন যেন জ্বালাপোড়া করে। সে বেসিনে গিয়ে বেশি করে চোখেমুখে পানি দেয়। তারপর আরেকটা ঘুমের বড়ি খেয়ে শুষে পড়ে। পরদিন অনেক বেলা করে ঘুম থেকে ওঠে। মা বলেন, তোমার কি শরীর খারাপ, বাবা? তেমন কিছু না। দীর্ঘ জার্নি করে এসেছি। আরেকটু রেস্ট নিলে ঠিক হয়ে যাবে।

টিভিরুমে গিয়ে আবাবো বসে। খবর চলছে। আশ্রম সেবায়োতের লাশ একটা খাটিয়ায় তুলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তার জী আলুথালু হয়ে মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে চিৎকার করছে। কিছুতেই সে লাশটা চিতায় তুলে মুখে আগুন দিতে দিবে না। তার দুটো ছেলেমেয়ে পাশে দাঁড়িয়ে, বাবা, বাবা বলে হাউমাউ করে কাঁদছে। তাদের বেশভূষা দেখে মনে হয় তারা খুব গরিব। সেই সময় লাইভ দেখায় একজন তরুণ। মাত্র তিন হাজার টাকা বেতন পেতেন তিনি। সেই টাকায় তাদের সংসার চালাতে হতো। এখন এ পরিবারটি বড় অসহায়। চোখে অন্ধকার দেখছে।

হাফিজ টিভির সুইচ অফ করে রুমে এসে শুষে পড়ে। ভালো লাগে না। কিছু ভালো লাগে না তার। বস্তৃত লোকটির সাথে তার কিংবা জিহাদদের কোনো শত্রুতা ছিল না। তার আশপাশের কোনো মানুষের সে ক্ষতিও করেনি। সে ছিল খুব ভালো একজন মানুষ। এমন একজন নিরীহ মানুষকে কেন হত্যা করা হলো? সে কি কোনো ক্ষতি করেছে? বীনের? কী ক্ষতি করেছে? এভাবে মানুষ হত্যা কি খোদাতাআলা পছন্দ করে? বীন কি আদৌ কায়াম হবে কোনোদিন? মানুষ হত্যার মাধ্যমে শান্তি আসতে পারে না। সবই বিভ্রান্ত, ধূয়াশা; অলীক কল্পনা।

মোবাইল বেজে ওঠে হাফিজের। তাকিয়ে দেখে মাসুদ। কলটা রিসিভ করতে একদম ইচ্ছে করে না তার। লাইনটা কেটে দেয় সে।



গল্প

এক দিনের ব্যবধান

এলিজা খাতুন

ছোট কাকুর বাইক জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় গেটে এসে থেমেছে, সরসী পেছন থেকে ছোট্ট লাফে নেমে পড়ল। কাকু ভীষণ ব্যস্ত, অফিসের কাজে মুসীগঞ্জ থেকে সেই ভোর ৫টায় দুজন বাইকে করে রওনা দিয়ে এইমাত্র পৌঁছল। ফেরি পারাপারে দেরি হওয়ায় ১০টা বেজে গেছে। ক্যাম্পাসের ভেতরটার প্রাথমিক পরিচিতি দেয়ার সময় নেই, ফোনে অর্পব নামের ছেলেটাকে সরসীর ভর্তি নিয়ে কী যেন বললেন কাকু। ক্যাম্পাসের ভেতরে যেতে বলে বাইকের কান মুড়িয়ে ভাঁ শব্দ তুলে রিকশার স্রোতে মিশে গেলেন। দুপুর ২টায় নিতে আসবেন, হোস্টেলে তুলে দিয়ে আজই ফিরবেন নিজ কর্মস্থল মুসীগঞ্জে। অর্পবের সেল নাম্বারটাও দিতে চেয়ে কাকু ভুলে না দিয়ে চলে গেছেন, অবশ্য কিছুক্ষণের মধ্যেই কাকু তাকে

ক্যাম্পাসে আসতে বলেছেন। এসে থাকলেও খুঁজে নেবে কী করে? আগে কখনো দেখা হয়নি। কয়েক ধাপ ভেতরে এগোতেই পেছন থেকে ডাক—
সরসী... অর্পব বলছি... এই যে তোমার পেছনে আছি... (বোঝা গেল বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরেই ছিলেন উনি)।
সোজা প্রশাসনিক ভবনে গিয়ে ভর্তিসংক্রান্ত যাবতীয় ফরমাশিটি ম্যানেজ করছে অর্পব, অচেনা হয়েও কেমন আপনার মতো, অবাক হয়ে দেখছে সরসী। সেদিন দুপুরে ছোট কাকুর ক্যাম্পাসে ফেরা হয়নি, সরসীকে হোস্টেলে পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব অর্পবের কাঁধে চেপে বসে ফোনের মাধ্যমে। ডিপার্টমেন্টের কয়েকজন স্যারের সঙ্গে পরিচয় এবং ক্লাসরুম পরিচয় পর্ব শেষে ক্যাম্পাস থেকে অর্পবের সঙ্গেই বের হয়ে

এলো সরসী। ক্ষুধার আগুন ধিক ধিক জ্বলছে, কোন ভোরে দুটো টোস্ট আর কলা খেয়ে কাকুর বাইকে চড়েছে সরসী। অর্গবের পিছু পিছু হেঁটে, ছুটে, হালকা ঠেলাঠেলি সামলে, খানিক ক্লান্তি অর্জন করে বেশ কিছু দূর এগিয়েছে সরসী, সামনে একটা ভাঙাড়ি বাসের কাছে দাঁড়িয়ে ইশারা করল অর্গব, সরসীর হাত ধরে একরকম টেনেহিঁচড়ে বাসে তুলল। মিনিট দশেক দাঁড়িয়ে থাকার পর একটা সিট খালি হতেই সরসীকে আবার হাত ধরে টেনে সিটটি দখল করাল। পাশের মোটা লোকটির শরীর থেকে ঘাম ও সিগারেটের মিশ্র গন্ধ সরসীর খালি পেটের ভেতরে ঘূর্ণিঝড় তুলল, মাথার ভেতরেও ঘূর্ণিপাক শুরু হলো। তুমুল বেগে ‘ওয়াক’ শব্দ তুলে জলের বন্যা বইয়ে দিল সরসী, পেটে তো জল ছাড়া কিছুই নেই। মোটা লোকটা একটু ছিঃ ছাঃ শব্দ বার করলেও সরসীর ধবধবে মুখের দিকে তাকিয়ে চোখাচোখি হতে তেমন উচ্চবাচ্চ করল না আর। আধ ঘণ্টা কোনোভাবে যাওয়ার পর মোটা লোকটা নেমে গেছে, সরসীকে ইশারা করে জানালার সাইডে সরতে বলে অর্গব পাশের সিট নিল। সরসীর ঘাড় মাথা সোজা করে ধরতে পারছে না, সিটের পেছনে মাথা হেলান দিয়ে চোখটা বুজেছে, অল্পক্ষণের মধ্যে তন্দ্রাভাব আসতেই মাথা হেলে এসে অর্গবের কাঁধে ঠেকল। অর্গব আশপাশে না তাকিয়ে সোজা সামনে দৃষ্টি রেখে স্থির, দাঁড়িয়ে থাকা যাত্রীদের বেশির ভাগই ঘাড় ঘুরিয়ে, মাথা কাত করে, চোখ বাঁকা করে, কপাল কুঁচকে নিখুঁতভাবে দেখে ও বুঝে নিচ্ছে। একেকজনের এই দেখাটুকু একেকরকম ভাবনার জন্য দিচ্ছে। অর্গব চুপচাপ, মিনিট দশ পার হতেই হঠাৎ সরসী জানালায় মুখ বাড়াল, ঠিক সরসীর সোজাসুজি জানালার বাইরে দাঁড়িয়ে একটা মাঝবয়সী লোক হাঁ করে তাকিয়ে ছিল, যেন গিলে ফেলবে সরসীকে। ওয়াক শব্দ শুনেই সরে পড়ল, মনে হলো সরসীর এইবারের ‘ওয়াক’ খুব কাজে দিল। অর্গব সরসীর কপালে হাত রেখে মাথাটা জানালার বাইরে থেকে টেনে ভেতরে নিল। সরসী ছটফট শুরু করে দিল নেমে পড়ার জন্য, মাঝপথে নেমে যেতে হলো। নামার আগে একটুও খেয়াল করেনি অর্গব এত মেঘ জমেছে আকাশে, তাহলে হয়তো সরসীর নেমে যাওয়ার বায়না প্রশ্রয় পেত না। তা ছাড়া গন্তব্যের প্রায় কাছে এসে গেছে তারা, তবে হাঁটার পক্ষে বেশ দূর। এখানটায় রিকশা তেমন পাওয়া যায় না, কিছু দূর হেঁটে যদিও একটা পেল আবার অনেক পথ ঘুরে ঘুরে গন্তব্যে আসতে হবে। ঝিরঝির করে বর্ষার ফোঁটা বরতে লাগল, রিকশায় উঠে পড়ল দুজনে। সরসী শান্তির একটা নিঃশ্বাস ফেলল ছোট করে, ওর ক্লান্ত চোখমুখের ওপর দিয়ে চিকোন একটা বিদ্যুৎ চমকিয়ে হেসেখেলে মিলিয়ে গেল। বস্তৃত শান্তির প্রকাশ সব সময়ই সুন্দর ও সহজ হয়। অর্গব দুই পাশ থেকে মাথার ওপর রিকশার ছড় তুলে দিতেই সরসী কেনন সংকুচিত হলো, একটু ব্যবধান তৈরি করে পাশে সরে গেল। অর্গব বুঝেও না বোঝার ফ্রেমে আটকে রইল।

সরসী আনমনা, কী যেন ভাবছে, যে মানুষটা হাজার মানুষের ধাক্কা থেকে সরসীকে আড়াল করছে, সরসীর সবটুকু নির্ভরতা যে মানুষটির হাতের মুঠোয় বদ্ধ, যার কাঁধে সরসীর অচেতন ক্লান্তি হেলে পড়ে.... তার পাশে বসে দুজনের মাঝে এই দুই আঙ্গুল ব্যবধান খুব বেশি গুরুত্ব বহন করে কি? হঠাৎ অর্গবের প্রশ্নে সরসীর সম্মতি ফিরল—
এটুকু পথ বাসে উঠলে এ অবস্থা... কাল থেকে কলেজ করবে কীভাবে?
রিকশায় যাব...
এত নরম আর ভীতু হলে চলে নাকি!
আকস্মিক পিচের রোডের ছালচামড়া ওঠা ভাঙা অংশে রিকশা হেঁচট খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সরসীও সামনে ঝুঁকে পড়ছিল, অর্গব স্বাভাবিক স্বভাবে তার দুই হাতে সরসীর দুই বাহু আঁকড়ে ধরল। সরসী কাঁপছে... অর্গব আবার সোজা হয়ে বসল, কিছুক্ষণের মধ্যে ফার্মগেট আনন্দ-হৃন্দ সিনেমা হলের সামনে এসে পড়েছে, ছুঁড়েছড়ি ঠেলে নেমে পড়ল দুজনেই। মানুষের স্রোতে এই মেয়েটির হাত না ধরলে হোস্টেল পর্যন্ত পৌঁছাতে আরো দুই দিন লেগে যাবে। ফুটওভার ব্রিজ পার হয়ে, ফুটপাথের ভিড় ঠেলে তেজগাঁও কলেজের পেছনে হোস্টেলের গেট পর্যন্ত ছাগলের গলার দড়ির মতো করে সরসীর হাত ধরে টেনে এনেছে অর্গব। বিকাল ৩টায় হোস্টেলের রেডি খাবার আশা করা যায় না, অর্গব দুটো কলা, এক পিস কেক, এক প্যাকেট স্নাইস পাউরুটি কিনে সরসীর হাতে ধরিয়ে দিল। কপালে উক্ষুক্ষু চুল ছড়ানো ক্লান্ত চোখে ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে হাত বাড়িয়ে প্যাকেটটি নিল সরসী, চলে যেতে অগ্রসর হতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল—
আপনি আর আসবেন না?
মাথা খারাপ? মেয়েদের হোস্টেলে ঢোকা বারণ। তাহলে?
সোজা দোতলায় উঠে যাও, বাঁ দিকের রুমে প্রথম সিটটি তোমার জন্য নেয়া আছে, ব্যাগপত্র ওখানাই সব রাখা।
শুকনো মুখে সরসী উত্তর দিল—
আচ্ছা।
আর কোনো অসুবিধা?
সরসী স্নান মুখে শুষ্ক ঠোঁটে যেন জোর করে একটা স্মিত হাসি টেনে বলল—
না।
অর্গব ক্ষণিকেরই পথের বাঁকে হারিয়ে গেল।
আবারো ফোন নামারটা নিতে ভুলে গেল সরসী, একটু কৃতজ্ঞতাও জানানো হলো না... নিস্তেজ শরীর আর অবসন্ন মনে এসব ফরমালিটি চট করে আসে না বোধহয়। থাক... না হয় কাল ভার্শিটিতে দেখা হলে কিছু একটা বলবে।
অর্গবও নিজে থেকে ফোন নামার দিল না, কী জানি হয়তো— পথের শেষ প্রান্তে এসে একটা সুস্বপ্ন অভিমান জন্য নিল ওই দুই আঙ্গুল ব্যবধান।
পরদিন খুব সকালে সরসী স্নান সেরে হোস্টেল ডাইনিংয়ে নাশতা খেয়ে ভার্শিটিতে যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছে। সাদা রঙের একটা ড্রেস পরেছে, ভেজা চুলগুলো পিঠের ওপর ছড়ানো।

স্নানের পর শুভ রঙের পোশাকে ভীষণ স্নিগ্ধ দেখাচ্ছে সরসীকে। বেশ কয়েকবার আয়না দেখে নিচ্ছে, সে কি অর্গবের সঙ্গে দেখা হওয়ার অব্যক্ত অবাধা আকাঙ্ক্ষায়? অধীরতায় সিন্ত সরসীর চোখের কোণে অর্গবের মৌন মুখখানা একঝলক উঁকি দিল যেন। রিকশা করেই রওনা হলো। প্রায় ৪০ মিনিট লেগে গেল বিশ্ববিদ্যালয় গেটে পৌঁছাতে। গেটের ভেতরে পা রাখতেই ক্যাম্পাসের মধ্যে শোরগোল শোনা গেল। কিছু দারি-দাওয়ার স্লোগান নিয়ে একটি মাঝারি আকৃতির দল এগিয়ে আসছে। সরসী মাঝপথ থেকে সরে পথের ধারে দাঁড়াল। স্রোতের মতো মিছিল পাশ কেটে সরে যাচ্ছে। মিছিল থেকে ছিটকে সরসীর সামনে এসে অর্গব বলল—
সরসী! আমাকে হয়তো আটকে ফেলবে ওরা... আমি জানি এখানকার পুলিশ সুপারের সঙ্গে তোমার কাকুর খুব ভালো সম্পর্ক, তাকে ফোনে আমার কথাটা জানাও।
এ কথা বলেই অর্গব মিছিলের পেছনের সারিতে আবার মিশে গেল। মিছিলটা গেটের বাইরে যেতেই হঠাৎ কয়েকটা বিকট শব্দ।
ফোন করে কাকুকে জানাল অর্গবের কথা। ছোট কাকুর উত্তরে সরসী হতবাক—
বাদ দে তো... ওসব নিয়ে মাথা ঘামাস না... কাকু! ছেলেটা গতকাল আমার জন্য...
বুঝলি না! গতকাল ছেলেটা যা করেছে, তা আজকের সুবিধা নেয়ার জন্য। ঠিক আছে রাখ... ব্যস্ত আছি।
সরসী কিছু বুঝে ওঠার আগেই আবার কয়েকটা বিকট শব্দ, এবারের শব্দ অন্যরকম। নীরব হয়ে আসছে চারদিক, মিছিলের শব্দ নেই আর। কী ঘটছে, কেন ঘটছে, কিসের মিছিল— সরসীর পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। অন্যায় কোনো দাবি? ন্যায়ের জন্য লড়াই? না কি অন্যায়ের প্রতিবাদ? কোন পক্ষে কারা? দুই পক্ষের ব্যবধানে দোদুল্যমান সরসী প্রাচীরের ভেতরে দাঁড়িয়ে দেখছে— প্রাচীরের বাইরের কয়েক ছাত্রের দৌড়ছুট। রক্তাক্ত দেহে কেউ কেউ উঠে কোনোভাবে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। একটু দূরে কেউ যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে, মনে হচ্ছে পরিচিত। রাস্তা পার হয়েই দেখল, কপালে রক্তমাখা অর্গবের মুখ। ততক্ষণে রাস্তা ফাঁকা। অর্গব হাত উঁচু করে কী যেন বলতে চাইল। কোনো রিকশা, গাড়ি, ট্যাক্সি দেখতে পাচ্ছে না সরসী। দু-একটা করে আসছে, পাশ দিয়ে শাঁ করে ছুটে সরে যাচ্ছে। অর্গবকে কোনোভাবে ধরে ভিক্টোরিয়া পার্কের কাছাকাছি সরিয়ে নিল। অর্গব ঢুলুঢুলু দৃষ্টিতে অনুভব করছে— গতকালের দেখা ভীতু আর নরম প্রকৃতির সরসী আজ এতটা নিভীক! ঘড় ঘড় করে একটা সিএনজি পাশ কাটিয়ে যাওয়ার আগেই সরসী সামনে এগিয়ে হাতের ইশারায় থামতে বলল। সিএনজি থামল, তবে ড্রাইভার গাড়ি থেকে নামল না। সরসী অর্গবকে পাঁজা করে ধরে ওঠাল। সিএনজি বাতাসের বেগে চলছে হাসপাতালের উদ্দেশ্যে। গাড়ির শব্দ, ধোয়ার গন্ধ, বমিভাব, ভয়-সংকোচ এসব কিছু বেশ দূরত্ব রেখে নিঃশব্দে সরে গেছে সরসীর থেকে। সরসীর কাঁধে ব্যবধানহীন ভর দিয়ে অর্গব অচেতন।



গল্প

অভিবাসীর অভিযাত্রা

দিলরুবা আহমেদ

প্রচণ্ড জোরে ব্রেক কষে গাড়ি থামালেন শাদ ভাই। আরিফ চেয়ে দেখলো, রাজহাঁস। সামনে দিয়ে অনেকগুলো রাজহাঁস রাস্তা পার হচ্ছে, যেন মিছিল করে রাস্তা পার হচ্ছে ওরা। ইউনিভার্সিটি হিল এরিয়া। চারদিকে লেক। এক লেক থেকে হাঁসেরা দল বেঁধে আরেক লেকে যাচ্ছে। শাদ ভাই হাত তুলে দেখালেন একটি সাইনবোর্ড। লেখাই রয়েছে তাতে ধীরে যেতে হবে। কারণ যেকোনো সময় হাঁসেরা রাস্তা পার হতে পারে। তারা পারও হচ্ছে এখন, রাজারানির মতন, হেলে দুলে। যেন জানে সব যান দাঁড়াবে তাদের জন্য, দানব বলে কিছু নেই এই রাজহাঁসগুলোর মনে, বনে, রাজ্যে, অভিধানে। আরিফের হাসি পেয়ে যায়। শাদ ভাই বললেন,
: কোথাও কোথাও আছে কাঠবিড়ালের জন্য

সতর্কতা। কী বুঝলেন?
আরিফ কিছু না বলে মুখ টিপে হাসলো।
: আর স্কুলের বাচ্চাদের জন্য তো স্কুলের আশপাশে থেকে শুরু করে সর্বত্র পারাপারের স্বর্গরাজ্য। স্পেশাল ব্যবস্থা ওদের জন্য। হলুদ সাইনবোর্ডে লাগানো আছে দুটো বাচ্চার হেঁটে যাওয়ার ছবি। বাচ্চারা ওই সাইনবোর্ডের নিচে দিয়ে নিরাপদে পার হয়ে যায়। আরো আছে আরিফ সাহেব, আরো আছে, স্কুলের বাসগুলো যখন থামে, বাচ্চা নামাতে, লাল রংয়ের একটা স্টপ সাইন বোর্ড বাসের বাম দিকে খুলে দেয়। বাসে কোনো হেলপার থাকে না বাসের কাঁধে চাপড় মারার জন্য বা স্টপ সাইনটা ধরে দাঁড়ানোর জন্য। অটোমেটিক স্টপ সাইনটা খুলে যায়। দরজাও অটোমেটিক খুলে সুইচের চাপে। আর ওই

রাস্তার উপর থাকা সব গাড়ি সঙ্গে সঙ্গে থেমে যায়। স্টপ সাইন ঢুকিয়ে নেয়ার সুইচ টেপা না পর্যন্ত সবাই দাঁড়িয়ে থাকবে। স্টাচু।

: বাহ্ বেশ ভালো তো।
আরিফ শাদ ভাইয়ের নাতিনীর্ঘ বর্ণনা বা ভাষণ শুনে খুশি হয়ে উঠে। যদিও এতো ছোট নোয়াকে সে একা বাসে যেতে দেবে না, হোক সেটা স্কুল বাস, তারপরও যেতে দেবে না। তবে অন্য বাচ্চাদের কথা ভেবে আনন্দিত হচ্ছে। মেঘার থেকে শুনেছে তাদের অ্যাপার্টমেন্ট এবং আশপাশের অনেক অ্যাপার্টমেন্টেই অনেক বাচ্চা আছে যারা ১১/১২ বছর বয়সেই স্কুলবাস থেকে নেমে একা একা বাসায় যায়, দরজা খুলে, খালি ঘরে একা একা অপেক্ষা করে পিতামাতার জন্য। বাবা-মা দু'জনাই তখন কাজে। খুবই ইনলিগাল কাজ, পুলিশ ধরতে পারলে সোজা জেলে ভরবে। তারপরও জীবিকার তাগিদে অনেকেই এটা করছে। চাইল্ডকেয়ার সেন্টারে রাখাটাও তো অনেক পয়সার ব্যাপার। আরিফ ভাবে মেঘাকে দিয়েও বাচ্চা স্কুল থেকে আনা নেয়ার জন্য সহসা ড্রাইভিং টেস্ট দেয়াতে হবে।

গাড়িটা আবার থামিয়েছেন শাদ ভাই। এবার মানুষের বাচ্চারা দলবেঁধে রাস্তা পার হচ্ছে। একটা বুড়ি মতন মহিলা স্টপ সাইন বোর্ড হাতে রাস্তার ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন, স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের রাস্তা পার করছেন তিনি।

শাদভাইয়ের দিকে আরিফ চাইতেই উনি বললেন,
: এরা আশপাশের লোকালয় থেকে আসে। হাঁটা যাত্রী। এদের জন্য শুধু স্কুল শুরু আর ছুটির সময় আশপাশের কয়েকটা মোড়ে ফোল্ডিং চেয়ার আর ক্যাপসহ ওই বুড়ি বা বুড়াদের দেখা যায়। এ কাজটা খুব সম্ভবত বুড়াবুড়ি ছাড়া আর কেউ পারে না, কথাটা বলে শাহেদ ভাই নিজেই হাসলেন। আরিফ খুব অবাক হচ্ছে দেখে শাদ ভাই বললেন,
: আরে বিশ্বাস করেন আমার কথা। পুরা ডালাস ঘুরাবো একদিন আপনাকে, একটা যদি জোয়ান লোক পান যে এই কাজ করছে তাহলে সঙ্গে সঙ্গে আমি যাকে পাই তাকে বিয়ে করে ফেলবো, প্রমিস।
আরিফ হা হা করে হাসতে লাগলো।
: আরে হাইসেন না ভাইরে ভাই। এদেশে বাচ্চাদের এতো রকমের কেয়ারের ব্যবস্থা দেখে সত্যিই মনে হয় ১০/১২টা বাচ্চার বাবা দুই দিনে হয়ে যাই।

: করে ফেলুন না একটা বিয়ে।
এবার শাদ ভাই চুপ করে থাকলেন। আরিফও চুপ।

এত নতুন পরিচয়ে আর বেশি কিইবা জিজ্ঞেস করা যায়।
প্রবাসের পড়শী, পাড়াতো, প্রবাসীর প্রতিবেশী আরেক প্রবাসী, এভাবে শাদ ভাই এই প্রবাসীর ভাই, এনার সঙ্গে পরিচয়ও আরিফের অরেক প্রতিবেশীর মাধ্যমে। পরোপকারী। এতো অল্প পরিচয়ে এতো বিশাল এক সাহায্যের হাত উনি বাড়িয়ে দিয়েছেন যে বুঝতেই পারা যাচ্ছে, দেশি ভাইদের কোনো বিকল্প নেই। ‘যেতে হবে বহুদূর’— এই স্লোগানে বিশ্বাসী, পরিশ্রমও করেন উদয়াস্ত।

তবে তার মাঝে সময় করে জনসেবা করেন। আরিফ ভাবে এই পৃথিবীতে কত রকমের মানুষই না আছে। নতুন পরিচয় অথচ মিশে গেছেন তাদের সঙ্গে অনেক আপন হয়ে। বয়স কত হবে আর! এই ৩৩/৩৪। তবে বহুবিধ টেনশনের জন্য আরেকটু বেশিই দেখায়। নিজেই বললেন,
: ইনলিগ্যাল হলে অনেক ঝামেলা। বিয়ে তো মহা এক ঝামেলা। কবে লিগাল হবো তারপরে বিয়ে। আরিফ পথ দেখালো, বললো,
: আপনার তো পথ খোলাই আছে, আপনি আনমেরেড, সিটিজেন কাউকে বিয়ে করে লিগাল হয়ে যান।
: হু, সেটাই শেষ ভরসা। দেখি কি করি। কিন্তু যাকে ভালোবাসি সে মত দিচ্ছে না। সে রাজি হলেই এখানে একটা বিয়ে পরে দেশে আরেকটা, কি বলেন, পরিকল্পনাটা কেমন?
: বলেন কি? ডবল মার্ভার।

: না থ্রিপল। আমিও তো মরছি। আপনি কি ভাবছেন দুই রমণী আমাকে আন্ত রাখবে? হা হা।
: তাহলে কি করবেন?
: দেশের জন রাজি হলে এখানে বিয়ে। তারপর গ্রিনকার্ড হলে এখানের জন রাজি হলে একে ডিভোর্স করে ওকে বিয়ে।
: ভাই, আপনি সবুজ কার্ডের জন্য লাল কার্ড খাবেন।

: লাল-সবুজের বাংলাদেশ। হা হা হা। লাল-সবুজ বললেই বুকে বাজে বাংলাদেশ। থাকুক সে ওই দেশে, আমি এখানে। পরবাসী। দুজন দুইদেশে। প্রবাসী উদাসী মন আমার।
শাদ ভাইয়ের অদ্ভুত মুখভঙ্গি আর লম্বা লম্বা নীর্যশ্বাস ফেলার ভঙ্গীমায় আরিফের যদিও হাসি পেয়ে যায় তারপরও হাসি চেপে বলে,
: দেশেই না হয় চলে যান।
: খাব কি? বাতাস?

আরিফ এবার বেশি কিছু বললো না, হাসলো, বললো শুধু ‘তাই তো’। কিন্তু বুঝলো, যতই লাভ/ভালোবাসা থাকুক দেশ ও দেশের জন্য আর সেই একজনের জন্য, লাভ (Love) মার খাচ্ছে বাস্তবতার কাছে। লাভ (ভালোবাসা) মার খাচ্ছে লাভের কাছে। লোভের কাছে। আলোচনার মোড় ঘুরাতেই যেন শাদ ভাইকে আরিফ তাড়াতাড়ি বললো,
: চলুন তাহলে, গাড়িটা দেখা আছে কিনে নেই। টাকা অবশ্য ওদের দিয়েই রেখেছি। আর এক বাংলাদেশির পুরাতন গাড়ি। এখন শুধু গিয়ে ডেলিভারি নেয়া।

: তাই চলুন, গাড়ি আনতে যেতেও তো না হলে আরেকদিন আরেকজনকে বলতে হবে। ডালাসের এই যোগাযোগ ব্যবস্থাটা খুবই বাজে। গাড়ি ছাড়া খোড়া।
: হ্যাঁ, তাই।
শাদ ভাই গাড়ি ছুটালেন।
আরিফ জানে তা, বাসা থেকে বের হতে হলে, হয় গাড়ি বা পা ভরসা। বাস-ট্রেন দুই চারটা, আর ট্রাম, পাতাল রেল, সাবওয়ে কিছই নেই। যা আছে এটা ওটা তা বহুদূরে। ওখানে যেতে আসতেও একটা কিছু বাহন লাগবে। টেক্সি চাইলে তাদের ফোন করতে হবে। রাস্তার মোড়ে গিয়ে দাঁড়ালে

তাদের দেখা মিলবে না। ফোন না হয় করা হলো, কিন্তু এতো খরচ পোষাবে না নিত্যদিনের জন্য। বাসা থেকে বের হয়ে মাঝে মাঝে তারপরেও হাঁটা দিয়ে এদিক ওদিক গেছে। যে গরম তাতে হাঁটাও বেশ কষ্টকর। এখানের প্রতিটি বাসাতে এসি-হিটার যেমন অবধারিত গাড়িতেও অপরিহার্য। না হলে গরমে সিদ্ধ বা শীতে বরফ হয়ে জমে থাকতে হবে। একেই বুঝি বলে চরম ভাবাপন্ন জলবায়ু। একা একা হাঁটতে গিয়ে এক ধরনের বিষণ্ণতাও ঘিরে ধরে। কোথাও কেউ নেই। একজন মানুষ একা একা হাঁটছে। পথ হারালেও জিজ্ঞেস করবার কেউ নেই, যে বলে দেবে কোথায় সে। মাঝে মাঝে রাস্তার পাশের বাড়িগুলো থেকে কুকুর ঘেউ ঘেউ করে উঠে। ভেবেছে নিশ্চয়ই কুকুরটা একি দৃশ্য দেখছে সে। একা একা ওটা মানুষের মতন কি যেন একটা হেঁটে বেড়াচ্ছে না!!! সে নিশ্চয়ই কখনো কাউকে হাঁটতে দেখেনি। কাটবিড়ালীগুলো চমকে চমকে থমকে থমকে তাকে চেয়ে চেয়ে দেখেছে বহুবার। চারদিকে ছড়ানো কাঠবিড়ালীর রাজত্ব। হয়তো বা ২০২৫ বা ২০৩১-এ অবস্থা এমন আর থাকবে না। চারদিকে তখন এতো ধরনের যানের ঢল থাকবে যে মানুষকে বললেও বিশ্বাস করবে না কতটা সুনসান নীরবতা ছিল আমেরিকার বিশালতার দিক দিয়ে দ্বিতীয় বিশাল এই রাজ্যটিতে।

আজ সকালেই আরিফ ড্রাইভিং টেস্ট দিতে গেল। ভোর পাঁচটায় লাইন দিয়েছে। গাড় অঙ্ককার তখন। সঙ্গে ছিলেন শাদ ভাই। একবারে রোড টেস্ট-এ কেউ পাস করে না এই তার ধারণা। হয়তো বা আরিফকে অ্যাডভান্স সাল্লনা দিয়ে আশ্বস্ত করে রেখেছেন, আসতে হবে আরো কয়েকবার। ঘাবড়াইয়ে মাত। এখানে অনেক বাংলাদেশিকেই দেখেছে কথার আগে পিঠে হিন্দি-উর্দু বলে মজা পায়। বিবিধ কালচারের প্রভাব।

কিন্তু আরিফ ড্রাইভিং টেস্ট-এ পাস করলো। ‘you pass’, পাশে বসা মহিলা পুলিশটি গম্ভীর মুখে যখন বললো কথাটা, আরিফের ইচ্ছে করছিল খুশীতে লাফিয়ে উঠতে। কিন্তু ভাবলেশহীন মিসরের পিরামিডের মতন মুখের ওই মহিলাটির দিকে চেয়ে ইচ্ছেটা দমন করলো।

কিন্তু দূরে উৎকর্ষা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা শাদ ভাইয়ের দিকে চেয়ে আরিফ যে হাসিটা দিল তাতেই শাদ ভাইয়ের বুকে ফেলার কথা কেল্লা ফতে। বুঝেছেনও হাত দুটো উপরের দিকে তুলে ঘাসের উপর সজোরে একটা লাফ দিলেন তিনি। এই লাফটাই আরিফ দিতে চেয়েছিল। পিরামিড দেখে চুপসে গিয়েছিল। শাদ ভাই কাজটুকু করে দিলেন।
আরিফ এতো বছর ধরে গাড়ি চালাচ্ছে। তারপরও ড্রাইভিং টেস্ট নিয়ে এতোজনের এতো কথায় তার বড় উৎকর্ষা ছিল। মনে মনে ভাবলো, মেঘাকে একটা ফোন করে জানানো দরকার। এখান থেকে বাসার দূরত্ব প্রায় ২৫ মাইল। বাসায় পৌছাতে সময় লাগবে। আজ ড্রাইভিং লাইসেন্স পাওয়াতে ভালোই হলো। গাড়ি কিনে নোয়াকে নিজেই স্কুলে টেস্ট দিতে নিয়ে যেতে পারবে। এখন শুধু ড্রাইভিং

লাইসেন্স দেখিয়ে ইন্স্যুরেন্স করতে হবে। ইন্স্যুরেন্স ছাড়া আবার রাস্তায় গাড়ি বের করার সমস্যা আছে। ভাবতে ভাবতে আরিফ ফোন ঘুরায়,
: হ্যালো, মেঘা?
: পাস করেছো, না? শোকর আলহামদুলিল্লাহ।
: তুমি জানো!
: জানবো না কেন? আমি জানতাম তুমি পাস করবে। আরিফ মেঘার হাসির শব্দ শুনতে পায়।
: ইন্স্যুরেন্সটা কি করবো? ফুল কাভারেজ? না লায়াবেলিটি।
: পাগল, পুরাতন গাড়ি। ১৭০০ ডলারের গাড়ির জন্য আবার ফুল কাভারেজ।

খাজনার চেয়ে বাজনা বেশি। লায়াবেলিটি করো। কাউকে তুমি ধাক্কা দিলে শুধু তার খরচটুকুই ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি বহন করবে।

: ওকে, তুমি নোয়াকে নিয়ে রেডি থেকো। গাড়িটা ফেরার সময়ই নিয়ে আসবো। ওর টীকা আর ESL-এর টেস্ট দিয়ে দেব আজকেই।
: আচ্ছা ঠিক আছে।
মেঘা ফোন রেখে দিয়েছে।

বাসায় আসতেই নোয়া গাড়িটা দেখে, আমার গাড়ি আমার গাড়ি, বলে কয়েকবার চোঁচালো। রংটা আকাশি। ওর অবশ্য আরো পছন্দ হতো যদি এটা বেগুনি হতো। গাড়িটার একদিকে অ্যাকসিডেন্টের দাগ আছে।

নোয়া ওটা দেখে কিছু বলল না। মেঘার মনটা খারাপা হয়ে গেল। বুকের ভেতর কেমন যেন খচ খচ করতে লাগলো। ঢাকায় শশুরের গাড়ি দুটোর কথা মনে পড়লো। মার্ক-টু আর পিক-আপ। বাবা জানলে কি বলবে তার এতো আদরের ছেলে ভাঙা গাড়ি চালাচ্ছে!!
: এই, কি হলো। গাড়ি পছন্দ হয়েছে।
: তুমি কি এই অ্যাকসিডেন্টের দাগ দেখেছিলে আগে।

: নয়তো ১৭০০ ডলারে গাড়ি পাব নাকি? আরিফ হাসছে হা হা করে। বললো,
: চলো বেরিয়ে পড়ি। চলো চলো।
অ্যাপার্টমেন্ট থেকে নামালো আরিফ গাড়ি নিয়ে রোডে। পাশে মেঘা বসা। সিট বেল্ট লাগলো। নোয়াও পেছনের সিটে সিট বেল্ট লাগিয়ে বসে গেছে। আরিফ একটানে গাড়ি হাইওয়েতে তুলে ফেলল। ৬০ মাইল স্পিডে গাড়ি ছুটছে। আবাসিক এলাকার ভেতরে ৩৫ মাইল স্পিড, এখানে ডবল। ধাই ধাই করে গাড়ি ছুটছে। কোথাও কোনো ট্রাফিক পুলিশ নেই। শুধু সাইন, সিগনাল, সিগনাল লাইট।
: প্রথম দিনেই হাইওয়েতে উঠার কি দরকার ছিল। সার্ভিস ওয়েতে যেতে।
: ট্রাফিক লাইট, সিগনাল প্রচুর থাকে সার্ভিস ওয়েতে। বিরক্তিকর। আরিফ খুব খুশীতে আছে।
: অবশেষে রাস্তায় গাড়ি বার করলাম।
: ওমা এমনভাবে বলছো যেন অনেক কষ্টের ধন। মাত্র তিন-চার সপ্তাহের মাথাতাই লাইসেন্স

পেয়েছো, এদেশে আসতে না আসতেই পেলে। যাই হোক শোকর আলহামদুলিল্লাহ। ম্যাকারথার রোড ধরে গাড়ি ছুটছে। এসি চলছে। বেশ গরম বাহিরে। রাস্তায় রাস্তায় বিভিন্ন জায়গায় পিলারে দেখাচ্ছে দিনের তাপমাত্রা ১০০। সময়ও দেখাচ্ছে। গাড়ির ভেতরে Cool Cool, Ice, Ice। কথাটা নোয়ার। কিন্তু আরিফ মনে মনে কয়েকবার কথাটা আওড়ালো।

আমেরিকার বুকে আরিফের গাড়ির চাকা ঘুরছে। কোথায় বাংলাদেশ আর কোথায় আমেরিকা। মানচিত্রে দুদেশের অবস্থান চিত্তা করে মেঘা পুলক বোধ করে। কোথা থেকে কোথায় মানুষ চলে যায়। মানুষও আন্তে আন্তে পাখি হয়ে যাচ্ছে। একটা সময় আসবে সবাই নিজেই একটা করে হেলিকপ্টার থাকবে। তখন আর চলতে হবে না। উড়বে। পাখি-পক্ষীর সঙ্গে ধাক্কা খায়ে অ্যাক্সিডেন্ট হবে।

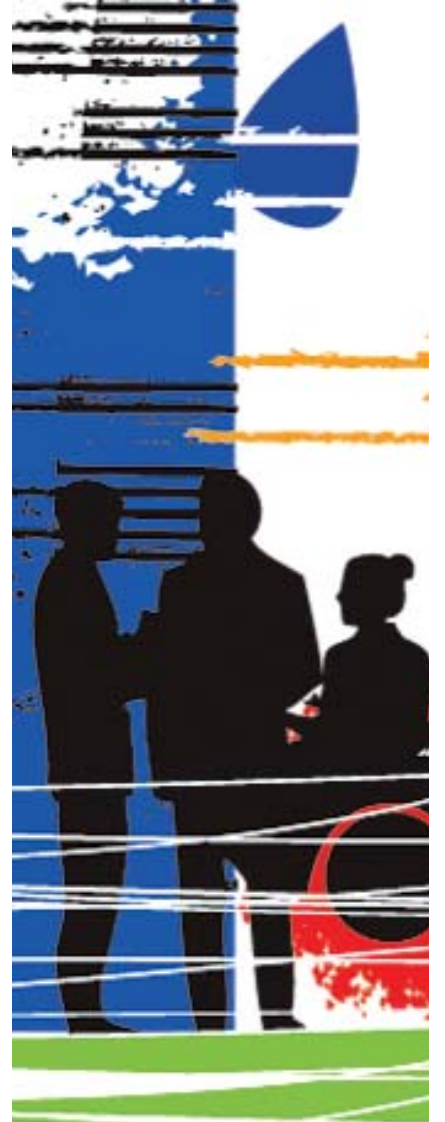
মেঘার থিওরি শুনে হো হো করে হাসতে হাসতে গাড়ির স্পিড আরো বাড়িয়ে দিল।
: আন্তে চালাও।
মেঘা সত্যক করে। টিকিট খেলে বুঝাব মজা। আরিফ কিছুই শুনবে না আজ। মনের আনন্দে সে গাড়ি চালাচ্ছে। একেবারে নোয়ার টেস্ট সেন্টারে এসে থামলো।
ESL টেস্ট-এর অধিকাংশ পাবলিকই মেক্সিকান। স্পেনিশ ভাষায় বহু কথা তারা বলে যাচ্ছে। মেঘা কিছুই বুঝতে পারলো না। এদেশে মেক্সিকানদের বেশ দাপট। প্রচুর সুযোগ সুবিধা তাদের দেয়া হয়। টেকসাসের ২য় ভাষাই হচ্ছে স্পেনিশ।

নোয়াকে পাশে নিয়ে একটা চেয়ারে বসে রইল মেঘা। আরিফ লাইনে দাঁড়িয়ে কাগজপত্র জমা দেয়ার জন্য। সহসাই নোয়ার ডাক পড়লো, সে চুপচাপ মিসের সঙ্গে পরীক্ষা দিতে ভেতরের রুম চলে গেল। মেঘা ভেবেছিল পাঁচ বছরের নোয়া হয়তো একা যেতে চাইবে না। কিন্তু সে গেল। আরিফ বললো,
: দেখলে, নোয়া কি সুন্দর চলে গেল।
: হ্যাঁ, সে একা চলতে শিখা শুরু করেছে।
: তোমার তো আনন্দের সঙ্গে কথাটা বলা দরকার। একা চলতে শেখা সবারই দরকার। দেশের সবাইকে ছেড়ে আমাদেরও একা চলা শুরু। আরিফের কথায় দুঃখ দুঃখ ভাব থাকায় মেঘা তাড়াতাড়ি বললো,
: আর নিজে যখন একা একা রাস্তায় হাঁটতে তখন। বলে মেঘা নিজেই হি হি করে হাসতে থাকে, আরিফ ও হাসিতে যোগ দেয়।
: সেটা খুবই ডিমোরালাইজিং ছিল। সবাই ছুটছে গাড়িতে আর আমি একা হাঁটছি। কোথাও কেউ নেই। একলা হাঁটরে। চিন্তার করা যায় না। ডালাসে কেউ হাটে না। নিউইয়র্কে হাটো ওখানে হাটা যায়।
: আরিফ, মাত্র দুই তিন সপ্তাহ তুমি হেঁটেছো, কিছু তাতেই এতো দুঃখ। নবাব সলিমুল্লাহ।
: সমস্যাটা হাঁটা নিয়ে না, একা হাটা আর সবার সঙ্গে হাটা নিয়ে। আচ্ছা বাদ দাও, তোমার সঙ্গে

কি নবাব সলিমুল্লাহর কোনো বিবাদ ছিল। কেউ একটু আয়েশ করলেই তুমি বলো নবাব সলিমুল্লাহ। মেঘা ঝুঁ নাচিয়ে বললো: আমার দাদার সঙ্গে ছিল, হু।
কথাটা শুনে আরিফ হাসতে লাগলো।

আরিফের খুব ভালো লাগছে সা সা করে গাড়ি ছুটিয়ে বেড়ানোর অধিকার পাওয়াতে। পা-বিহীন জীবন আর ডালাসে গাড়িহীন জীবন একই কথা। শিকল পড়া জীবন যেন। স্বাধীনতা বিহনে কে বাঁচিতে চাহে রে!! আরিফ চোঁচিয়ে বলতে চাইলো এবার আমি জয় করবো। এবার আমি ছুটবো নতুন এক মহাদেশে। এলাম, দেখলাম, জয় করলাম, Veni, Vidi, Vici।

রাস্তায় নামা না পর্যন্ত শুরু হয়নি যেন এই নতুন মহাদেশে নতুন এক অভিবাসীর জীবনের রানওয়েতে ছুটেতে শুরু করা।





প্রবন্ধ

শুকনো মাটি কিংবা স্নিগ্ধ কাফুরের দ্রাণ

সৌম্য সালেক

এলোমেলো হওয়া স্বাভাবিক কেননা ক্রমাগত চর্চায় এ বিষয়ে আমরা এখন বেশ মানিয়ে গেছি। এ ছাড়া অশ্রু আর রক্ত পরিধি এতই বিস্তৃত যে বিষয়টি গোচরে নিলে হয় তাত্ত্বিক হতে হবে না হয় আইনজ্ঞ; কিন্তু অধিকাংশের যেহেতু বিষয়টা অবশ্যপাঠ্য নয় সুতরাং আমরা যা ইচ্ছা বলতে পারি। একজন পাগল যখন দ্রুততার সঙ্গে বলতে থাকে আমরা কিন্তু বাতুলতা বলে এড়িয়ে যাই এবং বিব্রত বোধনে পদক্ষেপ নিই অথচ কী চমৎকারভাবে সে এসব জানে এবং প্রক্ষেপণ করে কিন্তু আমরা বলতে পারি না যে তার মস্তিষ্ক এখনো অক্ষম। আর যাই হোক রক্তপাত কিংবা

অশ্রুপাত বেশিদিন বিলম্ব করে না তাহলে অন্ধকার ছেয়ে দিত চরাচর যেমন দিনকে রাত আক্রমণ করে। মৃত্যু এলেই জীবন থেমে যাবে না কেননা একটা নতুন জন্মের লক্ষণ এখানেই নিহিত। অবশ্য ক্ষণিকের জন্য আহতরা সন্তোষে পর্যুদস্ত হয়ে পড়ে কখনো বা অবিশ্রান্ত হয়ে ওঠে; হাবিলের মৃত্যুতে প্রাচীন মানুষ যেমন হয়েছিল— ‘এ কী রকম কথা, সে ঘুমিয়েছে আর সে কিনা জাগার সক্ষমতা একেবারেই হারিয়ে ফেলল।’ এখানে ভয়াবহ হাহাকার খেলা করে কিন্তু মৃত্যুর ছোবল যখন এগিয়ে আসে সে কিন্তু নিরীহ প্রাণীর মতো চেয়ে থাকে। এদিকে মৃত্যুকামীদের একজন

এক বিচিত্র প্রস্তাব নিয়ে রাজ্যশাসকের নিকট এলো— ‘একটা দৌড় প্রতিযোগিতা কি হতে পারে যেখানে বিজয়ীর পুরস্কার হবে মৃত্যু।’ সভাসদ আপনার মতোই সেদিন হেসেছিল এবং প্রশ্ন বিদ্রোপে তাকে তাড়িয়ে দিল। কেন সে এমন প্রস্তাব করবে যেখানে মৃত্যুর উপযুক্ত রসদ নিয়ত তার চারপাশে খেলা করে। আসলে এ এক রহস্যবোধন যেহেতু পথিক জানত আত্মঘাতীরা নিরাপদ নয় কেননা মৃত্যুকে তার অধিকার থেকে সে বঞ্চিত করেছে। অবশ্য প্রেমকে তার স্বচ্ছন্দে এগিয়ে দিতে হবে এতে যদি রক্তক্ষরণ বেড়ে যায়, সংযম পালাতে লাগে সেটাই হবে চরম অভিজ্ঞান এবং উপযুক্ত পথ যে পিয়াসুরা নন্দলোকের দিকে যাবে। আমাদের সামনে যে পথটি সব থেকে অগম এবং দুর্বোধ্য কাঁটায় আকীর্ণ একদল সেদিকে ফিরে গেছে। একগুচ্ছ মেঘ ওদের ভিজিয়ে দিলে নিশ্চিহ্ন বনানী ভেদ করে এগিয়ে আসে রৌদ্র, শুষ্ক নিশিথে কাকজোসনা ওদের স্বপ্ন আশিস আর লুকনো ঝর্ণা এমন স্নিগ্ধ আরাম। তারপর ঈশানে আলোক দিলে এরা প্রার্থনা করে গোখুলি-আলোর মতো মিলে যেতে এবং অনুকূল পরিধির ঘুম চেয়ে আর ভেসে যেতে আরক্ত গোলাপের স্রোতে। এরমধ্যে নানারকম কাজে এবং তর্কে আমরা ভালোমতোই জড়িয়ে পড়লাম এবং যার যার গন্তব্যে পৌঁছতে না পৌঁছতে বিকৃতি আর বিসম্বাদ এমনভাবে ছেয়ে ফেলল চরাচর যেন এখনই নিভে যাবে আলো। কিন্তু না না করে সকালের ঠাণ্ডা হাওয়া যখন আমাদের অভ্যর্থনা জানানো এবং সৌরালোক পৌঁছে যাচ্ছিল তামাম রক্তে তখন বুঝলাম এটা নতুন দিন আর আরেকটা নতুন পৃথিবী আমাদের বানাতে হবে অন্তত নতুনের কথা ভেবে। আবাদজীবীরা ঈশট আরেকবার শানিয়ে নিল গাছেরা কোমরে গাঁথে নিল কান্তে এবং কৃতকর্মের রত হলো নগরের কর্মীরা। আমরা দেখলাম কর্মচাপে কীভাবে ভারী হয় পৃথিবী কিন্তু যেহেতু নতুন মুখে আরো কিছু সুন্দর মেখে দিতে সবই নিয়োজিত তাই সবারই ফেরার তাড়া আছে। সবার জন্য যেহেতু আশ্বাস উপযুক্ত না তাই গৃহিণীদের একজন দেখল এগিয়ে আসছে কজন মানুষ এবং গৃহকর্তার মৃতদেহ। তারপর রাতের আক্রমণে সূর্য পরন্তু হলো কিছু চিংকার ভেসে আসছে বাতাসে ভর করে নিশ্চয়ই বেশি দূর এগিয়ে যাবে না কারণ আগামীর আহ্বানে সবাই ঘুমিয়ে পড়বে আর সঠিক সময় ভেবে শিকারিরা যাবে পাখির অন্বেষণে...

(২)

এবং শিশুরা যখন একেকটা তীর হয়ে বেরিয়ে আসে, মাতৃজঠর যাকে আড়াল করতে অক্ষম তখন পিতারা সাক্ষাৎ ধানুকির মতো দৃষ্টি ফেলে কেননা স্থলিত তরল নিয়ে তারাই উপস্থিত ছিল আর মায়েরা আবৃত করে দেহ কিছুক্ষণ যা ছিল সবুজ মাঠ যেখানে হাওয়া দিলে ফসল কেঁপে ওঠে এবং তারা এগিয়ে যায় এক বুক ভালোবাসার সংযম নিয়ে। পর পর দিনাতিক্রমে ওরা হয়ে ওঠে আরো বেশি নমনীয় একজন কুমারী যে কথা ভাবতেই পারে না আসলে

আমরা তো তাকেই ‘মা’ বলে ডাকি। এখন উত্তাল উর্মির মতো যা কিনা প্রবাহ লঙ্ঘনে পারদর্শী আর শক্তিশালী একটা গল্প এসে গেছে। বৃদ্ধার ছেলেটি আরো বেশি বৃদ্ধ; তবে এটা খুব সম্ভব কেননা মৃত্যুর সবাই বুড়িয়ে গেছে যদিও তাদের পূর্ববর্তীরা এখনো বর্তমান। যতটা তার বয়স বরং নানা প্রকার বিমার তাকে আরো বেশি আড়ষ্ট করেছে এখন সে শয্যাশায়ী মৃত্যুর প্রহর গুনছে কারণ যাবতীয় শূন্যতা তার ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। মা’টি এখন নিরুপায় হয়ে এমন কোনো পথ খুঁজছে যা তার সন্তানকে আরো কিছ দিন বাঁচিয়ে রাখে। সে প্রায়ই গমন করত অদূরবর্তী অরণ্যে যেখানে আছে লুকনো ঝর্ণা লোকচক্ষু এখনো যাকে উদ্ভাবন করেনি। প্রায়ই পরিজনরা তাকে খুঁজে পেত না আসলে সে যেত ঝর্ণা জলে শুদ্ধ হয়ে নিতে। বৃদ্ধার এতসব খবর নিতে লোকেরা সক্রিয় ছিল না কেননা সমাজে তার প্রয়োজন খুবই কম। তিনি ভাবলেন মৃত্যু যদি আসে তবে ছেলের মৃত্যুকে আমি এই নির্জন অরণ্যে একান্তভাবে প্রত্যক্ষ করব আর বিলাপ করব আকাশের সীমানা ছাড়িয়ে উত্তর-ঈশানব্যাপী কখনো যা লোকালয়ে সম্ভব নয়। এক গভীর নিশিতে ছেলেকে বললেন ‘চল বাছা’। নিরন্তর বড়ু ছেলেটা মায়ের সাহায্যে চলতে লাগল— আরো ধীরে ধীরে। গহিন অরণ্যের দিকে বুড়ি পা দিল এবং ছেলেটা চমকে উঠলে তিনি বললেন— ‘তোমার জীবনের জন্য মা কী কম মমতাময় বাছা?— একটু আশ্বাস রাখো এবং আমার সঙ্গে চলো; যদি তুমি বুঝ মা তোমাকে সেদিন আরো বেশি করুণ ও নিরুপায় পেয়েছিল।’ অত্যন্ত শ্রম-শান্তি বিনিময়ে ওরা গড়ে নিয়েছে পর্ণকুটির যেখানে আরামের জন্য তারা পিঠ রাখবে যদিও একটা মৃত্যু তাদের চারপাশে অনবরত ঘুরপাক খাচ্ছে। ভোর হলো এবং শুষ্ক পাতার ফাঁক দিয়ে যখন সামান্য আলো কুটিরের ছিদ্র ভেদ করে এগিয়ে এলো একটা অনুকূল মুগ্ধতা নিয়ে বৃদ্ধা তখন বেরিয়ে পড়লেন আহরস্বরূপ কিছু ফল কিংবা পুষ্পমধুর খোঁজে। এবং দিন শেষে খুব সামান্য কিছু নিয়ে যখন তিনি ফিরে এলেন; দেখলেন পাখিদের বিচিত্র কূজন তার পুত্রকে বিছানা ছাড়াতে বাধ্য করেছে এবং সে কি জানি দেখছে একমনে। ঝর্ণা স্নান এবং সামান্য ফলাহার দিনে দিনে ছেলেটির দেহটিকে যখন খানিকটা উজ্জ্বলতা দিল বৃদ্ধা তখন তুলে ধরলেন উর্ধ্বহাত; কিছু শব্দ পৌঁছে যাচ্ছে বনানীর পার থেকে পারে— ‘হে প্রভু, হে অরণ্যধিপতি একবার পাশ ফের, ফিরে চাও।’ দিন যেতে থাকে আর মৃত্যু যেন এই পর্ণকুটির থেকে ভিন্ন দিকে দৃষ্টিপাত ছোড়ে। একদিন বৃদ্ধা ভাবলেন মৃত্যু কীভাবে আসবে যেহেতু পাপ কিংবা কলুষ প্রবেশের পথ এখন থেকে অনেক দূরে। মৃত্যু তো জানে নানারূপ কুটিল আছর, শ্রম-শ্রান্তি এবং অনাগ্য ইচ্ছার মধ্যে মানুষের সমাপ্তি লুকনো। যেখানে গ্রীষ্মের খরতাপ নানা রং, ফুল ও পাতারা শুয়ে নেয় আর আপার সুষ-মারা নেচে ফেরে। যেখানে বর্ষাজল স্নিগ্ধ করে রুক্ষভূমি এবং শান্ত করে পাখিদের প্রাণ। ভেজা বাতাসের সঙ্গে এখনো শরতের শেফালিরা দুলে ওঠে, কথা কয় ভ্রমরের সঙ্গে। শুদ্ধতার নিবিড়

শান্তি হয় যখন হেমন্ত ছুটে এসে মৌন করে পতঙ্গ শরীর যেন তারা এইমাত্র জীবনের বর পেল। শীত ও শিশির কণা যখন পদ্মপাতায় কেলাস কিংবা কনকের মতো স্বচ্ছ হয়ে ওঠে তখন এখানে বসন্তের আগমনী তোলে মধুর কোকিল। তারপর ঝর্ণা ছুটে চলে, নাচে পাখি, ফুল ফোটে— নগ্ন শাখায় জাগে নতুন পত্র জীবন এখানে জীবনের মতো মনোময়। এভাবে চলতে থাকে ঋতুপর্বের গোপন আবর্তন এবং তার সঙ্গে নিসর্গের নিবিড় শূন্যতা; একদিন বৃদ্ধা আবছা আবছা দেখলেন বিশুদ্ধ বাতাসের স্পর্শে দোল খাচ্ছে ছেলের চুলগুলো পূর্ণ জীবনের ছোঁয়ায় সে পবিত্র আজ। প্রকৃতই তিনি এখন বৃদ্ধ হয়েছেন এবং মেনে নিচ্ছেন জীবনের ভার। দুদিন পর ছেলেটি এগিয়ে এসে বলল— ‘মা আমি কিছু সন্তান রেখে এসেছি লোকালয়ে তারা যে কতকাল পিতৃহীন।’ পর্ণকুটির থেকে বহুদূর পথ চিনে চিনে বৃদ্ধা নতমুখ এগিয়ে এলেন বনানীর এক প্রান্তে এবং একহাত উর্ধ্ব তুলে অন্য হাতে পুত্রের কপাল স্পর্শ করে বললেন— ‘যাও বাছা, পুত্রদের জীবন শিখাও এবং আগামী দিনের জন্য আজকের কাজটি ফেলে রেখ না।’ এখন তিনি তাকিয়ে আছেন সন্তানের গমন পথে এবং দুই ফোঁটা অশ্রু যখন কুঁচকানো বুকের মধ্যে পড়ল আমরা কী শিউরে উঠব না। হায়রে মাতৃপ্রেম! আশ্চর্য কাকে বলে একজন অশীতিপর চোখ মুছল আর পাখর ফেটে গেছে লাফিয়ে ছোট নদী। ছেলে কি কিছুই বলেনি? হ্যাঁ, যা সম্ভব নিশ্চয়ই তাই বলেছে কিন্তু অরণ্যগামিনী পর্ণকুটির আর শৈলসঙ্গমে নতপদ বিজনে ফিরে গেছে।

(৩)

যা কিছু সত্য এবং গূঢ় আমরা তার সবটুকু এখনো শুনতে পাইনি আর দর্শনে যারা প্রাচুর্যপ্রাপ্ত বর্ণনার উপযুক্ত শব্দ তারা আগেই হারিয়েছে; আসলেই আমরা স্পষ্ট ধাঁধার মধ্যে পাক খাই এবং ক্রীড়ানক হিসেবে ব্যবহৃত বস্তু যেখানে অধিকাংশই বৃহৎ নকশার প্রগোদনায় চর্চিত হচ্ছে। আমি আমার বিষয় থেকে অনেক দূর সরে এসছি; কিন্তু কীভাবে আমি কলম ঠিক রাখি যখন কঠিন অরণ্যের ফাঁকে স্বপ্নরত বীজ মুক্ত বায়ুর স্বপ্ন দেখে আবার কোনো ঐশ্বর্যাশালিনী যখন হেরেমের ভিতর তার একমাত্র মেয়েশিশুটি হারিয়ে বসে। যদি তখন বিশুদ্ধ সঙ্গীত না বাজে তা কিন্তু কবির একান্ত অক্ষমতা বৈ কিছু নয়; তখন নিসর্গ নরম সুরে কাঁপে, পাখি তার নিরপেক্ষ সুরে গায় এবং তটিনী আরো বেশি ক্ষয়ে ক্ষয়ে বিষণ্ণ বেগ পায়। আমরা কি একথা বলতে পারি না যে বিশুদ্ধ সঙ্গীতগুলো বিষাদ এবং তাবৎ হর্ষ বিলোলসহ ঐকতান তোলে এবং তখন তা বাণী, সুর, লিঙ্গ আর ব্যক্তি নিরপেক্ষ। খোয়ালি রাখাল যখন একটি মেঘ হারিয়ে বিপাকে পড়ে এবং বাকিদের সন্ধানবার কথা ভেবে অপরাধে শীর্ণ নদীতে পা ফেলে তখন অন্ত কিনারে সঙ্গীত জেগে ওঠে বেদনা এবং আশ্রাসের— ‘বিরস দিন বিরল কাজ প্রবল বিদ্রোহে এসেছে প্রেম, এসেছে আজ কী মহাসমারোহে ...যেখা যে রয় ছাড়িল পথ ছুটালো ওই বিজয় রথ

আঁখি তোমার তড়িতবৎ ঘনঘুমের মোহে।
তখন শিপ্রানদীর অন্যপারে বেজে ওঠে নিসর্গস্নাত
পরম রাগিণী— শৈল তলে ঠিকরে পাড়ে আলো
আর বনবাসী বালিকাটি গেয়ে চলে, মুখে তার
লৌহফুল রেণু—

‘সারাদিন অনেক ঘুরে দিনের শেষে
এসেছি সকল চাওয়ার বাহির দেশে
নেব আজ অসীম ধারার তীরে এসে
প্রয়োজন ছাপিয়ে যা দাও সেই ধনে’

আবৃতযুগের উড্ডীনলীলার কথা ভেবে
স্পর্শকাতর প্রাণ অস্থির হয়ে ওঠে এবং বাঁশিয়াল
যখন ফুঁ দেয় তা কী বিচ্ছেদের চিৎকার কিংবা
পাখা-ঝাপটানি ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে?
শিশুটি স্বপ্নাকাশে উড়ে যায় আমরা তখন
সান্ত্বনার কথা ভেবে কারণ খুঁজতে লাগি। মায়েরা
তাদের স্বামীর কাছে নানারূপ স্বপ্নের কথা বলে
মমতা ভিন্ন যার ভিন্ন কোনো অর্থ হয় না এবং
পিতাটি আরো বেশি মুখর হয়ে ওঠে আর কামনা
করে দুঃস্বপ্নের মতো যেন কোনোদিন মৃত্যু
এগিয়ে না আসে। কিন্তু না, সব স্বপ্ন এবং
সম্ভাবনার মধ্যে এগিয়ে আসে ছোঁ; মৃত্যু— যার
কোনো ভাষা নেই, তর্ক নেই। পিতার এ কান্না
বেশি দূর ছড়িয়ে পড়বে না বাতাসের মতো
কেননা লোকেরা ব্যস্ত আছে, যথেষ্ট আশা তাদের
এখনো অবশিষ্ট। তারপর ভোর এলো এবং স্বভাব
প্রাত্যহিকতায় সে আলো পৌছে গেছে বিষণ্ণ
গহটির খাপে খাপে। মেয়েটা খুব পড়তে শিখবে,
পিতার বিরূপ মুহূর্তে বুলিয়ে দেবে মায়া, রংভুলি
কিনে দেব এবং বাপ-মেয়ে বেরিয়ে পড়বে বহু
দূর এসব বিচ্ছিন্ন স্বপ্নগুলো আজ মুখ খুবড়ে পড়ে
আছে। ‘মা, মা গো, সোনা আমার’ বলে চিৎকার
করছিল মেয়েটির মা। একজন এসে যখন তার
মাথায় হাত বুলিয়ে বলল— ‘আহা শান্ত হও,
একটু শান্ত হও কাঁটায় চোট লাগবে যে;
তোমাকে বাঁচতে হবে মা, শান্ত হও।’ চোঁচামেটির
ঘোরে সে বলল— ‘যার জন্য স্বপ্ন দেখেছি এত
সাধ এত আশা, সে চলে গেছে; আমার এ কাঁটার
কী মূল্য আছে, কী মূল্য আমার জীবনের।’ বস্তৃত
অবচেতনভাবেই লোকেরা এই ধারণা পোষণ
করে— যুগ যুগ ধরে নতুন মানুষের সঙ্গে নিজের
অবস্থান টিকিয়ে রাখার একমাত্র উপায়— সন্তান;
যেমন নতুন সংস্করণ নিয়ে পুরনো পুস্তকগুলো
বার বার ফিরে আসে। বিস্তর বিলাপের পর এবার
সে শান্ত হয়েছে ঠিকই কিন্তু শান্ত হয়নি অশ্রু—
অবোধ প্রস্রবণ। এখানে যেন সম্ভাবনার সবটুকু
আলো নিভে গেছে যদিও এতক্ষণে সূর্যটি ভালোই
তাপ দিচ্ছে। খনন শেষে গোরখোদকেরা ফিরে
এলে একজন বলে উঠল— ‘প্রার্থীরা তাড়াতাড়ি
আসুন, আসুন— বেশ বেলা হয়ে গেছে’। প্রথম
পুরুষটি ছিল তার পিতা— ছুঁয়ে দেখলেন শুকনো
মাটি গুহাঘরের গোপন আবহাওয়া যার একমাত্র
সন্ধান এখানে যা সবচেয়ে শূন্যবস্ত্রের নিচে
লুকনো এবং তার ওপর গুচ্ছ গুচ্ছ স্নিগ্ধ কাফুর
তাকে খানিকটা গন্ধ ধার দিল। এ এক বিচিত্র
ঘ্রাণ যা কিনা ছড়ানোর সক্ষমতা রাখে না; এ
এক বিচিত্র পরশ যার কোনো অনুভূতি নেই— সে
কেবল ব্যাখ্যাটুকু জানে...





মডেল : অনামিকা



ঈদ ফ্যাশন

ঈদের ঐতিহ্য শাড়ি-পাঞ্জাবি

অনামিকা লিপি

ঈদের পুরনো ঐতিহ্য শাড়ি-পাঞ্জাবি। শাড়িই বাঙালি নারীর দৈনন্দিন জীবনের প্রধান অনুষ্ঙ্গ হয়ে আসছে দীর্ঘদিন থেকে। উৎসব-আয়োজনে শাড়ি ছাড়া অন্য কিছু ভাবতেই পারে না বাঙালি নারী। পাঞ্জাবি ছাড়া পুরুষের ঈদ! ভাবাই যায় না। ঈদে সবার চাই নতুন পাঞ্জাবি। এবারের ঈদ বাজারে দেশি এবং ভারতীয় দু'ধরনের শাড়ির ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। এক সময় টাঙ্গাইল, রাজশাহী সিল্ক, কাতান, বেনারসি ও জামদানি শাড়িতে এর ব্যবহার সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে মানুষের জীবনমান উন্নত হলে মানুষ নিত্যনতুন শাড়ি খুঁজতে থাকে। নানা রঙের বৈচিত্র্যময় শাড়িতে নিজেকে সাজাতে অভ্যস্ত হন বাঙালি নারী। ঈদ উৎসবকে আরো বেশি আনন্দময় করে তুলতে ঈদে চাই নতুন নতুন পাঞ্জাবি। ঈদে তারুণ্যের প্রথম পছন্দ খাটো

পাঞ্জাবি। তরুণদের কথা চিন্তা করে অন্যমেলা তরুণ প্রজন্মের জন্য নিয়ে এসেছে খাটো পাঞ্জাবি। রঙের বিন্যাসের সঙ্গে সঙ্গে নকশায়ও ভিন্নতা থাকছে হাল ফ্যাশনের খাটো পাঞ্জাবিতে। অন্যমেলায় ঈদ উপলক্ষে মেশিন ও হ্যান্ড এমব্রয়ডারি, কারুচুপি কাজের বাহারি, অ্যান্ডি সুতি, সুতি সিল্ক কাপড়ের সব পাঞ্জাবি বাজারে নিয়ে এসেছে। ফ্যাশন হাউস সাদাকালোর ডিজাইনার তাহসিনা শাহীন জানান, সাদাকালো সবসময় ঈদে নতুন ডিজাইনের পাঞ্জাবি নিয়ে আসে। এবারো সাদাকালোতে ফ্যাশনসচেতন পুরুষের কথা চিন্তা করে সাদাকালো রংয়ের মিশ্রণে পাঞ্জাবি বাজারে নিয়ে এসেছে।

ফ্যাশন হাউস আড়ং ঈদের নতুন ডিজাইন ও বাহারি রঙের পাঞ্জাবির পসরা সাজিয়ে বসে। এবার ঈদের

জন্য নতুন ধরনের নকশায় তৈরি ঐতিহ্যবাহী ও আঁটসাঁট পাঞ্জাবি এনেছে আড়ং। নতুন নকশার পাঞ্জাবিগুলোতে অক্সিজেন মটালে তৈরি বোতামের ব্যবহার হয়েছে। আড়ং এমব্রয়ডারিতে অলঙ্কৃত জমকালো ঈদের পাঞ্জাবি পাওয়া যাচ্ছে। এসব পাঞ্জাবিতে ছোট-বড় কলকা বা পেইজলি মোটিফের ব্যবহার করা হয়েছে। এ ছাড়া আছে কাফলিঙ্কসহ পাঞ্জাবি। এসব পাঞ্জাবিতে নতুনত্ব আনার জন্য হাতে কাফলিঙ্ক বোতামের ব্যবহার হয়েছে। আড়ং ফ্যাশন হাউসে ঈদে কাটিং, ভেরিয়েশন, নানা ধরনের কলার, অফ হোয়াইটসহ বিভিন্ন রঙের মসলিন, সিল্ক, তসর, অ্যান্ডি ও সুতি কাপড়ে নকশা করা সব পাঞ্জাবি পাওয়া যাচ্ছে।

বাঙালি নারীর কাছে জামদানি শাড়ির আবেদন চিরকালীন। লালবাগ থেকে বসুন্ধরা সিটি কমপ্লেক্সের টাঙ্গাইল শাড়ি কুটিরের শোরুমে জামদানি শাড়ি কিনতে এসেছেন আফরোজা নাসিম। তিনি বলেন, ‘এবার ঈদে বেশ গরম থাকবে, তাই অন্য শাড়ির চেয়ে জামদানিই সবদিক থেকে স্বস্তিদায়ক। এর যেমন রয়েছে অভিজাত্য, তেমন এ শাড়ি মানানসই ও আরামদায়ক।’ দেশি তাঁতশিল্পের বিকাশে টাঙ্গাইল শাড়ি কুটিরের স্বত্বাধিকারী মুনীরা এমদাদের (১৯৮২ সাল থেকে কাজ করছেন) রয়েছে বিশেষ ভূমিকা। তাতে তৈরি টাঙ্গাইল, জামদানি, সিল্ক, হাফসিল্ক, জুট কাতান, মসলিন, মির-পুরি কাতান সবই পাওয়া যায় তাদের শোরুমে। প্লেনবডি শাড়ি ছাড়াও সুতা বা জরি দিয়ে বিভিন্ন বুটি, বল, ফুল, লতাপাতার ব্যবহার দেখা যায় কিছু শাড়িতে। তাদের কন্ট্রাস্ট রংয়ের শাড়িগুলোর রয়েছে বিশেষ সৌন্দর্য। আর তাদের জামদানি শাড়ির রয়েছে বিশুজোড়া খ্যাতি।

অভিজাত ও রুচিশীল ক্রেতা জানেন আড়ংয়ের রয়েছে বিশাল কালেকশন। কী নেই সেখানে? কাতান, জামদানি, সিল্ক সবই রয়েছে। সব শাড়ি বৈচিত্র্য ও নান্দনিক

সৌন্দর্যে ভরপুর। অঞ্জন’স পনের বছর ধরে কাজ করছে। তাদের ১৪টি শোরুমে সিল্ক, এন্ডি কটন, মসলিন, হাফসিল্ক শাড়িতে হাতের কাজ, এমব্রয়ডারি, অ্যাপ্লিক, কারচুপির কাজগুলো যে কারো দৃষ্টি কাড়ে। বিভিন্ন নকশি কাজে পুঁতি ও চুমকির ব্যবহারের সৌন্দর্য আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। ফুল, লতাপাতা, প্রজাপতি, পিঠার নকশা, তারাফুল ইত্যাদি লোকজ মোটিভও তারা ব্যবহার করেছে শাড়িতে। দাম ৪ থেকে ৩০ হাজার টাকা পর্যন্ত। সাদাকালো শুরু থেকেই গর্জিয়াস শাড়ি তৈরি করে। মসলিন, কাতান, সিল্ক এবং জামদানিতে অ্যাপ্লিক, কারচুপি ও ব্লক করা হয়েছে। এরা থিম বেইজ কাজ করে। এর আগে ছিল পাখা, তারা, জ্যামিতিক, ঘণ্টার ডিজাইন। এবার বাহারি পাতা, গোলাপ ও সূর্যমুখী ফুলের থিম নিয়ে করা শাড়িগুলো হয়ে উঠেছে অনন্য। দাম ৩ থেকে ১৫ হাজার টাকা পর্যন্ত। অন্যমেলার শাড়িগুলো মূলত গাঢ় রঙের। শাড়ির পাড়ে লেস বসিয়ে জমিনে জমকালো এমব্রয়ডারি করা হয়েছে। দাম ৭ হাজার ৭০০ থেকে ১৫ হাজার টাকা পর্যন্ত। বিবিয়ানার রয়েছে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। সিল্ক, কোটা শাড়িতে অ্যাপ্লিক, এমব্রয়ডারি, হাতের কাজ ও স্কিন প্রিন্ট করা হয়েছে। এতে চুমকি, পুঁতি ও জরির পাড় ব্যবহার হয়েছে। দাম ৩ থেকে ৬ হাজার টাকা পর্যন্ত। রঙ বরাবরই বৈচিত্র্যময় কাজ করে। তাদের শোরুমেগুলোতে খুব এক্সক্লুসিভ শাড়ি পাওয়া যাচ্ছে। বর্গিল রঙের শাড়িগুলোর ফেব্রিক্স মূলত মসলিন, এন্ডিকটন এবং সিল্ক। এতে কাটওয়াক, এমব্রয়ডারি, কারচুপিসহ নানা ধরনের জড়োয়া কাজগুলো নান্দনিকতায় অসাধারণ। এর দাম ৩ থেকে ১৫ হাজার টাকা পর্যন্ত। এ ছাড়া ড্রেসডেল, মায়াসীর, কে ক্র্যাফট, নাগরদোলা, তহুস ক্রিয়েশন, প্রবর্তনা, চরকা, বাংলার মেলা, ফড়িং, মাস্তা, বিশাল বুটিকস ইত্যাদি হাউসে বিভিন্ন ডিজাইনের জমকালো শাড়ি পাওয়া যাচ্ছে। ভারতীয় শাড়িগুলোর মধ্যে কাতান, সিল্ক, ক্রেপ সিল্ক, সবসময় চলে। তবে ঈদে গর্জিয়াস শাড়ির চাহিদা বেশি। সিল্ক বা জর্জেট শাড়িতে কারচুপি, অ্যান্টিক, জুয়েলারি ও স্টোনের কাজ বেশি চলেছে। তবে সৌন্দর্য ও আরামের জন্য অনেকেই রেশমের শাড়ির প্রতি আগ্রহী। পাঁচ-ছয় বছর আগে চুমকি, জরির কাজ বেশি ছিল। এখন এর চল অনেক কমে গেছে। আকর্ষণীয় রং এবং গর্জিয়াস ডিজাইনের জন্য ইদানীং জুট কাতানেরও চাহিদা বেড়েছে। মেরঙ্গ, ক্রিম, কালো, সবুজ, অঞ্জন’স-এর ঈদের পাঞ্জাবিতে এবার ভিন্নমাত্রার কাপড়ের পাশাপাশি ডিজাইনে নতুনত্ব আছে। সুতি, অ্যান্ডি সুতি, অ্যান্ডি সিল্ক কাপড়ে এমব্রয়ডারি, ব্লকপ্রিন্ট করে পাঞ্জাবি করা হয়েছে। ক্রেতাদের চাহিদার কথা চিন্তা করে খাটো ও লম্বা দু’ধরনের পাঞ্জাবিই পাওয়া যাবে এবারের ঈদে। বাংলার মেলায় ঈদের আনন্দকে আরো রাঙিয়ে দিতে জয় সিল্ক অ্যান্ডি, খাদি, সুতি, তাতে নিজস্ব বুননে ডবি মাল্টি স্ট্রাইপে লং, মিডিয়াম ও শর্ট পাঞ্জাবি পাওয়া যাচ্ছে। ফ্যাশনেবল তরুণদের জন্য ফ্যাশন হাউস বাংলার মেলা ঈদে ফুলেল, জ্যামিতিক নকশার কারচুপি, মেশিন এমব্রয়ডারি, কাঁথা স্টিচ, ভরাট কাজ করে খাটো পাঞ্জাবিতে। এসব খাটো ডিজাইনের পাঞ্জাবিতে ব্যবহার করা হয়েছে নানারকম কাট ও নকশার। এ ছাড়া পাঞ্জাবির ভিন্নধর্মী কাজ থাকছে গলায় ও হাতে। জামদানি শাড়ি ডিজাইন এবং রঙের দিক থেকে আগের চেয়ে এখন অনেক বেশি আধুনিক হয়ে উঠেছে। আগে কয়েকটি রং পাওয়া গেলেও এখন সব ধরনের রঙের জামদানি পাওয়া যায়। জামদানি মূলত তিন রকমের। সুতি, হাফসিল্ক ও ফুলসিল্ক। এর মধ্যে ফুলসিল্ক খুব পাতলা বলে চলে না। হাফসিল্ক বেশি চলে। সুতি জামদানি বাসায় ধোয়া যায়। হাফসিল্ক কাটা করে পরতে হয়। জামদানির মূল সৌন্দর্য লুকিয়ে থাকে এর পাড়ে। নানা রঙের সুতা দিয়ে তৈরি করলা, শাল, গাছ, শামুক তেজরি, দুবলা শিকড়, কাঁকড়া তেজরিপাড়গুলো খুবই জনপ্রিয়। এ শাড়ি অনেক দোকানে পাওয়া গেলেও কিছু দোকান শুধুই জামদানি বিক্রি করে। ঢাকা জামদানি মেলা, জামদানি গার্ডেন, জামদানি কর্নার, জামদানি কুটির ইত্যাদি দোকানের শোরুমে রয়েছে বিশাল আয়োজন। গরমে ভারি শাড়ির পরিবর্তে হালকা ডিজাইনের গর্জিয়াস শাড়ি অনেক আরামদায়ক হবে। জাঁকজমক কাজ দেখে যাই কিনুন না কেন, সেটা জীবনযাপনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কিনুন। যে অনুষ্ঠানে যেটা মানানসই সেই পরিবেশ অনুযায়ী শাড়ি পরা ভালো। এমন শাড়ি কেনা উচিত, যা আপনার চলাফেরায় বামেলা সৃষ্টি করবে না। সন্তান ছোট থাকলে এ ধরনের জমকালো শাড়ি কেনার সময় লক্ষ্য রাখুন চুমকি ও জরি যেন না থাকে। কেননা এসব শাড়ি তাদের জন্য অস্বস্তিকর। রঙের বিষয়ে সচেতন থাকুন। শুধু ভালো লাগে এমন নয়, যে রং আপনাকে মানাবে সে রঙের শাড়ি কিনুন। জাঁকজমক শাড়ির সঙ্গে সাধারণত ব্লাউজ পিস থাকে। তবে সেটা পছন্দ না হলে কাপড় কিনে ব্লাউজ বানিয়ে নিতে পারেন। যে ফেব্রিক্সের শাড়ি সেই ধরনের ফেব্রিক্সের ব্লাউজের কাপড় কেনার চেষ্টা করুন। নইলে দেখতে খুব খারাপ লাগবে। আবার সোনালি-রূপালি ব্রোকেট বা কাতান কাপড়ের ব্লাউজ পাওয়া যায় সেটাও পরতে পারেন। অনেক সময় এক রং কাপড়ের ব্লাউজ বানিয়ে এর মধ্যে ম্যাচিং করে লেস বা এমব্রয়ডারির বুটি দিয়েও পরতে পারেন। দেখতে আকর্ষণীয় লাগবে। তবে বিদেশি শাড়ির বিশাল বাজারের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আজকাল দেশীয় ফ্যাশন হাউসগুলো অনেকদূর এগিয়ে গেছে।



শিল্পী সুজন মাহাবুব

SUNMOON®

সানমুন টেইলার্স

প্রাঃ লিঃ এ

এখন সব

ধরনের পাঞ্জাবি

তৈরি করা হয় ।





ঈদের সাজসজ্জা

ঈদে ত্বকের যত্ন

কানিজ আলমাস খান

এই ঈদে যারা স্যালনে গিয়ে ফেসিয়াল করতে পারবেন না; তারা চাইলে বাড়িতে বসেই ফেসিয়াল সেরে নিতে পারেন। যদিও ত্বকের একটা বয়সে তাকে প্রফেশনালের সাহায্য নিতেই হয়। যদি এমন হয় যে কোনো ভাবেই স্যালনে যাওয়া সম্ভব নয়, তখন আপনি এভাবে হোম ফেসিয়াল করে ত্বককে কিছুটা হলেও তৈরি করতে পারেন। ঈদের দিনে নিজেকে সুন্দর রাখার জন্য এবং ঈদের দিনের মিনিমাম মেকাপটুকু মুখের ত্বকে পারফেক্টলি বসার জন্য বাড়িতে এই যত্নটা অবশ্যই করা প্রয়োজন; নয়তো হাজার মেকাপের পরেও আপনাকে নিষ্প্রভ দেখাতে পারে।

ফেসিয়াল করার জন্য আপনার প্রয়োজন হবে

ক্লিনজার,
এক্সফোলিয়েটিং স্কাব,
গরম পানি, পাতলা কাপড় ও বড় তোয়ালে,
ত্বকের ধরন অনুযায়ী মাস্ক,
টোনার,
ময়েশ্চারাইজার।

ফেসিয়াল স্টেপস

প্রথমে উষ্ণ পানির ঝাপটা দিয়ে ভালোভাবে মুখ ধুয়ে নিন। এরপর ক্লিনজার লাগিয়ে আঙ্গুলের ডগা দিয়ে নিচ থেকে উপরে এবং বাইরে থেকে ভিতরে সার্কুলার মুভমেন্টে ২-৩ মিনিট ম্যাসাজ করুন। এরপর ভেজা নরম কাপড় দিয়ে মুখ মুছে নিন। এবার ভালো মানের এক্সফোলিয়েটিং স্কাব চোখের

তাওছিফ বেনারশী ফ্যাশন

শাড়ীর জগতে একটি আধুনিক ও অনন্য নাম এখানে কাতান, ধুপিয়ান, বেনারশী, বিয়ের কাতান, জরজেট, পিওড় কাতান, কাঞ্চিবরণ, লিলাম্বরী জামেওয়ার্ক চেন্নাই সিল্ক, ব্যাঙ্গালর সিল্ক ও সময় উপযোগী শাড়ী পাওয়া যায়।



সেকশন-১০, ব্লক-এ, সেন-২,
বাড়ী-১২/এ, গেট নং-১, মিরপুর
বেনারশী পল্লী, পল্লবী, ঢাকা-১২১৬
মোবা : ০১৯৩০০১৯৬৬২

তাওছিফ বেনারশী ফ্যাশন -২

শাড়ীর জগতে একটি আধুনিক ও অনন্য নাম এখানে কাতান, ধুপিয়ান, বেনারশী, বিয়ের কাতান, জরজেট, পিওড় কাতান, কাঞ্চিবরণ, লিলাম্বরী জামেওয়ার্ক চেন্নাই সিল্ক, ব্যাঙ্গালর সিল্ক ও সময় উপযোগী শাড়ী পাওয়া যায়।



সেকশন-১০, ব্লক-এ, সেন-৮,
বাড়ী-১০, গেট নং-৩, মিরপুর
বেনারশী পল্লী, পল্লবী, ঢাকা-১২১৬
মোবা : ০১৯৬৪৮৮১৩৭৩

তাওছিফ ফ্যাশন

এই প্রথম মিরপুর বেনারশী পল্লবীতে তাওছিফ ফ্যাশন নিয়ে এলো একটি নতুন সংযোজন, ইন্সটিজ ও আন ইন্সটিজ কামিজ সুট লওন ওড়না ব্লাউজ ও পেটিকোট এর একটি আধুনিক প্রতিষ্ঠান।



সেকশন-১০, ব্লক-এ, সেন-৬,
বাড়ী-৩, দোকান -৩, মিরপুর গেট-২
বেনারশী পল্লী, পল্লবী, ঢাকা-১২১৬
মোবা : ০১৯৫৪৪৭৪১৩৪
০১৬৭২৪৮৫০৩৫

জেরিন সিল্ক ইন্ডাস্ট্রিজ

শাড়ীর জগতে একটি আধুনিক ও অনন্য নাম এখানে কাতান, ধুপিয়ান, বেনারশী, বিয়ের কাতান, জরজেট, পিওড় কাতান, কাঞ্চিবরণ, লিলাম্বরী জামেওয়ার্ক চেন্নাই সিল্ক, ব্যাঙ্গালর সিল্ক ও সময় উপযোগী শাড়ী পাওয়া যায়। এছাড়াও পাজাবী, শেরওয়ানী, সাটিং, খ্রি-পিছ এর খান কাপড় পাওয়া যায়।



সেকশন-১০, ব্লক-এ, সেন-৬,
বাড়ী-২, মিরপুর বেনারশী পল্লী,
পল্লবী, ঢাকা-১২১৬
মোবা : ০১৭২০৮৩৬২৮৪

তুক ও চৌট বাদে ত্বকের অন্যান্য অংশে লাগিয়ে নিন; বিশেষত নাকের পাশে, কপাল, চোঁটের পাশে, খুঁতনিতে একইভাবে ২ মিনিট ম্যাসাজ করুন। এবার মুখ ধুয়ে গরম পানির উপরে মুখ রেখে তোয়ালে দিয়ে ঢেকে নিন। গরম পানির পাত্র থেকে আপনার দূরত্ব হবে আট-দশ ইঞ্চি। ৩-৫ মিনিট পর ভেজা কাপড় দিয়ে মুছে নিন। এবার ত্বকের ধরন অনুযায়ী ফেসিয়াল মাস্ক ব্যবহার করুন। ১০-১৫ মিনিট পর মুখ ধুয়ে টোনিং করে নিন। ভেজা তুলোয় টোনার নিয়ে চোখের চারপাশের ত্বক ও চৌট বাদে ত্বকের অন্যান্য অংশে টোনিং করে নিন। এবার ময়েশ্চারাইজ করে নিন।

ত্বকের ধরনে কোনটা কি

ক্লিনজার- ত্বকের যে কোনো ধরনের ক্লিনজিং মিস্ক নেয়া যেতে পারে।

টোনার- শুষ্ক, স্পর্শকাতর ত্বকে স্কিন ফ্রেশনার ব্যবহার করতে হবে। স্বাভাবিক ত্বকে স্কিন টনিক। তৈলাক্ত ত্বক যদি স্পর্শকাতর না হয় ও অল্পবয়সী ত্বকে যদি হালকা ব্রণ থাকে অ্যাস্ট্রিনজেন্ট ব্যবহার করা যেতে পারে।

ফেসিয়াল প্যাক- তৈলাক্ত থেকে স্বাভাবিক ত্বকের জন্য সেটিং প্যাক (যে প্যাক লাগানোর পর শুকিয়ে যায়) এবং শুষ্ক ও মিশ্র ত্বকের জন্য নন সেটিং প্যাক (যে প্যাক লাগানোর পর শুকিয়ে সেটিং প্যাকের মতো মুখে বসে যায় না) লাগানোই ভালো। এতে ত্বক ব্যালেন্স থাকে।

ময়েশ্চারাইজার- যে কোনো ত্বকের জন্য ময়েশ্চারাইজিং লোশন ভালো। তবে খুব বেশি শুষ্ক ও রুক্ষ হলে এবং স্পর্শকাতর না হলে ক্রিম লাগানো যেতে পারে।

কিছু প্রয়োজনীয় টিপস

ফেসিয়াল প্যাকে ব্যবহৃত কোনো উপাদানে ফেসিয়াল স্টেপের কোথাও এসে অ্যালার্জি হলে, পরবর্তী সময়ে সেই উপাদানটি এড়িয়ে যাওয়াই ভালো।

এক টুকরো কুমড়ার সঙ্গে ডিমের হলুদ অংশ এবং দুধ ভালোভাবে মিশিয়ে একটি মিশ্রণ তৈরি করে পরিষ্কার ও শুকনো ত্বকে লাগিয়ে ৩০ মিনিট রেখে দিন। এরপর পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। এই মিশ্রণটি শুষ্ক ত্বককে চকচকে, উজ্জ্বল ও ফর্সা করার জন্য খুবই কার্যকরী।

এক চা চামচ আমন্ড বাদাম বাটা, ডিমের সাদা অংশ এবং আধা চা চামচ লেবুর রস একসঙ্গে মিলিয়ে লাগিয়ে ১০-১৫ মিনিট পর ধুয়ে নিতে হবে।

বেসন, মধু, দুধ, হলুদ এবং দই একসঙ্গে মিলিয়ে ব্যবহার করতে পারেন।

দুটো আমন্ড বাদাম সারারাত গরম পানিতে ভিজিয়ে রেখে সকালে পিষে এর সঙ্গে এক চামচ করে দুধ ও চন্দন পাউডার মিলিয়ে ব্যবহার করে শুকিয়ে যাওয়ার পর ঠাণ্ডা পানি দিয়ে ধুয়ে নিন। চালের গুঁড়ো, আটা, দুধ ও হলুদ একসঙ্গে মিলিয়ে মুখে লাগাতে পারেন, ১৫-২০ মিনিট পর ধুয়ে নিতে হবে।

গোলাপ জলে বেসন মিলিয়ে পেস্ট তৈরি করে ব্যবহার করে ১৫ মিনিট পর ধুয়ে নিতে হবে।

পাকা পেঁপে ও মধু একসঙ্গে মিলিয়ে ত্বকে ব্যবহার করে দশ-পনের মিনিট পর ধুয়ে নিন।

মসুরের ডাল সারারাত দুধে ভিজিয়ে রেখে সকালে বেটে পেস্ট বানিয়ে নিন। মুখে ও গলায় ব্যবহার করে শুকিয়ে যাওয়ার পর ধুয়ে নিন।

বেসন, দই, লেবুর রস ও হলুদ একসঙ্গে মিলিয়ে ব্যবহার করতে পারেন।

চুলের যত্নে কিছু টিপস

এভাবে ত্বকের যত্ন করার পাশাপাশি আপনি চাইলে নিচে উল্লিখিত উপায়ে আপনার চুলেরও কিছু যত্ন নিতে পারেন।

৫০ মি. গ্রা. নারকেল তেল গরম করে তার সঙ্গে তিন কোয়া রসুনের রস, চারটি গোল মরিচের গুঁড়ো মিলিয়ে নিন, একটু ঠাণ্ডা করে প্রতিদিন চুলে ম্যাসাজ করতে পারেন, চুলের স্বাস্থ্য হবে উজ্জ্বল ও দ্রুত বাড়বে;

আমন্ড তেল, অলিভ অয়েল এবং ক্যাস্টার অয়েল সমপরিমাণে মিলিয়ে খুব ভালো হেয়ার টনিক তৈরি করা যায়, টনিকটি প্রতিদিন মাসাজ করলে চুলের স্বাস্থ্য হবে উজ্জ্বল ও দ্রুত বাড়বে ;

২০ গ্রা. অলিভ অয়েলের সঙ্গে এক চা চামচ মধু ও এক চা চামচ মেথি বাটা খুব ভালো করে মিলিয়ে একটি পেস্ট তৈরি করুন, প্যাকটি মাথার ত্বকে লাগাতে পারেন, ৩০ মিনিট অপেক্ষা করে হালকা গরম পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন, মাসে অন্তত তিনবার প্যাকটি ব্যবহার করলে চুল পড়া বন্ধ হবে এবং চুল ঘন হবে ;

দুই টেবিল চামচ আদার রস, এক টেবিল চামচ লেবুর রস মিলিয়ে নিন, মিশ্রণটি ৩০ মিনিট রেখে হালকা গরম পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন, মাথার ত্বকে কোনো ইনফেকশন থাকলে উপকার পাবেন এবং চুলের বৃদ্ধিতেও ভূমিকা রাখবে ;

চুল পড়া কমানোর সবচেয়ে সহজ ও দ্রুত উপায় হলো, কয়েক টুকরো রসুন ছেঁচে মাথার ত্বকে ম্যাসাজ করে লাগান, দুই সপ্তাহে একবার লাগাতে পারেন; মেজর কোনো শারীরিক সমস্যা না থাকলে খুব তাড়াতাড়িই সমাধান হতে পারে।

চুলের গোড়ায় 'ম্যাসাজ' গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। নারকেল তেলের সঙ্গে কয়েক ফোঁটা ইউক্যালিপ্টাস তেল মিলিয়ে তালুতে ম্যাসাজ করুন। সারারাত রাখার পর চুল শ্যাম্পু করুন।

নারকেল তেলের সঙ্গে কয়েক ফোঁটা লেবুর রস মিশিয়ে ভালো করে চুল ম্যাসাজ করে সারারাত রেখে দিন। পরের দিন শ্যাম্পু দিয়ে চুল ধুয়ে ফেলুন। এই পদ্ধতি আপনার চুলের পিএইচের ভারসাম্য রক্ষা করবে ও খুশকি কমাতে সাহায্য করবে।

অল্প পরিমাণে ভিনেগার পানির সঙ্গে মিশিয়ে চুল ভিজিয়ে নিন এবং ২০ মিনিট পর চুল ভালো করে ধুয়ে ফেলুন।

নারকেলের ঘন দুধ চুলে মেখে সারারাত রেখে দিন এবং পরের দিন হালকা শ্যাম্পু দিয়ে চুল ধুয়ে ফেলুন সপ্তাহে দু'বার এটি করুন।

একটি পাত্রে দুই চা চামচ সরিষার তেল, একটি ডিম এবং দুই চা চামচ দই ভালোভাবে মিশিয়ে চুলে মেখে হালকাভাবে ঘষতে থাকুন। এভাবে কিছুক্ষণ ব্যবহার করার পর ৩০ মিনিট রেখে দিয়ে পানি দিয়ে চুল ধুয়ে ফেলুন। শ্যাম্পু ব্যবহার না করে তার পরিবর্তে রিঠা ও শিকাকাই ব্যবহার করতে পারলে বেশি ভালো হয়।

চোখের সাজ

চোখ মনের কথা বলে। রূপ-সৌন্দর্যের অন্যতম অনুষঙ্গ হচ্ছে চোখ। তাই চোখের সাজটি হওয়া চাই নিখুঁত ও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। স্থান-কাল বুঝেও চোখকে সাজাতে হবে। শুধু কাজল, আইলাইনার বা সুরমা টেনে আপনার চোখকে করে তুলতে পারেন নজরকাড়া। আবার কারো চোখে কিছু ত্রুটি থাকে, যা একটু গুরুত্বের সঙ্গে যথার্থ সাজের মাধ্যমে ঢেকে নিতে পারেন।

(ক) চোখের আকারের ওপর নির্ভর করে আপনার চোখের সাজ। আপনার চোখ যদি হয় কিছুটা কোটরের ভেতর ঢোকানো, তবে আইশ্যাডো হওয়া চাই হালকা।

(খ) চোখের পাতা ও ভেতরের দিকে হালকা



দিয়া শাড়ী



DIA SAREE'S

An Exclusive Sharee House

সেক্টর- ১০, ব্লক-এ, সড়ক নং-৮, বাড়ী নং- ১৪, মিরপুর বেনারশী পল্লী গেট # ৩,
মিরপুর, ঢাকা-১২১৬ (মিরপুর ইনডোর স্টেডিয়ামের পাশে)

ফোন: ৮০৬১৬৯২, মোবা: ০১৫৫২৪৮০১৫৬, ০১৬৭৭১৭২২১১

www.facebook/diasaree's, E-mail: diasaree1975@yahoo.com

আইশ্যাডো দিন। একটু গাঢ় আইশ্যাডো লাগান পাতার ওপরে, জর নিচে। মাঝারি রং থেকে আরো একটু গাঢ় রঙের আইশ্যাডো লাগান চোখের বাইরের কোণে একটু বাইরের দিকে টেনে। জর নিচে একদম হালকা রঙের আইশ্যাডো দিয়ে হাইলাইট করুন।

(গ) জ্র যেখানে শেষ হয়, সেই লাইনটাতে খুব সরু করে সাদা আইশ্যাডো লাগান। এবার চিকন আইলাইনার বা কাজল চোখের ওপরের পাতায় নিয়ে বাইরের কোণ পর্যন্ত টেনে দিন। নিচের পাতায় চাইলে খুব সরু করে কাজল নিতে পারেন।

(ঘ) নিচের পাতায় কাজল না দিয়ে শুধু মাশকারা লাগিয়ে নিতে পারেন। চোখের ওপরের পাপড়িতেও মাশকারা দিতে পারেন। এতে আপনার চোখ বড় ও সজীব দেখাবে।

(ঙ) চোখের পাতায়ও কোটরের ওপরের অংশজুড়ে খুব গাঢ় আইশ্যাডো লাগাবেন না। এতে চোখ আরো ভেতরের দিকে মনে হবে।

(চ) দুই চোখের মাঝে দূরত্ব যদি একটু বেশি হয়, তবে চোখের সাজ হওয়া উচিত এমন যাতে চোখ দুটি কাছাকাছি দেখায়। চোখের পাতার মধ্যভাগ থেকে ভেতরের অংশ পর্যন্ত একটু হালকা রঙের আইশ্যাডো দিন।

(ছ) চোখের মধ্যভাগ থেকে বাইরের দিকের অংশে একটু গাঢ় রঙের আইশ্যাডো দিন। এই দুই শেড চোখে ব্লেন্ড করে নিন। টেনে কাজল বা আইলাইনার দিন চোখের ভেতরের দিকের অংশে। চোখের ভেতরের অংশে ওপরে ও নিচে হালকা করে মিলিয়ে নিয়ে চোখ আঁকতে পারেন।

(জ) আপনার দুই চোখের মাঝে দূরত্ব যদি কম হয়, তবে চোখের পাতার ভেতরের অংশে হালকা আইশ্যাডো দিন মাঝ বরাবর। এবার মধ্যাংশ থেকে বাইরের দিকে গাঢ় রঙের আইশ্যাডো দিন। দুটো রং ভালো করে মিলিয়ে দিন চোখের ওপরে। গাঢ় রঙের আইশ্যাডো চোখের কোণের বাইরে টেনে দিয়ে নিচের অংশের মাঝ বরাবর দিতে পারেন।

(ঝ) আইলাইনার বা কাজল চোখের ভেতরের অংশ থেকে চোখের কোণের বাইরে পর্যন্ত টেনে দিন। বাইরের অংশটিতে একটু গাঢ় বা মোটা করে, একটু ওপরের দিকে টেনে দিতে পারেন। এভাবে আপনার চোখ টানা টানা ও সুন্দর দেখাবে।

(ঞ) আপনার চোখের আকার যদি হয় নিচের দিকে নামানো, তবে আইশ্যাডো ওপরে এবং বাইরের দিকে টেনে দিতে হবে। চোখের ভেতরের অংশে হালকা ও বাইরের কোণ থেকে নিয়ে মধ্যভাগ পর্যন্ত গাঢ় আইশ্যাডো দিন। খেয়াল রাখবেন, ওপরের অংশের গাঢ় আইশ্যাডো যেন টেনে নিচে নামিয়ে না আনা হয়।

(ত) চোখের ভেতরের অংশ থেকে আইলাইনার বা কাজল টেনে বাইরের অংশ পর্যন্ত দিয়ে একটু ওপরের দিকে ছড়িয়ে দিন। মধ্যভাগ থেকে বাইরের কোণ পর্যন্ত একটু মোটা করে নিন আপনার কাজল। চোখের নিচের পাতায় হালকা কাজল দিয়ে বাইরের কোণটি ওপরের কোণের সঙ্গে একটু ওপরে টেনে মিলিয়ে নিন। চোখের ওপরের পাতার পাপড়িতে ঘন করে মাশকারা লাগিয়ে নিন।

(থ) আপনার চোখ যদি চিকন ধরনের হয়, তবে চোখের পাতার ভেতরের অংশে একটু হালকা

শ্যাডো দিন। বাইরের অংশে গাঢ় শেড দিয়ে ভালো করে ব্লেন্ড করে নিন। আইলাইনার বা কাজল চোখে খুব একটা টেনে দেয়ার দরকার নেই। তাতে চোখ আরো লম্বা দেখাবে। হালকা লাইনার বা কাজল অথবা এর বদলে কালো আইশ্যাডো দিয়ে ঘন করে মাশকারা নিতে পারেন।

(দ) যাদের চোখ একটু ফোলা ধরনের, তারা চোখের পাতার ভেতরের অংশে হালকা, চোখের কোণ ও কোটরের ওপর গাঢ় আইশ্যাডো দিয়ে চোখের ফোলা ভাব কমাতে পারেন। মোটা করে কাজল বা আইলাইনারও লাগিয়ে চোখের ফোলা ভাব কমানো যায়।

(ধ) যাদের চোখের কোণ ফোলা থাকে, তারা ওপরের ও নিচের পাতায় গাঢ় করে কাজল বা আইলাইনার টেনে একটু মোটা করে লাগাতে পারেন।

(ন) আপনার চোখ যদি হয় গোলাকৃতির, তবে চোখের পাতার ভেতরের অংশে হালকা ও বাইরের অংশে গাঢ় আইশ্যাডো লাগিয়ে নিন। কাজল বা আইলাইনার চোখের ভেতরের কোণে হালকা করে লাগিয়ে বাইরের কোণ পর্যন্ত চিকন করে টেনে লাগান। বাইরের কোণে কাজল একটু মোটা বা উর্ধ্বমুখী করতে পারেন। চোখের নিচের পাতার কোণের সঙ্গে কাজল টেনে ওপরের অংশের সঙ্গে মিলিয়ে দিন।

(প) আইশ্যাডো ব্যবহার করতে না চাইলে মুখে হালকা ফেস পাউডার দিয়ে, চোখে শুধু কাজল দিয়েও হয়ে উঠতে পারেন নজরকাড়া সুন্দরী। প্রসাধনীতে সুরমার প্রচলন এখনো আছে। টেনে সুরমা দিলে চোখ টানা টানা লাগে। আবার হালকা করে চোখের ওপরের পাতায় কাজলের সঙ্গে মাশকারা লাগাতে পারেন।

(ফ) চোখ যদি মাঝারি আকারের হয়, তবে আইলাইনার বা কাজল চোখের ভেতরের কোণ থেকে টেনে নিয়ে বাইরের কোণ পর্যন্ত লাগান। ভেতরের দিকে ওপরের ও নিচের পাতায় কাজল দিয়ে চোখ টেনে একে নিন। আবার বাইরের কোণেও একটু বাড়িয়ে ওপর দিকে কাজল দিন। চোখের নিচের পাতার মাঝ থেকে বাইরের অংশ পর্যন্ত একটু মোটা করে ওপর দিকে টেনে কাজল দিন। এতে চোখ টানা টানা ও ভাসা ভাসা লাগবে।

(ব) ইদানীং চোখের সঙ্গে স্মোকি আইস বা কালো ধরনের মেকআপ খুব প্রচলিত। এতে প্রথমে চোখের পাতায় একটা বেজ লাগিয়ে নিন। হালকা বাদামি রঙের শেড দিন বাইরের কোণ থেকে চোখের কোটরের ওপর দিয়ে ভেতর পর্যন্ত। একটু কালো বা গাঢ় বাদামি রঙের শ্যাডো লাগান চোখের পাতার বাইরের কোণ থেকে ভেতরে চোখের কোটরের লাইন বরাবর।

(ভ) আইলাইনার বা কাজল লাগান গাঢ় করে, চোখের পাতার ভেতরের অংশ থেকে বাইরের অংশ পর্যন্ত। নিচের পাতায় কাজল দিন। কাজলের বদলে আইশ্যাডো দিতে পারেন। জর নিচে একটু হালকা সোনালি আইশ্যাডো দিন।

(ম) চোখে ভাসা ভাসা একটা ভাব আনতে চোখের ওপর নিচের পাতায় কাজল দিন। এবার আঙুল দিয়ে চোখের ওপরের পাতার কাজল একটু ওপরের দিকে ঘষে মিশিয়ে দিন।

ঠোঁটের সাজসজ্জা

ঠোঁটে লিপস্টিকের রং প্রয়োগের মাধ্যমে একটু বাড়িয়ে বা কমিয়ে ঠোঁটের আকার পরিবর্তন করা যায়। ঠোঁটের আকার পরিবর্তন করতে চাইলে প্রথমেই যে রঙের ফাউন্ডেশন বেছে নেবেন, সে ফাউন্ডেশন আঙুলে নিয়ে ঠোঁটে লাগিয়ে নিন। এভাবে ফাউন্ডেশন লাগিয়ে নিলে ঠোঁটের আউটলাইন বাড়িয়ে বা কমিয়ে লিপস্টিক লাগালে লিপস্টিকের রং কেটে যাবে না। দশ মিনিট পর লিপব্রাশে লিপস্টিক লাগিয়ে সে ব্রাশ খুব সরু করে প্রয়োজন মতো সীমারেখা বাড়িয়ে বা কমিয়ে মানানসই আউটলাইন একে নিন। খুব সতর্ক হয়ে আউটলাইন আঁকবেন, যাতে এ আউটলাইন ঠোঁটের মূল সীমারেখা থেকে খুব বেশি ভেতরে বা বাইরে না যায়।

এবার জেনে নিই ঠোঁটের আকার বুঝে আউটলাইন একে লিপস্টিক লাগানোর আধুনিক কলাকৌশল।

(১) যাদের ঠোঁট পাতলা, তারা ঠোঁটের প্রকৃত সীমারেখার ঠিক বাইরে আউটলাইন একে নেবেন লিপ লাইনার বা লিপব্রাশের সাহায্যে। এখন গাঢ় রঙের লিপস্টিক আউটলাইন বরাবর সারা ঠোঁটে লাগালে, ঠোঁট অনেক ভরাট দেখাবে। সবশেষে লিপগ্লস ব্যবহার করে ঠোঁট বাড়তি চকচকে করে নিন।

(২) যাদের ঠোঁট পাতলা ছোট, পাতলা ঠোঁট ভরাট ও বড় দেখানোর জন্য ঠোঁটের আসল সীমারেখা সামান্য বাড়িয়ে আউটলাইন একে নিন। এবার গাঢ় বা হালকা রঙের লিপস্টিকে ঠোঁট ভরাট করে নিন।

(৩) যাদের ঠোঁট দুই কোণ চাপা ভরাট ধরনের, তারা আউটলাইন আকার সময় ঠোঁটের দুই কোণ বাড়িয়ে মানানসই আউটলাইন আঁকবেন। এ ধরনের ঠোঁটে সব সময় হালকা রঙের লিপস্টিক লাগালে ভালো লাগে।

(৪) যাদের ঠোঁট একটু ফোলা ধরনের, তারা ঠোঁট মানানসই করার জন্য ঠোঁটের প্রকৃত সীমারেখা বরাবর ম্যাটিং শেড ব্যবহার করে আউটলাইন আঁকুন। এবার ওপরের ঠোঁট ও নিচের ঠোঁট ভরাট করুন যথাক্রমে হালকা ও গাঢ় রঙের লিপস্টিক দিয়ে। ফোলা ঠোঁট হলে লিপগ্লস না লাগানোই ভালো। তবে ফোলা ঠোঁট যদি মুখশ্রীর সঙ্গে মানানসই হয়, তাহলে শুধু নিচের ঠোঁটে লিপগ্লস লাগাতে পারেন।

(৫) যাদের ঠোঁট ভরাট তারা ঠোঁটের ক্ষেত্রে প্রকৃত সীমারেখা বরাবর বা সামান্য কমিয়ে আউটলাইন আঁকুন। ঠোঁটের দুই কোণায় আউটলাইন মেলাবেন না। সামান্য ফাঁক রাখবেন। এবার গাঢ় বা মাঝারি রঙের লিপস্টিকে ঠোঁট ভরাট করুন। ভরাট ঠোঁটে কখনো লিপগ্লস ব্যবহার করবেন না।

(৬) প্রসারিত ঠোঁটের জন্য আউটলাইন আঁকুন হালকা রঙের লিপস্টিক লিপব্রাশে নিয়ে বা হালকা রঙের লিপলাইনার ব্যবহার করে। দুই কোণায় সামান্য ফাঁক রাখবেন। যে রঙের লিপস্টিক দিয়েই ঠোঁট ভরাট করুন না কেন, তা ঠোঁটের মাঝের অংশে লাগান গভীর করে। আর দুই পাশে লাগান অপেক্ষাকৃত হালকা করে।

পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে খুলনা প্রেসক্লাবের পক্ষ
থেকে খুলনাবাসীকে জানাই ঈদের শুভেচ্ছা



এস এম নজরুল ইসলাম
সভাপতি
খুলনা প্রেসক্লাব, খুলনা।

ঈদ
মোবারক



প্রতিটি দিন হোক ঈদের মতো আনন্দময়-এ কামনায় সকল
পেশার মানুষকে জানাই পবিত্র ঈদুল-ফিতরের শুভেচ্ছা



ওবায়দুর রহমান পান্না

বিশিষ্ট সাংবাদিক ও
প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক
জোহরা খাতুন শিশু বিদ্যা নিকেতন
খুলনা।
মোবা : ০১৭১১৯৬৫২২০

ঈদ মোবারক





মঞ্চ

মঞ্চের অভিনেত্রী সোনিয়া হাসান

অপূর্ব কুমার কুণ্ডু

অস্কারপ্রাপ্ত চলচ্চিত্র ক্রেমার্স ভার্সেস ক্রেমার্স বাংলাদেশি দর্শকদের কমবেশি অনেকের দেখা। কোর্টের ট্রাইব্যুনালে ছয় প্রশ্নের একই উত্তর। ওখানে যিনি বসা তিনি কি আপনার স্বামী? ইয়েস। ওনাকে কি আপনি ভালোবেসে বিয়ে করেছিলেন? ইয়েস। ওনাকে কি আপনি এখনো ভালোবাসেন? ইয়েস। উনি চলে গেলে আপনার কষ্ট হবে? ইয়েস। তারপরও আপনি ওনাকে ডিভোর্স দেবেন? ইয়েস। পাশ্চাত্যের এ ঘটনার বিপরীতে প্রাচ্যে যদি এমন এক ট্রাইব্যুনাল বসে তবে সেখানে উপস্থিত গৃহবধূ কী উত্তর দিতে পারে! ঐ যে বংশীবাদক যে আপনার ওপর অ্যাটেম টু মার্ডারের অভিযোগে বিচার চাইছে উনি কি আপনার স্বামী? হ্যাঁ। উনি কি আপনার

দৈহিক রূপ এবং কণ্ঠের গুণ দেখে বিয়ে করেছিল? হ্যাঁ। উনার বাঁশরী আর আপনার গায়কী দিয়ে দারিদ্র্য জয় করতে চেয়েছিলেন? হ্যাঁ। জমিদার কামুক জানা সত্ত্বেও আপনাকে উনি একা ছেড়েছিলেন তার কাছে যেতে? হ্যাঁ। আপনার সম্মম হারিয়েছে ভেবে আপনাকে উনি মার্ডার করতে উদ্যত হয়? হ্যাঁ। এতদসত্ত্বেও আপনি তাকে ক্ষমা করতে চাইছেন? হ্যাঁ। পাশ্চাত্যের হ্যাঁ ক্রেমার্স ভার্সেস ক্রেমার্সের ঘটনা। আর প্রাচ্যের হ্যাঁ বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী নাট্যদল সুবচন নাট্য সংসদের নাটক রূপবতীর আলোকে কাল্পনিক রসায়ন। বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে একটাই পাশ্চাত্য তথা ইউরোপ-আমেরিকার বালি আর বাংলার পলিকে মিলিয়ে না ফেলা। এই মিলিয়ে

সততা বজুনিষ্ঠায় সমৃদ্ধ নন্দিত পত্রিকা দৈনিক যায়যায়দিনের সকল
পাঠক ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের জানাই পবিত্র ঈদুল ফিতরের শুভেচ্ছা



লেঃ কর্নেল মোঃ আরিফুল হক
অধিনায়ক
২১ বিজিবি, খুলনা।

ঈদ মোবারক



ঈদ সকলের মনে বয়ে আনুক অনাবিল আনন্দ



মোঃ তাজুল ইসলাম
অফিসার ইনচার্জ
ডুমুরিয়া থানা, খুলনা।

ঈদ
মোবারক



না ফেলানোয় বিশ্বয়কর উপস্থিতি রূপবতী নাটকের রূপবতী রূপী অভিনেত্রী সোনিয়া হাসান তথা সবার সুবর্ণা। চাকরি করছেন বিদেশি কোম্পানিতে উচ্চ বেতনে অথচ মঞ্চের আলো-আঁধারে নিজেকে বিলীন করছেন রূপবতী চরিত্রে দারিদ্র্যের বালুচরে। গলা সাধছেন মঞ্চ নাটকের কোরাসে গলা মেলাবেন বলে কিন্তু পুনর্নির্মাণে দলীয় সিদ্ধান্ত হচ্ছে খানদানি কিসাসার কেন্দ্রীয় চরিত্র নূসরাত হতে হবে এই তোমাকে। কক্সবাজারে ঢেউয়ের মতো দর্শক যখন উপড়ে পড়ছে নাটকটি দেখতে তখন চরিত্রায়ন, গায়কীর পাশাপাশি প্রথম থেকে শেষ অবধি গায়ন হতে হচ্ছে নির্ধারিত শিল্পীর শূন্যস্থানে। খানদানি কিসসা নাটকে যিনি নূসরাত হয়ে প্রেমের বলিদানের মতো? নিয়তিকে মেনে নিতে বাধ্য হয়, রাষ্ট্র বনাম নাটকে তিনি সাব ইমপেক্টরের বৌ হয়ে নিয়তিকে ঝেঁটিয়ে সোভাগ্যকে প্রতিষ্ঠা দেয়। টুয়েলফথ নাইট নাটকে যিনি রানী অলিভার যোগ্য সহচরী তীর্থঙ্কর নাটকের কুরুক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে তিনি আফ্রিদরূপী সঙ্গীতপিয়াসী। ক্ষুদ্রিত পাশা নাটকে যিনি নারী জীবনের বঞ্চনার রাগিণী মহাজনের নাও নাটকে সেখানে তিনি সরলারূপী শাহ আব্দুল করিমের যোগ্য সহধর্মিণী। নন্দিউ নতিম নাটকে যিনি হুমায়ূন আহমেদ সৃষ্ট চরিত্র মুনা হয়ে এলিট সোসাইটির প্রতিনিধি, ভবিষ্যৎ অভিনেত্রী ফেরদৌসী মজুমদারের উচ্চারিত সংলাপ, ‘আমার প্রার্থনা আমার কণ্ঠ যেন খেমে না যায়, পা দুটো যেন সচল থাকে, আমি যতদিন বাঁচব যেন নাটকের হয়ে অভিনয়ের মাধ্যমে জীবনের কথা বলতে পারি’ তিনি হৃদয়ে আত্মস্থ করে হয়ে উঠতে চান ঐতিহ্যের যোগ্য উত্তরাধিকারী। মঞ্চের আলো-আঁধারী যার আকর্ষণ অভিনয় জীবনের আচ্ছাদনে উপলব্ধির বহুমাত্রিকতা যার অন্বেষণ সহস্র দর্শকের শিল্প পিপাসা নিবৃত্তি যার সাধন সেই তারুণ্যদীপ্ত মঞ্চাভিনেত্রী সোনিয়া হাসান আজ মঞ্চমাধ্যমে সবিশেষ আকর্ষণ।

আকর্ষণীয়ভাবে শব্দ উচ্চারণ করতে পারলে কথার মানে কীভাবে যে বদলে বদলে দর্শক-শ্রোতাকে করে বিমোহিত সে বিষয়টা প্রথমত দুজন ব্যক্তিকে দেখে আত্মস্থ করেন অভিনেত্রী সোনিয়া হাসান। একজন লিজেন্ড অভিনেত্রী ফেরদৌসী মজুমদার এবং অন্যজন আব্বা হাসান আলী সরকার। শব্দের মধ্যে অন্তর্নিহিত লুপ্ত ধ্বনি কিংবা বর্ণকে হয়তো অনেকেই পাস কেটে

উচ্চারণ করেন কিন্তু করেন না ফেরদৌসী মজুমদারের মতো ব্যক্তিত্ব। ফলে তার মুখনিঃসৃত শব্দ উচ্চারণে ভিন্নমাত্রা পায়, শব্দই বিন্দু হয়ে সিন্দুর চিত্রকল্প তৈরি করে দেয় আবার পঠিত কাব্যের অদৃশ্য চিত্রপট চিত্রমাঝে মহাকাব্যের বিভোরতার ঘোর লাগায়। ফলে শৈশবে রাজশাহী থেকে ঢাকায় শিশুকুড়ি কিংবা অন্যান্য প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে আসা সোনিয়া হাসান আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে গিয়ে কিংবা বিচারকদের আহ্বানে আবৃত্তির উচ্চারণে আঁকড়ে ধরেন ফেরদৌসী মজুমদারের বাচিক অভিনয় ভঙ্গি। হৃদয়ের অন্তঃস্থ থেকে সোনিয়া হাসানের সে এক দীপ্ত উচ্চারণ আমাকে একটি শব্দ দাও স্পিলন্টারের ডগার মতো তীক্ষ্ণ শানিত শব্দ দাও... অথবা স্বগতোক্তি ভঙ্গিমায মরমীয় উচ্চারণ হে নিষ্ঠুর নির্দয় শশী সুদূর গগনে বসি কী দেখিছ...

দেখে-শুনে-পড়ে-জেনে উপস্থাপনার ক্ষেত্রে সব কাজে যৌক্তিক ব্যাখ্যাটা থাকা যে অনিবার্য দরকার একথা আব্বা রাজশাহীর প্রমিনেন্ট ল’ইয়ার হাসান আলী সরকারের কাছ থেকেই সোনিয়ার শেখা। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস থেকে দেখে তার ব্যক্তিত্বের বিকাশ সেই আব্বা প্রয়াত হলেন সোনিয়ার অতিশৈশবে। রাজশাহী কলেজ থেকে বাণিজ্য বিভাগে পাস করেই মা-ভাইকে সঙ্গী করে স্থায়ী আবাস শুরু হলো ঢাকায়। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করতে করতেই টেলিভিশন অভিনেতা এবং সুবচন নাট্যদলের নাট্যকর্মী আহসান হাবীব নাসিমের মাধ্যমে সুবচনের চৈত্রসংক্রান্তি উৎসব উদযাপনে গান গাইবার ডাক। পাশাপাশি ব্রিটিশ মাস্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে ওরাকেল ড্যাটাবেজ তৈরি করার কাজে যোগদান। ওরাকেল ড্যাটাবেজ তৈরির কাজ দিয়ে শুরু হয় হিউম্যান রিসোর্চ ম্যানেজার পদে উত্থান আবার সঙ্গীত দিয়ে সুবচনে প্রবেশ করে সুবচন নাট্য সংসদের নির্ভরযোগ্য অভিনেত্রী হয়ে ওঠা আরেক সফলতার আখ্যান।

আখ্যানে আখ্যানে কত চরিত্রের কত গভীরেই না উপলব্ধির আত্মানুসন্ধান। খানদানি কিসসা নাটকে নূসরাতকে ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে সোনিয়া হাসান বুঝেছেন ভালোবাসলেই ঘর বাঁধা যায় না, ঘর

বাঁধতে মুখোশ সরিয়ে মুখগুলোর বড় বেশি প্রয়োজন। রাষ্ট্র বনাম নাটকে সাব ইমপেক্টরের বৌ চরিত্রকে ফুটিয়ে তুলতে বুঝেছেন কস্ট্রোমাইজ করতে শেখাটা টিকে থাকার লড়াইয়ে জরুরি আত্মিকরণে। টুয়েলফথ নাইট নাটকে অলিভার সহচরী হতে গিয়ে বুঝেছেন, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ আসলে ফানুস উড়িয়ে ভেলকি দেখার বিশেষ সংযোজন। তীর্থঙ্কর নাটকের আফ্রিদি ফুটিয়ে তুলতে বুঝেছেন, যুদ্ধের দামামা থামাতে সুরের আবহ সৃজন আজ অতি বেশি জরুরি প্রশমন। ক্ষুদ্রিত পাশাণের রমণীকে তলে চাপা পাড়া দুর্বলের পক্ষে কত বিশেষ নিষ্পেষণ। রূপবতী নাটকের রূপবতী হতে গিয়ে আত্মবিশ্বাস, দারিদ্র্যের মতো///////// কীভাবে রূপ আর গুণকে করে কাল পরম্পরায় বাঁধৎসভাবে জীবন্ত দহন। মহাজনের নাও নাটকে সরলা হতে গিয়ে বুঝেছেন, একজন সৃজনশীল মানুষের জন্য যোগ্য সহধর্মিণী থাকাটা সৃজন কর্মের প্রাত্যহিকতায় অত্যাব্যবশ্যিক। নন্দিউ নতিম নাটকের মুনাকে ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে বুঝেছেন, খরস্রোতকে ঢাকতে শব্দ প্রবহমানতা জিইয়ে রাখা বহমানতার স্বার্থেই নিয়তির কালক্ষেপণ। আর এত এত সব বর্ণিল চরিত্রে রূপদান করতে গিয়ে নাট্যমঞ্চের রূপবতীখ্যাত অভিনেত্রী সোনিয়া হাসানের দিকনির্দেশনায় সর্বত্র অধিষ্ঠিত প্রয়াত কিন্তু ঢাকার নাট্যমঞ্চ স্বতন্ত্র অবস্থান যার সেই নাট্যমঞ্চের যুবরাজ, অভিনেতা নির্দেশক খালেদ খান। ‘বিষয় চরিত্রের গভীর থেকে গভীরে নিমগ্ন হয়ে, তল থেকে অতলে ডুব দিয়ে শৈল্পিক মণিমুক্ত অন্বেষণ করতে হবে তোমাকে নিমন্ত্বে, নির্জনে, একান্ত আপন করে আপনার।’ আপন আলায় পথ চলতে, আপন মহিমায় বিভোর হতে চলতি পথে যোগ্য চলার সাথী খুঁজে নিতে দেখা পেলেন সুবচন নাট্যসংসদের নাট্যকর্মী, কবি-নাট্যকার-নির্দেশক-অভিনেতা এবং ব্যক্তিজীবনে ব্যাংকের শীর্ষ কর্মকর্তা আসাদুল ইসলামের। প্রাগজুড়ে সরলতা, ব্যক্তিত্বের প্রশ্নের নিজস্বতা, নৈতিকতার প্রশ্নে অনমনীয়তা, দলগত পথচলার দায়িত্ববোধ, সংকটে সম্ভাবনায় স্বাভাবিক প্রাচুর্যতা মিলেমিশে যার মধ্যে একাকার সেই আসাদুল ইসলামের সঙ্গে ঘর না বেঁধে কি থাকা যায়। সোনিয়া আসাদুলের ভালোবাসার সংসারে ভালোবাসাকে অর্থপূর্ণতা দিয়ে এলো যে আর্থ মেঘদূত সেও এখন মঞ্চে হুমায়ূন আহমেদের লেখা চরিত্র কমলকে ফুটিয়ে তুলে শিশুশিল্পীদের ভিড়ে অন্যতম সেরা অভিনেতা। অভিনয়ের পথচলায় অবিরত পথ চলাতে আনন্দ যে সোনিয়া হাসানের তিনি সম্ভ্রতি সুবচনের অভিনেতা নির্দেশক দলপ্রধান আহাম্মেদ গিয়াসের সম্মতিতে সুবচনের পাশাপাশি মুক্ত হয়েছেন রেপার্টার নাট্যদল ম্যাড থেটারে। উদ্দেশ্য অধিক চরিত্রে রূপদান এবং সার্বক্ষণিক থিয়েটার চর্চা তথা থিয়েটারের সাধনা। ইতোমধ্যে হুমায়ূন আহমেদকে নিয়ে কথা হয় উপন্যাস আশ্রিত নাটক নন্দিউ নতিম নাটকে মুনা চরিত্রের বিশ্বয়কর উপস্থিতি নিয়ে হুমায়ূন ভক্ত পাঠক-দর্শকদের পাশাপাশি মঞ্চ নাটকের দর্শকদের কাছ থেকে পেয়ে চলছেন অবিরত প্রশংসা আর আরো অধিক চরিত্রে রূপদানের অকুণ্ঠ তাড়না। অভিনয় তাড়নায় তাড়িত সোনিয়া হাসানের তাই অক্ষুট উচ্চারণ মঞ্চ প্রদীপের আলায় এভাবেই হোক তব সবার আমন্ত্রণ।



পবিত্র ঈদুল-ফিতর উপলক্ষে পাঠক নন্দিত পত্রিকা
দৈনিক যায়যায়দিন পরিবারকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা



মোঃ শফিকুল ইসলাম

অফিসার ইনচার্জ
খুলনা সদর থানা
মেট্রোপলিটন পুলিশ, খুলনা।

ঈদ মোবারক



সোনাডাঙ্গা মডেল থানার পক্ষ থেকে দৈনিক যায়যায়দিন
পরিবারসহ সকলকে জানাই পবিত্র ঈদুল-ফিতরের শুভেচ্ছা



সুকুমার বিশ্বাস

অফিসার ইনচার্জ
সোনাডাঙ্গা মডেল থানা
খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশ।
খুলনা।

ঈদ মোবারক





ঈদ রেসিপি

ঈদের রান্না

ঈদের রান্নাবান্না একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিশেষ করে অতিথি আপ্যায়নের ক্ষেত্রে বাহারি ও মুখরোচক খাবারের জুড়ি নেই। ঈদের রান্নাবান্না নিয়ে লিখেছেন- পারভীন শম্পা

T.K. GROUP OF INDUSTRIES



তিখাদ
বাংলার
স্বাদ



পুক্টি

সরিষার তেল

শাহী কোরমা

উপকরণ : গরুর রানের মাংস ১ কেজি, পেঁয়াজ কুচি ১ কাপ, রসুন বাটা ২ টেবিল চামচ, আদা বাটা ১ টেবিল চামচ, টকদই আধা কাপ, ঘি আধা কাপ, মরিচ গুঁড়ো ১ চা চামচ, হলুদ গুঁড়ো ১ চা চামচ, লবণ পরিমাণ মতো।

যেভাবে তৈরি করবেন : প্রথমে মাংস টুকরা করে কেটে-ধুয়ে পানি ঝরিয়ে নিন। এবার দই ফেটিয়ে পেঁয়াজ কুচি ছাড়া বাকি সব বাটা ও গুঁড়ো মসলা, দই ও মাংস একসঙ্গে মিশিয়ে এক ঘণ্টা মেরিনেট করে রেখে দিন। এবার হাঁড়িতে ঘি ঢেলে গরম করে অর্ধেক পেঁয়াজ বেরেস্তা করে তুলে নিন। এবার বাকি ঘিয়ে তেজপাতা, গরম, মসলা, পেঁয়াজ কুচি, ও চিনি মিশিয়ে হালকা ভাজুন। পেঁয়াজ ভাজা ভাজা হলে মেরিনেট করা মাংস দিয়ে দিন। লবণ ও পানি দিয়ে কম আঁচে ভালো করে সিদ্ধ করুন, মাংস সিদ্ধ হয়ে তেলে মসলা ভিন্ন পেঁয়াজ বেরেস্তা ছিটিয়ে দিন। গরম করুন।

গরুর কোষ্ঠা

উপকরণ : গরুর কিমা মিহি করা ৫০০ গ্রাম, আদা বাটা ১ টেবিল চামচ, রসুন বাটা ১ চা চামচ, এলাচ, গোল মরিচ, দারুচিনি, লবঙ্গ কয়েকটা, বেরেস্তা পেঁয়াজ মিহি করে কাটা ১ কাপ, কাঁচা মরিচ কুচি করে কাটা ১ টেবিল চামচ, সরিষার তেল পরিমাণমতো, লবণ স্বাদমতো, তেল ভাজার জন্য।
যেভাবে তৈরি করবেন : প্রথমে গরুর কিমা ভালোভাবে ধুয়ে পানি ঝরিয়ে নিতে হবে। তারপর তাতে ধনেপাতা, কাঁচা মরিচ কুচি, পেঁয়াজ কুচি, গরম মসলা বাটা, আদা বাটা, রসুন বাটা, সরিষার তেল এবং লবণ দিয়ে ভালোভাবে মাখিয়ে গোল গোল করে ডুবন্ত তেলে হালকা করে ভেজে তুলে নিন।

টমেটো দিয়ে গরুর ভুনা মাংস

উপকরণ : গরুর মাংস হাড়সহ ১ কেজি টমেটো আধা কেজি, আদা বাটা ১ টেবিল চামচ, রসুন বাটা ২ চা চামচ, হলুদ গুঁড়ো ১ টেবিল চামচ, মরিচ গুঁড়ো ২ চা চামচ, লবণ স্বাদ অনুযায়ী, কাঁচা মরিচ আন্ত ৮-১০টি, ধনেপাতা অল্প এলাচ, দারুচিনি, লবঙ্গ

কয়েকটি, সয়াবিন তেল পরিমাণ মতো, পেঁয়াজ মোটা মোটা করে ২৫০ গ্রাম।
যেভাবে তৈরি করবেন : পাতিলে তেল গরম করে তাতে পেঁয়াজ, তেজপাতা এবং গরম মসলা দিয়ে অল্প ভেজে তাতে একে একে আদা ও রসুন বাটা, হলুদ গুঁড়ো, মরিচ গুঁড়ো, লবণ এবং গরুর মাংস দিয়ে ভালোভাবে কষিয়ে তাতে অল্প পানি দিয়ে ঢেকে চুলায় রাখতে হবে। আধা ঘণ্টা পর মাংস ও টমেটো এবং কাঁচা মরিচ দিয়ে মাংস চুলো থেকে নামিয়ে নিন।

মাংসের হাঁড়ি কাবাব

উপকরণ : গরুর মাংসের চাকা ১ কেজি, দই ২ টেবিল চামচ, পেঁয়াজ কুচি ১ কাপ, জায়ফল, যত্রিক, কাবাব, চিনি বাটা ১ চা চামচ, আদা, রসুন বাটা ১ টেবিল চামচ, মরিচ গুঁড়ো ২ চা চামচ, গরম মসলা বাটা ১ চা চামচ, গোল মরিচ বাটা ১ চা চামচ, তেল দেড় কাপ, ঘি আধা কাপ, লবণ পরিমাণমতো।

যেভাবে তৈরি করবেন : মাংস ১ ইঞ্চি পরিমাণ কেটে সামান্য খেঁতলে দিন। অল্প তেলে পেঁয়াজ ও মসলা দিয়ে ভাজুন। এবার পেঁয়াজ ও মসলা একত্রে বেঁটে নিন। বাকি তেলে মাংস, দই, সিরকা মাখিয়ে সামান্য পানি দিয়ে মৃদু আঁচে রান্না করুন। সুস্বাদু বের হলে উনুন থেকে হাড়ি নামিয়ে নিন।

বিরিয়ানি

উপকরণ : ১ টেবিল চামচ জিরা গুঁড়া, ১ টেবিল চামচ ধনে গুঁড়া, ৬টি গোলমরিচ, ৪টি এলাচ, ২ সেমি লম্বা ৪ টুকরা দারুচিনি, আধা চা চামচ জায়ফল, ১ কেজি খাসি বা গরুর মাংস, ৩/৪ কাপ তেল বা ঘি, ৩/৪ কাপ পেঁয়াজ স্লাইস, ১ টেবিল চামচ আদা বাটা, ১ চামচ রসুন বাটা, আধা কাপ দই, ৪টি কাঁচামরিচ, আধা কেজি পোলাওর চাল, ১ কাপ দুধ, ১ টেবিল চামচ চিনি এবং স্বাদমতো লবণ।

যেভাবে তৈরি করবেন : ১. গোলমরিচ, এলাচ, দারুচিনি ও জায়ফল গুঁড়ো করুন। ২. মাংস ছোট টুকরো করুন। ধুয়ে পানি ঝরান। মাংসে অর্ধেক গুঁড়ো মসলা, আদা, রসুন, দই, কাঁচামরিচ এবং

লবণ মেশান। ৩. তেল গরম করে পেঁয়াজ হালকা রং করে ভাজুন। মাংস দিন। নেড়ে ঢেকে দিন। মাঝারি আঁচে ২০-২৫ মিনিট রান্না করুন। পানি শুকালে মাংস কষান। তেল বের হলে মাংস সিদ্ধ হলে বাকি গুঁড়ো মসলা দিয়ে নেড়ে নামান। ৪. তেল এবং ঝোল ছেকে মাংস হাড়ি থেকে তুলে রাখুন। ৫. হাড়িতে ৩ কাপ পানি ফুটান, পানি ফুটলে চাল, দুধ ২ চামচ, লবণ ও চিনি দিয়ে নাড়তে থাকুন। দুতিনবার ফোটার পর বাকি কাঁচামরিচ দিয়ে নেড়ে ঢেকে দিন। মাঝারি আঁচে ১৮ মিনিট রান্না করুন। চুলার আঁচ খুব কমিয়ে আরো ৫ মিনিট চুলায় রাখুন। ঢাকনা দেয়ার পর কখনো ঢাকনা খুলবেন না। ৬. চুলা থেকে হাড়ি নামিয়ে রাখার ২০ মিনিট পর ঢাকনা খুলে পোলাওর ওপর মাংস দিয়ে আবার হাড়ি ঢেকে রাখুন। ৭. পরিবেশনের ঠিক আগে বড় হাতা দিয়ে ওপর-নিচ করে পোলাওর সঙ্গে মাংস মেশান।

গরুর মাংসের দোপেঁয়াজো

উপকরণ : হাড়বিহীন গরুর মাংস ১ কেজি, রসুন কুচি আধা কাপ, পেঁয়াজ কুচি আধা কাপ, আদা বাটা ২ চা চামচ, মরিচ গুঁড়ো ১ চা চামচ, হলুদ গুঁড়ো আদা চা চামচ, গরম মসলা ১ গুঁড়ো চা চামচ, তেজপাতা ২/৩টি, পেঁয়াজ বাটা ১ টেবিল চামচ, জয়ত্রীগুঁড়ো আধা চা চামচ, কায়ফল গুঁড়ো আধা চা চামচ, টক দই আধা কাপ, চিনি আধা চা চামচ, তেল ১ কাপ, লবণ পরিমাণমতো।
যেভাবে তৈরি করবেন : দইয়ের সঙ্গে আদা, হলুদ ও মরিচ গুঁড়ো মিশিয়ে একসঙ্গে ফেটিয়ে নিন। এবার মাংস ধুয়ে পানি ঝরিয়ে তাতে ফেটানো দইয়ের মিশ্রণ মাখিয়ে এক ঘণ্টা মেরিনেট করে রাখুন। এবার হাঁড়িতে তেল ঢেলে গরম করে পেঁয়াজ বেরেস্তা করে নিন। বেরেস্তা তুলে নিয়ে বাকি তেলে গরম মসলা তেজপাতা, চিনি, রসুন ও পেঁয়াজ বাটা দিয়ে ভেজে নিন। এবার মেরিনেট করা মাংস দিয়ে ভালোভাবে কষিয়ে নিন। কষানো হয়ে গেলে পরিমাণমতো পানি দিয়ে ঢেকে নিন। সিদ্ধ হয়ে তেল, মসলা ভিন্ন হয়ে গেলে জয়ত্রী ও জায়ফল গুঁড়ো মিশিয়ে নামিয়ে নিন। ওপরে পেঁয়াজ বেরেস্তা ছিটিয়ে নিন। গরম গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন।



ঈদ-এ
Discount!

SYMPHONY. H60
1.3 GHz Quad core
1GB RAM + 8GB ROM
8 MP + 5 MP Camera
2300 mAh Li-Poly Battery
~~Price: 7,290~~
Th. 6,490

SYMPHONY. H120
1.3 GHz Quad core
1GB RAM + 16GB ROM
8 MP + 5 MP Camera
3200 mAh Li-Poly Battery
~~Price: 7,790~~
Th. 6,990

SYMPHONY. H250
1.3 GHz Quad core (64 bit)
2GB RAM + 16GB ROM
13 MP + 5 MP Camera
2350 mAh Li-Poly Battery
~~Price: 9,990~~
Th. 9,190

ONE YEAR WARRANTY

www.symphony-mobile.com www.facebook.com/symphonybdt

A Product of **EMIL Group**

SYMPHONY.
new experience

© reg. Symphony 2016

খাসির স্পেশাল রেজালা

উপকরণ : মাটন ১ কেজি, রসুন বাটা ১ চা চামচ, কিসমিস বাটা ২ টেবিল চামচ, কাঁচামরিচ ৮/১০টা, ঘি+চিলি অয়েল ২ ভাগের ১ কাপ, জর্দার রং ঘন কেওড়া ১ চা চামচ, লবণ পরিমাণমতো, রোজখেরি বাটা ১ চা চামচ, মরিচ গুঁড়ো ১ চামচ, টমেটো পেস্ট ১ চা চামচ, টক দই ৪ ভাগের ১ কাপ, বাটা পঁয়াজ ২ ভাগে ১ কাপ, আদা বাটা ১ চা চামচ, পোস্তাদানা বাটা ২ টেবিল চামচ, বাদাম বাটা ৪ ভাগের ১ কাপ, কারি পাউডার ১ চা চামচ, চিনি ১ টেবিল চামচ, গরম মসলা ৪/৫ পিস।
যেভাবে তৈরি করবেন : চুলায় ঘি এবং চিলি অয়েল দিয়ে গরম মসলা দিন। এবার বাটা মসলাগুলো কষিয়ে মাংস দিন। ১ কাপ গরম পানি দিন। সিদ্ধ হলে নামিয়ে বাদাম কিসমিস দিয়ে ডেকোরেশন করুন। রান্নার সব শেষে ঘন কেওড়া, রংপানি, গুঁড়ো দুধ (২ টেবিল চামচ) একসঙ্গে গুলে নিন।

দই রেজালা

উপকরণ : গরু/খাসির মাংস ১ কেজি টক দই ১ কাপ, পোস্তাদানা বাটা ১ টেবিল চামচ, পঁয়াজ বেরেস্তা আধা কাপ, জয়ফল ও জয়ত্রী ১ চা চামচ, ঘি আধা কাপ, কিসমিস বাটা ২ টেবিল চামচ, পঁয়াজ বাটা আধাকাপ, মরিচ বাটা ১ টেবিল চামচ, চিনি ৪ টেবিল চামচ, আদা বাটা ১ টেবিল চামচ, রসুন পেস্ট ১ টেবিল চামচ।
যেভাবে তৈরি করবেন : মাংসের টুকরা কেটে ভালো করে ধুয়ে-মুছে নিন যেন একটুও পানি না থাকে। এবার মাংসের আদা বাটা, পঁয়াজ বাটা, রসুন বাটা, টক দই, মরিচ বাটা, পোস্তাদানা বাটা

দিয়ে মাখিয়ে কাটা চামচ দিয়ে কেটে নিন। চুলায় পাত্র বসিয়ে ঘি দিন। ঘি গরম হলে কিসমিস ও জয়ফল, জয়ত্রীবাটা অল্প পানি দিয়ে কষিয়ে মাখনো মসলাসহ মাংস দিন। কম আঁচে উল্টে দিয়ে মাঝে মাঝে নাড়ুন এবং সিদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত ঢেকে রান্না করুন। সবশেষে চিনি ও বেরেস্তা দিয়ে গায়ে মসলাসহ নামিয়ে পরিবেশন করুন।

মিট বল

উপকরণ : সলিড মাংস আধা কেজি, সিদ্ধ ডিম ২টি, গাজর, বরবটি, আলু আধাসিদ্ধ দেড় কাপ, আদা বাটা ১ টেবিল চামচ, টেস্টিং সল্ট ১ টেবিল চামচ, গোলমরিচ গুঁড়ো কিউব ২ টেবিল চামচ, সয়াসস ২ টেবিল চামচ, কাঁচামরিচ ও লবণ পরিমাণমতো, মাখন ১ টেবিল চামচ।
যেভাবে তৈরি করবেন : সব সবজি আধা সিদ্ধ করে নিন। মাংস ছোট ছোট টুকরা করে আদা, রসুন, সয়াসস, লবণ দিয়ে সিদ্ধ করে নিন। সিদ্ধ মাংস ও সিদ্ধ ডিম চপ করে নিন। এবার সিদ্ধ সবজি, মাংস ডিম, টেস্টিং সল্ট, কাঁচামরিচ, পঁয়াজ, গোলমরিচ ও মাখন দিয়ে মাখিয়ে ডো বানিয়ে নিন। গোল গোল বরের মতো বানিয়ে ডিমে চুবিয়ে বিস্কুটের গুঁড়োয় গড়িয়ে ডুবো তেলে ভেজে নিন। ফ্রান্স ফ্রাই দিয়ে পরিবেশন করুন।

কাটা মাসালা মুরগি

উপকরণ : মুরগি ১টা (ছোট টুকরা করা) তেল হাফ কাপ, টক দই হাফ কাপ, আস্ত জিরা ১ চা চামচ, পঁয়াজ (কিউব করে কাটা) ১ কাপ, রসুন

কুচি ১ টেবিল চামচ, আদা কুচি ১ টেবিল চামচ, আদা কুচি ১ টেবিল চামচ, পুদিনা পাতা বাটা ১ টেবিল চামচ, ধনে পাতা ১ টেবিল চামচ, গরম মসলা গুঁড়ো ১ চা চামচ (এলাচ, গোল মরিচ, কাবাব, চিনি, জয়ত্রী-জয়ফল, শাহী জিরা নোস্তাফণা শুকনা মরিচ গুঁড়ো করে নিতে হবে), তেজপাতা ১টা, গোল মরিচ গুঁড়ো হাফ চা চামচ, পানি ১ কাপ।

যেভাবে তৈরি করবেন : তেল, জিরা, তেজপাতা, পঁয়াজ ছাড়া সব উপকরণ দিয়ে মুরগি ১ ঘণ্টা মেখে রাখতে হবে হাড়িতে তেল গরম করে জিরা তেজপাতা ও পঁয়াজ দিয়ে ভুনা করতে হবে। পঁয়াজ বাদামি রং হলে মাখনো মুরগি দিয়ে মাঝারি আঁচে তুলতে হবে। কিছুক্ষণ পর আগুন বাড়িয়ে দিয়ে ভালোভাবে ভুনেতে হবে, পানি দিয়ে মুরগি সিদ্ধ হতে দিতে হবে পানি শুকিয়ে তেল ওপরে উঠে এলে চুলা থেকে নামিয়ে বেরেস্তা দিয়ে পরিবেশন করতে হবে।

মুরগির রোস্ট

উপকরণ : মুরগি (বড়) ১টা দেড় কেজি, টকদই ১ কাপ, মিস্তি দই ২ ভাগের ১ কাপ, চিনি ২ টেবিল চামচ, গোলাপ জল ২ ভাগের ১ চা চামচ, তেল ১ পোয়া (৪ ভাগের ১), পঁয়াজ কুচি ১ পোয়া, আদা বাটা ১ টেবিল চামচ, রসুন বাটা ১ টেবিল চামচ, পোস্তাদানা বাটা ২ ভাগের ১ টেবিল চামচ, জয়ত্রী/জয়ফল ২ ভাগের ১ চা চামচ, শুকনা মরিচ গুঁড়ো ১ চা চামচ, দুধ (ঘন) ১ কাপ, তেজপাতা ২/৩ টা, এলাচ, দারচিনি ৩টা, করে কিসমিস বাটা ২ চা চামচ, পানি ২ ভাগের ১ কাপ, লবণ স্বাদমতো, জাফরান রং অল্প।
যেভাবে তৈরি করবেন : পঁয়াজ ভেজে বেরেস্তা করে নিতে হবে। মুরগি টক দইয়ে মেখে আধা



ঘণ্টা রাখতে হবে। টক দইয়ে মেখে আধা ঘণ্টা রাখতে হবে। টক দই থেকে তুলে জাফরান রং মেখে ডুবো তেলে হালকাভাবে ভেজে নিতে হবে। হাঁড়িতে তেল দিয়ে আধা ভাগ পেঁয়াজ ভাজা ও বাকি টকদই, মিষ্টি দই, বাটামসলা ও মরিচ দিয়ে রান্না করতে হবে।

মোরগ পোলাও

উপকরণ : চিকেন ১টি ৪ পিস, মরিচের গুঁড়ো ১ চা চামচ, মাংসের পেস্ট মসলা ১ চা চামচ, পেঁয়াজ আধা কাপ, বাটার অয়েল ১ কাপ, লং ও এলাচ ৫টি করে, রসুন বাটা ২ টেবিল চামচ, ভাজা চিনা বাদাম ১ টেবিল চামচ, ক্রিম ২ টেবিল চামচ, চিনি ১ চা চামচ, সয়াবিন তেল ১ কাপ, লবণ পরিমাণমতো, কারি পাউডার ১ চামচ, আদা বাটা ২ টেবিল চামচ, চাল ২ কাপ, টক দই ১/২ কাপ।
যেভাবে তৈরি করবেন : পাত্রে তেল ও বাটার অয়েল দিয়ে লং এলাচ দিন। বাটা পেঁয়াজ, বাটা আদা রসুন, মরিচ ও টমেটোর সস বাদাম বাটা, মাংস পেস্ট মসলা দিয়ে কষিয়ে মুরগি দিন। ২০ মিনিট দমে দিয়ে রান্না করুন এবং পোলাওতে মেশান।

মাংস পেস্ট মসলা : উপকরণ— রোজমেরি ১ চা চামচ, কিসমিস ৪ চা চামচ, পোস্তাদানা ২ চা চামচ, গোলাপ পাপড়ি ১/২ চা চামচ। পানি দিয়ে পাটায় মিহি করে বেটে নিন। ফ্লেভার তৈরির উপকরণ, গুঁড়ো দুধ ২ টেবিল

মুরগির তেহারি

উপকরণ : মুরগি দেড় কেজি ছোট টুকরা করা, চাল ১ কেজি, আদার রস সিকি কাপ, রসুনের রস ১ টেবিল চামচ, পেঁয়াজের রস আধা কাপ, হাড় ছাড়া মুরগির মাংসের কিউব ২ টুকরা, কাঁচা মরিচ ১৪-১৫টা, সাদা গোলমরিচ আধা টেবিল চামচ, সয়াবিন তেল ১ কাপ, লবণ, পরিমাণমতো,

দারচিনি-এলাচ ৪টি করে, টাক দই ১ কাপ, কেওড়ার পানি ২ টেবিল চামচ, দারচিনি, এলাচ জায়ফল, জয়ত্রী ১ টেবিল চামচ।

যেভাবে তৈরি করবেন : জায়ফল, জয়ত্রী, এলাচ, দারচিনি, গোলমরিচ হালকা ভেজে গুঁড়ো করে রাখতে হবে। মুরগি আদা, রসুন, পেঁয়াজের রস, লবণ দই ও পাঁচটি কাঁচা মরিচ দিয়ে ১০ মিনিট মেরিনেট করে রাখতে হবে। পাত্রে আধা কাপ তেল দিয়ে মাখানো মুরগি মাঝারি আঁচে রান্না করতে হবে। মুরগির পানিতেই মুরগি সিদ্ধ করতে হবে। যদি প্রয়োজন হয় তবে পানি দিতে হবে। পানি শুকিয়ে তেলের ওপর উঠলে গুঁড়ো মসলা দিয়ে নেড়ে নামিয়ে ঢেকে রাখতে হবে। হাঁড়িতে চালের দেড় গুণ পানি ফুটিয়ে এলাচ, দারচিনি বাটা আধা কাপ, তেল লবণ মাংসের কিউব ও ১০ মিনিট আগে ভেজনো চাল দিয়ে নেড়ে দিতে হবে। পানি ও চাল সমান হয়ে অল্প আঁচে দমে বসিয়ে কাঁচা মরিচ দিতে হবে। ১০ মিনিট রান্না করা মুরগি পোলাওর ওপর দিয়ে কাঠের চামা দিয়ে ভালোভাবে মিশিয়ে ওপরে কেওড়ারজাল ছিটিয়ে দিতে হবে। ১৫ মিনিট দমে রেখে নামিয়ে পরিবেশন করতে হবে।

খাসির কাচ্চি

উপকরণ : খাসির মাংস, চাল তেল, ঘি, পেঁয়াজ, আদা, রসুন, গরম মসলা, শসা, জিরা, টকদই, দুধ, লবণ পরিমাণমতো।

যেভাবে তৈরি করবেন : কাচ্চির মাংস গরম মসলা, কাচ্চির মসলা মেখে কিছু সময় রাখতে হবে। চাল আদাভাবে আধা সিদ্ধ করে নিতে হবে। এরপর পাতিলে পরিমাণমতো তেল, আদা, রসুন, টকদই, ভাজা পেঁয়াজ, আলুবাখারাসহ সব গরম মসলা দিয়ে মাংস ভালো করে মেখে দিতে হবে। এর ওপর চাল দিয়ে দিতে হবে। চাল দেয়ার পর কোনো নাড়াচাড়া না করে দীর্ঘসময় ঢেকে রাখতে হবে। ঢাকনা দিয়ে ধোঁয়া বের হওয়ার নির্দিষ্ট সময় পর খাসির কাচ্চি তৈরি হয়ে যাবে।

ফুটস সালাত

উপকরণ : আপেল একটি (খোসা ও বিচি ফেলে টুকরো করা), শসা ২ টি, (খোসা ফেলে টুকরো করা), মধু ৪ টেবিল চামচ, টক দই ১০০ গ্রাম (পানি বারানো লবণ)।
পরিমাণমতো, সাদা মরিচের গুঁড়ো ১ চা চামচ, লেটুস পাতা ৮টি, টমেটো লম্ব কুচি আধা কাপ।
যেভাবে তৈরি করবেন : ফলগুলো পানি দিয়ে ধুয়ে পানি পানি ঝরিয়ে নিয়ে একটি পাত্রে হাতের সাহায্যে ভালো করে নেড়ে ফেটিয়ে সব মিশিয়ে নিন। সবকিছু ভালোভাবে মিশে গেলে আলদা করে রাখুন। একটি কাচের বোলে লেটুস পাতা এমনভাবে পাতা এমনভাবে বিছান যাতে পাতাগুলো পাত্রে বাইরে ঝুলে থাকে। এবার পাত্রে সব ফল রেখে ওপরে দই মধুর মিশ্রণটি এমনভাবে ঢেলে দিন যাতে ফলগুলো মিশ্রণ ঢাকা পড়ে।

ফিরনি

উপকরণ : পোলাওর চাল ১ কাপ, দুধ ২ লিটার, কনড্যান্ড মিল্ক ১ টিন, দারচিনি ৪ টুকরা, ছোট এলাচ ৪টি, গোলাপজল ১ টেবিল চামচ, জাফরান আধা চা চামচ, কিসমিস ২ টেবিল চামচ, পোস্তাবাদাম কুচি ৪ টেবিল চামচ, চিনি আধা কাপ।
যেভাবে তৈরি করবেন : গোলাপজলের সঙ্গে জাফরান মিলিয়ে ভিজিয়ে রাখতে হবে। পোলাওর চাল এক ঘণ্টা ভিজিয়ে রেখে আধা বাটা করে দুধ দিয়ে জ্বাল করার সময়, দারচিনি ও এলাচ দিতে হবে। চাল সেদ্ধ হলে চিনি, কনড্যান্ড মিল্ক, জাফরান মিশ্রিত গোলাপজল, কিসমিস, পোস্তাবাদাম কুচি দিতে হবে। ৪. ঘন হয়ে এলে পাত্রে ঢেলে মাওয়া গুঁড়ো, পোস্তা ও কিসমিস দিয়ে সাজিয়ে পরিবেশন করতে হবে।





প্রবন্ধ

কাজী নজরুল ইসলামের কবিতায় ঈদুল ফিতর

এ কে আজাদ

মুসলিম সংস্কৃতিতে ঈদ হলো প্রধান ধর্মীয় উৎসব। পূর্ণ এক মাস সিয়াম সাধনার পরে পালিত হয় ঈদুল ফিতর। যুদ্ধ শুরুর আগে সেনাবাহিনীতে যেমন স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়, ঠিক তেমন ধৈর্য, ত্যাগ-তিতিক্ষা, উদার মানসিকতা, পরোপকারিতা, পারস্পরিক সহমর্মিতা, অর্থনৈতিক অপচয় রোধ এবং সর্বোপরি সমাজে অর্থনৈতিক সুখম বণ্টন নিশ্চিত করতেই রমজানের মাধ্যমে মহান আল্লাহ রক্বুল আলামিন মানবসমাজে দীর্ঘ এক মাস ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করেছেন, যাতে সারা বছর মানুষ রমজানের এ শিক্ষা কাজে লাগিয়ে সমাজে শান্তি-কুজ্বলা বজায় রাখতে

পারে। সেই সঙ্গে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত এবং আদল ও ইহসানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে পারে। পবিত্র ঈদুল ফিতরের উৎসবমুখর মহড়ার মাধ্যমে এ প্রশিক্ষণ সমাপ্ত হয়। তাই সমাজে ঈদুল ফিতরের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীমা। এটা শুধু মুসলমানের ধর্মীয় উৎসবই নয়, গোটা জাতির জন্য শিক্ষামূলক সামাজিক উৎসবও বটে। সুতরাং এটি সমাজের প্রতিটি মানুষকে সমভাবে আলোড়িত করে। আর একজন কবির সংবেদনশীল হৃদয়ে তো এর স্পর্শ লাগবেই। তাই তো কবি-সাহিত্যিকের কলমে নানাভাবে বিধৃত হয় ঈদুল ফিতর। বাংলা সাহিত্যে যখন মুসলমান কবি-সাহিত্যিকের

অংশগ্রহণ শুরু হয়, তখন থেকেই ঈদুল ফিতর নিয়ে অনেক কবিতা, গান, গল্প, নাটিকা ইত্যাদি লেখা হয়েছে। তবে গবেষণায় দেখা যায়, তাদের মধ্যে বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামই এককভাবে কাজ করেছেন সবচেয়ে বেশি। ঈদুল ফিতর নিয়ে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ এবং ইসলামের সুগভীর মর্মবাণীসমৃদ্ধ কবিতা রচনা করেছেন কাজী নজরুল। হতে পারে ইসলামী জ্ঞানে তার পাণ্ডিত্য ছিল বেশি, অথবা মনেপ্রাণে মুসলমানের ইতিহাস-ঐতিহ্যের প্রতি বিশ্বাসী ছিলেন তিনি, অথবা মানুষ ও মানবতার মুক্তির জন্য মুসলমানের ধর্মীয় উৎসব কতটা সামাজিকভাবে দায়বদ্ধ তা প্রকাশ করার মানসেই হয়তো বা ঈদুল ফিতর নিয়ে এত বেশি কাজ করেছেন তিনি। তার কবিতাগুলোয় ইসলামের মৌলিক সৌন্দর্যই প্রকাশিত হয়েছে। মানুষ এবং মানবতার জন্য ইসলামের যে কর্মপন্থা তাও প্রকাশিত হয়েছে নজরুলের কবিতায়। শুধু কবিতাই লেখেননি তিনি, গান ও নাটিকাও রচনা করেছেন।

‘ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে এলো খুশীর ঈদ, তুই আপনাকে আজ বিলিয়ে দে শোন্ আসমানী তাকীদ ॥’

কাজী নজরুল ইসলামের এ গান না হলে যেন ঈদুল ফিতরই অপূর্ণ থেকে যায়। এ গানের মতোই ঈদুল ফিতরের সঙ্গে কাজী নজরুল ইসলামের সম্পৃক্ততা। ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহা উভয় ঈদ নিয়েই লেখালেখি করেছেন তিনি। যেহেতু ঈদুল ফিতর আমাদের বহমান প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য, সেহেতু ঈদুল ফিতরবিষয়ক নজরুলের কবিতাগুলোর দিকেই এবার দৃষ্টি ফেরানো যাক। আল্লাহ এক। তিনি অদ্বিতীয়। তিনি সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা। এখানে ধনী-গরিব সব মানুষই আল্লাহর সৃষ্টি। তাই মানুষে মানুষে বৈষম্য নেই, আছে সাম্য-সম্প্রীতি— এ হলো ইসলামের মৌলিক দর্শন। এ দর্শনের জয় হবে যদি প্রকৃত ঈদের শিক্ষা আমরা জীবনে গ্রহণ করতে পারি।

আল্লাহর করুণা রোদ, বৃষ্টি, আলো, বাতাস ইত্যাদি জাতিধর্মবর্ণনির্দেশে সবার মাঝে বর্ষিত হয় সমানভাবে। আবার আল্লাহর ক্রোধ যখন প্রাকৃতিক দুর্যোগ হয়ে দেখা দেয় তখনো কোনো ভেদাভেদ না করে সবাই তার দ্বারা সমানভাবে প্রভাবিত হয়। তাই তো এক আল্লাহর গুণগান গাওয়া চাই, এক আল্লাহর প্রতি অগাধ বিশ্বাস চাই; আর চাই এক আল্লাহর জয়। অন্য পথে অন্য মতে মানুষের কোনো মুক্তি নেই— এমনটিই মনে করতেন কাজী নজরুল ইসলাম। তাই তো তিনি লিখেছেন— পরোমৎসব হবে সেদিন ময়দানে সাত আসমানে দোল খাবে জয়গানে

এক আল্লাহর জয়গানে

মহামিলনের জয়গানে

‘শান্তি’ ‘শান্তি’ জয়গানে। [নতুন চাঁদ]

তবে তার জন্য চাই আল্লাহর একাত্মবাদে অপরিণীম এবং অটুট বিশ্বাস। কারণ তাকে না চিনতে পারলে যে নিজেকেও চেনা যাবে না। বহু চেতনায়, বহু ঈশ্বরে বিশ্বাসে নিজের অস্তিত্বই বিলীন হয়ে যায়। তাই তো আমরা নিজেকে চিনতে

ব্যর্থ হই। নজরুলের ভাষায়—
কত নামে ডাকি — সর্বনাম,
এক তিনি
তারে চিনি না কো, নিজেরে তাই
নাহি চিনি
আলো বৃষ্টি তাঁহার দান
সব ঘরে ঝরে এক সমান।
ডুডুডুডুডুডুডুডুডু
এক সে স্রষ্টা সব কিছুর
সব জাতির
আসিছে তাঁহারই চন্দ্রালোক
এক বাতির!

[নতুন চাঁদ]

ঈদের সে প্রকৃত চন্দ্রালোক যারা পায়, তারা ভীরা নয়, কাপুরুষ নয়। তারা বীর। পাহাড়সম উচ্চ তাদের শির। তারাই প্রকৃত নওজোয়ান। তাদের মন নেই, দেহ নেই। আছে কেবল দুর্জয় প্রাণশক্তি। এই প্রকৃত সাহসী মানুষেরাই ঈদের মর্ম বুঝতে পারে। জ্যোতিষ্মান ঈদের চাঁদ দেখার যোগ্য তারা।

এরাই দেখিবে নতুন চাঁদ

জ্যোতিষ্মান

ইহাদের নাই দেহ ও মন

কেবল প্রাণ

নৌজোয়ান!

নৌজোয়ান!

[নতুন চাঁদ]

ঈদের প্রকৃত সুখ তারা পায়, যারা অন্যায়-অবিচার পায় দলে, মিথ্যা ভেদাভেদ ভুলে মানুষের মর্যাদা দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠা করতে পারে। আল্লাহ যেমন সমান দৃষ্টিতে সবাইকে দেখেন, এই সাহসী মানুষেরাও তেমন চক্ষুন্মান। এদের ব্যাপারেই নজরুলের আশাবাদ—

এক আল্লাহর সৃষ্টিতে

এক আল্লাহর দৃষ্টিতে

দেখিবে সবারে দুনিয়াতে

নৌজোয়ান।

[নতুন চাঁদ]

কাজী নজরুল ইসলামের ‘নতুন চাঁদ’ কবিতাটি পড়লে ঈদ সম্পর্কে আমাদের মনে এ ধারণাই প্রতিয়মান হয় যে, ঈদ কেবল দুঃখীর দুঃখ ভাগ করে নেয়াই বোঝায় না। বরং সব অনাচার-অবিচার ঠেলে, আঁধারের কালিমা পায়ে দলে, আলোর মশাল হাতে নিয়ে জাগ্রত হতে শেখায়, যে মশালের আলো ছড়িয়ে পড়বে দিক থেকে দিকে।

ঈদের যে জামাত হয়, ঈদগাহে যে নামাজ হয়,

সে নামাজের ইমাম সাহেবের দায়িত্ব-কর্তব্য নিয়েও আলোকপাত করেছেন কাজী নজরুল ইসলাম। ইসলামের পূর্ণ যৌবন যুগে যখন ইমামরা ঈদের জামাতের খুতবা পড়তেন, সে খুতবা শুনে শ্রোতারা ইসলামের শক্তিতে নিজেরদের শানিত করতে পারতেন। কেননা ইসলাম হলো আলো।

যেখানে ইসলামের আগমন, সেখানে সব অন্ধকারের অবসান। কিন্তু বর্তমানে ঈদের মাঠে ইমাম সাহেব যে খুতবা দেন, তাতে জনগণের মাঝে কোনো আলোড়ন সৃষ্টি হয় না। তাদের মনে ইসলামের মৌলিক আলোর বিচ্ছুরণ ঘটে না। বরং তারা খুতবার সময় আলস্যে বিমায়, অবসাদগ্ৰস্ত হয়ে ঘুমায়। এই যে প্রাণহীনতা, তাকে ব্যঙ্গ

করেছেন কাজী নজরুল ইসলাম। তিনি লিখেছেন—
আজিও তেমনি জমায়েত হয় ঈদগাহে, মসজিদে
ইমাম পড়েন খুতবা, শ্রোতার আঁখি ঢুলে আসে
নিদে;

যেন দলে দলে কলের পুতুল শক্তি শৌর্যহীন
নাহি ক ইমাম, বলিতে হইবে ইহারা মুসলমীন
পরম পূর্ণ শক্তি-উৎস হইতে জনম লয়ে
কেমন করিয়া শক্তি হারালাে এ জাতি? কোন সে
ভয়ে?

তিলে তিলে মরে, মানুষের মত মরিতে পারে না
তবু?

আল্লাহ যার প্রভু ছিল, আজ শয়তান তার প্রভু!
খুঁজিয়া দেখিনু — মুসলিম নাই, কেবল কাফের ভরা
কাফের তারেই বলি, যারে ঢেকে আছে শত ভীতি
জরা,

অজ্ঞান-অন্ধকার যাহারে রেখেছে আবৃত করি,
নিত্য সূর্য জ্বলে, তবু যার পোহালো না বিভাবরী!

[আজাদ]

কাজী নজরুলের মতে ঈদের শিক্ষা সেই তো গ্রহণ করতে পেরেছে যার ভেতরে পূর্ণ ইসলাম বর্তমান। তার মতে—

সেই সে পূর্ণ মুসলমান সে পূর্ণ শক্তি ধর,
‘উম্মি’ হয়েও জয় করিতে যে পারে এই চরাচর।

[আজাদ]

এ একই কবিতায় তিনি লিখেছেন জরাগ্রস্ততা, আলস্য, উদ্যমহীনতা, ভীরা ও কাপুরুষতা দূর করে ইসলামকে বিজয়ী করতে না পারলে সারা জীবন রোজা পালন করেও ঈদের অভিনবত্ব আবিষ্কার করা সম্ভবপর নয়। তার ভাষায়—
জরারে পৃষ্ঠে বহিয়া বহিয়া জীবন যাবে তব,
জীবন ভরিয়া রোজা রাখি, ঈদ আনিবে না
অভিনব।

কাজী নজরুলের কবিতার মর্মবাণী বড় সুগভীর। ভুখা-নাগা মানুষের ক্ষুধার্ত দিনগুলোকে তিনি তুলনা করেছেন রমজানের সঙ্গে। রমজান মাসে পানাহার পরিত্যাগ করে মানুষ রোজা পালন করে। রোজা শেষে আসে খুশির ঈদ। আল্লাহর রহমত পায় রোজাদার। তার জন্য চাই আল্লাহতায়ালার স্মরণ। তার স্মরণের মাঝেই রয়েছে রহমতের ফল্গুধারা। ঠিক তেমনি আজকে যারা অনাহারে-অর্ধাহারে দিন কাটাচ্ছে, তারা যদি আল্লাহকে স্মরণ করে সদা চেষ্টায় থাকে তাহলে তারাও পাবে রোজাদারের মতো ইফতারের শুভক্ষণ। তাদের জীবনেও আসবে ঈদের উৎসব। ব্যাথাভুর রাত্রির শেষে তাদের জীবনেও উদিত হবে আলো ঝলমল রাঙা রবি। সেই আশাবাদ নজরুলের ‘কেন জাগাইলি তোরা’ কবিতায়—

‘মাহে রমজান’ এসেছে যখন আসিবে শবে কদর
নামিবে তাহার রহমত এই ধুলির ধরার পর।
এই উপবাসী আত্মা, এই যে উপবাসী জনগণ
চিরকাল রোজ রাখিবে না— আসে শুভ ‘এফতার’
ক্ষণ।

আমি দেখিয়াছি আসিছে তোদের উৎসব-ঈদ-চাঁদ,
ওরে উপবাসী ডাক তাঁরে ডাক, তাঁর নাম লয়ে
কাঁদ।

আমি নয় ওরে আমি নয় — তিনি যদি চান ওরে
তবে

সূর্য্য উঠিবে, আমার সহিত সবার প্রভাত হবে।

ঈদ হাসতে শেখায়, ভালোবাসতে শেখায়, সাম্য

হের ঈদগাহে চলিছে কৃষক যেন প্রেত কঙ্কাল!
কশাইখানায় যাইতে দেখেছে শীর্ণ গরুর পাল?
রোজা এফতার করেছে কৃষক অশ্রু-সলিলে হায়
বেলাল! তোমার কণ্ঠে বুঝি গো আজান থামিয়া
যায়!

খালা, ঘটি-বাটি বাঁধা দিয়ে হের চলিয়াছে ঈদগাহে
তীর খাওয়া বুক, ঋণে-বাঁধা-শির লুটাতো খোদার
রাহে।

জীবনে যাদের হররোজ রোজা ক্ষুধায় আসে না
নিদ

মুমূর্ষ সেই কৃষকের ঘরে এসেছে কি আজ ঈদ?
একটি বিন্দু দুধ নাহি পেয়ে যে খোকা মরিল তার
উঠেছে ঈদের চাঁদ হয়ে কি সে শিশু-পাঁজরের
হাড়?

আসমান জোড়া কাল কাফনের আবরণ যেন টুটে
একফালি চাঁদ ফুটে আসে মৃত শিশুর আধর পুটে!
[ঈদ মোবারক]

মানুষের এ দুরবস্থাকে ইসলাম সমর্থন করে না।
ইসলাম হলো আলো, যেখানে ইসলাম থাকে

মুক্তির পথে। তাহলে কীভাবে কোরআন-হাদিস
আজকের ইমাম সাহেবরা পড়েন, যে মুক্তির মন্ত্র
পড়েও মানুষের মুক্তি আসে না? কল্যাণকামী সমাজ
প্রতিষ্ঠা হয় না। তাহলে তারা কি তোতা পাখির
মতো কোরআন-হাদিসের বুলি আওড়ান শুধু?
কোরআন-হাদিসের আলো তাদের বুকের ভেতরে
কি ঢোকে না? আর যারা শ্রোতা তারাও কবরের
বাসিন্দার মতো জেগে ওঠে না কল্যাণময়ী সমাজ
ও রাষ্ট্রব্যবস্থার জন্য। কবরের পাশে কোরআন-
হাদিস পড়লে যেমন মৃত মানুষের কোনো সাড়াশব্দ
থাকে না, ঈদের মাঠে সারি সারি জনতাও তেমন
কোরআন-হাদিস শুনে নীরব থাকে। আলোর মশাল
হাতে জেগে ওঠে না। ওই কবরের মৃত ব্যক্তি আর
ঈদের মাঠের মুসল্লির মধ্যে কীই বা পার্থক্য আছে?
তাই তো কাজী নজরুলের কণ্ঠে প্রশ্নভরা আক্ষেপ-
কোথায় ইমাম? কোন্ সে খোৎবা পড়িবে আজিকে
ঈদে

চারিদিকে তব মুর্দার লাশ, তারি মাঝে চোখ বিধে,
জরীর পোশাকে শরীর ঢাকিয়া ধনীরা এসেছে সেথা

আছে, সেখানে ইসলাম ছাড়া অন্য ব্যবস্থা থাকতে
পারে না। আর যেখানে ইসলাম নেই, সেখানে
ইমানও নেই। তাহলে ইমাম সাহেবসহ আর যারা
ইমানের দাবি করছেন আদতেও কি তাদের ভেতরে
ইমান আছে? এমন প্রশ্ন নজরুলের—

ইমান! ইমান! বল রাত দিন, ইমান কি এত
সোজা?

ইমানদার হইয়া কি কেহ বহে শয়তানী বোঝা?
শোন মিথ্যুক! এই দুনিয়ায় পূর্ণ যার ইমান
শক্তির সে, টলাইতে পারে ইঙ্গিতে আসমান।
আল্লাহর নাম লইয়াছ শুধু বোঝনি আলার
নিজে অন্ধ যে— সে কি অন্যের আলোকে লইতে
পারে?

নিজে স্বাধীন হইল না যে— সে স্বাধীনতা দেবে
কাকে?

মধু দেবে সে কি মানুষে যাহার মধু নাই মোচাকে!
কোথা সে শক্তি-সিদ্ধ ইমাম প্রতি পদাঘাতে যার,
আবে জমজম শক্তি-উৎস বাহিরায় আনিবার?
আপনি শক্তি লাভেনি যেই জন, হায় সে শক্তিহীন
হয়েছে ইমাম, তাহারি খোৎবা শুনিতোছি নিশিদিন।
[কৃষকের ঈদ]

কাজী নজরুল ইসলাম বাংলা সাহিত্যের প্রধান
কবি, মুসলমানের ইতিহাস-ঐতিহ্যের প্রতি যার
ছিল অগাধ বিশ্বাস; মানুষ ও মানবতার জন্য যার
ছিল সীমাহীন দরদ। ধর্মবর্ণনির্বিশেষে সব মানুষের
মুক্তির জন্য তিনি নিরলসভাবে করেছেন সাহিত্য
সাধনা। ইসলাম সম্পর্কে তার ছিল প্রকৃত জ্ঞান।
ঈদুল ফিতর নিয়ে ইসলামের প্রকৃত দৃষ্টিভঙ্গিই
প্রকাশিত হয়েছে তার কবিতায়। ইসলামের মৌলিক
যে শিক্ষা, ইসলামের আসল যে চলার পথ তাও
তিনি ব্যক্ত করেছেন তার ঈদসংক্রান্ত পদাবলিতে।
আইয়্যামে জাহেলিয়া তথা অন্ধকার যুগ থেকে
আলোর দিকে আহ্বানকারী যে ধর্মব্যবস্থা, যে
মতবাদ, তার নান্দনিক রূপ প্রকাশও আশা
করেছেন তিনি তার কবিতায়। ঈদ বলতে তো
বোঝায় খুশি, আনন্দ। কবি কাজী নজরুল
ইসলামের মতে তখনই তো প্রকৃত আনন্দ মানুষ
পাবে, যখন আকাশের চাঁদের মতো নির্মল সুন্দর
মানুষের জীবন হবে। তার জন্য চাই একটা
শক্তিশালী নেতৃত্ব, তিনি সেই নেতৃত্বের প্রতিই
ইঙ্গিত করেছেন, যে নেতৃত্ব নিয়ে এসেছিলেন
মানবতার মুক্তিদূত মহানবী (সা.)। তাঁর দেখানো
পথ ও মতের সাধকই কেবল যন্ত্রণাক্রান্ত
মানবজাতিকে দেখাতে পারে আলোর পথ। সেই
আলোর মিছিলেই কেবল মিলতে পারে শান্তি, সুখ
ও স্বাচ্ছন্দ্য। আর সেদিনই হতে প্রকৃত ঈদ। কবির
ভাষায়—

দীন কাঙ্গালের ঘরে ঘরে আজ দেবে যে নব তাগিদ
কোথা সে মহান শক্তি-সাধক আনিবে যে পুনঃ
ঈদ?

ছিনিয়া আনিবে আসমান থেকে ঈদের চাঁদের হাসি
ফুরাবে না কভু যে হাসি জীবনে কখনো হবে না
বাসি।

সমাধির মাঝে গগিতোছি দিন, আসিবেন তিনি
কবে?

রোজা এফতার করিব সকলে সেই দিন ঈদ হবে।
[কৃষকের ঈদ]



সেখানে তো আর আঁধার থাকতে পারে না।
যেখানে ইসলামী অর্থনীতি আছে, সেখানে দারিদ্র্য
থাকতে পারে না। যেখানে দারিদ্র্য আছে সেখানে
নিঃসন্দেহে ইসলাম নেই। ইসলাম তো শক্তি, যে
শক্তি পরাধীনতার শৃঙ্খল ছিড়ে ডেকে আনে মুক্তি।
মানুষ আছে কিন্তু মুক্তি নেই। তাহলে এখানে
ইসলামের কোনো আলো নেই। এখানে মানুষের
প্রকৃত স্বাধীনতা নেই। স্বাধীনতা ছাড়া মানুষ তো
কবরস্থানে বসবাসরত মৃত মানুষের সমান। তারা
অন্ধকারে বাস করে। এ অন্ধকার থেকে আলোর
পথে মানুষকে ডেকে নিয়ে যাওয়াই হলো নেতার
কাজ। ইসলামে সেই নেতাকেই তো ইমাম বলা
হয়। কিন্তু এ কোন ইমাম আজ ঈদগাহে জরির
জামা গায়ে নামাজ পড়ান? ইমামতি করেন, কিন্তু
মানুষের মুক্তির কোনো বারতা তিনি দিতে পারেন
না। অখচ মহানবী (সা.) এবং তাঁর সাহাবিরা তো
মানব জাতির সেই ইমাম ছিলেন, যারা মানুষকে
ডেকে নিয়ে এসেছেন অন্ধকার থেকে আলোর পথে,

এই ঈদগাহে তুমি কি? তুমি এদেরই নেতা?
নিঙাড়ি কোরান হাদিস ও ফেকা এই মৃতদের মুখে
অমৃত কখনো দিয়াছ কি তুমি? হাত দিয়ে বল
বুকে!

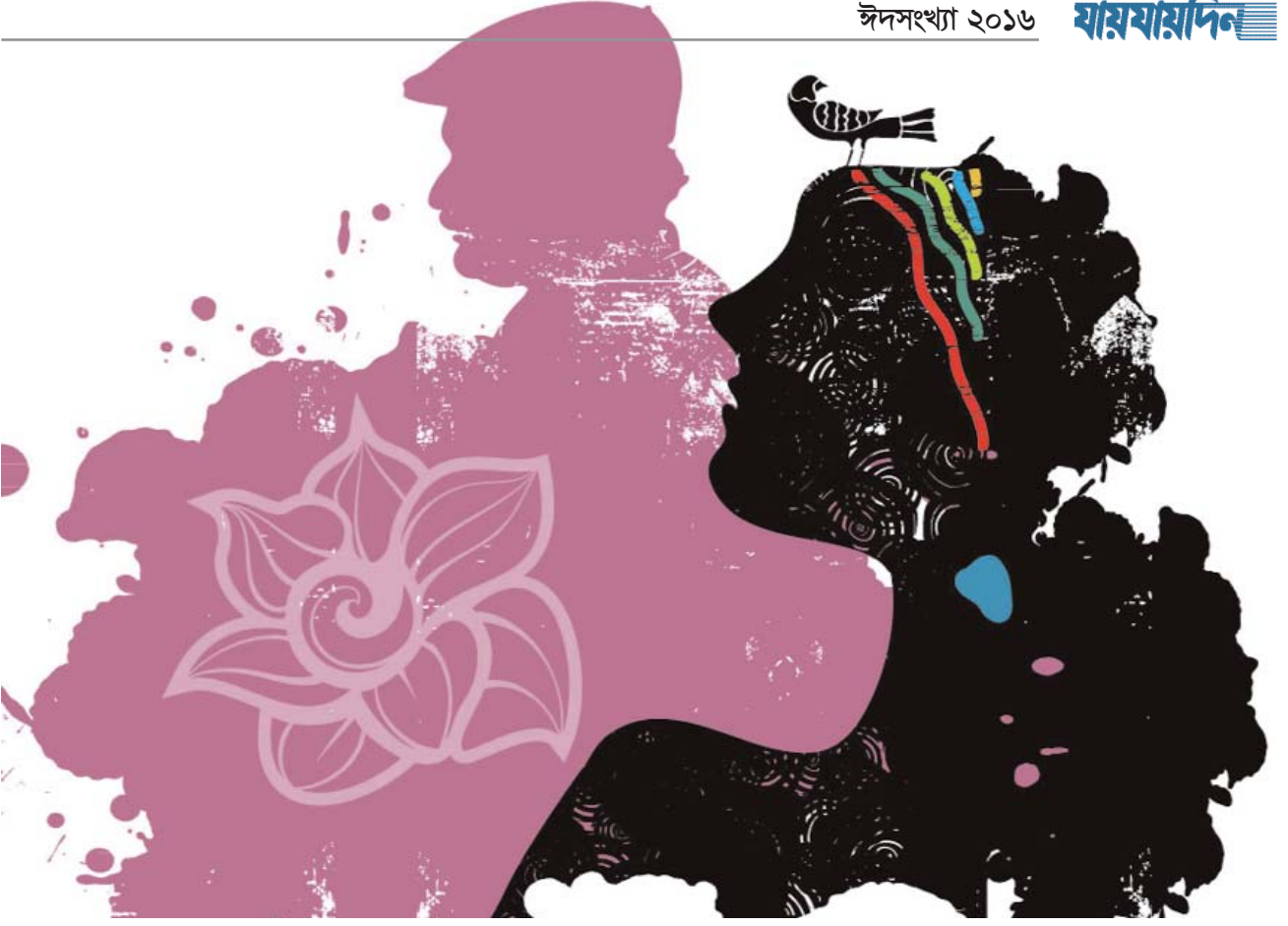
নামাজ পড়েছ, পড়েছ কোরান, রোজাও রেখেছ
জানি

হায় তোতা পাখি! শক্তি দিতে কি পেরেছ
একটুখানি?

ফল বহিয়াছ, পাওনিক রস, হায় রে ফলের ঝুড়ি
লক্ষ বছর বার্ণায় ভুবে রস পায় না'ক নুড়ি।
আল্লাহ তত্ত্ব জেনেছ কি, যিনি সর্বশক্তিমান?
শক্তি পেলো না জীবনে যে জন, সে নহে
মুসলমান।

[কৃষকের ঈদ]

ঈদগাহের ইমাম সাহেবরা ইমানের কথা বলেন।
নিজেকে ইমানদার হিসেবে দাবি করেন। অখচ
ইমলমহীন রাষ্ট্রব্যবস্থার খাদেম তারা। এটা কী
করে হয়? যেখানে ইসলাম আছে যেখানে ইমান



গল্প

হাওয়ায় ভেসে যাওয়া

মনির জামান

নব্বই দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত মধ্যবিত্ত সমাজে আপাকালচার প্রচলিত ছিল। কলেজপড়ুয়া আধুনিকার কম বয়সী দু-এক জন বন্ধু থাকত। ওরা আপার ভক্ত ও অনুরক্ত হতো। আপার রূপগুণ ওদের মোহমায়ায় আটকে রাখত। ওরা আপাকে সঙ্গ দিত। প্রেমে সহায়তা করত। আপাও ওদের জড়িয়ে-টড়িয়ে চুষ্টুমু খেত হয়তো। কিন্তু অল্প দিনেই বয়োজ্যেষ্ঠ কোনো যুবকের সঙ্গে আপার বিয়ে হয়ে গেলে কম বয়সী তরুণ আনমনা হয়ে যেত। আপা বিনে হাঁসফাঁস লাগত। কিন্তু আপা আর ওকে সময় দিত না। হঠাৎ কখনো দেখা হয়ে গেলে ছলনা করে বলত, তুই চিরকাল আমার হৃদয়ের মণিকোঠায় থাকবি...। এটুকুতেই কম বয়সী তরুণের সঙ্গে

সিনিয়র আপার পাগল পাগল সম্পর্কের অবসান ঘটে যেত। ইদানীং গণেশ উল্টে গেছে। আপারা ইদানীং আর ছোট ভাইদের কলিজায় সেকা না দিয়ে রীতিমতো বিয়ে করে ফেলছে। লুকিয়ে পালিয়ে না। রীতিমতো ঘটা করে ঢাকঢোল পিটিয়ে কাচ্চি বিরিয়ানির ডিনারসহযোগে। বলা যায়, নারীদের নবোথানের ফলে নতুন শতাব্দীতে আপাকালচার নবরূপ লাভ করেছে। ইউরোপ-আমেরিকায় তো কম বয়সী স্বামীর হ্যাঁতি ডিম্বাণ্ড। বোম্বাইয়ের ওল্ড হিরো তার ললিপপ ছেলের জন্য ঐশ্বরীয়া আপাকে বউ করে এনেছে। ঢাকায় যে এ রকম দু-একটি ঘটনা ঘটছে না, তা নয়। তাই বলে উনত্রিশ বছরের নয়নতারা চব্বিশ বছরের

জগলুকে বিয়ে করে সংসার পেতে বসবে, এমনটা কেউ আশা করেনি। আরো আশ্চর্যের ঘটনা, দুই পক্ষের গার্জেনরাও মহাধুমধাম করে ওদের বর-কনে হিসেবে বরণ করে নিয়েছেন। নতুন যুগে নতুন করে বলতেই হচ্ছে— মিয়া বিবি রাজি/কেয়া করে গা কাজি।

নয়নতারা শিক্ষিতাই নয়; সূচরু, সুদেহী, সুন্দরীও বটে। অতিসম্প্রতি বিসিএস পাস করে গভর্নমেন্টের ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে চাকরিতে যোগ দিয়েছে। এমন কন্যার জন্য যোগ্য পাত্রের অভাব হওয়ার কারণ ছিল না। নয়নের বাপ-মাও যোগ্য পাত্রের সন্ধান নিচ্ছিল। কিন্তু জগলুর নামে নয়নতারা এমন আড়বাকা দিল, চুপ মেরে যাওয়া ছাড়া অভিভাবকরা আর কোনো পথ পায়নি। নয়নের মা বলেছিল, ছেলোটা এখনো পড়াশোনা করতেছে, নয়ন!

নয়ন বলে, তাতে কী! আমি তো চাকরি করছি। না মানে, সমাজ মানবি না।

আইনে তো নাই; ধর্মও কোনো বাধা নাই। শুধু শুধু সমাজের দোহাই দিচ্ছ কেন, মা।

শেষ চেষ্টা হিসেবে নয়নের মা ঝিমলিকে ধরে।

ঝিমলি আর নয়ন প্রাণের সহ। ঝিমলি এখন মাস্টারনি। ওর স্বামী ব্যাংকার। ওদের একটাই মেয়ে টিকলি। জগলুর প্রসঙ্গ শুনে ঝিমলি হেসে কুটপাট। নয়নের মা চোখ কুচকে বলে, হাসতেছ কেন! ঝিমলি বলে, না মানে, দুনিয়ার কত যে পরিবর্তন হচ্ছে, বোঝা দায়। ঠিক আছে, আমি কথা বলব।

ঝিমলি সঙ্গে মিটিংয়ে বসে নয়ন বলে, জীবন আমার পছন্দও আমার। আমি কোনো হোমরা-চোমরা পুরস্কার ম্যাম হয়ে থাকতে পারব না। কথাটা ঝিমলির খুব লাগে। ওর স্বামী ডাটায়াল পুরুষ। স্বামীর কাছে ঝিমলি চুনোপুটি হয়ে থাকে। মাস্টারি করতেছে বছর দুয়েক হলো। তাও টিকলি বড় হওয়ায় সময় কাটতে চায় না বলে করা। কিন্তু নয়ন একটা জুনিয়র ছেলেকে বিয়ে করবে, এটা কি ওর বিকৃতি না? নয়ন বলে, তাতে কী! পুরুষরা যে যুগ যুগ ধরে কন্যার বয়সী মেয়েদের বিয়ে করতেছে; ওদের লজ্জা লাগে না! ঝিমলি বলে, তার মানে, তুই মাস্টার নয়নতারা খুঁজছিলি?

নয়ন বলে, ইয়েস বন্ধু। কারো লেজুড় হয়ে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব না।

ম্যাজিস্ট্রেট বান্ধবীর সঙ্গে ঝিমলির মতো গৃহিণী মার্কি মেয়ের পক্ষে জেরায় পেরে ওঠা অসম্ভব। সে তবু বলেছিল, নয়ন, বিয়ে জিনিসটা মেয়েদের জীবনে সাংঘাতিক একটা ব্যাপার। ভালো করে ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নে। নয়নতারা খিলখিল করে হেসে বলে, ঝিমলি, তুই এখনো ভেদা মাছ রয়ে গেছিস। মানুষ হওয়ার চেষ্টা করা। জগলুই হবে মিস্টার নয়নতারা। এটাই ডিসিশন। ব্যস।

নয়ন আর জগলু বন্ধু ছিল বটে; বিয়ের সিদ্ধান্ত নেয় আচমকা অনেকটা আবেগের বশে। ওর মোহমায়ায় জগলু এতটাই অতিষ্ঠ ছিল যে, বিচ্ছিন্ন হওয়ার কথা একবারো মাথায় আসেনি। কিন্তু জীবন নানা বয়সে নানা মাত্রা নেয়। বিসিএস পাস করার পর পাল্টে যায় নয়নের জীবনধারা। চাইলেও জগলু আর আগের মতো ওকে পায় না। শ্রীকৃষ্ণ বিচ্ছেদের অনলে রাখার যে দশা হয়েছিল, জগলু

যেন তেমনি দুর্দশায় নিপতিত হয়। নয়ন আপু ছাড়া ওর হাঁসফাঁস লাগে। কিন্তু এ কথা সে কাকে বলবে! ট্রেনিং শেষে নয়নতারা শ্রীমঙ্গলের ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে চলে গেলে জগলুর মন বিদ্রোহ করে বসে— অসম্ভব, নয়ন আপু ছাড়া বাঁচা যাবে না। সে নয়নকে ফোন করে। নয়ন হাসে— ওরে আমার সোনার চান পিতলা ঘুঘু, মনটা আনচান আনচান করতেছে বুঝি! একটু ধৈর্য-সৈন্য বাড়! লেখাপড়ায় মন দে।

জগলু উত্তেজিত হয়ে বলে, গুপ্তিমারি লেখাপড়ার আমার অত ধৈর্য নাই। আমি আসতেছি।

নয়ন হাসে। এসেই তো আমার সঙ্গে ইটিশ-পিটিশ শুরু করবি। আমার দম ফেলার সময় নাই।

একটার পর একটা কাজ লেগেই আছে। আচ্ছা,

ঠিক আছে, শূক-শনি বন্ধে ঢাকায় আসতেছি।

নয়নতারাকে জগলু দূরে সরে যেতে দেবে না।

অন্য কারো হতে দেবে না। নয়ন শুধু তার। অদ্ভুত আবেগ নিয়ে জগলু ট্রেনে চেপে শ্রীমঙ্গল পৌছে যায়। কোনো প্রতোকলের ধার না ধরে

ম্যাজিস্ট্রেটের রুম চুকে পড়ে। নয়ন তখন

কয়েকটা মামলার নথি নিয়ে সহকর্মীদের সঙ্গে

আলাপ করছিল। জগলুকে দেখে চমকে গিয়ে

বলে, তুই হঠাৎ।

জগলু বলে, ওঠো। চল। তোমার সঙ্গে জরুরি কথা আছে।

নয়ন বলে, এফুনি বলতে হবে?

জগলু বলে, ওকে। তুমি কাজ শেষ কর। আমি

বাইরে অপেক্ষা করছি।

নয়ন বলে, বাইরে অপেক্ষা করতে হবে না। সঙ্গে লোক দিয়ে দিচ্ছি। তুই আমার কোয়ার্টারে চলে

যা। ফ্রেশ-ট্রেশ হয়ে বিশ্রাম নে।

জগলু যেদিন শ্রীমঙ্গল যায়, নয়নতারা সেদিন

দুর্দান্ত অ্যাকশনে ছিল। কৈয়াপাড়া বাসস্ট্যান্ডে

স্থানীয় এক নেতা খাস জমিতে বাজার বসিয়ে দশ

বছর ধরে লাখ লাখ টাকা জনগণের কাছ থেকে

টোল আকারে তুলে নিচ্ছে। বার বার সরকারি

নোটিশ দেয়া সত্ত্বেও এমপির মদদ থাকায়

গভর্নমেন্ট অর্ডার ভায়লেন্ট করছে। খালেক

মজুমদার নয়নতারাকে ঘুষ সেধেছিল। এমপিকে

বলে বদলির হুমকি দিয়েছিল। ওসি বলেছিল,

ম্যাডাম, খালেক সাহেবকে ঘাঁটবার দরকার নাই।

এমপিও পার্সেন্টেজ পায়। নয়নতারা পাঠা দেয়নি।

কৈয়াপাড়া বাজারে আগে থেকে রায়ট পুলিশ আর

বুলডোজার রেডি ছিল। বাজারে পৌছে নয়নতারা

প্রথমে মাইকিং করে। মাইকিং সে এক মাস ধরে

করে যাচ্ছে। কিন্তু খালেক মজুমদারের ভরসার

কারণে ব্যবসায়ীরা সরে যাননি। জিপ থেকে নেমে

পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে নয়নতারা হুকুম দেয়—

ভাঙো।

বুলডোজারটা বাজারের কোনায় আঘাত করে।

খালেক মজুমদারের লোকজন মিছিল নিয়ে

বুলডোজারের দিকে এগিয়ে যায়। নয়নতারা

ব্যাটালিয়নকে বলে— অ্যাকশনে যান। শুরু হয়

লাঠিচার্জ। প্রতিপক্ষ ইটপাটকেল ছুড়তে থাকে।

নয়নতারা বলে টিয়ার শেল ছোড়েন।

নতুন ম্যাজিস্ট্রেটের অ্যাকশনে বাজার বন্ধ হয়ে

যায়। কৃষকরা বলে খুব ভালো হইছে। আমরা

মালামাল নিয়া রাস্তার দুই ধারে বসমু। খালেক

মজুমদার বুঝে ফেলে। এই মেয়ে অন্য ধাতুর

তৈরি। সে ফোন করে— দেখাইলেন ম্যাডাম।

আপনার বয়সী আমার একটা মেয়ে আছে।

প্রফেসারি করে। একদম আপনার মতো মাথা

খারাপ মেয়ে...।

নয়নতারা জানে, নেতা এখন কথার প্যাঁচ খেলবে।

নেতা জানে, অস্ত্রে সে হেরে গেছে। এখন কথা

দিয়ে ঘায়েল করতে হবে। কিন্তু নেতাকে সেই

সুযোগ দিতে চায় না নয়ন। সে বলে, আপনার

সঙ্গে পরে কথা বলব। কাজটায় অনেক ঝুঁকি।

নয়নকে ওএসডি করতে পারে। সরিয়েও দিতে

পারে। শোকজ তো করবে নির্ধাৎ। তবু অ্যাকশন

সফল হওয়ায় খুব ভালো লাগে ওর। জগলু কী

টেলিপ্যাথি জানে! সকালবেলায় জগলুকে দেখে

অদ্ভুত এক সাহস চলে এসেছিল। নয়নতারার

সাহস দেখে ওসি বলে যান, বাসায় গিয়ে রেস্ট

নেন। খুব রিস্কি কাজ করেছেন। বাকিটা আমি

সামলাতে পারব। ভয় নেই। খালেক মজুমদারের

লোকজনের ওপর কড়া নজর রাখা হচ্ছে। প্লিজ

ম্যাডাম।

শীতকালে বুপ করে সন্ধ্যা নামে। জগলু খেয়ে

দেয়ে গেস্টরুমে ঘুমিয়ে পড়েছিল। কয়েক দিনের

দুর্ভাবনায় ক্লান্ত ছিল খুব। জিপের শব্দে ঘুম ভেঙে

যায়। নয়নতারা এসে দাঁড়াতেই জগলু বিছানায়

বসে হাত বাড়িয়ে দেয়। নয়ন ছুটে গিয়ে জগলুর

আলিঙ্গনে নিজেকে ছেড়ে দিয়ে বলে, কী যে

ভাল্লাগতেছে। দারুণ একটা অ্যাকশন করে এলাম।

ভয় করতেছে। খালেক মজুমদারের গুণ্ডারা যদি

হামলা করে!

জগলু বলে, কেউ তোমাকে কিছু করতে পারবে

না। বিকজ ইট আর নয়নতারা; মাই লাভ। ওরা

অদ্ভুত আবেগে কালিসন্ধ্যার সরকারি কোয়ার্টারে

অপূর্ব প্রেমে মেতে ওঠে। ঝিঝি ডাকে। নয়নতারা

ভাবে, বিয়ে করা দরকার। জগলুকে করে ফেলি।

জগলু ইজ এ চার্মিং বয়। ভীষণ আবেগী। যাকে

ভালো লাগে, যাকে এত জানি, সেই তো পার্টনার

হবে। জগলু বলে, নয়ন আপু, তুমি বিয়ে করে

ফেল।

নয়ন বলে, কাকে?

যে কাউকে। তোমার যাকে ভালো লাগে।

আমার তো ইচ্ছা করে তোকে বিয়ে করতে।

আমি কি তোমার যোগ্য। আমি কী ঠিকমতো

করতে পারব। আমি তো ছোট। সবাই তোমাকে

ছি ছি করবে।

নয়নতারা খিলখিল করে হেসে ওঠে, 'আমি কি

ডরাই সখা ভিখারি রাখবে!'

নয়নের কোয়ার্টারের সামনে বিশাল এক দিঘি।

রাতের আকাশে দিঘির জলে নেমে আসে।

কয়েকটা ছোট কাছিম ভেসে ভেসে পিঠে জ্যাংলা

মাখে। ঝিঝি ডাকে আর ওপারের জঙ্গলে

কলাবাদুড়গুলো ভীষণ আমোদে ঝাঁপাঝাঁপি করে।

জগলুর আলিঙ্গন থেকে কে পারে নয়নকে সরাতে!

স্বপ্নগুলো ওর হাতের মুঠোয় আপসে ধরা দেয়।

যেন সে এমন জীবনই চাচ্ছিল বহুদিন ধরে।

বিয়ের পর জগলু পাল্টে যায়। নয়নতারার

বাস্তবতার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে গিয়ে উড়নচণ্ডী

ভাবটা জলাঞ্জলি দিয়ে ওর মনের মতো হয়ে ওঠার

চেষ্টা করে। লেখাপড়ায় সিরিয়াস হয়। জগলু যে

বছর এমএ পাস করে নয়নতারা সে বছর

প্রগন্যান্ট হয়। তার আগেই ঢাকায় ফ্ল্যাট কিনে

ফেলে। অনেক উঁচুতে আকাশের কাছাকাছি, মাঝারি আয়তনের ফ্ল্যাট। তানহা জন্মায়। নয়ন লবিং-টবিং করে ঢাকার সচিবালয়ে বদলি হয়ে আসে। প্রিয়জনরা বলে, বাঃ নয়নতারা, তুমি ট্যালেন্ট বটে। তোমার তুলনা নেই। মেয়েদের ভীষণতাই তুমি অনেকখানি ভাঙতে পেরেছ। নয়ন বলে, তোমরাও ভালো হয়ে যাও। স্বামী পদবির পুরস্কার গায়ে হেলান দিয়ে নিজেকে আড়াল করার অভ্যাসটা ত্যাগ কর। মেয়ে না ভেবে নিজেকে মানুষ ভাব।

এজন্য তো তোমার মতো পাওয়ারফুল হওয়া দরকার। পাওয়ার জিনিসটা চেতনার সঙ্গে জড়িত। চেতনাকে শানিত কর, দেখবা, সময় তোমার নিয়ন্ত্রণে এসে যাচ্ছে।

জগলু মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে চাকরি নিয়েছে। কানেকশনটা নয়নতারার। নিজের কেনা গাড়িতে চড়ে সচিবালয়ে যাওয়ার পথে জগলুকে অফিসের সামনে নামিয়ে দিয়ে যায়। তানহাকে রেখে যায় দক্ষ গৃহপরিচারিকার কাছে। এখন তো মোবাইলের যুগ। সর্বক্ষণ পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত থাকা যাচ্ছে। যেটুকু অবসর পায় বাচ্চা নিয়ে মার্কেটে যায়। ভালো রেস্তোরাঁয় ডিনার করে। প্রিয়জনের নিমন্ত্রণ কিংবা পার্টি থাকে কোনো কোনো দিন। তানহাকে মনে হয় দেবশিশু। জগলু বলে, তোমাকে না পেলে আমি হয়তো এখনো ছন্নছাড়াই থেকে যেতাম।

নয়ন বলে, অন্য কারোর সঙ্গে অ্যাডজাস্টমেন্টের ঝামেলাতেই আমার মাথা নষ্ট হয়ে থাকত। জগলু বলে, তুমি নির্ধাৎ আমাকে জাদু করেছিলে। নয়ন হাসে। গুনগুন করে গান গায়। রহস্যময় আবেগ ওকে আপ্ত করে রাখে। কিন্তু সময়ের ক্রমবর্ধমান দৈর্ঘ্যে ছোট ছোট বিষয় যুক্ত হয়ে জীবনধারাকে যে সম্পূর্ণ বিপরীত গতিতে প্রবাহিত করে দিতে পারে— এত খেয়াল কি কারো পক্ষে রাখা সম্ভব! সময়ের সঙ্গে নয়নতারার অফিশিয়াল ব্যস্ততা বেড়েছে চতুর্গুণ। তানহা রীতিমতো স্কুলে যায়। সন্তানের জন্য যে সময় সুখের, পিতা-মাতার ক্ষেত্রে তা তেমনটি নাও হতে পারে। জগলুর ভেতর থেকে প্রেমিকের আবেগ আগেই উবে গেছে। এখন তার ভেতর করপোরেট এক্সিকিউটিভের ভাবধারা পুরোমাত্রায় স্পষ্ট। নয়নতারাই জীবনের সবটুকু না। জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে যেতে থাকে নানান সম্পর্ক। ওর এখন অনেক বান্ধবী। মদের দোকানে দামি ছইস্কির বোতল নিয়ে বসা ছাড়া ওর সারা দিনের কর্মকলাপিত দূর হয় না। এসবের খবরাখবর নয়নতারাই একটু একটু পায় আর একটু একটু বিষণ্ণতা ওকে হ্যামলকের মতো গ্রাস করতে থাকে। জগলু ইদানীং বাসায় ফেরে অনেক রাতে নেশায় চুর হয়ে। নয়নতারাই জানতে চাইলে একটাই উত্তর দেয়— ব্যস্ত ছিলাম। নয়ন বলে, ব্যস্ততা এক ধরনের রোগ। ব্যস্ততাই ভান্নাগতেছে। ব্যস্ততা না আমাকে এড়িয়ে থাকা। তোমার হিংসা হচ্ছে? হিংসা না কষ্ট। কিসের কষ্ট। ভালোই তো আছো। নামিদামি আমলা হয়ে উঠছে। ফরেন টুরে যাচ্ছে। প্রবলেম কোথায়?

জগলুর এই আচরণ নয়নের ভান্নাগে না। এই জগলুকে সে বুঝে উঠতে পারে না। নানান দুর্ভাবনা ওর মাথার মধ্যে তালগোল পাকায়। বয়স্ক স্ত্রীতে কি জগলুর পোষাচ্ছে না? নাকি পুরুষ মানুষ এমনই— নির্মম, বহুগামী, সুরাসক্ত? কিন্তু এসব ভাবনা জগলুর কাছে প্রকাশ না করে বরং ভাবতে থাকে— কী কী অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটতে পারে আগামী দিনগুলোতে? সময়কে নিয়ন্ত্রণে রাখা কঠিন মনে হয় নয়নতারার। কঠিন কাজটাই করতে হবে। জগলুর মতো জুনিয়র ছেলেকে একদিন যেমন অবাধ করে তুলেছিল, তেমনি আবার গুটিয়ে নিতে চায়। তখন জগলুর জগৎ ছিল ক্ষুদ্র। এখন ডানা গজিয়েছে। যে পতঙ্গের পাখা গজায় সে উড়বেই। এক পুরুষকে নিয়েই যে ঘর করতে হবে, এমন দিব্যি নয়ন দিতে চায় না। জীবন তার কাছে নৈসর্গিক। নয়ন দেখে, সময় পাল্টে গিয়ে সম্পর্কের ধৈর্যও খাটো হয়ে এসেছে। ইদানীং বাংলাদেশে মধ্যবিত্তের ঘর ভাঙছে হরদম। এখন ডিভোর্স ডাল-ভাতের মতো। নয়া জমানায় ডিভোর্সিরা বরং পুরুষদের কাছে নতুন আকর্ষণ নিয়ে ধরা দিচ্ছে। হলিউডের অভিনেত্রী এলিজাবেথ টেলর তো বুড়ি বয়সে নাতির সমান ছেলেকে বিয়ে করেছেন। ডায়ানাকে দেখলাম রাজকুমারকে ছেড়ে মুসলিম ছেলের সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। সুবর্ণা আপাও বিয়ে করলেন ফরীদি জীবিত থাকে অবস্থায়। ওদের তুলনায় নয়নতারাই সাধারণ মেয়ে। সে কেন জগলুর মতো ছেলের উচ্ছৃঙ্খলতা সহ্য করে মুখ বুজে থাকবে। তার চেয়ে একাকী একটি জীবন আরো সুন্দর হতে পারে। ভাবতে ভাবতে, সুখ-দুঃখের দোলাচলে বালিশে মুখ ডুবিয়ে ফোঁপাতে ফোঁপাতে সত্যি একদিন আকাশের কাছাকাছি ফ্ল্যাটটা ছেড়ে মায়ের বাড়িতে এসে হাজির হয় নয়নতারা। কয়েক দিনের মাথায় মেয়ের হাবভাব দেখে মা অনুমান করে— ডালমে কিছু কালা হ্যায়। জগলু মাঝে মাঝে আসে। শাড়ির হাতের রান্না খেয়ে একা চলে যায়। যাওয়ার সময় ইতস্তত করে বলে, অনেক দিন তো বেড়ালে। তোমার ফ্ল্যাটের অবস্থা ভালো না। তোমার জন্য দেয়ালগুলো পর্যন্ত হা-হুতাশ করে। জগলুর কথা শুনে নয়নতারাই হেসে কুটিকুটি হয় আর বলে, আমার ফ্ল্যাট আমার জন্য হা-হুতাশ করবে না তো অন্য কারো জন্য করবে! আজকাল ফ্ল্যাটে মেয়ে নিয়ে আসো নাকি? জগলু উত্তর না দিয়ে বলে, চলো তানহা, বাবার সঙ্গে বাসায় চলো। তোমার টানে মা চলে আসবে। তানহা বলে, মা কারো জন্য কোথাও যায় না। বুঝেছি। কান টানলে মাথা আসে, তাই না বাবা? মেয়ের কথায় জগলু অবাক হয়। নয়নতারাই হাসতে হাসতে বলে, ব্যস্ততা আরো বাড়িয়ে দে। তাহলে আর বাসায় ফেরাফিরির সমস্যা থাকবে না। সারা জীবন একই ঘরে ফিরতে হবে, এমন কোনো দিব্যি দেয়া আছে নাকি! নয়নের কথায় জগলু অপমান বোধ করে। নয়ন পাল্টে যাচ্ছে। ওকে আর সহ্য করতে পারছে না। রাস্তায় নেমে জগলু শাস করে— হোয়াট ক্যান আই ডু। আমি কি নয়নতারার পোষা কুকুর? রক্তের সম্পর্ক ছাড়া কোনো সম্পর্কই চিরদিনের না। নয়ন তো আস্ত ফ্যাসিস্ট। সুপিরিওরিটি





কমপ্লেক্সের ডিপো। মাস দুয়েক হয় নয়ন বাবার বাড়ি এসেছে। মেয়েজামাইয়ের হাবভাব মার ভালো ঠেকে না। কিন্তু নয়নের ব্যক্তিত্ব এমনই প্রভাবশালী হয়ে উঠেছে, ওকে কিছু বলার সাহস মার নেই। দিশা না পেয়ে কিমলিকে ফোন দেয়। কিমলি বলে, ওদের সমস্যা কী, আন্টি? মা বলে, মনে হচ্ছে আন্ডারস্ট্যান্ডিং প্রবলেম। কিমলি বলে, আমি আগেই বলেছিলাম। নয়ন পাত্তা দেয়নি। পুরুষ হচ্ছে এক ধরনের বেজি, মুরগির বাচ্চা সে খাবেই খাবে।

খোঁজখবর নিয়ে কিমলি যা জানতে পায়, তা রীতিমতো ভয়ঙ্কর। দুধকলা দিয়ে কালসাপ পোষার মতো। ইদানীং মর্ডার গার্লরা নাকি ওকে ঘিরে রাখে। র‍্যাম্প মডেল সানিকা-সানির সঙ্গে নাকি লিভটুগ রিলেশন।

বাসায় ফিরে গিয়ে কাজের মেয়ের কাছে নয়ন শুনেছে, দুপুরের দিকে জগলু নাকি বন্ধুবান্ধব নিয়ে বাসায় আসে। এদের মধ্যে দুটি মেয়ে নাকি টেলিভিশনে নেচে-গেয়ে ক্লাস্ত হয়ে গিয়ে মাথায় সাবান-শ্যাম্পু মাখে। কিন্তু এসব শুনে ক্রুদ্ধ না হয়ে নয়নের বরং মনের ভাব লাঘব হয়। কিমলি জানতে চায়— এখন কী করবি, নয়ন? নয়ন হাসে, ডিভোর্স করব। কী সাংঘাতিক কথা!

লোকে ছিছি দেবে। তাইলে কী করব? খাঁচায় পুরে রাখব? বোঝা। কুপথ থেকে ফিরিয়ে আন। আমার ঠেকা পড়ছে! ওইসব রগটিন মেয়েদের চেয়ে আমি ঢের সুন্দরী।

তার মানে, জগলুকে ডিভোর্স দিয়ে তুই বিয়ে করবি? বাট নট নাউ।

তোর এসব পোস্ট মর্ডার কথা শুনে মাথা ঘুরছে, নয়ন। তোর মাথা ছোটবেলা থেকে ঘোরে। মাথায় ঠাণ্ডা তেল মাখ।

তুই মাখ। আমারটা তো ঘোরে। তোর মাথা একদম নষ্ট হয়ে গেছে।

কিমলি ফোন কেটে দেয়। নয়নতারা হাসে। একই ছাদের নিচে দুজন মুখোমুখি দাঁড়ালে তারপর আর পাশাপাশি থাকা হয় না। নয়নতারা ছইস্কির গ্লাসে একটু একটু চুমু দেয় আর ড্রয়িংরুমে পায়চারি করে গুনগুন করে গান গায়— যারে যারে উড়ে যারে পাখি/ফুরাল প্রাণের খেলা/শেষ হয়ে এলা বেলা/আর তোরে কেন মিছে বেঁধে রাখি...।

প্রসিক্রির সিঁড়ি উপকে ক্যারিয়ারের যে অবস্থানে জগলু আছে, তার পেছনে নয়নতারার অবদান ষোলআনা। ইচ্ছে করলে মৈনাক পর্বতের মতো ডানা কেটে পথের ভিখারি বানিয়ে দিতে পারে। রাত দুপুরে মাতাল জগলু ঘরে ফিরলে একেক দিন নয়নের মাথায় খুন চেপে যায়। কিন্তু জীবনের জন্য যে সংযম শিখেছে তা সে এড়াতে পারে না। এক রাতে জগলুকে বলে, আমাদের মনে হয় আলাদা থাকা ভালো।

জগলু হতাশ হয়— কী বলল? উইথড্র কর, প্লিজ। আমার ভুলগুলো ধরিয়ে দাও। শুধরে নেব। নয়নতারা বলে, একই বাতাসে চেরির একই ডাল দুবার দোলে না। নয়নের আক্রোশে জগলুর নেশা হালকা হয়ে যায়। নয়ন বলে, অনেক দিন তো একসঙ্গে আছি। এক যুগ কম সময় না। আমরা আর আগের মানুষ নাই। আমার কিছু একান্ত সময় কাটানো দরকার। জগলু নিশ্চুপ হয়ে যায়।

সিগারেট ধরিয়ে খুব ধীরে ধীরে প্যাফ করে। নিজের জন্য করুণা হয়। সে যে একমাত্র নয়নকেই ভালোবাসে, এখন এ কথা চিৎকার করে সারা দুনিয়াকে জানিয়েও কোনো লাভ হবে না। মানুষ আচরণ দেখে সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু আচরণ আর মনের বাস্তবতা সব সময় এক হয় না। জগলু বলে, তুমি কি ভালোভাবে ভেবেছ? নয়ন বলে, তুমি ইচ্ছে করলে তানহাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পার।

জগলু আর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া আবেগী ছেলেটি নেই। দায়িত্ব আর বাস্তবতার মুখোমুখি পূর্ণবয়স্ক একজন মানুষ। পাশাপাশি থাকা মানুষগুলোর চেতনাগত পরিবর্তন আমরা তেমন বুঝে উঠতে পারি না। বহু বছর পর জগলু এমন একজন নয়নতারাকে দেখে, যে খুব জেদি, নিজের মতো বলতে ভালোবাসে, যাকে তার মতো থাকতে দিতে হয়। আবেগ সামলে নিয়ে জগলু বলে, তানহা তোমার কাছেই থাক। আমি মাঝে মাঝে আসব। আগে যেমন তোমার কাছে ছুটে আসতাম। এখন না হয় তানহার জন্য আসব। আমি যাই তাহলে। জগলু উঠে দাঁড়ায়।

নয়ন বলে, রাতটা থেকে যাও। জগলু বলে, না, যাই। কাল বিকালে না হয় আসব একবার। কাল ছুটির দিন। বাসায় থাকবে তো?

আকাশের কাছাকাছি ফ্ল্যাট থেকে নামতে নামতে জগলুর বুক ভেঙে আসে। রাস্তায় নেমে ফুটপাথে ছিন্নমূল মানুষ দেখে। চৌরাস্তার পাগলটা চিৎকার করছে দেখে রাভের হাওয়ায় ভেসে গিয়ে কিছুটা যেন ভারমুক্ত লাগে। এত রাতে কোথায় যাবে ভেবে পায় না। ফুটপাথ ধরে একটানা হাঁটতে থাকে। নয়নতারা কি জগলুর কথা ভাবছে না? ওর কি কষ্ট হচ্ছে না? কষ্ট তো নানাভাবে জীবনের সঙ্গে জড়াতে থাকে। তানহা ঘুমিয়েছে।

সন্তানের কপালে চুমু খেয়ে নয়নতারা বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। ফ্ল্যাটটা যখন কেনে জগলু তখন ছাত্র। নয়নকে উন্মাদের মতো ভালোবাসতো। নিচের রাস্তার গাড়িগুলো জোনাক-পোকাকার মতো ছুটছে যেন। নয়নতারা ওড়নার কোণে চোখ মোছে। কান্না একটা বিকর। আশা-নিরাশার মাঝামাঝি থাকতে চায় নয়ন। নিজেকে ভারমুক্ত রাখতে চায়। কিন্তু নিরপেক্ষ থাকা মানুষের পক্ষে কঠিন কাজ। তার চেয়ে গান শোনা ভালো। মাঝরাতে মিঠা হাওয়া ওকে চারপাশ থেকে জড়িয়ে ধরে জানতে চায় ক্যামন আছ নয়নতারা? নয়ন ঠিক বুঝে উঠতে পারে না, সে ক্যামন আছে। হাওয়ার তোড়ে তার ওড়নাটা শূন্যে উড়ে গিয়ে বাতাসে ঘুরতে থাকে। সে হাত বাড়ায়।

ধরতে পারে না। ওড়নাটা বারান্দার বাধা অতিক্রম করে আকাশের কাছাকাছি ফ্ল্যাটটাকে ছেড়ে রাতের একটুকরো রঙিন মেঘের মতো দেখা দিতে দিতে হাওয়ায় মিলিয়ে যায়। নয়ন রেলিংয়ে হেলান দিয়ে মনে মনে বলে, যা। যার যেখানে ইচ্ছে চলে যা। আমার কী সাধ্য ধরে রাখব! একা একা নয়নের ক্যামন যেন শীত শীত করে। ভয় ভয় করে। জগলু এমন হট করে না গেলেই পারত। কোথায় যাবে এত রাতে! একি হাওয়া! জীবন যেন একটা গডলিকা প্রবাহ। নয়নতারা হাওয়ার তোড়ে ভেসে যায়।



গল্প

দিনলিপি

জহিরুল হক

ফুলঝুড়ি থেকে বাওয়ালকরের গাঁয়ের ভেতর দিয়ে একটি লম্বা রাস্তা চলে গেছে খাগদনের খেয়াঘাটে। দিনরাত এ রাস্তা দিয়ে ফুলঝুড়ি, বাওয়ালকর ও আরো নানা এলাকার লোকজন হেঁটে আবার কখনো রিকশা, নছিমন ও সাইকেলে চলাচল করে। এই সেদিনও রাস্তাটি ছিল সরু ও আঁকাবাঁকা, এখন চওড়া হয়েছে, কোথাও কোথাও তার ইটও পড়েছে। এ রাস্তায়ই ঘটে ঘটনাটি। ঘটনা না বলে একে একটি সাধারণ দুর্ঘটনা বলা যায়। ফুলঝুড়ি থেকে বাওয়ালকরের রাস্তা ধরে এক লোক যাত্রী নিয়ে মোটরসাইকেল চালিয়ে আসছিল। আর রাস্তার ওপরে আড়াআড়িভাবে এক নছিমনচালক মুধাবাড়িতে ঢুকছিল। চালক অমাবস্যা রাতে জনহীন রাস্তায় দ্রুতবেগে চলা সাইকেলটি থামাতে ব্যর্থ

হলে এসে ধাক্কা খায় নছিমনে শুধু এটুকুই। আর এ ধাক্কাই মুহূর্তেই সাইকেলচালকের পেছনে বসা যাত্রী ছিটকে গিয়ে রাস্তার পাশে ডোবায় পড়ে। আর চালকসহ সাইকেলটি ভেঁা ভেঁা শব্দ করে শিরিশ ও তালগাছের সঙ্গে আটকে যায়। সাইকেলটি থেকে অনবরত ধোঁয়া বেরোতে থাকে, আর পেছনের চাকাটি দূরে ছিটকে যায়। ‘ওরে মা!’ বলে একটি চিৎকার সাইকেলের শব্দের সঙ্গে মিলিয়ে যায়। তড়িৎগতিতে নছিমন থেকে দুজন লোক লাফিয়ে নেমে দেখতে পায়, সাইকেলচালকের এক পায়ের হাঁটু পর্যন্ত চামড়া উঠে গেছে। তারা ধরাধরি করে সাইকেলসহ চালককে নছিমনে তোলে। সামান্য আঘাত পেয়ে ডোবা থেকে কাদা-পানিসহ সাইকেল আরোহীও এসে নছিমনে ওঠে। দ্রুতবেগে নছিমন চালিয়ে

চালককে শহরের সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগে এনে প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়া হয়। আর সাইকেল আরোহী অসুস্থ মাকে খুঁজতে হাসপাতালের ওয়ার্ডে চলে যায়।

বাওয়ালকর আর কুমরাখালীর মাঝখানে শুধু একটি মাঠ। তাই দুর্ঘটনার খবরটি চারদিকে ছড়িয়ে যেতে সময় লাগে না। তা ছাড়া সাইকেলচালক নিজেও হাসপাতালের ফোন দিয়ে দুর্ঘটনার কথা বাড়িতে জানায়। তার মা, স্ত্রী ও সন্তান কান্দতে কান্দতে শহরের হাসপাতালে এসে পৌঁছে। অন্যান্য সাইকেলচালক ও আত্মীয়-স্বজনরা খবর শুনে তাকে দেখতে আসে।

দুর্ঘটনাগ্রস্ত এই সাইকেলচালক কুমরাখালী ফকিরবাড়ির জমিরউদ্দীন ফকিরের ছেলে নজরুল। বাবা নেই। স্ত্রী, সন্তান ও মাকে নিয়ে আলাদাভাবে ফকিরবাড়ি থেকে একটি দক্ষিণে তাল, নারকেল, কলা ও খেজুরগাছ ঘেরা নতুন বাড়িতে থাকে ও। বাড়ির সামনে কুমরাখালী খাল, পেছনে বিশাল সবুজ মাঠ। কখনো তাতে থাকে গুচ্ছ গুচ্ছ ধানগাছ, কখনো কলাই আবার কখনো ঘাস আর ঘাস। বর্ষাকালে পুরোমাঠই ধানক্ষেত, কখনো মাঠভর্তি পানি আর পানি। চোতবোশাখে পুরো মাঠ প্রখর রোদে ফেটে চৌচির হয়ে থাকে। বাড়ির আশপাশের মাঠে গাঁয়ের ছেলেমেয়েরা কলাগাছ দিয়ে গোলপোস্ট বানিয়ে ফুটবল খেলে, বিশাল মাঠের এখানে-সেখানে চড়ে বেড়ায় গরু-ছাগল-হাস-মুরগি কবুতর। মাঠের আকাশে উড়ে বেড়ায় চেনা-অচেনা নানা পাখি। শৈশবের নজরুল জমাজমি চাষ করলেও এখন নিজে কোনো জমি চাষ করে না।

ব্যংকের ঋণে কেনা মোটরসাইকেলটিই এখন ওর জীবন-জীবিকার উৎস। নজরুলের সাইকেলে যে চড়েই এমন লোক কুমরাখালীতে খুঁজে পাওয়া যাবে না। শীত-গ্রীষ্ম উপেক্ষা করে প্রতিদিন সকালে কুমরাখালী খালের সরু রাস্তা দিয়ে ও বেরিয়ে পড়ে সাইকেল নিয়ে—কখনো খেয়ে আবার কখনো না খেয়ে। পথ থেকে ও কাউকে তুলে নেয় সাইকেলে, তারপর চাকা গড়িয়ে গড়িয়ে চলে যায় চেনা-অচেনা নানা জায়গায়। সাইকেল নিয়ে রাস্তায় ওঠার সময় পাশের বাড়ির রাবিয়া বুবুর সঙ্গে প্রায়ই ওর দেখা হয়। প্রথম দিকে দেখা হলেই সে জিজ্ঞেস করত, ‘এ ছামরা, এই বেইননাহালে যাও কৈ?’ প্রতিদিন দেখতে দেখতে সে এখন আর ওই কথা জিজ্ঞেস করে না। নজরুল রাতে যখন ফিরে আসে তখন প্রতিদিন দেখা হয় রাবিরার ছেলে নুরুল ইসলামের সঙ্গে। নুরুল ইসলাম খালের ওপরে বাঁধা জাল দিয়ে রাত জেগে মাছ ধরে। নজরুল কখনো বাঁধা জালের পাশে এসে দাঁড়ায়।

প্রথমে সেও তাকে জিজ্ঞেস করত, ‘এ নরজুল, কোমইদদ্যা আইলি?’ এখন জিজ্ঞেস করে, ‘এই আইলি বুজি?’

কারো কথার উত্তর দেওয়ার সময় নজরুলের নেই। ও কখনো তাদের কথার উত্তর দেয়, আবার কখনো দেয় না। কখনো-বা নুরুল ইসলামের কাছ থেকে আগুন নিয়ে সারাদিনের ক্রান্তি দূর করার জন্য ও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে বিড়ি-সিগারেট খায়; আর নুরুল ইসলাম মাছ পায় কি

পায় না তা জিজ্ঞেস করে কিছুক্ষণ খালের পাড়ের শুদ্ধ বাতাস বুক ভরে টেনে নিয়ে বাড়ির ভেতরে চলে যায়। প্রতিদিন সকালে, দুপুরে বা সন্ধ্যায় কখনো ওকে দেখা যায় ফুলঝুড়ি, কখনো পাথরঘাটা, আবার কখনো বা বরিশাল, পটুয়াখালী বা কুয়াকাটা। কখনো দুপুরে ফিরে আসে আবার কখনো সারাদিন বাইরে কাটিয়ে গভীর রাতে ও বাড়িতে ফেরে। কয়েকমাস ধরে সাইকেল চালাতে চালাতে ও চিনে ফেলেছে আশপাশের প্রায় সব জায়গা। থেমে থাকার ওর অবসর নেই। রাতের ঘুমটুকু বাদ দিলে পথই জীবন, পথই জীবিকা, পথের সঙ্গেই ওর মিতালি। ওর কাছে ঘমানোর চেয়ে সজাগ থাকা সময়ের মূল্য বেশি। সময়ের কাছে বন্দি ও।

সাইকেল চালাতে গিয়ে পথে কত বিচিত্র মানুষের সঙ্গে ওর পরিচয় হয়! কেউ ওর সাইকেলে ওঠে গাঁ থেকে শহরে আসতে-যেতে, কেউ ওঠে বেড়াতে, কেউবা ওঠে স্টেডিয়ামের কাছে বাস স্টেশন ঠিক সময়ে পৌঁছাতে না পেরে পুরাকাটা ফেরিঘাট থেকে বাস ধরতে। কেউ কেউ শহর থেকে গাঁয়ের বাড়িতে এসে ওকে খামিয়ে রেখে প্রয়োজনীয় কাজ সেরে আবার একই সাইকেলে শহরে ফিরে যায়। বলতে গেলে সাইকেল ও কখনো একা চালায় না। কোনো না কোনো মানুষ সাইকেলে থাকেই। মানুষকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পৌঁছে দেয়াই যে ওর কাজ। কখনো সাইকেলে চড়া লোকটির সাথে সাইকেল চালানোর সময়ই নজরুল কথা বলে, জেনে নেয় তার পরিচয়। সময় কম থাকায় কখনো আরোহীর সাথে ও কোনো কথাই বলে না, সোজা গন্তব্যে চলে যায়। সাইকেলে যারা চড়ে তারা সবাই আগে যেতে চায়। আরোহীদের কেউ বলে, ‘বাই, জোরে চালান, সময় নাই।’

কেউ বলে, ‘বাস ধরাইয়া দেতে পারবেন তো?’ কেউবা বলে, ‘অসুস্থ রোগী দ্যাকতে হাসপাতালে যামু, তরতরি চালান।’

কেউ গাছ থেকে পড়া ছোট ছেলেকে জড়িয়ে ধরা অবস্থায় সাইকেলে উঠে বলে, ‘ছ্যামরাডা গাইছদা পইররা ব্যাতা পাইচে। আল্লায় কইতে পারে কী অইবে। ছ্যাতকরইরা চালান।’

এসব লোকের কাছে জীবনের চেয়ে যেন সময়ের মূল্য অনেক বেশি। অথবা জীবনের প্রয়োজনেই সময়ের মূল্য। নজরুলের জীবনও এ লোকদের মতো। ওর চাকা ঘুরলেই জীবিকা, না ঘুরলে নয়। ওর কাছে সময়ের অন্য নাম অর্থ। তাই যতক্ষণ সাইকেল রাস্তায় থাকে ততক্ষণই ওর লাভ।

দক্ষিণাঞ্চলে এ ভাড়ার মোটরসাইকেল চালানো রীতি বেশি দিনের নয়। কয়েক বছর আগেও ভাড়ার সাইকেল পাওয়া যেত না। যারা সাইকেল চালাত, তারা নিজেদের প্রয়োজনেই চালাত। তাদের মধ্যে কেউ ছিল ব্যবসায়ী, কেউ রাজনীতিবিদ, কেউ চাকরিজীবী।

গৃহবধু কিংবা স্কুল-কলেজ অধ্যয়নরত মেয়েদের মধ্যে কেউ সাইকেল চালাত না কিন্তু চাকরিজীবীদের মধ্যে এনজিওতে চাকরিরত মেয়েরা প্রত্যন্ত অঞ্চলে যাতায়াতের প্রয়োজনে সাইকেল ব্যবহার করত। আর তাদের সংখ্যাও ছিল কম। কিন্তু এখন দেখা যায় শহরে সাইকেলের সংখ্যা অনেক বেশি। এর

কারণ হিসেবে বলা যায় এলাকার উন্নয়ন। ফেরি, পুল ও রাস্তাঘাটের উন্নতি হওয়ায় মোটরসাইকেলে করে কম সময়ে দূরে যেতে এবং গাঁয়ের সরু ও আঁকাবাঁকা পথে চলাচল করা সুবিধাজনক। মানুষের সুবিধের জন্য ও নিজেদের জীবিকার প্রয়োজনে এ মোটরসাইকেল চালকরা শহরের গুরুত্বপূর্ণ দু’তিনটি জায়গায় বিশেষ করে বড় পুলের ধারে, নদীর ওপারে, আর পৌরসভার সামনে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। এদের দেখলেই চেনা যায়। কখনো এরা কোনো স্থানে নিয়ে যাওয়ার কথা বলে লোকদের দৃষ্টি আকর্ষণেরও চেষ্টা চালায়, তাতেও বোঝা যায়। এরা সংঘবদ্ধও। এদের আছে সমিতি। কখনো কোনো সমস্যা হলে এই সমিতির লোকরাই তার সমাধান করে থাকে।

ব্যবসার বাইরে এই ভাড়ার সাইকেলচালকরা আর একটি কাজে অংশ নেয়— তাহলো রাজনীতি। রাজনীতিও এদের কাছে ব্যবসার মতো। এদের কেউ কেউ কোনো না কোনো রাজনৈতিক দলের সাথে যুক্ত। রাজনৈতিক দলগুলোর কেন্দ্রীয় কোনো বড় নেতা কিংবা শাসক দলের এমপি, মন্ত্রী বা নেত্রী এলাকায় এলে তাদের ফেরিঘাট বা লঞ্চঘাট থেকে সাইকেল শোভাযাত্রা করে এরা ‘...নেত্রী বা ভাইয়ের আগমন, স্বাগতম! স্বাগতম’ ধরন দিতে দিতে সার্কিটহাউস বা ডাকবাংলোয় নিয়ে আসে। এই শোভাযাত্রা তারা বিনামূল্যে করে না। বড় অঙ্কের টাকা তারা তাদের কাছ থেকে আদায় করে নেয়। রাজনৈতিক দলের মিছিলে ও নির্বাচনের সময় এ সাইকেলগুলো দলীয় পতাকাশোভিত করে ব্যবহার করা হয়। আর সমাজিকভাবে কোনো না কোনো নির্বাচন সারা বছরই হয়ে থাকে। কখনো কখনো রাজনৈতিক দলের সক্রিয় কর্মীদের সঙ্গে যৌথভাবে শোভাযাত্রায় ব্যবহৃত এসব সাইকেলের বিরক্তিকর শব্দ ও নির্বাচনের মার্কাক্ষরিত জনবহুল শহরে উপদ্রবেরও কারণ হয়ে থাকে। নজরুল কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত ছিল না; শুধু এলাকার এক নাম্বার বদরখালী ইউনিয়নের চেয়ারম্যানের সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিল। আর এই যোগাযোগও তার বেশি দিনের নয়। সিডরের সময় এলাকায় নানা সাহায্য এলে এ সাহায্য পেতেই চেয়ারম্যানের সাথে তার সম্পর্ক হয়। আর সিডরের আগে ও এলাকায়ই ছিল না। আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে শৈশবে ওর পড়ালেখা হয়নি। প্রথমে কিছুদিন মাদ্রাসায় পড়লেও পরে পড়ালেখা বাদ দিয়েই ও ঢাকায় গিয়েছিল। ঢাকায় থেকে ও তেমন কিছু করতে না পেরে আবার গাঁয়েই ফিরে আসে। দীর্ঘদিন ঢাকাতে থাকলেও ওর মুখের আঞ্চলিক ভাষার কোনো পরিবর্তন হয়নি, তবে পোশাকে পরিবর্তন এসেছে। ঢাকায় যাওয়ার আগে ওর গায়ে থাকত পাঞ্জাবি ও লুঙ্গি, কিন্তু শহর থেকে ও প্যান্ট-শার্ট পরেই ফিরে এসে মূল বাড়ির অংশবিশেষ দাবি করতে থাকে। এ নিয়ে ও সংভাইদের সঙ্গে বিবাদে জড়িয়ে পড়ে। সংভাইয়েরা চায়নি যে নজরুল বাড়িতে এসে এমন করুক। তারা মনে করত, ও শহরের অবস্থানরত ভাই বা বোনের বাসায়ই থেকে

যাক।

জমির ফকিরের দ্বিতীয় স্ত্রীর সঙ্গে প্রথম স্ত্রীর সন্তানদের সম্পর্ক কখনো আনন্দজনক ছিল না। জীবিতকালে তার দ্বিতীয় স্ত্রী ও সন্তানদের কারণে ফকিরবাড়িতে বাগবিতণ্ডা লেগেই থাকত। আর তাই তিনি তাদের মূল বাড়ি থেকে দূরে আলাদাভাবে নতুন বাড়ি করে দিয়ে যান। তার মৃত্যুর পর থেকে সে বাড়িতেই তারা বসবাস করে। কিন্তু মূল বাড়ির কিছু দাবি তাদের থেকেই যায়। কাজেই নজরুল যখন মূল বাড়িতে এসে দখল নেয়, তখন তার সংভাইদের সঙ্গে দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে যায়। আর নজরুল শুধু বাড়ির দখলই নেয়নি, অনেক গাছও সে বিক্রি করে ফেলে। এ নিয়ে ভাইদের সঙ্গে তার বিরোধ চরমে ওঠে। এরপরে সে যখন তার বাবার ফুফাতো ভাই অর্থাৎ রহমান চাচার কাছ থেকে কেনা ধানি জমির দখল নিয়ে নগদ টাকায় লাগিয়ে দেয়, তখন ভাইদের সঙ্গে বিরোধ শত্রুতার পর্যায়ে পৌঁছে যায়। জমির ফকিরের প্রথম পক্ষের স্ত্রী ও সন্তানরা কেউ গ্রামে থাকে না। তারা লেখাপড়া শিখে সবাই শহরে চাকরি করে। যখনই তারা গায়ে আসত, তখনই নজরুলকে নিয়ে নানাজনের কাছে নানা অভিযোগ করে বলত—

‘নজরুল খারাপ।’

‘নজরুল বেয়াদব।’

‘নজরুলকে শিক্ষা দেওয়া লাগবে।’

‘নজরুল বেশি বাইরেরা গ্যাচে।’

তবে নজরুলের সংভাইদের ব্যাপারে এলাকার মানুষের একটি অভিযোগ আছে। নজরুলের বাবার জীবিতকালে দ্বিতীয় স্ত্রী অনায়াসভাবে নাকি স্বামীর কাছ থেকে সব জমি লিখিয়ে নিতে চেয়েছিলেন। এ কথা তার প্রথম স্ত্রীর সন্তানরা জানতে পেরে বাবার কাছ থেকে পুরো সম্পত্তিই তিন ভাই লিখে নেয়। সম্পত্তি থেকে তাদের নিজেদের আপন বোন ও সংভাই-বোনরা বঞ্চিত হয়। যার ফলে তাদের প্রতি একমাত্র বোন, বোনের জামাই ও সন্তানদের একটা ক্ষোভ সব সময়ই ছিল। কখনো কখনো প্রথম পক্ষের স্ত্রীর একমাত্র মেয়ের সন্তানরা মায়ের সম্পত্তি বুঝে মেয়ের জন্য মামাবাড়ির গাছপালা বিক্রি করে মামাদের সঙ্গে ঝগড়ায় জড়িয়ে পড়ে। আর সেজন্য এলাকার চেয়ারম্যানের কাছে গাছ কাটার অভিযোগ দিয়ে পিটিয়ে হাত-পা ভেঙে ভাগনেনদের মামারা শাস্তিও দেয়। নজরুলকে আমি চিনতাম। ও আমাকে একদিন সাইকেলে করে বাড়ি পৌঁছে দিয়েছিল। কোনোভাবেই আমি ওকে ভাড়া নেয়াতে পারিনি। ওকে মনে হয়েছিল খুবই অনুগত হাস্যোজ্জ্বল ও বিনয়ী একটি ছেলে। আমি ওর মাঝে কোনো বেয়াদবকে খুঁজে পাইনি। তবে আমি সেবার নভেম্বর মাসে সিডরের পরে বাড়িতে গিয়েছিলাম। এলাকার দরিদ্র মানুষের জন্য আমি প্রচুর পুরনো ও নতুন কাপড়-চোপড় সঙ্গে নিয়েছিলাম। বাড়িতে যাওয়ার পথে নজরুলের সঙ্গে আমার দেখা হয়। ও আমাকে বলেছিল, ‘বাইজান, সিডরে মোর গরের টিন উইররা গ্যাচে, এলাকায় কতো এনজিও, আপনে তো সবাইকেই চেনেন, কেউরে কিছু কইয়া দ্যান না মোরে যেন একটু সাহায্য হরে।’ কুমরাখালীতে আঞ্চলিক পরিবেশে

জন্ম নিলেও ঢাকায় অবস্থানের কারণে প্রমিতও আঞ্চলিক উচ্চারণেও কথা বলত। আমি আঞ্চলিক এনজিওর মালিক এক বন্ধুর সঙ্গে ওকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলাম। এ ছাড়া আঞ্চলিক এনজিও ‘সংগ্রাম’ ও ঢাকা আহছানিয়া মিশন’-এর আঞ্চলিক অফিসের লোকজনের সঙ্গেও ওর পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলাম। তাদের থেকে ও ছাড়া এলাকার কিছু লোক ভালোই সাহায্য পেয়েছিল। কিন্তু ওর একটা কাজে আমি অবাক হয়েছিলাম। ওকে বলেছিলাম, এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত কিছু মানুষের ঘর-বাড়ির ছবি তুলে আনতে, যদি ঢাকা থেকে কোনো সংস্থা পাই, তাহলে আরো সাহায্য দেয়ার চেষ্টা করতে পারব, সেজন্য কিন্তু ও যেটি করেছিল, তা হলো— শহর থেকে এক ফটোগ্রাফারকে নিয়ে শ’খানেক বাড়ির ছবি তুলেছিল; আর প্রত্যেকের কাছ থেকে ২০০, ৩০০ করে টাকা উঠিয়েছিল।

আমি তখন ওকে বলি, ‘তোমাকে তো মানুষের কাছ থেকে এভাবে টাকা তুলতে বলিনি। এ কাজটি করা তো ঠিক হয়নি।’

ও বলে, ‘বাইজান, মুই তো টাছা নেই নায়া।

সবই কয় মোগো গরের ফটোক তোর তোলা

লাগবেই। টাছা যা লাগে দিমু। সাইবেরে নিয়া

দিবি। কেউ কেউ ফটোক না তোলালে মোরে

মারতেও চাইচে।’

আমি অসন্তুষ্ট হয়ে বলছিলাম, ‘মানুষের এত বড় বিপদ গেল, আর তুই সবার কাছ থেকে এভাবে চাঁদা তুলে নিলি।’

ও বলে, ‘না, বাইজান, মুই কারো দাইরদ্যা চাঁদা তুলি নাই।

আমি বলি, ‘দেখ, গায়ে আমাকে সবাই ভালো

জানে। আমার সম্মান নষ্ট হয়নি তো?’

ও বলে, ‘আমি আপনার কথা কই নাই। কইচি

ফটোক তুইলক্ষ্য সাইবেরে দিমু, যদি হে কিছু

হরতে পারে।’

তবে আমার মনে হয় ওর এ কাজে কিছুটা অনিয়ম ছিল। আর সংভাইয়েরা ওর সম্পর্কে

যেসব অভিযোগ দেয়, তা-ও একেবারে ফেলে

দেয়ার মতো নয়। নজরুলের মধ্যে হয়তো

কোনো জোরজবরদস্তিমূলক আচরণ ছিল। কিন্তু

এটাওতে সত্যি যে, অধিকার পেতে হলে কখনো

কখনো জোরজবরদস্তি করতে হয়। কিন্তু পরে

নজরুলের কাছ থেকে শোনা একটি ঘটনায় ওর

আচরণে আমি অবাক হয়েছিলাম। সিডরের আগে

একবার ওর বড় দুই সংভাই শহর থেকে গিয়ে

বাড়ির সব সুপারিগাছ থেকে কাঁচা-পাকা সুপারি

পাড়ে। তারা তড়িৎগতিতে রিকশার মধ্যে বস্তায়

ভরা সুপারি নিয়ে শহরে ছুটে আসে। তাদের

কাছে সময়ের মূল্য খুব বেশি ছিল। কারণ

নজরুল তাদের যদি পথে ধরে ফেলে সেজন্য।

কিন্তু নজরুল তাদের পথে ধরেই ফেলে।

কাঁচাবাজারের ওপারে পুলের গোড়ায় ৩০০

টাকায় সুপারি বিক্রি করা হয়। নজরুল নাকি

তখন তাদের বলেছিল, ‘ন্যাবাই, আমহনাগো

সুপারি লাগবে মোরে কইতেন, মুই দিয়া

আইতাম। এইরোহোম কাঁচা-পাছা সুপারি

পাইররা আনলেন ক্যা?’

তারা কোনো কথা বলে না।

পথচারী একলোক নাকি বলে, ‘বাই, আপনারা

শিক্ষিত মানুষ। এরোহোম করলেন ক্যা। খাইলে

তো আমহনাগো এই অশিক্ষিত বাইডায়ই

খাইতে। এইরোহোম কাঁচা সুপারি কেউ

ডাহাইতের মতো পাইররা আনে?’

নজরুলের মেঝেভাই ছোটভাইকে বলে, ‘তোরা

কতা হুইননা মান-সম্মান সব গ্যাচে। সুপারি

বাড়িদদ্যা আইন্যা লাভ কী অইচে? তোর আমার

পটুয়াখালী আর আমতলী দিয়া আইতে-যাইতে

লাগবে ৪০০ টাছা, আর সুপারি বেইচা পাইচি

১৫০ টাছা। এয়ার কোনো মান আচে।’

নজরুল সেদিন না কি সুপারি বিক্রির অর্ধেক

টাকা ভাইদের দিয়ে বলেছিল, ‘মোর টাছা

লাগবে না। আমহনেরা শহর খাইককা আইচেন,

আওয়া-যাওয়ার ভারার জন্য ও টাছা নিয়া যান।

মুই সুপারি নিতে আই নায়া, শুধু কইতে আইচি

আমহনারা কাজটা বালো হরেন নায়া।’

এ ব্যাপারটি এখানেই শেষ হয়। সেদিনের ওই

ঘটনার পরে নজরুল বাড়ি ফিরে যায়।

শহর থেকে নজরুল বাড়িতে এসে থাকার

পাশাপাশি পাশের গাঁ থেকে একটি মেয়েকে

ভালোবেসে বিয়ে করে। সে বিয়ে নিয়েও একটি

ঘটনা আছে। একদিন শনিবার হাট শেষে বরগুনা

থেকে বাওয়ালকরের লতিফ মৃধাকে মৃধাবাড়িতে

নিয়ে যায়। বাড়ির সামনে পৌঁছোনার পর লতিফ

মৃধা নজরুলকে চা খেয়ে যাবার জন্য বাড়ির

ভেতরে যেতে বলে। ওইদিন সেখানে মৃধার মেয়ে

লোলো আখতারের সঙ্গে নজরুলের পরিচয় হয়।

পরিচয়ের পরে দুজনের মধ্যে প্রেম হয়ে যায়।

তারপর কখনো ও বাওয়ালকর গলে ওই

বাড়িতে ঘুরে আসত। লোলো কখনো বা ওর

খোঁজে রাস্তায় এসে দাঁড়াত। আর দেখা হলেই

শহরে সিনেমা দেখতে যাওয়ার কথা বলত।

একদিন মোটরসাইকেলে করে ও লোলোকে

বরগুনা শহরে সনিয়া সিনেমা হলে ‘রাঙা বৌ’

সিনেমা দেখাতে নিয়ে যায়। একসঙ্গে সাইকেলে

এলেও হলের মধ্যে দূরত্ব রেখেই দুজন বসে।

বিরতির সময়ও লোলো বাইরে বেরোয় না।

নজরুল লোলোর জন্য একটা ম্যাংগো জুস কিনে

আনে। বিরতির পরে নায়ক-নায়িকার জড়াজড়ি

দেখে নজরুল লোলোর গলা জড়িয়ে ধরতে

চাইলে সে হাসি দিয়ে আরো দূরে সরে গিয়ে

হলের অন্ধকারে নিজেকে কিছুটা গুটিয়ে রাখে।

হলে বসে নজরুল লোলোকে মনের কথা বলবে

বলবে করে আর বলা হয় না। ছবি শেষে হল

থেকে বাইরে বেরোতে বেরোতে লোলো বলে,

‘সিনামাডা খুব বালো নজরুল বাই।’

নজরুল বলে, ‘আর্যাকদিন দ্যাকতে আবি।’

লোলো বলে, ‘হ্যা কইতে পারি না। তরতরি বারি

লন। কেউডে কইয়া আই নাই। মোরে আইজ

মাইররাই হালাইবো।’

নজরুল কাছে একটি মিষ্টির দোকান দেখিয়ে

বলে, ‘ল কিছু খাইয়া আই।’

লোলো বলে, ‘মুই আর একটুও খারাইতে পারমু

না। এহন লন।’

নজরুল লোলোকে নিয়ে সনিয়া সিনেমা হল

থেকে সদর রাস্তা ধরে বরগুনা শহরের ভেতরে

এসে ঢোকে। মাছের বাজারের পাশে খাগদন

নদীর পুল পেরিয়ে কুমরাখালী ও বাওয়ালকর

যেতে হয়। শহরের মাছের বাজারের কাছেই

নজরুলের চাচাত ভাই আবুল কালাম ফকিরের মনিহারি দোকান। সেখানে সে বৈদ্যুতিক চার্জ দেয়ার জন্য মোবাইলটি রেখে গিয়েছিল। গ্রামে বিদ্যুৎ না থাকার কারণে বাজারে এলেই নজরুল ফকিরের দোকানে মোবাইলটি চার্জে রেখে যায়। মোবাইলটি নেয়ার জন্য লোলোকে নিয়ে নজরুল দোকানে ঢোকে। কালাম ফকিরের সঙ্গে নজরুল লোলোর পরিচয় করিয়ে দেয়। তার সঙ্গে কিছুক্ষণ তারা কথাও বলে।

কালাম ফকির বলে, 'নজরুল, মনের মানুষ নিয়া আইচ, ভোগো তো কিছু খাওয়ান লাগে।'

লোলো বলে, 'না, ন্যবাই এহন সোময় নাই। আরেকদিন আমু।'

কালাম ফকির বলে, 'না হ্যা ক্যামনে অয়! খালি মোহে ক্যামন যাও? ল নজরুল পরাণ সখীরে লইয়া কিছু খাইয়া যা।'

কালাম ফকিরের জোরাজুরিতে শেষে নজরুল ও লোলো শহীদুল্লা ফকিরের বনফুল দধিঘরে ঢুকে দধি-চিড়া-মিষ্টি খেতে ঢোকে।

কালাম ফকির দধি খেতে খেতে লোলোর দিকে বড় বড় চোখে তাকিয়ে বলে, 'কি মানুষ পছন্দ অইচে?'

লোলো বলে, 'হ্যা কইতে পারি না।'

কালাম ফকির বলে, 'পছন্দ অইলে মুই কিন্তু সব ব্যবস্থা কইররা দেতে পারমু। নজরুল মোরে জানাইলেই অইবে।'

লোলো হাসে, কোনো কথা বলে না।

লোলো নজরুলকে বলে, 'লন, আর সোমায় নাই।'

নজরুল কালাম ফকিরকে বলে, 'ন্যবাই, মোগো আর সোময় নাই। আমি আমহনের পরে সব কমু আনে। মোরা এহন যাই।'

সন্ধ্যা পেরিয়ে গেছে কখন! পুল পেরিয়ে রাস্তায় নেমে নজরুল দ্রুতবেগে সাইকেল চালায়।

লোলো নজরুলকে বলে, 'কালাম বাই মানুষডা খুব রসিক।'

নজরুল বলে, 'হ্যার মতো মানুষ অয়!'

লোলো বলে, 'আমহনের বাই না।'

নজরুল হাসি দিয়ে বলে, 'ও হ্যাই কতা?'

সিনেমা হল থেকে বেরোনের পর লোলো বাইরের আবহাওয়ায় সাহস ফিরে পেলেও দ্রুতবেগে সাইকেল চালানোয় ভয় পেয়ে বলে, 'নজরুল বাই, আচতে চালান।'

নজরুল হাসতে হাসতে বলে, 'মোরে জোরে হাবডাইয়া দর।'

লোলো বলে, 'হাবডাইয়া দরলে কিন্তু আর ছারমু না।'

নজরুল বলে, 'আচ্চা, ঠিক আচে।'

নজরুল সাইকেলের গতি কমিয়ে দেয়। ওদের মধ্যে ভবিষ্যৎ জীবন নিয়ে নানা কথা হয়।

লোলো নজরুলকে জিজ্ঞেস করে, 'হারাদিন সাইকেল নিয়া রাস্তায়-রাস্তায় গোরেন, বাল লাগে?'

নজরুল বলে, 'বাল না লাগলেই বা কি হরমু, টাহা কামান লাগবে না।'

লোলো মুচকি মুচকি হেসে বলে, 'আর কত টাহা কামাইবেন, বিয়া হরবেন না?'

নজরুলও হাসতে হাসতে বলে, 'হরতে তো চাই, কিন্তু পক্ষি তো বোজে না।'

লোলো বলে, 'কী কইলেন বুজলাম না।' নজরুল আবার বলে, 'মনের কতা পক্ষি বোজে না।'

লোলো শব্দ করে হেসে বলে, 'ও বুজজি, তয় আমহনের পক্ষি এখন কোতায়?'

নজরুল বলে, 'মোর পিছেই তো বইয়া রইচে।'

লোলো বলে, 'পিছে তো পক্ষি নাই-মানু।'

নজরুল লোলোকে স্পর্শ করে বলে, 'এই মানুষডাই তো মোর সুহের পক্ষি।'

লোলো নজরুলের কানের পাশে ফুঁ দিয়ে বলে, 'এই পক্ষিডারে পছন্দ হরেন?'

নজরুল বাঁ হাত দিয়ে লোলোর নাক স্পর্শ করে বলে, 'কী মনে অয়?'

লোলো পেছনে বসে হাসিতে আটখানা হয়ে বলে, 'জানি না, তয়, আমহনে মানুষডা বেশি বাল না।'

নজরুল হাসি ও ক্ষোভ মিশিয়ে বলে, 'কী কইলি!'

লোলো এবারে কথা ঘুরিয়ে বলে, 'না, আমহনে মানুষডা একেবারে খারাপ না।'

নজরুল খুশি মনে বলে, 'মুই বিয়া হরতে চাইলে কি তুই রাজি অবি?'

লোলো নিচের দিকে চেয়ে বলে, 'রাজি না অইলে কি আইতাম।'

নজরুল বলে, 'তুই না হয় রাজি অইলি, তোর বাপে?'

লোলো বাঁ হাত দিয়ে মুখ চেপে ধরে হাসিমাখা অস্ফুট স্বরে বলে, 'আমহনে প্রস্তাব দিয়েন, হ্যা মুই বুজমু আনে।'

নজরুল বলে, 'যদি রাজি না অয়।'

লোলো বলে, 'আমহনের সাইকেলে উইটট্যা পলাইয়া আমু।'

নজরুল স্বর উঁচু করে জিজ্ঞেস করে, 'তোর সাহস আচে?'

লোলো দ্রুততার সঙ্গে মাথা নাড়িয়ে বলে, 'প্রস্তাব দিয়াই দেইককেন।'

এ ভাবে কথা বলতে বলতে একসময় ওদের পথচলা শেষ হয়।

সেদিন নজরুলকে জড়িয়ে ধরা মোটরসাইকেলের পেছনে বসা বোরকা পরা মেয়েটিকে চিনতে আশপাশের লোকদের তেমন অসুবিধে হয় না। এ

কান থেকে ও কানে কথা চলে যেতে থাকে। একপর্যায়ে তা নজরুলের মা-ও জেনে ফেলেন।

মা নজরুলকে অন্য জায়গায় বিয়ে করাবেন বলে ঠিক করেছেন, তাই ওই মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে নিষেধ করেন। কিন্তু নজরুল লোলোর সঙ্গে সম্পর্ক বাদ দেয়নি। মাঝে মাঝে

বাওয়ালকরের রাস্তায় মনের মানুষের সঙ্গে তার দেখা হলেও সিনেমা দেখে রাত করে বাড়ি ফেরাতে লোলো আর গায়ের বাইরে বেরোতে পারেনি।

এরই মাঝে একদিন লোলো নজরুলের কথা মতো বিয়ের কথা মাকে জানায়। মা

লোলোর বাবা লাতিফ মুখার কাছে সে কথা বললে তিনি মেয়ের বিয়ে তেতুলবাড়িয়ার

শাহআলম খোনকারের সঙ্গে ঠিক করেছেন বলে জানান। সময় মতো জানাবেন বলেই তিনি স্ত্রীকে

এতদিন তা জানাননি। নজরুলের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হয়ে যায়। কী করবে এটা ভেবে

নজরুল খুব চিন্তিত হয়ে পড়ে। একদিন বিকেলে

নজরুল লোলোকে শহরের কাঠপাতি কাজী অফিসে নিয়ে চাচাত ভাই আবুল কালামের উপস্থিতিতে বিয়ে করে বাড়ি ফেরে। লোলোর বাবা ফুলঝুড়ি গিয়ে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হিরু মাতুব্বরের কাছে অভিযোগ দেন।

চেয়ারম্যান সাহেব বিয়ে মেনে নেয়ার জন্য লোলোর বাবাকে অনুরোধ করেন। লোলোর বাবা

চেয়ারম্যানের কথামতো চূপ হয়ে যান। কিন্তু কথা না রাখায় বিয়ের পর থেকেই নজরুলের সঙ্গে

মায়ের বিরোধ শুরু হয়ে যায়। একপর্যায়ে ছেলে ও বোয়ের সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায় মা

আলাদাভাবে থাকতে থাকেন। আর ছেলেকে তিনি সারাক্ষণ অভিশাপ দিতে থাকেন। সবসময়

তিনি নজরুলের মৃত্যু কামনা করতেন। এ পৃথিবীতে কোনো মা ছেলেকে এভাবে অভিশাপ

দেন কিনা জানা নেই। কখনো পাশের বাড়ির রাবিয়া সহানুভূতি দেখিয়ে বলত, 'ও নরজুইল্লার

মা, পোয়াডারে এইরহোম বরদোয়া দিও না, মায়ের বরদোয়া কিন্তু লাগে। এহন বরদোয়া

দেও, পোয়া মইররা গ্যালে বোজবা কেমন লাগে।'

নজরুলের মা তারপরও একের পর এক অভিশাপ দিতেন—

'গোলমার পোয় মরুক!

ওরে জোলায় নেউক!

ওর মাতায় ঠাড়া পড়ুক!

ওর মুক মুই দ্যাকতে চাই না!'

সারাদিন পথে পথে সাইকেল চালিয়ে রাতে বাড়ি ফিরে নজরুলকে প্রতিদিন মায়ের অভিশাপ সহ্য

করতে হতো। আর অভিশাপের ফলই যেন ও একদিন পেয়ে যায়। বাওয়ালকর নছিমনের সঙ্গে

মোটরসাইকেলের দুর্ঘটনা যেন মায়ের অভিশাপের ফল। অথচ ওই মোটরসাইকেলেই হার্ট অ্যাটাক

করা এক মায়ের কাছে তার ছেলেকে তাড়াতাড়ি পৌঁছে দেয়ার জন্যই জীবনকে উপেক্ষা করে সময়

বাঁচিয়ে ও চলছিল শহরের দিকে। কারণ একটু সময়ের হেরফের হলে হয়তো লোকটি আর তার

মাকে দেখতে পাবে না।

তাই সে মোটরসাইকেলে উঠে বার বার বলছিল, 'বাই, জোরো চালান, মোর মায়ের মনে হয় আর

জ্যাতা পামু না।'

নজরুল বলছিল, 'বাই, এত তরতরি হইররেন না, সলিঙের রাস্তায় জোরে চালাইয়া আমিও

মরমু, আমহনেও কোলাম মরবেন।'

জীবনের চেয়ে সময়ের মূল্য দিতে গিয়ে শেষপর্যন্ত নজরুলকেও হাসপাতালে আসতে হলো পঙ্গু

হয়ে। সদর হাসপাতালের বর্বর ডাক্তারদের অবহেলা, ও মুখুতা তাকে আরো অসুস্থ করে

জীবন থেকে দূরে সরিয়ে নেয়। ডাক্তাররা তাকে টিটোনাস ইনজেকশন দিলেও টিআইজি

ইনজেকশন দেয়নি। অথচ টিটোনাসে তাৎক্ষণিক কোনো লাভ হয় না। তাৎক্ষণিক লাভ পেতে

গেলে ও জীবাণুর হাত থেকে বাঁচতে গেলে দিতে হয় টিআইজি। তার শরীরে ধনুষ্টঙ্কার বাসা

বাঁধতে থাকে। অবস্থা খারাপ বুঝতে পেরে হাসপাতাল থেকে তাকে পরদিন রাতে পাঠিয়ে

দেয়া হয় ঢাকায়। ঢাকায় এনে সকালে তাকে পঙ্গু হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। মাঝখানে

পেরিয়ে যায় একদিন, একরাত। এ সময়ের

মধ্যেই তার জীবনের সব সময় শেষ হয়ে যায়। কারো পা কেটে ফেলার পরেও সে বেঁচে থাকে। পায়ে সামান্য আঘাত নিয়ে নজরুলের জীবন শেষ হয়ে যাওয়ার কথা নয়, অথচ ডাক্তাররা তাকে ফিরে না আসার ঠিকানায়ই পাঠিয়ে দেয়! কিংবা হয়তো এটাই ছিল নজরুলের নিয়তি। নিয়তির লিখন ও খণ্ডাবে কীভাবে। তাই স্ত্রী ও মা তার প্রাণহীন দেহ নিয়ে আত্ননাদ করতে করতে কুমরাখালীতে ফিরে আসে। নজরুলের শেষ ঠিকানা হয় বাড়িতে বাবার কবরের পাশে। নজরুলের মৃত্যুর পরে তার সন্তানসম্ভাবা স্ত্রী এ বাড়ি থেকে ও বাড়িতে গিয়ে পাগলের মতো চিৎকার করে বলতে থাকে, ‘ওগো, তুমি মোরে এইরোহোম ছাইররা গ্যালা ক্যা?’ আর বাড়িতে লোকজন এলেই মা আত্ননাদ করে বলেন, ‘ও সোনা, তুই মোরে এইরোহোম ফাহি দিয়া চইলগা গ্যালা। মুই না হয় তোরে খামার দেতাম, হেইজন্য তুই মোরে কইলজাডা হিরর্যা গেলি!’

মায়ের কান্না শুনে পাশের বাড়ি রাবিয়া বলে, ‘তোমারে তো কত কইচি খাঁরজি, পোয়াডারে ওইরোহোম বরদোয়া দিও না। এহন কান্দো ক্যা? আর কুইল দিয়া কি হরবা? যহন বাইছ্যা আলহে তহন তো একটুও দ্যাকতে পারো নায়া।’

মা বলে, ‘ও রাইবব্যা, আর কতা কইস না। মোর কইলজাডা ফাইটা যায়।’ নজরুলের মৃত্যুর পরে এলাকার চেয়ারম্যানের মধ্যস্থতায় সালিশি হয়। নজরুলের মৃত্যুর ক্ষতিপূরণ হিসেবে নছিমনি তার মালিক নজরুলের বিধবা বৌকে দিয়ে দেয়। আর জীবনের মূল্য হয় নগদ মাত্র ৫ হাজার টাকা! কিন্তু সদর হাসপাতালে যে অমানুষ ডাক্তারদের অবহেলার কারণে নজরুলের ধনুস্ত্রকার হলো তার কোনো জরিমানা কিংবা বিচার হলো না! নজরুলের মৃত্যুর কিছুদিন পরে তার বিমাতার বড় সন্তান অবসরপ্রাপ্ত সহকারী সচিব ইদ্রিস সাহেব ঢাকা থেকে বাড়িতে আসেন। নজরুলের স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে সন্তানস্বরূপ তিনি মাত্র ৫০০ টাকা দিয়ে বলেন, ‘ঢাকাতে নিয়ে নজরুলকে মেরে ফেললে আর আমাকে জানালে না। আমি কি ওর কোনো চিকিৎসা করাতে পারতাম না। ও কি আমার ভাই ছিল না।’ নজরুলের বৌ বলে, ‘ও ন্যাবাই, কত চাইচি, কিন্তু মোগো দারে কোনো ফোন নাম্বার আলহে না। আমহনের বাইর কাছে আলহে, হ্যার ফোন নছিমনের দাক্কায় আরাইয়া গ্যাচে।’ ইদ্রিস সাহেব বলেন, ‘যাক, আল্লার মাল আল্লায় নেচে, আর কাইন্দো না।’ ইদ্রিস সাহেবকে দেখে গাঁয়ের লোকজন কাছে এসে জড়ো হয়।

লোকদের মধ্য থেকে আজিজ ফকির বলে, ‘সাইব, আমহনাগো হতাইয়া বাই নজরুল বাল আলহে, আদব-কায়দা লেহাজ-তরিকাতও বাল আলহে। মোরা যা দেকচি, হ্যা কইলাম।’ উপস্থিত আরো কজন মাথা নাড়িয়ে অস্পষ্ট উচ্চারণে তার কথায় সমর্থন দেয়।

ইদ্রিস সাহেবের ছোটভাই আজিজ ফকিরকে উদ্দেশ্য করে বলে, ‘বাল ছিল, তবে বেয়াদবও

ছিল।’ বাড়ির আম-কাঁঠাল-কলা-সুপারি বাগান ঘুরে দেখে সেদিনই ইদ্রিস সাহেব শহরে ফিরে যান। তার কয়েকদিন পরে তাদের মেঝেতাই এসে বাড়ির অবস্থার সার্বিক মূল্যায়ন করে লোকদের বলে, ‘যা-ই হউক, যা-ই খাউক, নজরুলই খাইত। ও তো মোগো বাই আলহে। এহন তো খাইবে মানষে। মোগো কেউর তো আর বাড়িতে আওয়া পড়বে না।’

উপস্থিত লোকজন কেউ তার কথার কোনো উত্তর দেয় না। নজরুল মারা যাবার পর তার সৎভাইয়েরা পুরো বাড়িরই দখল পেয়ে যায়, আইন-আদালত করে নয়, নিয়তির নির্দেশে। আর নজরুলের স্ত্রী আগত ও অনাগত সন্তানকে আগলে ধরে অনিশ্চয়তার পথে এগোতে থাকে। কখনো বা সকাল-দুপুর কুমরাখালী খালের পাড়ের রাস্তা দিয়ে ছোট সন্তানকে সঙ্গে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে পুরনো দিনের কথা চিন্তা করে

বেদনার্ত হয়। জীবিত থাকাকালে নজরুলের কাছে জীবনের চেয়ে সময়ের মূল্য ছিল বেশি। তার চলে যাওয়ার পরে স্ত্রী-সন্তানের কাছেও জীবনের চেয়ে সময়ের মূল্য যেন আরো অনেক বেশি। তারা হয়তো কিছুদিন তাল-নারকেল ঘেরা গাঁয়ের পথে-প্রান্তরে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে ফেলতে একসময় জীবনযুদ্ধে নেমে নজরুলকে ভুলে যাবে; কিন্তু অনাগত সময়ের মূল্য দেবে কীভাবে? ইতোমধ্যেই ঋণদাতারা এসে বাড়িতে হাজির হতে শুরু করেছে। নজরুলের জীবনের বিনিময়ে পাওয়া নছিমন ও তার সাধের সাইকেলটি বিক্রি করে দেয়া হয়েছে ঋণ পরিশোধ করতে। পরিবার-পরিজন হয়তো একরকম করে বেঁচে থাকবে; কিন্তু অনাগত সময়কে বরণ করার মতো কিছুই যে তাদের আর অবশিষ্ট নেই!





ভ্রমণ

ভ্রমণের অভিজ্ঞতায় শিক্ষালাভ

ড. মো. হুমায়ুন কবীর

ছোটবেলায় কেবল স্কুলে যাওয়া শুরু করেছি, যা সম্ভবত ১৯৭৩-৭৪ সালের কথা বলছি বলে অনুমান করা যায়। তখন জীবনের সর্বপ্রথম বাবার সঙ্গে রাজধানী ঢাকায় গিয়েছিলাম, যা এখনো স্মৃতিতে অম্লান হয়ে আছে। গ্রামের বাড়িতে জন্ম নেয়া শিশু হিসেবে বড়জোড় থানা ও মহকুমা শহরে বাবা-মায়ের সঙ্গে তখন বেড়ানোর সুযোগ হয়েছে। তার উপর সেই ছোট অবস্থাতেই রাজধানী ঢাকা শহরে বেড়াতে যাওয়ার কথা শুনে সেদিন কতটুকু আবেগাপ্ত হয়েছিলাম তা মনে না থাকলেও এটুকু শুধু মনে

আছে, সেদিন বাবাকে জামা-কাপড় পড়ে কোথাও একটা যেতে দেখে আমাকে যাতে রেখে যেতে না পারে সেজন্য কান্নায় ভেঙে পড়েছিলাম। যার ফলশ্রুতিতেই ঢাকায় থাকা আমার এক চাচার বাসায় যাই। এখন মনে করতে পারছি, আমার চাচার বাসা ছিল আগারগাঁও সরকারি কলোনিতে, যা বর্তমানে রেডিও সেন্টারের দক্ষিণপাশে পাশে অবস্থিত। তখন আমার পরিষ্কার মনে আছে, সেখান থেকে উত্তর দিকে তাকালে শুধু পানি আর পানি দেখা যেত, পূর্বদিকে তাকালে বাউন্ডারি ও

বিমানবন্দর দেখা যেত। আমার স্মৃতিতে দেখা সেই তখনকার ঢাকা ও এখনকার ঢাকা সম্পর্কে যদি কখনো লেখার সুযোগ হয় তখন বিস্তারিত লিখব। একটি ঘটনার কথা বলেই আমি এ প্রসঙ্গটির ইতি টানব। চাচার বাসায় সকালে ঘুম থেকে উঠে বাসার সামনে দেখলাম ২-৩ বছর আগে শেষ হওয়া মুক্তিযুদ্ধের আলামত হিসেবে ছোট-বড় অনেকগুলো বন্দুকের খোসা পড়ে আছে। সোনালি রঙের দেখতে অত্যন্ত চমৎকার সে খোসার কয়েকটি আমি কুড়িয়ে এনেছি এবং বাড়িতে নিয়ে আসার জন্য গো ধরেছি। কিন্তু পুলিশে ধরবে এমন ভয় দেখিয়ে সেদিন আমাকে সেগুলো আনতে দেয়া হয়নি। সেদিনের সেই ঢাকা যাওয়ার সুবাদে বাড়ি থেকে পায়ে হেঁটে গফরগাঁওয়ার লামকাইন, কান্দিপাড়া, তারপর রিকশায় মশাখালী রেলস্টেশন। এরপর রেলগাড়িতে তেজগাঁও স্টেশন, সেখান থেকে স্কুটারে আগারগাঁওতে চাচার বাসায় গমগামগমের অভিজ্ঞতা সত্যিই ভোলায় নয়। তারপর ছাত্রাবস্থায় এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময়ে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে মোটামোটি সারাদেশই একপ্রকার ঘুরে বেড়িয়েছি। অতঃপর চাকরির সুবাদে দেশের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করার সুযোগ হয়েছে। সে ভ্রমণগুলোর মধ্যে রয়েছে খুলনা, যশোর, মাগুরা, ঝিনাইদহ, পাবনা, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, ফরিদপুর, রাজবাড়ি, মানিকগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, বগুড়া, দিনাজপুর, রংপুর, নাটোর, নওগাঁ, রাজশাহী, নারায়ণগঞ্জ, নরসিংদী, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, কুমিল্লা, ফেনী, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম ইত্যাদি জেলা, তাদের উপজেলা ও বিভাগীয় শহর।

২. কথায় আছে, ‘বউ পালা আর হাতি পালা সমান কথা’ একটি হাতি পালায় দায়িত্ব হিসেবে ২০০১ সালে ময়মনসিংহের ফুলপুরে চাকরিরত অবস্থায় জীবনের দুঃসাহসিক অভিযাত্রায় বিব-ইবন্ধনে আবদ্ধ হই। তারপরে হানিমুনে যাওয়ার কথা থাকলেও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পারিবারিক, সাংসারিক, চাকরিজনিতে ঝামেলার কারণে যাওয়া হয়ে ওঠেনি। প্রথম ২-৩ বছর নিজের বাড়ি, শশুরবাড়ি, চাকরির প্রশিক্ষণ ইত্যাদি করতে করতেই সময় পেড়িয়ে গেল। তারপর বাচ্চা-কাচ্চা এবং বড় হওয়ার ঝঙ্কি-ঝামেলায় কোথাও একটা বেড়াতে যাই যাই করে আর যাওয়া হয়ে ওঠেনি। অতঃপর ফুলপুরে চাকরিতে থাকা অবস্থাতেই সরকারিভাবেই অফিস থেকে বিদেশ ভ্রমণের সুযোগ সৃষ্টি হলো। ওই ভ্রমণটি ছিল মাত্র এক মাসের। যেহেতু কৃষি বিভাগে চাকরি করি সেজন্য কৃষির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ফিলিপাইনে অবস্থিত আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ইরি)-তে ছিল সেই ট্রিপ। আধুনিক পদ্ধতিতে ধান উৎপাদন এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও দর্শনীয় বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন করাই এ ভ্রমণের মূল উদ্দেশ্য ছিল। সেটি ছিল ২০০৫ সালে এবং তখন আমার বিয়ের প্রায় ৪ বছর পর। মনে আছে, আমার প্রথম সন্তান নাকির প্রথম জন্মদিনে (২০০৫ সালের ১৬ মার্চ) আমি ফিলিপাইনে ছিলাম। ইরি প্রতিষ্ঠানটি

ফিলিপাইনের রাজধানী শহর ম্যানিলা থেকে ৬৪ কিলোমিটার দূরে একটি মনোরম দৃশ্যসমৃদ্ধ পাহাড়ি এলাকায় অবস্থিত। পাহাড়ের উপরেই একটি বিরাট সমতল এলাকায় আন্তর্জাতিক ধান গবেষণার জন্য প্রতিষ্ঠিত এ বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানটির অবস্থান। ইতিহাস থেকে জেনেছি, ইরি নামের এ আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানটি প্রথমে বাংলাদেশে তথা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে হওয়ার প্রস্তাব ছিল। কিন্তু সে সময়ের স্বৈরশাসকরা তখন ইরিকে এখানে হতে দেয়নি। যাহোক আমি যা বলছিলাম, ইরি প্রতিষ্ঠানটি সেখানকার লস-বৈনস মিউনিসিপালিটির শহরতলিতেই অবস্থিত। ইরির পাশেই একটি আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় আছে যার নাম হলো ‘ইউনিভার্সিটি অব ফিলিপিস লস বৈনস’। সেখানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মতো আমাদের বাংলাদেশেরও অনেক স্কলার লেখাপড়া করছিল, এখনো করছে। তাদের বেশিরভাগই বাংলাদেশের কৃষি সম্পর্কিত বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যেমন- বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গবন্ধু কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়সহ আরো কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। কৃষি সম্পর্কিত বিভিন্ন গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট যেমন- বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি), বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা), বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিজেআইআই), বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বার্ক), বাংলাদেশ একাডেমি ফর রুরাল ডেভেলপমেন্ট (বার্ড)সহ আরো অনেক প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানী ও প্রশিক্ষক যারা সেখানে প্রশিক্ষণ এবং উচ্চতর এমএস, পিএইচডি ইত্যাদি অ্যাডভান্সড ডিগ্রি ও গবেষণার জন্য গিয়েছেন। সেই সুবাদে আমার নিজের খুব কাছেই কয়েকজন বন্ধুকে পেয়ে যাই, যাদের মধ্যে ব্রির বিজ্ঞানী ড. মো. রফিকুল ইসলাম ও বর্তমানে সপরিবারে নিউজিল্যান্ড প্রবাসী মোবারাকুল আহসান চৌধুরী নিব্বনের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। আমার বন্ধুদের পরামর্শক্রমে এবং অনেক সময় তাদের সঙ্গে নিয়ে আশপাশের অনেক জায়গায় ঘুরেছি এবং আলাচনায় মাধ্যমে অনেক ধারণা পেয়েছি। আমরা বাংলাদেশ থেকে কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের প্রকল্পের মাধ্যমে দশজন কর্মকর্তা এ সরকারি সফরে যাওয়ার জন্য সুযোগ পেয়েছিলাম। বিভিন্ন বয়স ও পদবির দশজন কর্মকর্তা একমাস ধরে পুরো ফিলিপাইনের গুরুত্বপূর্ণ এলাকাসমূহ ঘুরে বেড়িয়েছি। আমাদের এক মাসের এ ভ্রমণটি দুটি ভাগে বিভক্ত ছিল। যথা- এক, দুই সপ্তাহের ধান উৎপাদনবিষয়ক প্রশিক্ষণ, দুই, ধানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পুরো ফিলিপাইনের বিভিন্ন গবেষণা ও চাল প্রক্রিয়াজাতকরণ পদ্ধতি সরেজমিনে পরিদর্শন করা। আমরা যে প্রশিক্ষণে অংশ নিয়েছিলাম আমাদের টিমের দশজনের সঙ্গে জাপান, শ্রীলঙ্কা, ভারত, জার্মান, দক্ষিণ কোরিয়া, মালয়েশিয়াসহ সাতটি দেশের মোট ২৭ জন অংশগ্রহণকারী ছিল। দু’সপ্তাহের ধান উৎপাদনবিষয়ক প্রশিক্ষণটি অত্যন্ত সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে সবার

অংশগ্রহণমূলকভাবে সম্পন্ন হয়েছিল। সেই কোর্সের সময়কারী হিসেবে দায়িত্বরত ছিলেন আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ইরি)-এর একজন ভারতীয় বংশোদ্ভূত বিজ্ঞানী ড. ভি বাল। সুব্রামেনিয়ান, যিনি ধান গবেষণার একজন প্রথিতযশা বিজ্ঞানী হিসেবে আন্তর্জাতিক মহলে বেশ পরিচিত। প্রশিক্ষণের প্রত্যেকটি সেশন ছিল মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরের মাধ্যমে, উন্নত তথ্যপ্রযুক্তির ছোঁয়া তখন সেখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করার মতো ছিল। ইরির ট্রেনিং সেন্টারে অত্যাধুনিক একটি কম্পিউটার ল্যাব রয়েছে যেখানে দ্রুতগতির ইন্টারনেট কানেকশনসহ প্রায় ৫০-৬০টি কম্পিউটার দিনে রাতে ২৪ ঘণ্টাই ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে। সেখানেই আমি প্রথম আমার একটি ই-মেইল আইডি অর্থাৎ অ্যাকাউন্ট খুলেছিলাম যা এখনো আমি ব্যবহার করছি। সেখান থেকে ধান উৎপাদনের প্রতিটি পর্যায়ে কেমন করে একেবারে জমি চাষ দিয়ে, সেই জমিতে আবার মেশিনের মাধ্যমেই ধানের চারা রোপণ কৌশল প্রদর্শন করেছে। তারপরে আবার আগাছা নিড়ানো, কীটনাশক স্প্রে করা, ধান কর্তন, মাড়াই-ঝাড়াই, শুকানো, বস্তাবন্দি করা, গুদামজাত করা, প্রতিটি কাজ হাতে-কলমে নিজেরা যেমন করেছি, ঠিক তেমনি অন্যরা কেমন করে সেটিও স্বচ্ছ দেখেছি। ধানক্ষেতে ইঁদুরের আক্রমণ হলে সেই ইঁদুর মারার বিভিন্ন কৌশল সম্পর্কেও শিক্ষা দেয়া হয়েছিল আমাদের।

৩. দু’সপ্তাহের ট্রেনিং কোর্সের অংশ হিসেবে সেন্টারের ভিতরে ও মাঠ গবেষণাগারে হাতে-কলমে তালিম নেয়ার পর শুরু হলো প্রায়োগিক জ্ঞানসমৃদ্ধ প্রশিক্ষণ। সেই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে ফিলিপাইনের বিভিন্ন কৃষকের মাঠে কেমন করে কৃষকরা তাদের মাঠে ধান আবাদ করে, সরেজমিনে পরিদর্শন করি এবং কৃষকদের ধান চাষে কী ধরনের সমস্যা রয়েছে, সে সম্পর্কে একেবারে সরাসরি তাদের সঙ্গে কথা বলেছি। ফিলিপাইন দেশটি আমাদের দেশের চেয়ে খুব বড়ও নয়, আবার আমাদের দেশ থেকে খুব বেশি উন্নতও নয়। কিন্তু সেখানকার প্রধান পেশা হলো পশ্চিমা দেশসমূহে জনশক্তি রপ্তানি। এখানে আরেকটি কথা না বললেই নয়, আর তা হলো ২০০৫ সালে ওটাই ছিল আমার প্রথম বিদেশ ভ্রমণ। সেজন্য বাংলাদেশের ঢাকায় অবস্থিত হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের বাইরে থেকে দেখার সুযোগ হলেও এতো ভিতরে অর্থাৎ রানওয়ের কাছে গিয়ে দেখার সুযোগ এর আগে কখনো হয়নি। কিন্তু প্রথম দর্শনেই বিমানবন্দরের ভিতরে দেখে আমার কাছে এতো বেশি ভালো লাগলো যে, এই আমাদের বাংলাদেশের ভেতরেও এমন জায়গা আছে, তা না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। আমার ফ্লাইট ছিল সিঙ্গাপুর এয়ারলাইন্সের একটি বিমানে যার ট্রানজিট ছিল সিঙ্গাপুরে। এই বিমানে ঢাকা বিমানবন্দর থেকে রাত ১১.৫০টায় রওয়ানা করে সিঙ্গাপুর বিমানবন্দরে পৌঁছি রাত ২.৩০টায়। কিন্তু সিঙ্গাপুর বিমানবন্দরের

জাঁকজমক অবস্থা দেখে তখন ঢাকা বিমানবন্দর সম্পর্কে আমার যে প্রাথমিক ধারণা হয়েছিল তা মুহূর্তেই কেটে গেল। তবে ফিলিপাইনের ম্যানিলা বিমানবন্দর দেখে মনে হলো তা বাংলাদেশের চেয়েও নিম্নমানের। একটি দেশের বিমানবন্দর দেখেই সেই দেশের রুচিবোধ, অর্থনৈতিক উন্নতি বোঝা যায়। ঠিক যেমনটি বোঝা যায় কোনো বাড়ির বাথরুম কিংবা টয়লেট দেখে সেই বাড়ির মানুষ কতটুকু সভ্য ও রুচিশীল। তবে এটিও ঠিক, টাকা-পয়সা-অর্থকরী থাকা মানের কারণে রুচিবোধ জাগ্রত হবে কিংবা থাকবেই হবে এমনটি নয়। তবে ম্যানিলা শহরের ভেতর এমনকি বাহিরেও রাস্তাঘাটসংক্রান্ত অবকাঠামো খুবই উন্নত। কোথাও কোথাও তো একেবারে ৩-৪ তলা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে এবং ফ্লাইওভার বিদ্যমান। আরো আছে মেট্রোরেল যার জন্য সেখানে আমার থাকা একমাসেও চোখে পড়ার মতো কোনো যানজট দেখা যায়নি। ইরি এবং টাচাই পাশাপাশি ক্যাম্পাসে পাহাড়ঘেরা এমন একটি দৃষ্টিনন্দন স্থান যা দেখলে এমনিতেই মন জুড়িয়ে যায়। দেশি-বিদেশি স্কলার, আমাদের দেশের বিজ্ঞানী, আমার সঙ্গে থাকা সহকর্মী, প্রশিক্ষক ও সহপ্রশিক্ষার্থীসহ সকলে মিলে দুইসপ্তাহের ধান উৎপাদন ট্রেনিং কোর্সটি আসলেই খুব উপভোগ্য ছিল। সেখানে আমরা কীভাবে অটোমেটিক মেশিনে ধানের বস্তা ঢেলে দিলেই বিভিন্ন প্রক্রিয়া শেষ করে সরাসরি তা ভাঙা, তুষ, কুঁড়ো, চিকন-মোটো ইত্যাদি বিভিন্ন ক্যাটাগরির চালে পরিণত হয়, সেটি না দেখলে বিশ্বাসই হয় না যে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ এতোটা এগিয়েছে।

৪.

তারপর শুরু হলো সেখানকার স্থলের মতো সুন্দর ও মনোরম পাহাড়ি এলাকা হিসেবে পরিচিত বাজিও সিটি এবং পাতাইয়া চূড়াতে ভ্রমণ। ফিলিপাইনের বাজিও সিটি হলো ভারতের দার্জিলিংয়ের মতো, আর আমাদের বাংলাদেশের পার্বত্য এলাকার নীলগিরির মতো। আমাদের টিম বাজিও সিটি পরিদর্শনে যাচ্ছি এটি জানার পর সেখানকার আমাদের দেশসহ অন্যান্য দেশের যারা স্কলার রয়েছেন তারা আক্ষেপ করে বললেন, ‘আমরা এখানে দীর্ঘদিন ধরে থেকেও সেখানে বেড়াতে পারলাম না, আর আপনারা মাত্র একমাস সময়ের জন্য এসেই এসব জায়গায় চলে গেলেন, সত্যিই আপনারা ভাগ্যবান।’ আমরাও তখন গর্ববোধ করলাম এইজন্য, সত্যিই আমরা একটি অসাধ্য সাধন করে যাচ্ছি। আগেই বলে রাখি, ফিলিপাইন দেশটিতে খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী অধিবাসীই বেশি। সেখানে ফিমেল ডমিনেটেড সমাজব্যবস্থা প্রচলিত। কাজেই দোকান, শোরুম, শপিংমল, ভ্রমণ গাইড থেকে শুরু করে সর্বত্রই মহিলাদের প্রাধান্য। সেখানে অবশ্য মহিলাদের নিরাপত্তাজনিত কোনো সমস্যা নেই, যে কারণে তারা অবাধেই রাত-বিরাতোও চলাচল করতে পারে। আর নাগরিক হিসেবে তাদের আবেগ-অনুভূতি-সত্যতা ইত্যাদি প্রশ্নাতীত। একটি উদাহরণ দিলেই বিষয়টি পরিষ্কার হতে পারে, পাবলিক গাড়িতে চড়ে

নিজে নিজেই গাড়ির ভাড়া পরিশোধ করতে হয়। সেখানে কোনো কনডাক্টর নাই গাড়িতে ভাড়া উত্তোলন করার, এমনকি যদি নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে ভাড়া পরিশোধের জন্য ভাঙতি না থাকে তাতেও নিজেই ভাড়া জমা হওয়ার ব্যাগে হাত দিয়ে ভাঙতি নিয়ে নিতে হয়, যা আমাদের দেশে তো চিন্তাই করা যায় না; বিশ্বে এমন দেশই বা আর কয়টি আছে। ট্রেনিংয়ের কোর্স কোর্ডিনেটর আগের দিন ট্রেনিং শেষে জানালেন, পরের দিন থেকে আমাদের বাজিও সিটিতে সাত দিনের ট্যুর, তারপর মনটা হঠাৎ উৎফুল্ল হয়ে উঠল। পরদিন ভোরবেলায় ইরির নামাঙ্কিত একটি এসি কোস্টার মিনিবাসে করে পাহাড়ি এলাকার জন্য একজন সুদক্ষ ড্রাইভারের চালনায় আমরা ৮ ঘণ্টা সময়ের অ্যাডভেঞ্চারাস জার্নি শুরু করলাম। ২-৩ ঘণ্টা গাড়ি চালানোর পরপর গাড়ি এবং ড্রাইভার দুজনকেই খানিক রেস্ট দেয়ার জন্য ১৫-২০ মিনিট ব্রেক দিতো। সে সময়ে প্রাকৃতিক কাজকর্ম, হাল্কা রিফ্রেশমেন্ট এবং যাদের ধূমপানের অভ্যাস ছিল তারা সেকাজ সেরে নিতো। সেখানে গিয়ে সন্ধ্যায় পৌঁছে ইরি নির্ধারিত ‘সিটি ট্র্যাভেল ইন্টারন্যাশনাল হোটেল’ে উঠলাম। প্রথমদিন হোটেল চেকইন করে আশপাশের দুয়েকটি জায়গায় ঘুরে এলাম। যেহেতু ইরির ট্যুর, ইরিই গাইড আর সঙ্গে বিভিন্ন পর্যায় ও বয়সের সহকর্মী ছিল সেজন্য ইচ্ছা করলেই সকলকে ছাড়া আলাদা কোথাও যাওয়ার উপায় ছিল না। তবে সবাইকে মানিয়েই একসঙ্গে ঘুরে বেশ মজা করছিলাম। সেখানে বিভিন্ন শপিং মলে গিয়ে যখন যা পছন্দ হয়েছে তৎক্ষণাৎ কিনে নিয়েছি। আগেই বলেছিলাম, আমার প্রথম সন্তান নাকির প্রথম জন্মদিনে (১৬ মার্চ ২০০৫) আমি ফিলিপাইনে ছিলাম, সেটিকে মনে করে যেখানেই গিয়েছি নাকিকে উদ্দেশ্য করে সেখান থেকেই জামা, প্যান্ট, টি-শার্ট, খেলনা ইত্যাদি কিনে নিয়েছি। সঙ্গে অবশ্য নাকির মা যে একেবারে বাদ গেছে তা কিন্তু নয়। ভেবেছি সরকারি অর্থে যেহেতু আসার সুযোগ পেয়েছি, আর কখনো বা কবে সুযোগ পাবো তার তো ঠিক নেই, সেজন্য টাকা বাঁচিয়ে কি করব? আমার এ রকম শপিং দেখে সদ্য বিবাহিত এক সহকর্মী আমার উপর এক ধরনের রাগ করে বলে ফেলল, ‘ভাই আর কত কিনেন আপনার ছেলের জন্য।’ অবশ্য আরো বছরখানেক পর আমার ওই সহকর্মীর প্রথম সন্তান হলে তিনি ওই মন্তব্যের জন্য আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন এই বলে, ‘ভাই নিজের সন্তানের প্রতি কী যে মায়া, তা না বুঝেই তখন আপনাকে যা বলেছি এখন আমি তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছি।’ যা হোক, বাজিও সিটিতে যাওয়ার পূর্বে পাতাইয়া নামক আরেকটি পাহাড়ি দর্শনীয় স্থান দেখে গেছি, সেটাও অনেক সুন্দর। সেখানে পাহাড়ের উপরে দোকান, হোটেল, শপিংমল ইত্যাদি রয়েছে। যেখানে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ও বিশেষ আইটেম পাওয়া যায়, যা আর কোথাও পাওয়া যায় না। চারদিকে পাহাড়ের গা ঘেঁষেঘেঁষে অনেক উঁচু পাহাড়ের চূড়ায় বিরাট শহর। যেখানে ফিলিপাইনের প্রেসিডেন্টের শীতকালীন অবকাশ কেন্দ্র, বিমান

বাহিনীর সদরদপ্তর, সেনাবাহিনীর সদরদপ্তর ছাড়াও আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন হোটেল-মোটেল, চিড়িয়াখানা ইত্যাদি অবস্থিত। সেসব জায়গায় পাহাড়ের গায়ে গায়ে অনেক প্রান্তিক পর্যায়ের মানুষ বিশেষত মহিলারা বিভিন্ন ছোট-খাটো ব্যবসাবাগিজ করে তাদের জীবিকা নির্বাহ করতে দেখা গেছে। কেউ তাদের হাতে বানানো চাবির রিং কেউবা আবার হাত-পাখা কিংবা ঘরের বিভিন্ন শোপিস বিক্রি করছে। তারপর ৩-৪ দিন ধরে পাহাড়ি এলাকায় অবস্থিত বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান ও স্থাপনাসমূহ পরিদর্শন করে একইভাবে আবার ম্যানিলা সিটি হয়ে ইরির ট্রেনিং সেন্টারে ফিরে আসি। পরে আবার ৩-৪ দিন ফিলিপাইনে সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে কৃষি সম্প্রসারণ বিষয়ে সরকারি কৃষি অফিস ও কয়েকটি এনজিও পরিদর্শন করি। মিউনিসিপাল কৃষি অফিস, জেলা কৃষি অফিস, প্রতিগিয়াল কৃষি অফিস এবং সর্বোপরি কেন্দ্রীয় কৃষি অফিস ও পরিদর্শন করে নিজেকে নিজের দেশের কৃষি সম্প্রসারণের কাজকে আরো বেগবান করার জন্য অনেক কিছু শিখে আসতে পেরেছি, যা পরবর্তীতে আমাদের দেশের মাঠপর্যায়ে কাজে লেগেছে। দেশে ফিরে আসার আগে আমাদের দেশি ভাইরা একেরপর এক দাওয়াত খাওয়াতে লাগল এবং দেখা গেল প্রতিদিনই রাতের খাবার কারো না কারো বাসায় খেতে হয়েছে। ইরিতে তখন আমাদের দুজন বাংলাদেশি খুবই বড় পদে ছিলেন, আর তারা হলেন- ইরির সামাজিক বিজ্ঞান বিভাগীয় প্রধান বিশিষ্ট কৃষি অর্থনীতিবিদ ড. মাহবুব হোসেন (মৃত্যু :২০১৬ সালে) যিনি আগে বাংলাদেশের বিআইডিএস কর্মরত ছিলেন, সর্বশেষ তিনি ওখানকার চাকরি শেষ করে বাংলাদেশের বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ব্র্যাকের নির্বাহী পরিচালক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। অন্যজন কৃষিতত্ত্ববিদ ড. জয়নাল আবেদীন বর্তমানে যিনি ইরির হয়ে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)-এর ধান বিশেষজ্ঞ হিসেবে বাংলাদেশের জন্য কাজ করছেন। ২০০৫ সাল থেকে ২০১৬ সাল ১১ বছর আগের বিষয় লিখতে গিয়ে সবকিছুই আর হুবহু মনে করতে পারিনি। তবে যেটুকু মনে রেখে লিখতে পেরেছি তাতে নিশ্চয়ই এটি পরিষ্কার হবে, ফিলিপাইনের সেই দর্শনীয় স্থানগুলো অবশ্যই পর্যটকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। যাদের পর্যটন নেশা আছে তারা অবশ্যই ফিলিপাইনের ইরি, বাজিও সিটি, পাতাইয়াসহ আরো অনেক এলাকা ভিজিট করবেন, অনেক ভালো লাগবে। আর সপরিবারে যেতে পারলে আরো উপভোগ্য হবে।

৫.

২০০১ সালে বিয়ের পর যেহেতু হানিমুনে যেতে পারিনি, সেজন্য দীর্ঘদিন থেকেই সপরিবারে বেড়ানোর পরিকল্পনা করছিলাম। কবি নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ে ডেপুটি রেজিস্ট্রার হিসেবে ২০১০ সালের ২৮ ডিসেম্বর চাকরিতে যোগ দেয়ার পর মাত্র কয়েকমাস পরেই ৩০ মে ২০১১-তে আমাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্তে ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রারের দায়িত্ব নিতে হয়েছিল। এ

দায়িত্ব আমি ২৮ জানুয়ারি ২০১৫ পর্যন্ত প্রায় চার বছর পালন করেছি। সেজন্য বেড়ানোর শত ইচ্ছা থাকার সত্ত্বেও সময় করে উঠতে পারছিলাম না। আমি যেহেতু ময়মনসিংহস্থ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলাম সেজন্য ২০১৩ সালের জানুয়ারিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫০ বছরপূর্তি অনুষ্ঠানে গিয়ে অনেক পুরনো বন্ধুবান্ধব পেয়ে কিছুটা নস্টালজিক হয়ে যাই। সেখান থেকেই কয়েক বন্ধু মিলে সপরিবারে কক্সবাজারসহ পার্বত্য এলাকায় বেড়ানোর পরিকল্পনা করে ফেলি। যেই কথা সেই কাজ। তা না হলে পরিকল্পনা পরিকল্পনাতেই সীমাবদ্ধ থাকবে এই ভেবে সঙ্গে সঙ্গেই সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলাম বেড়ানোর। সেখানে আমার বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এবং রুমমেট সঙ্গীক তারিফ আনাম তারেক যিনি বর্তমানে রাজনীতিক ও একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, অন্যজন আরেক ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও রুমমেট বর্তমানে কবি নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়েই পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগের উপ-পরিচালক কাজী মাহবুব ইলাহী চৌধুরী (তখনো তিনি অকৃতদার)-কে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শীতকালীন ছুটিতে বেড়াতে গিয়েছিলাম। সেখানে গিয়ে যতটুকু না আমি এবং আমাদের পরিবার মজা পেয়েছিলাম, তার থেকে বেশি মজা করেছিল আমাদের সন্তান-সন্ততিরা। প্রায়ই মজা করে তাদের বলতাম, ‘দেখ বাবারা! আমরা আমাদের প্রায় অর্ধশতাব্দী বছরেও এখানে বেড়াতে আসার সময় পাইনি, আর তোমাদের ৫-১০ বছর বয়সেই এখানে বেড়ানোর সুযোগ পেয়েছ, যা সৌভাগ্যই বটে’। আমাদের পর্যটনবহরে সবাই কৃষিবিদ হওয়ার সুবাদে সমুদ্র সৈকতের পাশেই কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের হটিকালচার সেন্টারের মাশরুম উন্নয়ন কেন্দ্রের বিলাসবহুল ডরমিটরিতে একেবারে নামমাত্র ভাড়াই থাকার জায়গা পেয়েছিলাম। এতে আমাদের ভ্রমণের ক্ষেত্রে অনেকাংশে আর্থিক সাশ্রয় হয়েছে। সেখান থেকেই প্রায় দুসপ্তাহ ধরে কলাতলী, ইনানি, লাবণী ও হিমছড়ি বিচ, রামুর বৌদ্ধ মূর্তিসহ গুরুত্বপূর্ণ দর্শনীয় স্থানসমূহ অনায়াসেই পরিদর্শন করতে পেরেছি। রামুর বৌদ্ধ মূর্তিটা তখন একদল সন্ত্রাসী নাশকতা করে পুরিয়ে দিয়েছিল, যার সংস্কারের কাজ সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে হচ্ছিল। সেখান থেকে একদিনের জন্য গিয়েছিলাম সেন্টমার্টিনস দ্বীপে। সে আরেক মজার ও স্বপ্নের বেড়ানো। জীবনে অনেকেরই স্বপ্ন থাকে সেখানে বেড়ানোর। তবে যারা এখনো যাননি তারা জীবনে একটি বড় মিস করেছেন। খুব ভোর বেলায় ঘুম থেকে উঠে পূর্ব নির্ধারিত একটি গাড়িতে করে টেকনাফে নাফ নদীর পাড়ে গিয়ে স্টিমারে উঠি। ৩-৪ ঘণ্টা জার্নি করে সেন্টমার্টিন গিয়ে পৌঁছি দুপুরবেলায়। সোখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য আসলে খুবই নির্মল। চারদিকে অঁঠে সমুদ্র আর মাঝখানে এক টুকরা দ্বীপ সত্যিই কল্পনা করা যায় না। রাতের সেন্টমার্টিন তো আরো অনেক বেশি মনোরম যা দুচোখে না দেখলে বিশ্বাস কিংবা কল্পনা করা দুটোই কঠিন। সেন্টমার্টিন গিয়ে বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক হুমায়ুন আহমেদের ‘সমুদ্র বিলাস’ দেখেছি এবং সেখানকার ছবি তুলেছি। সেখানে

কোরাল লাইমস্টোনের উপর বসেবসে বউ-বাচ্চা, বন্ধুবান্ধবীদের নিয়ে ছবি তুলেছি এবং অঁঠে সমুদ্রতীরে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে মনোরম দৃশ্য উপভোগ করেছি। সেখানে নারিকেলের শাঁসসমৃদ্ধ ডাব খেয়েছি, কারণ এটি না খেলে তো নারিকেল জিজিরা যাওয়ার অর্থ, অনর্থ হয়ে যাবে। সেখানে দুপুরবেলা পরম ক্ষুধায় গরম ভাতের সঙ্গে খেয়েছি চোখের সামনে ভেজে দেয়া সামুদ্রিক রুপচাঁন্দা। তারপর বালুকাময় রাস্তা দিয়ে হেঁটে হেঁটে আবার সেই ফিরতি স্টিমারে আসা। ফিরে আসার সময় দেখলাম মধ্য-সমুদ্রে স্টিমার আসার পর এক ধরনের পাখি দলবেঁধে চারদিকে ঘুরেফিরে শূণ্য আমাদের কাছাকাছিই থাকছে এবং সেখানে বাচ্চাদের অর্ধ-খাওয়া চিপস কিংবা অন্যকোনো খাবার সহজেই ছিটিয়ে দিলে তাড়াতাড়ি দলবেঁধে খেয়ে নিচ্ছে। বাচ্চারা তো বটেই, আমরা এটি দেখে খুবই মজা পেয়েছি। কক্সবাজার, রামুতে বৌদ্ধ মন্দির সম্পর্কে আগেই বলেছি, মন্দিরটি প্রতিহিংসার শিকারে সন্ত্রাসী হামলায় ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, টেকনাফ ও সেন্টমার্টিন ঘুরেফিরে বেড়ানো শেষ করে ফেরার পথে বান্দরবান হয়ে চট্টগ্রামে আসি। সেখান থেকে ঢাকায় ফেরার জন্য মনস্থির করি। সে কারণে বান্দরবানের পথে ডুলাহাজরায় বঙ্গবন্ধু সাফারি পার্ক, বান্দরবান পাহাড়ি ও আদিবাসী এলাকা, লামায় বিখ্যাত স্বর্ণমন্দির দেখতে দেখতে চট্টগ্রামে ফিরেছি। চট্টগ্রামে এসে আবার আমার আরেক সাবেক সহপাঠী (বর্তমানে বিআইডব্লিউটিএ-এর কর্মকর্তা)‘র আমন্ত্রণে তাদের সরকারি রেস্টহাউজে একরাতি থেকে চট্টগ্রামে কয়েকটি স্থানে ঘুরে চট্টগ্রাম থেকে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে অনেক যানজট পার করে ঢাকা পাড়ি দিয়ে ময়মনসিংহ ফিরে আসি। প্রায় দু’সপ্তাহে পারিবারিক এ ভ্রমণটি খুবই উপভোগ্য ও স্মরণযোগ্য হয়েছিল। আসলে মেন্টাল রিক্রিয়েশনের জন্য সাধ ও সাধের মধ্যেই মাঝে-মাঝে এ ধরনের ভ্রমণ নেয়া উচিত। কারণ এতে বাচ্চারা খুবই মজা করে এবং তাদের শিক্ষাটিই বেশি হয়।

৬.

একবার যখন বেড়ানোর অভিজ্ঞতা হয়েছে সেজন্য এখন বেড়ানো একটি নেশা হয়ে গেছে। আগেই উল্লেখ করেছিলাম আমার সাবেক সহপাঠী ও বর্তমানে আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের এ বয়সেও দিনাজপুর নিবাসী অকৃতদার সহকর্মী কাজী মাহবুব ইলাহী চৌধুরী হঠাৎ করে বিয়ে ঠিক করলেন। পাত্রী দিনাজপুর হাজী দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের মৎস্য বিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক। তার বিয়েতে ইতিহাস হয়ে থাকার জন্য এবং আমার পারিবারিক বেড়ানোর অভিজ্ঞতাকে আরো সুদৃঢ় করার জন্য দিনাজপুরে সেই বিয়ের অনুষ্ঠানে আবাবো সেই কক্সবাজারে বেড়ানোর টিমসহ ট্রেন জার্নি করার জন্য রাজি হই। ট্রেন জার্নির প্রস্তাবটা অবশ্য বন্ধু তারিফ আনামেরই ছিল। আসলে ট্রেন জার্নির মজাই আলাদা। ট্রেনে যেতে যেতে দু-ধারে সবুজমাঠ, ঘাট, ধানক্ষেত, আখক্ষেত, বঙ্গবন্ধু যমুনা সেতু ইত্যাদি দেখতে

দেখতে কখন যে দিনাজপুর গিয়ে পৌঁছেছি টেরই পাইনি। মনে হয়েছে যদি ‘এই পথ যদি আর শেষ না হতো!’ তবে বাংলাদেশের ট্রেনে ভ্রমণ করার অভিজ্ঞতা যে খুব একটা ভালো নয় সেটা আমরা তা সবাই জানি। কিন্তু এখানে সেরকমটি একেবারেই মনে হয়নি। তার কারণ হলো যাওয়ার দিন খুব কষ্টে আমাদের দুই পরিবারের জন্য ঢাকার এয়ারপোর্ট স্টেশন থেকে একটি এসি কামরা বুকিং দিতে পেরেছিলাম। সেজন্য গতানুগতিক ট্রেনের সময়সূচি অর্থাৎ কখন ট্রেনটি কোন স্টেশন ছাড়ল, আবার কোথায় পৌঁছল, কোথায় ক্রসিং দিল, কতক্ষণ লেট করল, এগুলো বিষয় আর তেমন মেনটার করেনি। আমাদের জন্য ট্রেন জার্নিটাই বরং উপভোগ্য হয়ে উঠেছিল। তারেকের দুই ছেলেমেয়ে এবং আমাদের দুই ছেলেসহ আমরা চার বুড়া-বুড়ি মিলে মোট আটজনের লটবহর। কাজেই দিনাজপুর রেলস্টেশনে নামার পর তাই মনে হয়েছে ভালোই তো লাগছিল, আরো যেতে পারলে খারাপ হতো না। এর আগে আমি যখন কুমার ছিলাম তখন ২০০০ সালে অল্প কিছুদিন দিনাজপুরে চাকরি করতে গিয়েছিলাম। কিন্তু বারো-তেরো বছরের ব্যবধানে দেশের অন্যান্য জায়গার মতো দিনাজপুর শহরেও অনেক কিছুই পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। রেলস্টেশনে নেমে সেজন্য অনেক কিছুই অচেনা লাগছিল তখন। দিনাজপুর শহরে অনেক বন্ধুবান্ধব থাকার পরও কাউকে বিরক্ত না করার মানসে সেখানে আমাদের জন্য আগে থেকেই ভোগ করে রাখা রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির একটি রেস্ট হাউজে উঠেছিলাম। তখন জুন মাসে সেখানে খুব গরম ছিল। সেজন্য সারাদিন কষ্ট করে ঘুরেফিরে এসে রাতে কোনো রকমে ইচ্ছামতো এসি ছেড়ে ঘুমাতে। আমি নিজে যেহেতু একজন কৃষিবিদ, সেজন্য একজন কৃষিবিদের জন্য স্বজাতীয় আরেকজন কৃষিবিদের খুব টান অনুভব করি আমরা। দিনাজপুরে হাজী দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় নামে একটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থাকার কারণে এবং সে অঞ্চল মূলত কৃষিপ্রধান হওয়ার সুবাদে কৃষি উন্নয়ন করপোরেশন (বিএডিসি), মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট (এসআরডিআই), বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে আমার অনেক বন্ধুবান্ধব রয়েছে। সেই সুবাদে সে অঞ্চলের অনেকের সঙ্গে দেখা হওয়ার সুযোগ হয়েছিল। পরিবারের সদস্যদের নিয়ে আজ এর বাসায়, কাল আরেকজনের বাসায় দাওয়াত খেতে খেতে ব্যস্ত সময় কাটিয়েছি। এর মধ্যে দিনাজপুরের ঐতিহ্যবাহী রামসাগর, কাভজিউ মন্দির, ঐতিহাসিক রাজবাড়ি, স্বপ্নপুরী ইত্যাদি স্থান ঘুরে দেখেছি। এভাবেই সেখানে বেড়ানোর পর আবার একটি আরামদায়ক ট্রেন জার্নি করে ময়মনসিংহে ফিরে আসি। পর্যটন যে একটি নেশা, সেইসঙ্গে এর মাধ্যমে যে অনেককিছুই শিখার আছে, তা না বেড়ালে কখনোই অনুভব করা যায় না। এভাবেই আগে যে একটি বেড়ানো ভীতি ছিল তা সম্পূর্ণরূপে কেটে গেছে এখন। ছুটি পেলেই মন চায় বেড়িয়ে পড়ি।



গল্প

ফকিরের ধনের নেশা

তমসুর হোসেন

মাঝে একটা গভীর নালা। টলটলে স্বচ্ছ জলরাশি তরঙ্গিত হয় নালায় দেহজুড়ে। নালায় পূর্বপাড়ে এক ভিক্ষকের কুঁড়েঘর। প্রতিদিন ভিক্ষকের জী নালায় পানিতে বাসন কোসন মাজতে আসে। নালায় পশ্চিম পাড়ে গৃহস্থের খামারবাড়ি। বাড়ির সামনে ফসল তোলার চারকোনা প্রশস্ত আঙিনা।

বিশাল পান সুপারির বাগান বাড়ির পেছন দিকে। সুপারির মাঝে আছে নানা জাতের ফল-পাকড়ের গাছ। আমলকি, বহেরা, হরতকি এবং উলটকলমের গাছও আছে বাগানের চারধারে। সুপারির বাগানের উত্তরে আরও দু'খানা গাছের বাগান আছে গৃহস্থের। মেহগিনি, ইউক্লিপটাস, আকাশমনি, পিতরাজ, ইপিলইপিল এরকম মূল্যবান কাঠের বাগান করেছে গৃহস্থ। বাগানের সে গাছগুলো এতো সুঠাম এবং

দীর্ঘ হয়েছে যে সেসব গাছ কেনার জন্য বড় বড় গাঞ্জের পাইকাররা এখনই ঘুর ঘুর শুরু করেছে। বারো মাসে তের ফসলের আমদানি গৃহস্থের খামারবাড়িতে। দুপুর বেলা সংসারের কাজ সেরে নালায় পানিতে গোসল করতে আসে গৃহস্থের ক্রান্ত-শ্রান্ত বউবেটি। টলটলে পরিষ্কার পানিতে দেহ ভিজিয়ে তারা শরীরের ক্রান্তি দূর করে। এই ফাঁকে ভিক্ষকের জীর সঙ্গে নানা বিষয়ে কথাবার্তা হয় তাদের।

ভিক্ষকের নাম জব্বার শেখ। জিনের মতো খাছলোতের জন্য লোকজন তাকে জিন-জব্বার বলে ডাকে। ভিক করার জন্য সে অনেক দূরের হাটবাজার এবং গ্রামে যায়। সাহেবের আলগা, বারোবিশ, পাখিউড়া, চৌদ্দকুড়ি, শুকচর,

কোদালকাটি এবং শিলকুড়ি নারায়ণপুরের দিকেও সে সব সময় যাতায়াত করে। প্রতিদিন সে ঝোলা ভর্তি করে নানা রকম জিনিস নিয়ে আসে ওসব এলাকা থেকে। পাখিউড়ার উত্তরে ভারতের ছালাপাড়া এবং আইডুমারীর হাটে অল্প দামে নানা রকম সন্দেশ পাওয়া যায়। জিন-জব্বার প্রায়ই সন্দেশ আনে বাড়িতে। কদমা, লাডু, বাতাসা, মুড়কিভাজা, জিলাপি, হাতনাদু, বালুশা কত ধরনের সন্দেশ তারা মজা করে খায়।

দাঁতভাঙ্গা আর কোদালকাটিতে নদীর বাঁকে উজানী জেলেরা বেড় জাল ফেলে মাসকে মাস মাছ ধরে। জিন-জব্বার রাজস্থানী মোছওয়াল পশ্চিমাদের কাছে মাছ বশীভূত করার কিছু তন্ত্রমন্ত্র শিখেছিল। সেই মন্ত্র পড়ে কালিজিরা আর মেতির গুড়ায় ফুঁ দিয়ে সে মাঝিরের জালের বেড়ে ছিটিয়ে দেয়। মাঝিরা মন্ত্রের জাদুতে অনেক মাছ পেয়ে খুশী হয়ে তার ঝোলায় রুই কাতলা তুলে দেয়। সেই মাছের পেটি খেয়ে ফকিরের বউ নালার পানিতে দাঁত মাজতে আসে। নালার জলে কুলি পানি ফেলে সে গল্প ফাঁদিয়ে বসে—
'আইজ মাবুদ খিলাইলো গো কাতল মাছের পেটি। যা ত্যাল হইচাল মাছটার। সেই ত্যালে হাঁড়ি পাতিল পিচলা হইয়া গ্যাছে। আমাগের ফহির ভিক করতে গ্যাছে দাঁতভাঙ্গা। হের লগে জেলগুলার বিষম খাতির। হেরা দয়া কইরা দেয় বইলা আমাগের মুহে মাছ ওঠে। আমাগের তো কিনা খাওনের কপাল না।'

তিনহাজারী আর সাহেবের আলগায় অবস্থাসম্পন্ন লোকেরা বাস করে। তারা বালা মুহিবত থেকে বেঁচে থাকার জন্য সব সময় ফকির মিছকিন খাওয়ায়। জিন-জব্বার সেখান থেকে ঝোলা ভর্তি চাল আর খাসির মাথা নিয়ে বাড়ি আসে। সেই চাল আর খাসির মাথা দেখে ফকিরের বউ হেসে গলে পড়ে। সে ভক্তিতে গদগদ হয়ে স্বামীকে বলে—
'আইজ কি আন্দমু?'
'কি রান্ধবা মানো। রুচলভোগ চাইল আর রাম ছাগলের মাথা কি ঘরের কোণে পচবে? আমি গতরে কষ্ট দিয়া নইড় পাইড়া আনলাম আর আমার বউড়ি কয় কি আন্দমু। এক কাজ কর গিয়া, আমার ঠ্যাংগের গোস্ট কাইটা আন্দন চড়া।'
'আগ কইরা কথা কইতাহুন ক্যা। আপনে না আমার ভাইয়ের লাহান।'
'এহন আমি ভাই হই। আমার মাথার ঘামে গোয়া ভেজে আর তুমি দোপায় বইয়া হুকা খাও।'
'কি বেশরম কথা কন। মাইনযে কইব ফকিরনি হুকা টানে।'
'টানো না তো কি করো। আমার ছিলিমের তামুক কেডা খায় শুনি? নাকের ছ্যান্দা দিয়া ধুমা বাইর কইরা বুট কথা কওন সাজে না।'

অনেক রাত অবধি কাজিয়া ফ্যাসাদ করে খেয়ে দেয়ে নাক ডেকে ঘুমায় তারা। সকালে উঠে ফকিরের বউ বাসন কোসন নিয়ে নালার পানিতে ধুতে যায়। সেই খাসির চর্বি তাদের বাসনে লেগে থাকে। খালা-বাসন মাজতে মাজতে সে গৃহস্থের বউকে বলে—

'আপনাগের আইজ কি সাণুন গো?'
'শাকভাজা আর মসুর ডউল।'
'গোশত নাইকা? আমরা আইজ খাইলাম গো খাসির চরপা।'
'তোমরা ভিক্ষা কইরা গোস খাও। আর আমরা বাগিজ কইরা মরিচ গিলি।'
'তোমাগের গেরঙটা ক্যামুন মানুষ গো, খরচ করবার চায় না?'
'খরচ করলে ভোতার চরের জমি কিনব কি দিয়া?'

গৃহস্থের নাম মোল্লা জহির। তার অনেক জমিজমা। কিছু নিজে আবাদ করে কিছু বর্গা দেয়। ফসল কাটার সময় হলে বর্গাচারিরা আবাদের ভাগ দিতে আসে। মোল্লা জহির সামান্য লেখাপড়া জানে। সে বড় আঙিনার এক কোণে টেবিল চেয়ার নিয়ে খাতা খুলে বসে। নিজের উৎপাদিত ফসল এবং বর্গাচারিদের অংশ খুঁটে খুঁটে লিখে রাখে সে। অনেক লোকের রান্না হয় তার বাড়িতে। এদের খানাপিনা সম্পর্কে সে খুব একটা মাথা ঘামায় না। শাকসবজি সে নিজেই আবাদ করে। বাড়ির চাকররা জাল ফেলে বিল থেকে মাছ ধরে আনে। গোয়াল ঘরের ছাঁদ এবং খড়ের গাদায় কবুতর বাচ্চা দেয়। এতেই তার দিন ভালোভাবে চলে যায়। জমিজমা ছাড়াও মোল্লার চাউলের আড়ত আছে। বন্দরে বাসাবাড়ি এবং গুদাম ঘর আছে। সে সবার খোঁজখবর নিতে তার মাথার ঘাম ঝরে। এবার সে ভাটির ব্যবসার জন্য নৌকা বানাবে। উজান থেকে সস্তায় পাট, ধান এবং সরিষা কিনে ভাটির বড় বড় গঞ্জে চালান দিবে। এত যার আবাদ-বসত, ব্যবসাবাগিজ তার বাড়ির লোকেরা প্রায়ই শাকসবজি খেয়ে থাকে। ফকির ফাঁকরারা গোস মাছের ঝোল খেয়ে টেকুর তোলে আর তারা সবজির মুড়া গিলে শরীর নষ্ট করে। এসব কথা নিয়ে গোটা বাড়িতে ফোভের আগুন জ্বলে। বউঝিদের কথা মোল্লা জহির আড়াল থেকে শোনে। সে মনে মনে বলে জিন-জব্বারের মতো সে যদি সব টাকা মাছ-মাংস আর তেল মশল্লায় উড়ায় তাহলে সংসার বড় করবে কি দিয়ে। একদিন সে তার স্ত্রীকে ডেকে জিজ্ঞেস করে—
'ফহিরের বউ কি কি আন্ধে গো? জব্বার কি খরচ কেনে না ভিক্ষায় পায়? ভিক কইরা হামেশা গোছ খায় এটা তো আজব খবর শুনবার নইচি।'
'হে ভিক কইরা কালিয়া কোত্তা খায় আর তুমি গেল ডাউলের পানি। পোলাপানের রুচি তো তোমার মতো খবিচ না। এ বাড়ির সাণুন ফকিরও গিলবার চায় না।'
'স্ত্রীর কথা শুনে মোল্লা জহির হাসে।
'হালায় ফহির দেহি আমারে ভাজালে ফেইললো। মজা কইরা গোছ খাইয়া চোষা হাড়ি ফ্যালবার আহোস আমার নালায়! আমার সংসারের কোমড় ভাইঙ্গা তর কি লাভ? ঠিকমতো একখান ঘর বাইন্ধবার পারোনা না। বেরামী বকরির পঁচা ফ্যাপরায় কামড় দিয়া খুব বাহাদুরি করস? তরে আমি এমন গিট দিমু ছেড়া ঠুপি মাথায় দিয়া চিমসাপুরের মুসী সাজবি। শালা বান্দোরের বান্দোর। বড়লোকী দেখাইবার চাস আমার লগে?'

নাতির আকিকা উপলক্ষে রমজানে রোজাদার এবং ফকির খাওয়ানোর নিয়ত করলেন মোল্লা জহির।

সেজন্য জিন-জব্বারকে কাজের লোক দিয়ে খবর পাঠালেন তিনি। তাকে বলে রাখলে অনুষ্ঠানের দিন ফকির পেতে অসুবিধা হবে না। সকালেই জিন-জব্বার দেখা করল মোল্লা জহিরের সঙ্গে। তাকে দেখেই কলকলিয়ে উঠল মোল্লা জহির।
'জব্বার বাই। বেশ কদিন খেইক্যা আপনরে তালাশ করছি। এতদিন কই আছিলেন?'
'আরে বাই। বাইঙেই থাকি। কাম কাজ নাই কই যামু। আইজ গেছিলাম এক দাওতের বাড়ি। যে মরার সে তো মরছে। হেগুরে শুদু কাইজা ক্যাচাল।'
'কিসের কাইজা ক্যাচাল জব্বার বাই?'
'চরের জমি কেই নিব না। হক্কলে কাইমের জমিত বাড়ি করবার চায়।'
'দাওতে কেমন খিলাইলো?'
'ছাড় ফহিরের খাওয়া। চোনা হাড়ি আর আলুর ফালা। রুহ ছাপাতের কাম শ্যাষে ঘাড় ধইরা ফিক মারো।'
'কাইল আমার বাইঙে আহন লাগব। জনা দশেক লাগব কইল। নাতির আকিকা।'
'আইছা আমুনো।'
'আর একটা কতা কই। ম্যায়ার বিয়ার কি করল্যা?'
'বিয়া দিমু ট্যাকা পামু কই? আগে ট্যাকা জোগাড় করি তারপর চিন্তা করমুনো।'

মোল্লা জহির জিন-জব্বারকে আড়ালে ডেকে নিয়ে হাতে একটা থলে দেয়। তারপর বলে, 'এইখানে কিছু ট্যাহা আছে। এটা ম্যায়ার বিয়ার জন্য তোমারে দিলাম। বাকিটা জোগাড় কইরা জলদি ওদের বিয়া দিও। ভালোই কামাই করছ হুনলাম। খাওন দাওনে বেশি খরচ কইরা ফেইললে হাতে পয়সা থাকব না। মোল্লা জহিরের দেয়া থলে খুলে জব্বার অবাক হয়। থলের ভেতর অনেক সিকি এবং আধুলি। এতো টাকা সে একসঙ্গে কোনোদিন দেখেনি। হাত দিয়ে অনেকক্ষণ মুদ্রাগুলো নাড়াচাড়া করল সে। তারপর একটা একটা করে গুনতে লাগল। গুনে সে আশুস্ত হলো সেখানে দশ কম পাঁচশত টাকা আছে। কোথায় রাখবে সে এতো টাকা। ঘরে দাদার আমলের একটা কাঠের বাস্ক আছে। সেটা ঝেড়ে মুছে টাকাগুলো রাখল সে। রাভের বেলা বাস্ক খুলে টাকাগুলো সে নাড়াচাড়া করে। সারাদিন ভিক্ষা করে সন্ধ্যায় সে টাকা উড়াত। সিকি রেজকিগুলো জমানোর খেয়াল তার মাথায় কোনোদিন আসেনি। এবার সাবধানী হলো সে। পরম যত্নে সে অর্থ সঞ্চয় করতে লাগল। জব্বারের স্ত্রী খুবই আশ্চর্য হলো স্বামীর কীর্তি দেখে। সন্ধ্যায় যে মানুষ আসত ব্যাগ বোঝাই খরচ নিয়ে এখন সে আসে খালি হাতে। অনেক সময় চাল আনতেও সে ভুলে যায়। মোল্লা জহির স্ত্রীর কাছে ফকিরের বাড়ির খবর শোনে। এখন আর আগের মতো খাওয়া দাওয়ার গল্প ফাঁদিয়ে বসে না ফকিরের বউ। রমজান মাসে জিন-জব্বার খাওয়া দাওয়ার খরচ বেশ কমিয়ে ফেলল। সে মনে মনে ভাবতে লাগল এবার জাকাত ফেতরা কালেকশনে ফকিরনিকেও কাজে লাগাবে। মন্দ কথা বলেনি মোল্লা জহির। দু'টো মেয়ে খুজনা চাউলের ভাত খেয়ে লকলকিয়ে বাড়ছে। চকে ঘর না থাকায় লাজলজ্জার মাথা খেয়ে এক ঘরেই থাকে সে মেয়ে দু'টোকে নিয়ে। তার মাথায়

খেয়াল চেপেছে এবার ঈদে বেশি করে টাকা
রোজগার করে বড় করে টিনের একখানা চোয়ারি
ঘর তুলবে। মাঝে বেড়া দিলে মেয়েরা বেশ
হেফাজতে থাকতে পারবে। রাতে সে বিষয়ে সে
ফকিরনির সঙ্গে সলা পরামর্শ শুরু করল।
‘মাথায় একখান খেয়াল চাপল গোলাপির মা।’
‘কি খেয়াল কইনছেন শুন। আমারে তো এখন
কিছুই হইচ করেন না।’
‘আরে কি কমু তোমারে। সব কতা ঢোল বাজায়া
গেরামে পরচার করলে দেলে শান্তি লাগে?’
‘এই যে একখান চরম মিছা কতা কইলেন আপনে।’
‘আমি মিছা কতা কই। বোয়াইল মাছের কতা কে
পরচার করছে।’
‘আমি পুটির মায়েরে কইচি তুমি বাজার খন কিইনা
আনচো।’
‘হেই শালি। লাঠি দিয়া পিডি ফাটামু।’
‘আপনে খালি কতায় কতায় রাগ করেন।’
‘রাগ করমু না। মেয়ে যে ফাল দিয়া ডাংগর
হইতাছে সে কতা ভাবস?’
‘আমি কেমনে ভাবমু। ওজগার করেন আপনে,
আপনি ভাবুন গিয়া।’
‘তাইলি এবার খিনি ঈদে মেয়েগো সাথে নিয়া
গেরাম ঘুরবি।’
‘আপনি ঘুরুন গিয়া। আমার বংশে একটো
জনপোকাও ভিক মাংগেনা।’
‘এই ব্যাকরা নাটির মাইর তাহিলে একটাও মাটিত

পড়বো না।’

সামনে পবিত্র ঈদুল ফিতরকে সামনে রেখে জিন-
জব্বার বেশ একখানা পরিকল্পনা তৈরি করল। শুধু
মেয়ের বিয়ে কেন মোল্লা জহিরের মতো ধনসম্পদ
এবং জমিজমার মালিক হওয়ার স্বপ্ন তাকে অস্তির
করে তুলল। ঈদের দশদিন আগ থেকে গাট
কোমড় বেঁধে সে নিজ গ্রাম ছেড়ে দূরদূরান্তে ছুটে
লাগল। তার স্ত্রীও মেয়ে দুটোকে নিয়ে ফকিরের
কথামতো প্রতিটি অবস্থাপন্ন পরিবারের কর্তার
কাছে সোমন্ত মেয়েদের বিয়ের জন্য ফিতরা,
জাকাত এবং কুরবানির চামড়া থেকে হিস্যা দেয়ার
জন্য অনুরোধ করতে লাগল।

নালায় পাড়ে ফকিরের বউবেটির সঙ্গে এখন আর
ততো একটা দেখা হয় না মোল্লা জহিরের স্ত্রীর।
কেন যেন ওরা আর খালের পাড়ে বাসন মাজতে
আসে না। বেশ ভাবনায় পড়ল জহিরের বউ।
যারা প্রতিদিন মাছ মাংস খেয়ে নানা রকম গল্প
করে এখন তারা কি এমন কাজে ব্যস্ত হয়ে
পড়ল? দশ বারো দিন পরে একদিন খালের
পাড়ে ফকিরনির সঙ্গে দেখা হলো মোল্লার স্ত্রীর।
আগের মতো গল্পের মন নেই তার। তাড়াতাড়ি
গোসল সেরে ঘরে ফিরে যাওয়ার মানসিকতা
কাজ করছে তার মধ্যে। তার এ অবস্থা দেখে
জহিরের বউ বলে—

‘কি গো ফকিরের বউ এখন যে বাসন মাজতে
আছেন না?’
‘ফকির কি আর আরাম আলিস করতে দেয়।
দিনরাত খাটায় মারে।’
‘কি এমন কাম চাপল বাইত্তে?’
‘জকাত ফেতরার মওসুম পড়ছে না। হের লাই
গেরাম দৌড়ান লাগে।’
‘খাওন দাওনের এখন কি অবস্থা। ফহির আগের
মতো গোছমাছ পায় না?’
‘গোছমাছ? পানিয়া ডাউল জোটে না কপালে।
ভিকের জিনিস ও বাজারে বেইচা আসে।’
‘তাহিলে এই অবস্থা ফহিরের? মোল্লার রোগ
তাহিলে ফহিরকেও ধইলো?’

এমন করে দিন যেতে লাগল। মোল্লা জহির মাঝে
মাঝে ফকিরের সঙ্গে দেখা করে তাকে ধন
সঞ্চয়ের বিষয়ে পরামর্শ এবং আর্থিক সহযোগিতা
করতে লাগল। তার মধ্যে সে এ বোধও জন্মাতো
লাগল যাতে আগামী কয়েক বছরের মধ্যে সে
স্বাবলম্বী হয়ে উঠতে পারে। ভিক্ষাবৃত্তির মতো
নিগৃহীত পেশা তাকে যেন আর করতে না হয়।
তার মেয়েদের ভালো ঘরে বিয়ের বিষয়ে সে চিন্তা
করতে লাগল। ফকিরের স্ত্রীও যে ফকিরের মতো
পরিবারের উন্নতির জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছে তা
মোল্লা জহিরের মোটেই অজানা নয়। একদিন
দাওয়ায় বসে পান তামাক খেতে খেতে মোল্লা
স্ত্রীকে মজা করে বলে,
‘কইনছেন দেহি ফহিরের বাড়ির গল্প। আইজ
কিদা ভাত রাঁধছে ফহিরের বউ? আরে কতায়
কয় না পরের ধনের পোদারী, নদীর চরের
জোতদারি। ফহিরের দুইখান ম্যায়া যে তলে তলে
ডাংঙ্গর হইতাছে হের বিয়া দিব কি দিয়া?
তোমারও যে তিনখান ম্যায়া ফাল দিয়া বাড়তাছে
তার কতা ভাবছাও? ফহিরের লগে দুস্তি কইরা
ফকোটয়ার খাতায় নাম লেখাইতে কও?’
জহিরের কথা শুনে স্ত্রী বলে, ‘ফহিরের লগে দুস্তির
কি হইল? মাইয়ার বিয়ার কতা মুহে তোল কোন
শরমে। পরের পোলা আইসা তোমার বাইত্তে
ডাউলের পানি গিলব? এই সাত গেরামে কেডা
আছে পোলাপানগো না খিলায়া ধন জমায়া।’

মোল্লা জহির স্ত্রীর কথায় বুঝতে পারে, ঘটনা অন্য
রকম। বিষয়-সম্পত্তির জন্য তার এতটা কুপণতা
করা যে ঠিক হয় নাই তা সে উপলব্ধি করতে
পেরেছে। এদিক দিয়ে জিন-জব্বার তার চেয়ে
ভালো আছে। সান্ত্বনা দিয়ে সে স্ত্রীকে বলে,
‘ফহিরের কিসসা বাদ দেও। হায়াতে বহুত লড়াই
করছি। এখন আমিও একটু আরাম করবার চাই।
আল্লায় যা দিচে চালায়া খাইবার পারলে অসুবিদা
হওনের কতা না। আমি চাষাভুষা মানুষ। কতায়
কতায় বাজার দৌড়ান আমার সাজে না। দেউলার
বিলে একখান পুকুর কাটছি। ভাবলাম বাইত্তে
একখান মুরগির ফারাম দিমু। ঘরেই যদি সব
ফলাইবার পারি বাজার যামু কার মুখ দেইখতে?’

সময় বয়ে যেতে লাগল। মোল্লা জহিরের পরামর্শে
জিন-জব্বারও এগিয়ে যেতে লাগল সমৃদ্ধ জীবনের
দিকে। অরুণ রবির কিরণছটা তার অন্তরের
সংকীর্ণতা ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে দিল।





গল্প

ক্যাসিনো-খোয়াব

সাজ্জাক হোসেন শিহাব

ক্যাসিনো দে গেন্টিং।

ইদানীং অনেকটা অভ্যাসের ঘোরেই এখানে আসে রনো। এরপর আজব এই নেশার উৎসবে ডুবে যায়। নিয়মিত মাতে চারশ'র অধিক ইলেকট্রনিক টেবিল গেমসের কোনো একটিতে। কখনো কখনো এখানকার তিন হাজারেরও বেশি স্লট মেশিন গেমসে মনটাকে আটকে রাখে। আবার কখনো কখনো প্রিয় ক্লাসিক টেবিল গেমসে নিমগ্ন থাকে সে। রাউলাটে, বাক্সারট, পাই গোউ, ব্ল্যাকজ্যাকের মতো ক্লাসিক খেলা এখন তার ডাল-ভাতের মতো মনে হয়। সে নিয়মিত এই খেলাগুলো খেলে। গেন্টিং হাইল্যান্ড রিসোর্টের এই ক্যাসিনোতে বসে সময় কাটায় ঢের। ক্যাসিনো দে গিন্টিং চব্বিশ ঘণ্টা জেগে থাকে। বৃকে ভরে রাখে পৃথিবীর নানান জাতের, হরেক বর্ণের মানুষ।

কালো, সাদা, তামাটে, বাদামি মানুষ এখানে মেতে থাকে নেশায়। রনোও তাই। নিজ দেশ থেকে হাজার হাজার ক্রেশ দূরে এই ভিনদেশে রনোর সঙ্গে আসে তার অন্যতম প্রিয় মানুষ। ডেইজি। সদা লাগ ভেলকি লাগের মতো পোশাক পরা যার স্বভাব, সেই ডেইজিই এখানে রনোর সার্বক্ষণিক সঙ্গী। ডেইজি রনোর একান্ত সহকারীও বটে। রনোর সঙ্গে সব সময় থাকে সে। দেশে, বিদেশে। নিজ দেশ থেকে এই দূরদেশ পর্যন্ত ডেইজিই রনোর ভরসা। খাওয়া-দাওয়া থেকে শুরু করে রাতযাপন— সবই একসঙ্গে করে তারা। কিছু স্বাভাবিক ক্রিয়া বাদ দিলে মোটামুটি সব কাজ একসঙ্গেই করে ডেইজি ও রনো। রনোর অনেক কাজের সাক্ষী ডেইজি। কিন্তু এখানে রনো শুধু শুধু অবসাদ কাটানোর জন্য আসে নাকি অন্য কোনো

মতলব আছে তার— এ ব্যাপারটা ডেইজি আজ পর্যন্ত বুঝে উঠতে পারেনি। রনো ব্যবসায়ী মানুষ। তার পদে পদে টাকার হিসাব কষা থাকে। অথবা রনো এখানে আসে না— রনোকে নিয়ে এমন ভাবনাই ডেইজির মনে বার বার উঁকি মারে। সমতল থেকে হাজার হাজার ফুট ওপরে এই বিশাল ক্যাসিনোতে রনো যখনই আসে তখনই সে বুক ভরে টেনে নেয় এখানকার তৃপ্তির বাতাস। পাহাড়ের নীরব-নিস্তব্ধ রূপ। হরেক রকম নিয়ন বাতির মায়ায় মুগ্ধ হয় সে। কখনো কখনো আদরে আদরে দুই হাত দিয়ে ডেইজিকে বুক পুরে নেয়। এরপর পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা খাওয়া দলছুট মেঘের দিকে নিজ চোখ ভাসিয়ে ডেইজিতে চাষ করে দূষিত আবেগের আবাদ। তাদের আবেগে যেন মেতে ওঠে সব। পাম গাছের পাতা নাড়ানো এখানকার অচেনা হাওয়া থেকে শুরু করে এই গ্যামারাস দুনিয়া এখন তাদের কাছে চেনা। পাহাড়ের পায়ে ঢলে পড়া আলো তারা উপভোগ করে বেশ। এই ক্যাসিনোর নীল আলোর মাঝে নেশায় ডুবে থাকা কিছু লোকও তাদের পরিচিত। চীনের ঝিয়াং, ভারতের পাও, গ্রিসের আলেকজান্দ্র তাদের খুব জানা। চেনা তালিকায় আরো আছে যুক্তরাষ্ট্র, তাইওয়ান, ম্যাকাও, হংকংয়ের লোক। তারা একেকজন একেক মতলবে এখানে আসে। ক্যাসিনোর আড়ালে কেউ কেউ জীবনের ক্রান্তি ফেলে যায় অটোমেটিক গেমিং যন্ত্রের বাটন চেপে। বিট কয়েনে সারাক্ষণ মাতাল থাকে কেউ কেউ। রনো এর বাইরে নয়। কিন্তু বিষয়টা ডেইজির কাছে আজো অস্পষ্ট। চেষ্টা করেও জানতে পারেনি ডেইজি— ঠিক কী কারণে রনো এখানে আসে। কখনো কখনো নিজ ইচ্ছায় হঠাৎ করে সোজা দেশ থেকে এখানে চলে আসে রনো। আবার কখনো পাশের দেশ থাইল্যান্ড বা হংকংয়ে কোনো মিটিং থাকলেই সে এ পাম গাছের দেশে চলে আসে। এখানে এসে কিছুদিন থেকে চলেও যায়। এই ব্যাপারটা ডেইজির কাছে বড় ভুতুড়ে বলে মনে হয়। এত লম্বা সময় ধরে এই প্রথম সে এখানে আছে। সঙ্গে ডেইজিকেও রেখেছে। কুয়ালালামপুর থেকে মাত্র ৪৫ মিনিট দূরের এ রিসোর্ট সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ১৮০০ মিটার ওপরে। এখানকার ইনডোর আর আউটডোর থিম পার্কেটাও তাদের ভালো লাগে। কেমন জানি আপন আপন মনে হয়। জ্বলে থাকা মায়াবী নিয়ন আলোয় শো গার্লদের পদচারণ তারা উপভোগ করে। মন জুড়ায় ফ্লাইং ফস্ট্র। এই বয়সেও তারা স্কাই কেবল করে চড়ে উপভোগ করে পাহাড়ের রূপ। রনো কখনো কখনো তার প্রিয় অ্যাপল আইফোন সিক্সএস গ্লাস মোবাইলে ফটো তোলে। পোস্ট করে সামাজিক সাইটগুলোতে। তারা ইস্টগ্রাম, ফেসবুক, টুইটারে নিয়মিত যাতায়াত করে। রাতের বেলা দুজন একসঙ্গে একই রুমে ঘুমায়। একসঙ্গে কফিরোল খায়। তারা প্রায় মালয়ী নাসি গোরং কামপুং খায়। এই স্পেশাল ফ্রাইড রাইস ছাড়াও তারা ভালোবাসে এখানকার চিকেন ফ্রাইড রাইস। যাকে এখানকার লোকজন নাসি গোরং আয়াম বলে। এভাবেই এখানে রনো আর এই বসন্তে ৩৫-এ পা দেয়া ডেইজি সময় কাটায়। ডেইজির বয়স ৩৫ হলেও তাকে শ্রিভলস টপসে দেখলে মনে হয় এক ভয়ঙ্কর সুন্দরী অষ্টাদশী। তার দিকে তাকালে মনের

দক্ষিণ জানালায় কী যেন দোলা দিয়ে ওঠে রনোর। ডেইজিকে দেখে এখানো রনো মাঝে মাঝে গুবলেট পাকিয়ে ফেলে। তার অনন্ত অতীত বাসনা ডেইজিকে ঘিরে। এক কেস বিয়ার খেয়েও সে এমন মাতাল হয় না যেমনটি ডেইজিকে দেখে হয়। তাই তো এত টাকা দিয়ে ডেইজিকে রেখেছে রনো। মাসে পুরো এক লাখ টাকা বেতন তার। এবার এখানে আসার পর একদিন বিকালে গেন্টিং হাইল্যান্ডের আকাশে মেঘ ছিল। ক্যাসিনো ছেড়ে রনো আচমকা সেদিন খোলা আকাশের নিচে এক জায়গায় এসে দাঁড়ায়। গলার ভাঁজে সুর তোলে গীতিকার কেজি মুক্তফার লেখা আর শিল্পী তালাত মাহমুদের গাওয়া বিখ্যাত সেই গান— তোমারে লেগেছে এত যে ভালো চাঁদ বুঝি তা জানে, রাতের বাসরে দোসর হয়ে তাই সে আমারে টানে। অচেনা দেশে সুরকার রবিন ঘোষের চেনা এই গান শুনে ডেইজির ভালো লাগলেও রনোর এমন কাণ্ড দেখে সে অবাক না হয়ে পারে না। দূরদেশে এসে স্যারের মুখে প্রিয় অ্যালবাম রাজধানীর বৃকের এই বাংলা গান শুনে সে কিছুটা পুলকিত হয়। দেশের বাইরে এলে সে সাধারণত এমনটি করে না। ডেইজি রনোর সঙ্গে আছে সাত বছর ধরে। কিন্তু এমনটি সে এই প্রথম দেখেছে। বাংলা গানের মুগ্ধতায় এদিক-সেদিক তাকায় ডেইজি। রাস্তার পাশে ঝাড়ুদার ধূলাবালি পরিষ্কার করছে। তামাটে রং দেখে ঢের বলা যায় সে বাংলাদেশ বা ভারতের। বাংলাদেশের হলে হয়তো এমন গান শুনে কথা বলত। কিন্তু ঝাড়ুদার কিছুই বলে না। তাই ডেইজি ধরে নেয় ও হয়তো ভারতের কেউ হবে। শ্রীলংকা বা নেপালের কেউও হতে পারে। ঝাড়ুদারের পাশেই রনো দাঁড়ানো। সে মেঘের ছোট্টাছুটি দেখছে। দিগ্বিদিক মেঘগুলো দৌড়ে বেড়াচ্ছে। মাঝে মাঝে আলোর ঝলকানিতে ঘুমন্ত পাহাড়ের নিখর দেহ দেখা যাচ্ছে। কাছে, দূরে। এবার এমন দৃশ্যে চোখ ফেলে ডেইজি তার পাশে



এসে দাঁড়ায়। ডেইজি রনোকে কিছু বলার আগেই তাদের কাছে এসে একটা নতুন চকচকে চেরোকি জিপ দাঁড়ায়। রনো সেদিকে তাকায়। রনোর তাকানো দেখে ডেইজিও সেদিকে তাকায়। লাল জিপের ডাইভিং সিটে বসে আছে এক সুন্দরী নারী। স্টিয়ারিং থেকে হাত নামায় সে। এরপর বাইরে বের হয়ে আসে। তার জমট দেহে মেদের ছিটেফোঁটাও নেই। সে রনোর কাছে এসে ভাঙা ভাঙা গলায় যে ইংরেজি বলে তার মানে দাঁড়ায় এমন— আমি তোমাকে খুঁজছি। অনেক দিন ধরে। কিন্তু তোমাকে সত্যি সত্যি আজ এখানে এভাবে পেয়ে যাব তা আমি ভাবিনি। যদিও তুমি আমাকে স্কাইপে বলেছিলে তুমি এখানে আছ। তার পরও আমার বিশ্বাস হয়নি। যা হোক, ওই যে পেনাংয়ের রাতটার কথা তোমার মনে আছে? হোটেল সেন্ট্রালে? তুমি আর আমি এক রাত একসঙ্গে কাটিয়েছিলাম এক বেডে। মনে পড়ে? রনো মাথা নাড়ায়। আর আচমকা মেয়েটার এমন কথায় মাথা ঝিমোতে থাকে ডেইজির। তার মাথা ঝিমোতে থাকে। রনো সেদিকে ড্রাকফপ না করে মেয়েটিকে বলে, আজ কিন্তু আমাকে তোমার গল্পটা বলতেই হবে। আইল টেল টুডে। রনোর কথায় মেয়েটা উত্তর দেয়। এভাবে তার মাথা ঝিমোতে থাকে। তারা দুজনে ডেইজিকে কিছু না বলেই কথা বাড়াতে থাকে। তাদের এমন আচরণ আর কথা শুনে ডেইজি মাথা ভীষণ ঝিমোতে থাকে। ইতস্তত বোধ করে। ডেইজি কী করবে বুঝে উঠতে পারে না। শেষমেশ সে রনোকে বলে, আমি কুয়ালালামপুরে যাচ্ছি। হোটেলের থাকব। তুমি এসো। ডেইজি রনোর সঙ্গে একা দেশের বাইরে এলে বা একান্তে তার কাছে থাকলে সাধারণত তাকে তুমি বলে। রনোর তা শুনতে ভালোই লাগে। কিন্তু আজ ডেইজি আরেকজনের সামনে তাকে তুমি বলছে কেন? রনোর কেমন জানি তা পানসে পানসে লাগে। রনোকে একটা অভিমানের সুরে বিদায় জানিয়ে ডেইজি শৌ শৌ করে চলে যায়। রনোও মনে মনে এটাই যেন চাচ্ছিল। তাই রনো তাকে আটকাল না। ডেইজির চলে যাওয়াতে তার পথ খোলা হয়ে যায়। এরপর তারা দুজনে যায় এখানকার হোটেলের লবিতে। যেখানে ডেইজি ছিল সেখানে আসে আসিয়া। সিরিয়ার আসিয়া। গৃহযুদ্ধে আসিয়ার সব লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে। তার স্বপ্ন, তার পরিবার। মৃত্যুপথে একে একে পা বাড়িয়েছে তার ভাই-বোন। বিনোয়ীদের ভয়াবহ বোমা হামলায় ধূলিসাৎ হয়ে যায় আসিয়ার পিতৃভূমি। মারা যায় তার আপন বড় দুই ভাই আর এক বোন। আসিয়া হোটেল এসে রনোকে সেসব গল্পই বলতে থাকে। সে বলতে থাকে কীভাবে জীবনভয়ে পরিবারের বাকি সদস্যরা সিরিয়া থেকে রওনা দেয় গ্রিসের দিকে। কীভাবে টার্কি থেকে ইলিয়ডের গ্রিক দ্বীপ কসে যাওয়ার জন্য আসিয়ার বাবা চেপে বসে এক রাবার ডিঙিতে। সেসব মনোযোগসহকারে শুনতে থাকে রনো। আসিয়া বলতে থাকে। বাবা পরিষ্কার ও ধবধবে সাদা সৈকত কসে যাওয়ার সময় সঙ্গে নেয় আমার বড় ভাই বাদের ইউসুফের বেঁচে থাকা পাঁচ বছর বয়সী ছেলে হাসান আর আমার মাকে। সাগরের ভয়ঙ্কর ঢেউ ঠেলে জীবন নিয়ে বেঁচে থাকার আশায় তারা একসময় পৌঁছায় স্বপ্নের কস দ্বীপে। যদিও তা

তুরস্ক থেকে মাত্র আড়াই কিলোমিটার দূরে। কিন্তু বিধিবাম! সেখানে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে ধীপে পাহারারত পুলিশ তাদের হাতকড়া পরায়। এরপর নিয়ে যায় কাছের থানায়। থানায় গিয়ে তাদের চোখ আসমানে ওঠে। সেখানে দেখে হাজার হাজার শরণার্থী মানুষের আহাজারি। তাদের ভিড়ে হালকা হয়ে যায় আব্বা-আম্মার বেদনা। সেখানে মানুষের মুখে শুধু আতঙ্কের ছাপ। তাদের সঙ্গে পুলিশের কর্তারা ভালোভাবেই নাকি কথা বলছে। পুলিশের এমন আচরণ দেখে তারা আশায় বুক বাঁধে। আস্তে আস্তে পুলিশের কর্তারা আমার বাবার কাছে আসে। তারা তাদের মায়ার চোখে দেখে। কিন্তু সবশেষে তাদের যা বলা হয় তা খুব বেদনার। কষ্টের। লিভ গ্রিস উইদিন ফোরটি এইট আওয়ারস। ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে গ্রিস ছাড়ার এমন কথা শুনে তারা কী করবে বুঝে উঠতে পারে না। বাবার কাছে এক হাজার ইউরো ছিল। তার মধ্য থেকে দেড়শ ইউরো এক পুলিশকে ঘুষ দিয়ে তারা বের হয়ে পড়ে। পুলিশের হেফাজত থেকে প্রকৃতির তদারকিতে। তাদের সঙ্গে ছিল আরো শরণার্থী। তাদের সঙ্গে আমার বাবা গেল গ্রিসের রাজধানী এথেন্সে। বাবা জানত এথেন্স সবার জন্য খুব উদার। কিন্তু ওখানে গিয়ে দেখল মহান এথেন্স আজ কৃপণ। ভীষণ কৃপণ। সে জানত ওখানে গিয়ে কোনো লাভ হবে না। তবুও গিয়েছিল। আজ এথেন্সের সৌন্দর্য তার ভালো লাগে না। অথচ বাবা ১০ বছর আগেও এখানে এসেছিল। অফিসের এক ট্রেনিংয়ের অংশ হিসেবে। কী অপরূপ বর্ণনাই না সে শুনিয়েছে আমাদের। তার কথাতেই আমি আজ এথেন্সকে ভিজুয়লাইজ করতে পারি। কল্পনায় দেখতে পারি তাকে। অথচ বাবা ওইদিন বলল যে, এথেন্সকে তার এখন একটা মৃত ফুলের মতো মনে হয়। তার সুগন্ধ না নিয়ে বাবা তাই এথেন্স থেকে এরপর সোজা পৌঁছে যায় সাবেক অটোম্যান সাম্রাজ্য হিসেবে ইতিহাসখ্যাত পর্বতদেশ ম্যাসিডোনিয়ার উদ্দেশে। কিন্তু সেখানে গিয়ে বাবা দেখে সেখানকার অবস্থা আরো ভয়াবহ। কোনো মানুষ সীমানা পার হয়ে যেতে পারছে না। যেতে পারছে না মানে তাদের যেতে দেয়া হচ্ছে না। সেখানে গিয়ে উপায় না পেয়ে বাবা সার্বিয়ার পথে পা বাড়ায়। যে দেশের রাজধানী বেলগ্রেডে মানুষের বিনোদনের জন্য আছে ভাসমান নাইট ক্লাব। অথচ আমার বাবা একটা মাথা গাঁজার ঠাই পাচ্ছিল না। যা হোক, এক দালাল অব্যাহে সার্বিয়ায় পৌঁছানোর কথা বলে বাবার কাছ থেকে তিনশ ইউরো হাতিয়ে নেয়। কিন্তু সার্বিয়ায় না নিয়ে তাদের ভুল পথে অন্যত্র নিয়ে যাচ্ছিল সে। শেষমেশ পুলিশের হাতে ধরা পড়ে শেষ রক্ষা হয়। এরপর বাবাদের প্রেরণ করা হয় থানায়। সার্বিয়া থেকে ইউরোপের মধ্যদেশ হাঙ্গেরি, অতঃপর জার্মানভাষী অস্ট্রিয়া হয়ে পশ্চিম ইউরোপের স্বপ্নের দেশ জার্মানি যাওয়ার স্বপ্ন থেমে যায় বাবার। স্থান হয় থানায়। সেখানে গিয়ে বাবাদের দেখা মেলে তাদের মতো অনেক সিরীয় কয়েদির। কিছুদিন জেলে রাখার পর বাবাদের ছেড়ে দেয়া হয়। এত বড় দুনিয়ায় বাবাদের জায়গা হয় না। পশু-পাখিদের হয়। অথচ সৃষ্টির সেরা জীব মাথা গাঁজার ঠাই খুঁজে পায় না। ভাবতে খুব খারাপ লাগে। তাই জেল থেকে ছাড়া পেয়েই বাবা পণ করে মরি বাঁচি নিজ দেশে ফিরে

যাব। অবশ্য জেলে অনেকেই বলেছিল এক হাজার ইউরো দালালদের দিলে তারা অনায়াসে হাঙ্গেরির রাজধানী বুদাপেস্টে যেতে পারবে। এরপর সেখান থেকে আরো এক হাজার ইউরো খরচ করলে সোজা যাওয়া যাবে স্বপ্নের দেশ জার্মানি। সেখানে গিয়ে শরণার্থী হিসেবে আবেদন করলেই মিলে যাবে একটা না একটা পথ। উদার জার্মানরা বিমুখ করবে না বলে জেলের কিছু কয়েদিও নাকি অভয় দিয়েছিল। বিপদগ্রস্ত কয়েদির মুখে আশার কথায় বাবার ভরসা মেলে না। অভাবী মানুষের মুখে কেউ তো ধনী হওয়ার গল্প শুনতে চায় না। তা ছাড়া বাবার কোনো ইচ্ছাও ছিল না সেখানে যাওয়ার। এ ছাড়া পকেটে ইউরো তো শেষের দিকে ছিল। তাই জেল থেকে ছাড়া পেয়ে বাবা আবার চেনা পথে ফিরে গেল সেই কস ধীপে। যেখান থেকে বাবাদের অভিবাসী জীবন শুরু হয়েছিল সেখানে। এখানে এসে আবার বাবারা চোপে বসল ছোট আরেক রবার ডিঙিতে। গন্তব্য তুরস্ক। ডিঙিতে চাপার আগে বাবার সঙ্গে আমার শেষবার ফোনে কথা হয়েছে। এরপর তার, মার আর আমার ছোট বাবাটার আর কোনো খোঁজ মেলেনি। তারা বাড়িতেও ফেরেনি। জানি না ওই সাগরের পেটে তারা আছে কিনা। তাদের খোঁজ আমি জানি না। এই বলেই হাউমাউ করে কাঁদে আসিয়া। আসিয়ার কান্নায় রনো কাঁদে। ভেঙে পড়ে। তাকে জড়িয়ে ধরে সে। এর আগেও রনো তাকে জড়িয়ে ধরেছিল। তখন ধরেছিল হিংস্র বাঘের মতো। কামার্ত থোড় ভেজা শরীরে। আর এখন পরম মমতায়, ভালোবেসে নাকি করুণায়— তা রনো বুঝে উঠতে পারছে না। আসিয়ার সঙ্গে রনোর প্রথম দেখা হয়েছিল পেনাংয়ের বেভিউ বিচ রিসোর্টে। সেখানকার সিলিকন ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজির ছাত্রী ছিল সে। বাবা-মায়ের আদরের মেয়েটার জীবন ভালোই চলছিল এখানে। কিন্তু আচমকা তার দেশে একটা যুদ্ধঝড় এসে সব বদলে দিয়ে যায়। এলোমেলো হয়ে যায় তার জীবন। সেমিস্টার ফি দিতে না পেরে থেমে যায় তার পড়াশোনা। আস্তে আস্তে সে মিশে যায় অন্য এক জগতে। যেখানে দ্বারে দ্বারে মেলে অসন্তোষের আনাগোনা। আসিয়ার কথায় আস্তে আস্তে সব খোলাসা হয়ে যায়। আসিয়ার বাদামি বর্ণের ঘোলা চোখে ধরা পড়ে রনোর বিমর্ষ মুখ। আসিয়া তার সঙ্গে কথা বলতে থাকে। রনোর মনে পড়ে সেদিন কীভাবে এক দালাল তাকে আসিয়ার কাছে নিয়ে গিয়েছিল। রাস্তার পাশে আসিয়াকে দাঁড় করিয়ে সেই দালাল আসিয়ার দিকে আঙুল তুলে কীভাবে বলছিল, দ্যাট এইটিন ফর ওয়ান এইটি। ১৮০ রিঙ্গিতে রনো সেদিন আসিয়াকে কাছে পেয়েছিল। আসিয়ার ওই জীবন ভালো লাগে না। তাই সে আস্তে আস্তে স্ট্রিটলাইটের পাশে দাঁড়ানো বাদ দিয়ে জড়িয়ে পড়ে অন্য এক দুনিয়ায়। সে যে নতুন পথের পথিক সে পথে অনেক টাকা। অল্প পরিশ্রম। রনোকে সে তার পথে হাঁটতে চায়। সে রনোকে বলতে থাকে কীভাবে অন্যের টাকা নিজের পকেটে সহজে আনা যায়। রনোও সে পথে হাঁটার আগ্রহ প্রকাশ করে। টাকার লোভে নাকি আসিয়ার মোহে— তা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারে না। রনো লোভী মানুষ। টাকার, টানের। বেশি কিছু না ভেবেই আসিয়ার সঙ্গে সে কাজ করতে রাজি হয়।

তাই আচমকা দুজনের পথ এক হয়ে যায়। কথায় কথায় এত কাছে আসতে পেরে খুব খুশি হয়। এখন থেকে তারা একসঙ্গে কাজ করার শপথ নেয়। তাদের ভিন্ন জীবনধারা কোনো বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। রনো আগেই আসিয়ার প্রেমে পড়েছিল। এবার আসিয়াও তাতে সায় দিল। তাদের মাঝে আর কোনো বাধা রইল না। ক্যাসিনোর এই দিনের পর থেকে আসিয়া রনোর সঙ্গে স্নাইপে, ভাইভারে বেশি বেশি কথা বলা শুরু করে। নতুন ব্যবসার কথা, প্রেমের কথা। তাদের টাকা, প্রেম যেন এক বৃত্তে এসে মিলে যায়। মাঝখানে অবশ্য তা কোনো বাধা হয় না। কিন্তু বাধা হয়ে দাঁড়ায় রনোর সহকারী আর তার পরিবার। তাদের নিয়ে মাঝে মাঝে রনো বিচলিত হয়ে ওঠে। কিন্তু শক্ত হয়ে থাকে সে। রনোর বাড়ি ঢাকায়। গুলশান-২-এ তার আলিশান একটা বাড়ি আছে। তার শানশওকতের অভাব নেই। তার বাড়িভাড়া একটা ছেলে আছে। মেয়েও আছে একটা। ছেলেমেয়ের বয়স কাছাকাছি। ১০ আর ১১। আর আছে তার বউ। রনোর নিজস্ব ব্যবসা আছে। অনেক তৈরি পোশাক কারখানা আছে তার। বায়ারদের সঙ্গে বিভিন্ন মিটিংয়ে যোগদান করতে বা ব্যবসায়িক কাজে সে মাঝে মাঝে বাইরের দেশে যায়। তার একটা অভ্যাস আছে। তা হলো নিজের ঘরের তাপমাত্রা আঠারোতে রাখা। প্রতি মুহূর্ত সে তাই রাখে। শীত হোক আর গ্রীষ্ম— সে এ তাপমাত্রায় থাকে। এ কথা সে আবার ঢাকঢোল পিটিয়ে সবাইকে বলেও বেড়ায়। ঘরের তাপমাত্রা কমিয়ে শীতপ্রধান দেশের মতো রাখলেও তার গায়ের চামড়ার রং শীতপ্রধান দেশের মানুষের মতো সাদা হয়নি। তার ত্বক বেশ কালো। কুচকুচে। আসিয়ার গায়ের বরণ ফরসা। ধবধবে দুধের মতো। সে রূপবতী বটে। তার রূপের গুণগ্রাহী রনো নিজেও। তাকে কাছে পেয়েই রনো তার দিকে তাকিয়ে থাকে। ঘরে, বাইরে, এমনকি জুয়ার টেবিলে বসেও আসিয়ার ছবি মাঝে মাঝে মনে করে সে। আসিয়ার সঙ্গে পৃথিবীর নানান প্রান্তের লোক কাজ করে। তার সঙ্গে আছে ইন্দোনেশিয়ার এলান পেনালোসা, ভারতের রাজা শেঠি, ফিলিপাইনের উইলিয়াম সো গোরসহ আরো অনেকে। আসিয়া তাদের সঙ্গে আম্পাতত কিছু দেশে কাজ করছে। তারা যে কাজটা করে তা অদৃশ্য। কেউ সহজে ভাবতেই পারে না। এটা একটা দলগত কাজ। যাকে সহজ বাংলায় হ্যাকিং বলে। পৃথিবীর নানান প্রান্তের লোকজন তাদের বিশেষ লক্ষ্য। তাদের কাজের সঙ্গে আছে বিভিন্ন দেশের ব্যাংক কর্মকর্তাও, যাদের দিয়ে তারা তাদের টাকা রিলিজ করে। আসিয়া এই চক্র মিশেছে নিজ ইচ্ছায়। প্রয়োজনে। রনোর উদ্দেশ্য আরো টাকা রাজগার। দ্রুত কোটি কোটি টাকা কামানো। ম্যালওয়্যার ভাইরাসের ওপর ভর করে তারা কামিয়ে নিতে থাকে কোটি কোটি টাকা। এরপর থেকে রনো ঘনঘন মালয়েশিয়ায় আসতে থাকে। ক্যাসিনো দে গেন্টিং হাইল্যান্ডে। একেক সময় একেক জায়গা থেকে সে এখানে আসে। আজ বাংলাদেশ থেকে তো কাল আসে ফিলিপাইন থেকে। রনোর নতুন বিজনেসের পেছনে বিনিয়োগও আছে কয়েক কোটি টাকা। বিভিন্ন জায়গা থেকে ভাইরাস ম্যালওয়্যারের মাধ্যমে কারো ব্যাংক তথ্য চুরি করার কাজে এ টাকা ব্যবহার

হয়। বিভিন্ন উপায়ে এটা দেশ থেকে সে দেশের বাইরে নিয়ে আসে। এরপর সেই টাকার বদলে তথ্য চলে আসে ক্যাসিনোয়। ভাগ-বাটোয়ারা শেষে এই টাকা ক্যাসিনো হয়ে চলে যায় ব্ল্যাকহোলে। যেখান থেকে তা আর কখনো ফেরে না। ক্যাসিনোর ইলেকট্রিক ট্রেইল ঘাঁটাঘাঁটি করেও কোনো লাভ হয় না। এই ক্যাসিনো আইনে এখানে প্রবেশ করা অর্থের উৎস এবং তার গন্তব্য কোথায়, তা তারা কাউকে জানাতে বাধ্য নয়। ক্যাসিনোর আরো কিছু নিয়ম আছে। এখানে কোনো মুসলমান প্রবেশ করতে পারে না। অবশ্য তা শুধু নিজ দেশ মালয়েশিয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ২০ বছরের নিচের কোনো ব্যক্তিও এখানে প্রবেশ করতে পারে না। সে যে ধর্মেরই হোক না কেন। আসিয়ার এখানে আসার সনদ আছে। আসিয়ার বয়স কেবল ২২। তার জোয়ারে খলবল করা উজনি মাছের মতো দেহের পূর্ণিমা-জোছনা ক্যাসিনোর অনেকেই চেনে। এখানে সবচেয়ে বেশি আসে চীনের লোকজন। খেলে। মজা করে। এরপর চলে যায় নিজ ঠিকানা। এ দেশের একটা বিশাল জনগোষ্ঠী চীনা বংশোদ্ভূত। তারা সহজে এখানে বাণিজ্য করে। আসিয়া তাদের অনেককেই জানে। তার সঙ্গে

অনেকের বাণিজ্য চলে। যেমনটি চলে রনোর সঙ্গে। অন্যদের সঙ্গে রনোর পার্থক্য একটাই— আর তা হলো, রনো তার নতুন পার্টনার। এভাবেই তাদের দিন কাটতে থাকে। রনো আসিয়াকে তার ভাগের অনেক টাকা দেয়। এর মাঝে একদিন আচমকা রনোর সঙ্গে ডেইজি এখানে আসে। এক প্রকার রনোর মনের বিরুদ্ধেই এখানে হাজির হয় ডেইজি। ডেইজি এখানে এসেই ক্ষান্ত হয় না। সেদিন রনোর সঙ্গে জুয়ার টেবিল পর্যন্ত যায় সে। পাশে দাঁড়ায় রনোর। আসিয়া ছিল সেখানে। রনো জুয়ার টেবিলে মন না দিয়ে আসিয়ার দিকে তাকায়। মায়ার দৃষ্টিতে তাকায়। সেদিন আসিয়ার চোখ কেমন জানি বলসে যাওয়া রুটির মতো ঘোলাটে লাগছিল। রনো আসিয়ার চোখে চোখ রাখতেই আসিয়া একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায়। কিছুক্ষণ থেমে আসিয়া বলে, কী দেখছ। উত্তরে রনো বলে, তোমাকে। তুমি কি আমার সঙ্গে বাংলাদেশে যাবে? এই জীবন ছেড়ে আমার সঙ্গে থিতু হয়ে একটা স্বাভাবিক জীবন চালাবে? আমিও স্থির হতে চাই। রনোর মুখে এমন কথা শুনে সে একটা তাচ্ছিল্যের হাসি দেয়। এ তাচ্ছিল্য মানে খোঁজে রনো। তারপর জুয়ার টেবিলে চোখ দেয়। আর কথা বলে

যায় আসিয়ার সঙ্গে, ডেইজির সঙ্গে। মুখে নয়, এবার তাদের কথা হয় চোখে চোখে। জুয়াটা যেন টেবিল থেকে জীবনে চলে আসে। জুয়া চলে আসিয়ার সঙ্গে, ডেইজির সঙ্গে, রনোর বউ নাইমার সঙ্গে। এমনকি রনোর নিজের জীবনের সঙ্গেও। সবকিছু কেমন ভয়ঙ্কর এক খেলা হয়ে ওঠে। তারা সবাই নীরব হয়ে যায়। রনোর হাত ধরে বিট কয়েনে অন্যের ভাগ্য মঞ্চস্থ হয়। সে জুয়ার টাকা খোয়াতে থাকে। কাঁড়ি কাঁড়ি ডলার উড়তে থাকে রনোর। এর মধ্যে হঠাৎ করে আসিয়ার দিকে ডেইজি তাকিয়ে বলে, রনোর টাকা দিয়ে দাও, আমি তোমার সব জেনে গেছি। তোমার আসল পরিচয়ও। ডেইজির এমন কথা শুনে রনো অবাক হয়ে যায়। তার টনক নড়ে। জুয়ার টেবিল ছেড়ে সে ডেইজি, আসিয়াকে নিয়ে বাইরে আসে। চারদিকে পাহাড়ের সারির দিকে ভাতঘুমের চোখে তাকায় সে। পাহাড়ের গা-খোঁষে মেঘ ঘুরছে। সেদিকে তাকিয়ে কেউ কিছু বলার আগেই ডেইজি বলে, আমি ওই উড়ন্ত মেঘের মতো। আমার কোনো ঘর নেই, যখন যেখানে যেভাবে চাই, উড়ে বেড়াই। তুমিও উড়ে বেড়াও। আজ এখানে তো কাল ওখানে। আমি উড়ি রনোর সঙ্গে। অনেক দিন উড়ছি, শুধুই উড়ছি। আমি এখনো বিয়ে করিনি। আমার একটা স্বভাব আছে। আর তা হলো, আমি সব সময় বাতাসে ভাসি রনোর সঙ্গে। আর তুমি ভাসো সবার সঙ্গে। এটাই তোমার আর আমার মারের পার্থক্য। তোমার আসল পরিচয়টা ফাঁস করার জন্যই আজ আমি এখানে এসেছি। আমি এটা জেনে গেছি যে তুমি হলে স্রেফ একজন শিক্ষিত আর প্রফেশনাল ব্রেথেল। আমি প্রমাণ পেয়ে গেছি। তুমি চাইলে আমি তা দেখাতে পারি। রনোর স্কাইপ চেক করেই আমি ধরে নিয়েছিলাম তোমার মাঝে একটা গলদ আছে। পুরুষেরা যতই ধূর্ত হোক না কেন, তারা একটা নারীর কাছে আজীবন শিশুর মতোই রয়ে যায়। যে মেয়ের প্রতি কোনো পুরুষের দুর্বলতা থাকে সে মেয়ে চাইলেই ওই পুরুষকে মুখে ললিপপ দিয়ে আজীবন শিশু রাখতে পারে। আর তুমি তো রনোকে রেখেছ হ্যাকিং চক্রের। আমাদের দেশে তোমাদের এই হ্যাকিং-ট্যাকিং নিয়ে এখন মহাকাণ্ড চলছে। আমি চাই না তোমার মতো নিচু ব্রেথেলের কারণে আমার দেশের একজন খ্যাতিমান ব্যবসায়ী কাম সুশীল বিপদে পড়ুক। আসিয়া ডেইজির কথায় মুচকি হেসে বলে, তোমার কথা ঠিক। তুমি সব জেনে গেছ। কিন্তু এও নিশ্চয় জেনে গেছ যে, আমার বাকি সব পরিচয় ঠিক। আমি সিরীয়। আমি রনোর সঙ্গে সে জুয়াই খেলেছি যা অন্যদের বেলায় খেলি। এটাই আমার কাজ। আমি রনোর টাকা কোনো দিনই ফেরত দেব না। পারব না। কারণ ইতোমধ্যে এটা এই ক্যাসিনো হজম করে ফেলেছে। এটা আমার পকেটে নেই। সরল চেহারার আসিয়ার মুখে এমন গরল কথা শুনতে শুনতে রনোর মাথা ঘুরতে থাকে। সে ডেইজির কাঁধে হেলে পড়ে বলে— আমার টাকা! আসিয়া এদিকে কর্ণপাত না করে সামনে হাঁটে। ক্যাসিনোর নীল আলোয় সে মিশে যায়। বেদনার নীল চোখে ডেইজি রনোর দিকে তাকায়। রনোর কাছে সবকিছু যেন একটা খোয়াব বলে মনে হয়। ক্যাসিনো-খোয়াব।





গল্প

মহাযাত্রা

আবুল বাসার

আজ আমাদের বাড়িতে শোকের মাতম চলছে। ভোরবেলায় মারা গেছে আমাদের দাদি রায়জন নেছা। উঠানের এককোণে আমগাছ তলায় গোসল দেয়া হচ্ছে তাকে। বড়ই পাতা সমেত পানি গরম করে আনা হয়েছে। বাড়ি ভরা মানুষ। আত্মীয়-অনাত্মীয়, পাড়া-প্রতিবেশী ও আশপাশের গ্রাম থেকে কয়েকশ' মানুষ এসে জমায়েত হয়েছে এখানে। আত্মীয়রা কাঁদছে। দাদির ছয় ছেলে ও এক মেয়ে। তাদের ঘরে আটাশজন সন্তান-সন্ততি। দাদার মৃত্যু হয়েছিল প্রায় বাইশ বছর আগে। এতটা বছর দাদি ছয় ছেলে ও এক মেয়েকে মানুষ করে সংসারটাকে আগলে রেখে বেঁচেছিল। আজ চলে যাচ্ছে পৃথিবী ছেড়ে। কখনো আর ফিরে আসবে না। ছেলেমেয়ে, ছেলের বউয়েরা, নাত-নাতনি সবাই কাঁদছে। কেউ সশব্দে বিলাপ করে কাঁদছে, কেউ বা কাঁদছে নীরবে শুধু চোখের জল ফেলে। আমি কাঁদছি একটু দূরে নিম্ন গাছের তলে দাঁড়িয়ে। পুরো বাড়িতে

কান্নার আওয়াজে স্করুণ আবহ তৈরি হয়েছে। সবাই শোকে মুহমান। এই শোক বিহ্বলতার মাঝেও আমার মনে পড়ে বহুদিন আগের এক রাতের কথা। রাতটা ছিল জোছনার কাছে সমর্পিত। পূর্ণিমার চাঁদের অব্যাহত আলোয় আলোকিত হয়েছিল আকাশ ও চরাচর। বারান্দায় মাদুর পেতে দাদির মুখে রূপকথার গল্প শুনব বলে তার চারপাশ ঘিরে বসেছিলাম আমরা ভাই-বোনেরা। তার মুখে রূপকথার গল্প শোনা আমাদের অভ্যাস ছিল। প্রায় প্রতি রাতেই শোনা হতো। তার বলা গল্পগুলোর কাহিনী ও বলার ভঙ্গিতে ছিল মুগ্ধতা। আমরা মন্ত্রমুগ্ধের মতো তন্ময় হয়ে শুনতাম। শুনতে শুনতে রাত গভীর হতো। কখনো রাত ফুরিয়েও যেত। কিন্তু আমাদের চোখে ঘুম আসত না। দাদি ক্লান্ত হয়ে পড়ত। আমরা ঘুমিয়ে পড়েছি ভেবে চূপ করে থাকত কিছুক্ষণ। হঠাৎ আমরা বলে উঠতাম, 'তারপর?' দাদির হয়তো ঘুমে চোখ বুজে এসেছিল। ঘুম জড়ানো

গলায় বলত, 'তোরা ঘুমাসনি এখনো?'

'ঘুমাব কেন? গল্প কী শেষ হয়েছে?'

'না, শেষ হয়নি। বাকিটা কাল বলব।'

'কাল না আজই বল।' বলেই আমরা পাকা চুল বেছে দেয়া, হাত-পা টিপে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিতাম।

'আচ্ছা ঠিক আছে, বলছি। একটু দম ফেলতেও দিবি না তোরা!' এই বলে দাদি ফের গল্প বলা শুরু করত, 'তারপর কদ্দুর না বলেছিলাম?'

আমরা মনে করিয়ে দিতাম, 'রাজার অসুখ।'

দাদি আবার গল্প বলা শুরু করত, 'হ, মনে পড়েছে। রাজার হয়েছে অসুখ। তবিজ-কবচ, ওষা-বৈদ্য, ডাক্তার কবরেজ সব করা হয়েছে। কিন্তু রোগ সারে না। রাজা মনে মনে ভাবে, আমার মৃত্যুর সময় হয়ে গেছে বোধ হয়... এতটুকু বলে হঠাৎ গল্প থামিয়ে দাদি বলে উঠল, 'আজ আর না। বাকিটা কাল বলব।'

'না আজই বল।' আমরা সবাই একসঙ্গে আবদার করতাম।

দাদি ঘুম জড়ানো গলায় বলত, 'আমার চোখে ঘুম এসে গেছে। আজ আর বলতে পারব না।'

'ঠিক আছে। শুধু এইটুকু বল, রাজা বেঁচে ছিল না মারা গেছে?'

হঠাৎ মরণের কথা উঠতেই দাদি যেন একটু অনমনস্ক হয়ে গেল। আমরা ফের তাড়া দিতাম, 'ও দাদি! বল না এরপর কী হলো? রাজার অসুখ কি সেরেছিল নাকি রাজার মৃত্যু হয়েছিল?'

ঠিক এ সময় মা এসে দাদিকে বিরক্ত করছি দেখে রোগে গিয়ে বলত, 'এসব গল্পতল্ল রেখে ঘুমাতে যা। রাত অনেক হয়েছে। সকালে স্কুলে যেতে হবে। এখন ঘুমা গিয়ে।'

এরপর আর গল্প শেষ হলো না। গল্পটা অসমাপ্ত রেখেই দাদি বলেছিল, 'আমার মৃত্যুর পর কবরে সমাহিত হওয়ার আগে আমার নিখর দেহটা কীভাবে পড়ে থাকে। আমাকে ঘিরে কে কে কাঁদে। কী কী কাণ্ড ঘটে তা যদি আমি দেখতাম!'

আমি কাঁদছি। আটাশজন নাত-নাতনি আর ছেলের বউয়ের বিলাপ করে কাঁদছে। কাঁদছে আত্মীয়-অনাত্মীয়, পাড়া-প্রতিবেশীরাও। জীবনের শেষ গোসলটা সেরে সাদা কাপড়ে মোড়ানো হয়েছে দাদির নিখর দেহটাকে। আতর, লোবান মেখে অপেক্ষা করা হচ্ছে শেষ তখা- মহা যাত্রার। দাদি কি এসব দেখতে পাচ্ছে?

সকাল গড়িয়ে দুপুরের দিকে ধাবিত হচ্ছে সময়।

দাদিকে শেষবারের মতো দেখতে পুরো গ্রাম এসে জড়ো হয়েছে আমাদের বাড়ির উঠানে। উঠান ভরে উত্তরধার-দক্ষিণধার ছেয়ে গেছে মানুষ। কিন্তু এত কিছুই মধ্যেও দাদির বাপের বাড়ির কারো নোকা এসে ঘাটলায় ভেঙেনি। দাদি জানান দিয়ে যাত্রা শুরু করা সত্ত্বেও কেন তাদের আগমন বিলম্বিত হচ্ছে? দাদি হাসপাতালের সাদা বিছানায় শুয়েছিল বহুদিন। ঠিকমতো ঘুমাতে পারেনি, খেতে পারেনি। খেতে পারত শুধু তরল খাবার। ঘুমানের জন্য সব রকমের চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু দাদি যেন চির অতন্দ্র হয়ে গেছে। ঘুমের কড়া ভাগ হাক্সাভাবে তন্দ্রায় আচ্ছন্ন করে রাখে শুধু তাও কিছুক্ষণের জন্য। তার জন্য দিনেরবেলায় তো বটেই, সারারাতও জেগে থাকতে হয়েছে বাড়ির মানুষকে। দাদির ছয় পুত্রবধূ পালা করে রাত জেগে সেবা-যত্ন, ওষুধ-পথ্য সেবন করিয়েছে। পুত্রবধূদের এমন সেবা-যত্নের তচ্ছল্য করে দাদি বলেছিল, 'আমার জন্য কেন মিছে এত কষ্ট করছ তোমরা?'

বউদের মধ্যে থেকে বড়বউ বলেছিল, 'আম্মা,

আপনি একটু ঘুমান।'

দাদি বলেছিল, 'একদিন তো ঘুমাবোই। এই তো অল্প কিছুদিনের মধ্যে চলে আসবে সেই চির ঘুমের দিনটা। যে ঘুম আর কোনো দিনই ভাঙবে না।'

বাড়ির ছোট-বড় সবাই জেগেছিল। কেউ ঘুমোয়নি। দাদির মাথার কাছে মা আর ফুপু ও কাকিরা হাত-পায়ের কাছে বসেছিল। আমরা নাত-নাতনিরা, বাবা ও ছোট কাকা বসেছিলাম দাদির বিছানার পাশে। মেজোকাকা চেয়ারে হেলান দিয়ে দাদির কাছে ধীর গলায় বলেছিল, 'মা, আলসারটা প্রায় সেরে এসেছে। তবু ডাক্তারকে একবার দেখানো দরকার। ডাক্তারের রিপোর্ট পেলে নিশ্চিত হওয়া যায়।'

কাকার কথা শুনে দাদির মধ্যে কোনো উৎসাহ দেখতে পেলাম না। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বেশ ভারি গলায় বলেছিল, 'তোরা ভাবিস নে আসন্ন মৃত্যুর কথা ভেবে আমি খুব কষ্ট পাচ্ছি। আমি কষ্ট পাচ্ছি তোদের এমন অভিনয় দেখে। কী নিখুঁত অভিনয় করে চলেছিস তোরা আমার সঙ্গে।'

সবাই চুপ করে একে অপরের মুখের দিকে তাকাল। দাদি ফের বলতে লাগল, 'শোন বাবা! ডাক্তারের সঙ্গে ফিস্‌ফিস্ গোপন আলোচনা করে তোরা সবাই মিলে রিপোর্ট গোপন রাখলে কী হবে? আমার কাছে ব্যাপারটা মোটেও গোপন নেই। আমি তো একেবারে মুখ্য নই রে। আমি তো তোদের লেখাপড়া জানা মা। আসল সত্য কথাটা তোরা সবাই মিলে আমার কাছে কেন লুকাতো চাচ্ছিস? তোরা কি ভাবিস আমি কিছুই বুঝি না!'

মা বলেছিল, 'কী বলছেন এসব যা তা!'

'যা তা নয়, বরং যা, তা-ই বলছি।'

'আপনি শুধু শুধু এ কথা বলছেন মা। কোনো ভয় নেই আর। আপনি একদম ভালো হয়ে গেছেন।' দাদি সবাইকে কাছে ডেকে নিয়েছিল 'এদিকে আয় সবাই।'

আমরা দাদির কাছে গেলাম, খুব কাছে। দাদি জড়িয়ে আসা গলায় বলেছিল, 'ওই যে দেখ, দেয়ালের ঘড়ির কাঁটাটা এগিয়ে যাচ্ছে ক্রমশ। টিক টিক শব্দ হচ্ছে। ঘড়ির কাঁটাটা টিক টিক শব্দে শুধু এগিয়েই যাচ্ছে না। আমাকে জানিয়ে দিচ্ছে, সময় চলে যাচ্ছে দ্রুত। এগিয়ে যাচ্ছে শেষের দিকে।'

মেজোকাকা বলেছিল, 'চুপ করেন মা। আপনি এখন ঘুমান।'

দাদি বলেছিল, 'ঘুম তো আসে না রে বাবা!'

'চেষ্টা করেন। রাত প্রায় একটা বেজে গেছে। এত রাতঅবধি জেগে থাকলে শরীর আরো খারাপ করবে।' ফুপু এতক্ষণ চুপচাপ বসেছিল। কাকার কথার সঙ্গে সঙ্গে সেও বলেছিল, 'হ্যাঁ, বেশ রাত হয়েছে।

আম্মা, এবার একটু ঘুমান।'

'ঠিক আছে। তোরাও ঘুমা গিয়ে। এই তো আমি এখনই ঘুমিয়ে পড়ছি।' বলেই দাদি চোখের পাতা বন্ধ করল। কিন্তু আমরা কেউ ঘর থেকে বের হলাম না। কারণ- দাদির মহাযাত্রার দৃশ্যটা কীভাবে রচিত হয় তা দেখা থেকে বঞ্চিত হতে চায়নি কেউ।

ভোর হওয়ার একটু আগে ফজরের নামাজের পরে দাদির ঘুম ভাঙল। মেজোকাকা দাদির খুব কাছে বসে জিজ্ঞেস করেছিল, 'আম্মা! এখন কেমন লাগছে?'

দাদি নির্বিকার গলায় বলেছিল, 'ভালো।'

'সত্যি বলছেন?'

'মরণ পথের যাত্রী হয়ে মিথ্যে বলব, তু-ই বল!'

'কিছু খেতে ইচ্ছে করছে, কিছু খাবেন?'

'কী খেতে পারি?'

'ডাক্তার বলেছে কোনো বারণ নেই। আপনি যা খেতে চাইবেন তা-ই খেতে পারবেন।'

'কোনো বারণ নেই কেন? শেষ খাওয়া বলে?'

বলেই দাদি কাঁদতে শুরু করেছিল। শিশিরের মতো ফোটা ফোটা অশ্রু ঝরে পড়ছিল দাদির দুচোখ বেয়ে। কাঁদতে কাঁদতে ফের বলেছিল, 'আমিও তা বুঝতে পেরেছি। ডাক্তার খাবারের ব্যাপারে আর কোনো বারণ করবে না।'

আমার বাবা-মা, কাকা-কাকিরা, ফুপু ও আমরা নাত-নাতনিরাও কাঁদতে শুরু করেছিলাম। সবার চোখেই নেমে এসেছিল জলা। কেউ আর কান্না, চোখের জল দাদির চোখের আড়াল করে রাখতে পারল না। হঠাৎ মায়ের মনে পড়ল দাদিকে সকালের ওষুধ খাওয়াতে হবে। তাই দাদির মুখের কাছে ওষুধ নিয়ে নিচু গলায় বলেছিল, 'মা, একটু হা করুন, ওষুধ খেতে হবে।'

দাদি বলেছিল, 'নাগো, এখন আর ওষুধটমুধ কিছুই খাব না। আমার ভীষণ খারাপ লাগছে। তোমরা বরং ফ্যানের স্পিডটা বাড়িয়ে দিয়ে আমার কাছে আস। আমি এখন তোমাদের সঙ্গে কিছু কথা বলব।'

ফ্যানের স্পিড বাড়িয়ে দিয়ে আমরা দাদির চারপাশ ঘিরে বসলাম। কিন্তু ততক্ষণে আমাদের প্রিয় দাদি নিখর, নিশ্চল হয়ে গেছে। মেজোকাকা নোড়ে ছুটে গেল ডাক্তারের কাছে। ডাক্তার এসে জানাল, দাদী আর বেঁচে নেই। আমাদের ছেড়ে চলে গেছে চিরতরে। দাদিকে জড়িয়ে ধরে মা, কাকিরা, ফুপু চেষ্টা করে দাদি শুরুর করে দিল। তাদের চিৎকার শুনে পাড়া-প্রতিবেশীরা ছুটে এলো আমাদের বাড়িতে। আমরাও কাঁদতে কাঁদতে মাটিতে লুটিয়ে পড়লাম। দাদি টান টান হয়ে শুয়ে আছে হা করে। কয়েকজন মিলে তাকে দক্ষিণে পা আর উত্তরে মাথা রেখে শুইয়ে দিল। ধবধবে সাদা কাপড়ে ঢেকে দেয়া হলো তার সারা দেহ। আগর বাতি জ্বলে দিল কে যেন। কয়েকজন ছেলমেয়ে দাদির চারপাশ ঘিরে বসে কোরআন শরিফ পড়তে লাগল। মুহূর্তের মধ্যেই হয়ে গেল এসব কিছু।

আতর, আগর আর লোবানের সুগন্ধ বাতাসে মিশে পুরো বাড়ি সুগন্ধময় করে তুলেছে। দাদির লাশসহ খাটিয়া নিয়ে মাদ্রাসার মাঠের দিকে এগিয়ে চলেছে শববাহকেরা। তাদের মুখে আল্লাহর নাম ধ্বনিত হচ্ছে। মাদ্রাসার মাঠে শত শত মানুষ জনাজার জন্য অপেক্ষা করছে। জানাজা শেষ হলে মাদ্রাসার পাশেই ভুঁইয়া বাড়ি পারিবারিক কবরস্থানে দাদির লাশ সমাহিত করা হবে। কবরে নামিয়ে চল্লিশ কদম পেরিয়ে এলেই দাদিকে জিজ্ঞেস করা হবে, 'তোমার রব কে? তোমার স্বীন কী?' নবীকে দেখিয়ে বলবে, 'ইনি কে?' দাদি এসব প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারলেই পার পেয়ে যাবে। যদি প্রশ্নগুলোর উত্তর না দিতে পারে তাহলে অন্ধকার কবরে দাদিকে যে কত সাপাখোপ-কীটপতঙ্গ দংশন করবে। দাদি সেসব দংশন-যন্ত্রণা সহ্য করতে নাম পেরে আত্নানাদ করতে থাকলেও রেহাই পাবে না...। এই দৃশ্যটাই জানাজা পড়ার সময় কল্পনা করছে আমজনতা। এর মধ্যে জানাজা শেষ হলো। দাদিকে কবরে নামিয়ে বাঁশের মাচা আর কলাগাছের খোলস বিছিয়ে মাটিচাপা দিয়ে সবাই চলে গেলে আমি একটু দূরে দাঁড়িয়ে দুই হাত তুলে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলাম, 'আয় খোদা! দয়াময়, আমার দাদির তরোতে যেন গো বেহস্ত নাজেল হয়...।'



খেলা

শামীমা সাত্তার মিমু ক্রীড়াঙ্গনের আলোকিত একজন

জাহিদ রহমান

এখনো ক্রীড়াঙ্গনে ভীষণ উজ্জ্বল এবং আলোকিত এক নাম শামীমা সাত্তার মিমু। ক্রীড়ামহলে এবং পরিচিত জনের কাছে 'মিমু' নামেই যিনি বড় বেশি পরিচিত। একসময়ের সাড়াজাগানো অ্যাথলেট তিনি। জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কারও পেয়েছেন। বর্তমানে বিকেএসপি'র উপপরিচালক (প্রশিক্ষণ) হিসেবে কর্মরত আছেন। একজন দক্ষ ক্রীড়াসংগঠক, বিচারক, ম্যাচ রেফারি হিসেবে তিনি শুধু এখন আর নিজ দেশ নয়, দেশের বাইরেও সমানভাবে সমাদৃত। সর্বশেষ ভারতের গোহাটি-শিলং-এ অনুষ্ঠিত ১২তম এসএ গেমসে তিনি বাংলাদেশ দলের মহিলা টিম ম্যানেজার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এই গেমস থেকে

বাংলাদেশের মেয়েদের যে অনন্য অর্জন সেখানে শামীমা সাত্তার মিমুর অবদান কোনো অংশেই কম নয়। রাতদিন পরিশ্রম করে তিনি নারী অ্যাথলেটদের উজ্জীবিত ও উৎসাহিত করেন। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার আলোকে সাহস ও পরামর্শ দেন। যার ফলাফলও তিনি দেশবাসীকে উপহার দিতে সক্ষম হন। এসএস গেমস থেকে শীলা, মাবিয়ারা দেশের জন্যে যে দারুণ সাফল্য বয়ে আনে সেই সাফল্যের নেপথ্যের তিনিও একজন।

জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কার প্রাপ্ত শামীমা সাত্তার মিমু সত্তর ও আশির দশকে ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ডের দাপুটে এক অ্যাথলেট ছিলেন। খেলেছেন দীর্ঘদিন ধরে। সে সময়



স্প্রিন্ট, হার্ডলস, হাইজাম্প, লংজাম্প-ইভেন্টে তার ছিল সক্রিয় ও সরব উপস্থিতি। তবে বড় বেশি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন মেয়েদের হাইজাম্প ইভেন্টে। জাতীয় পর্যায়ের লড়াই-এ প্রমীলাদের এই ইভেন্টে টানা ষোলোবার চ্যাম্পিয়ন হওয়ার অনন্য এক রেকর্ড এখনো তার করায়ত্তে। এই রেকর্ড এখনো অক্ষত রয়ে আছে। এখন পর্যন্ত কেউ এ রেকর্ড ভাঙতে পারেনি। মিমু এবং হাইজাম্প নামটি তাই একসময় প্রায় সমার্থক হয়ে উঠেছিল। মিমু যতদিন ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ডে ছিলেন ততদিন হাইজাম্প তার ধারের কাছেও আর কেউ আসতে পারেননি। বলা যায়, এখনো তার মতো কেউ আলো ছড়াতে পারেনি এই ইভেন্টে। আবার আন্তর্জাতিক আঙিনায় মহিলা ইভেন্টের জাম্প রেফারির দায়িত্ব পালন করেছেন কেবল তিনিই। এখানেই শেষ নয়, বাংলাদেশ মহিলা ক্রীড়া সংস্থা, অ্যাথলেটিক্স ফেডারেশনসহ বেশ কয়েকটি ফেডারেশনের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে রয়েছেন তিনি। খেলোয়াড়, সংগঠক হিসেবে অনেক দেশে গিয়েছেন। অভিজ্ঞতার ঝুলিও তাই তার অনেক বড়।

মিষ্টি চেহারার মিমুর ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ডে জাতীয় পর্যায়ের লড়াই-এ আগমন ঘটেছিল স্বাধীনতার পরপরই। ৭৩ সালে দিনাজপুর জেলাতে অনুষ্ঠিত ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে ১০০ মিটার, ২০০ মিটার, লংজাম্প এবং ট্রিপল জাম্পে তিনি প্রথম হন। ওই বছর দিনাজপুর জেলা জাতীয় অ্যাথলেটিক্সে অংশগ্রহণ করে। ৭৩ সালে নিজ জন্মস্থান দিনাজপুর জেলা একাদশের পক্ষে ঢাকায় অনুষ্ঠিত প্রথম জাতীয় অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় খুদে এক অ্যাথলেট হিসেবে অংশ নেন। বয়স তখন তার ছিল মাত্র ১৩ বছর। দিনাজপুরের মতো মফস্বল শহর থেকে আসা এই কিশোরী জাতীয় পর্যায়ের লড়াই-এ সেসময় সূচনাতেই চমকে দিয়েছিলেন লং জাম্পে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। এই ইভেন্টে প্রথম হয়েছিলেন প্রখ্যাত অ্যাথলেট সুলতানা আহমেদ খুকী। প্রথম জাতীয় অ্যাথলেটিক্সে ১০০ মিটার স্প্রিন্টার এবং হার্ডলসে অংশ নিয়ে তিনি তৃতীয় স্থান অর্জন করেছিলেন। ১০০ মিটারে প্রথম হয়েছিলেন শামীম আরা টলি। কয়েক বছর আগে যিনি প্রয়াত হন। দ্বিতীয় হয়েছিলেন সুলতানা আহমেদ খুকী। ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে প্রিয়দর্শিনী অ্যাথলেট সুলতানাও নিহত হন। সেই সময়ের কথা মনে করে মিমু বলেন, ‘তখন আমি অনেক ছোট। খালি পায়ে জাতীয় পর্যায়ের লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করি। তাও আবার সুলতানা আহমেদ খুকীর মতো অ্যাথলেটের সঙ্গে। আমাকে দেখে খুকী আপা দারুণ খুশি হন। আমাকে আদর করে অনেক পরামর্শ দেন। মনে আছে সেদিন ট্র্যাকসুট পরা খুকী আপার দিকে অপার স্বপ্ন নিয়ে শুধু চেয়ে থেকেছিলাম। তখন একটা রানিং সু পর্যন্ত ছিল না আমাদের। আপা বলেছিলেন খেলে যাও ভালো করবো।’

প্রথম জাতীয় অ্যাথলেটিক্সের পর মিমুকে আর পেছনে তাকাতে হয়নি। জাতীয় অ্যাথলেটিক্সের প্রতিটি আসরেই তিনি বাজিমাত করার অনন্য কৃতিত্ব দেখান। তবে ৭৯ সালে হাইজাম্পে প্রথম চমক দেখান তিনি। মিমু পরপর চারবার চ্যাম্পিয়ন মেরিনা খানম মেরীকে পেছনে ফেলে নতুন রেকর্ড গড়ে সেবছর চ্যাম্পিয়ন হন। শুধু রেকর্ড গড়াই নয়, প্রিয়দর্শিনী অ্যাথলেট হিসেবেও সবার মন জয় করেন

তিনি। ৭৯ সাল থেকে টানা ৮৪ সাল পর্যন্ত মিমু চ্যাম্পিয়ন হয়ে এই ইভেন্টে একজন মডেল অ্যাথলেট হিসেবে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। এই ইভেন্টে মিমু এতটাই খবরদারিত্ব দেখান যে ৯২ সালের ২২ ডিসেম্বর ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ডকে গুডবাই জানানোর দিনও মিমু প্রথম হয়েই বিদায় নেন। হাইজাম্প থেকে মিমু বিদায় নেয়ার পর তার যোগ্য উত্তরসূরি হিসেবে আসেন সাখী পারভীন। সর্বশেষ বছরে বিটিএমসির হয়ে ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ডের লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করেন। ফিল্ড অ্যান্ড ট্র্যাকের লড়াই থেকে অবসরের পরপরই বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস করপোরেশন (বিটিএমসি)-এর ম্যানেজার হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। কিন্তু অ্যাথলেট তৈরির অদম্য বাসনায় পরবর্তীতে অ্যাথলেট কোচ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। এখানেও তিনি রেকর্ড গড়েন দেশের প্রথম নারী অ্যাথলেট কোচ হিসেবে। অবশ্য বিটিএমসি ছেড়ে এক বছর পরেই কোচ হিসেবে যোগ দেন জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ তথা এনএসসিতে। এনএসসির কোচ হিসেবে তিনি দারুণ দক্ষতা দেখান। অবশ্য এর আগেই ভারতের পাতিয়ালা থেকে কোচিং-এর ওপর ডিপ্লোমা সাফল্যের সঙ্গে শেষ করে আসেন। উচ্চতর প্রশিক্ষণ নেন জার্মান থেকেও। তার দক্ষ কোচিং-এর কারণেই ৯৬ সালে পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক মহিলা ইসলামিক গেমসে অ্যাথলেট যুথি, ফিরোজা, নিলুফাররা কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফল করতে সক্ষম হন। অতঃপর টানা আট বছরের কোচিং জীবনের অবসান ঘটিয়ে বিকেএসপিতে যোগ দেন। ২০০২ সালের ৬ জুন নিজ জন্মভূমি দিনাজপুর বিকেএসপির উপ-পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব প্রাপ্ত হন। সে সময় মিমুর পরিচালনায় দিনাজপুর বিকেএসপিতে যুক্ত হয় নতুন প্রাণ। মিমু দিনাজপুরের মেয়ে হওয়ার কারণে অনিবার্যভাবেই অঙ্গীকারবদ্ধ হন এই ভেবে যে, বন্যা আর নানা অভাব যেখানে নিত্য সঙ্গী সেই এলাকার কিশোর-কিশোরীদের দু চোখে তিনি হাসি ফোটাবেন। নিজের মাঝে যতটুকু আছে তা নিংড়ে দেবেন। কয়েক বছরে বছরে মিমু তা বেশ ভালোভাবেই প্রমাণ করতে সক্ষম হন। মিমু দায়িত্ব পাওয়ার পর দিনাজপুর বিকেএসপিতে অনেকগুলো আবাসিক-অনাবাসিক ফুটবল, হকি, সুইমিং, অ্যাথলেটিক্স ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। তার জামানায় ভূটানের অনূর্ধ্ব ১৫ ফুটবল দলও দিনাজপুর বিকেএসপিতে খেলতে আসে। মিমুর ব্যবস্থাপনায় তারাও ভীষণরকম সন্তোষ প্রকাশ করে যান। সেই স্মৃতি মনে করে মিমু বলেন, ‘দিনাজপুর বিকেএসপিতে দায়িত্বে থাকা অবস্থায় প্রতিভা অন্বেষণের জন্য অ্যাথলেটিক্স, ফুটবল, হকি এবং ক্রিকেট-এর বেশ কয়েকটি ক্যাম্প করি। শুধু এই নয়, মরহুম আব্দুল ওয়াহেদ স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্ট, তিনবার স্ব-উদ্যোগে দিনাজপুর বিকেএসপি কাপ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট, জাতীয় হ্যান্ডবল প্রতিযোগিতার আবাসিক ক্যাম্প, মহিলা ফুটবল দলের আবাসিক ক্যাম্প, রাজশাহী বিভাগের অনূর্ধ্ব-১৩ ক্রিকেট দলের খেলা- এসবের আয়োজন করি। দিনাজপুরবাসী এসব আয়োজনের কথা মনে রেখেছে।’ প্রথমবারের মতো জাতীয় ভলিবল দলের আবাসিক ক্যাম্পও হয়েছিল তার সময়ে। এর আগে দিনাজপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থা আয়োজিত প্রথম বিভাগ ক্রিকেটে লীগে বিকেএসপি খেলার যোগ্যতা

অর্জন করেছিল তারই পরিশ্রমের ফলশ্রুতি হিসেবে। মিমুর গল্প এখানেই শেষ নয়। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতার অনেক জায়গাতেই তিনি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। জাতীয় অ্যাথলেটিক্সের জাম্প ইভেন্টের একমাত্র মহিলা রেফারি হিসেবে অনন্য কৃতিত্ব তিনিই গড়েছেন। আবার নবম সাফ গেমসে অ্যাথলেটিক্সের জাজ হিসেবেও দায়িত্ব পালন করার অভিজ্ঞতা তার রয়েছে। মিমু একসময় যেমন অ্যাথলেট হিসেবে বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গন আলোকিত করেছেন তেমনি এখন ব্যবস্থাপক, পরিকল্পক এবং প্রশাসক হিসেবেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। সবচেয়ে বড় কথা এক দীর্ঘসময় ধরে তিনি ক্রীড়াঙ্গনের সঙ্গে নিজেকে আন্তঃপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছেন। অ্যাথলেটিক্সে আলোকিত পথও রেখে গেছেন পরবর্তী প্রজন্মের জন্য। তবে নিজের মাঝে তার অসন্তোষও আছে। বিশেষ করে সাফ লড়াই-এ হাইজাম্প ইভেন্ট থেকে কোনো পদক না পাওয়ার দুঃখ তার রয়েই গেছে। শামীমা সাত্তার মিমু বলেন, টেকনিক্যাল সুযোগ-সুবিধা না থাকার কারণেই হাইজাম্পে এ দেশের অ্যাথলেটরা নারী-পুরুষ দু বিভাগেই খুব বেশি দূরে এগুতে ব্যর্থ হয়েছে। নিজের অভিজ্ঞতা টেনে তিনি বলেন, একসময় তারা বালুতে লাফিয়ে কম্পিটিশন করেছেন। অনেক পরে জাতীয় পর্যায়ের লড়াই-এ ফোমের সুবিধা দেয়া হয়। মিমু আরো বলেন, এখন জাতীয় পর্যায়ে হাইজাম্পের লড়াই-এ ফোমের ব্যবহার থাকলেও গ্রাসরুট পর্যায়েতো অ্যাথলেটরা বালুতেই লাফাচ্ছে। ফলে অন্য দেশের সঙ্গে তুলনা করলে সামনে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে এটি একটি বড় বাধা। মিমুর মতে, এ ধরনের ইভেন্টে ভালো ফলাফলের জন্য অবশ্যই সুযোগ-সুবিধা বাড়তে হবে। শুধু রাজধানী ঢাকাতে নয়, সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করতে হবে জেলা পর্যায়েও, তবেই না ভালো ফলাফল করার সুযোগ সৃষ্টি হবে। শামীমা সাত্তার মিমু আমাদের ক্রীড়াঙ্গনের এক অন্যতম সাক্ষী। নিজ মাঠে খেলেছেন, খেলোয়াড় তৈরি করেছেন। মাঠ ছেড়ে যাননি, মাঠেই থেকেছেন। ফলে তার অভিজ্ঞতার বুলিও অনেক বড়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ঘুরেছেন। আন্তর্জাতিক সব ইভেন্টে কখনো খেলোয়াড়, কখনো কোচ, কখনো ম্যানেজার, জাজ হিসেবে অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি মনে করেন বর্তমান সময়ে বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনে নারীর নতুন এক অগ্রযাত্রা শুরু হয়েছে। এই অগ্রযাত্রার সূচক হলো আন্তর্জাতিক ক্রীড়াঙ্গনে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি এবং সাফল্য প্রাপ্তি। তার মতে, নারী অ্যাথলেটরা এখন অ্যাথলেটিক্স, ক্রিকেট এবং ফুটবল এই তিনটি ধারাতে চমৎকার সব সাফল্য অর্জন করে দেশের ক্রীড়াঙ্গনকে সুরভিত এবং সৌন্দর্যময় করছে। সর্বশেষ এসএ গেমসের দিকে আঙুল তুলে তিনি বলেন, ‘ভারতে অনুষ্ঠিত এসএ গেমসে যে সাফল্য দেখানো মেয়েদের সামগ্রিক অবদান পঁচাত্তর ভাগ, বাদবাকি ছেলেদের। দেশের যেকোনো অর্জিত চারটি সোনার তিনটিই নিয়ে এসেছে মেয়েরা। শিলা আর মাঝিয়ার কথা উল্লেখ করে বলেন, ‘ওদের দুজনের সাফল্যই এবারের সাফ গেমসের বড় সাফল্য। মান-নায় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনাও যে সাফল্যের অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছেন।’ মিমু মনে করেন বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপটে অনেককিছুই বদলে গেছে। শহরে মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়েরা এখন আর

খেলাধুলোতে যুক্ত হতে চায় না। সেভাবে তারা আসছেও না। সেই তুলনায় প্রান্তিক পর্যায়ের পরিবারের মেয়েদের এখন খেলাধুলার প্রতি আগ্রহ বেশি বলে প্রতীয়মান। তবে তৃণমূল পরিবারের মেয়েদের মাঝে আরো আগ্রহবোধ জাগাতে হলে আর্থিক সহায়তাসহ বহুবিধ প্রণোদনার ব্যবস্থা থাকতে হবে। সেটা না থাকলে মেয়েরা আসতে চাইবে না। তার মতে মেয়েরা যত বেশি খেলাধুলোতে যুক্ত হবে তত বেশি সাফল্য অর্জিত হবে। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে মেয়েদের ফুটবল এবং ক্রিকেটের অংশগ্রহণটাকে মিমু মেয়েদের অগ্রযাত্রার অন্যতম ফলক হিসেবে দেখেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘কয়েক বছর আগেও কেউ কল্পনা করেনি যে আমাদের মেয়েরা বিশ্বকাপ ক্রিকেটে অংশ নেবে। দেশের বাইরে গিয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফুটবল খেলবে। ভারত, পাকিস্তানের মেয়েদেরকে পরাজিত করে সাফল্য নিয়ে মেয়েরা দেশে ফিরবে। কিন্তু বিশ্বায়কর হলেও সত্য সব বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে ক্রীড়াঙ্গনে মেয়েরা অনেক পথ এগিয়ে গেছে। মেয়েদের এই পথচলাকে আরো মজবুত ও মসৃণ করতে হবে। আর তাই এগিয়ে আসতে হবে সবাইকে।’ সবশেষে তিনি বলেন, ‘প্রতিটি নারীর মাঝেই লুকিয়ে রয়েছে অদম্য শক্তি। সেই শক্তি অবশ্যই উন্মোচন করতে সঠিক পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ বিষয়ে বড় ধরনের ভূমিকা পালন করে যাচ্ছেন। আমরা সবাই যদি তৎপর হই, যদি নারীদের খেলাধুলোতে আরো পৃষ্ঠপোষকতা ও আর্থিক সুযোগ সুবিধা বাড়ানো সম্ভব হয়- তাহলে বাংলাদেশের মেয়েরা ক্রীড়াঙ্গনে আরো বড় ধরনের সাফল্য বয়ে আনতে সক্ষম হবে। ক্রীড়াঙ্গনকে মেয়েরাই বদলে দেবে দ্রুত। নারীর সামগ্রিক অগ্রযাত্রায় ক্রীড়াঙ্গনের মেয়েরা সাফল্য ও স্বীকৃতিতে অভূতপূর্ব অবদান রাখতে সক্ষম হবে।’ শামীমা সাত্তার মিমুর বাবার নাম মরহুম আব্দুল ওয়াহেদ। মায়ের নাম তররাতুন নাহার। ১৩ ভাইবোনের মধ্যে তিনি সবার ছোট। ১৯৭৬ সালের ৪ অক্টোবর বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন মো. আব্দুস সাত্তারের সঙ্গে। তার একমাত্র ছেলের নাম শাহ-রিয়ার শরীফ। গাছ লাগানো, গল শোনা তার প্রিয় শখ। ভীষণরকম মানবিক তিনি। মিমু কেবলই স্বপ্ন দেখেন বাংলাদেশের মেয়েরা আন্তর্জাতিক ক্রীড়াঙ্গনে আরো ভালো করছে, সাফল্য বয়ে আনছে। শিলা, মাঝিয়ার মতো আরো অনেকেই দেশের জন্যে স্বর্ণ জিতে নিয়ে আসছে। মিমু বলেন, ‘এ দেশের মেয়েদের মাঝে অসম্ভব সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে। প্রতিটি মেয়েকে এগিয়ে নিতে হবে। তাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। মেয়েরাই পারবে এদেশকে আরো সুন্দর করে গড়ে তুলতে।’ সবশেষে মিমু সেই পুরনো স্মৃতি মনে করে বলেন, ‘সবচেয়ে অসুবিধা হতো যখন ট্রাকসুট পরে মাঠে যেতাম তখন মানুষ বলত ছেলে না মেয়ে, ভালো বিয়ে হবে না। কিন্তু তাদের কথা কোনোদিন কানে নেইনি। বরং আল্লার রহমতে খেলতে খেলতেই ভালো চাকরি হয়েছে। নিজেকে খেলার জগতে রেখেছি। পরিশ্রম, শৃঙ্খলা ও সততার সঙ্গে খেলাধুলা ও পড়শোনা করলে অবশ্যই সাফল্য আসবে।’

জীবন

ইদ্রিস সরকার

শান্তি আর প্রেমপ্রবাহের মতো আনন্দ
আনন্দ আর শ্রমের মতো জগতের তৃণময় সুখ
তবু কেন মানুষেরা স্ব-ইচ্ছায় জ্বালাময়ী
সূর্যের হৃৎপিণ্ডে দৃষ্টির লোকালয় খোঁজে
দৃশ্য থেকে অদৃশ্যে দিন থেকে দিনান্তে?

কিছু পাখি উড়ে যায় কিছু ফিরে আসে
কিছু পাখি নরকের অগ্নিপ্রাসাদও
ফুটো করে স্বর্গের ধনাত্মক অন্তরীক্ষে ঠোট রাখে

পেছনে রাজহংসীর কালো চোখ থেকে
হলুদ ছন্দের মতো সবুজের ভালোবাসা
বারে যায় দূরে কালো ডাহক সংসারে

মোরগ ধারালো ঠোঁটের ভেতরে হৃদয়ের মূল্যায়ন
তবু কেন রৌদ্রের গভীর খাদে
যাত্রার বিরাট এ নোটিশ?
সময়ের পৃষ্ঠায় জীবন মানচিত্র
আরশিতে নির্জন ছবি নিজ লোকালয়ে হাত
হাতের তালুতে ম্রিয়মাণ এ জীবন।

জীবন

মনিরুজ্জামান

জীবনে জীবন থাকে
অনেক রকম জীবন থাকে
সুখী জীবন, দুখী জীবন,
চির সুখী চির দুখী জীবন থাকে
কেউবা হাসে জোসনা জলে
কেউবা জ্বলে দুখের জ্বলে
কেউবা আবার কষ্ট দিয়ে জীবন গড়ে
কেউবা আবার সুখ হারিয়ে দুখী হয়
কেউ বা আবার হাজার কষ্ট গুণে গুণে
স্বপ্ন দেখে রাজা হবে সুখী হবে
স্বপ্ন ভেঙ্গে দুখী হয়
কেউ বা আবার ভাগ্য খুলে সুখী হয়
কেউ বা আবার সারা জীবন কষ্ট সহ্যে দুখী হয়
তবুও মানুষ জীবন ছেড়ে অন্য কোথাও না চাই যেতে।

সম-অধিকার

জান্নাতুল ফেরদৌসী

ছেড়ে যাই জীবনের সীমারেখা,
কায়ক্লেশে কাঁটাতারের বেড়া।
কাব্যিক অনুভূতি গর্বিত কলম,
মায়া-মমতা, সুখ ও সান্নিধ্য।
প্রিয় মানুষ পাষণ নগরী,
ছেড়ে যাচ্ছি মায়াহীন নাগরিক জীবন।
কোলাহল জনমানুষ ঘরবাড়ি,
চলে যাই প্রকৃতির গানে।
নীরব পাহাড় জঙ্গল গহিন বনে,
গাছ ফুল লতা পাতা মল্লয়ার সনে
থাকব মিলেমিশে তাদের সাথে।
কিছুটা সময় কাটাব সেখানে,
তারপর যাব অন্যকোনো খানে।
যেখানে মানুষ মানুষের বন্ধু,
শত্রু বলে কিছু নেই
নেই কোনো চিন্তা অথবা হারাবার।
ক্লেশ কষ্ট দীনতা মানুষই মানুষ,
ভেদাভেদ ছাড়া উঁচু নিচু জাত-বেজাত
কিংবা ধর্মের বাড়াবাড়ি, হাফাকার মারামারি।
হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান-মুসলমান পুরুষ কিংবা নারী,
যেখানে মানব ধর্মই সেরা।

বেলা-অবেলার গল্প

রুমকি আনোয়ার

দুঃখ আমার সাজঘর, কান্না আমার বাসর
একদিন ক, খ, গ, ঘ লিখতে শিখেছিলাম
আজ শব্দেরা দুর্বোধ্য ঘাতক, নষ্ট নীড়
হৃদয় মন্দিরে বেদনার আরতি কেবলই আর্তনাদ।
শৈশব, কৈশোর, যৌবন, বার্ধক্য এসেও স্বপ্নের বুনন
বিধাতার অভিশাপ, স্বপ্ন আয়ু নিয়ে জন্ম আমার
যাদের ফেলে এসেছি পোড়া ধূপকার্ঠে তারা আমায় ডাকে
সময় বলে যায় ফুরিয়ে এসেছে বেলা।
মরে গেলে কবিতাগুলো তোমাদের স্মৃতি থেকে পালাবে অন্ধকারে
নক্ষত্রের মাঝে জ্বলে উঠা, নিভে যাওয়া মাঝে মাঝে দেখা মিললেও
হয়ত চিনতেও পারবে না ধূসর স্বীপের বাসিনীকে
যাবার সময় হয়ে এলো এখনো তোমাদের কাছে আমি অচেনা।
অনাগত পৃথিবীকে বলে যাই একদিন পাথরেও ফুল ফুটিয়েছিলাম
কালের গর্ভে মুছে গেছে তা, ছিটেফোটা যা আছে
ন্যাপথলিনের গন্ধ মাখা ছেঁড়া পাতায়, অজান্তে রয়ে যাব কারো স্মৃতিতে
কোনো এক সকালে খুন হবে ভোরের নরম আলো।